মাক্সিম গোর্কি রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা করেছেন :

অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন

কলিকাতা

প্রকাশক :
সোমেন পাল
রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রণে :
স্বপন বসু
বাসু প্রিন্টার্স
৫১ অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
অরুণ গুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কো
১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন :
আনন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৩৬ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

কুড়ি টাকা

সূচীপত্র

প্রিয় পাঠক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের একটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ইদানিং বহু বিশ্বখ্যাত লেখকের বই বাংলায় প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সুযোগে কোনও কোনও অসাধু প্রকাশক পাঠকদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে 'সমগ্র রচনাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মূল রচনার ৫০ শতাংশই মাঝে মাঝে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বিশ্ব সাহিত্যের মহান রচনাগুলির মূলের রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তারা যেন বাজার চলতি অন্যান্য রচনাবলী-গুলি দেখে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নেন।

আমরা বিশেষ জোরের সঙ্গে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, **আমাদের রচনাবলীতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই মূল রচনার হুবহু অনুবাদ।** অনুবাদক কিংবা সম্পাদক কোনক্ষেত্রেই মূল রচনার একটি লাইনকেও কেটে বাদ দেবার মত ধৃষ্টতা দেখাননি। **যদি কোন পাঠক আমাদের প্রকাশিত বইগুলিতে কোথাও একটি লাইনও কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে দেখাতে পারেন, তা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বইয়ের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব।**

একটি অনুরোধ : অনুগ্রহ করে বইটি পড়ার পর অনুবাদ, সম্পাদনা এবং অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আপনার মতামত যদি আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হব।

—প্রকাশক।

আমাদের অন্যান্য রচনাবলী

শেকস্‌পীয়র রচনাবলী
মপাসাঁ রচনাবলী
তলস্তয় রচনাবলী
দস্তয়েভস্কি রচনাবলী
ডিকেন্স রচনাবলী
চেকভ রচনাবলী
বঙ্গদর্শন

ভূমিকা

॥ এক ॥

ঝুলে-পড়া গোঁফ, তার ওপর পাহাড়ের চুড়োয় বসা বাজপাখির মত টিকালো নাক, একজোড়া ঘন ভ্রুর নিচে মমতামাখানো চোখ, বয়সের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন খানিকটা—মাক্সিম গোর্কির এই চেহারা সংগ্রামী সাহিত্যিকদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। কুঁদে-কাটা দেহের সবটাই যেন রাশিয়ার মাটি দিয়ে গড়া, সেই মাটি যা তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এক লেখক বলেছেন, 'দীর্ঘদিন হালের সম্পর্করহিত থাকার পর চাষাবাদের প্রয়োজনে এখন সারিবদ্ধভাবে ওল্টানো।' যে বিপুল গণজাগরণের ফলে সেখানে সম্ভব হয়েছে কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের সমষ্টিগত আধিপত্য, জমির ওপর কৃষিসংঘের কর্তৃত্ব, তার মহান ভাষ্যকার নভেম্বর বিপ্লবের প্রধান প্রেরণা—মাক্সিম গোর্কি। তাঁর সাহিত্যের ফসল, বলশেভিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মতই, সাধারণ মানুষের যজ্ঞে নিবেদিত। বস্তুতঃ সমস্ত দেশ যেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বারবার কথা কয়ে উঠছে—ভল্‌গার জলোচ্ছাস, মস্কো বা পেট্রোগ্রাড্ (অধুনা লেনিনগ্রাড্) শহরের জৌলুস, তুন্দ্রার কোল, স্টেপের দিগন্তপ্রসারী দোল, তাঁর রচনাকে প্রায়ই মহাকাব্যের গুণ দিয়েছে। আর কী বিচিত্র ব্যক্তিদের বাসই না সেখানে!—গ্রাম-শহরের কৃষাণ-জেলে-মজুর তো আছেই, চোর-বাউণ্ডুলে-গাঁটকাটা-বেশ্যাও বাদ যায়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সূচনার অন্তরঙ্গ চিত্রলিপি এত ব্যাপকতায় কোথাও ধরা পড়েনি। স্বয়ং লেনিন তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'আপনার দেখার পরিধি তুলনামূলকভাবে অনেক বৃহৎ এবং বিচিত্র।'

বাজপাখির ঠোঁটের সঙ্গে তাঁর নাকের সাদৃশ্য বর্ণনা করে শুরু করেছিলাম, উপমাটি আরো দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়—মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে চলেছেন তিনি রাশিয়ার পাহাড়-নদী-প্রান্তর অতিক্রম করে অন্যায়ের ওপর ছোঁ মেরে মেরে সেই ঝড়ো পাখির মত যার গান তিনি নিজেই বেঁধেছেন :

সমুদ্রের ধূসর উদারতায়
হাওয়ারা তুলে ধরল মেঘ
এবং সমুদ্র ও মেঘের মাঝখানে
গর্বিত
উড়ে বেড়ায় ঝড়ো পাখি
গাঢ় বিদ্যুৎচমকে যেন।
এই ঢেউ কাটিয়ে ডানায়—ভর করে
উঠে যায় মেঘে তীরের মত,
ডাক দেয়
আর মেঘেরা শোনে হর্ষধ্বনি সে তূর্যনাদে।

॥ দুই ॥

স্থান—নিঝ্‌নি-নভগোরদ, সন—১৮৬৮; গোর্কি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখলেন। শুরু থেকেই অস্বাচ্ছন্দ্য। বাড়ির অনুমতি ছাড়াই মা, ভারাভরা, খালি হাতে বিয়ে করেছিলেন। বাবা, মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ, সৎ এবং বিবেকী। একবার ভারভারার ভাইরা মিলে তাঁকে বরফ জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। সুস্থ হবার পর পুলিশী জেরা সত্ত্বেও তিনি কারো নাম ভাঙেননি, কেবল চোখের জল ফেলেছিলেন। তাঁরই বংশে জন্ম নিলেন আলেকসি মাক্‌সিমোভিচ পেশকভ, ডাকনাম আলিওশা। চার বছর বাদে সাভাতেয়েভিচ দেহ রাখলেন। ভারভারার বাপের বাড়িতে তখন তার বিয়েতে না দেওয়া যৌতুকসুদ্ধ সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে তুমুল বচসা। আশ্রয়ের অভাবে তবু সেখানেই উঠতে হল। পরের ঘটনা, বলা বাহুল্য, সুখের নয়। আলিওশার দাদু, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ছিলেন একটা রঙের কারখানার মালিক। বাড়ি বলতে ময়লা লালচে এঁদো ঘর, উঠোনে বড় বড় রঙগোলার গামলা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কটা চোখ, লাল দাড়ি, রঙে খেয়ে-যাওয়া হাত, দু ছেলে ইয়াকভ এবং মিখাইলোর জ্বালাতনে তিতি-বিরক্ত দাদুর তিরিক্ষি মেজাজের চিহ্ন পড়ত আলিওশার গা-হাতে-পায়ে। মাঝে মাঝেই শয্যা নিতে হত। এহেন অবস্থা বেশিদিন চলবার নয়। ছেলেরা পৃথক হয়ে যাবার পর আলিওশার দাদু ঘন ঘন বাড়ি বদলালেন। একে পারিবারিক অশান্তি, তার ওপর মদ্যপ অবস্থায় মিখাইলোর অত্যাচারের ফলে কিছুকাল সংসার লণ্ডভণ্ড হবার যোগাড়। দুঃখ ভুলতে আলিওশার মা আবার বিয়ে করলেন, কিন্তু জুয়াড়ী স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। যক্ষায় দুঃখিনী-জীবন শেষ হল অল্প পরেই। ওদিকে আলিওশার দাদু-দিদিমা নামতে নামতে তলানি ছুঁলেন। দশ বছর বয়সে মা বাপহারা আলিওশাকে পথে নামতে হল। এখন থেকে তিনি কেবল আলেকসি মাকসিমোভিচ পেশকভ। পরবর্তীকালে যিনি নিপীড়িতদের নিয়ে লিখবেন, তাঁর জীবন গোড়া থেকেই পোড় খাওয়া।

অন্য কেউ হলে মন বিষিয়ে যেত; কিন্তু আলেকসি ভিন্ন ধাতুতে গড়া। চতুর্দিকেই অসন্তোষ। মৃত্যুর আট বছর আগে তিনি বলেছিলেন, এসব দেখার পর তিনি তখনই বুঝেছিলেন—এ এক অছিলা কাজ না করার, প্রতিবাদ না জানানোর। ভয় অবশ্য পেতেন অমানুষিক দুর্গতিতে, হানাহানিতে। নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরদে থাকতেই দেখেছিলেন রাস্তা দিয়ে বুড়ো গ্রিগরি ইভানোভিচকে ভিক্ষে করতে। দাদুর কারখানায় সর্দার কারিগর থাকার পর অন্ধত্বের জন্য এই দশা। দিদিমা তখনই সাবধান করেছিলেন ফল সম্পর্কে, দশ বছর যেতে না যেতেই ভিক্ষাপাত্র হাতে দাদুকেও একই পথ ধরতে হয়েছিল। মার খাবার সময়ে যে ছেলেটি হাত বাড়িয়ে তাকে আগলাত—সিগানক, সে ছিল একটি চোর। দিদিমা সেবার বলেছিলেন, 'পৃথিবীটা একটা কুৎসিত জাল; ধরা পড়লে চোর মার খেয়ে মরে, কাজ না পেলে চুরি করতে বাধ্য হয়।' এভাবেই কখনোবা দাদুর মুখে বজরার গুণ টানার কষ্ট শুনে আবার কখনো চাষাদের জোর করে কাজে লাগাবার বর্বরতা দেখে, আলিওশার মনে সমাজবোধ জেগে ওঠে। প্রতিকার খোঁজেন তিনি। মেনে নিতে পারেন না দাদুর মত—দুর্ভোগ মাত্রই ঈশ্বরের দণ্ড; দিদিমার মতো সব কিছুকেই অনিবার্য বলে স্বীকার

করেন না। তাঁর আত্মসম্মান এবং সহানুভূতি জেগে উঠতে থাকে। বাড়ির অশান্তি নিয়ে কেউ খোঁটা দিলে আগুন হয়ে যান। রাস্তায় সমবয়সীরা পাগল বা ছাগল-দলের পিছু নিলে কিম্বা কুকুর কি মোরগের লড়াই বাঁধিয়ে মজা দেখলে, রুখে দাঁড়ান। একবার সৎবাবার বিরুদ্ধে ছুরিও চালিয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। পরবর্তী জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে আলিওশার জীবনে।

দশ বছর বয়সে আলেকসি মাকসিমোভিচ পেশকভ যখন রুজি রোজগারে বেরোলেন, তখন জীবনের অনেকটাই তাঁর দেখা। দাদুর বাড়িতে থাকার সময়েই কুড়ুনির কাজ করেছিলেন—পেরেক, কাগজ, ন্যাকড়া, হাড়ের টুকরো, যা পাওয়া যায়। বেরিয়ে এসে প্রথমে একটা জুতোর দোকানে ঠাঁই পেলেন, পরে ভিক্তর সার্গেয়েভ নামে এক দূর আত্মীয়ের কাছে নক্‌শা শিখতে আসেন। বেঁচে আছেন এই কথাটা বোঝবার জন্যই, তিনি লিখেছেন, অদ্ভুত সব খ্যাপামি এই সময়ে তাঁকে পেয়ে বসত : তরকারিতে নুন ঢেলে, ঘড়িতে ধুলো ছুঁড়ে, চিমনিতে ন্যাকড়া গুঁজে প্রায়ই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন। 'মনে হত,' গোর্কি (এই নামেই তাঁকে এখন থেকে ডাকব) বলছেন, 'ভাঙা গুঁড়ি, আগাছার জঙ্গল, পচা পাতায় ভর্তি কোন বনে পথ হারিয়ে ফেলেছি, পা ডুবে যেত।' প্রকাশের জন্য সৃষ্টিশীল প্রতিভার বেদনা বাঙালী পাঠকের অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে প্রায় একই ধরনের আচ্ছন্নতার কথা বলেছেন : আমার পনেরো-ষোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া যায় নাই তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদ্-হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ...জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য আমাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে শান্তি পেয়েছিলেন। 'দোব্রি' নামক বোটে খালাসী হয়ে গোর্কি ভেসে গেলেন ভলগায়। এখানে তাঁর বোধোদয় হল। অক্ষর পরিচয় হয়েছিল আগে দাদুর কাছে। স্কুলে থাকতে কুড়িয়ে পাওয়া রুবল দিয়ে 'রবিনসন্ ক্রুশো', 'অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা' আর 'ধর্মের ইতিহাস' কিনেছিলেন। 'দোব্রি'তে বোটের রাঁধুনি স্মুরি তাঁর মুখে বই পড়া শুনতে চাইতেন। গোর্কির জ্ঞানের পরিধি বাড়ল। শুরু হল এমন এক অভ্যাস যার ফলে চাঁদনী রাতে তামার সস্‌প্যান আলোয় ধরে পর্যন্ত চেষ্টা চালাতে লাগলেন। বরফে ভলগা ছেয়ে যেতে শীতকালে গোর্কি 'দোব্রি' ছাড়লেন, কিন্তু জ্ঞানের পিপাসা গেল না। বসন্তকালে পাখি ধরা বা ভিক্তর সার্গেয়েভের পুরনো চাকরি—কোন কাজেই জিজ্ঞাসা ঠেকে রইল না। গোর্কির চোখের সামনে একটার পর একটা নতুন জগৎ। সেখানে ফরাসী কথা সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন : বালজাক, ফ্লোবের, স্তাঁদাল। অনেক কিছু ঘৃণা করার পর,' গোর্কি লিখেছেন, 'স্তাঁদাল পড়েছিলাম ; তাঁর ধীর স্বর এবং অবিশ্বাসী হাসি আমার ঘৃণাকে প্রবল করল।' বালজাকের 'ইউজিন গ্রঁদে'তে দেখলেন দাদুর

ছবি। ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট প্রমুখের লেখা পড়ার পর মনে হল, পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতরবিশেষ নেই। আরো উপলব্ধি করলেন, ভাল বইমাত্রেই প্রেরণা দেয়; লেখা খারাপ হলে শ্লীলতাহানি ঘটে! এরই মধ্যে 'পার্ম' জাহাজের বয়লারের শ্রমিক ইয়াকভ তাঁর মুখে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'এতে মজুরদের কথা কোথায়?' গোর্কি গল্পের সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখতে বাধ্য হন। 'এমন অল্পই চিন্তা পেয়েছি,' পরে তিনি বলেন, 'জীবনে আগেই যার মুখোমুখী হইনি।' আবার অন্যত্র, 'জীবনে যা কিছু ভাল পেয়েছি তা বইতে পড়া।' পুঁথিকে অভিজ্ঞতার আলোয় মিলিয়ে তার থেকে রস টেনেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে গোর্কির প্রবেশ কাজান শহরে আন্দ্রেই দেরেনকভ নামে এক বিপ্লবীর রুটির কারখানায় যোগ দেবার পর। জার-বিরোধী মনোভাব রাশিয়ায় পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যেসব রুশ সেনাধ্যক্ষরা প্যারী অভিযানে গিয়েছিলেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে প্রথম অবস্থা পাল্টবার চেষ্টা করেন তারাই। ১৮২৫ সালে জার আলেকজান্দারের মৃত্যু এবং প্রথম নিকোলাসের ক্ষমতারোহণের মধ্যেকার সময়ে ১৪ই ডিসেম্বরে এক সামরিক অভ্যুদয়ের চেষ্টা হয়। প্রস্তুতি ঠিক ছিল না এবং বিপ্লবীরা সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা শহীদের গৌরব বিস্মৃত হননি। অন্যতম নেতা হিসাবে কবি রাইলেয়েভ বলেন: 'আমাদের ভাগ্য সমর্পণের, বিনাশ অনিবার্য, কিন্তু আমাদের দৃষ্টান্ত হবে চির-স্মরণীয়।' তত্ত্বগতভাবে আন্দোলনের বক্তব্যকে উপস্থিত করেন হেৎসেন। খেতের ওপর কৃষকের কর্তৃত্ব ও তার মুক্তিদান এবং জমির যৌথ মালিকানার মাধ্যমে তাঁর আশা ছিল পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রণা এড়িয়ে সমাজবাদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। এরজন্য কিন্তু তিনি জারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এখানেই তাঁর পিছুটান। ভবিষ্যতে যাঁরা ঝড়ে হাল ধরবে বলে তিনি আশা করেছিলেন, পরবর্তীকালের সেই কর্মবীরদের পক্ষে তাঁর আবেদননীতি গ্রহন করা তাই সম্ভব হয়নি। এঁদের ভাবধারা 'নারোদনিক': রাশিয়ার পুরনো কালের যৌথ কৃষি এব শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রগুলি, 'মীর' এবং 'আর্তেল' বলে যা যথাক্রমে পরিচিত, সংস্কার ওপর জোর দিয়ে এঁরা চেয়েছিলেন হেৎসেনের আদর্শে জনশাসন (নারোদনিচেস্তভ) প্রতিষ্ঠা করতে। এই দলেরই মুখপাত্র ছিলেন চেনিশেভস্কি, ইংরেজ দার্শনিক জন্ স্টুয়ার্ট মিল সম্পর্কে যাঁর ব্যাখ্যা গোর্কির হাতে আসে। চেনিশেভস্কি, মনে রাখা দরকার কমুনিষ্ট মতবাদে বিপুল প্রেরণা। লেনিন তাঁকে মনে করতেন, 'মার্কের আগে সমাজবাদের মহত্তম প্রতিভাবান প্রবক্তা। বুলগেরিয়ার কমুনিষ্ট আন্দোলনের জনক জর্জি ডিমিট্রফ্ আরো বলেছেন: 'চেনিশেভস্কির উপন্যাস ('কি করতে হবে?') আমাকে বিপ্লবী শিক্ষায় যতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল আর কোন লেখা তা করেনি।' কিন্তু কেবল চেনিশেভস্কিতেই গোর্কি মজেননি। ঋণ স্বীকার করতে নাম করেছেন বিশেষ করে রাশিয়ার পূর্ববর্তী তিনজন লেখকের: নিকোলাই পমিয়ালোভস্কি, গ্লেভ্ উস্পেনস্কি, এবং নিকোলাই লেস্কভ্। এঁদের মধ্যে আবার বনেদীয়ানার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহে নিচুতলার মানুষদের সাথী করার জন্যে পমিয়ালোভস্কি আকৃষ্ট করেন সবচেয়ে বেশি। উস্পেনস্কির তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। ১৮৬১তে দাসত্ব থেকে মুক্ত কৃষকরা কিভাবে জোতদারের হাতে শোষিত হচ্ছিলেন তারই মানসিক বাস্তবতা ফুটে উঠছিল তাঁর লেখায় এমন প্রত্যক্ষতার সঙ্গে, যা

প্রতিরোধে মূর্তি দৃঢ় করে। আবার সেই সঙ্গে আধিভৌতিক আবেদনও ছাড়তে পারছিলেন না তিনি। তাঁর লেখা গোর্কিকে কাছে টেনে আবার দূরে ঠেলছিল। মনস্থির করতে না পেরে তিনি আবিষ্কার করলেন, তাৎক্ষণিকে উস্পেন্স্কি নিজেকে ক্ষয় করেছেন। কথাটা মনে রাখা দরকার, কারণ সংগ্রামে যতই লিপ্ত হন না কেন, শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজনীয় অবসরের গুরুত্বটুকু গোর্কি কখনোই ভুলতে পারেন নি। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর সাংগঠনিক কর্মকথার বিবরণে এ প্রসঙ্গে ফিরে আসব। আপাতত মনে রাখা যাক, পুরনো রাশিয়ার কাঠামোটাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে আরেকটু টলিয়ে দিচ্ছিলেন সাল্তীকভ্-শ্চেদ্রিন এবং নিকোলাই লেস্কভ্। তবে প্রথমজন, আসল নাম মিখাইল সাল্তীকভ্ আভাসে ইংগিতে রূপকথার মাধ্যমে গল্প ফুটিয়ে তুলতেন বলে আবেদন পৌঁছত না সরাসরি। গোর্কির ওপর অবশ্য দুজনের প্রভাব তাঁর দুটি উক্তি থেকে বোঝা যায়। প্রথম 'সাল্তীকভ্-শ্চেদ্রিনকে বাদ দিয়ে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে রাশিয়ার ইতিহাস বোঝা যায় না'; দ্বিতীয়: 'রাশিয়ার এক প্রধান লেখক (লেস্কভ্); তাঁর লেখার বিষয়বস্তু সমস্ত রাশিয়া।' নিকোলাইয়ি মিখাইলভস্কি বলে এক নারোদনিক অর্থনীতিবিদের চিন্তার সঙ্গেও তখন গোর্কির পরিচয় ঘটে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের বেকারত্ব বাড়বে, কৃষকদের পক্ষে অধিক ফলন ছাড়া পথ না থাকলেও পয়সার অভাবে জমিকে সুফলা করা অসম্ভব হবে, চাহিদা নামবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখে বাইরের জগতে বানিজ্যের প্রসার ঘটবে না—রুশ অর্থনীতির চূড়ান্ত দুর্গতি কল্পনা করেছিলেন মিখাইলভস্কি। কার্যতঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়নি কিন্তু এইসব ভাবনার মধ্য দিয়েই মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল্' হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন গোর্কি।

নারোদনিকদের সঙ্গে পা বাড়ালেও দু-একটা বিষয়ে খটকা ছিল গোর্কির। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে চাষা-মজুরদের ঘাগী চরিত্র দেখে তিনি বুঝেছিলেন, নারোদনিকদের অধিকাংশই জল্পনা। আবার সম্পূর্ণভাবে নিচু শ্রেণীর মধ্যেই বিপ্লবের প্রস্তুতি আটকে রাখতে চাননি তিনি। খুঁজতে জানলে পরে অবস্থাবানদের মধ্যেও প্রগতিশীল পাওয়া যায়, রুশ বিপ্লবের পরেও কথাটার ওপর জোর দিয়ে গোর্কি এমন কয়েকজনের নাম করেছেন: কালুগা অঞ্চলের শিল্পপতি লেখক গন্চারেভ্, 'পার্ম' জাহাজের মালিক এনা মেশকভ্, লেনিনের 'ইস্ক্রা' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক সাভভা মোরোজভ্ এবং আরো অনেক। নারোদনিকদের সঙ্গে গোর্কির অমিলের গভীর কারণও ছিল। তাঁর নিজের জন্মস্থান নিঝ্নি-নভ্গোর-দের বিখ্যাত নারোদনিক নেতা দোব্রোলুবভ্ যে উক্তি করেছেন তাতেই এর প্রতিফলন: 'জনতার কাছে আমাদের উদ্দেশ্য অপরিচিত, আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা অবোধ্য, আমাদের উচ্ছ্বাস কৌতুকপ্রদ। ছোট বা বড় চক্রের প্রয়োজনেই আমরা লিখি এবং খাটি।' বস্তুত হেৎসেনের গোষ্ঠীর তুলনায় এঁদের অনেক নিষ্প্রভ মনে হত গোর্কির। তাঁর শ্রোতৃসংখ্যা ছিল অনেক বেশি বিচিত্র: রুটির কারখানার সহকর্মী, ছুতোরমিস্ত্রী, রেলের শ্রমিক, ভবঘুরে, পাদ্রী, এমন কি সমুদ্রতীরে শামুক কুড়নোই যাদের পেশা—এদের মধ্যে বসেই তাঁর গল্প বলার পালা শুরু। স্বভাবতই প্রশ্ন হল, জীবনকে কিভাবে শিল্পে মিলিয়ে দেওয়া যায়? হৃদয়ারণ্যে ভ্রমণের যে দুঃসহ যন্ত্রণার কথা আগে বলেছেন গোর্কি তার সবচেয়ে মর্মান্তিক পর্যায় এখন।

দিদিমার মৃত্যুর শোকে একবার নিজের দিকে গুলি চালিয়েছিলেন ; ফুসফুস ভেদ হল বটে, প্রাণ গেল না। সুস্থ হয়ে মিখাইল রোমাস বলে একজন বিপ্লবীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে আদর্শ প্রচারের ভার নিলেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের পরামর্শে চাষারা ঘরে তার আগুন দিল। ওদিকে কাজান শহরে রুটি তৈরীর কারখানার সহকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্মঘট ভাঙতে গেল। আরো অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান প্রয়োজন, গোর্কি টের পেলেন। মানসিক চাপ কথা বলে উঠল। কোরোলেঙ্কো প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, পাণ্ডুলিপি হাতে তরুণ লেখক তাঁর দরজায় ঘা দিলেন। 'ভাষা কৃত্রিম, কিন্তু প্রতিশ্রুতিহীন নয়'—জবাব মিলল। এদিকে অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে, সরকারের পক্ষে তাঁকে ভয় পাবার কারণও। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রেপ্তারের পর শুরু হল এক দীর্ঘ পদব্রজ, পায়ের তলায় পেরিয়ে যেতে লাগলেন ভলগার তীর, য়ুক্রেন, ক্রিমিয়া, ট্রান্সককেশিয়া, মল্দাভিয়া, কুবান, জর্জিয়া—আর তারপরই এল সেই আশ্চর্য ক্ষণ। ১৮৯২তে টিফ্‌লিশের এক কাগজে প্রকাশিত প্রথম গল্পের নিচে সই বেরোল 'মাক্সিম গোর্কি'। লেনিন বা স্টালিনের মত এক্ষেত্রেও নিজেই নিজের নামকরণ। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। স্টালিন বলতে যেমন তার রুশ শব্দের মানে 'লোহার মানুষ' স্বপ্রকাশ, গোর্কি বলতে কিন্তু তেমন কোন 'তিক্ততা' চোখ তুলে তাকায় না। এখানেই তাঁর রচনা তাঁর নামের প্রবলতম বিরুদ্ধভাষণ। পীড়াগ্রস্ত সমাজের পরিচয় নয়, সমসাময়িক কালের ঘরে পায় রাজধানীগুলোর মুমূর্ষ নয়, রক্তমাংসের উত্তাপময় মানুষের প্রচণ্ড ঘোষণা এখানে। গোর্কির নাম তাঁর দৃষ্টিতে খণ্ডিত। এখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। পুনর্জন্ম।

॥ তিন ॥

'সমুদ্র থেকে ভিজে ভারি হাওয়া বইছিল'—কথা কটি দিয়ে গোর্কির প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মাকার চুদ্র' আরম্ভ। তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনের পর্যালোচনার ভূমিকাতেও শব্দগুলো বসিয়ে নেওয়া যায়। সমুদ্র কেবল পৃথিবীর তিনভাগ বেষ্টিত কল্লোলিনী নয়, সাবেগে মথিত অন্তস্তলও। পড়ে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের রাশি, গর্জমান বিপজ্জনক প্রসার, অস্থির ফেনোচ্ছ্বাস, আর ওপরে ঐ ওপরে, যতদূর চোখ চলে হাজার হাজার ডানার ঝাপট, মেঘ আর ফেনার পার্থক্য সূচিত তাদের রেখায়—অনন্ত চলমান পটভূমিকায় গোর্কির ছবিগুলো আঁকা। ভলগার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, আগেই বলেছি, পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। পরবর্তী রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শলোখফ্ এত অন্তরঙ্গতায় নদীর চিত্র এঁকেছেন, ডনের কলতানে। আশ্চর্য লাগে না তাই যখন কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি, ত্রিশ দশকের প্রধান রুশ 'কথাশিল্পী', বলেন : 'আমার কাছে গোর্কি বলতে রাশিয়া, আর যেমন ভলগা ছাড়া রুশদেশ ভাব যায় না, তেমনি গোর্কিকে বাদ দিয়েও নয়।' কিন্তু দিগন্তবিস্তারী রাশিয়ার প্রকৃতি বর্ণনায় গোর্কির বৈশিষ্ট্য কোথায়? এর উত্তর দিতে গেলে কিছু তত্ত্বকথার প্রয়োজন : খৃষ্ট ধর্মমতে মানুষ মূলতঃ পাপী ; বিশ্বজগতের সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে প্রতি মুহূর্তে মুগ্ধ হতে—সংকল্পের জোর খাটিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় রুদ্ধ করতে না পারলে প্রতারিত, অর্থাৎ ভগবৎ সাধনা থেকে বিচ্যুত, হবার সম্ভাবনা। তলস্তয়ের নিসর্গ চিত্রগুলো সংখ্যায় তাই অতি অল্প, কখনোবা

যেমন 'রেসারেক্‌সন' উপন্যাসের শুরুতেই মানবিক পাপাচারের বৈপরীত্য ফোটাতে উপস্থিত। অবশ্য গোর্কির আগে যে রাশিয়ায় আবহাওয়া পূর্বসূরী কারো মধ্যেই দেখা দেয়নি বলা ভুল। ছিলেন চেখভ ; কিন্তু তাঁর পরিবেশ মন্থর, নিষ্ক্রিয়, অঘ্রাণ বেলার মত। গোর্কির ভাষাতেই পার্থক্যটা ধরা যাক : আন্তন চেখভের গল্প পড়লে মনে হয় হেমন্তশেষের দুঃখী দিনে আছি, যখন আকাশ স্বচ্ছ আর রেখাগুলো পাতাহীন গাছে, সরু সরু বাড়িতে, ফাকাশে মানুষে কৌনিক। সবকিছু অদ্ভুত, একা অনড অসহায়। নীল শূন্য দিগন্ত আবছা আকাশে, গলে পড়ে বরফমাটির ওপর ভীষণ হিম শ্বাস। হেমন্ত সূর্যের মত লেখকের মন কঠিন কাঠামোয় তুলে ধরছে একঘেয়ে পথ, বাঁকাতেড়া গলি, খুপড়ির ঘিঞ্জিতে কুনো ক্লান্তিতে হাঁপধরা বেচারী মানুষদের বাড়িভর্তি অনর্থক ঘুমপাড়ানি গোল।' চেখভের প্রকৃতি পুরনো রাশিয়ার মুখচ্ছবি. গোর্কির ঝড়ো পরিবেশ আর অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার গতিবেগ তাতে নেই।

নারোদনিকদের সঙ্গে যোগ সত্ত্বেও গোর্কির স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছি, তলস্তয় আর চেখভের প্রতি-তুলনায় তাঁর দমকা প্রবেশকে রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে অভাবিত ভাবলে উত্তরাধিকারের নিয়ম ভঙ্গ হবে। এই দুই মহারথীর হাতে তাঁর শিল্পে হাতে-খড়ি ; নানা সংশোধনে সাহায্য করেছেন এঁরা। গত শতকের শেষে চেখভকে এক চিঠিতে গোর্কি বলছেন, 'জীবনপাত্রে তিক্ততার মধ্যে দুফোঁটা মধু পেয়েছি— আপনার এবং তাঁর সান্নিধ্য।' কথাটা যে একেবারেই স্তুতি নয় তার প্রমাণ আছে চেখভকে লেখা আগে-পরের চিঠিতে। সেখানে কখনো বা চেখভের বাস্তববাদী দৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত—'জলের মত ভাবলেশহীন আপনার মুখ-চোখে ছায়া পড়েছে সবকিছুর : পৃথিবীর, জমা জলের, আগুনের আর পুকুরে সূর্যের জ্যোতির।' তলস্তয় সম্পর্কে বিস্ময় ধরা আছে পংক্তির পর পংক্তিতে। যেমন এখানে : 'বুড়োর দিকে তাকিয়েছিলাম, যেন ঝর্ণা দেখছি—স্বতঃস্ফূর্তির শক্তি।' রুশ সাহিত্যের আরেক মহীরুহের সঙ্গে তুলনাও এখানে অনিবার্য—দস্তোয়েভস্কি। সমুদ্রের প্রতীকে গোর্কির সাহিত্যসাধনার পরিচয় দিচ্ছিলাম। প্রসঙ্গটা প্রসারিত করি। সমুদ্রের দুই রূপ : একটি মারকুটে কালো জলের উচ্ছ্বাস, খল হাওয়ায় যখন মাস্তুল কাঁপিয়ে দেয়, পাল টুকরো টুকরো করে, বিদ্যুৎচমকে আকাশের ওপরভাগ মুহূর্তের জন্য খুলে দেখায়, প্রবাহের পাকে একের পর এক বৃত্ত ঘিরে ধরে—এই জগৎ দস্তোয়েভস্কির। অন্য সময়ে প্রান্ত শান্ত, কোটালের বান তত প্রবল নয়, নগর-গ্রামের বিষ্ঠা ধুইয়ে প্রণালীপথে ক্লেদ নিষ্কাশিত হয় সম্মার্জনীর স্বভাব গোর্কির। কিন্তু এছাড়াও পৃথিবীর মৌলকল্পে সমুদ্রের অশান্ত গর্জন, ঝড়ঝাপটার মতই, মানব-হৃদয়ের একেবারে আভ্যন্তরীণ, তার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ তলস্তয়ের সংসার ত্যাগের পর তাঁর এই দিকটাই তুলে ধরেছিলেন গোর্কি : "এবং সমুদ্র তাঁর অন্তরাত্মার অংশ ; চারধারের সবকিছু তাঁর মধ্য থেকে, ভিতর দিয়েই, আসে। বুড়োর শব্দহীন চিন্তায় মনে হত, অদৃষ্টের আশ্চর্য কিছু তাঁর ভিতর অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর নীল শূন্যতায় সার্চলাইটের মত উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—যেন তিনি, তাঁর সংহত ইচ্ছাশক্তি ঢেউ-গুলোকে ডেকে নিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন, মেঘ ও ছায়ার গতি নির্দ্ধারণ করছেন, পাথরে প্রাণ আনছেন।" তলস্তয়-দস্তোয়েভস্কি-গোর্কি রুশ-সাহিত্যের তিন পারাবার। এঁদের মধ্যে গোর্কি বয়ঃকনিষ্ঠ—বিপ্লবী পরিবেশের গুণে দস্তোয়েভস্কির আলোহীন অন্ধকার সহ্য করতে পারেননি, তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর কালান্তরের ব্যবধান।

গোর্কির প্রকৃতি তাঁর মানবিক প্রবৃত্তির দর্পণ। দীর্ঘ সংস্রবের পর লুনাচারস্কি তাঁর রচনায় নিসর্গ শোভা সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে সামাজিক মূল্যায়নের পটস্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। 'সমুদ্র-পাহাড়-অরণ্য-স্টেপ, ছোট ছোট বহু বাগান, প্রকৃতির গোপন কোণ—গোর্কির লেখায় কত কিছুই না পাই! কি আশ্চর্য শব্দ সব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বর্ণনায়! আশ্চর্য বিশ্লেষণী চোখ আর আমাদের সাহিত্যে বিপুলতম শব্দসংখ্যা নিয়ে এই রঙগুলো পৃথক করেছেন, যেন মোনে (monet) ; আবার অভেদপন্থীর মত সাধারণ রূপরেখাকে একটা বাক্যবন্ধের জোরে এঁটে দিয়েছেন।'

বিশেষ-অবিশেষে এই চলাফেরা গোর্কির সমাজ চরিত্রেরও লক্ষণ। টুকরো ঘটনায় জারের আমলের বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া বেঁধে সেখানে শুরুর গল্পগুলোতে সাধারণ উপলব্ধিতে পৌঁছানোর চেষ্টা। ঘটনা নানা স্তরের, বহু কৌনিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বগামী সবকটা রেখা একটা তোরণে নিজেদের বিন্যস্ত করে, পার্শ্ববর্তী সমাজের থেকে উত্থিত হলেও উচ্চতায় তা আকাশচুম্বী। পরিপ্রেক্ষিতের দূরত্ব অর্জন করতে গোর্কি এখানে রুশ সাহিত্যে এক নতুন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—ভবঘুরে। এরা সমাজ থেকে বিচ্যুত কিন্তু নিজেদের মধ্যে প্রেম প্রীতি সম্পর্ক রহিত নয় ; সামাজিক দ্বীপের মধ্যে পৃথক অবস্থিতি। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় পতন বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির দোষত্রুটির ফলে সম্ভব হলেও পরিবেশ যথেষ্ট দায়ী। এই পর্বের চরিত্রদের কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট শিল্পবিদ লুকাচ্ তাই পাঁচটি গুণ গোর্কিতে সমান্বিত দেখেছেন : 'তীক্ষ্ম, কঠোর, প্রচারধর্মী, বিশ্লেষণমুখী, সংগ্রামী।' জীবনযুদ্ধে পরাভূতদের দুর্দশা কেবল স্খলনের গ্লানিতে ঢাকেনি, যে সমাজের সঙ্গে তাদের অসদ্ভাব তার অসংগতিও ধরা পড়েছে। রুশ সমাজের ভেতরকার পিঁপড়ে পল্লার চেহারা কলমের মুখে উঠে এসেছে : 'ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কঠোর একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলে মানুষ-ঢিপিতে পিঁপড়ের বশম্বদ দুর্গতি মেনে নিয়েছিল ; এই নিয়তি তাদের পরিবার, স্কুল, চার্চ—মুনিবদের একটানা তাড়নায়, আত্মরক্ষার মৌলিক বৃত্তির ফলে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার। সবই ঠিক, কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে প্রতিযোগিতা চোখের সামনে এত বেড়ে যাচ্ছে যে আত্মরক্ষার যে প্রবৃত্তি মানুষকে ধনীদের চাকর করে, তাই তার "শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের" সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। গোর্কির গল্পে পরাজিতরা রুজি রোজগারের এই দৈনন্দিন অমানুষিকতার বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দাঁড়ায়, অনুকম্পা করা দূরে থাক পাঠক অস্বস্তিতে অনুভব করেন তাঁর নিজের ক্রূরতা, দেখেন যাযাবর জীবন উদ্দেশ্যহীন হলেও নিয়মকে কুর্নিশ করে ফেরে না। গোর্কির গল্পের স্বাদ স্বাধীনতার। তাঁর প্রথম দিককার পাঠকরাও যে এই খোলা মেজাজে মজেছিলেন তার প্রমাণ আছে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর গল্প সংগ্রহের ২'খণ্ড বেরনোর পর সমকালীন 'মির বোসি' (ঈশ্বরের পৃথিবী') পত্রিকায় প্রকাশিত এক সমালোচনায়। লেখক—আঞ্জেল বোগদানোভিচ বলেন : 'গোর্কির অধিকাংশ গল্পে স্তেপ আর সামুদ্রিক মুক্তির শ্বাস। ভিখিরী আর পতিতদের ছোঁয়া লাগা অন্যান্য লেখকদের থেকে একটা দিলদার ভাব এদের সহজে চিহ্নিত করে।' রুশ সমাজ এই ধরণের লেখার জন্য কেমন মুখিয়ে ছিল তার প্রমাণ, গোর্কির গল্প সংগ্রহের প্রথম খণ্ড এক লক্ষ কপি কেটেছিল। তলস্তয় ছাড়া এর আগে সেখানে কোন লেখকের বই এত বিক্রি হয়নি। এই জনপ্রিয়তা, এই পর্বে লেখা গোর্কির

দুটি নাটকেরও। ১৯০২ সালে 'ফিলিস্তিন্' চলার সময়ে পুলিশী পাহারায় হল্ ঘিরে ফেলা হয়। তা সত্ত্বেও মানুষের অদম্য প্রশস্তি পায় 'লোয়ার ডেপ্‌থস্', যেখানে একটি চরিত্র, সাতিন, ইতিহাসে গোর্কির বাণী ঘোষণা করে: 'একমাত্র মানুষই আছে, আর সব তার হাতে-মগজে তৈরি। মা-নু-ষ! শুনতেও কত জোর! মানুষ ৮ মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। দুঃখ না...করুণা করে তাকে ভালবাসা নয়...শ্রদ্ধা জানাতে হবে।' একেই বলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

কিন্তু জারের নিশানে ঈগল কেবল নখেই হিংস্র নয়, তার দৃষ্টিও কুটিল। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে গোর্কি যখন জগদ্বিখ্যাত, তখন চারবার আটক হলেন। ১৯০১এ সেন্ট পিটার্সবার্গে ছাত্রদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে প্রচারের জন্য কারাবাস, আবার ১৯০৫এ মস্কোর পথে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি ছোঁড়ার মুহূর্তে—রুশ বিপ্লবের সেই সূচনা—ব্যারিকেডে পক্ষ নেবার ফলে শ্রীঘর। দুবারই গোর্কি পেলেন বীরের সম্মান। কেবল সংগ্রামীদের অভিনন্দন নয়, প্রথমবার সরকারকে সওয়াল করেছিলেন তলস্তয়, দ্বিতীয়বারে খোলা ডাক দিয়েছিলেন—তিনি কেবল রাশিয়ার নন, বিশ্বের। পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে গোর্কির কলমে এল ১৯০১এ 'ঝড়ো পাখি'—যার থেকে প্রথম অধ্যায়েই উদ্ধৃতি দিয়েছি; আর 'মা', সমাজতন্ত্রী আদর্শের সবচেয়ে খ্যাতনামা উপন্যাস। মাঝখানে ১৯০৪ সালে 'সামার ফোক্' নাটক, যার মর্মকথা শ্রমিকদের ভালবাসা: 'করুণা নয়, দাক্ষিণ্য নয়, তাদের জীবন উন্নত করা প্রয়োজন নিজেদের স্বার্থেই, এই হতভাগা একাকীত্ব এড়াতে।' সমষ্টির কল্যাণে নিজেকে সঁপে দেওয়ার প্রয়োজন আরো বিস্তারিত। 'মা' উপন্যাসে যেখানে প্যাভেল আর তার মা সহস্র নির্যাতনের মুখে বিপ্লবের জয়গান গেয়ে যায়। স্পষ্টতই রুশ জীবনে এক পরিবর্তন সমাগত। রাজনীতি আর সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গি যোগে তারই প্রতিফলন লণ্ডনে ১৯০৭ সালে, প্রথম করমর্দনের মুহূর্তে লেনিন যখন বলেন আবেগের বশে, যে সব শ্রমিকরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদের পক্ষে 'মা' উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, আর গোর্কি দেখেন এমন এক মানুষকে যিনি গুরুগিরি না ফলিয়ে অবিলম্বে কাছে টানতে পারেন। ঐতিহাসিক এই সেতুবন্ধের জন্য আরো দশ বছর অপেক্ষা প্রয়োজন—১৯১৭র বিপ্লব পর্যন্ত—তারপর একজন রাষ্ট্রের কর্ণধার, অন্যজন সোভিয়েট সাহিত্যের জনক।

নতুন পরিস্থিতিতে গোর্কির অবদান দু'দিক দিয়ে বিচার করা যায়: সংগঠনকর্তা হিসাবে এবং তাঁর নিজস্ব রচনার পরিমাপে। আলোকচিত্রের নিপুণতায় প্রথমটি সবটুকু যথাযথ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে পরবর্তী কালের অন্যতম সমালোচক চুকোফস্কি লেখা এই স্মৃতিকথায়: 'বিশ্বসাহিত্য, শিল্পভবন, ঐতিহাসিক চিত্রশালা, কথাশিল্পী শ্রমসংঘ ইত্যাদির মাথা ছিলেন তিনি। কেবল সবকটি কমিশনের সভাপতি নয়, নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সব বিপদ, দায়িত্ব—ছেলে হলে দুধের বোতলের ছিপি, টাইফাস রোগে ধরলে হাসপাতালে জায়গার জন্য সুপারিশ, গ্রামে যেতে হলে বিশ্রামাগারের পাশপোর্ট।' অন্তর্বিপ্লবের দিনে গোর্কিই ছিলেন লেখকদের প্রধান সহায়। কেবল ব্যক্তিগত সাহায্য নয়, তাঁদের জন্য বাইরের চিন্তাভাবনার জানালাগুলো খুলে দিচ্ছিলেন তিনি। লেনিন যে বলেছিলেন, প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক যুগে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের পূর্ণ পরিণতি, কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করার কৃতিত্ব গোর্কির। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এইচ. জি. ওয়েলস্‌কে লেখা

বিশ্ব সাহিত্য পত্রিকার পরিকল্পনায় পাই এমন সব নাম যারা' কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্নও নন : আইনস্টাইন, স্পেংলার, কেইনস্, টমাস মান, রোঁমা রোলা। ন বছর পরে রোঁলাকে লেখা এক চিঠিতে সাধ্যের অভাবে আকুতি গভীর, তীব্র : 'বালজাক, গ্যেটে, ফ্লোবের রচনাসমগ্রগুলো কাগজের অভাবে প্রকাশকের জন্য প্রস্তুত হয়েও পড়ে আছে। আপনার বইগুলোও আটকে গেছে—অথচ প্রতি বছর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজের কল স্থাপিত হচ্ছে। শত শত শতাব্দী ধরে উপোসী মানুষগুলোর 'আত্মিক খাদ্য জোগানো বড় শক্ত।' তাঁর নিজের লেখাগুলোতে এই ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা পড়ন্ত বয়সেও সমান সক্রিয়। যে পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে রুশদেশে সমাজবাদের আগমন তাঁর চরিত্র এঁকেছেল 'মাতভেই কোজেমিয়াকিন' এবং 'ক্লিম সামগিন'— তাঁর শেষ দুই উপন্যাসে ; নতুন ঐক্যের প্রবর্তন ফুটে উঠেছে 'ইয়েগর বুলিচভ্' আর 'দস্তিগায়েভ্'—শেষ দুই নাটকে। ১৯৩২ সালে তাঁর লেখক জীবনের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন এই অক্লান্ত কর্মের উদ্ভাসিত স্বীকৃতি। আরো আট বছরে চারটে বই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠা ভঙ্গ হল। কারণ মৃত্যু : ১৮ই জুন, ১৯৩৬।

বিপ্লবের সেতুবন্ধ : গোর্কির জীবন সংগ্রাম এই বোধে পূরে দেওয়া যায়। জন্ম রাশিয়ার সাবেকী দুস্থতায়, কৈশোরে বিশ্ব সাহিত্যের ছাত্র, যৌবনে নারোদনিক হঠকারীতার পথ ছেড়ে বলশেভিক মতাদর্শ, বিপ্লবের পর তরুণতর 'লেখকদের সহায় সুহৃদ সম্বল। গোর্কির চরিতকথা রুশ সাহিত্যের প্রধান দলিল। ব্রত-সার্থকভাবে খুব কম লেখকই পেয়েছেন সমকালের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। তাঁর মৃত্যুর পর পাউস্তোভস্কি বলেছেন, 'রুশ সাহিত্যিকরা অনাথ হল।' সরকারী রিপোর্টে মলোটভ্ বলেন, 'লেনিনের মৃত্যুর পর এটাই রুশদেশ এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় ক্ষতি।' ধীরে ধীরে যুদ্ধের মেঘ ইউরোপ ছেয়ে ফেলল। কিন্তু রক্তবহ হলেও তা' ক্ষণস্থায়ী। তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে আজ শুধু কেবলই নিঝ্‌নিই দাঁড়িয়ে নেই, মস্কোর বিশ্ব সাহিত্যভবন এবং প্রধান সড়কও সম্মানিত। বাংলায় প্রথম রচনাবলী প্রকাশের মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে পূর্ণ মহিমায় দেখা দেবেন। এবার থেকে ঝড়ো পাখির গান আরো প্রবল হবে।

বিদ্যাসাগর কলেজ
কলিকাতা

নিখিলেশ গুহ

জীবনপঞ্জী

১৮৬৮ নিঝ্‌নি নভগোরদ শহরে জন্ম। বাবা—মাক্সিম্ সাভাতেয়েভিচ পেশকভ; মা—ভারভারা। জন্মকালে নাম—আলেক্‌সি মাক্‌সিমোভিচ পেশকভ।

১৮৭২ বাবার দেহান্তর।

১৮৭৮ মার মৃত্যু; গোর্কি বাড়ি ছাড়েন।

১৮৮০-৮২ শিক্ষানবিসি।

১৮৮৪ প্রথমে বেকার হয়ে কাজান শহরে ঘোরাঘুরি, পরে এক রুটির কারখানায় কর্মে নিযুক্তি।

১৮৮৮ নারোদনিক প্রভাবে বিপ্লবী কাজে যোগদান। রুটির কারখানায় এবং রাত পাহারাদার হিসাবে জীবিকা অর্জন।

১৮৮৯ প্রথম গ্রেপ্তার, মুক্তির পর পদব্রজে রুশ দেশ ভ্রমণ।

১৮৯২ টিফ্‌লিস্ নগরীর 'কাভ্‌কাজ' ('ককেশাস') দৈনিক পত্রিকায় সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম গল্প 'মাকার চুদ্রা' প্রকাশ।

১৮৯৫-৯৬ 'সামারাস্কায়া গাজেতা' পত্রিকায় আঞ্চলিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক সাংবাদিকতা। লেখক হিসেবে আরো প্রস্তুতি—ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান সাহিত্যপাঠ।

১৮৯৮ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার; মুক্তির পর নজরবন্দী। বিপুল সংবর্ধনার মধ্যে দু'খণ্ডে প্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভূ'ত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—'অর্‌ফ্যান্ পল্', 'ওল্ড্ ওম্যান্ ইসেরগিল্', 'মালভা', 'কমরেড' ইত্যাদি। চেখভের সঙ্গে পরিচয়।

১৮৯৯-১৯০০ বিখ্যাত উপন্যাস 'ফোমা গর্‌দিয়েভ' প্রকাশিত; গল্পের স্রোতে নতুন নজীর 'টোয়েন্টি সিক্স্ আণ্ড্ ওয়ান্', 'দি থ্রি অফ্ দেম্' ইত্যাদি। তলস্তয়ের সঙ্গে আলাপ।

১৯০১ মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে আবেদন প্রচারের অপরাধে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার। 'ঝড়ো পাখির গান' রচনা। এই প্রতীকেই পরে গোর্কি স্বয়ং অভিহিত হন।

১৯০২ আর্জামাস্ অঞ্চলে নির্বাসন। দুটি নাটক—'লোয়ার ডেপ্‌থস্' এবং 'ফিলিস্টিনস্'—অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত।

১৯০৪ আরেকটি নাটক—'সামার ফোকস্' প্রকাশ।

১৯০৫ এ বছরের 'রক্তাক্ত রবিবার', ২২শে জানুয়ারি, সেন্টপিটার্সবার্গ শহরে নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর জার সৈন্যের গুলি চালনার মধ্যে মহান রুশ বিপ্লবের সংকেত। ব্যারিকেডে গোর্কি। তলস্তয় আর রুশ জীবনের প্রতিনিধি নন এবং তাঁর নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে মুক্তির সম্ভাবনা অসার বলে গোর্কির পত্রদান। চতুর্থবার গ্রেপ্তার এবং জনতার চাপে মুক্তি।

১৯০৬ আমেরিকা গমন। সহচরী মারিয়া ফিওদোরোভনা তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ নন বলে মার্কিণ পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য। যুক্তরাষ্ট্রের অসাম্যে গোর্কির পীড়িত মনোভাবের প্রকাশ—'দি সিটি অফ দ্য ইয়লো ডেভিল'।

১৯০৭ বিখ্যাত সাম্যবাদী উপন্যাস 'মাদার' রচনার পর গোর্কির সঙ্গে লেনিনের প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয়—লণ্ডনে, রুশ সোস্যাল ডেমক্রোটির পার্টি'র পঞ্চম কংগ্রেসে।

১৯০৮-১৩ ইটালিতে বাসকালে উল্লেখযোগ্য রচনা—আত্মজীবনীর তিন খণ্ডের সূত্রপাত, 'টেলস্ ফ্রম ইটালি' ইত্যাদি। ১৯১২এ সাইবেরিয়ার লেনা অঞ্চলে দু'শ' ধর্মঘটরত শ্রমিকের ওপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ। ১৯১৩ ডিসেম্বরে গ্রেপ্তারী পারোয়ানার কাল শেষ হলে ভিসা-পাশপোর্টবিহীন অবস্থায় রুশ দেশে প্রবেশ।

১৯১৪-১৭ প্রথম মহাযুদ্ধ এবং নভেম্বর বিপ্লব। গোর্কির উদ্যোগে 'জনানীয়ে' (জ্ঞান) প্রকাশনালয়ের সূচনা।

১৯২১-২৮ প্রবাসে গোর্কি। প্রথমে জার্মানী পরে ইটালির সরেন্টোতে বাস। রুশ দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রতিরোধে ১৯২১ খৃস্টাব্দে মার্কিণী সাহায্য সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভারকে চিঠি: 'বাস্তববাদী মানবিকতার ইতিহাসে আপনাদের সাহায্যদানের সঙ্গে ঔদার্য ও বিপুলতায় তুলনীয় আর কিছু আমার জানা নেই।' ১৯২৪-এ লেনিনের মৃত্যু।

১৯২৮ গোর্কির ষাটবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রুশ দেশে বিপুল সংবর্ধনা।

১৯৩২ সোভিয়েট শিল্পী সাহিত্যিকদের মহাসম্মেলনে পৌরহিত্য—'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' তত্ত্বের ব্যাখ্যা। গোর্কির লেখক জীবনের চল্লিশ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নানা আয়োজন।

১৯৩৬ ১৮ই জুন মস্কোর কাছে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ।

আমার ছেলেবেলা

এক

ছোট অন্ধকার ঘর। জানালার ঠিক নীচেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোষাক পরিয়ে আমার বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাকে অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে। পায়ের পাতা খোলা, আঙ্গুলগুলো অসম্ভব ফাঁক ফাঁক হয়ে রয়েছে। বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাত নিশ্চল হয়ে আছে; তবু হাতের কোমল আঙ্গুলগুলো যেন পায়ের আঙ্গুলের মতই বিকৃত। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো গাঢ় রঙের তামার পয়সা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে! কোমল মুখখানা শিসের মত বিবর্ণ হয়ে হয়ে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সাজানো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে; আর সেদিকে তাকিয়ে আমি আঁতকে উঠেছি।

বাবার পাশেই মা হাঁটু মুড়ে বসে আছে; তার পরণে একটা টকটকে লাল রঙের স্কার্ট পরে আছে! বাবার মাথার নরম চুলগুলো একটা কালো চিরুণী দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড়ে দিচ্ছে, এটাই একদিন আমার হাতে তরমুজের খোসা কাটবার ছুরি হয়েছিল। মা বসে বসে ভাঙা গলায় বিড বিড় করে কি যেন বলছে। তার চোখ দুটো ফুলো ফুলো, মনে হয় যেন কান্নায় গলে পড়ছে।

দিদিমা আমার একটা হাত ধরে আছে তার চেহারাটা গোলগাল, মাথাটা বিরাট, চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা, নাকটা থ্যাবড়া। তার সর্বাঙ্গ কোমল, হাব ভাব বেশ গম্ভীর—যেন কি এক যাদু তাকে ঘিরে আছে! সেও কাঁদছে; কিন্তু তার কান্নাটা বেশ অদ্ভুত—যেন মার কান্নার সঙ্গে সে কান্না শানাইয়ের পোঁ ধরেছে। দিদিমা ক্রমাগত কাঁপছে আর আমাকে ঠেলছে বাবার দিকে। কিন্তু আমি তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে আছি, লুকিয়ে আছি তার স্কার্টের পিছনে। আমার খুব ভয় করছে, আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

এর আগে কখনো বড়দের কাঁদতে দেখিনি। দিদিমা আমাকে বার বার বলছে, 'যা বাছা, বাবাকে একবার দেখ, এইতো তাকে শেষ দেখা! সময় না হতেই তোর বাবা চলে গেছে...' কিন্তু দিদিমার এই কথাগুলোর কোন অর্থই আমি বুঝতে পারছি না।

আমি নিজে সবে মাত্র একটা কঠিন অসুখ থেকে উঠেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অসুখের সময় বাবা আমার কাছে বার বার আসতেন, নানারকম খেলার মধ্য দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর সে জায়গায় আসা শুরু হল বিচিত্র এই মহিলাটির—যে আমার দিদিমা।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিদিমা, কোথা থেকে তুমি এলে?'

দিদিমা উত্তর দিল, 'আমি আসছি সেই নিজ্‌নি থেকে। পায়ে হেঁটে আসিনি, এসেছি জাহাজে চড়ে। ওরে বোকা, জলের ওপর দিয়ে কি হাঁটা যায়রে?'

কথাগুলো আমার কাছে খুব এলোমেলো মনে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির উঁচু তলায় একদল দাড়িওলা পার্শি থাকে, পরণে তাদের নানা রঙের জামা-

কাপড় ; আর নিচু তলার কুঠুরিতে থাকে এক ভেড়ার চামড়ার কারবারী—হলুদ রঙা বুড়ো কালোমিক। ওপর থেকে নীচে আসতে হলে রেলিঙের গা বেয়ে যেমন নামা যায়, তেমনি পা হড়কে ডিগবাজী খেতে খেতেও যে নেমে আসা চলে, এসব কথা আমার ভালভাবেই জানা আছে। এ তো সোজা কথা—এর মধ্যে আবার জল আসে কোত্থেকে ? বুড়ী ঠিক কথা বলে নি, সবটাই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

বললাম, 'তুমি আমাকে বোকা ছেলে বললে কেন ?'

হাসতে হাসতে সে জবাব দিল, 'কারণ, তুই যে বড্ড চীৎকার করিস।'

তার কথা বলার ধরণটা খুব মিষ্টি, বেশ রসাল, যেন খুশিতে ভরা। সেই প্রথম দিন থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল! এ ঘরের মধ্যে আমার আর ভাল লাগছে না। দিদিমা যদি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় তাহলে বেঁচে যাই।

মার অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পারছি না। তার এই কান্না আর চীৎকার আমার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তার এমন অবস্থা আমি আগে কখনো দেখিনি। এমনিতে সে খুব কড়া মেজাজের মহিলা, বাড়তি কথা একেবারেই বলে না। সব সময় ফিটফাট, ধোপদুরস্ত। শরীরের বাঁধুনি আছে, হাত দুটো দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু মা এখন যেন কি বিশ্রী রকম ফুলে উঠেছে, কেমন এলোমেলো দেখাচ্ছে তাকে, পরণে ছেঁড়া জামা, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। এমনিতে তার মাথার ফিকে চুলগুলো বেশ সুন্দর করে খোঁপা করা থাকে, কিন্তু এখন সেই চুল কাঁধ আর চোখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ; বাবার ঘুমন্ত মুখের ওপর দুলছে একটা অবিন্যস্ত গুচ্ছ। বেশ কিছুক্ষণ হল আমি এই ঘরে রয়েছি, অথচ এর মধ্যে মার একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর হয়নি—সারাক্ষণই শুধু চীৎকার করে কেঁদেছে আর বাবার মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছে।

একজন পুলিশ ও কয়েকজন কালো রঙের চাষী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বিরক্তির সঙ্গে পুলিশটা বলল, 'নাও, হয়েছে।'

জানলায় একটা কালো রঙের পরদা টাঙানো ছিল, দমকা বাতাসে সেটা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠেছে। মনে আছে, একবার বাবার সঙ্গে একটা পাল তোলা নৌকোয় করে বেড়াতে গিয়েছিলাম ; তখন হঠাৎ মেঘ গর্জে উঠেছিল। বাবা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে, ও কিছু নয়।'

হঠাৎ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মার শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল, মা চিৎ হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ; তার চুলগুলো মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফ্যাকাসে মুখটা কালো হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি বুজে এসেছে। তার দাঁত-কপাটি লেগে গেছে—ঠিক বাবার দাঁতের মতই।

যন্ত্রণা-কাতর বিকৃত স্বরে মা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও ; আলেক্সেইকে বাইরে যেতে বল।'

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দিদিমা আমাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে বললেন, 'ওহে ভাল মানুষের ছেলেরা, তোমারা ভয় পেও না।

যীশুখ্রীষ্টের দোহাই, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, ওকে ছুঁয়ো না। ওর কলেরা-টলেরা কিছুই হয়নি—প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দয়া কর তোমরা!'

কোণের দিকে ট্রাঙ্কের পিছনে অন্ধকারে আমি গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার মা যন্ত্রণায় মেঝের ওপরে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে গোঁঙাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে। এদিকে দিদিমা মার চারদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে কোমল অথচ আনন্দের স্বরে বলছেন, 'ভগবান ও তার সন্তানের নামে বলছি, আর একটু সহ্য করতে চেষ্টা কর ভারিয়া। হে পরম করুণাময়ী জগন্মাতা, হে সর্বজীব রক্ষাকারিনী...'

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার বাবাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে তার চার পাশে ওরা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, গোঁঙাচ্ছে, চীৎকার করছে; মাঝে মাঝে বাবার গা স্পর্শ করছে। কিন্তু বাবা স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছেন—মনে হচ্ছে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তিনি হাসছেন। অনেকক্ষণ ধরে এইসব চলছে। আমার মা কয়েকবার দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রত্যেক-বারই টলে পড়ে যায়। একটা মোটাসোটা কালো বলের মত দিদিমা কয়েক বার ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করেন এবং তারপর এক সময় হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে শিশুর কান্না শোনা যায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিদিমা বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ! ছেলে হয়েছে গো!'

সে কটা মোমবাতি জ্বালল।

আমি সম্ভবতঃ ভয়ে ঘরেরসেই কোণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ এর পরের কোন কথা আমার মনে নেই!

তারপরই আমার স্মৃতিতে যে-ঘটনা অম্লান হয়ে আছে তা হচ্ছেঃ বৃষ্টির দিন, সমাধিক্ষেত্রের এক জনবিরল অংশ এবং একটা পিচ্ছিল মাটির ঢিবির ওপরে আমি দাঁড়িয়ে। একটা গর্তের মধ্যে আমার বাবার কফিন নামানো হয়েছে আর আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি। গর্তের নীচে জল জমেছে, ব্যাঙ লাফালাফি করছে—কফিনের হলদে ডালাটার ওপরে দুটো ব্যাঙ লাফিয়ে উঠেছে।

সেই কবরের পাশে লোক বলতে মাত্র আমরা কজন। ভিজে জুবজুবে পুলিস, কোদাল হাতে দুজন রুক্ষ মেজাজী চাষা, আমার দিদিমা আর আমি। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আমরা সবাই ভিজে গেছি।

'নে, এবার মাটি ফেল্।' বলে প্রহরীটা চলে গেল।

চাদরের খুঁটে মুখ চাপা দিয়ে দিদিমা কাঁদতে লাগল। লোক দুটো নুয়ে পড়ে কোদালভর্তি মাটি ফেলল। ঝপাং করে মাটি পড়তেই জল গর্তের মধ্যে ছিট্‌কে এল, ব্যাঙগুলো গর্তের গায়ে লাফালাফি করতে লাগল, কিন্তু এক সময় মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে দিদিমা বলল, 'আয় রে, আলিওশা।' কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, তাই আমি নিজেকে দিদিমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমা বলল 'হায় প্রভু!' এমন ভাবে কথাগুলো বলল যে, সন্দেহ থেকে গেল তাঁর অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে, আমার না প্রভুর? অনেকক্ষণ সে সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল; এমন কি কবরের গর্তটা সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে যাবার পরেও দাঁড়িয়েই রইল।

লোক দুটো কোদালের উল্‌টো দিক দিয়ে কবরের ওপরকার মাটি ঠুকে ঠুকে সমান করে দিল। বাতাস বইছে, বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। দিদিমা আবার আমাকে হাত ধরে দূরের গির্জার দিকে নিয়ে চলল। গির্জার চারদিকে অনেকগুলো কবর, তার ওপরকার কালো ক্রুশচিহ্নগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসার পর দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাঁ রে, তুই কাঁদছিস না কেন? কিছুটা কেঁদে নে।'

আমি বললাম, 'আমার কান্না পাচ্ছে না দিদিমা।'

শান্তস্বরে সে বলল, 'ঠিক আছে, যদি কান্না না পায় তো কাঁদিস না।

দিদিমা যে আমাকে কাঁদতে বলল আমার কাছে এটা খুবই অবাক হবার মত ব্যাপার। আমি সাধারণতঃ কাঁদি না, শারীরিক কোন যন্ত্রণায় তো নয়ই। মনের দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেলেই আমার কান্না আসে। আমাকে কাঁদতে দেখলে আমার বাবা খুব জোরে হেসে উঠতেন, কিন্তু মা ধমক দিত, 'চুপ কর বলছি।'

পরে আমরা গাড়িতে চেপে ফিরে এলাম। চওড়া কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা, তার দু-দিকে গাঢ় লাল রংয়ের বাড়ি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাঙগুলো কি বেরিয়ে আসতে পারবে না?'

দিদিমা জবাব দিল, 'না, পারবে না। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন!'

আমি মা কিংবা বাবার মুখে কখনো এত ঘন ঘন এবং এমন একান্ত আপন জনের মত ভগবানের নামোচ্চারণ শুনিনি।

কয়েকদিন পর আমার মা, দিদিমা আর আমি একটা জাহাজের ছোট কেবিনে চেপে রওয়ানা দিলাম। আমার ছোট ভাই মাক্সিম মারা গেছে এবং কোণের একটা টেবিলের ওপরে তাকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

আমি আমাদের বাক্সপেঁটরা পোঁটলা-পুঁটলির ওপরে বসে আছি। আমার সামনে একটা গোল জানলা, ঠিক ঘোড়ার চোখের মত দেখতে। আমার দৃষ্টি বাইরের দিকে। জানলার কাঁচের ঠিক নিচ দিয়েই ফেনাতোলা ঘন কালো ঢেউ ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে একেবারে জানলার কাঁচের ওপরেই ঝাপ্‌টা মারছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মেঝের ওপরে লাফিয়ে পড়ি।

দিদিমা নরম দুটো হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আবার সেই পোঁটলার ওপরে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভয় পাস না।'

জলের ওপরে ধূসর ভিজে কুয়াশা জমে আছে। মাঝে মাঝে দূরের এক টুকরো কালো জমি যেই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, অমনি আবার তা মিলিয়ে যায়। আমাদের চারপাশে সবকিছু কাঁপছে। শুধু মা দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। চোখদুটো শক্ত করে বোজা, মাথার পেছনে হাত দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখটা কালো, আর থমথমে। মুখ থেকে একটাও কথা বলছে না, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মা একেবারে বদলে গেছে, সেই পুরনো মানুষ আর নেই। এমন কি যে পোষাক পরে আছে সে পোষাকটাও আমার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

দিদিমা বার বার খুব নরম গলায় বলছেন, 'ভারিয়া, লক্ষ্মীটি, একটু কিছু মুখে দে।'

কিন্তু মা নির্বাক ও নিশ্চল।

দিদিমা আমার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে; কিন্তু মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আরেকটু উঁচু গলায় বলছে, যেন খুব ভয়ে ভয়ে এবং খুবই সাবধানে। তবু আমার মনে হচ্ছে, দিদিমা আমার মা'কে ভয় করে। ব্যাপরটা আমি বুঝতে পারি এবং এই কারণেই দিদিমার ওপর আমার টান আরো বেড়ে যায়।

মা হঠাৎ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'সারাতভ। কোথায় গেল সেই নাবিকটা?'

'সারাতভ' 'নাবিক'...মা'র কথাগুলো যেন কেমন অদ্ভুত, কেমন অপরিচিত বলে মনে হতে লাগল আমার।

এক বিশালস্কন্ধ পাকাচুল লোক, ঘরে ঢুকল তার পরনে নীল পোশাক, হাতে ছোট একটা বাক্স। দিদিমা তার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের দেহকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু হাতে করে বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু দিদিমা এত মোটা যে, না বেঁকে তার পক্ষে সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় কি করবে বুঝতে না পেরে হাস্যকরভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

'মা গো কী!' বলে ধৈর্য হারিয়ে মা দিদিমার হাত থেকে কফিনটা কেড়ে নিল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে গেল বাইরে। আমি সেই নীল পোশাক পরা লোকটার সঙ্গে কেবিনেই রয়ে গেলাম।

লোকটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তোমার ভাই কি তাহলে আমাদের ছেড়ে চলে গেল?'

'তুমি কে?'

'আমি একজন নাবিক।'

'আর সারাতভ কে?'

'সারাতভ হল একটা শহরের নাম। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ, ওটাই হচ্ছে সারাতভ।'

কুয়াশার ওড়না জড়ানো অন্ধকার উঁচুনিচু জমি জানালার পাশ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে পাঁউরুটির একটা টুকরোর মত মনে হচ্ছিল আমার।

'দিদিমা কোথায় গেল?'

'নাতিকে কবর দিতে।'

'ওকে কি মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

আমার বাবাকে কবর দেবার সময় কি-ভাবে কতগুলো জ্যান্ত ব্যাঙ মাটিতে চাপা পড়েছিল—আমি নাবিকটিকে সে সব-কথা বললাম। শুনে লোকটা আমাকে দু-হাতে তুলে নিল এবং বুকের ওপরে শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল।

'খোকা তুমি এখনো কিছুই বুঝতে পারনি! ব্যাঙের জন্যে অত দরদ দেখাবার দরকার নেই—ব্যাঙের দল জাহান্নমে যাক্! তোমার মার জন্যে দরদ দেখাও, তাঁর অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো? শোকে দুঃখে তিনি কী হয়ে গেছেন!'

হঠাৎ ওপরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা সোরগোল এবং তীব্র শব্দ ভেসে এল। আমি জানতাম শব্দটা স্টীমারের, সুতরাং আমি কোন ভয় পেলাম না। কিন্তু

নাবিকটা আমাকে তাড়াতাড়ি মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল 'আমাকে যেতে হবে' বলতে বলতে।

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল বেরিয়ে যাই। কেবিনের বাইরে এলাম। অন্ধকার সরু পথটায় একজন লোকও নেই। দেখতে পাচ্ছিলাম, পিতলমোড়া সিঁড়িটা ঝকঝক করছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মালপত্তর হাতে নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বুঝলাম এবার আমাকেও যেতে হবে।

কিন্তু আমি যখন জাহাজ থেকে নামবার পাটাতনের কাছে ভিড়ের মধ্যে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন সবাই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল, 'তুমি কোথা থেকে এলে? কার সঙ্গে এলে?'

'আমি জানি না।'

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে নিয়ে ধাক্কাধাক্কি কাড়াকাড়ি করল। অবশেষে সেই পাকাচুলওয়ালা নাবিকটা এসে হাজির। সে বলল, 'ও এসেছে আস্ত্রাখান থেকে, একা একাই কেবিন থেকে বাইরে চলে এসেছে—'

তারপর আমাকে কোলে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে সে কেবিনে ফিরে এল. সেখানে পোঁটলার ওপর আমাকে বসিয়ে আঙ্গুল তুলে বলল, 'খবরদার!' এই বলে শাসিয়ে সে চলে গেল।

ওপরের হৈ-হট্টগোল ধীরে ধীরে কমে আসছে। শুধু রয়েছে স্টীমারের ঝাঁকুনি আর জলের শব্দ। কেবিনের জানলাটাকে আড়াল করে একটা ভিজে দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে; ফলে কেবিনের ভেতরটা গুমোট আর অন্ধকার। আমার মনে হতে লাগল, পোঁটলাগুলো যেন ফুলেফেঁপে আমাকে পিষে মারতে চাইছে। আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। এই জনমানবহীন স্টীমারে সবাই যদি আমাকে ফেলে রেখে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কি হবে?

আমি দুয়োরটার কাছে গেলাম। দুয়োরটা শক্তভাবে বন্ধ করা, তার পিতলের হাতলটা আমি কিছুতেই ঘোরাতে পারলাম না। একটা দুধের বোতল নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতলটার ওপরে ঘা মারলাম। বোতলটা চুরমার হয়ে গিয়ে আমার পা ও জুতোর ওপরে দুধ গড়িয়ে পড়ল।

কোন দিক দিয়ে কিছু করতে না পেরে আমি খুব মনমরা হয়ে পোঁটলাগুলোর ওপরে শুয়ে পড়লাম এবং কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, স্টীমারটা আবার কাঁপছে। জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কেবিনের জানলাটা আগুনের মত ঝল্‌সে উঠেছে। দিদিমা আমার পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে আর কপাল কুঁচকে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। দিদিমার মাথায় গোছা গোছা নীলাভ কালো চুল দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। সেই চুলের গোছা তার কাঁধ, বুক আর হাঁটুর ওপর দিয়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। একহাতে সে সেই চুলের গোছাকে মেঝে থেকে তুলে শক্ত করে ধরে আছে আর অন্য হাতে একটা মোটা কাঠের চিরুণী দিয়ে গোছা গোছা চুলের জট্ ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। তার মুখ কুঁচকে উঠেছে, রাগে কালো চোখদুটো জ্বলছে, আর গোছা গোছা চুলের মাঝখানে মুখখানাকে ছোট আর হাস্যকর দেখাচ্ছে।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তার মেজাজ মোটেই ভাল নেই। কিন্তু

তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তার চুলগুলো এত লম্বা কেন, অমনি তার গলার স্বর নরম হয়ে এল। তখন আগের দিনের মতই দরদভরা সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'চুলের কথা বলছিস, এটা সম্ভবতঃ ভগবানের দেওয়া একটা শাস্তি। ভগবান বলেছেন—এই নে, তোকে একমাথা চুল দিলাম, এবার এই আপদ সামলাতেই তোর দিন কাটুক! অল্প বয়সে এই চুল নিয়েই আমার কত দেমাক ছিল! আর এখন এটা হয়েছে দু-চোখের বিষ। দাদু, এবার ঘুমোও তো। এখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি—এত তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না।'

'আমি আর ঘুমোব না দিদিমা।'

'বেশ, ইচ্ছে যদি না হয় তো ঘুমিও না।' চুল বাঁধতে বাঁধতে সে আমার ইচ্ছায় সম্মতি জানাল। একটা খাটিয়ার ওপরে মা তীরের মত চিত হয়ে শুয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখল দিদিমা। তারপর বলল, 'কাল দুধের বোতলটা ভাঙলি কী করে রে? চিৎকার করিস না, যা বলবি নীচু গলায় বল।'

তার কথা বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি ছিল। কথাগুলো গানের সুরের মত—ফুলের মত সুস্পষ্ট ও সুখকর। একবার শুনলে সহজেই মনে রাখতে পারি। সে যখন হাসে তখন চেরির মত তার কালো চোখের তারা বড়ো হয়ে যায় এবং একটা অসাধারণ দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসলে সাদা দাঁতের সারিগুলো চোখে পড়ে। ময়লা রঙের গালদুটোতে অসংখ্য দাগ ফুটে ওঠা সত্ত্বেও সারা মুখটায় যেন তারুণ্য আর আলো ফুটে ওঠে। তার মুখের একমাত্র খুঁৎ হচ্ছে মাংসল নাকটা; ইয়া বড় বড় দুটো নাসারন্ধ্র আর লাল নাসাগ্র। রূপের গুটি লাগানো একটা কালো কৌটো থেকে সে নস্যি নেয়। যদিও সে ফর্সা নয়, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে হৃদয়ের এক অনির্বাণ আলোর দীপ্ত শিখায় অবিরত সে উজ্জ্বল। শরীরটা এত নুয়ে পড়েছে যে তাকে প্রায় কুঁজো বলে মনে হয়। কিন্তু একটা ভারী বেড়ালের মত তাঁর চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে এবং আদুরে বেড়ালের মতই সে তুলতুলে।

আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে তার আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আমি এক অন্ধকার আচ্ছন্নতায় শুয়ে ছিলাম। কিন্তু সে এসে আমাকে জাগিয়ে দিল এবং আমার হাত ধরে নিয়ে এল এক আলোর রাজ্যে। আমার চারদিকের পরিবেশকে অখণ্ড ও একক একটা সূত্রে গেঁথে এক বিচিত্রবর্ণ জরিতে রূপান্তরিত করল। প্রথম দিন থেকেই সে আমার সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেল; আমার সবচেয়ে নিকটজন হল। জীবনের প্রতি তার নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমাকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং আমার মধ্যে কঠোর ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চার করেছে।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে স্টীমার চলত আস্তে আস্তে। তখন নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের প্রচুর সময় লাগল। সৌন্দর্যভরা সেই প্রথম কয়েকটা দিনের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

আবহাওয়াটা চমৎকার, আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি দিদিমার সঙ্গে ডেকের ওপরে থাকি। ঝলমলে আকাশের নিচ দিয়ে, শরৎকালের সোনালী কারুকার্য-শোভিত ভল্‌গার দুই তীরের মধ্য দিয়ে আমরা ভেসে চলি। বাদামী

রঙের স্টীমারটার সঙ্গে একটা বজ্‌রা বাঁধা ; স্রোতের উল্টোদিকে জল কেটে কেটে, ধূসর নীলরঙের জলে চাকার ঝুপ-ঝাপ শব্দ তুলে ধীরগতিতে স্টীমারটা এগিয়ে চলে। ধূসর রঙের বজ্‌রাকে মনে হচ্ছে যেন জলের পোকা। সূর্য যেন অলক্ষ্যে ভল্‌গা নদীর ওপরে সাঁতার দিয়ে ভেসে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুনের আবির্ভাব হয়। সবুজ পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হয় যেন সেগুলো মাটির বহুমূল্য পোশাকের ভাঁজ। দূরে দূরে শহর ও গ্রাম পার হয়ে যায় ; তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সেগুলো যেন কেকের টুকরো দিয়ে তৈরি। শরৎকালের গাছের সোনালী পাতা ভাসে জলের ওপরে।

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী সুন্দর!' দিদিমা বলে চলে ; আর উচ্ছ্বাসভরা মুখে, খুশিতে উপছে পড়া বড় বড় চোখে ডেকের একদিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আমার উপস্থিতিটাই ভুলে যায়। তখন তার আর এক চেহারা। দু-হাত বুকের ওপরে আড়াআড়িভাবে রাখা, ঠোঁট দুটো হাসিতে ছড়ানো, চোখ ভরে গেছে জলে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমি তার গাঢ়রঙের ফুলকাটা স্কার্টটা ধরে টান দিই।

'সে চমকে ওঠে ; তারপর বলে, 'ও তুই! আমার কী মনে হচ্ছিল জানিস? যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি।'

'তুমি কাঁদছ কেন দিদিমা?'

'বাছারে, ওরে সোনা আমার, কেন কাঁদছি জানিস? কাঁদতে ভাল লাগছে বলে কাঁদছি, শরীরে জোর নেই বলে কাঁদছি,' হাসতে হাসতে সে বলে, 'বুড়ো হয়ে গেছিরে দাদু, আমার তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেছে···'

তারপর নাকে একটিপ্‌ নস্যি নিয়ে সে আমাকে সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে শুরু করে ; সাধুদের গল্প, জন্তুজানোয়ারদের গল্প, হৃদয়বান ডাকাত আর অশুভ শক্তিসমূহের গল্প।

আমার মুখের কাছে মুখে এনে রহস্যভরা শান্ত স্বরে সে গল্প বলে, তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে। তার চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— আর তাকে দেখে আমার মনে হয় যাতে আমি বল পাই সে যেন আমার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত করছে। সে যেন কথা বলে না, গান গায় ; আর যতই সে কথা বলে ততই তার বলার ভঙ্গিতে আরো বেশি ছন্দ জাগে। তার কথা শুনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তাই একটা গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলে উঠি, 'আরো গল্প বল দিদিমা!'

'তাহলে বলি শোন্‌ এরপর কী হল। উনুনের মধ্যে যে দৈত্যটা থাকত সে তো বসে আছে উনুনের নিচে। বসে বসে দুলছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, ছোট ইঁদুর, ছোট ইঁদুর! হায় হায়, আর তো আমি বাঁচব নারে ছোট ইঁদুর!'

সে নিজেই নিজের পা-টা চেপে ধরে দুলতে শুরু করে, তার চোখমুখ কুঁচকে ওটে—মনে হয়, না-বাঁচতে পারার কষ্টটা তাকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

গোঁফদাড়িওলা ভালমানুষ নাবিকের দল চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে, তাকে বাহবা দেয়, একটা গল্প শেষ হলে আরেকটা শুনতে চায়।

'থেমো না দিদিমা আরো বল!' তারপর বলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে রাত্রের খাওয়া খেতে চল!'

রাতে খাবার সময় দিদিমাকে তারা ভদ্‌কা খেতে দেয় আর আমাকে দেয় ফুটি আর তরমুজ। ব্যাপারটা চুপি চুপি সারতে হয়; কারণ স্টীমারের ওপরে ফল খাওয়া বারণ। কেউ যাতে ফল না খায় সে-দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যে একজন লোক আছে। যদি সে ফলসমেত হাতে-হাতে কাউকে ধরতে পারে তাহলে ফল কেড়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকটার পোশাক-আশাক পুলিসের মত, জামায় পিতলের বোতাম, সব সময় সে মত্ত অবস্থায় থাকে। তার কাছ থেকে সবাই দূরে দূরে থাকে।

আমার মা কখনো কখনো ডেক্‌-এ আসত। আমাদের সঙ্গে সে কম মেলামেশা করত। সব সময় গম্ভীর। আজো তার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে—দীর্ঘ সুন্দর গড়ন, থমথমে গম্ভীর মুখ, আর মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ। মনে হত তার সমস্ত শক্তি ও কাঠিন্য যেন কুয়াশা বা স্বচ্ছ মেঘের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। এত বছর পরেও তার ধূসর চোখের সেই অনাত্মীয় চাউনি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক যেন আমার দিদিমার মত—বড় বড় চোখ।

মা একদিন রুক্ষ কণ্ঠে দিদিমাকে বলে, 'মা, তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে হাসাহাসি করে।'

কথাটা শুনে অত্যন্ত সহজ ভাবে দিদিমা জবাব দেয়, 'লোকের যদি হাসতে ইচ্ছে হয় তো হাসুক না। ভালই তো, লোকে যত হাসতে পারবে ততই ভাল।'

আমার মনে আছে, নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ দেখতে পাওয়া মাত্রই ছেলেমানুষের মত দিদিমার সে কী উল্লাস!

'দেখ্‌, দেখ্‌ কী সুন্দর!' আমার হাতটা ধরে রেলিং-এর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'দেখেছিস তো, এই হচ্ছে নিজ্‌নি! কি সুন্দর! ভগবানের শহর! গির্জার চূড়োগুলোকে দেখ্‌—যেন আকাশে উড়ছে!'

তারপর আমার মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, 'ভারিয়া! তুই তো বোধ হয় এতদিনে সব ভুলেই গেছিস। দেখ, দু-চোখ ভরে দেখে নে!'

মা শুষ্ক হাসি হাসল।

সেই সুন্দর শহরের সামনে এসে স্টীমারের চলা বন্ধ হল; স্টীমারটা নদীর মাঝখানে থামল। চারদিকে নৌকো আর জাহাজের ভিড়। আকাশ জুড়ে শত শত মাস্তুল। লোকবোঝাই মস্ত একটা নৌকো এসে আমাদের স্টীমারের সিঁড়ির গায়ে লাগল। তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে বহু লোক উঠে এল স্টীমারের ডেক্‌-এ। সেই দলের সবচেয়ে আগে এলেন কালো লম্বা জামা গায়ে রোগামত এক বুড়ো। তাঁর চোখ দুটো সবুজ, নাকটা বঁড়শির মত, দাড়ি সোনার মত ঝকঝকে।

'বাবা!' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেই আমার মা বুড়োর দু-হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোট ছোট লাল দুটো হাতের মধ্যে মা'র মাথাটা তুলে ধরে গালের ওপরে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে চাপা উত্তেজিত স্বরে বুড়ো বললেন, 'ফিরে এলি বাছা আমার! আহা-রে!'

চাকার মত ঘুরপাক খেতে খেতে দিদিমা সবাইকে জড়িয়ে ধরছে আর চুমু খাচ্ছে।

'আয়, আয়, এগিয়ে আয়,' বলে আমাকে সেই ভিড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে তোর মামা মিখাইল, এ ইয়াকভ, আর এই হচ্ছে তোর মামী নাতালিয়া। আর এই যে সব বাচ্চাদের দেখছিস, এরা সবাই তোর মামাতো ভাইবোন—এই দুজনেরই নাম সাশা, আর এর নাম কাতেরিনা। দেখছিস তো কত লোক—এরা সবাই আমাদের আত্মীয়।'

আমার দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

তারপর তাঁরা দুজন দুজনকে তিনবার চুমু খেলেন।

আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমাকে এক টানে কাছে টেনে নিয়ে মাথার ওপর একটা হাত রেখে দাদু বললেন, 'তুই কে? তোর নাম কী?'

'আমি এসেছি আস্ত্রাখান থেকে, কেবিনে থাকি···'

'কী বলছে ও?' মা'র দিকে ফিরে দাদু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই চলতে চলতে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, গালের হাড়গুলো 'ঠিক বাপের মত হয়েছে।' তারপর বললেন 'নৌকোয় নামো'।

তীরে পোঁছে একটা পাথর-বাঁধানো পথ বেয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম। দু-দিকে উঁচু বাঁধ, মাঝখানে হল্‌দে ঘাসে ঢাকা পায়ে-চলা পথ।

সবচেয়ে আগে চলেছেন দাদু আর মা। লম্বায় দাদু মা'র কাঁধের কাছাকাছি। ছোট পদক্ষেপে খুব দ্রুত পা ফেলে চলছেন তিনি। দাদুর দিকে উঁচু থেকে মা তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলেছে। তাদের দুজনের পিছনে চলেছে আমার দু মামা—এদের একজন মিখাইল, যার চুল খাড়া খাড়া কালো আর দাদুর মতই রোগা শরীর, অপরজন ইয়াকভ, যার কোঁকড়ানো সোনালী চুল। তারপিছেই রঙচঙে পোষাক পরিহিতা কয়েকজন মোটা-সোটা মেয়েলোক, তাদের সঙ্গে গোটা ছয়েক ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার চেয়ে বড় আর সকলেই বেশ গম্ভীর। আমি চলেছি দিদিমা আর ছোট নাতালিয়া-মামীর সঙ্গে। নাতালিয়া-মামীর চেহারা ফ্যাকাশে, চোখ নীল আর পেট মস্ত বড়। কিছুক্ষণ পর পরই নাতালিয়া-মামীর হাঁপ ধরে যায়, দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'উঃ, আর চলতে পারছি না।'

রেগে উঠে আমার দিদিমা বিড়বিড় করে বলে, 'তোমাকে ওরা কেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এখানে? কী বোকার দল!'

এদের কাউকেই আমার ভাল লাগছে না; না বয়স্কদের, না বাচ্চাদের। নিজেকে আমার একান্ত বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছে। এমন কি আমার দিদিমাও যেন এখানে এসে বদলে গেছে এবং আমার থেকে দূরে সরে গেছে।

বিশেষ করে দাদুকে আমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। প্রথম থেকেই মনে মনে বুঝতে পারছি, তার সঙ্গে আমার বনবে না। তিনি আমার মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর দিকে আমি সবসময় নজর রাখছি।

উঁচু রাস্তাটার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পোঁছলাম আমরা। একেবারে এই শেষ মাথার ডানদিকের বাঁধের গা ঘেঁসে নিচু একতলা একটা বাড়ি। এখান থেকেই শহরের রাস্তা শুরু। বাড়িটার কেমন ময়লা ময়লা গোলাপী রং, জানালাগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, আর ছাদটা যেন নিচু হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জানলা-গুলোর ওপরে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখে প্রথমে বেশ বড়ই মনে হয়েছিল

আমার, কিন্তু ভেতরের ঘরগুলো খুব ছোট আর অন্ধকার। তাছাড়া সব জায়গায় লোক গিজগিজ করছে; একদল বিরক্তিকর লোক সবসময় ব্যস্ত হয়ে চলেছে এঘরে-ওঘরে। স্টীমারে যাত্রীরা ওঠা-নামা করার সময়ে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা তেমনই। সুযোগসন্ধানী পাখির মত বাচ্চাগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর বাড়ির চারদিকে কেমন যেন একটা ঝাঁঝালো অপরিচিত গন্ধ।

তারপর বাইরে উঠোনে এসে দেখলাম, সেখানকার অবস্থাও অথৈবচ। চারিদিকে ঘন রং গোলা জলভর্তি বড় বড় গামলা। তাতে কাপড় ভিজছে আর বহু কাপড় টাঙানো হয়েছে শুকোবার জন্যে। এক কোণের একটা নিচু চালাঘর থেকে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে; কাঠের উনুন জ্বলছে, তাতে চিড়বিড় শব্দে কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। আর একজন অদৃশ্য মানুষের বিকট চিৎকারে শোনা যাচ্ছে কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ—'চন্দন…ম্যাজেন্টা…সালফিউরিক এসিড…'

দুই

তারপর থেকেই এক অতি দ্রুত, ঘটনাবহুল ও বর্ণাতীত আশ্চর্য জীবনের শুরু। এক করুণ গল্পের মত এই জীবনের কথা আমার মনে পড়ে; একজন প্রতিভা দয়ালু ব্যক্তি, যিনি এত বেশি বাস্তবানুগ যে এতটুকু বিচ্যুতিও সহ্য করেন না—যেন তাঁর মুখেই এ গল্প শোনা। আজ অতীতের কথা যখন মনে পড়ে তখন একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে যে এই ধরণের ঘটনা সত্যেই একদিন ঘটেছিল। কারণ দিদিমা যাদের 'বোকার দল' বলেছেন তাদের জীবনটা ছিল খুবই অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর রকমের হিংস্র। আজও ইচ্ছে করে, ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলে দি; জোর করে ভাবতে চাই যে ওগুলো মোটেই সত্যি নয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাল-লাগা বা না-লাগার ওপরে সবকিছু নির্ভর করে না; আর তাছাড়া এ শুধু কাহিনী আমার নিজের সম্পর্কে নয়। সে-সময়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষরা যে শ্বাসবন্ধকরা আতঙ্কজনক অবস্থায় বাস করত এবং এখনো করে—এ তারই কাহিনী।

আমার দাদুর বাড়িটা ছিল পরস্পর বিদ্বেষের একটা আস্তানা। সেখানে কেউ কাউকে পছন্দ করত না। বয়স্কদের হাড়-মাংসে হিংসার বিষ মিশে গিয়েছিল এমন কি ছোটরাও এর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচতে পারেনি। পরে দিদিমার মুখ থেকে আমি শুনেছি যে, আমার মা এমন এক সময়ে এই বাড়িতে হাজির হয়েছিল যখন কিনা দুমামাই দাবি তুলেছেন যে দাদু তাঁর বিষয়সম্পত্তি সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিন। আমার মা'র ফিরে আসাটা ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত, ফলে দাবিটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। মামাদের ভয় হল হয়তো মা এবার তার বিয়ের যৌতুক দাবি করে বসবে। মা তার 'নিজের পছন্দমত' বিয়ে করেছিল; সে বিয়েতে দাদুর মোটেই মত ছিল না—তাই তিনি তাকে কোন যৌতুকও দেননি। মামারা চাইছিল যে এই যৌতুকও তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অনেকদিন ধরেই মামাদের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল যে, কে শহরে থেকে কারখানা চালাবে, আর কে যাবে ওকা নদীর অপর তীরে কুনাভিনো জমি জায়গা দেখবে।

আমার আসার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রান্নাঘরে খেতে বসে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ মামারা দুজনেই লাফিয়ে উঠে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে কুকুরের

মত চিৎকার করে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাদুর মুখের ওপরে যা-তা বলতে থাকে। দাদু রাগে লাল হয়ে ওঠেন, তারপর টেবিলের ওপর চামচ ঠুকে মোরগের মত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেন, 'তোদের আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করাব!'

যন্ত্রনা-কাতর স্বরে দিদিমা বলে, 'ওদের সব দিয়ে দাও। যা আছে দিয়ে দাও। কী দরকার এত অশান্তির!'

'থাম, ওদের সায় দিতে হবে না!' আগুন-ঝরা চোখে দাদু চিৎকার করে ওঠেন। এই ছোট মানুষটিও যে এমন কান-ফাটানো চিৎকার করতে পারেন—সেটা সত্যই অবাক কাণ্ড বলতে হবে!

মা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে ঘরের মানুষগুলোর দিকে পিছন ফিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিখাইল-মামা হঠাৎ তার ভাইয়ের মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে ভাই প্রচণ্ড আক্রোশে মিখাইল-মামাকে জাপটে ধরে। তারপরেই শুরু হয় মেঝের ওপর ধস্তাধস্তি, গালাগালি, চিৎকার আর হাঁপানি।

বাচ্চারা কান্না শুরু করে দেয়। অন্তঃসত্ত্বা নাতালিয়া-মামী কাঁদতে থাকে, মা তাকে দু-হাতে ধরে বাইরে নিয়ে যায়। বসন্তের দাগওলা হাসিখুশি ইয়েভগেনিয়া-ধাই ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে রান্নাঘর থেকে বার করে দেয়, চেয়ারগুলি উল্টে পড়ে। তরুণ বিশালস্কন্ধ শিক্ষানবীশ ৎসিগানক মিখাইল-মামার পিঠে বসে তাকে চেপে ধরে আর গ্রিগরি ইভানোভিচ একটা তোয়ালে দিয়ে বেশ শক্ত করে মামাকে পিঠমোড়া করে বাঁধে। গ্রিগরি ইভানোভিচের মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, চোখে কালো চশমা। সে নাকি একজন পাকা কারিগর।

আমার মামা হাল্কা কালো দাড়িসমেত চিবুকটা মেঝের ওপর ঘষতে ঘষতে গলা ফাটিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে।

টেবিলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে দাদু করুণ স্বরে চিৎকার করতে থাকেন। 'কী লোক সব! এরা নাকি আবার এক মায়ের পেটের ভাই। ছিঃ, কী জঘন্য!'

কথা কাটাকাটি শুরু হতেই আমি ভয়ে উনুনের ওপরে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে ভয়ে ভয়ে দেখি, দিদিমা ইয়াকভ-মামার মার-খাওয়া মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছেন। ইয়াকভ-মামা কাঁদছে আর দাপাচ্ছে; ওদিকে দিদিমা ভারী গলায় বলছে, কবে 'তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি হবে রে জংলীর দল!'

এদিকে গায়ের ছেঁড়া জামাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে দাদু দিদিমার দিকে তেড়ে আসছেন আর চিৎকার করছেন, 'দ্যাখ ডাইনী বুড়ী, দ্যাখ্, তুই কী অসভ্য জংলীদের পেটে ধরেছিলি!'

'ইয়াকভ-মামা বেরিয়ে যাবার পর দিদিমা এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভীষণ চিৎকার জুড়ে দেন, 'হে জগৎমাতা! আমার এই ছেলেগুলোকে তুমি একটু সুবুদ্ধি দিও!'

টেবিলের ওপরের জিনিসপত্রগুলো উল্টে-পাল্টে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে দাদু বলেন, 'ওগো, তোমার এই ছেলেগুলোর দিকে নজর রেখো। বিশ্বাস নেই, ওরা হয়তো ভারভারাকে একদিন খুনই করে বসবে…'

'ভগবান জানেন তুমি কী বলছ! ঠিক আছে, এবার তোমার গায়ের জামাটা খুলে দাও তো, সেলাই করে দিই।'

দু-হাতে দাদুর মুখটা ধরে দিদিমা তার কপালে চুমু খায়। দিদিমার তুলনায় দাদু বেশ বেঁটেখাটো—তিনি দিদিমার কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকেন।

'ওগো, মনে হচ্ছে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'হ্যাঁ সেটাই ভাল।'

বহুক্ষণ তাঁরা কথা বলেন। প্রথম দিকে কারও কথাবার্তার মধ্যে রাগ ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদু রেগে ওঠেন। লড়াই শুরু করার আগে মোরগ যেমন মাটি আঁচড়ায় তেমনিভাবে মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে তিনি দিদিমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে থাকেন, 'তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। ওদের চিন্তায় তুমি পাগল—আমাদের কথা ভাববে কেন?' চাপা গলায় দাদু চিৎকার করতে থাকেন, 'ওই যে তোমার মিখাইল—ওটার মুখে এক, মনে অন্য! ইয়াকভটা হচ্ছে একটা আসল শয়তান! ওদের হাতে পড়লে দু-দিনে সব সম্পত্তি উড়িয়ে দেবে!'

আমি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসি। অসাবধানে নড়তে গিয়ে আমার কাঁধের ধাক্কায় একটা ইস্ত্রি পড়ে যায়। ওটা প্রচণ্ড শব্দে উনুনের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। কাপ-ডিশের নোংরা ফেলার জন্য একটা বড় গামলা ছিল—ইস্ত্রিটা গিয়ে তার মধ্যে পড়ে। দাদু চমকে লাফিয়ে উঠে এক টানে আমাকে নিয়ে আসেন, তারপর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যে, তিনি যেন এই প্রথম আমাকে দেখছেন।

'উনুনটার ওপর কে তোকে উঠিয়ে দিয়ে গেল? তোর মা?'

'আমি নিজেই উঠেছি!'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস।'

'না, আমি মোটেই মিথ্যে কথা বলছি না। ভয় পেয়ে আমি নিজে থেকেই উনুনের ওপর উঠেছি!'

আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে কপালে একটা চাঁটি মেরে বললেন, 'ঠিক বাপের স্বভাব পেয়েছে! যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।'

আমিও তাই চাইছিলাম। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খুশিই হলাম।

বেশ বুঝতে পারতাম দাদুর ধারাল চোখ দুটোর দৃষ্টি সবসময় আমায় অনুসরণ করে চলেছে সে কারণে আমি তাকে ভয় করে চলতাম। মনে আছে, সেই ছোট চোখ দুটোর দৃষ্টিকে সবসময় আমি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। আমার মনে হত, তিনি অত্যন্ত নীচ স্বভাবের লোক; লোকের মনে আঘাত দিয়ে, এবং লোক যা পছন্দ করে না সেভাবেই তিনি সবার সঙ্গে কথা বলেন; সবাইকে রাগিয়ে তিনি মনে মনে আনন্দ পান।

'হ্যাঁ, তোমার-ই'—এ কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন, এবং বলতে ভালবাসতেন। 'ই' শব্দটা বলবার সময় অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে উচ্চারণ করতেন শব্দটা শুনে আমার সারা শরীর শির শির করে উঠত; নিজেকে তখন বড্ড একা একা মনে হত।

সন্ধ্যার চা খাবার সময়টা ছিল সব থেকে বিপজ্জনক। কারখানা থেকে

আমার দাদু, মামারা আর কারিগরেরা চলে আসত ক্লান্ত হয়ে।' সবাই এসে ঢুকত রান্নাঘরে। এ্যাসিড-ঝল্‌সানো চন্দনের রঙমাখা হাত আর ফিতে দিয়ে বাঁধা উল্টানো চুল—সব মিলে চেহারাগুলো অন্যরকম হয়ে যেত। মানুষগুলোকে রান্নাঘরের কোনে রাখা সাধুদের কালো কালো মূর্তিগুলোর মত মনে হত। আর ঠিক সেই সময় দাদু আমার সামনে বসে কথা বলতেন। আমার সঙ্গে তিনি যত কথা বলতেন, অন্য নাতিনাতনিদের সঙ্গে তা বলতেন না; ফলে আমার ওপর তাদের হিংসে হত। দাদুর চেহারার মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য ছিল, অনেকটা পাথর কুঁদে গড়া মসৃণ মূর্তির মত। তিনি যে রেশমের ফতুয়া গায়ে দিতেন তা ছিল পুরান ও ছেঁড়া, কুঁচ্‌কনো, সুতির জামা আর হাঁটুর কাছে তালি দেওয়া প্যান্ট। ওদিকে তাঁর ছেলেরা কিন্তু কোট গায়ে দিত, গলায় রেশমি রুমাল বাধত—তবুও মনে হত ছেলেদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাঁর সাজপোশাকও অনেক উঁচুদরের।

আমার পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন। কাজটা হল, কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা শেখা। বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েরা সবাই আমার থেকে বয়সে বড় এবং তারা সবাই লিখতে পড়তে জানে। আমাদের বাড়ির জানালা দিয়ে তাকালে দূরে একটা সোনালী চূড়ো দেখা যায়। গির্জাটার নাম উস্পেনস্কি গির্জা। এই গির্জার পুরোহিত এ-বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

আমাকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছিল আমার মামী নাতালিয়া। তার স্বভাব ছিল শান্ত, ভীরু; মুখখানা ঠিক ছেলেমানুষের মত, আর তার চোখদুটো এত স্বচ্ছ যে মনে হয় সেই চোখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে একবারে তার মাথার পেছনদিকটা দেখে নেওয়া যায়!

চুপ করে বসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগত। মামীমা এতে অস্বস্তি বোধ করত। চোখ ছোট করে সে মাথা ঝাঁকিয়ে, ফিস্‌ফিসিয়ে চাপা স্বরে কথা বলত, 'লক্ষ্মীটি আমি যা বলছি তাই বল—যিনি আমাদের পিতা হন...'

'যিনি মানে কী?'

'চুপ, প্রশ্ন কোরো না।' চারদিক দেখে নিয়ে মামীমা বলত, 'প্রশ্ন করলে কথাগুলো গুলিয়ে ফেলবে। আমি যেমন করে বলছি, তুমি ঠিক তেমন করেই বলে যাও—আমাদের পিতা— কি হল চুপ করে আছ যে?'

প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলব কেন, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, 'যিনি হন' কথাগুলোর আরো কোন মানে আছে। তাই আমি ইচ্ছা করেই কথাগুলো ঠিক না বলে উল্টো-পাল্টা বলতে শুরু করি, 'যিনি হন', 'যিনি মন...'

মামীমার সাদা ধবধবে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত, মামীমা যেন ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। তবু ধৈর্য না হারিয়ে সে আমার ভুল ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করত, 'না, ঠিক হচ্ছে না, আমি কী বলছি শোন—যিনি হন—'

তবু আমার কাছে মামীমা এবং তার মুখের কথা—এ দুটোই যথেষ্ট জটিল বলে মনে হত। আমি রেগে উঠতাম, ফলে আমার পক্ষে উপাসনার কথাগুলো মনে রাখা আরো শক্ত হত।

একদিন দাদু আমার সারা দিনের কাজের হিসেব নিতে বসলেন। বললেন, 'এই যে লেক্সেই, আজ দিনভর কী করেছ শুনি ? শুধু খেলা হয়েছে—না ? কপালটা যে-রকম ফুলে উঠেছে তাতে তা-ই বোঝা যাচ্ছে। ওহে ছোকড়া, খেলতে গিয়ে কপাল ফুলিয়ে আসাটা তেমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়, ওটা সবাই পারে—কিন্তু লেখাপড়ার খবর কি ? 'আমাদের পিতা' উপাসনাটা শিখেছ ?'

মামীমা নীচু গলা করে বলে, 'ওর মুখস্থ করতে একটু সময় লাগে।'

লাল ভুরুদুটো তুলে মুচকি হেসে দাদু বললেন, 'তাই যদি হয় তো ওকে একটু উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।'

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে তোর বাবার হাতে মাঝে মাঝে দু'এক ঘা খেতি ?'

দাদু কী বলছেন বুঝতে না পেরে আমি চুপ করেই রইলাম।

আমার মা জবাব দিল, 'না, মাক্সিম কখনো ওর গায়ে হাত তুলত না। আমাকেও সে মারতে নিষেধ করত।'

'কেন ?'

'সে বলত, মারধোর করে নাকি কাউকে কিছু শেখানো যায় না।'

রেগে উঠে দাদু স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মাক্সিমের আত্মা যেন শান্তি পায়। তবু বলি, লোকটার কোন ব্যাপারেই একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না।'

দাদুর কথা শুনে আমি যে ব্যথিত হলাম, সেটা তিনি বুঝতে পারলেন।

'থাক, আর ঠোঁট বাঁকাতে হবে না : বরং একটু বুঝেশুনে চলবার চেষ্টা কোর। দেখ আঙটির জন্যে সাশকাকে এই শনিবার কেমন ধোলাই দিই।' কথাগুলো বলে তিনি নিজের মাথার লাল ও রূপোলি চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে পরিপাটি করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোলাই কাকে বলে ?'

আমার কথাশুনে সবাই হেসে উঠল। দাদু জবাব দিলেন, 'অপেক্ষা কর, নিজেই নিজেই বুঝতে পারবে ধোলাই কাকে বলে।'

ঘরে এক কোণে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে আমি ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ধোলাই দিতে হলে কাপড়চোপড়কে আলাদা আলাদা বাছাই করে ভাঁটিতে চড়াতে হয় জানি। সুতরাং উত্তম-মধ্যম দেওয়া আর মার দেওয়া সম্ভবতঃ একই জিনিষ। আচ্ছা লোকে তো মার দেয় কুকুর ঘোড়া আর বেড়ালকে। আস্ত্রাখানে পুলিস পারসিকদের ধরে মারে—সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ছোট ছেলে মেয়েদের ধরে মারতে দেখিনি কাউকে। সত্যি কথা বলতে কি, মামাদের মাঝে মাঝে অবশ্য দেখেছি ছোটদের কপালে বা মাথাব পিছনে দু-একটা চাঁটি মারতে—আর যারা চাঁটি খায় তারা এতে বিশেষ কিছু মনেও করে না। শুধু ব্যথার জায়গায় দু-একবার হাত বুলিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যায়। মাঝে মাঝে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, ওরা এতে ব্যথা পেয়েছে কিনা।

ওরা বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়, 'উঁহু, মোটেই ব্যথা লাগেনি।'

আঙটির বিখ্যাত ঘটনাটা আমি জানতাম। চা-পানের পর রাত্রের খাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার মামারা আর কারিগররা সেলাই নিয়ে বসে। রঙে-ছোপানো কাপড়ের টুকরোগুলো পর-পর জোড়া দিয়ে তাতে বোর্ডের চাক্‌তি লাগিয়ে রাখে।

সেদিন তামাসা করবার জন্যে আধা-অন্ধ গ্রিগরিকে নিয়ে মিখাইল-মামা একটা কাণ্ড করে বসল। ন-বছরের ভাইপোকে বলল, গ্রিগরির আঙটিটা মোমবাতির ওপরে ধরে গরম করতে। সেই কথা শুনে সাশা একজোড়া চিমটে দিয়ে আঙটিটাকে জ্বলন্ত মোমবাতির ওপরে ধরে থাকে। তারপর যখন আঙটিটা তেতে লাল হয়ে উঠল তখন সেটাকে গ্রিগরির পাশে রেখে দিয়ে উনুনের পিছনে লুকিয়ে রইল। ঠিক সেই সময়ে দাদু সেখানে এলেন এবং কাজ করার জন্যে সেই গরম আঙটিটা তুলে নিলেন।

আমার মনে আছে, এত হৈ-হল্লা কিসের তা জানবার জন্যে আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, দাদু হাস্যকরভাবে লাফালাফি করছেন আর পোড়া আঙ্গুলগুলো দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করছেন, 'কোন উল্লুক এটা করেছে ?'

মিখাইল-মামা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙটিটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর ফুঁ দিচ্ছে ; গ্রিগরির কোন দিকে খেয়াল নেই, সে আপন মনে সেলাই করে চলেছে—লম্বা ছায়া এসে পড়েছে তার মাথার মস্ত টাকের ওপরে। ইয়াকভ-মামা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল, তারপর হাসি চাপবার জন্যে উনুনের পিছনে লুকিয়ে রইল। দিদিমা প্রলেপ দেবার জন্যে কাঁচা আলু বাটতে শুরু করল।

মিখাইল-মামা হঠাৎ বলে উঠল, 'ইয়াকভের ছেলে সাশকার কাণ্ড এটা।'

উনুনের পিছনে থেকে লাফিয়ে এসে ইয়াকভ বলল, 'মিথ্যে কথা।'

ওদিকে ঘরের এক কোণ থেকে ইয়াকভের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে আকাশ ফাটানো স্বরে চিৎকার শুরু করেছে, 'না বাবা, মিথ্যে বলছে! জেঠু নিজেই তো আমাকে আঙটিটা গরম করতে বলল!'

তারপর শুরু হয়ে গেল মামাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া শুনে দাদু মুহূর্তে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। এরপর একটা কথাও বললেন না, আঙ্গুলে প্রলেপ লাগিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সকলে মিখাইল-মামাকেই দোষ দিতে লাগল। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, মিখাইল-মামাকে এবার ধোলাই দেওয়া হবে কিনা। চা-পানের সময় আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে বসলাম।

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দাদু বিড়বিড় করে বললেন, 'সেটা দেওয়াই তো উচিত। শোন ভারভারা. তোমার ওই কুকুরছানার মত ছেলেকে যদি না সামলাও তাহলে আমি ওর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলব।'

আমার মা জবাব দিল, 'ওর গায়ে একবার হাত তুলে দেখই না।'

সবাই চুপ করে রইল।

আমার মা'র এই একটা ক্ষমতা আছে। ছোট দু-একটা কথাকে সে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারে যে অন্য সবাই পিছে সরে যায়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, মা-কে সবাই ভয় করে চলে। এমন কি মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার দাদুর গলার স্বরও বদলে যায়। অন্যদের সঙ্গে তিনি যে-ভাবে কথা বলেন, মা'র সঙ্গে তার থেকেও অনেক শান্তভাবে বলেন। এতে আমি মনে মনে খুশিই হতাম।

মামাতো ভাইদের কাছে আমি গর্ব করে বলতাম। 'আমার মা'র মত ক্ষমতা আর কারো নেই।'

অবশ্য মামাতো ভাইরাও কথাটা স্বীকার করত।

কিন্তু পরের শনিবারের একটা ঘটনায় মা'র সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা বদলে গেল।

শনিবারের আগেই আমিও একটা বিশ্রী ব্যাপার করে বসলাম এবং নিজেই বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

বড়রা যে-ভাবে কাপড়ের রং বদলায় তা দেখে আমি খুবই অবাক হতাম। হয়তো একটা হলদে কাপড়ের টুকরো নিয়ে কালো জলে ডোবাল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা গাঢ় নীল হয়ে গেল—কিংবা হয়তো একটা ছাইরঙা কাপড় নিয়ে লাল জলে ডোবাল আর কাপড়টা হয়ে গেল টক্‌টকে লাল—এ কাজগুলো খুবই সহজ কিন্তু কি ভাবে কি হয় তার কিছুই বোঝা যায় না।

আমার মনে মনে খুবই ইচ্ছে ছিল, কি করে কাপড় রং করে সেটা নিজে একবার যাচাই করে দেখি। ইয়াকভের ছেলে সাশাকে আমি আমার মনের এই ইচ্ছা বললাম। ছেলেটা বিনয়ী, গম্ভীর প্রকৃতির; সব সময় সে বড়দের পিছনে পিছনে ঘোরে এবং তাদের সব কাজে সাহায্য করতে চায়। ওর এই বুদ্ধি আর বিনয়ের জন্য এক দাদু ছাডা আর সবাই ওর প্রশংসা করে।

ছেলেটার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদু বলেন, 'দূর দূর, একেবারে তোষামুদে!

ইয়াকভের ছেলে সাশার গায়ের রং কালো, শরীর হাড়-জিরজিরে, চোখদুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চাপা স্বরে দ্রুত কথা বলে; তার অর্ধেকটা কথা মুখ দিয়ে বেরোয় আর বাকিটা বেরোয় না, তাছাডা কথা বলার সময় এমনভাবে চোরের মত চারদিকে তাকায় যেন ছুটে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেবার মতলব আঁটছে। এমনিতে তার কটা চোখদুটো স্থির কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে মনে হয়, তার চোখের তারাটা পর্যন্ত কাঁপছে।

ওকে আমার ভাল লাগে না। বরং মিখাইলের ছেলে সাশাকে অনেক বেশি ভাল লাগে। যদিও এই সাশার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই এবং ও একটু হাবাগোবা ধরনের। সাশার স্বভাব নম্র, আমার মায়ের মত ওই দুটো ঠাণ্ডা চোখ আর ভুবনভোলানো হাসি। ওর দাঁতগুলো ভারি বিশ্রী; মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া দু-সারি দাঁত গজিয়েছে ওপরের মাড়িতে। এই দাঁতের পিছনেই সবসময় লেগে থাকে ও, মুখের মধ্যে সর্বক্ষণ আঙুল ঢুকিয়ে চেষ্টা করে পেছনের দাঁতগুলোকে টেনেটেনে আল্‌গা করে তুলে ফেলা যায় কিনা। কেউ যদি আঙুল দিয়ে ওর দাঁতগুলোকে দেখতে চায়, তাহলেও তাতে ওর কোন আপত্তি নেই, বাধ্য ছেলের মত ও হাঁ করে। শুধু এটুকু ছাড়া ওর মধ্যে আমি আর কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাই না। বাড়ির মধ্যে মানুষ ঠাসাঠাসি করছে তবু এই ভিড়ের মধ্যেও ও যেন একা। ওকে দেখতে পাওয়া যাবে কোন একটা অন্ধকার কোণে, হয়তো ও আপন মনে বসে আছে কিংবা জানলার ধারে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে সারা সন্ধ্যাটা। ওর পাশে বসলে ক্রমাগত বকতে হয় না, ইচ্ছেমত চুপ করে থাকা যায়। জানলার ধারে ওর পাশে বসে কোন কথা না বলেও পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। শুধু চেয়ে থাকা যায়—উস্পেনস্কি গির্জার চারপাশে দাঁড়কাকগুলো গোল হয়ে উড়ছে আর সূর্যাস্তের লাল আভায় গির্জার সোনালী চূড়াগুলো উৎকীর্ণ লিপির মত অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাখিগুলো অনেক ওপরে উঠে যায়, আবার নিচে নেমে

আসে, তারপর হঠাৎ একসময়ে নিস্প্রভ আকাশে কালো একটা জাল বিস্তার করে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, পেছনে পড়ে থাকে এক সীমাহীন শূন্যতা। এই ধরনের দৃশ্যের দিকে চেয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না ; আনন্দে ও বিষণ্ণতায় বুকটা টনটন করে ওঠে।

এদিকে ইয়াকভ-মামার ছেলে সাশার স্বভাবটা ঠিক উল্টো। বড়দের মত যে কোন বিষয়ে যতক্ষণ খুশি ও চমৎকার কথা বলতে পারে। কাপড়ে রং করার বিদ্যেটা আয়ত্ত করবার জন্যে আমি আগ্রহী এ কথা জানতে পেরে ও আমাকে পরামর্শ দিতে এল। বলল ছুটির দিনে পাতবার জন্যে যে টেবিল-ঢাকনাটা দেরাজে আছে সেটাকে বার করে নিয়ে আমি গাঢ় নীল রঙে চুবিয়ে নিতে পারি।

'আমার তো মনে হয়, সাদা কাপড়ে সব রং যেমন চমৎকার ফোটে, আর কোন কাপড়ে তেমন হয় না। আমার এই কথাটা জেনে রাখ।'

সেই মস্ত টেবিল-ঢাকনাটা আমি টেনে বার করলাম, তারপর ছুটে গেলাম উঠোনে। গামলাতে গাঢ় নীল রং তৈরি করাই ছিল, তাতে সবেমাত্র ঢাকনাটার একটা ধার চুবিয়েছি এমন সময় ৎসিগানক একেবারে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে প্রকাণ্ড থাবার মত দুই -হাত দিয়ে নিঙড়োতে শুরু করল। আমার মামাতো ভাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল, তার দিকে তাকিয়ে ৎসিগানক চেঁচিয়ে বলল, 'যাও তো, দৌড়ে গিয়ে ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে এস!' তারপর উষ্কখুষ্ক চুলে ভর্তি কাল মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে বেশ তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'দেখ না, মজাটা কেমন টের পাও।'

দিদিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, তারপর চোখের সামনে এই ব্যাপার দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। এমন কি আমাকে ধমক দিতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল বেরিয়ে এল। তার নিজস্ব বিচিত্র কায়দায় তিনি আমাকে বকলেন, 'ওরে, বাঁধাকপির মত কানওলা পাজিছোঁড়া, তোকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলা উচিত।' তারপর তিনি ৎসিগানকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, 'ভানিয়া, কথাটা ঠাকুরদার কানে ওঠাসনে যেন! আমি কাউকে টের পেতে দেবনা, তাহলে আর কোন গোলমালই হবে না…'

গায়ের চিত্রবিচিত্র পোষাকে হাত মুছতে মুছতে উদ্বিগ্ন স্বরে ভানিয়া জবাব দিল, 'আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। বরং আপনি সাশাকে সতর্ক করে দিন, ও যেন এ নিয়ে কানাকানি না করে।'

আমার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে দিদিমা বলল, 'ওকে কিছু পয়সা দিলেই ওর মুখ বন্ধ করা যাবে।'

শনিবার, সন্ধ্যা প্রার্থনা-সভার আগে, কে যেন আমাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ঘরের ভেতরটা অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। মনে আছে, বাইরের দিকের এবং এ ঘর থেকে অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের দরজাগুলো শক্ত করে আঁটা ছিল। জানলার বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও কুয়াশা ঝরছে। উনুনের কালো মুখটার সামনে একটা বেঞ্চিতে অস্বাভাবিক রকমের রাগত মুখে ৎসিগানক বসে আছে। দাদু এক কোণে একটা গামলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, বার্চগাছের ডাল দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা বেতগুলোকে জল থেকে টেনে টেনে তুলছেন' সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করছেন আর তীব্র শপ শপ বেতের বাড়ি

মারছেন হাওয়ায়। আমার দিদিমা ঘরের অন্ধকারে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে যেন এবং জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে নস্যি নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলছে, 'পাষণ্ড, এই কাজেই তোমার আনন্দ...'

রান্নাঘরের মাঝে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ইয়াকভের ছেলে সাশা। দু-হাতের মুঠো দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বুড়ো ভিখিরির মত করুণ সুরে বলে চলেছে, খৃষ্টের দোহাই, আমি এবারকার মত মাফ চাইছি...

মিখাইল মামার ছেলে সাশা ও তার বোন কাঠের মত সোজা হয়ে চেয়ারের পেছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

একটা লম্বা ভিজে বেত হাতের মুঠোর মধ্যে টানতে টানতে দাদু বলেন, 'আগে তোর উপযুক্ত শাস্তি হোক তারপর তোকে মাফ করব। নে, এবার প্যান্ট খোল।'

কথাগুলো তিনি শান্ত স্বরে বলেন। রান্নাঘরের ভেতরটা আধো অন্ধকার, ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া কড়িকাঠ—আর ঘরের মধ্যে এমন এক নিস্তব্ধতা যা সহজে ভোলা যায়না। আমার দাদুর কথা, নড়বড়ে আর ক্যাচকোচ-শব্দ হওয়া চেয়ারের ওপর ছেলেটার নড়াচড়া, আমার দিদিমার একপা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াম—কোন কিছুতেই ঘরের এই নিস্তব্ধতা এতটুকু ভাঙ্গে না।

সাশা উঠে দাঁড়ায় চেয়ার থেকে। প্যান্টটা খুলে হাটু পর্যন্ত নামায়, তারপর নিচু হয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায় বেঞ্চির দিকে। ওর এই অবস্থা দেখে আমার গা শির শির করে ওঠে। আমারও হাঁটুদুটো কাঁপছে। কিন্তু এরপরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। একান্ত বাধ্য ছেলের মত সাশা বেঞ্চিটার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে আর ভানিয়া একটা তোয়ালে ওর বগলের তলা থেকে নিয়ে ঘাড়ের ওপরে শক্ত করে বাঁধে। তারপর কাত হয়ে ওর পায়ের পাতা দুটো চেপে ধরে।

দাদু বলেন, 'লেক্সেই, সামনে এগিয়ে এস। কী, কথা কানে ঢুকছে না? মার কাকে বলে জানতে চেয়েছিলে; ভাল করে তাকিয়ে দেখ, এবার চোখের সামনেই তা দেখতে পাবে। এক...'

অল্প একটু উঁচুতে হাত তুলে তিনি সাশার পিঠে বেতের বাড়ি মারেন। ছেলেটা আর্তনাদ করে ওঠে।

দাদু বলেন, 'বাড়াবাড়ি কোর না; ওতে তোমার মোটেই ব্যথা লাগেনি! তবে এবার লাগবে!'

সপাং করে বেত মারেন; সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া চাকা চাকা হয়ে ফুলে লাল দাগ হয়ে যায়। আর আমার মামাতো ভাই প্রচণ্ড জোরে চিৎকার জুড়ে দেয়।

গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার মত দাদুর হাতটা একবার ওপরে ওঠে, আবার নিচে নেমে আসে, আর তিনি প্রশ্ন করে চলেন, 'কেমন লাগছে? মিষ্টি লাগছে না বুঝি? এইবার বোঝ আঙটিতে হাত দিলে কী হয়!'

যতবার তিনি হাত ওঠান, ততবার আমার মনে হয়, বুকের মধ্যে থেকে কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে; আর যতবার তিনি হাত নামান ততবার মনে হয় আমিও পড়ে যাচ্ছি।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সাশা চিৎকার করে চলেছে। এ চিৎকার কান পেতে শোনা যায় না।

'আর কখনো এমন কাজ করব না—টেবিলের ঢাকনার কথাটা কি আমি বলিনি—আমিই তো বলেছি—'

শান্তস্বরে দাদু বলেন, 'আরে কজনের নামে লাগালেই তো দোষ কেটে যায় না ; যারা লাগায় তারাই প্রথম মার খায়। ঠিক আছে, এবার টেবিলের ঢাকনাকে ধরা যাক।'

আমার দিদিমা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নেয়।

'খবরদার বলছি, তুমি যত বড় পাষণ্ডই হওনা কেন, লেক্সেইয়ের গায়ে আমি তোমাকে কিছুতেই হাত তুলতে দেবনা।' দিদিমা দরজায় লাথি মারতে থাকেন আর চিৎকার করেন, 'ভারিয়া! ভারিয়া!'

দাদু ছুটে এসে ধাক্কা মেরে দিদিমাকে ফেলে দেন ; তারপর আমাকে জাপটে ধরে বেঞ্চির দিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেন। আমি তার হাতের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিই, তার লাল দাড়ি ধরে টানি, তার আঙ্গুলে কামড়ে দিই। তিনি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে জাপটে ধরে এনে বেঞ্চির ওপরে ফেলেন। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মনে আছে, সবকিছু ভুলে দাদু তখন চিৎকার করছেন, 'বাঁধ ওকে শক্ত করে! ওকে আমি খুন করব!'

আর মনে আছে আমার মার সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা আর বড় বড় চোখ দুটো। বেঞ্চির পাশে মা ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'বাবা এবার থাম—ওকে ছেড়ে দাও।'

শেষ পর্যন্ত আমি জ্ঞান হারাবার পর দাদু থেমেছিলেন। তারপর আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম ; একটা ছোট ঘরে বিরাট একটা বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে দিনরাত শুয়ে থাকতাম। ঘরটাতে একটাই মাত্র জানালা, আর মূর্তিগুলোর পাশে একটা ছোট লাল আলো সারাদিন সারারাত ধরে জ্বলত।

অসুখের কয়েকদিন আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। মনে হয়, এ সময়েই আমি যেন হঠাৎ বড় হয়ে উঠেছিলাম, এবং একটা নতুন গুণ অর্জন করেছিলাম—সেদিন থেকে সব মানুষকে আমি আপন বলে মনে করতে লাগলাম। যেন আমার বুকের ওপর থেকে একটা চামড়ার আবরণ খসে গেছে আর আমি নিজের ও অন্যের আঘাত সম্পর্কে সীমাহীন অনুভূতি প্রবণ হয়ে উঠেছি।

প্রথমতঃ আমার মার আর দিদিমার মধ্যে যে কথাকাটাকাটি হয় তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে উঠি। এই ছোট ঘরটার মধ্যে দিদিমা মা'র ওপর তার প্রকাণ্ড কালো শরীরটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; মাকে টানতে টানতে মূর্তিগুলোর কাছে নিয়ে গেল, তারপর গর্জাতে গর্জাতে বলল, 'ওকে তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি না কেন? বল।'

'আমার ভয় করছিল।'

'এত বড় হয়েছিস, তবু তোর ভয় করে! ছি, ছি, ভারভারা! আমি বুড়ি হয়েছি, কিন্তু কৈ, আমি তো ভয় পাইনি!'

'থাম মা, এ সব আমার খুব খারাপ লাগে!'

'ওর জন্য তোর এতটুকুও দরদ নেই! আহা! বাপ-হারা অনাথ ছেলে!'

আর্তকণ্ঠে মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি নিজেও তো একজন অনাথা—আমার এ জীবনে আর কি আছে!' তারপর ঘরের কোণে বাক্সের ওপর বসে দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে।
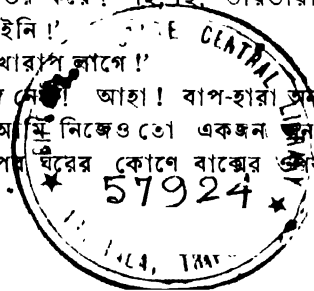
মা বলে, 'আলেক্সেই যদি না থাকত তাহলে আমি আর এখানে থাকতাম না—দূরে অন্য কোথাও চলে যেতাম। এই নরকে আমি আর থাকতে পারছি না মা, এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখানে থাকার মত মনের জোর আমার নেই!'

দিদিমা ফিসফিস করে বলে, 'আহারে, বাছা আমার, আমার সোনার চাঁদ!'

এতদিনে আমি জানতে পারলাম, আমার মাকে আর যাই বলা যাক না কেন, তাকে মোটেই শক্তিমতী বলা চলে না। অন্য সবার মত মা-ও দাদুকে ভয় করে চলে। এখানকার জীবন তার কাছে অসহ্য—তবু তাকে এখানে থাকতে হচ্ছে শুধুমাত্র আমার জন্য। কথাটা ভাবতেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, এ ঘটনার কিছুদিন পরে মা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়।

একদিন আমার দাদু আমাকে দেখতে এলেন। হঠাৎ এমনভাবে এলেন যে মনে হল যেন তিনি ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। বিছানার ধারে বসে কনকনে ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কেমন আছিস? কথা বলনা বাপু—মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখিস না। কি রে?'

ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে ফেলে দিই; কিন্তু যন্ত্রণায় আমার হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা ছিল না। তার চুলগুলো যেন আগের থেকে আরো লাল হয়ে গেছে; অস্থির হয়ে তিনি ক্রমাগত মাথা নেড়ে চলেছেন; তার উজ্জ্বল চোখ দুটো দেওয়ালের গায়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পকেট থেকে একটা মিষ্টি রুটির তৈরী ছাগল বের করলেন; চিনির তৈরী দুটো ঢোল, একটা আপেল আর কিছুটা কিসমিস। জিনিষগুলো বালিশের ওপর আমার নাকের পাশে রেখে বললেন, 'দেখ দাদু, তোর জন্য আমি কত কিছু নিয়ে এসেছি।'

নিচু হয়ে তিনি আমার কপালে চুমু খেলেন। তারপর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে কথা বলতে লাগলেন; তার ছোট খস্‌খসে হাতটায়, বিশেষতঃ তার হাতের পাখির মত বাঁকানো নখগুলোতে ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙের দাগ পড়েছে।

'দাদু, সেবারে তোর যতটা পাওনা ছিল, তার থেকে কিছুটা বেশি শোধ দেওয়া হয়ে গেছে। আসলে কি জানিস, তুই আমাকে এমন আচড়-কামড় দেওয়ায় আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। আর সেজন্যই একেবারে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। তবে এই বাড়তি মাত্রাটা তোর পক্ষে ভালই হয়েছে। এটা তোর হিসেবে আগামী বারের জন্য জমা রইল। একটা কথা মনে রাখিস, বাড়ির লোকেরা যদি কখনো মারে তাতে অন্যায় কিছু নেই। সেটা বরং ভাল। তবে সাবধান, বাইরের লোককে কখনো গায়ে হাত তুলতে দিস না! আপনার-জন হলে কিছু আসে যায় না, তবে বাইরের লোককে কিছুতেই নয়। তুই কি ভাবছিস যে ছেলেবেলায় আমার কপালে কিছুই জোটেনি? আলিওশা, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও তুই মোটেই কল্পনা করতে পারবি না যে ছেলেবেলায় আমাকে কি মার খেতে হয়েছে! এক একদিন এমন মার খেতাম যে স্বয়ং ভগবানও তা দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। তা বলে এত মার খাবার ফল কি কিছুই হয়নি? আমার দিকে চেয়ে দেখতো—আমি ছিলাম ভিখারি মায়ের বাপ-হারা অনাথ ছেলে—আর এখন আমি হলাম কারিগরদের প্রধান—আমার হুকুমে এখন কত লোক চলছে।'

রোগা অথচ মজবুত দেহটা নিয়ে তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার

ছেলেবেলার গল্প বলতে শুরু করলেন। বেশ নিপুনতার সঙ্গে একটার পর একটা কথা জুড়ে তিনি গল্প বললেন। তার সবুজ চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠেছে, মাথার সোনালী চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে, আর কথাগুলো তীরের মত এসে বিঁধছে আমার মুখে।

'তুই এখানে এলি জাহাজে চড়ে। সেই জাহাজকে চালিয়ে এনেছে বাষ্প। অর্থাৎ বাষ্প তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে। কিন্তু ছেলেবেলায় আমি নিজের জোরে ভল্‌গার ওপর থেকে বজরা টেনে নিয়ে যেতাম, পাল্লা লড়তাম ভল্‌গার সঙ্গে। জলের ওপর বজরা, আর আমি ডাঙ্গায়—খালি পায়ে পাথর আর ঢিবি ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলা। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে চলার কোন বিরাম নেই। মাথার ওপর সারাদিন সূর্য জ্বলে ; শেষে মনে হয় মাথাটা যেন একটা লোহারপাত্র, আর সে পাত্রের মধ্যে কি যেন একটা তরল পদার্থ টগবগ করে ফুটছে। সারাটা শরীর চুলের কাঁটার মত বেঁকে যায়, মটমট করে শব্দ হয় হাড়গুলোর মধ্যে—তবুও শুধু চলা, আর চলা। দরদর করে চোখের ওপর ঘাম ঝরে তবুও অন্ধের মত শুধু পথ চলা। বুকের মধ্যে দূরদূর করে—যন্ত্রণায় ঠোঁট ফেটে যায়—তবুও কোন নালিশ না করে মুখ বুজে শুধু পথ চলা। এই ছিল আমাদের অবস্থা। আর এভাবে চলতে চলতে একসময় কাঁধ থেকে দড়ি খসে পড়ে, মুখ থুবড়ে আশ্রয় নিতে হয় মাটিতে ; কিন্তু তবুও ভাল লাগে তখন, কারণ, ততক্ষণে শরীরের শেষ-বিন্দুশক্তিও ক্ষয় হয়ে গেছে। আর যতক্ষণ না অজ্ঞান হই, কিংবা মারা যাই, ততক্ষণ শুয়েই আছি—তখন মনে হয় ও দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের দুনিয়ায়, দয়াময় খৃষ্টের জগতে এভাবেই বেঁচে থাকতাম আমরা! এভাবেই তিন তিনবার আমি সোজাসুজি ভল্‌গা পার হয়েছি—সিম্বিয়স্ক থেকে রিবিনস্ক-এ, সারাতভ থেকে এখানে, আস্ত্রাখান থেকে মাকারিয়েভের বাজারে। এভাবেই হাজার হাজার মাইল পার হতে হয়েছে! তারপর, তিন বছর এভাবে চলার পর, আমার পদোন্নতি হল—আমি বজরার মোড়ল হলাম। কারণ, অন্য সকলের থেকে যে আমার বুদ্ধি একটু বেশি এটা মালিক বুঝতে পেরেছিল।'

আমার মনে হতে লাগল, আমার চোখের সামনে যেন একটুকরো মেঘের মত বাড়তে বাড়তে তিনি মস্ত বড় হয়ে উঠেছেন। বেঁটে খাটো রোগা বুড়ো লোকটাই যেন রূপকথার নায়কের মত মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছেন—যেন বিরাট এক নদীর প্রচণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি এক বিরাট ছাইরঙ্গা বজরাকে টেনে নিয়ে চলেছেন।

মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে এক লাফে নিচে নেমে পড়েন। বুলার্করা কিভাবে দড়ি কাঁধে নিয়ে পথ চলে, আর কিভাবে জল ছেঁচে ফেলে—হাত পা নেড়ে তাই দেখান। কর্কশ গলায় বেসুরে গান গেয়ে ওঠেন ; তারপরই আবার কম-বয়সী তরুণের মত ক্ষিপ্রতায় চকিতে উঠে আসেন বিছানায়। বেশ চমৎকার মানুষ—কথা বলতে বলতে তার গলার স্বর গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যায়, এবং ক্রমেই তার কথায় আত্মবিশ্বাসের ভাবটুকু পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

'তবে কি জানিস আলিওসা, ঐ জীবনের অন্য একটা দিকও ছিল। গ্রীষ্মের দিনে কোন কোন সন্ধ্যায় আমরা জিগুলিতে বিশ্রাম করতাম, সামনে থাকত সবুজ পাহাড় আর সেখানে আমরা আগুন জ্বালতাম। সে সব কি দিনই না গেছে! ওদিকে হয়তো উনুনে পরিজ্‌ ফুটছে, এদিকে তখন এক হতভাগ্য বুলার্ক মনকে

হালকা করার জন্য হঠাৎ দরদভরা গলায় গান গেয়ে উঠল ; অন্য যারা থাকতাম, তারাও ওর সঙ্গে সমবেত গলায় গলা মেলাতাম। আহা। সে কত রকমের গান! সে সব গান শুনে সারা শরীর শিরশির করে উঠত! এমন কি মনে হত, সে সব গান শুনে ভল্‌গা নদীও যেন আরো গতি-মুখর হয়ে উঠেছে, ঘোড়ার মত টগবগিয়ে আকাশ ফেঁড়ে চলে যেতে চাইছে! ঝড়ের মুখে ধুলোর মত আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যেত। গানে আমরা এমন বিভোর হয়ে যেতাম যে, উনুনে চাপানো পরিজে্‌র কথা আর কারো মনেই থাকত না—শেষে পাত্র থেকে পরিজ্‌ উপচে পড়ত মাটিতে। যার হাতে রান্নার ভার থাকত, তার মাথায় চাটি মেরে আমরা বলতাম,—যত খুশি গান-বাজনা কর, আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো, কাজে যেন কোন ভুল না হয়।'

দাদুকে ডাকার জন্য মাঝে মাঝে লোক আসছে। যতবার লোক আসে, আমি ততবারই বলি, 'দাদু, এখন যেওনা—আর একটা গল্প বল।'

তিনি হাসেন, তারপর হাত নেড়ে বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলগে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত এক নাগাড়ে গল্প বলেন তিনি। তারপর সস্নেহে বিদায় নিয়ে চলে যান। আমি বুঝতে পারি, দাদু নীচ কিংবা ভয়ঙ্কর প্রকৃতি—এ'র কোনটাই নন। ভাবতেও কষ্ট হয় যে এই একই লোক আমাকে এমন নির্দয়ভাবে মেরেছেন। কিন্তু সে ঘটনাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

দাদু আমাকে দেখে যাবার পর থেকেই আমার কাছে অন্য সবার আসা অবারিত হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেউ না কেউ আমার বিছানার পাশে বসে নানারকম মজাদার কাহিনী বলে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। তবে এটুকু আমার স্পষ্ট মনে আছে, শুধু চেষ্টা করলেই যে আমাকে ভুলিয়ে রাখা যেত—তা নয়। সবথেকে বেশি আসত আমার দিদিমা; আর কেউ তার মত এত বারবার আসত না। অনেক সময় দিদিমা আমার সঙ্গে শুতো পর্যন্ত। কিন্তু এ সময় আর একজন আমার মনে সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল। সে হল ৎসিগানক। আটসাট চেহারা, চওড়া কাঁধ, বিরাট মাথা আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত উৎসবের পোষাক—সোনালী সিল্কের জামা, মখমলের প্যান্ট আর মশ্‌মশে্‌ বুট জুতো। চলবার সময় গোড়ালির কাছে জুতোর চামড়ায় হারমনিয়মের মত ভাজ পড়ে! মাথার চুল চক্‌চক্‌ করছে, ঘন ভুরুর নিচে তির্যক চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক, ঠোঁটের ওপর তারুণ্যের চিহ্ন কালো গোঁফের রেখা—আর সেই কালো রেখার নিচে ঝকঝকে কালো দাঁত। গায়ের জামা থেকে নরম আলো ফুটে বের হচ্ছে—মূর্তির লাল আলো প্রতিফলিত হয়ে আসছে তা থেকে।

জামার হাতা তুলে সে দেখায় ; দেখলাম, তার খোলা হাতের ওপরে জালের মত অনেকগুলো লাল রেখা ফুটে রয়েছে। বলে, 'দেখছিস তো, কেমন ফুলে আছে। আগে এর থেকেও খারাপ অবস্থা ছিল, এখনতো অনেকগুলো প্রায় সেরে গেছে।' তারপর বলে চলে, 'দেখলাম, রাগে তোর দাদুর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে ; হয়তো মারতে মারতে তোকে মেরেই ফেলত। তখন তার বেতের নিচে আমি নিজে হাত পেতে দিলাম। ভেবেছিলাম, বেতটা হয়তো ভেঙ্গে যাবে।

তাহলে অন্য একটা বেত নিয়ে আসতে যে সময়টুকু লাগত, , তার মধ্যেই তোর দিদিমা কিংবা মা তোকে নিয়ে সরে পড়তে পারত। কিন্তু ভাবলে কি হবে, বেতটা যে ছিল মজবুত ; ওটাকে জল খাওয়ান হয়েছিল। তবে যাই বলিস না কেন, বেশ কয়েকটা বেতের ঘা থেকে আমি তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। গুনে দেখতে পারিস কতগুলো! আমি বাবা খুব চালাক, হ্যাঁ।'

হাল্কাভাবে সে হেসে ওঠে। সত্যিই সুন্দর তার হাসিটা। নিজের ফুলো হাতটার দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'তোর অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট লাগছিল। দম আটকে আসছিল। তখনই বুঝেছিলাম যে তোকে খুব ভুগতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য, তোর দাদুর একটুও হুঁশ হল না, তিনি সপাং সপাং করে ক্রমাগত চালিয়ে গেলেন!'

কথা বলতে বলতে ঘোড়ার ডাকের মত মুখে একটা আওয়াজ করল। মাথা নেড়ে দাদুর উদ্দেশ্যে কি যেন বিড় বিড় করে বলল। তখন আমি অনুভব করলাম সে আমার আপন জন। শিশুর মত ছিল তার মন।

আমি তাকে বললাম তার প্রতি আমার অন্তহীন ভালবাসার কথা। এ কথা শুনে সে সরল ভাবে হেসে জবাব দিল 'আমিও তোকে ভালবাসি। এই দ্যাখ, তোর জন্যেই তো এত যন্ত্রণা ভোগ করলাম। অন্য কেউ হলে আমার বয়ে' যেত এই দুর্ভোগ ভোগার!'

বার বার দরজার দিকে তাকিয়ে সে আমায় সন্তর্পণে বলল, 'শোন, একটা কথা বলি। পর পর যখন মার খেতে হবে, তখন একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবি— শরীরটাকে শক্ত করবি না; আলগা করে রাখবি। আর দম বন্ধ করার চেষ্টা করিস না। বার বার দম নিবি, আর ছাড়বি। আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাবি, যতটা পারিস্। কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করিস।'

'আমাকে কি আবার মারবে?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

ৎসিগানক সাধারণ ভাবেই জবাব দেয় কি ভাবছিস? শুধু একবারই নয়। তোর কপালে এবার থেকে বার বার মার জুটে গেল।

'ইস্ কিজন্যে? আমি কি করেছি?'

'তোর দাদুর অপরাধী সাব্যস্ত করতে বেশি দেরী লাগে না।'

তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে বলল, 'যদি দেখিস বেতটা সপাট এসে পড়ছে, তাহলে আলতোভাবে শরীরটাকে ফেলে রাখবি! আর যদি বেতের মারে শরীরের ছাল-চামড়া ওঠবার উপক্রম ঘটে, তখন বেতটা যেদিক থেকে পড়ছে, সেদিকে ততই এগোবি।' চোখটা টিপে আবার বলল, 'মারের ব্যাপারে আমি কিন্তু পুলিশের চেয়েও পোক্ত হয়ে গেছি। এত মার জীবনে আমাকে হজম করতে হয়েছে যে আমার চামড়াটা পুরু বনে গেছে। তা' দিয়ে দস্তানাও বানানো যায় বলতে পারিস।'

ৎসিগানকের হাসিভরা মুখ দেখে আমার দিদিমার মুখে শোনা সেই রাজকুমার ইভান আর বোকা ইভানুশ্কার গল্পের কথা মনে পড়ে।

তিন

ৎসিগানকের খাতির আমাদের বাড়িতে বেশ বেড়ে গেছে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর আমার তা বোধ হল। আমার দাদু ওর নিজের ছেলেদের ওপর যত চোটপাট করেন, ৎসিগানকের ওপর কিন্তু তা করেন না। ৎসিগানকের আড়ালে ওর

সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে দাদু চোখ দুটো পিট পিট করে, মাথা নেড়ে বলেন, 'দ্যাখ্ তো ভাগ্নি ! হতভাগাটার কাজের হাত আছে বলতে হবে। অমন কাজের হাত থাকা কম কথা নয়। আমি বলে রাখছি, এ ছেলে একদিন মস্ত বড় হবে।'

আমার মামারাও ৎসিগানকের সঙ্গে কোন অসদভাব করেনা। এমন কি তারা তামাসা করে ওর পেছনেও লাগে না। অথচ কারিগর গ্রিগরির সঙ্গে তো প্রতি সন্ধ্যায় মারাত্মক ধরণের রসিকতা লেগেই আছে। যে কাঁচিটা সে ব্যবহার করে সেটাকে গরমে তাতিয়ে রেখে দেয় ; অথবা যে চেয়ারে গ্রিগরি বসত তাতে পেরেক ফুটিয়ে রাখা হত। অথবা সেলাইয়ের জন্য যে কাপড় স্তূপ করে রাখা হত তাতে নানা রঙের কাপড় মিশিয়ে দেওয়া হত। আধকানা গ্রিগরি সেই কাপড়ের টুকরোগুলো সেলাই করে বসতো আর দাদুর কাছ থেকে প্রচণ্ড গালিগালাজ খেত।

একদিন সন্ধ্যায় গ্রিগরি খাওয়া-দাওয়া সেরে রান্নাঘরে বেঞ্চির ওপর ঘুমোচ্ছিল। তখন আমার মামারা তার মুখে ম্যাজেন্টা রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিল। সাদা গাল ভরতি দাড়ি ; মাঝখানে চশমার কালো কালো দুটো কাচ—আর সেই কাচের ফাঁক দিয়ে লম্বা লাল নাকটা জিভের মতো ঝুলে থাকতো। এই সঙের মত সাজ নিয়ে গ্রিগরি ঘুরে বেড়াত। মুখে কোন প্রতিবাদ জানাত না। শুধু বিড় বিড় করে [illegible] কি যেন বলত। এরপর থেকে কাজের আগেই সাবধান হত। কাচি, চিমটে, ইস্ত্রিতে হাত দেবার আগে থুথু দিয়ে আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে নিয়ে তবে ধরতো। এমন কি খেতে বসবার সময় কাঁটা চামচে ছোওয়ার আগে আঙ্গুল থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিত। এতে ছোটরা কৌতুক বোধ করত, একটা ঘা খেলে ওর মুখের চামড়া কুঁচকে যেত। তারপর মুখের কোঁচকানি তলার দিক থেকে ওপরের দিকে উঠে যেত। মনে হত মাথার টাকের মধ্যে তা মিলিয়ে গেল।

গ্রিগরিকে নিয়ে এহেন তামাসা দাদু কি চোখে দেখতেন তা আমার জানা নেই। তবে দিদিমা চটে উঠত বিলক্ষণ। ঠাট্টাটা যখন সীমা ছাড়াত দিদিমা চীৎকার করে বলত, 'পাষণ্ড পিশাচ কোথাকার ! তোদের লজ্জা করে না···!'

ৎসিগানকের সামনে কিছু না বললেও তার আড়ালে আমার মামারা যা তা বলত। তারা ওকে মনে প্রাণে সহ্য করতে পারত না ; প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কাজে খুঁত ধরতো। চোর, কুঁড়ে বলে ওকে গালিগালাজ দিত। অবশ্য সবটাই ওর অলক্ষ্যে।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি কতবার, মামারা এরকম করে কেন ?

দিদিমা স্পষ্ট কথার মানুষ। জবাব দিয়েছিল, 'ওরা প্রত্যেকেই নিজেরা এক একটা কারখানা খুলতে চায়। ওদের ইচ্ছে ভানিয়া ওদের কারখানায় কাজ করুক। তাই একজন আরেকজনের কাছে ভানিয়ার নিন্দে করে। বজ্জাতি আর কাকে বলে ! দু'জনেই ভয় পায়, ভানিয়া হয় তো ওদের সপাট প্রত্যাখান করবে। তোর দাদুর কাছেই থাকতে চাইবে। তাই ওরা মিথ্যে করে লাগায়, নানা ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়। তোর দাদুও তো আর ঘাস খায়না। সে-ও পাকা লোক। হয়তো দেখবি ভানিয়াকে নিয়ে সে আরেকটা কারখানা খুলে বসেছে। তা যদি হয়, তবে তোর মামারাই দেখবি প্যাঁচে পড়বে।' নিঃশব্দে দিদিমা হাসতে থাকে।

'তোর দাদুও কি ওদের চালাকি বুঝতে পারেনা ? বেশ ভালই পারে। তাই তো ওদের ইচ্ছে করে ক্ষেপিয়ে তোলে। হয় তো বলে বসবে, 'ওরে শোন ;

ইভানকে একটা রিক্রুট সার্টিফিকেট কিনে দেব ভাবছি। তাহলে পল্টনে ওর ডাক পড়বেনা। ওকে ছাড়া তো আর কাজ চলবেনা, এটা তো ঠিক।' তা শুনে তোর মামারা তো খাপ্‌পা। এতে ওদের কারও মত নেই, সার্টিফিকেট কিনতে খরচ তো কম নয়,—পয়সাটা ওর খুব চেনে।

স্টীমারে কয়েক দিন যেমন কেটেছিল, আবার আমি তেমনি দিদিমার সঙ্গেই থাকছি। আর সন্ধ্যা বেলায় ঘুমোতে যাবার আগে দিদিমা আমায় রূপকথার গল্প অথবা ওর নিজের জীবনের গল্প বলত। ওর নিজের জীবনের গল্প সত্যিই রূপকথার মত চমৎকার। মাঝে মধ্যে সংসারের কথা উঠত। দাদুর সম্পত্তি ভাগের কথা অথবা দাদু নিজেও একটা নতুন বাড়ি করতে পারেন এ সব বলত। কথাগুলি বিকারহীনভাবে দিদিমা বলত। বিদ্রুপের সুরও ফুটে উঠত। তার কথা শুনে মনে হত এবাড়ির সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্কই নেই। যেন বাইরের লোক।

দিদিমার মুখেই শোনা যে ৎসিগানক কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। বসন্তের সূচনায় এক ঝড় বৃষ্টির রাতে বাড়ির সদরের পাশে একটা বেঞ্চিতে ওকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সামান্য এক টুকরো কাপড়ে জড়ানো। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল, চীৎকার করার ক্ষমতা ছিল না ওর।

'আচ্ছা দিদিমা, লোকে অতটুকু বাচ্চাকে এভাবে ফেলে দেয় কেন?'

'মায়ের কপাল এমন মন্দ হয় যে ছেলেকে একটু দুধ বা অন্য কিছু মুখে তুলে দেওয়ার অবস্থা থাকে না। অগত্যা উপায় থাকে না। তখন হতভাগিনী খোঁজ খবর নেয় কোন বাড়িতে সদ্য একটি বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। সেই বাড়ির আনাচে কানাচে বাচ্চাকে ফেলে আসে।' দিদিমা চুল আঁচড়াতে লাগল। মুখে কিছুক্ষণ রা'টি কাটল না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চলল, 'কি জানিস আলিওশা, এসবের পেছনে রয়েছে মানুষের দারিদ্র্য। এমন লোক আছে যাদের দারিদ্র্যের কথা মুখে বলে বোঝান যায় না। আর এমন অবস্থা যদি হয় যে মেয়ের বিয়ের আগেই বাচ্চা হয়ে গেছে তবে তো খুবই লজ্জার ব্যাপার! তোর দাদু কিন্তু চেয়েছিল ভানিয়াকে থানায় জমা দিতে। কিন্তু আমার তা ইচ্ছে ছিল না। আমি বললাম, কি দরকার বাপু; এতকুটু বাচ্ছাকে থানায় দিয়ে! আমাদের তো অনেকগুলো বাচ্ছাই মারা গেছে। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন। ওকে আমরাই মানুষ করি। আঠারোটা বাচ্ছাকে আমি পেটে ধরেছি। যদি সব ক'টা বেচে থাকত তবে গোটা একটা রাস্তা লাগত ওদের বাসের জন্যে। আঠার—হ্যাঁ আঠারটা বাড়ি। চোদ্দ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। পনের পেরতেই আমার প্রথম বাচ্চা হল। এক একটি বাচ্চা ভগবান দিয়েছেন, তারপর তিনিই আবার দয়া করে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন। কষ্ট পেতুম খুব, আবার আনন্দও হত।'

দিদিমা বিছানার ধারে বসে। পরণে শুধু রাতের পোশাক। মাথার কালো চুলে সারা শরীরটা ঢাকা পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সেই ভল্লুকীর মত, যাকে সেগার্চ এর জঙ্গল থেকে একটা চাষী আমাদের উঠোনে নিয়ে এসেছিল।

বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে, হাসতে হাসতে দিদিমা বলল, 'যারা ভাল ছিল, ভগবান তাদের টেনে নিয়েছেন। আর যেগুলো ওঁচা সেগুলোই রয়ে গেছে। ভানিয়াকে পেয়ে সেদিন মনে কী আনন্দ হয়েছিল। তোদের মতন বাচ্চা দেখলে সত্যিই আমার খুব ভাল লাগে; স্থির থাকতে পারি না। তখন থেকেই ভানিয়াকে-

মানুষ করছি। গির্জায় গিয়ে ওর নামকরণ করে এলাম। এখন দেখতে পাচ্ছিস তো কত বড় আর চমৎকার হয়েছে ছেলেটা। প্রথম প্রথম ওকে আমি গুবরে পোকা বলে ডাকতুম! ডাক শুনলেই ও হামাগুড়ি দিয়ে গুবরে পোকার মত গুন গুন শব্দ করে আসত। আলিওশা, ছেলেটা খুব সরল সিধে—ওকে একটু আপন করে নেবার চেষ্টা করিস।'

সত্যি বলতে কি, আমিও ইভানকে ভালবাসতাম। ওকে যতই দেখতাম, ততই আমার অবাক লাগত।

সপ্তাহে প্রতি শনিবার দাদুর দুটো কাজ বাঁধা ছিল। সপ্তাহের মধ্যে ছেলে মেয়েরা যে সব অপকর্ম করত তাদের শাস্তি দেওয়া; দ্বিতীয়, সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া। দাদুর প্রস্থানপর্ব শেষ হলে, রান্নাঘরে মজার মজার কাণ্ড কারখানা ঘটত। ভাষায় তা বলা যায় না। উনুনের পিছন থেকে কয়েকটা কালো কালো আরসোলা ধরে আনত ৎসিগানক; তৈরি হত সুতোর লাগাম আর কাগজের স্লেজ গাড়ি—আর তারপর সেই আরসোলা টানা স্লেজ গাড়ি ছুটত ঝক্‌ঝকে হলুদে রঙ লাগান টেবিলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। ছোট একটা কাঠি দিয়ে আরসোলাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে ৎসিগানক বলত, 'পাদরিমশাইকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি চলেছে।'

আরেকটা আরসোলার পিঠে একটা কাগজ এঁটে দেওয়া হত। আর তাকে ছুটিয়ে গাড়ির পেছনে নিয়ে যাওয়া হত। কারণ হিসেবে বলা হত, 'একটা ঝোলা ফেলে যাওয়া হয়েছে, তাই মঠের সন্ন্যাসীরা চলেছে পেঁছে দেবার জন্যে।'

তারপর আরেকটা আরসোলার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হত। মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে টাল খেতে খেতে আরসোলা এগোত। ভানিয়া উল্লসিত হয়ে বলত, 'পুরুত ঠাকুর শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে সান্ধ্য উপাসনায় চলেছেন।'

ভানিয়ার কতগুলো ইঁদুর ছিল। কায়দা মাফিক ভানিয়া ওদের নিয়ে খেলা দেখাত। দু-পায়ে দাঁড় করিয়ে ইঁদুরগুলোকে হাঁটাত। ওদের লম্বা লেজগুলো ঝুলঝুল করে দুলত পিছনের দিকে আর কালো গোল গোল চোখ পিট পিট করে দেখত। ইঁদুরগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নিজের মুখ থেকে চিনি খাওয়াত। আর মাঝে মাঝে চুমু খেত আর বলত, 'ইঁদুর ভারি বুদ্ধিমান জন্তু, মায়া মমতারও শেষ নেই। বাস্তুভূতের সঙ্গে এদের খুব ভাব। ইঁদুরকে যারা খাওয়ায় বাস্তুভূত তাদের কোন ক্ষতি করেনা।'

ৎসিগানক তাস আর পয়সা নিয়ে ম্যাজিক দেখাত। বাচ্চাদের মধ্যে ওর খুব কদর ছিল। তাস খেলায় ওকে পর পর কয়েকবার গাধা হতে হয়েছিল। এতে ভয়ানক চটে তাস ফেলে ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে গেল খেলা ছেড়ে। পরে নালিশ জানাত, 'ওসব কারসাজি। একজন আরেকজনকে চোখ টিপছে আর টেবিলের তলা দিয়ে তাস চালাচালি করছে। এর নাম খেলা! হাতের কারসাজি করলে সবাই জিততে পারে।'

ৎসিগনাকের বয়স উনিশ। চেহারাটা সবল গোছের। আমার মত জনাচারেক এক করলে যা হয় সেই রকম।

ছুটির দিনে সন্ধ্যায় ৎসিগনাকের কথা মনে পড়লে যেন তাকে দেখতে পাই ছবির মত। আমার দাদু ও মিখাইল মামা ছুটির দিনে সন্ধ্যায় দেখা সাক্ষাতের

পালা শেষ করতে যেত। আর ইয়াকভ মামা তার রুক্ষ বেশে বসে গীটার বাজাত। দিদিমা জলখাবারের ব্যবস্থা করতেন। প্রচুর খাবার আসত। লাল ফুলের নকশা কাটা একটা সবুজ পাত্র থেকে ভদ্‌কা ঢালা হত। ছুটির দিনে পোশাক পরে ৎসিগানক লাট্টুর মত চরকি খেয়ে ঘুরে বেড়াত। গ্রিগরি একপাশে হেলিয়ে পড়া দেহটাকে নিয়ে এসে ঢুকত। চোখে কালো চশমা। কাঁচ দুটো জ্বল জ্বল করত। ইয়েভগেনিয়া আমাদের ধাই। মুখে বসন্তের দাগ। জালার মত মোটা আর ছোট ধূর্ত চোখ, আর গলার স্বরটা নীচু। উস্পেনস্কি গির্জার পুরুত, পুরুত, যার সারা শরীরে লোম—প্রায়ই আসতেন। এছাড়া আরও জন কয়েক আসতেন যাদের চেহারা স্পষ্ট মনে নেই; রোগা আর কালো সেই মানুষগুলো। ওদের ছায়া ছায়া কায়া অস্পষ্ট মনে আছে। প্রচুর পানাহার করত সবাই। আর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলত। বাচ্চাদের জন্যে মিষ্টি মদের ব্যবস্থা ছিল। আস্তে আস্তে একটা উৎসবানন্দ জমে উঠত। ইয়াকভ মামা গীটারে সুর বাঁধত। সুর বাঁধা হলে বলত, 'তাহলে আমি এবার শুরু করি।' কোঁকড়ানো চুলগুলো ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ত গীটারের ওপর; হাঁসের মত গলা বাড়িয়ে দিত। নিশ্চিন্তমুখে ফুটে উঠত স্বপ্নালুতা। তেলতেলে মুখে পর্দার মত উজ্জ্বল চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠত। আলতো হাতে আঙ্গুল চালাতেই সুর জেগে উঠত। আর সেই সুরে চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

সেই সুরে মুখের কথা স্তব্ধ হয়। মনে হয় স্রোতস্বিনীর ধারা দেওয়াল আর মেঝের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

বুকের ভেতরটা ভারী আর অশান্ত হয়ে ওঠে। কেমন যেন দুঃখ হয়; দুঃখ হয় নিজের জন্যে, আর সকলের জন্যে। বড়দের বয়স যেন কমে যায়; স্থির হয়ে বসে থাকে সবাই। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। মিখাইলের ছেলে সাশা সাগ্রহে সুর শোনে। চোখের দৃষ্টি তার গীটারের দিকে, মুখে যেন লাল ঝরে; সমগ্র শরীরটা যেন ঝুঁকে পড়ে যন্ত্রটার ওপর। সুর শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় সে। ভারসাম্য হারিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যায় মাটিতে। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে। তার দৃষ্টিতে এক গভীর শূন্যতা। সেই সুর সবার মনকে স্পর্শ করে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে থাকে সবাই! শুধু শোনা যায় সামোভারের একটানা গুঞ্জন। ছোট দুটো জানলা। জানলার বাইরে শারদ রাত্রির ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে জানলার শার্সিতে কে যেন টোকা মারে। মোমবাতি দুটোয় হলুদ শিখা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। দেখে মনে হয় বর্শার তীক্ষ্ণ ফলক।

ইয়াকভ মামা যেন ঘুমিয়ে পড়ে। আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে ডুবে যায় সে। কিন্তু ঘুম নেই তার হাতের। হাত দুটো যেন অন্য প্রাণে ডগমগ।

ডানহাতের বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলো যেন গীটারের কালো ফাকের ওপর থর থর কাঁপে। তার বাঁ হাতটা ওঠানামা করে তারের এক ঘাট থেকে আরেকটায়। মনে হয় একটা পাখি যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। মদ খেয়ে সে রোজ একই গান গায়। গলার স্বরটা মিহি নয়; বরঞ্চ কর্কশ বলা যায়। চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে গান। ইয়াকভ গায়ঃ

যদি ইয়াকভ হত এক কুকুরছানা
তার ঘেউ ঘেউ ডাকে পড়শীদের ঘুম

কোথায় উবে যেত, তা নেইকো জানা—
হে প্রভু, তুমি পরম দয়াময়।
সারহীন এ জীবনটারে সওয়া ভীষণ দায়!
মঠবাসিনী পথ চলে সে পায়ে পায়ে
কাকটা এসে ডাকে যেন অতি কাছে
সারহীন এ জীবনটারে সওয়া ভীষণ দায়!
ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায় উনুন ধারে
ব্যাঙ ডেকে যায় আঁধার ঘেরা ঝোপে ঝাড়ে
সারহীন এ জীবনটারে সওয়া ভীষণ দায়!
ভিখিরী এক আচ্ছাদনটা মেলে যেমন দেয়
আরেকজনার দৃষ্টি পড়ে তায়,
সারহীন এ জীবনটারে সওয়া ভীষণ দায়!
নিরেট নীরস জীবনটারে সওয়া ভীষণ দায়—
প্রভু, তুমি পরম দয়াময়।

এ গান যখনই হত, আমি সহ্য করতে পারতাম না তা। যখন ভিক্ষুকের প্রসঙ্গ উঠত, তখনই চোখ ফেটে জল আসত আমার। সে জল যেন থামতে চাইত না। ৎসিগানকও তন্ময় হয়ে গান শুনত। গান শুনতে শুনতে মনের আবেগে যেন সে উথলে উঠত। সে আক্ষেপের সুরে চেঁচিয়ে উঠত এই বলে, 'হায়রে আমার যদি এমন গলা থাকত! তবে কত গানই না গাইতাম!'

দিদিমা গান শুনতে শুনতে উতলা হয়ে উঠত। বলত: 'ওরে গানটা থামা, বুকটা যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে!' ভানিয়া, তুই একটা নাচ দেখা!

দিদিমার কথামত যে সব সময় তা করা হত এমন নয়। গায়কও মাঝে মধ্যে আবেগ উতলা হত। সে এই গভীর শূন্যতার মাঝে সুরের মূর্চ্ছনা বন্ধ করে বুনো ষাঁড়ের মত অতর্কিতে চীৎকার করত, 'এই বিষণ্ণতাকে ভেঙ্গে খান খান কর। এসহ্য করা দায়! ভানিয়া উঠে পড়।'

ভানিয়া উঠে দাঁড়ায়। পরনের পোশাকগুলো সামলে নেয়। তারপর ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ায়। হাঁটার ভাব দেখে মনে হয় সে যেন পিচ্ছিল পথে চলছে।

'ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ একটু জোরে বাজান।' বিনম্র ভঙ্গীতে অনুরোধ জানায় সে।

গীটারে যেন সুর বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। মেঝের ওপর পায়ের তাল ঠোকার শব্দ হয়। ৎসিগানক নাচ শুরু করে। সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে, হাত দুটো মুক্ত বিহঙ্গের ডানার মত স্পন্দিত হয়। পায়ের ছন্দকে অনুসরণ করা দৃষ্টির অসাধ্য হয়ে পড়ে। নাচতে নাচতে ৎসিগানকের মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হয়। মেঝেতে বসে পড়ে সে। তারপর সোনালী লাট্টুর মত ঘুরপাক খায়। পরণের সিল্কের জামায় আলো পড়েছে। ঝলমল করছে। সেই আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। নাচতে ৎসিগানকের ক্লান্তি নেই। শ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে না সে। আত্মহারা হয়ে সে নাচে। মনে হয় গণ্ডীর সীমা পার হয়ে সে নাচতে নাচতে চলে যাবে কোন এক অজানা দেশে! দরজা খোলা পেলে পথে, পথ ছেড়ে শহর ঘুরে, দূরে—অনেক দূরে।

ইয়াকভ মামা তাল দেয় ওকে। চেঁচিয়ে উঠে তারিফ করে—'সাবাস!' শিস দিতে দিতে ভাঙা গলায় গান গায়ঃ

পথের মাঝে জুতা জোড়া ছিঁড়ে হল বাধা
বউকে ছেড়ে পালিয়ে যেতাম আমি তবে সোজা।

এ গানের রেশ শ্রোতাদের মনে ছোঁওয়া দেয়। মুখ থেকে নানা শব্দ ভেসে আসে। চীৎকার করে ওঠে কেউ কেউ। দাড়িওয়ালা কারিগর টাক মাথাতে টোকা দিয়ে যেন তাল খোঁজে। নিজের মনে বিড় বিড় করে সে। একদিন গ্রিগরি গান শুনতে আমার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। কাঁধে লেগে ছিল ওর নরম দাড়ির স্পর্শ। বড়দের চাপাগলার কথা বলার মত ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তোমার বাবা এখানে থাকলে কী ভালই না হত। সবাইকে আরো অনেক অনেক মাতাতে পারত! খুব আমুদে মানুষ ছিল। মনে পড়ে তোমার বাবাকে?'

'না।'

'সত্যি? জান! তোমার বাবা আর দিদিমা…আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর!'

লম্বা আর রোগা চেহারাটা নিয়ে দাঁড়াল সে। দিদিমাকে প্রণাম করে বলল, 'আকুলিনা ইভানোভনা আপনি দয়া করে যদি আমাদের সবাইকে নাচ দেখান তবে আমরা সকলেই খুশি হই। মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের সাথে যেমন নাচতেন ঠিক তেমনি যদি আজ করেন তো খুব ভাল হয়। আজ আমার এ অনুরোধ।'

'তুমি কি উন্মাদ? কি বলছ, গ্রিগরি ইভানোভিচ! ওমা, কী লজ্জার কথা।' বলে হেসে উঠল দিদিমা। আরো জড়সড় হয়ে বসল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'এই বয়সে যদি আমি নাচি তাহলে লোকে কি বলবে; হেসে কুটো পাটি খাবে।'

এদিকে সকলেই নাছোড়বান্দা। দিদিমাকে নাচতেই হবে; সবার আব্দার, অনুরোধ। সকলের অনুরোধে দিদিমা উঠে দাঁড়াল। ঠিক যেন তরুণী মেয়ের মতন নাচের আসরে এসে দাঁড়াল। পরণের গাউনটা ঠিক করে মেরুদণ্ডটা খাড়া করে নাচের ভঙ্গিতে মেঝেয় চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাসুক, যত খুশি পারে হাসুক! ইয়াকভ সুরে তাল দেবে!'

ইতিমধ্যে ৎসিগানক নেমে পড়েছে নাচের আসরে। দিদিমার পাশে পাক খেয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিয়েছে সে। দিদিমা বাতাসে উড়ে বেড়ানর মত মৃদু তালে নাচছে, তার হাতের মুদ্রা ভ্রূ-যুগলের ইশারা আর চোখের চাওনিতে লীলায়িত ছন্দ। দিদিমাকে নাচতে দেখে আমার হাসি পেল। হাসি চাপতে গিয়ে পারলাম না। একটা বিকট শব্দ বের হয়ে এল। বড়রা বোধ হয় সবাই এতে অসন্তুষ্ট হল। গ্রিগরী আমায় ধমক দিল। গ্রিগরি হাসি হাসি মুখে বলল, 'ইভান সরে এস।' ৎসিগানক ধীরে ধীরে নাচের আসর ছেড়ে চৌকাঠে এসে বসে পড়ল। আর তখন ভরাট গলায় ইয়েভগেনিয়া-ধাই গান জুড়ে দিল:

হাজার কাজের ফাঁকে নেই কোন অবসর
লেসের মালা গেঁথে চলে তন্বী নিথর,
হাতের আঙ্গুল শুকিয়ে এল আপনা থেকে
পাংশু, ধূসর, লাবণ্য—নেই মুখে চোখে।

দিদিমার নাচ দেখে মনে হয় যেন গল্প বলে চলছে নাচের ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার অঙ্গের প্রতি প্রান্ত দোলে। উত্তোলিত বাহু ভঙ্গিমার তালে তালে চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়। পায়ে পায়ে পথ খুঁজে দ্বিধা ভরে নড়ে চড়ে। হঠাৎ এক সময়ে সারা শরীরটা যেন থমকে দাঁড়ায়। মুখে যেন এক অজানা ভীতির ছাপ। ভ্রূ-যুগল কুঁচকে যায়। আবার কোন সময়ে হাসির আলোয় সারা দেহটা ঝলমল করে ওঠে। তখন প্রচণ্ড উল্লাসে সারা শরীর আন্দোলিত হয়। সারাটা দেহ যেন লম্বা হয়ে ওঠে। তার শরীরে তারুণ্যের উচ্ছল ধারা যেন বয়ে যায়। সেদিক থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না।

এদিকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই গেয়ে চলে:

রবিবারের উপাসনার অন্তে
ভোরের আলো উঠল যখন ফুটে,
সোমবারটা এসে গেল এক নিমেষে—
খুশিভরা ছুটির দিনটা গেল কেটে।

নাচ শেষ হলে দিদিমা নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ে; সামোভারের পাশে। সবাই প্রশংসা করে তার নাচের। সচকিতে দিদিমা প্রতিবাদ করে ওঠে, বলে, 'থাক্, খুব হয়েছে। নাচ কাকে বলে তা দেখনি তোমরা।' নাচের জন্যে মাথার চুল গুলো এলো মেলো হয়েছিল, তা হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বলল, 'তাহলে শোন, তোমাদের একটা মেয়ের কথা বলি। বালখনাতে তখন আমি থাকি। ওখানকারই মেয়ে। তার নাম কি, কোন্ বাড়ীতে সে থাকত আজ তা আমার মনে নেই। কিন্তু সে যা নাচত! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার মত। চোখের দৃষ্টিটা যেন নিবদ্ধ হয়ে যেত আপনা থেকেই। সেই নাচের তাল, ছন্দ মনে আনত শিহরণ। চোখ ফেটে মনের আবেগে জল বের হয়ে আসত। তার নাচ দেখে মন ভরে যেত। কী হিংসেই না হত আমার!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুব গম্ভীর ভাবে বলল, 'নাচিয়ে আর গাইয়েরাই তো আসল রত্ন।' তারপর সে রাজা ডেভিডের সম্পর্কে একটা গান শুরু করল। ৎসিগানকের গলা জড়িয়ে ধরে ইয়াকভ তখন বলল, 'তোমার কোন সরাইখানায় নাচা উচিত। তোমার নাচ দেখতে লোক সরাইখানায় ভীড় করবে।'

ৎসিগানক জবাব দেয়, 'আমি গান গাইতে চাই। ভগবান যদি আমায় গানের গলা দিতেন, তাইলে সারা রাতদিন আমি শুধু গাইতাম। গান শেখার জন্যে যদি আমায় মঠে থাকতে হয়, তাতেও আমি রাজী।'

সকলে ভদ্‌কা খাচ্ছে, বিশেষভাবে গ্রিগরি পরিমাণে একটু বেশি খায়। দিদিমা ওকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢেলে চলল। দিতে দিতে মাঝে মাঝে বলল, 'অত বেশি খেয়োনা, অন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রিগরি জবাব দেয়, 'এ পৃথিবীর যা দেখার, তা অনেক দেখেছি। অন্ধ হলে এখন আর দুঃখ নেই।

এত মদ খেয়ে নেশা লাগে না তার। শুধু বক্ বকানি বেড়ে যায়। ভদ্‌কার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর কথা বলছে। বলছে আমার বাবার কথা।

'বড় দরাজ প্রাণের মানুষ ছিল সে! আমার প্রাণের দোস্ত ছিল সে। মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ!'

দীর্ঘ শ্বাস ফেলে দিদিমা বলল, 'আহা অনাথ বাছা আমার!'

এসব কথা আমি সাগ্রহে শুনছিলাম। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন একটা মিশ্র পরিবেশে ভরে যায়। একদিকে অনাবিল আনন্দ, অন্যদিকে করুণ বিষন্নতা। দুইয়ে মিলে ভারি সুন্দর। একই সঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মানষের মনকে বার বার ছোঁওয়া দেয়। কখনো একটার প্রতিক্রিয়া কাজ করে বেশি, কখনো আরেকটার। ইয়াকভ মামা মদ খেলেও, নেশাটা তেমন জমেনি। হঠাৎ সে নিজের গায়ের জামাটা খুলে ছিঁড়তে থাকে। নিজের মুখে খামচিকাটে, গোঁফ ধরে টানে। তারপর সে কী কান্না!

'কেন? কেন এমন ধারা ঘটে? নিজের হাতে নিজেকে আঘাত করে। বুকে, গালে, কপালে আঘাতের পর আঘাত। তারপর কান্না ভেজা গলায় বলে 'আমি একটা হতভাগা! কাপুরুষ আমি! আমার দ্বারা কিছুই হবেনা..। নরকে ঠাঁই হবেনা আমার।'

'ঠিক কথা বলছ।' গ্রিগরি জবাব দেয়।

দিদিমা ইয়াকভ মামার হাতটা চেপে ধরে; বলে, 'থাম্ বাছা তুই! ভগবান আমাদের কতটুকু শেখান উচিত তা তাঁরই জানা আছে।'

মদের নেশা ধরেছিল দিদিমারও। নেশাতুরা হলে তাকে ভারি সুন্দর দেখায়। রূপ যেন খুলে যায়। চোখের দীপ্তি যেন আরো উজ্জ্বল হয়। গালে যেন সিঁদুরে রঙ লাগে। রুমাল নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে আধো আধো কণ্ঠে বলে, 'ভগবান কী সুন্দর তোমার সৃষ্টি।' অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কথাটা ভেসে আসে। এই বুঝি তার জীবনের চরম অভিজ্ঞতার বাণী।

ইয়াকভ মামাকে সব সময়েই আমার বেপরোয়া মনে হত। কিন্তু তাকে এমন অসহায় ভাবে কাঁদতে আর কপাল চাপড়াতে দেখে আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম-'কেন এমন হয়?'

প্রশ্ন শুনে দিদিমা বোধহয় একটু চটে উঠেছিল। বলেছিল, 'সব ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি জানার কী দরকার? সব ব্যাপারে নাক গলান ভাল নয়। ঢের সময় আছে, সবই জানবে ধীরে ধীরে।'

এতে আমার কৌতূহল বেড়ে ছিল। ইভানকে কারখানায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। জবাব দেয়নি সে। এড়িয়ে গেছে। কারিগরের দিকে চেয়ে শুধু হেসেছে আর আমাকে কারখানা থেকে বিদেয় করে দিয়েছে।

বেশি পীড়া-পীড়ি করলে বলেছে, 'আর একটা কথাও নয়। এবার, আর একটা কথা বললে রঙের গামলায় চুবিয়ে ছাড়ব।'

কারিগর উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লাঠি দিয়ে গামলার ভেতর নাড়া চাড়া করছিল। মাঝে মাঝে লাঠিটা তুলে ধরে রঙটা কেমন হয়েছে দেখছিল। গনগনে আগুনের আভা এসে পড়েছে ওর গায়ের এপ্রনে। এপ্রনটা অনেকটা পাদ্রীদের আলখাল্লার মত। গামলাতে রঙীন জল ফুটছে আর ঘরটা একটা ঝাঁঝাল গন্ধে ভরে গেছে।

লালাভ চোখ তুলে কারিগর চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল, প্রথমটা আমার দিকে। তারপর ইভানের দিকে, হুঙ্কার করল, 'উনুনে আঁচ কমছে, কাঠ দিতে হ'বে খেয়াল নেই! চোখ নেই নাকি?'

কাঠ আনতে ইসিগানক ছুটে গেল। তখন একটা লাল চন্দন রঙের বস্তার ওপরে বসে গ্রিগরি আমাকে ডাকল। বলল, 'এদিকে শুনে যাও তো।'

আমাকে কোলের ওপর বসাল। তার নরম দাড়িব স্পর্শ লাগল আমার গালে। তারপর সে যা বলল সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

'তোমার মামা তার বৌকে পিটিয়ে মেরেছে। তার সেই হত্যার পাপের দংশন তাকে যেন কোন সময়ে শান্তি দিচ্ছে না। সব কথাই জানা ভাল ; চোখ কান খুলে রেখে চল, না হলে পস্তাতে হবে।'

দিদিমার মত গ্রিগরির সাথেও ভাল ভাবেই কথা বলা যায়। কিন্তু তার বলার ভঙ্গিতে গা শির শির করে। কালো চশমার ফাঁক দিয়ে যখন সে তাকায়, তখন মনে হয় অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত যেন সে দেখছে।

নির্বিকারভাবে সে বলল, 'কেমন ভাবে বৌটাকে মারল ? বৌয়ের সঙ্গে রাতে শুতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গে জড়াল কম্বল আর তারপর শুরু হয়ে গেল কিল, চড়, লাথি, ঘুষি। এমন ভাবেই রাতের পর রাত চলে। শেষ পর্যন্ত এ পীড়ন আর সহ্য করতে পারল না, শেষ বেশ মরেই গেল বৌটা। সে কিন্তু নিজেই জানত না, কেন সে এত মারপিট করে।'

ইভান এতক্ষণে কাঠ নিয়ে এসে পড়েছে। সে উনুনে কাঠ গুঁজতে লাগল। গ্রিগরি ওর সামনে বলতে দ্বিধা করল না। বলতে থাকল, 'কেন মারপিট করত রোজ ? বৌয়ের ওপর ছিল প্রচণ্ড হিংসা। কোন দিক দিয়ে টেক্কা দিতে পারত না সে। আসল কথা কি জান, কাশিরিনরা কোন ভাল কিছু সহ্য করতে পারে না। ভাল দেখে, নিজেরা ভাল হ ; শেখ কেমন ভাবে ভাল হতে হয়—তা নয়, ভাল কিছুর অস্তিত্ব নাশ করতে উঠে পড়ে লাগে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমার বাবার কি পরিনাম হয়ে ছিল এ বাড়ীতে। দিদিমার কাছেই সব জানতে পারবে। আশাকরি দিদিমা তোমাকে কিছু গোপন করবেন না। তোমার দিদিমাই হলেন খাঁটি মানুষ, যাকে বলে সাচ্চা! তাঁর কাছে ছলচাতুরী খাটে না। ছলচাতুরী নিজেও করেন না কখনো। মাঝে মধ্যে মদ খান বটে, নস্যিও নেন ; তবু,—তবু মানুষটা ভাল। একটা কথা, কখনো যেন ওর কাছ ছাড়া হয়ো না ভায়া...।'

এরপর গ্রিগরি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠোনে সরে এলাম। বারান্দায় আসার আগে ভানিয়া আমার কাছে এল। কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'ওকে ভয় করার কিছু নেই, লোকটা বড্ড ভাল। ওর দিকে সোজাসুজি চেয়ে লোকে কথা বলুক, এটাই ও চায়। তা-ই ও পছন্দ করে।'

সব কিছু উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে। অন্য ধরণের জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। অস্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়ল আমার বাবা-মা অন্য ধরনের জীবন কাটিয়েছেন। তাদেব কথাবার্তা আর আনন্দ-স্ফূর্তির কায়দা কানুন ছিল স্বতন্ত্র ধাঁচের। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন, চলেছেন। কোথাও কোন ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যার অবসরে ওরা দুজনায় মুখোমুখি বসে গল্প করতেন অথবা প্রাণ খুলে হাসতেন, কোন কোন সময়ে গান গাইতেন। সেই গান আর হাসির শব্দে নীচে লোক জমতো। ওরা মুখ উঁচু করে তাকাত! ওদের দেখে আমার মনে হত কত

কথা। অথচ এখানে পরিবেশটা একেবারে আলাদা। এখানে সহসা কেউ হাসে না, যদি বা হাসে তা-ও রহস্যের হাসি ; বোঝা যায় না তা। সারাটা সময় চলে গালিগালাজ, হুমকি, শাসানি, । বাচ্চারা এখানে যেমন-তেমন ভাবে মানুষ হয়। কারো নজর নেই ওদের দিকে। চরম অবহেলা এদের প্রতি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ওদের বেদম মার খেতে হয়। এ বাড়ীর পরিবেশ ভাল লাগে না আমার। যা কিছু হচ্ছে তা কৌতুহলের সঙ্গে দেখছি। চোখ কান খোলা রেখে লক্ষ্য করি সব কিছু।

ইভানের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা বাড়ে। সকাল থেকে রাত অবধি আমার দিদিমা গেরস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকে। সেইহেতু ৎসিগানকের সাথে আমার সময় কাটে। দাদু যখন আমায় শাস্তি দেন, প্রহার করেন, তখন ৎসিগানক আমাকে রক্ষা করে ; রক্ষা করতে গিয়ে ওর গায়ে দু-চার ঘা পড়ে। পরদিন আঘাতে ফোলা জায়গাটা দেখিয়ে শাসিয়ে বলে, 'আর তোমায় বাঁচাতে যাচ্ছি না। তোমার জন্যেই আমার এ শাস্তি। এই শেষ! পরে কপালে যা আছে তাই হবে।'

পরে যখন আবার এমন অঘটন ঘটে, তখন সে তেমনি অনর্থক শাস্তি ভোগ করে।

'কী বলে ছিলে না যে, তুমি এ ব্যাপারে আর থাকবে না ?'

'কথা আর কাজ তো এক জিনিষ নয়, কখন যে আমি হাত বাড়িয়েছি তা নিজেই টের পাইনি।'

কিছুদিনের মধ্যেই ৎসিগানকের সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে পারি। শুনে ওর সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়।

প্রতি শুক্রবার ৎসিগানক বাজারে যায়, সারা সপ্তাহের খাবার কেনে। স্লেজ গাড়িটার সাথে লাল রঙের ঘোড়া শারাপকে জুড়ে দেওয়া হয়। (শারাপ আমার দিদিমার আদরের ঘোড়া। কিন্তু বজ্জাতি ওর ষোল আনা। মিষ্টি খায় বেদম)। মাথায় টুপি, আঁট-সাট চামড়ার পোশাক আর কোমরে উড়ুনী এঁটে সে বের হয়। কোন কোন সময়ে বাজার থেকে ফিরতে অনেক দেরি হয় ; সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তুষার-ঢাকা জানলা দিয়ে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায় না, শার্সিটা সাফ করে দিয়ে দেখা হয় বাইরের রাস্তা।

'কি রে এল ?'

'দেখছি না তো।'

দুশ্চিন্তাটা আমার দিদিমার বেশি। স্বামী আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দিদিমা গর্জে ওঠে ; বলে, 'তোমাদের জন্যে এই ছেলেটা আর ঘোড়াটা মরবে। নিল'জ্জ বেহায়া কোথাকার! বিবেক বলে কিছু নেই ? নিজেদের যা জুটছে তাতে খুশি নয়! বোকা, লোভীর দল! দেখ, এরজন্য ভগবানের তরফে সব শাস্তি মাপা থাকবে। এর ফল পেতে হবে তোদের।'

দাদামশাই বিড় বিড় করে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, 'না আর পাঠাব না, এই শেষ।'

ৎসিগানকের ফিরতে কোন কোন সময় দুপুর গড়াত। উঠোনে গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বের হয়ে আসত ; দাদামশাই, মামারা। পেছনে পেছনে দিদিমাও বের হয়ে আসত ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টেনে ভাল্লুকের মত শব্দ করতে করতে। এ সময়ে তাকে বড় এলোমেলো মনে হত। বাচ্চারাও বের হয়ে আসত, মহা

উল্লাসে গাড়ি থেকে মালপত্তর নামান হত। জিনিষপত্তর ঠাসা গাড়ি ; আস্ত শূয়োর ছানা, মাছ আর নানা আকারের মাংসের টুকরো।

দাদু একনিমেষে স্লেজ গাড়ীটা একবার তাকিয়ে দেখে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কি হে, যা আনতে বলেছিলাম তা সব আনা হয়েছে ?'

আনন্দে লাফিয়ে ইভান জবাব দেয়, 'একটা জিনিষও বাদ যায়নি।' হাত দুটোকে গরম করার জন্য দাস্তানা নাখুলেই হাতে হাত ঘষাঘষি করে সে।

দাদু কড়া ধমক দেন, 'দস্তানা শুদ্ধ অমন ভাবে হাত ঘষাঘষি কোরনা—দস্তানা কিনতে পয়সা লাগে। খুচরো কিছু ফেরৎ হয়েছে কি ?'

'না।'

গাড়ীটার চার পাশে পাক খেয়ে দাদু বিড় বিড় করে বলেন, 'এ যে দেখছি বাজার শুদ্ধ এনে হাজির করেছ! এ কি আর বিনে পয়সায় হয়েছে! বলে রাখছি, আর যেন এমন না হয়।'

মুখটাকে বিকৃত করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

এরপর মামারা গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মুরগী, মাছ, বাছুরের ঠ্যাঙ আর মাংসের টুকরোগুলোর কোনটার কি ওজন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'বাঃ, চমৎকার বাছাই করেছ কিন্তু—বেশ, ভাল।' তারিফ করার ভঙ্গীতে চীৎকার করে আর শিস দেয়।

বিশেষ মিখাইল-মামা গদগদ হয়ে ওঠে। স্লেজ গাড়ির চার পাশে এমন লাফালাফি করে, যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগান রয়েছে! কাঠঠোকরার মত শুঁকে শুঁকে দেখে, জিভে যেন জল আসে। ঠোঁট চাটে ; আবেশে ভরে আসে চোখ দুটো। বাপের মতই ওর চেহারার গড়ন। তবে আরও লম্বা আর মিশ কালো।

'বুড়ো বাজারের জন্য কত দিয়েছিল ?'

'পাঁচ রুবল।'

'এখানে যা মাল আছে তার দাম নিদেনপক্ষে পনের রুবল। কত খরচ হয়েছে তোমার ?'

'চার রুবল দশ কোপেক।'

'তার মানে নব্বই কোপেক ফেরত হয়েছে। শুনছ তো ইয়াকভ ? পয়সা রোজগারের এও এক ফিকির।'

ইয়াকভ-মামা হাসে। ঠাণ্ডায় শুধু তার গায়ে একটা শার্ট ছিল, আর দৃষ্টি ছিল ঝাপসা আকাশের দিকে। তারপর হেসে হেসে বলে, 'তাহলে ভানিয়া এখন আমাদের এক গ্লাস করে খাইয়ে দাও।'

দিদিমা ঘোড়ার লাগাম খুলছিল। আপন মনে বিড় বিড় করে বলছিল, 'বুঝেছি, খেলাব ইচ্ছে হয়েছে আমার সোনার! তা যাও, খেলা করে এস। একটু-আধটু খেলা করলে দোষ নেই। ভগবানের কাছে কোন দোষ নেই।' সেই প্রকাণ্ড শারাপ ঘোড়াটা দিদিমার ঘাড়ে তার বড় বড় দাঁত দিয়ে আদর করে। টেনে খুলে ফেলে ওর মাথার রুমালের আবরণটা। খুশিতে উজ্জ্বল দৃষ্টি বিনিময় হয় দিদিমার সাথে। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের পাতা থেকে তুষারের কণাগুলো ঝেড়ে ফেলে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করে, 'একটুকরো রুটি খাবে বাছা ?' মস্ত একটুকরো

রুটিতে নুন মাখিয়ে গুঁজে দেয় ঘোড়ার মুখে। ঘোড়া রুটি খায়; এপ্রনটা তলায় মেলে দিদিমা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায় ঘোড়ার দিকে।

বাচ্চা ঘোড়ার মতই লাফ-ঝাপ দিয়ে ৎসিগানক এসে হাজির হয়। বলে, 'ঠাক্‌মা, কি সুন্দর ঘোড়াটা—তাই না? কী বুদ্ধিমান?'

'যা, যা, পালা! এখানে ঘুরঘুর করিস না। তোকে বলেছি না, হাটের দিনে তুই আমার কাছে ঘেষবিনা।'

পরে একদিন দিদিমা আমাকে রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছিল। ৎসিগানক বাজার গিয়ে যতটা কেনে তার চেয়ে ঢের বেশি চুরি করে।

বিরক্তির সঙ্গে দিদিমা বলেছে, 'এই ধর পাঁচ রুবল দাম দেওয়া হল বাজারের জন্য। তিন রুবল খরচ করল আর দশ রুবলের মত মাল চুরি করে আনল। হতভাগাটার চুরি করা যেন এক নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।...এরজন্য প্রথম প্রথম সবাই ওর তারিফ করত। হাত সাফাইয়ে তারিফ পেতে পেতে এখন সেটা ওর পুরোপুরি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর তোর দাদুর হাতে প্রথম জীবনে পয়সা ছিলনা, বুড়ো বয়সে পয়সা এলেও তা বের করতে চায়না। পয়সার ওপর খুব টান। ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি টান। পয়সা না দিয়ে মাল আসছে, তাতেই খুব খুশি। আরমিখাইল, ইয়াকভের কথা যদি বলিস তো ?'

নস্যির কৌটা থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে হাত নেড়ে দুজনার গুরুত্বটা উড়িয়ে দিল দিদিমা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আলিওশা, এ যেন এক অন্ধ বুড়ীর হাতে জট পাকানো ফিতে। আসল নক্‌শাটা যেন চেনা দায়। তবে ভানিয়া যদি এই বিদ্যেতে ধরা পড়ে কখনো, তবে আমি ওকে মারতে মারতে খুন করে ফেলব।'

দিদিমা খানিক চুপ থাকার পর কেমন যেন নরম হয়, মিহি গলায় বলে, 'একবার ভাবত আলিওসা, 'নীতিকথা তো সবাই বলে, কিন্তু নীতি পালনের সময় সব ফাঁকা।'

পরের দিন ৎসিগানককে একরকম হাতেপায়ে ধরে অনুরোধ করলাম চুরি না করার জন্য। বললাম, 'যদি ধরা পড়ে যাও তবে দিদিমা তোমায় খুন করবে।'

'ইস্—ধরা অত সোজা? ধরতে পারলে তো! দেখিস আমি ঠিক পগার পার হয়ে যাব। আমার ঢের বুদ্ধি আছে। আর ঘোড়াটাও বাহাদুর, যা ছোটে না।' এই বলে হেসে ওঠে সে। কিন্তু হাসিটা ক্ষণিকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওর সারা চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিমর্ষ ভাব। বলে, 'তুমি কি ভাবছ জানিনা। তবে চুরি করা পাপ, অন্যায়—আমি জানি। তবু আমি চুরি করি। ভাবছ, এ পয়সা আমি কামাই করি। কিন্তু বিশ্বাস কর, ওই পয়সা আমি জমাই না, ছুঁইওনা। তোমার মামারাই ওই পয়সা ওড়ায়। আমার তাতে বয়ে গেছে। আমার তো আর খাবার ভাবনা নেই।'

সে হঠাৎ দু-হাতে আমার দেহটা তুলে ধরে, তারপর ঝাকুনি দিয়ে বলে, 'তোমার হাড় শক্ত আছে। বড় হলে জোয়ান চেহারা হবে। আমি বলছি, তুমি গীটার শেখ। ইয়াকভ-মামাকে বলে গীটারটা শিখে নাও। হ্যাঁ, ঠাট্টা নয়। অবশ্য এখন তুমি বাচ্চা আছ, কিন্তু তুমি সমঝদার। আচ্ছা, তোমার দাদুকে তুমি পছন্দ করনা, কেমন ?'

'জানিনা।'

'এক ঠাক্‌মা ছাড়া কাশিরিন্‌দের কেউ ভাল নয়। ওদের কাউকে দু-চোখে দেখতে পারি না, সবার পেটে পেটে শয়তানি। ওদের একটাও ভাল নয়।'

'আর আমি ?''

'তুমি ? তুমিতো আর কাশিরিন্ নও ; তুমি তো পেশ্‌কভ। তোমরা আলাদা বংশের, একেবারে আলাদা পরিবারভুক্ত।'

হঠাৎ কোন আবেগে সে আমায় জড়িয়ে ধরে কান্না ভেজা গলায় বলে, 'আমি যদি গান জানতাম! গান গেয়ে লোকের মতিগতি পাল্টে দিতাম। আচ্ছা চলি আজ, কাজ শুরু করতে হবে এখন।'

আমাকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে একমুঠো পেরেক মুখে ভরে নিয়ে কাজ শুরু করল। মস্ত একটা চৌকিতে ভিজে কালো কাপড় লাগাতে শুরু করল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ৎসিগানকের মৃত্যু হয়।

ব্যাপারটা ঘটে এভাবে ঃ গেটের কাছে উঠোনের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে মস্ত এক ওক্‌কাঠের ক্রুশ রাখা ছিল। ক্রুশের তলার অংশটা থামের মত মোটা। অনেক দিন পড়েছিল ওটা। আমি যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসি তখন ওটা ছিল নতুন। এখনকার মত বিবর্ণ হয়নি ওর রঙ—শরতের বৃষ্টি আর রোদ্দুর লেগে আজ যতটা বিবর্ণ হয়েছে। অনেক আজেবাজে জিনিষের মধ্যে ক্রুশটা বেশ অসুবিধে করেই পড়েছিল উঠোনে।

ইয়াকভ-মামা ওটা কিনে এনেছিল, ওর বৌয়ের কবরে লাগাবার জন্যে। ইচ্ছে ছিল, বৌয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ওটা বসান হবে, সে ওটা নিজেই বয়ে নিয়ে যাবে।

শীতকালের এক শনিবারে পড়ল মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটা ছিল ঠাণ্ডা। বাইরে ঝড় বইছে, বাতাসে বরফের কুচি উড়ছে। মৃতের জন্য উপাসনায় যোগ দিতে দাদু দিদিমা আর তিন নাতি ইতিমধ্যে চলে গেছে। অন্যেরা এসে দাঁড়াল উঠোনে। আমাকে কি একটা অপরাধের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি ; আমি বাড়িতেই আটক রইলাম।

মামারা সবাই কালো কোট পরেছে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্রুশটার একটা হাতল চাপিয়ে দিল ইয়াকভের ঘাড়ে, অন্য দিকটা মিখাইলের ঘাড়ে। গ্রিগরি আর একজন লোক ৎসিগানকের ঘাড়ে চাপাল ক্রুশের থামের মত দিকটা। ভারী জিনিসটা কাঁধে নিয়ে টলে পড়ল ৎসিগানক। তারপর পায়ে ভর করে সামলে নিল নিজেকে।

গ্রিগরি জিজ্ঞেস করল, 'কী হে, পারবে তো ?'

'কী জানি। বুঝতে পারছিনা। খু-উ-ব ভারী।'

মিখাইল-মামা চীৎকার করে উঠল, 'ফটকটা খুলে দাও না হতভাগা পাজী কোথাকার!'

ইয়াকভ-মামা বলল, 'লজ্জা করেনা ? আমাদের তুলনায় কত ভাল চেহারা অথচ আমরা তো নির্বিবাদেই নিয়ে চলেছি।'

গ্রিগরি ফটক খুলে দিয়ে ইভানকে বলল, 'সাবধান! বেশি জোর ফলাতে যেওনা। ভগবান তোমাদের সহায় থাকুন!'

মিখাইল-মামা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে টেকো বুড়ো শয়তান!'

উঠোনে দাঁড়িয়ে যারা ব্যাপারটা দেখছিল তার সবাই হেসে উঠল। সকলে বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছিল। ক্রুশটা যে এ্যাদ্দিন বাদে নড়েছে, এতেই সবাই খুশি।

ইতিমধ্যে গ্রিগরি আমাকে হাত ধরে কারখানায় নিয়ে এসেছে। বলল,

'আজ আর তোমার দাদু তোমায় কিছু বলবেনা—আজ তার মেজাজটা ভালই আছে বোধহয়।'

একরাশ জড়ো করা পশমের ওপর বসিয়ে দিল আমাকে। আমার গায়ে পশম জড়িয়ে দিয়ে সে বলতে থাকল পুরনো দিনের সেই সব কথা। ওদিকে গামলা দিয়ে ফুটন্ত রঙের-ধোঁয়া উঠছে। সে বলল, 'তোমার দাদুকে আমি আজ সাঁইত্রিশ বছর ধরে চিনি। এই ব্যবসা যখন শুরু সেই সময় থেকে আজ এই শেষের দিনেও আমি ওর সঙ্গেই আছি। আমাদের তখন থেকেই বন্ধুত্ব। তোমার দাদু বুদ্ধিমান লোক। দুজনেরই এক ব্যবসা, অথচ সে এখন সর্বেসর্বা। তার সাথে পেরে ওঠা আমার পক্ষে দায়! কিন্তু ভগবান! ভগবানের সঙ্গে কে টেক্কা দেবে বল! তার কাছে তো আমরা শিশু। তিনি যদি মৃদু হাসেন, তবে তার হাসিটার অর্থ বোঝাও ভার। এখানকার হাড়-হদ্দ তুমি কিছুই জান না। কিন্তু বাপ-মরা ছেলে, তোমার সব জানা উচিত। জীবনে অনেক কিছু ঝক্কি পোয়াতে হবে। তোমার বাবা মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ ছিল একজন খাঁটি মানুষ। তোমার দাদু মোটেই তাকে দেখতে পারত না; তাই কোন সম্পর্কও ছিলনা।'

দরদ ভরা কথাগুলো আমি শুনছিলাম। আমার কাছে তা ভাল লাগছিল। উনুনের ওপর লালচে সোনালী আগুনের শিখা কেঁপে উঠছে; গামলাগুলো থেকে বাষ্পাকারে ধোঁওয়া উঠছে আর সেগুলো ছাদের কাঠে লেগে বরফ বনে যাচ্ছে। ছাদের তক্তার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে নীল আকাশ যেন দৃশ্যমান হচ্ছে। বাতাসে মাতন নেই, ঝকঝকে রোদ্দুর, উঠোনের দিকে তাকালে মনে হয় ঘষা কাচের টুকরো ছড়ান রয়েছে সেখানে। বাইরে স্লেজ গাড়ি চলার শব্দ ভেসে আসে। চারপাশের বাড়ির চিমনি থেকে পাক খেয়ে খেয়ে নীল ধোঁয়া উঠছে; বরফের ওপর হাল্কা ছায়া পড়ে তা মুহূর্তে সরে যায়—যেন তারাও গল্প বলছে।

গ্রিগরি রোগা, লম্বাটে চেহারা। লম্বা দাড়ি, বড় বড় কান। টুপি ছাড়া খালি মাথাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় রঙ মেশাচ্ছে। দেখে মনে হয়, বুঝি কোন এক যাদুকর দুঃখীর দুঃখ ঘোচাতে সদুপদেশ দিচ্ছে, 'সোজাসুজি লোকের চোখে চোখ রেখে তাকাবে। দেখবে, কুকুর তাড়া করলেও সে পালাবে।'

চশমার কাচ দুটো যেন নাকে চেপে বসেছে। ফলে ওর নাকটা নীল হয়ে গেছে; অনেকটা দিদিমার নাকের মতই।

সে বলল, 'কী হল?' হঠাৎ কান পেতে সে কী যেন শুনল। তারপর উনুনের দরজা বন্ধ করে জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেল। আমিও তার পিছু নিলাম।

রান্না ঘরে মেঝেতে ৎসিগানক চিত হয়ে পড়ে আছে। জানালা দিয়ে রোদ্দুরের আলো দু প্রস্থে এসে পড়েছে। একটা ওর মাথায়, আরেকটা পায়ে। আলোয় তার ভুরু দেখা যাচ্ছে, বাঁকা চোখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে ময়লা ছাদের দিকে। কালো ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেছে আর তার দু-পাশ দিয়ে ঝরে পড়ছে লালচে ফেনা। শরীরের ওপর দিক থেকে নীচেকার অংশ পর্যন্ত শুধু রক্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পা দুটো যেন দুমড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। আর পরনের ঢলঢলা প্যান্টটা মেঝের সঙ্গে লেপটে রয়েছে—বোঝা যায় ওটা ভিজে গেছে। ঘরের মেঝে বালি দিয়ে ঘষে এত পরিষ্কার করা হয়েছিল যে সূর্যের আলোতে এখন তা চকচক করছে। রক্তস্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার বাইরে। রোদ্দুর পড়ে তা যেন চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

ৎসিগানকের অনড় শরীরটা পড়ে আছে। শুধুমাত্র হাতের আঙুলগুলো নড়ছে। মনে হয়, যেন মাটি আঁকড়ে ধরতে চায় সে। রঙের ছোপ ধরা নখগুলো যেন তখনও চক্‌চক্‌ করছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাতের মুঠোয় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু খসে পড়ে তা, শিথিল হয়ে যায় মুঠি, রক্তের ধারায় নিভে যায় মোমবাতির শিখা। ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার মুঠিতে ধরিয়ে দেয় বাতিটা, কিন্তু অস্থির আঙুলগুলো শক্ত নয়। সমস্ত ঘরে একটা চাপা উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ঢেউ যেন আমাকেও উদ্বেল করল। আমি স্থির থাকতে চেষ্টা করলাম। শক্ত হাতে দরজাটা চেপে রইলাম।

ইয়াকভ-মামা ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।' ইয়াকভ-মামার মুখটা ধূসর। মুখে যেন কত ভাঁজ খেলেছে, চোখের দৃষ্টিতে একটা অসম্ভব প্রাণহীনতা।

'ও পড়ে গেল, আর ক্রুশটা পড়ল ওর পিঠের ওপর। একেবারে পিষে গেছে। আমরাও পিষে যেতাম, যদি না সরে আসতাম।'

গ্রিগরি ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'ওকে পিষে মারার জন্য তোমরা এসব করেছ।'

'এসবের মানে! আমরা কী করলাম...!'

'হ্যাঁ, তোমরাই।'

রক্ত গড়িয়ে চলেছে। দরজার কাছে যেন একটা রক্তের পুকুর হয়েছে। টকটকে লাল রক্ত কালো হয়ে গেছে। ৎসিগানক তেমনি পড়ে আছে, গলা থেকে ঘড়-ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে আর মুখ থেকে লালচে ফেনা বের হচ্ছে। তার সমস্ত শরীর যেন সংকুচিত হয়ে; পড়ছে আস্তে আস্তে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে।

নীচু গলায় ইয়াকভ-মামা বলল, 'বাবাকে আনতে মিখাইল গির্জায় গেছে। আর আমি দ্রশ্‌কিতে চাপিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি, বাব্বা. ক্রুশের তলার দিকটা নিলে আমারও এই অবস্থা হত।'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই বাতিটা আবার ওর মুঠোতে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মোমের ফোঁটা আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ৎসিগানকের হাতের পাতায়।

গ্রিগরি রুক্ষ স্বরে খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'আরে বোকা, ওটা ওর মাথার কাছে মাটিতে রাখনা—।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'মাথা থেকে টুপি খুলে নাও।'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই টুপিটা খুলে দিল। ইভানের মাথাটা ঠক করে মেঝেয় এক পাশে হেলে পড়ল। গলগল করে মুখ থেকে রক্ত স্রোত ঝরে পড়ে। সারা মুখ নয়, মুখের এক কোণ দিয়ে। ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ পর সে ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রামের পর উঠে বসবে। তারপর বিরক্তির সঙ্গে মাটিতে থুথু ফেলে বলবে, 'থুঃ, কি জঘন্য গরম।' কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে রক্ত ঝরল; শংকা বেড়ে যেতে লাগল। সারা শরীর বেয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ল। সূর্য অস্তমুখী। ৎসিগানকের দেহ থেকে রক্ত স্রোতও যেন থিতিয়ে আসছে। আঙুলগুলোও যেন আর নড়েনা! তার মাথার তিনদিকে তিনটে মোমবাতি জ্বলছে। সেই বাতির আলোয় ওর পাংশু বিবর্ণ মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই কেঁদে উঠে বলল, 'সোনা রে আমার, তোর হাসিমুখ দেখে যে প্রাণ জুড়োত বাছা!'

ঘরের ভেতর একটা চাপা ঠাণ্ডা। আমি গুড়ি মেরে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছি। ভারী পায়ের শব্দ তুলে দাদু ঘরে ঢুকলেন। পরনে তার লম্বা কোট। পিছনে লোমের কোট পরে দিদিমা এসে দাঁড়াল। তাদের পিছনে মিখাইল-মামা, বাচ্চারা আর অনেকগুলো অজানা অচেনা মুখ।

দাদু গায়ের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন, 'শুয়োরের দল, এমন সোনার টুকরো ছেলেটাকে তোরা মেরে ফেললি! পাঁচ বছর পরেও যে ওকে সোনা দিয়ে মাপলেও ওর দাম দেওয়া যেত না।'

ইভানকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। গুড়ি মেরে আমি ভাল জায়গায় যেতে গিয়ে একেবারে দাদুর মুখোমুখি পড়লাম। তিনি এক লাথিতে আমাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর আঙুল নেড়ে শাসানির ভঙ্গীতে মামাদের বললেন, 'তোরা মানুষ নস, নেকড়ে!'

কাছেই একটা বেঞ্চিতে তিনি ধপ করে বসে পড়লেন। বেঞ্চিটা চেপে ধরলেন শক্ত করে। তারপর হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া দুঃখ-ভেজা গলায় বললেন, 'জানি, তোরা ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতিসনা! কী বোকারে তুই ভানিয়া! আর কিছু করার নেই,..কিছুই করার নেই! ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে। লাগাম পচে গেছে—গিন্নী, তুমি কথা বলছনা কেন?'

দিদিমা ঘরে ঢুকেই ইভানের পাশে লুটিয়ে পড়েছিল। তার দুটো তুলে নিয়ে তেলোর স্পর্শ নিচ্ছিল; মাথায়, মুখে স্পর্শ করছিল। ধাক্কা দিয়ে মোমবাতি ফেলে দিল। সেই ঘন অন্ধকারে প্রকাণ্ড কালো এক মূর্তি, পরনে কালো পোষাক জ্বল জ্বল করছে। চাপা গলায় শুধু বলল, 'দূ-র-হয়ে যা হারামজাদার দল!'

সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রইলেন শুধু মাত্র দাদু।

কেউ জানল না, কেউ শুনল না, সবার অলক্ষ্যে ৎসিগানককে সমাধিস্থ করা হল।

চার

কম্বলে সারা শরীরটা আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে আমি বিছানায় শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুনছি, দিদিমা প্রার্থনা করছে। হাঁটু মুড়ে বসেছেন তিনি, এক হাতে বুক চেপে ধরেছেন, অন্য হাতে বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকছেন, বলেছেন।

বাইরে ভীষণ শীত। জানালার শার্সিতে বরফ জমে নানা কারুকার্য তৈরী হচ্ছে; তার ভেতর দিয়ে সবুজ চাঁদের আলো এসে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। সেই অদ্ভুত আলোয় উজ্জ্বল তার চোখ মুখ। দিদিমার চুলগুলো রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা, পরণের কালো পোষাক কাঁধের কাছ থেকে ভাঁজের পর ভাঁজ ফেলে নেমে এসেছে মেঝের ওপর।

প্রার্থনা শেষ হলে···দিদিমা পোষাক বদলাত। কোনের একটা বাক্সের ওপর সযত্নে ভাঁজ করে রাখা হত পোষাক। তারপর এসে দাঁড়াত বিছানার কাছে। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকতাম।

আদরের সুরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলত, 'ওরে শয়তান, ভাবছিস আমি কিছু টের পাচ্ছিনা। মটকা মেরে পড়ে থাকলেই ঘুমন্ত দেখান যায় কি! এবার দেখি, কম্বলের এক পাশ ছাড় তো মণি!'

হাসি চাপতে পারতাম না আমি। দিদিমা সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠত, 'এই তো, ধরা পড়ে গেলি তো! বুড়ি দিদিমার সাথে চালাকি?'

কম্বলের একটা প্রান্ত চেপে ধরে এক হ্যাচকা টানে আমি ঘুরপাক খেয়ে এসে পড়লাম নরম বিছানায়। দিদিমা হেসে উঠল সরবে।

অনেক দিন এমন ঘটনা ঘটছে যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে পড়েছি বলে টেরও পাইনি দিদিমার প্রার্থনা কখন শেষ হয়েছে, কখন সে শুয়েছে।

যে দিন বাড়িতে হৈ চৈ হয় অথবা ঝগড়া মারামারি ঘটে যায়, সেদিন দিদিমার প্রার্থনার সময় ও বেড়ে যায়। এটা আমার নজরে এসেছে। দিদিমার প্রার্থনাটা সত্যিই মজার ব্যাপার। খুঁটিনাটি যা ঘটে দিদিমা তা ভগবানের কাছে আনুপূর্বিক বিবৃত করেন। প্রথম দিকে তা খুবই দুর্বোধ্য শোনায়, পরে তা বিক্ষোভের রূপ নেয়।

'প্রভু, তুমি তো জান যে সব লোকই নিজের ভাল চায়। এই চাওয়াটা তো স্বাভাবিক। মিখাইল বাড়ির বড় ছেলে। ওর স্থিতি হওয়াটা দরকার। ওর শহরেই থাকা উচিত। কিন্তু ওকে যদি নদীর ওপারে কোথাও পাঠান হয় সেটা তো কাজের কথা হতে পারে না। নূতন জায়গাটা কেমন হবে তা জানা নেই। কিন্তু কর্তার ইচ্ছে ইয়াকভ এ বাড়ীতে থাকুক। ইয়াকভের প্রতি তার বেশি দরদ। বাপ হয়ে এক ছেলের প্রতি বেশি আতিশয্য দেখান আর অপর জনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটা কি ঠিক? কিন্তু কর্তা তো একগুঁয়ে লোক। কর্তার মাথায় তুমি বুদ্ধি দিয়ে দাও, যাতে তার সুবিবেচনা ফিরে আসে।'

জ্বল জ্বল চোখে মূর্তিগুলোর দিকে তাকায় দিদিমা। তারপর প্রার্থনার সুরে উপদেশ ভেসে ওঠে। বলতে থাকে, 'প্রভু তুমি বরং কেমন ভাবে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করতে হবে সে সম্পর্কে স্বপ্ন দিও কর্তাকে।'

বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে প্রণাম করে। প্রণাম শেষে আবার খাড়া হয়ে বলতে থাকে, 'আচ্ছা ভারভারাকে যদি সামান্য ছিটে ফোঁটা আনন্দ দাও তাতে ক্ষতি কি? ও কি এমন করেছে যাতে তোমার এক কণা আশীর্বাদও ঝরে পড়বেনা ওর মাথায়? শক্ত সমর্থ মেয়ে; অল্প বয়স, অথচ কেন এমন দুর্ভোগে পড়বে? গ্রিগরির কথাও ধর। বেচারী দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে। যদি অন্ধ হয়ে যায় তবে ওর গতি কি হবে প্রভু! দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে খেতে হবে! এটা কি কাম্য হতে পারে? যে কর্তার ব্যবসায় প্রাণপাত করল, তার কি এ হাল হওয়া উচিত? কিন্তু আমি জানি, সে সময় যদি কখনো আসে তবে কর্তা একটা কানাকড়িও ওকে দিয়ে সাহায্য করবে না। হে প্রভু...!'

অনেকক্ষণ নির্বাক থাকে দিদিমা। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে আসে, মনে হয় ঘুমে ঝিমোচ্ছে।

তারপর আত্মস্থ হয়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, 'প্রভু যারা তোমার ওপর ষোল আনাই নির্ভর ছিল তাদের তুমি দয়া কর। আমি যদি কোন পাপ করে থাকি, তারজন্য দোষ নিও না। তবে জেনো সে পাপ আমার পাপী অন্তঃকরণের জন্যে নয়, আমার অজ্ঞানতা, আমারমূর্খতার জন্যে।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'প্রভু তুমি তো অন্তর্যামী! তুমি তো সবই জান, সবই বোঝ।' শেষ দিকের কথার সুরে গভীর ভালবাসা ও অভিমান যেন ফুটে বের হয়।

দিদিমার এই একান্ত আপন-জন ভগবানকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি প্রায়ই বলি, 'দিদিমা, তুমি আমাকে ভগবানের কথা বল।'

ভগবানের কথা বলবার একটা বিশেষ কায়দা আছে দিদিমার, সেটার কখনো অন্যথা হয় না। সোজা হয়ে চোখ বুঝে মিহি গলায় অদ্ভুত টানা টানা সুরে বলে কথাগুলো। হঠাৎ উঠে পড়ে মাথায় রুমাল জড়ায়, তারপর আবার বসে কল্পনার জাল বোনে। কোন ফাঁকে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। দিদিমা বলতে থাকে, 'তবে শোন্। প্রভু আমার বসে আছেন সিংহাসনে। উদ্যান ঘেরা সেই স্বর্গ রাজ্যে পাহাড়ের ওপর লিণ্ডেন গাছের তলায় সেই সিংহাসন পাতা রয়েছে। সেই গাছে ফুল ফল ধরে থাকে সারা বছর ধরে, শীত গ্রীষ্মের বালাই নেই। সেখানে থাকে সাধুরা, দেবদূতেরা। দেবদূতদের প্রভু প্রায়ই মর্ত্যে পাঠান। মর্ত্যের খবর নিয়ে তারা ফিরে যায় স্বর্গে। ফিরে ওরা প্রভুর কাছে আমাদের কথা বলে। জানিসতো আমাদের প্রত্যেকেরই এক একজন দেবদূত আছে। তোর আছে, তোর দাদুর আছে, আমার আছে। সবার প্রতি তাঁর সমানভাব। যেমন তোর কথাই ধরা যাক্। 'লেক্সেই তার দাদুকে জিভ দেখিয়েছে।' এই শুনে প্রভু আদেশ দিলেন 'তাহলে দাদু লেক্সেইকে ধরে আচ্ছা করে মার দিক।' এই নিয়মে জগত সংসার চলছে। কেউ দুঃখ পায়, কারো ভাগ্যে জোটে আনন্দ। কী মধুর দৃশ্য।' দেবদূতেরা ডানা কাঁপিয়ে প্রভুর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রভুর গুণগান গাইছে। প্রভু সে গান শুনে আনন্দ পান, হাসেন।

দিদিমাও হাসতে থাকে। মনে হয় যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

'আচ্ছা দিদিমা তুমি কি এসব নিজের চোখে দেখেছ?'

দিদিমা জবাব দেন, 'না দেখিনি; তবে আমি কল্পনা করতে পারি।'

দিদিমা যখন প্রভুর কথা, দেবদূতের কথা বলে, তখন অনেক ছোট হয়ে যায়; ভারি কোমলতা আসে তার মধ্যে। বয়সের ছাপগুলো মুছে যায় মুখ থেকে; ভিজে চোখ দুটো থেকে আলো বেরিয়ে আসে। বেনীটা নিয়ে গলায় জড়াতে জড়াতে চুপটি করে বসে আমি দিদিমার গল্প শুনি, কিন্তু কিছুতেই যেন আর আশা মেটেনা।

'প্রভুর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারা যায় না; চোখ ঝলসে যায়। তাই দেবদূতদের দেখা যায়। অবশ্য মনে যদি কোন গ্লানি না থাকে তবেই তাদের দেখা যায়। আমি দেবদূতকে দেখেছি। সেদিন ভোরে গির্জায় গেছি উপাসনা করতে, দেখলাম, সাদা কুয়াশার মত জনাকয়েক দেবদূত এসেছেন। আলোয় গড়া তাদের শরীর। ডানা মেলে যেন নেমে এসেছে! বুড়ো পাদরি ইলিয়াকে উপাসনার কাজে সাহায্য করছে। পাদরির বয়েস হয়েছিল, তাই বার্দ্ধক্যে সে নুইয়ে পড়েছে এসময় আমি দেবদূতদের দেখেছি। দেখে উচ্ছাসে আমি মূর্ছা যাওয়ার মত হয়েছিলাম। বুকটা যেন কেমন কেঁপে উঠেছিল। আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। আর অলিওসা, বাছা আমার, মাণিক আমার! কী আনন্দ ভরা এই পৃথিবী, সবকিছু কত সুন্দর, কত মধুর!'

'দিদিমা আমাদের এই বাড়ীটারও কি সবকিছু ভাল?'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিদিমা ঘাড় নেড়ে বলল, 'মেরীমাতার জয় হোক। হ্যাঁ, এ বাড়িতেও সবকিছু ভাল।'

দিদিমার কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম না। আমাদের বাড়ীতে কারো সঙ্গে কারোর সম্পর্ক ভাল নয়। তাই এ বাড়ীর সম্পর্কে একথা বিশ্বাস হয়না। আজও বেশ মনে আছে নাতালিয়া-মামীকে উতলা হয়ে নিজের ঘরে ছুটে বেড়াতে দেখেছি। মিখাইল-মামার ঘরের সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম: মামী বুক চাপড়ে বলছে, 'ভগবান, আমাকে তুমি মুক্তি দাও; মুক্তি দাও এ বাড়ী থেকে।' এর কারণ কি তা বুঝতে আমার ভুল হয়নি। ভুল হয়নি গ্রিগরির সেই আক্ষেপের কথা। গ্রিগরি বিড়বিড় করে বলেছে, 'যেদিন একেবারে অন্ধ হয়ে যাব, সেদিন ভিক্ষে করতে বের হব। এ বাড়ীতে থাকায় চেয়ে ভিক্ষে করাও অনেক ভাল!'

আমার ইচ্ছে হত গ্রিগরি যেন তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ হলে আমি গ্রিগরিকে হাত ধরে নিয়ে ভিক্ষেয় বের হব। ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াব দুজনে সারা দুনিয়াজুড়ে। আমার মনের কথাটা গ্রিগরিকে জানিয়েছিলাম। শুনে দাড়ির আড়ালে মুচকি হেসেছিল সে বলেছিল, 'দাদুভাই, ঠিক আছে। পথে যেতে যেতে বলব, 'রঙের কারখানার মালিক ভাসিলি কাশিরিনের নাতিকে নিয়ে আমি ভিক্ষে করছি। তোমরা আমায় ভিক্ষে দাও।' তাতে খুব মজা হবে, না?

মাঝে মাঝে নাতালিয়া-মামীর শরীরে আমি আঘাতের চিহ্ন দেখেছি; দেখেছি তার মুখে কালসিটের দাগ।

আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মামা কি মামীকে মারে!'

'মারে, তবে লুকিয়ে। জানোয়ারটা প্রায়ই রাতে বৌকে ধরে মারে। তোর দাদু এ-সব পছন্দ করেনা। মিখাইলটা একটা আস্ত জানোয়ার আর ওর বৌটা হয়েছে মিনমিনে।' তারপর দিদিমা বলতে থাকে, 'আজকাল তো মারধোরের চোট অনেক কম। বড় জোর দু চারটে চড়, ঘুষি অথবা চুলে টান দেওয়া। সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আর আগে এসব চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনে আছে, একবার তোর দাদু আমাকে সারাদিন ধরে পিটিয়েছিল। সেট ইষ্টারের ছুটির দিন উপাসনার শুরু হবার সময় থেকে মার শুরু হল, শেষ হল যখন তখন সূর্য অস্ত গেছে। এক এক বার মার চলে—খানিক বিশ্রামের পর আবার শুরু হয়। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মারে।'

'তুমি কি দোষ করেছিলে?'

'তা আমার মনে নেই। একবার প্রায় মার খেয়ে আধ মরা হয়ে পড়েছিলাম। এরপর দিন পাঁচেক উপোসে কেটেছে। কি-ভাবে যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলাম, সেটাই আশ্চর্য। একবার কি হয়েছিল...'

আমি হাঁ করে এসব কথা শুনি। মুখে রা'টি নেই। দিদিমার চেহারাটা দাদুর প্রায় দু-গুণ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বে দিদিমা কেমন করে মার খায় ভেবে অবাক হই।

'আচ্ছা দিদিমা তোমার চেয়ে দাদুর গায়ের জোর বেশি?'

'গায়ের জোরের কথা নয়। বয়সে বড়, তাছাড়া স্বামী। ভগবান তো স্বামীর ওপরই সব মেয়েদের সঁপে দেন। স্বামীকে মেনে চলা তো ভগবানের বিধান।'

দিদিমা যখন • মূর্তিগুলো ঝাড়ামোছা করেন তখন দেখতে ভাল লাগে

আমার। এ বাড়ীর মূর্তিগুলোর নানা অলঙ্কার আছে। রূপোর চুমকী, মূল্যবান পাথর, মনি মুক্তা। এক একটা মূর্তি হাতে নিয়ে দিদিমা নিজেই আহ্লাদ করে' বলে, 'কী মিষ্টি মুখ, কী সুন্দর মূর্তি। পরম মঙ্গলময়ী মেরীমাতার মূর্তিতে কী ধূলোটাই না পড়েছে!' মূর্তি পরিষ্কার করতে করতে দিদিমা আমায় বলে, 'কী সুন্দর নিখুঁত মূর্তিগুলো। প্রত্যেকটা আলাদা। দ্যাখ 'বারোটি প্যুদিন; এটা হল ফিওদরভস্কির পুণ্যময়ী মা মাঝেখানে দাঁড়িয়ে আছেন যেন দয়া ও করুণার প্রতীক!

এসব দেখে মনে হয়, আমার মামাতো বোন কাতেরিনা যেমন পুতুল নিয়ে খেলা করে আনন্দ পায় দিদিমাও মূর্তিগুলো নেড়েচেড়ে সেই আনন্দই পাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দিদিমা শয়তানদেরও দেখেছে। তারা যে কখনো একা, কখনো দলবদ্ধ হয়ে থাকে—সে কথাও আমি শুনেছি ওরই মুখে। বলেছে, 'ঝেলৎ এ এক রাতে রুদলফের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, চাঁদের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে, এমন সময় ছাদের ওপর কি যেন একটা কালো মত জিনিষ ঠ্যাঙ ফাঁক করে বসে আছে। মস্ত চেহারা; চিমনীর মধ্যে দুটো শিং ঢুকিয়েদিয়েছে। ফোঁস ফোঁস করে নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে। ল্যাজের ঝাপটা দিচ্ছে ছাদের ওপর। আমি তাকে দেখে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বললাম, 'যীশুখৃষ্টের অভ্যুদয় হোক আর তার শত্রুরা নিপাত যাক্।' সাথে সাথেই সেই মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হয় উপোসের দিনে রুদলফরা কোন নিষিদ্ধ কিছু খাবার আয়োজন করেছিল, আর সেই পাপেই শয়তানের আবির্ভাব।'

শয়তানের এই পলায়নী ঘটনায় আমি হেসে উঠলাম; দিদিমাও হাসল।

দিদিমা তার নিজের আরেকটা ঘটনা বলল।

'একরাতে গেরস্থালির কাজ শেষ করতে দেরি হয়েগিয়েছিল। স্নানের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ধুয়ে ফেলছি, এমন সময় পিল পিল করে শয়তানরা আমাকে ঘিরে ধরল। হরেক রঙ এদের—লাল, সবুজ, কালো। আকারেও তফাৎ অনেক—যেন এক ঝাঁক আরশুলা। যতই দরজা দিয়ে বের হতে যাচ্ছি, শয়তানগুলো ততই বাঁধা দিচ্ছে। আমাকে ওরা ঘিরে ধরেছে, নড়া-চড়ার জো নেই। মনে হয় সংখ্যায় ওরা হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি হবে। ওরা আমাকে নানাভাবে বিরক্ত করেছে। আচড়িয়ে, কামড়িয়ে, হুল ফুটিয়ে—হরেক রকমে। ক্রুশ চিহ্ন এঁকে যে ওদের বিদেয় করি, এ অবস্থাও আমার ছিল না। শয়তানগুলোর গায়ে লোম ভরতি। গরম আর নরম তাদের স্পর্শ। ওদের মাথায় যেখানে মুণ্ডি সেখানে শিং থাকে। তাই দিয়ে ওরা আমাকে গুতোয়। তখন আমার অবস্থা সত্যিই কী ভয়ানক! আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি মোমবাতি পুড়ে শেষ হতে চলেছে। কাপড় কাচা জলটা ভয়ানক ঠাণ্ডা। মেঝের ওপর কাচার সরঞ্জাম পড়ে থৈ থৈ করছে। মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যা তোরা; নরকের কীট। তোদের মৃত্যু হোক।'

আমি এ ঘটনা মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করি। চোখের সামনে দৃশ্যটা যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ছাইরঙা পাথরের উনুনটার মুখটা যেন খুলে গেছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট শয়তানগুলো আসছে আর আসছে। ওদের সারা শরীর লোমশ; ওরা লাল জিভ বার করছে। দৃশ্যটা ভাবতে যেমন মজা, তেমনি ভয়েরও বটে।

দিদিমা আবার বলতে থাকে, 'শয়তানে-পাওয়া লোকও আমি দেখেছি।

সেটা ছিল শীতের রাত। তুষার ঝড় হচ্ছে। ইয়াকভ নালা অতিক্রম করছিলাম। সেখানে এক পুকুরের ওপর জমা বরফের ফাঁক দিয়ে ইয়াকভ আর মিখাইল তোর বাপকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করছিল, সেকথা আগেই শুনেছিস। আরেক দিন, ঠিক একই জায়গায় নালাটার নীচে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম বিকট চীৎকার আর শিস্। দেখি যে, তিনটে কালো ঘোড়া গাড়ি টেনে প্রচণ্ড গতিতে দৌড়চ্ছে। গাড়ির চালক একটা গোলগাল শয়তান, মাথায় তার লাল টুপি। সে আসনে বসে নেই, দাঁড়ান অবস্থায় রয়েছে। ঘোড়াগুলোকে লাগামের বদলে শেকল দিয়ে চালাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছে, পেছনে বরফের মেঘ উড়ছে। গাড়ির মধ্যে যারা রয়েছে তারাও শয়তান। তারা চীৎকার করছে, শিস দিচ্ছে। এভাবে সাত সাতটা ত্রয়কা আমার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। এরা সবাই ছিল বখাটে। শয়তানরা বখাটেদের ওপর ভর করে।'

দিদিমার এ সব কথা অবিশ্বাস করতে আমার মন চায় না। তার বলার ভঙ্গিতে সরলতা আর সত্যের ছাপ থাকে।

এমন ধারা অনেক গল্প বলে দিদিম। দিদিমার মুখে সব থেকে সেরা গল্প শুনেছি সেই কবিতা, যাতে বলা হয়েছিল মেরীমাতা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন যন্ত্রণা দগ্ধ পৃথিবীর পথ দিয়ে। যেতে যেতে তিনি অনুরোধ জানালেন 'ডাকাত রাজকুমারী' ইয়নেগালি চেভাকে, যাতে রুশ দেশে ডাকাতি বন্ধ হয়। এ ছাড়া আরো অনেক গল্প। ভগবানের অনুগত আলেক্সেইয়ের কবিতা, যোদ্ধা ইভানের গল্প, জ্ঞানপরী ভাসিলিসা, মাফাপসানিৎসা, ডাকাত-সর্দারণী উস্তা-মেয়ে, মিশরীয় মারিয়া আর ডাকাত-মায়ের শোক-বিহ্বল রূপকথার কাহিনী। দিদিমা যে কত রূপকথা জানে তার ইয়ত্তা নেই—সে এক বিশাল ভাণ্ডার।

আমার মনে হয়, ভয় কি জিনিষ দিদিমা তা জানে না। আমার দাদুকেও ভয় করতে দেখিনি। শয়তানেও তার ভয় ছিল না। কিন্তু মজার ব্যাপার যা তা হল দিদিমার আরশুলায় ছিল দারুণ আতঙ্ক। এত বেশি আতঙ্ক ছিল যে মাঝ রাতে ঘুমতে ঘুমতে উঠে বসে আমাকে ডেকে বলত, আলিওশা, লক্ষ্মী বাবা আমার, ঘরে একটা আরশুলা ঢুকেছে। যীশুর দিব্যি, তুই আরশুলাটাকে খতম করে দে এখনি।

ঝিমোতে ঝিমোতে আমি উঠে মোমবাতি জ্বালি। শত্রু খুঁজে বেড়াই সারা ঘরে। প্রতিবারই যে শত্রুকে খুঁজে পাই, এমন নয়। আমি তখন বলি, 'দিদমা আরশুলা কোথায় দেখলে ?'

'আছে, আছে, আমি টের পেয়েই তো বলছি। ভাল করে দ্যাখ্ বাবা!'

শেষ বেশ দেখা যেত, হয় বিছানার কাছে, না হয় [illegible] অনেক দূরে।

'কী রে, মেরেছিস? এই তো লক্ষ্মী ছেলে।' আগাগোড়া মুড়ি দেওয়া লেপটা সরিয়ে দিদিমা হাসি হাসি মুখে [illegible]লে থাকে। কিন্তু আরশুলা খুঁজে না পাওয়া গেলে সে-রাতে ঘুমের দফারফা হত। আরশুলা হয়ত নয়, কোথায় কি একটা খস্‌খস্ আওয়াজ হয়েছে আর যায় কোথায়। সারারাত ধরে চলে—ঐ দরজার পাশে, ঐ পালাল ট্রাঙ্কের তলায়...'

'আচ্ছা দিদিমা, আরশুলাকে তুমি এত ভয় পাও কেন ?'

এ প্রশ্নের জবাবও তার তৈরী ছিল। সহজভাবে উত্তর দিত, 'আচ্ছা

ওগুলো জগতের কি উপকার করে বলতো। কেবল গুটি গুটি চলে। জগতের নিকৃষ্ট প্রাণীগুলোর অস্তিত্বের তবু একটা মানে আছে। বিছেগুলো কত মারাত্মক। ওদের দেখে বোঝা যায় যে বাড়ীটা পুরণো হয়েছে। ছারপোকার আগমনে বোঝায় ঘর-দুয়ারে ময়লা জমেছে। উকুন হলে মালুম হয় শরীরে রোগের বীজানু রয়েছে। প্রত্যেকটার একটা কারণ আছে। কিন্তু আরশুলা? আরশুলার কি কাজ? কোন কাজই নেই! জগতের বোঝা হয়ে কেন ওরা বেঁচে থাকে?'

একদিন দিদিমা বিনীতভাবে যখন ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন তখন দাদু হঠাৎ দরজাটা খুলে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ও গিন্নী শুনছ, প্রভু একেবারে সাক্ষাৎ দূত পাঠিয়েছেন। কারখানায় আগুন লেগেছে!'

ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'বলছ কি!' তারপর দুজনেই মস্ত বৈঠকখানা ঘরের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধুপধাপ শব্দ করতে করতে ছুটলেন।

দিদিমার চড়া গলা শোনা গেল, 'ইয়েভগেনিয়া মূর্তিগুলো নামাও! আর নাতালিয়া, তুমি ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় পরিয়ে তৈরি করে রাখ!'

দাদু আর্তস্বরে শুধু 'উঃ আ' বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন।

আমি রান্নাঘরে ছুটে এলাম। এই ঘরে উঠোনের দিকে একটা জানলা আছে। জানলাটা সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। সোনালী আলোর এক-একটা ঝলক মেঝের ওপরে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। ইয়াকভ-মামা ঘরের মধ্যে রয়েছে, পায়ে জুতো গলিয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হয়, উত্তাপে যেন তার পায়ের তলাটা পুড়ে যাচ্ছে। সে দাপাচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'এটা নিশ্চয়ই মিখাইলের কাণ্ড! ওই আগুন লাগিয়েছে! আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে!'

'চুপ কর্ নির্বোধ।' বলে দিদিমা তাকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে ইয়াকভ-মামা দরজার ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

জানলার কাচের ওপর তুষার জমেছে; সেই তুষারের ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি কারখানার ছাদে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, আগুনের শিখা ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে। নিস্তব্ধ রাত্রিতে ধোঁয়াবিহীন লাল আগুন যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। শুধু আকাশের অনেক উঁচুতে স্থির হয়ে রয়েছে এক টুকরো কালো মেঘ। কিন্তু এই কালো মেঘ ছায়াপথের রূপালি দাগকে লুকোতে পারেনি। আগুনের শিখায় টকটকে লাল হয়ে বরফ ঝল্‌সে উঠেছে। বাইরের দিককার ঘরগুলোর দেয়াল যেন একদিকে হেলে পড়ে কাঁপছে। মনে হয়, ওগুলো উঠোনের কোণের দিকে সরে যেতে চায়। কারখানা-ঘরের চওড়া চওড়া ফাটলগুলো আগুনের আলোয় ফুটে উঠেছে, আর সেইসব ফাটল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে আগুনের লকলকে জিব। কারখানার ছাদের ওপরে শুকনো কাঠের আচ্ছাদন, তার ওপর দিয়ে লাল আর সোনালী ফিতের মত আগুনের ধারা বইছে; ছাদের ফাঁক দিয়ে সরু লম্বা একটা মাটির চিম্‌নি উঠেছে, তার চারপাশে থেকে একটা পাতলা ধোঁয়ার ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এত দূরে জানলার

শার্সির ওপরে আগুনের শব্দটা অনেক আস্তে শোনায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আগুনের ছটায় কারখানাটা অপরূপ দেখাচ্ছে—ঠিক যেন গির্জার উপাসনা বেদী। এই আশ্চর্য দৃশ্য যে প্রবল আকর্ষণে টানে, তা থেকে কিছুতেই চোখ ফেরান যায় না।

একটা ভারী ভেড়ার চামড়ার জামা আমি মাথায় গলিয়ে নিলাম। সামনে যেন কার জুতো ছিল, সেটাই পায়ে পরে এগিয়ে গেলাম উঠোনের দিকে। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা, প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা ধরে যায়; আর তার সঙ্গে চলেছে দাদু, মামা আর গ্রিগরির চিৎকার। এর ওপরে দিদিমার কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। দিদিমা একটা খালি বস্তা মাথায় পেচিয়ে আস্তাবল থেকে একটা কাঁথা এনে সেটা গায়ে জড়িয়ে জ্বলন্ত কারখানার দিকে ছুটে চলেছেন আর চিৎকার করছেন, 'ওরে বোকার দল, কারখানার ভিতরে যে সালফিউরিক এসিড আছে! ওই এসিডে একবার আগুনের ছোঁয়া লাগলে আর বক্ষে আছে? উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে সব।'

দাদু• প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছেন, 'গ্রিগরি ..ধরো...ধরো', ওকে যেতে দিও না. কি সর্বনাশ, ধরতে পারলে না! দেখো, আর ফিরে আসতে হচ্ছে না. '

কিন্তু দিদিমা ফিরে এসেছে। সারাটা শরীর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে; দু-হাতে সালফিউরিক এসিডের মস্ত একটা বালতি, তার ওজনে সে একেবারে নুয়ে পড়েছে।

প্রচণ্ড কাশির ধাক্কা সামলাতে সামলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় দিদিমা চিৎকার করে উঠল, 'ওগো আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে বার করে আন···ওরে, হাঁ করে দেখছিস কি? এই কাঁথাটা আমার গা থেকে খুলে নে, দেখছিস না, চারদিকে আগুন ধরে গেছে?'

• গ্রিগরি দিদিমার কাঁধ থেকে কাঁথাটা টেনে নিল। তারপর প্রচণ্ডভাবে কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেল। বরফের স্তূপ আগুনের ওপর ছুঁড়ে দিতে লাগল। কুড়ুল হাতে ছুটোছুটি করছে ইয়াকভ-মামা। দাদু দিদিমার পেছন থেকে তুষারের টুকরো ছিটিয়ে দিচ্ছেন। বরফ দিয়ে এসিডের পাত্রটাকে ঢেকে দিল দিদিমা। তারপর সদর খুলতে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাড়া প্রতিবেশীরা জড়ো হয়েছিল। দিদিমা চীৎকার করে বলল, 'আপনারা একটু হাত লাগান, সাহায্য করুন। গোলা-ঘরটাকে বাঁচাতে হবেই, না হলে খড়ের গাদায় আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হবে। এ-কাণ্ড যদি ঘটে তবে আশেপাশের বাড়ীগুলোও বাদ যাবেনা। আসুন সবাই হাত লাগান। গোলাঘরের চালটা আগে খুলে ফেলুন, খড়ের গাদাটার কোদাল চালিয়ে বাগানে সরিয়ে দিন। গ্রিগরি, ওকি হচ্ছে! মেঝেতে বরফ ছড়িয়ে লাভ কি? ওপর দিকেও ছুঁড়ে দাও। ইয়াকভ, তুই খামকাই ছুটছিস। কোদাল আর কুড়ুল এনে দে সবাইকে। সবাই প্রতিবেশী-সুলভ সাহায্য করুন। একমাত্র ভগবানই ভরসা।'

আগুন যেমন দেখায়, দিদিমার মুখখানাও যেন তেমনি। আগুনের লেলিহান শিখা দিদিমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে, দিদিমা যেন ছায়ার মত দৌড়চ্ছে। তার দৃষ্টি সবদিকে, সবাইকে হুকুম করছে সে।

শারাপ ঘোড়াটা ছুটে উঠোনে এসেছে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদু লাগামটা ধরেছেন, সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লেন। ঘোড়াটার চোখ

দুটো রক্তবর্ণ; যেন বাগ মানতে চায়না কিছুতেই। দাদু সামলাতে পারলেন না। লাগামটা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। চীৎকার করলেন, 'গিন্নী, ঘোড়া সামলাও।'

দিদিমা হাত বাড়াল ঘোড়াটার সামনে। ঘোড়াটা বশ মানল! দু'একবার চিঁহি ডাক ছেড়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সান্ত্বনা দেবার সুরে দিদিমা বলল, 'ভয় কীরে? আমি তো আছি। হ্যারে, তোর বিপদে আমি কাছে থাকব না, এটা তুই ভাবছিস?'

সেই প্রকাণ্ড ঘোড়াটা বাধ্য ছেলের মত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে দিদিমার মুখের দিকে চেয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডাকল।

এদিকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বাচ্চাদের এক সাথে জড়ো করে নিয়ে বাইরে এসেছে। কাপড় জড়ানো বাচ্চাগুলোকে পোঁটলার মত দেখাচ্ছে। আর সে, পোঁটলা থেকে অস্পষ্ট গুঞ্জনও আসছে।

দাদুকে উদ্দেশ্য করে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বলল, 'লেক্সেই কে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।'

দাদু বলল, 'এক্ষুনি বাইরে যাও।'

বারান্দার সিড়ির নীচে আমি লুকিয়ে রইলাম। যেন ধাই আমায় না দেখে তাহলে আমাকে-শুদ্ধ বাইরে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কারখানার ছাদ ভেঙে পড়েছে। কঙ্কালের কড়ি বরগাগুলো দাউ দাউ জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশে। আর সেই কঙ্কালের ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা এগিয়ে আসছে। লাল, সবুজ, নীল-কত ধরণের রঙে রঙীয়ান সেগুলো। উঠোন মানুষের ভীড়ে জমজমাট। তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে আগুন নেভাতে; বরফ ছুঁড়ছে কোদাল দিয়ে। গামলার তরল পদার্থ টগবগ করে ফুটছে, আর তা থেকে ধোঁয়া উঠছে কুল কুল করে। উৎকট একটা গন্ধ বের হচ্ছে, চোখে ধোঁয়া লেগে জল আসছে।

সিড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসতেই আমি দিদিমার সামনে পড়ে গেলাম। দিদিমা ধমকে উঠলেন, 'ঘুর ঘুর করছিস্ কেন? পিষে মরার জন্যে? যা, পালা এখান থেকে।'

এমনি সময় হাতে চাবুক নিয়ে এক অশ্বারোহীর আগমন ঘটল। উঠোনের মাঝখানে হেলমেট মাথায়. শাসানির ভঙ্গিতে সে চাবুক তুলে হাঁক দিল, 'হটো সব!'

ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা গেল। দিদিমা আমায় আবার ধমক লাগাল। বলল, 'কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি?'

বেগতিক বুঝে আমি রান্নাঘরে এসে ঢুকে জানলায় দাঁড়ালাম। বাইরে শুধু লোকের অগুনতি মাথা। আগুন দেখা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে পেতলের হেলমেট-গুলো আগুনের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে।

দমাদম পিটুনি আর জলের তোড়ে ক্ষণিকের মধ্যেই আগুন নিভে গেল। পুলিশ প্রথম মানুষের ভীড় হটাল, তারপর এক সময় দিদিমা এসে রান্নাঘরে ঢুকল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমোসনি এখনও? ভয় নেই, আগুন নিভে গেছে।'

দিদিমা আমার পাশে বসল; এরপর একটা রা' ও কাটলনা। শুধু বসে বসে দুলতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারে এক গভীর নিস্তব্ধতা যেন আবার ছেয়ে গেল চতুর্দিকে। এখন আমার ভাল লাগছে। কিন্তু সে আগুন আর নেই।

এর মধ্যে দাদু দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। হাঁক্ দিলেন, 'গিন্নী ?'

'এ্যা !'

'পুড়ে-টুড়ে যাওনি তো ?'

'না, তা যাইনি।'

দাদু দেশলাইটটা ধরালেন ; বাতি জ্বালালেন। আলোয় তার ক্লেদাক্ত কালিঝুলি মাখা মুখটা দেখা গেল। তিনি এসে বসলেন দিদিমার পাশে।

দিদিমা বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে নিলে পারতে।' তার নিজেরও মুখ হাত ধোওয়া দরকার ; কালিঝুলি লেগেছে, ধোঁয়ার গন্ধ বের হচ্ছে গা থেকে।

দাদু এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, 'দেখ গিন্নী, তোমার ঈশ্বর মাঝে মাঝে তোমায় অপার করুণা করেন। হঠাৎ বুদ্ধি দেন।'

দিদিমার কাঁধে হাত চাপড়ে বলতে থাকেন, 'সামান্য সময়ের জন্য হলেও তিনি তোমাকে করুণা করেন।'

দিদিমার ঠোঁটে হাসির রেখা। একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দাদু বলল, 'গ্রিগরিটাকে এবার তাড়াতে হবে। ওকে দিয়ে আর কাজ চলেনা। ওর দিন শেষ হয়েছে। ওধারে দেখ ইয়াকভ বারন্দায় বসে কাঁদছে। তুমি যাও, ওকে গিয়ে থামাও...।'

দিদিমা উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা আঙ্গুলে ফু দিতে দিতে বের হয়ে গেল। দাদু আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কীগো ভয় পাওনি তো ? কাণ্ডকারখানা সব বুঝলে তো ? দিদিমাকে কী মনে হয় ?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলতে থাকেন, 'অনেক বয়স হয়েছে। বাধাবিপত্তি অনেক এসেছে তোমার দিদিমার জীবনে। কিন্তু দেখলতো, এখানে মানুষ বলতে ঐ একটাই। বাকি সব, ছিঃ ছিঃ।' এরপর খানিক সময় ঘাড় নীচু করে বসলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মোমবাতির পোড়া সলতে খসিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'ভয় করেনি তো তোমার ?'

'না।'

'হ্যাঁ, ভয়ের কি আছে ? কিছু নেই।'

বিরক্তি-ভরে গায়ের জামাটা খুললেন। তারপর রান্না ঘরের কোণে হাতমুখ ধুতে গেলেন। হাত মুখ ধুতে ধুতে বললেন, 'নেহাত অকম্মের ঢেকি না হলে এমন হয় ? কারো বাড়িতে আগুন লাগে ?' রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে বললেন, 'এবার থেকে নিয়ম হওয়া উচিত যে, যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে খোলা ময়দানে নিয়ে আসা হবে। কারণ, বুঝতে হবে, সে লোক হয় চোর নয়তো বোকা। এদের দুজনায় কোন তফাৎ নেই। তাই এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। জনাকয়েককে ধরে শাস্তি দিলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ; কারো বাড়িতে আর আগুন লাগবেনা। কী হে, তুমি যে এখনো শুয়ে পড়নি দেখছি ! যাও, শুয়ে পড়গে।'

আমি শুয়ে পড়ার জন্যে গেলাম বটে, কিন্তু কোনক্রমে ঘুম এলনা। বিছানায় শুয়ে এধার ওধার করছি, এমন সময় অতর্কিতে চীৎকার শুনে একলাফে উঠে পড়লাম। রান্নাঘরে এসে দেখি, মোমবাতি হাতে দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। তার সারা শরীর কাঁপছে। তিনি এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ স্বরে বলছেন, 'কী হয়েছে বলনা, গিন্নী ? এই ইয়াকভ, কী হয়েছে বল্‌নারে ?

আগুন লাগায় যেমন হৈ হট্টগোল হয়েছিল ঠিক তেমনি হৈচৈ শুরু হয়েছে।

ভীষণ চীৎকারে যেন চারদিক কাঁপছে। পাগলের মত দাদু আর মামা এধার ওধার ছুটোছুটি করছেন। দিদিমা দুজনকেই ধমকে রান্নাঘর থেকে বের করে দিলেন। ওদিকে গ্রিগরি চীৎকার করে উনুনে কাঠ গুজছে। বয়লারগুলোতে জল ভরে দিয়ে গেল। অস্ত্রাখানের উঠের মত ঘাড নাড়তে নাড়তে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। দিদিমা চীৎকার করে বলল, 'আগে আগুনটাকে তৈরী রাখ।'

গ্রিগরি কিছু জ্বালানী কাঠ নাবাবার জন্য উনুনের ওপর উঠে গেল। উঠতে গিয়ে আমার পায়ের সঙ্গে ওর পায়ের ছোঁওয়া লাগাতে ও চমকে উঠল। বলল, 'কে কে, এখানে? ওঃ তুই! ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। এমন বিদকুটে স্বভাব তোর, যেখানে তোর আসার দরকার নেই, সেখানেই আসা চাই।'

'আচ্ছা, এত হৈ চৈ কিসের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উনুনের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে গ্রিগরি বলল, 'তোর মামীর বাচ্চা হবে।'

আমার মনে পড়ে, আমার মায়ের প্রসবের সময় কিন্তু মা এমন চীৎকার করেনি।

জলের পাত্রগুলি উনুনে চাপিয়ে গ্রিগরি আবার ওপরে উঠে গেল। তারপর একটা পোড়ামাটির পাইপ দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ, চোখ ভাল করবার জন্য তামাক খাচ্ছি। তোর দিদিমা অবশ্য নস্যি নিতে বলেছিল, আমি কিন্তু তামাক ধরেছি। কারণ, নস্যি নেওয়ার থেকে তামাক খাওয়া ঢের ভাল।'

উনুনের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সে মোমবাতির কৃপণ আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার গায়ে মুখে কালি লেগেছে, জামাটা ছিঁড়েছে; আর তার ফাঁক দিয়ে ওর কঙ্কালসার শরীরের পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। চোখের চশমার একটা কাঁচ ফাটা। তার থেকে খসে পড়েছে একটা টুকরো! ওখান দিয়েই দেখা যাচ্ছে চোখের খানিকটা অংশ। মনে হয় যেন লাল দগদগে। ওদিকে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি সমানে চিৎকার করে চলেছে। শুনতে শুনতে গ্রিগরি তামাক ভরে নিল পাইপে। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কী আগুন রে বাবা! তোর দিদিমার হাত বোধহয় ঝলসে গেছে! ঐ পোড়া হাতে কীভাবে প্রসব করাবে কে জানে। তোর মামীর কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ওর কাৎরানি শুরু হয়··· একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা কী শক্ত কাজ দেখছিস তো ··· কিন্তু মেয়েদের পোড়া কপাল ... ওদের কানাকড়ি দাম নেই। প্রতিটি মেয়েমানুষকে সম্মান করে চলা উচিত। বিশেষ ভাবে যে মা তাকে তো বটেই। তুই কিন্তু কথাটা মনে রাখিস।'

ঢুলতে ঢুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা সোরগোলে আমার সে ঘুমও ভাঙল। মিখাইল-মামার চীৎকার শুনতে পেলাম। দুর্বোধ্য ভাষায় কারা যেন কি সব বলছে, 'স্বর্গের ফটক অবাধ হবার সময় আগত।'

'এক কাজ কর হে, খানিকটা প্রদীপের তেল, মদ আর কাজল মিশিয়ে খেতে দাও ওকে। পরিমাণটা কি হবে জান তো? আধ গ্লাস তেল, আধ গ্লাস মদ আর টেবিল চামচের এক চামচ কাজল।'

মিখাইল-মামা বিচলিত হয়ে এক কথাই বলছে, 'একবার আমাকে দেখতে দাও। আমি ওকে একবার দেখব।'

মেঝের ওপর দুপা ছড়িয়ে বসে আছে সে। দুপায়ের মাঝে থুথু ফেলছে আর মেঝেতে হাত ঠুকছে বার বার। উনুনের ওপরটা ক্রমাগত তেতে উঠছে। তাই আমি নেমে এলাম। নামতেই মামা আমার পায়ে এমন একটা লাথি মারল যে আমি চিৎপাত হয়ে পড়লাম। মাথাটা ঠক করে গিয়ে লাগল মাটিতে।

আমি চীৎকার করে বললাম, 'বোকা কোথাকার।'

মামা তেড়ে মেরে লাফিয়ে উঠল! তারপর আমাকে শূন্যে তুলে দোলাতে দোলাতে বলল, 'তোকে আজ পিষে মারব; উনুনের মধ্যে ফেলে দেব।'

আমি যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, দেখি দাদুর কোলে আমি শুয়ে আছি। মূর্তিগুলোর নীচে তিনি বসে আসেন আর আমাকে দোল দিচ্ছেন। ওর চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে। উনি বিড়বিড় করে বলছেন, 'আজ কারো রেহাই নেই যেন, একজনও বাঁচবে না।'

তার মাথার দিকে মূর্তির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে আর টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। জানালা থেকে বাইরে শীতকালের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আবির্ভাব দেখা যায়।

দাদু আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

শরীরে আমার যন্ত্রনা ছিল। ভিজে মাথা, শরীরটা সীসের মত হয়ে গেছে। এসব কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই। চারদিকে তাকিয়ে দেখি সব অচেনা মুখ। চেয়ারে অনেকে বসে আছে। বেগুনি আলখাল্লা পরিহিত পুরুত, চশমা চোখে এক পক্ককেশ বৃদ্ধ এবং আরো অনেকে। সবাই যেন মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে আর সবাই কান খাড়া করে শুনছে। পেছন দিকে দুটো হাত রেখে ইয়াকভ-মামা টান টান হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াকভ-মামাকে ইশারা করে দাদু বললেন, 'ছেলেটাকে শুইয়ে দে তো।' মামা আমাকে ইঙ্গিতে ডাকল। পা টিপে টিপে আমরা দিদিমার ঘরে ঢুকলাম। তারপর যখন বিছানায় গিয়ে শুয়েছি, এমন সময় মামা ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোর মামী গেছে রে।'

খবরটা শুনে অবাক হলাম না। নাতালিয়া-মামীকে আমি এ বাড়ীর কোথাও দেখিনি। রান্নাঘরে খাবার টেবিলেও তাকে দেখা যায়নি।

'দিদিমা কোথায়?'

'ওখানে।' বলে হাত দেখাল মামা। তার পর যেমন পা টিপে টিপে ঢুকেছিল, তেমনি খালি পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি বিছানায় শুয়ে থাকলাম। উৎকণ্ঠার সাথে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখলাম। অন্ধ আর পাকা চুলওয়ালা কতকগুলি মুখ যেন শার্সি ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। কোণের দিকে ট্রাঙ্কের ওপর একটা পোশাক ঝুলছে; জানি, ওটা দিদিমার পোশাক, তবু মনে হচ্ছে একটা জীবন্ত প্রাণী যেন অন্ধকারে ছায়া মূর্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালিশে মুখ গুজে, একটা চোখ দরজার দিকে রেখে আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এঘর থেকে কোথাও পালিয়ে যাই। ঘরে দারুন গরম, একটা উৎকট গন্ধ—। মনে পড়ে ৎসিগানকের মৃত্যুর দৃশ্য—রান্না ঘরে সেই রক্ত ধারার স্রোত। আমার মাথাটা আর বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে। এ বাড়িতে যে সব দৃশ্য আমি দেখেছি সেগুলো আমার ভিতর দিয়ে দাগ কেটে চলেছে শীতের রাস্তায়

স্লেজ গাড়ির মত। আমাকে যেন পিষে ফেলছে; আমার অস্তিত্ব যেন শুষে নিচ্ছে।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর দিদিমা একটু কাৎ হয়ে প্রবেশ করল ঘরে। কাঁধ দিয়ে দরজা বন্ধ করল, আর দরজায় ঠেস দিয়ে মূর্তিগুলোর সামনে নীল শিখার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে কান্না ভেজা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'আমার এই দুটো হাতে কী [illegible]ণা হচ্ছে ..,

পাঁচ

সেই বছরই বসন্তকালে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল। ইয়াকভ রয়ে গেল শহরে আর মিখাইল চলে গেল নদী পেরিয়ে। দাদু পলেভায়া স্ট্রীটে চমৎকার নতুন একটা বাড়ি কিনলেন। বাড়িটার নিচুতলায় একটা শুঁড়িখানা ছিল আর ছাদে ভারি সুন্দর একটা ঘর। বাড়ির পেছনে বাগান ছিল। বাগান পেরিয়ে একটা নালা, নালাটা উইলো চারায় ভরে আছে।

দাদু মুচকি হেসে বললেন, 'এখানে দেখছি বেতের অভাব হবেনা।' আমরা দুজনে বাগান দেখার জন্য বের হয়েছিলাম, কাদা ভরা রাস্তায় হাঁটছিলাম। দাদু বললেন, 'এবার আমি তোমাকে বর্ণ পরিচয় শুরু করাব। আর তখন এই বেতগুলো কাজে লাগবে।'

সারা বাড়ীতে ভাড়াটের ভিড়। দাদু নিজের জন্য ও অভ্যাগতদের জন্য একটা ঘর রেখে দিলেন। দিদিমা আর আমি ছাদের ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে রাস্তার দিকে একটা জানলা ছিল। জানলা দিয়ে দেখা যেত প্রতি সন্ধ্যায় অথবা কোন ছুটির দিনে মাতালরা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা চলতে গেলে টলে পড়ে, চীৎকার করে ওঠে আর রাস্তার ধারে পড়ে যায়। মাঝে মধ্যে দেখা যায়, এক একটা লোককে ময়দার বস্তার মত ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ওরা আবার দরজার দিকে এগিয়ে আসে। দরজা খোলা-বন্ধের আওয়াজ শোনা যায়; আর শোনা যায় কিচ্ কিচ্ শব্দ। তারপর মারামারি চলে। জানলা থেকে তাকিয়ে দেখতে ভারি মজা লাগে। দাদু রোজ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। মামারা দুটো আলাদা কারখানা খুলেছে, কারখানাগুলো যাতে চালু হয় সেই উদ্দেশ্যে দাদু দেখাশুনা করতে যান। সন্ধ্যার দিকে মন মেজাজ খারাপ করে ফিরে আসেন।

দিদিমা সেলাই, রান্না আর বাগান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সারাদিন। এক মুহূর্ত তার ছুটি নেই। কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে যেন ঘুর-পাক খেতে হয় তাকে। মাঝে মাঝে নস্যি নেয় আর হাঁচে; আর নিজের মনেই বলতে থাকে 'চিরকাল মানুষ যেন সুখে থাকে। আলিওশা, মানিক আমার, এ্যাদ্দিনে আমরা শান্তির সংসার পেয়েছি। পুণ্যময়ী মেরীমাতার কৃপায় আমাদের সংসারের সব অশান্তি কেটে গেছে।'

আমার কিন্তু এ জীবনকে খুব বেশি শান্তির বলে মনে হয়না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এ-বাড়ির ভাড়াটেরা যেন সবাই অস্থির হয়ে ছুটছে। পাশের ঘরের স্ত্রীলোক হুড়মুড় করে এ-ঘরে ঢোকে। সব সময় তারা ব্যস্ত, একটা কিছু না কিছু তারা যেন করছেই।

দিদিমাকে ওরা ডাকে, 'আকুলিনা ইভানোভনা!'

এ ডাক শুনে আকুলিনা ইভানোভনারও ক্লান্তি নেই। অন্তরঙ্গভাবে সব সময়েই দিদিমা হেসে কথা বলে ; এবং মন দিয়ে ওদের কথা শোনে। মাঝে মাঝে নস্যি গোঁজে নাকে, আর লাল চেক রুমাল দিয়ে নাক ও আঙুল মোছে।

'উকুনের কথা বলছ ? উকুন তাড়াবে ?' বলে চলে দিদিমা, 'শোন উকুন তাড়াতে হলে ঘন ঘন স্নান করতে হবে। আর পিপারমেন্ট দিয়ে শরীরটাকে ঘষে যদি না স্নান করলে তো কথাই নেই। আর যদি চামড়ার ভেতর উকুন থাকে তো বড় চামচের এক চামচ হাঁসের খাঁটি চর্বি আর চায়ের চামচের এক চামচ বিষ আর তিন ফোটা পারা একটা খলের মধ্যে নিয়ে সাতবার মিশিয়ে নিলে ওষুধ তৈরী হয়ে গেল। উকুনের জায়গায় ঘসে ঘসে লাগালে তারপর উকুন সেরে যাবে। তবে হ্যাঁ, কাঠ বা হাড়ের চামচ যেন ভুলেও ব্যবহার কোর না, তামা আর রূপার যেন স্পর্শ না লাগে তাতে। সেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, তা হলে পারাটা নষ্ট হয়ে যাবে।

দিদিমা সব সময়ে সব কথা বলে এমন নয়। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক সময় বলেন, আমার পক্ষে এর ওষুধ বলা সম্ভব নয়। তোমরা বরং পেচেরি মঠে সাধু আসাফেব কাছে যাও।'

দিদিমা সব ব্যাপারেই আছে। ধাইয়ের কাজ করে, বাড়িতে ঝগড়া ঝাঁটি হলে মিটমাট করিয়ে দেয়, ছেলে মেয়ের অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। 'মেরামাতার স্বপ্ন' আবৃত্তি শেখায় অন্য মেয়েদের। গেরস্থালীর সব কাজেতেই তার পরামর্শ পাওয়া যায়। শশা দিয়ে কখন আচার হবে তাতো ঝামেলার ব্যাপারই নয়। শশা থেকে যদি মাটি মাটি গন্ধ না ছাড়ে তাহলে নুন ছড়িয়ে দাও, কোন বিপত্তি নেই। ভাল 'কভাস' তৈরী করতে ভাল আরকের দরকার হয়। কয়েকটা কিশমিশ আর খানিক চিনি—চায়ের চামচের এক চামচ আরকি, এক বালতির জন্যে দরকার। অবশ্য ভারেনেৎস তৈরীর কায়দা অনেক রকমের। এক এক জায়গায় এক এক ধরণের তৈরী করে। দ'নিয়ুব অঞ্চলের লোকেরা অবশ্য অন্য ধাঁচে তৈরী করে। প্রতি জায়গায় স্বাদ, গন্ধ আলাদা।

সারাদিন ধরে আমি দিদিমার পাশে পাশে ঘুরি। বাগানে থাকলে আমি সঙ্গে থাকি, পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ী গেলে আমিও সঙ্গে যাই। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে চা খায়, গল্প করে। এ সময়ের কথা যখন ভাবি তখন আমার দয়ালু এই বুড়ীর কথা মনে হয়।

মাঝে মধ্যে কোথা থেকে মা আসত, অল্প কিছু দিন থেকে চলে যেত। মা ছিল শীতকালের মত নিরুত্তাপ, ধূসর। কোন বারেই বেশি দিন থাকতনা মা ; কোন গভীর ছাপ কখনো রেখে যেতনা।

একদিন আমি দিদিমাকে বললাম, 'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি ডাইনী ?'

হেসে দিদিমা বলত, 'পাগল ছেলের কথা শোন ! তোর এ-কথা মনে এল কেন রে ?' তারপর গম্ভীর ভাবে বলত, 'তুকতাক মন্ত্র জানা অত সহজ নয়। আমার তো অক্ষর জ্ঞানও নেই। আর তোর দাদু ভারি পণ্ডিত লোক। আমি তার বিদ্যে বুদ্ধির দিক থেকে সত্যিই অপাত্র।'

দিদিমা তার জীবনের এক নতুন পরিচ্ছেদের কাহিনী বলল আমাকে, 'আমি তার মতই অনাথ ছিলাম ; একবারেই অনাথা! বাপ ছিল না। আমার

মা ছিল নেহাতই গরীব, অঙ্গহানি ছিল বলে কোথাও কাজ পেতনা। মা যখন খুব ছোট, তখন এক বড়লোকের বাড়ীতে কাজ করত। এক বার সে লোকটার ভয়ে মা জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে যায়। ফলে পাঁজরে আর কাঁধে চোট লাগে, আর ধীরে ধীরে তার একটা হাত শুকিয়ে যায়। ডান হাতটা এমনি ভাবে অক্ষম হয়ে যায়। লেস বুনতে মা ছিল পাকা। কিন্তু ভদ্রলোক যখন দেখলেন মাকে আর কোন কাজে লাগবে না তখন মানে মানে তাকে বিদায় করে দিলেন। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে থাকা যায় না, তাছাড়া নুলো লোকের আবার ভাগ্য কিসের। সুতরাং ভিক্ষে ছাড়া কোন পথ রইল না। যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়ে বালখনা বলে জায়গায় ছুতোরের কাজ আর বোনার কাজের জুড়ি ছিল। এক দল আরেক দলকে টেক্কা মারত। আমাকে নিয়ে মা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত। শরৎ আর শীতে এভাবেই চলত। তারপর দেবদূত গাভ্রিলোর তলোয়ারের খোঁচায় যখন তুষার কেটে পড়ত তখন বসন্ত আসত। বেরিয়ে পড়তাম গাঁ-ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে। চলার পথের কোন শেষ ছিল না, হাঁটার কোন বিরাম ছিল না। যতক্ষণ না ক্লান্ত হতাম ততক্ষণ হাঁটতাম। আমরা প্রায়ই 'মুরাম'-এ অথবা 'ইউরিয়েভেৎস'-এ ভোগা আর শান্ত ওকা নদীর ধারে নানা জায়গায় যেতাম। ভারি ভাল লাগত দেশে দেশে ঘুরতে বসন্তের দিনগুলিতে। নরম মাটি, তুলোর মত ঘাস আর ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে মাঠ-ঘাট। ঠিক মনে হত মেরীমাতার আশীর্বাদ যেন ছড়িয়ে আছে। দেখে চোখ জুড়োত। খোলা আকাশের নীচে [illegible] প্রান্তরে এসব দেখলে কার না মন ভরে যায়। এসব দেখে আমার মায়ের মন আবেগে ভরে যেত তার কণ্ঠে সুর এসে পড়ত। মায়ের গানের গলা ছিল ভারি মিষ্টি। মা যখন গান গাইত তখন মনে হত নিরব হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতি যেন সে গান শুনছে। আমার বয়স যখন বছর নয়েক তখন আর আমাকে নিয়ে মা ভিক্ষায় বের হত না। তখন মা পাকাপাকিভাবে বালখনাতেই আস্তানা তৈরী করল। রোজ দোরে দোরে ভিক্ষে করত আর উপাসনার দিন গির্জার চাতালে গিয়ে বসত। আমি বাসাতেই থাকতাম, লেস বোনা শিখতাম। আমার মনে হত শিখতে আমার বড় বেশি সময় লাগছে। এর কারণও ছিল। কেননা, আমি চেয়েছিলাম কিভাবে রোজগার করা যায় যাতে মাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। কাজ শিখতে শিখতে যখন আমার ভুল হত, তখন দুচোখ ফেটে জল আসত। যাহোক, বছর দুইয়ের মধ্যে আমি ভাল মতই কাজ শিখে নিয়েছিলাম। সারা শহরে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যখনই কোন বড় ধরণের কাজ আসত, সবাই ছুটে এসে পড়ত আমার কাছে। বলত 'কই গো আকুলিয়া, তৈরী হও, কাজ এনেছি।' [illegible] ভারি আনন্দ পেতাম। অবশ্য তাতে আমার অহংকারের কিছু ছিল না, সবই মায়ের কাছে শিখেছি। নুলো হাতে মা নিজে বুনতে পারত না ঠিকই, কিন্তু নির্দেশ দিত চমৎকার। এরপর আমি নিজেকে আর হীন ভাবতাম না। মাকে একদিন বললাম, তুমি আর ভিক্ষে করতে পারবেনা. হাতের কাজ যা জানি তাতে অন্ততঃ তোমায় খাওয়াতে পারব। এতে মা হেসে জবাব দিল, 'ওরে আমার বাছারে!

তোর টাকা তোরই থাক্। বিয়ের সময় যৌতুক লাগবে। এর কিছুদিনের মধ্যে তোর দাদুর আবির্ভাব। তখন ওর বয়স হবে বছর বাইশ। দিব্য কান্তি চেহারা, চোখে পড়ার মত। তার আগেই সে বুলার্ক দলের মোড়ল হয়েছে। তার মা আমাকে দেখে পছন্দ করল। যখন জানল যে আমরা ভিক্ষে করে বড় হয়েছি, তখনই বুঝতে অসুবিধা হল না যে আমি বৌ হিসেবে খুবই খাটিয়ে হব। সে নিজে মিষ্টি রুটি বিক্রী করত, আর স্বভাবটা ছিল একটু কড়া প্রকৃতির। সে কথা যাক। কড়া মানুষের সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। ঈশ্বর সবই দেখেন। আমাদের সাহায্য না নিয়ে তিনি দেখেন সবই। আর শয়তানদের ভাল লাগে।'

প্রাণ খুলে দরাজ গলায় দিদিমা হাসল। নাকটা কেঁপে উঠল, চোখ দুটোয় তার স্নেহের পরশ ছিল। ভাষায় যা ব্যক্ত করা যায় না তা দৃষ্টিতে বলা যায়। দিদিমা সেদিন তাই বলেছিল আমায়।

এক সন্ধ্যায় আমি, দিদিমা আর দাদু বসে চা খাচ্ছিলাম। দাদুর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই বিছানায় বসে তিনি চা খাচ্ছিলেন। খালি গায়ে ছিলেন তিনি, কাঁধে ছিল একটা তোয়ালে। সেই তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছছিলেন আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিলেন। নিশ্বাসে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল। তার মুখটা ছিল লাল আর ফুলো ফুলো। চা নেওয়ার জন্য যখন হাত বাড়ালেন, তখন তার হাতটা কাঁপছিল। তাকে কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিল—যেটা তার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না।

'চায়ে চিনি দিচ্ছ না কেন?' আদুরে গলায় দাদু দিদিমাকে নালিশ জানালেন।

'চিনির চেয়ে মধুটা তোমার শরীরের পক্ষে উপকারী।' দিদিমা কোমল অথচ কড়া ভাবেই জবাব দিয়েছিল।

ঘন ঘন নিশ্বাস আর ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে দাদু বললেন, 'দ্যাখ গিন্নী, আমাকে মরতে দিও না যেন।' এই বলে এক নিশ্বাসে চা'টা খেয়ে নিলেন।

'তোমার অত ভাবনা কিসের? কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে?'

'এই তো আসল কথা। আমি যদি সত্যিই মরে যাই এখন, তাহলে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাবে। এ্যাদ্দিন বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হবে।'

'এবার শুয়ে পড় দেখি।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন দাদু। কালো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চাটলেন। তারপর বিছানা ছেড়ে এমনভাবে ধড়মড়িয়ে উঠলেন, যেন মনে হল কিছুতে দংশন করেছে।

'গিন্নী এধারে শোন। যত তাড়াতাড়ি হোক মিখাইল আর ইয়াকভের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বউ আর ছেলেপুলে হলে ওরা হয়তো শুধরে যাবে, কি বল?'

শহরে বিয়ের উপযুক্ত কোন কোন মেয়ে আছে তা দাদু যেন ভাবতে থাকেন। দিদিমা কোন মন্তব্য করে না, শুধুমাত্র চা-এ চুমুক দিতে থাকে। আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ ছিল, কোথায় কি একটা অপরাধ করে বসেছিলাম—তাই জানলার ধারে বসেছিলাম। সূর্য তখন অস্তায়মান, তার সিঁদুরে আলোয় কি চমৎকার লাগছিল সব।

নীচে বাগানের বার্চ গাছের ডালে ডালে গুবরে পোকার আনাগোনা। গুন গুন শব্দে ওরা উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ী থেকে পিপে তৈরীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছুরি শানানোর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। বাগান পার হলেই নালা। সেখানকার ঝোপেঝাড়ে খেলা করছে ছোট ছেলেমেয়েরা—তাদের কল-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। আমার ওদের সাথে মিলতে ইচ্ছে করছে। সন্ধ্যা পার হয়ে যাওয়ার দুঃখ যেন আমার মনকে নাড়া দেয়।

এমন সময় দাদু হঠাৎ একটা বই হাতে নিয়ে তালুর ওপর ঠুকলেন। তারপর আমাকে ডাকলেন, 'ওহে, অকালপক্ক ছোকরা, এদিকে এসতো! বস এখানে। দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? অ-য়ে অজগর, আ-য়ে আম, হ্রস্ব-ইয়ে ইঁদুর। আচ্ছা এবার বলতো দেখি এটা কি?'

'আ-য়ে আম।'

'ঠিক হয়েছে। এটা কি?'

'হ্রস্ব-ইয়ে ইঁদুর।'

'হল না। এটা হচ্ছে অ-য়ে অজগর। আচ্ছা, এবার এখানে দ্যাখ্। এটা দীর্ঘ ঈ। দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল। হ্রস্ব উ-য়ে উট। পড়লি তো?' এবার বল দেখি এটা কি?'

'হ্রস্ব-উয়ে উট।'

'বাঃ, বেশ। এটা ?'

'দীর্ঘ-ঈয়ে ঈগল।'

'বেশ, বেশ! এটা?'

'অ-য়ে অজগর।'

দিদিমা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। দাদুকে বললেন, তুমি অত বোলনা; চুপ করে শুয়ে থাক।'

'তুমি থাম; বরং এতেই আমি ভাল আছি। ভাবনা-চিন্তাগুলো মনে জট পাকায় না। পড়ে যা তুই লেক্সেই।'

দাদু আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে, সেই হাতেই অক্ষরগুলো দেখালেন। অপর হাতে বই ধরেছেন আমার চোখের সামনে। পিঁয়াজ আর ভিনিগারের গন্ধ বের হচ্ছে দাদুর গা থেকে। সেই গন্ধে আমার দম বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা এসেছে দেখলাম দাদুর মধ্যে। তিনি চীৎকার করে বলছেন, 'ভ-য়ে ভল্লুক, ম-য়ে মা।'

শব্দগুলো আমার পরিচিত। কিন্তু স্বাভাবিক অক্ষরগুলোর সঙ্গে মিল নেই। ভ-অক্ষরটার সাথে ভল্লুকের মিল খুঁজে পাইনি, যতটা পেয়েছি পোকার সঙ্গে। দীর্ঘ ঈ-কে দেখে কিছুতেই ঈগল মনে করা যায় না। কুঁজো গ্রিগরির সঙ্গে ওই অক্ষরটার যেন খুব মিল। পেটমোটা ম-অক্ষরটা দেখে মনে হয় আমি ও দিদিমা যেন এক সঙ্গে রয়েছি। আর সব অক্ষরগুলোর মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যার সঙ্গে আমার দাদুর চেহারার মিল চমৎকার। দাদু ছাড়বার পাত্র নন, একটার পর একটা অক্ষর আমায় চিনিয়ে চলছেন। এক এক বার ক্রমিক অনুসারে অক্ষরগুলো ধরছেন, আবার উল্টেপাল্টেও ধরছেন। দুজনেই এক চরম উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছিলাম। আমি চীৎকার করে চলেছি, আমার কাণ্ড দেখে দাদু হেসে

উঠলেন। হাসতে হাসতে কাশি এল তার। এক হাতে বই আর অন্যহাতে বুক চেপে তিনি বললেন, 'দেখ গিন্নী, ছেলেটার কাণ্ড দেখ। ওরে আস্ত্রাখানী শয়তান এমন হেঁকে হেঁকে পড়ছিস কেন রে?'

'আমি হাঁকছি না আপনি হাঁকছেন?'

দাদু ও দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভারি ভাল লাগছিল। টেবিলের ওপর দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে গালে হাত রেখে দিদিমা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমরা দুজনে থামো বাপু। মাথার খিল খুলে যাবার যোগাড় হয়েছে!'

দাদু নরম সুরে বললেন, 'আমার না হয় শরীর বেগতিক, তাই আমি চেঁচাচ্ছি, কিন্তু তোর তো কিছু হয়নি, তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ঘামে ভেজা মাথা নাড়তে নাড়তে দিদিমাকে দাদু বললেন, 'নাতালিয়া যে কথাটা বলেছিল তা দেখছি ঠিক নয়। ওর স্মৃতিশক্তি দুর্বল নয় মোটেই। আমি তো দেখছি ও সব কথাই মনে রাখতে পারে। ঠিক আছে খাঁদা-দাঁত আমার! এবার উঠে পড়ে লাগ দেখি!'

তারপর হাসতে হাসতে অনেক ঠট্টা-তামাশা করে আমায় বিছানা থেকে হটিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যস আর নয়, বইটা নিয়ে যা আর কোমর বেঁধে পড়তে শুরু কর। কাল যদি সব পড়া ঠিক বলতে পারিস, তবে পাঁচ কোপেক পুরস্কার পাবি।'

হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে যেতে তিনি আমায় জাপটে ধরলেন আর বিষণ্ণ-স্বরে বললেন, 'তোর মা'র মনে কি একটুও দরদ নেই রে? এমন ছেলেকে কেউ ফেলে যায়!'

'ওসব কথা কেন তুলছ? বলে কিছু লাভ আছে?' বলল দিদিমা।

'সাধ করে কি বলি? অনেক দুঃখে আমি বাধ্য হয়েই বলি…ইস্ অমন মেয়েটা উচ্ছন্নে গেল!' ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আমাকে। 'যা এবার বাইরে যা। একটু বেড়িয়ে আয়। খবরদার, রাস্তায় যাসনে। উঠোন আর বাগানেই খেলবি, বুঝলি?'

বাগানে যেতে আমার মনটা উসখুস্ করছিল। জানি, যে মুহূর্তে আমি বাগানে গিয়ে বাঁধের ওপর দাঁড়াব সেই মুহূর্তে উল্টোদিকের ঝোপঝাড় থেকে ছেলের দল আমাকে গাজর ছুড়বে। আমিও পাল্টা ছুড়তে থাকব। আমায় দেখলেই ওরা চেঁচিয়ে উঠবে, 'টুসকা আসছে। নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।' তারপর ওদের অস্ত্রাগার থেকে সবাই অস্ত্র যোগাড় করতে থাকবে।

আমাকে টুসকা বলে ডেকে কি বোঝাতে চায় জানিনা। তবে এতে আমি একটুও অপমান-বোধ করি না। কিন্তু যখন দেখি ওরা দঙ্গল বেধে এক দিকে আর আমি একা আরেক দিকে, তখনই ভারি মজা লাগে। একটা পাথর একজনের গায়ে কোনমতে লাগলে ওরা সব পালায়, ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নেয়। এ লড়াইয়ে কিন্তু রাগ রেষারেষি থাকে না, ক্ষোভও থাকে না।

বর্ণ-পরিচয় হতে আমার খুব বেশি সময় লাগে নি। এইজন্যেই দাদু আমার প্রতি নজর দিচ্ছিলেন আর তার বেত মারার ইচ্ছেটাও কমে গিয়েছিল। কিন্তু এতে একথা বলছি না যে আমি খুব ভাল ছেলে হয়ে উঠেছিলাম। বরং যত বড় হয়েছি, ততই ডানপিটে হয়ে দাদুর বিধিনিষেধ ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তবুও দাদু বেত না মেরে আমাকে শুধু তিরস্কার করতেন আর ঘুসি তুলে শাসাতেন।

অকারণে দাদুর কাছে আমি কম মার খাইনি। একদিন তো সোজাসুজি দাদুর মুখের ওপর সপাট বলেই ফেললাম।

দাদু উত্তরে আমার থুতনি ধরে চোখে চোখ রেখে বললেন, 'কি ব-ল-লি ?' তারপর একটু টেনে টেনে বললেন. 'ওরে গাধা, তোকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হবে কি হবে না, তা ঠিক করব আমি। তুই ব্যাটা কেরে ? আমি যা ভাল বুঝব—করব, বুঝলি হতভাগা ?'

আমি ফিরে যাচ্ছি, তিনি ঘাড় ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চোখে চোখ মেলে বললেন, 'তুই চালাক না গবেট—কোনটা ?'

'জানি না' !

'জানিস না। তবে শোন্, ধূর্ত হবি সব সময়—গবেট হওয়ার চেয়ে ওটাই ঢের ভাল। গবেটের বুদ্ধি ভেড়ার মত, বুঝেছিস ? এবার যা, খেলা করগে।'

কিছুদিনের ভেতর আমি প্রার্থনা-সঙ্গীত পড়তে শুরু করলাম। বইয়ের যে কোন লাইনের প্রতি অক্ষর আমি ধরে ধরে পড়তে শিখেছি। সচরাচর সন্ধ্যায় পড়তে বসি। চা খাওয়ার পরই পড়ার সময়। প্রতিবারই পুরো একটা স্তোত্র পড়তে হয়।

'স-য়ে সময়, হ্রস্ব-উ-য়ে উট, খ-য়ে খাবার, ভ-য়ে ভালুক, ও-কারে ওড়না, গ-য়ে গগন', দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল,···নির্বোধ এভাবে বানান করে করে আমি পড়ি। পড়তে পড়তে আমার বিরক্তি আসে। নানা প্রশ্ন মনে দানা বাঁধে।

'আচ্ছা, নির্বোধ কাকে বলা যায় ? ইয়াকভ মামা ?'

দাদু চটে যান। বলেন, 'মাথায় দেব গাঁট্টা। তখন টের পাবি নির্বোধ কে ?' দাদু যখন এই ধাঁচের কথা বলেন, তখনই আমি বুঝি সত্যিকারের রাগ দাদুর হয় নি, তিনি অভ্যেস বশে বলেন। আমার ধারণাটা যে অমূলক নয় তা টের পাই। একটু বাদেই সব ভুলে বিড়বিড় করে আপন মনে বলেন, 'গান বল, খেলা বল তার বেলা একেবারে রাজা ডেভিডের সমান ! আর কাজের বেলায় আবেসালামের শয়তানের জুড়ি। সারাদিন শুধু নাচ গান আর হল্লা ! কেন রে বাপু ? নেচে বেড়ালে, ফুর্তি করলে কি হবে ? নাচলে কত দূর যাওয়া যেতে পারে ?'

আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ; ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন দূরে। ওঁর দৃষ্টিতে যেন একটা বিষণ্ণতা রয়েছে। ভারি অন্তরঙ্গ বলেই মনে হয়। মুখের কাঠিন্যটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। বিষণ্ণ চিন্তায় নিজের অজ্ঞাতে নখ দিয়ে টোকা মেরে চলেছেন।

'দাদু. ও দাদু !

'কি রে ?'

'একটা গল্প বলবে আমায় ?'

'পড়না, বই পড়না।' ধমকে ওঠেন। এমনভাবে চোখ রগড়াতে থাকেন যেন এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠেছেন। 'প্রার্থনা-সঙ্গীতে যেন মন নেই দেখছি ! গল্প পেলেই হল আর কি !'

দাদুর কথা শুনে মনে হয়, তিনি নিজেও যেন প্রার্থনা-সঙ্গীতের চাইতে গল্প বলতে বেশি পছন্দ করেন। প্রার্থনা-সঙ্গীতের স্তোত্রগুলোকে তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন। রোজ রাতে শোবার আগে তিনি কয়েকটা স্তোত্র আবৃত্তি করেন। এই স্তোত্র পাঠ তার প্রতিদিনের রুটিন হয়ে উঠেছে। গির্জার পাদরিরা যেমন উপাসনা পাঠ করেন তেমনি তিনি স্তোত্র পাঠ করেন।

শেষ পর্যন্ত আমাকে কোন রকমে ভোলাতে না পেরে বৃদ্ধ বলা শুরু করেন, 'ঠিক আছে বাবা, বলছি। শোন তাহলে। আর প্রার্থনা-সঙ্গীত তো তোর জীবদ্দশা পর্যন্ত থাকবেই। কিন্তু আমি আর কদ্দিন? আমার তো ওপারের ডাক এল বলে!' পুরনো আরাম কেদারার সেলাই করা দিকটায় ঠেস দিয়ে বসে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চোখ দুটো ছাদের দিকে রেখে ভাবতে থাকেন। ব্যবসায়ী জায়েভ-এর দোকান লুট করার জন্য একবার নাকি বাক্স খুলতে ডাকাতের দল এসেছিল। বিপদ সংকেত হিসেবে ঘন্টা ঘরের দিকে দাদুর বাবা ছুটছিলেন। ডাকাতের হাতে পড়তে হল তাকে। তারা তাঁর শরীরটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিল, আর সেই টুক্‌রোগুলো ছড়িয়ে দিল পথে।

'আমি তখন খুব ছোট। এসব ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখিনি, মনেও নেই। আমার মনে পড়ার মত ঘটনা হচ্ছে ফরাসীরা যখন এদেশে এল। ১৮১২ সালের কথা। আমার বয়স তখন বছর বারো হবে। ত্রিশজন ফরাসীকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছে বালখনাতে! মানুষগুলোর হাড়জিড়জিরে চেহারা একেবারে ভিখিরির মত। তারা শীতে কাঁপছে; ঠাণ্ডায় হাত পা যেন অবস হবার যোগাড়। উঠে দাঁড়াবে এমন বল নেই শরীরে। চাষীরা লোকগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু লোকগুলোর সাথে সান্ত্রীরাই ওদের চাষীদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল। এর পর সৈন্যরা এসে চাষীদের হটিয়ে দিল। এরকম ঘটনা পরে আর হয়নিক! পাশাপাশি বসবাসে ওরা অভ্যস্ত হল। ফরাসীরা জাত হিসেবে চতুর, ভাবনে যে কোন অবস্থার সঙ্গে ওরা মানিয়ে নিতে জানে। আমুদে জাত, গলা ছেড়ে গান গায় ওরা। ফরাসী বন্দীদের দেখার জন্যে চারদিক থেকে লোক আসে। ত্রয়কা চেপে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসে। কেউ কেউ তাদের গালি দিত, কেউবা শাসাত। আবার কোন কোন লোক মারধর দিয়ে বসত। আবার এমন লোকও ছিল যারা ওদের টাকা পয়সা দিত, পুরনো পোশাক পরিচ্ছদ দিত। এবা আন্তরিকতা দেখাত। একটা বুড়ো গোছের লোক, সম্ভ্রান্ত কেউ হবেন—তিনি তো কেঁদেই ফেললেন। মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন 'এই বোনাপার্টটার জন্যই এই হাল হল।' ভাবতো দেখি, কী রকম দরাজ মনের মানুষ তিনি। বিদেশীদের জন্য তাঁর কতখানি সহানুভূতি!'

এক মুহূর্ত্ত দাদু চুপচাপ হয়ে যান, মাথার চুলগুলোয় হাত বোলাতে থাকেন। আবার রোমন্থন করে চলেন সে পুরান-স্মৃতিকে। সে সময় হাড় কাঁপানো শীত। তুষার ঝড় চলছে। বাড়ী ঘরে লোক বন্দী হয়ে আছে। এর মধ্যে ফরাসীরা দৌড়ে এসেছে আমার মাকে ডাকতে। আমার মায়ের ছিল পিঠে তৈরি করে বিক্রীর ব্যবসা। ওরা জানলায় টোকা দিল। মা ওদের ঘরে ঢুকতে দিতেন না; ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে গরম পিঠে দিত। ওরা সেই পিঠে দিয়ে হাতে গায়ে সেঁক দিত। কিভাবে যে ওরা সহ্য করত বুঝতাম না। ওরা গরম দেশের লোক, এ আবহাওয়ায় ওরা মোটেও অভ্যস্ত ছিল না। ঠাণ্ডায় যে কত লোক ওদের মরেছিল তাই বা কে মনে রাখে? আমাদের বাগানের দিকে যে স্নানঘরটা ছিল, তাতে দুজন ফরাসী থাকত। একজন অফিসার আর তার এডজুন্টাট। লোকটার নাম মিরন। লম্বা-রোগা চেহারা। মেয়েদের লম্বা ঝুলের কোট পড়ে ঘুরে বেড়াত। লোকটা মদ খেয়ে মাতলামি করলেও এমনিতে বেশ ভাল ছিল।

আমার মা বীয়ারেরও ব্যবসা করত। লোকটা তা কিনত। যতক্ষণ না নেশা চূড়ান্ত হচ্ছে ততক্ষণ থামত না। খেয়ালে সে গান জুড়ত। এখানে থেকে থেকে আমাদের ভাষাও শিখেছিল। ভাঙা ভাঙা ভাষায় বলত, 'এদেশটা সাদা নয়, কালো—খারাপ বলা যায়। ওর বক্তব্য ঠাওরাতে কষ্ট হত না, সত্যি কথাই বলত সে। উত্তরাঞ্চলের আমাদের এদিকটা স্বর্গরাজ্য নয়। ভলগা পেরিয়ে দক্ষিণে নেমে গেলে বরফ দেখা যায় না। কাস্পীয় সাগর পার হলে সে দেশেতে কস্মিনকালেও বরফ পড়েনা। এ সব ঠিক। ধর্মের বই প্রার্থনা-সঙ্গীতে এ সব আছে। যীশু ওদেশেই জীবন কাটিয়েছেন। এখন আমরা প্রার্থনা-সঙ্গীত পড়ছি তো, এরপর খবর সুসমাচার।'

বলতে বলতে দাদু স্তব্ধ হয়ে যান। যেন ঝিমিয়ে পড়েন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে আধ-বোজা চোখে দেখেন, আর তার সমস্ত শরীরটা ছোট ও খাড়া হয়ে ওঠে।

'কই গো দাদু ?' আমি তাগাদা দিই।

চমকে উঠে দাদু আবার বলতে থাকে, 'হাঁ, কি যেন বলছিলাম? হাঁ, ফরাসীদের কথা। ওরাও তো আমাদের মতই মানুষ, নিকৃষ্ট জাতের নয়। ওরা আমার মা'কে মাদাম বলত। ফরাসীরা যে কোন ভদ্রমহিলাকে মাদাম বলে। কিন্তু এই 'ভদ্রমহিলাটি' ছিল অদ্ভুত ধরণের পরিশ্রমী। বড় বড় আড়াইমনি ময়দার বস্তা অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেত। একবার আমার মাথার চুলের মুঠি ধরে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। তখন আমি উনিশ বছর বয়সের যুবক। ব্যাপারটা সত্যই ভাবার মত। আমার চেহারাটাও একদম রোগা পটকা ছিল।

এডজুটান্ট মিরন ছিল ঘোড়া-অনুরাগী লোক। অযাচিতভাবেই লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘোড়া দেখত, পরিচর্যা করার অনুমতি চাইত। প্রথম প্রথম কেউ তাকে বিশ্বাস করত না, কারণ, হাজার হোক, শত্রুপক্ষের লোক তো! যদি ঘোড়ার সর্বনাশ করে দেয়। পরে অবশ্য গাঁয়ের লোকে তাকে ডেকে নিয়ে যেত। বলত, 'ওহে মিরন একবার সময় করে এসো তো হে।' মিরনের মাথার চুলগুলো ছিল গাজরের মত লাল; প্রকাণ্ড নাক, বেঁটে, ঠোঁট পুরু। ঘোড়ার চিকিৎসা সে জানত, পরে সে ঘোড়ার চিকিৎসক হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। শেষে ওর মাথা খারাপ হয়েছিল! দমকলের লোকেরা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে! আর ওর সাথে যে অফিসারটি এসেছিল তার যে কি হল! লোকটা শুকিয়ে যেতে লাগল। তারপর এক বসন্তের সকালে দেখা গেল যে সে মরে পড়ে আছে সেই স্নানঘরের জানলাতে।

লোকটা সত্যি ভাল ছিল। ওর জন্যে আমি কেঁদেছিলাম! লোকটার ভাষা বুঝতাম না বটে, তবে এটা বুঝতাম যে ও যা বলছে, তা সোহাগ করেই বলছে। তার গলার স্বর ছিল বড় মিষ্টি—আমার খুব ভাল লাগত। জগতে একজন মানুষ আর একজনকে ভালবাসছে এটাই তো মেলে না। একবার হয়েছিল কি, আমাকে ওই লোকটা ফরাসী ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা পারেনি। মা বাধা দিয়েছিল। পরে আমাকে নিয়ে পাদরির কাছে গিয়েছিল। সেই পাদরি মাকে অফিসারটির নামে নালিশ করতে এবং আমাকে বেদম প্রহার দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। আমাদের কালে সত্যিই অনেক কষ্ট করতে হত।

একালে তো তেমনটি হয় না। এই ধরনা আমার কথা। কী কষ্টই না আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল!'

দাদু যখন গল্প বলেন, তখন তার মধ্যে আবেগ আসে। সেই আবেগে যে শুধু তার গলার স্বরটার প্রতিক্রিয়া হয় এমন নয়, শরীরেও এর প্রক্ষেপ পড়ে। অন্ধকার ঘরে দাদুকে যেন বেখাপ্পা ধরণের বড় দেখাচ্ছিল। দাদুর মুখে ওর জীবন কাহিনী শুনতে আমার ভাল লাগে না। আর বলার মাঝ মাঝে যে উপদেশগুলো তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে দিয়ে থাকেন তা-ও আমার ঠিক মনোমত নয়।

আমার দাদুর মুখে এমন কথা শুনেছি যাতে কেবল ব্যথাই পেয়েছি। ব্যথা পেয়ে তাকে ভুলতে পারিনি, আর পারিনি বলেই বার বার মনে হয়েছে। তিনি আমাকে এযাবৎ যা বলেছেন তা সত্য কাহিনী, রূপকথার গল্প নয়। দাদুকে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্তই হয়েছেন। আর সেজন্য ইচ্ছে করেই আমি তাকে বারবার হাজারো প্রশ্ন করে থাকি।

'আচ্ছা দাদু, বলতো দেখি, তোমার কাছে কারা ভাল, রুশরা না ফরাসীরা?'

'অতশত জানিনা বাপু, আমি তো ফ্রান্সে যাইনি কোনদিন। তাই তাদের জানিনা।' তারপর একটু কি যেন ভেবে তিনি বলেন, 'ইঁদুর যখন গর্তে থাকে তখন তাকে ভালই বলা হয়।'

'তাহলে রুশরা? রুশরা কি সকলে ভাল?'

'সকলে নয়, কেউ কেউ ভাল। ওরা যখন ভূমিদাস ছিল আজকের তুলনায় তখন ওদের অবস্থা ভাল ছিল। ঠিক যেন ইস্পাতের মত। এখন স্বাধীনতার পর অন্নের সংস্থান নেই। সমাজের যারা ভদ্রলোক রয়েছে, তারা যেন পাষাণ হৃদয়—দয়ামায়া বলে ওদের কিছু নেই। অথচ ওদের মগজে বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব নেই। আর সব ভদ্রলোক যে এ ধরণের হয়, তা বলছি না। কেউ কেউ এমন ধারাই হয়। আবার কোন কোন ভদ্রলোককে একেবারে গবেট বলা যেতে পারে। ওরা যেন ঠিক বস্তার মত—যা দিয়ে ভরাট কর তাই-ই চলে যাবে। আমাদের মধ্যে অন্তঃসারহীন লোকের সংখ্যাই বেশি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কটা মানুষ, কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেই দেখবি শুধুই খোসা, শাঁসটাকে কুড়েকুড়ে পোকায় খেয়েছে। কিন্তু আজ আমাদের সবচেয়ে কোন জিনিষটা দরকার জানিস্? প্রথম দরকার হচ্ছে জ্ঞানের। আর তারপর শানিত বুদ্ধির। কিন্তু কেমন করে তা হবে?'

'আচ্ছা, রুশরা কি খুব শক্তিশালী?'

'কেউ কেউ আছে বৈকি। শক্তিটাই প্রধান নয়, তাকে দক্ষতা দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এমন বহু লোক দেখা যায় যারা খুবই শক্তিশালী, অথচ একটা ঘোড়ার চেয়েও দুর্বল।'

'আচ্ছা দাদু, ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের এই যুদ্ধ বাধার কারণ কি?'

'যুদ্ধের ঘটনাটার দায়দায়িত্ব জারের, কেননা ওটা তিনিই ঘটিয়েছেন। আমরা সাধারণ মানুষ তা বুঝব কেমন করে?'

আমি একবার দাদুকে বোনাপার্টের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এই প্রশ্নের জবাবে দাদু যা বলেছিলেন তা আমার স্মৃতিপট থেকে কখনো ম্লান হয়ে যাবে না। দাদু আমায় বলেছিলেন, 'বোনাপার্ট ছিল সাহসী মানুষ। সে গোটা পৃথিবীটাকে জয় করতে চেয়েছিল। কেন বলতে পারিস? লোকটার ইচ্ছে ছিল,

জমিদারী, বড় চাকুরী সব উচ্ছেদ করে দিতে। মানুষে মানুষে বৈষম্যটা দূর করতে চেয়েছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ থাকবে শুধু মাত্র নামে ; আর কোন দিকে নয়। এমনকি ধর্ম কর্মে সবাইকে এক হতে হবে। এর অবশ্য কোন যুক্তি নেই। পৃথিবীতে কাঁকড়া ছাড়া কোন প্রাণী এক ধাঁচের নয়। এই দ্যাখনা মাছ, কত ধরণের হয়ে থাকে। চাঁদা মাছ আর সামন মাছ তো পরস্পরের শত্রু। আর হেরিং মাছ, স্টার্জন মাছ পাশাপাশি থাকতেই পারে না। এদেশেও বোনাপার্টের মত লোক ছিল, যেমন স্তেপান, রাজিন বা এমেলিয়ান পুগাচভ। থাক, এদের কথা আরেকদিন বলা যাবে খন।'

মাঝে মাঝে চোখ দুটো বড করে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দাদু। বড় অস্বস্তি বোধ করি। তার ভাবসাব দেখে মনে হয় তিনি এই প্রথম আমায় দেখছেন। দাদুর মুখে আমার বাবা অথবা মায়ের কোন প্রসঙ্গ শুনিনি।

আমরা দুজনে যখন বসে কথা-বার্তা বলি, তখন দিদিমা মাঝে মাঝে এসে আমাদের সাথে যোগ দেয়। এক ধারে বসে কথাগুলো শোনে। তারপর এক সময়ে যেন হঠাৎ স্মৃতিটা প্রখর হয়, আবেগে উথলে ওঠে। বলে, 'কর্তা মনে আছে, সেই সুরোম তীর্থের কথা ? মেরীমাতার কাছে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম আমরা ? মনে পড়ছে—কত সাল হবে বলতো ?'

'সালটা আমার মনে নেই। তবে যে বছর কলেরার মড়ক হয়েছিল তার আগে। সেই বছরেই বোধহয় যে বার ওলন্‌চান্‌রা বনে পালিয়ে গিয়েছিল আর তাদের খুঁজে বার করার জন্যে সারা বন তোলপাড় করা হয়েছিল—সেই বছরই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়ছে। ওদেরকে কি ভয়ই না করতাম আমরা !'

'হুঁ,—তা বটে।'

ওলন্‌চান্‌দের কথা আমি দাদুকে জিজ্ঞেস করি। কেন ওরা বনে পালিয়েছিল তারও কারণ জানতে চাই।

দাদু ইচ্ছে না থাকলেও সংক্ষেপে জবাব দেন, 'ওরা হচ্ছে ভূমিদাস। জারের কারখানায় কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।'

'ওরা ধরা পড়ল কিভাবে ?'

'ধরা আর পড়বে কি করে ? বাচ্চারা দু-দলে বিভক্ত হয়ে যেমন একদল আরেক দলের পিছনে ধাওয়া করে, ঠিক তেমনি। ধরা পড়লে রক্ষে নেই। চাবুকের পর চাবুক চলবে, ফেটে যাবে, রক্ত বের হবে—তারপর কপালে দাগী বলে ছাপ দিয়ে দেওয়া হবে।'

'কেন ? ছাপ মারবে কেন ?'

'তা বলতে পারি না, সবটাই ধোঁয়াটে ব্যাপার। কেউ বলতে পারতো না কে দোষী ; যারা পালিয়েছে তারা, না যারা পাকড়াও করতে ছুটেছে—তারা।'

দিদিমা আবার মাঝে মধ্যে যে প্রসঙ্গ চলে তার থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। দাদুকে বলে, 'হ্যাগো ! তোমার মনে পড়ে সেই আগুন লাগার ব্যাপারটা ?'

দাদু যেন স্মৃতিতে তলিয়ে খুঁজে না পেয়ে জেদের সঙ্গে বলেন, 'কোন আগুন লাগার কথা বলছ ?'

পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে আমি যে এখানে আছি সে কথা দুজনেই ভুলে

যান। দুজনে নীচু গলায় কথা বলেন, সেই কথায় এমন একটা মাত্রাবোধ আছে যেন মনে হয় দুজনে একসঙ্গে একটা গান গাইছেন। সেই গানের বিষয়বস্তু বড় করুণ—কবে আগুন লেগেছিল আর কবে মহামারী শুরু হয়েছিল, কোথায় মানুষকে পশুর মত মারা হয়েছিল, দুর্ঘটনায় কোন্ লোক মারা গেছে, প্রতারণা, ধর্মান্ধতা, বড় লোকদের ক্রোধোন্মত্ততা—এই সব।

দাদু বিড়বিড় করে বলেন, 'এই চোখদুটো দিয়ে কত কিছুই না দেখতে হয়েছে! কত ঝড়ঝাপ্টাই না গেছে এই জীবনটার ওপর দিয়ে!'

দিদিমা বলে, 'তবে আমাদের জীবনটা যে খুব খারাপ কেটেছে তা নয়। ভারিয়ার যখন জন্ম হয়, সেবার কি সুন্দর বসন্তকাল এসেছিল।'

'সেটা আঠার শ আটচল্লিশের কথা; সেই বছরই আমাদের সৈন্যরা হাঙ্গেরী আক্রমণ করে। ভারভারাকে যেদিন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হল তাঁর পরদিনই ওর ধর্মবাপ তিহনকে নিয়ে ওরা চলে যায়...'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'সেই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া।'

'হ্যাঁ, শেষ যাওয়া! সেদিন থেকেই আমরা ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি পেয়েছি। ভেলার ওপব দিয়ে জল যেমন ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ে যায় তেমনি ঈশ্বরেব কৃপাদৃষ্টিও আমাদের ওপর গড়িয়ে এসেছিল। ওঃ ভারভারা···ওরে সর্ব্বনাশী···'

'যাক্ গিয়ে, ওসব কথা আর বোল না...'

দাদু রেগে উঠে বলেন, 'কেন বলব না? ছেলেমেয়েগুলো সব জানোয়ার হয়েছে; একটাও যদি একটু ভাল হত! আমাদের শক্তি-সামর্থ্য আমরা মিথ্যেই বিসর্জন দিয়েছি! আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতের সঞ্চয় একটা অক্ষত পাত্রে জমা হচ্ছে; কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যেটাকে আমরা অক্ষত পাত্র বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে একটা ঝাঁঝরা চালুনি···'

দাদু এমনভাবে চিৎকার করে ওঠেন যেন কোন কিছুতে ছ্যাঁকা লেগেছে। তিনি ঘরের চারদিকে দৌড়দৌড়ি শুরু করে দেন, হা-হুতাশ করেন, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে যা তা বলতে থাকেন আর হাড়-বের-করা হাত পাকিয়ে দিদিমাকে শাসিয়ে বলেন, 'তোমার দোষেই ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে গেছে। ডাইনী বুড়ী, ওদের হয়ে আর কথা বোল না।'

তার গলার স্বরে এত বেশি তিক্ততা থাকে যে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে গিয়ে মূর্তির সামনে দাঁড়ান আর হাড় বের করা বুকে চাপড় মারতে মারতে কান্নাভরা গলায় বলেন, 'তোমার কাছে আমি কী অন্যায় করেছি প্রভু? আমার মত দুর্ভাগা তো আর কাউকে দেখিনে!'

ভিজে চোখদুটোতে যন্ত্রণা আর অভিশাপের চিহ্ন ফুটে ওঠে। চোখদুটো চক্চক্ করে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপে।

দিদিমা অন্ধকার কোণাতে নিঃশব্দে বসে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকে। শেষে দাদু কাছে উঠে এসে মিনতিভরা স্বরে বলে, 'কেন নিজেকে মিছিমিছি এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? প্রভুর লীলা একমাত্র তিনি নিজেই বোঝেন। অন্য সব বাড়িতেও তো এই একই অবস্থা; অন্য সব বাড়ির ছেলেমেয়ে আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই দিনরাত শুধু ঝগড়া মারামারি নিয়েই আছে। প্রত্যেক বাপ-মাকেই চোখের জলে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শুধু একা তুমি নও···'

মাঝে মাঝে দিদিমার কথা শুনে দাদু চুপ করেন এবং ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুয়ে পড়েন। দাদু শুয়ে পড়লে আমরা দুজনে সন্তর্পনে পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে চলে যাই।

কিন্তু একদিন দাদুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দিদিমা যেই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি দাদু দিদিমার মুখের ওপরে দুম্ করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন। দিদিমার সারাটা শরীর কেঁপে উঠল, হাত দিয়ে তিনি ঠোঁটদুটো চেপে ধরলেন। একটু পরে শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বললেন, 'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে…' তারপর দাদুর পায়ের কাছে মুখ থেকে রক্ত ফেললেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাদু ভাঙা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে খুন করব!'

দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা বললেন, 'বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে!' দাদু দিদিমার পেছনে পেছনে ছুটে এলেন; কিন্তু দিদিমা ধীর পায়ে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাদুর মুখের ওপরেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

দাঁতে দাঁত চেপে দাদু চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাইনী বুড়ি!' জ্বলন্ত আগুনের মত রাগে তিনি কাঁপছেন। দরজার হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন, হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছেন তার ওপরে।

উনুনের ওপরে মৃতপ্রায় হয়ে আমি বসেছিলাম। আমার নিজের চোখকেই নিজের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সামনেই দিদিমার গায়ে হাত তুলতে দাদুকে আমি এই প্রথম দেখছি। ব্যাপারটার জঘন্যতায় আমি বড় আঘাত পেলাম। দাদুর এক নতুন চেহারা আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে এবং এই চেহারাটা এমনই যে কোন কিছু দিয়েই তা ঢাকা যায় না; ভয়ঙ্কর একটা বোঝার মত সে আমাকে চেপে ধরেছে। দাদু দরজার হাতলটা ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ধীরে ধীরে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, ক্রমাগত নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছেন আর তার সারা গায়ে যেন ছাইয়ের গুঁড়ো এসে পড়েছে। তিনি হঠাৎ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাতে ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপরেই আবার শরীরটাকে সোজা করে নিয়ে দু হাতে বুকের ওপর চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে উঠলেন, 'হায় ভগবান! হায় ভগবান!'

উনুনের আঁচে গরম তাকের ওপর থেকে আমি নেমে এলাম। তারপর ছুটে গেলাম ওপরে। দিদিমা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আর জল দিয়ে মুখ কুলকুচো করছে। বললাম, 'ব্যথা লাগছে?'

এক কোণে গিয়ে ময়লা জল ফেলবার বালতির মধ্যে মুখ কুলকুচো করে জল ফেলে শান্তস্বরে জবাব দিল, 'নাঃ, ঠিক আছে। দাঁত ভাঙেনি, শুধু ঠোঁটের ওপর খানিকটা কেটে গেছে।'

'দাদু কেন এটা করলেন?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দিদিমা জবাব দিল, 'মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বুড়ো হয়েছে তো, তাছাড়া তার জীবনের ওপর দিয়ে তো আর কম ঝড়ঝাপ্টা যায়নি,—এ অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুবই কঠিন। আচ্ছা, তুই এবারে শুয়ে পড় গে যা। এ ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলিস।'

আমি আরো কি যেন একটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক

ঝাঝালো স্বরে দিদিমা বলল, 'কথা কানে ঢুকছে না বুঝি? ভারি ত্যাঁদড় ছেলে তো!'

জানলার ধারে বসে দিদিমা ঠোঁট চুষছে। মাঝে মাঝে রুমালে থুথু ফেলতে থাকে। জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে আমি তাকিয়ে দেখি দিদিমাকে। দিদিমার মাথার ওপর দিয়ে এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা তারাও বুঝি জ্বলছে। বাইরে চতুর্দিক খুব শান্ত; ভেতরে ঘন অন্ধকার।

বিছানায় শুয়ে পড়তেই দিদিমা এগিয়ে এল। আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ঘুমিয়ে পড; ঘুমের মধ্যে ছটফট করিস না। আমি তোর দাদুকে একবারটি দেখে আসছি। দেখি, কি করছে···সোনা আমার, যাদু আমার, মিছি-মিছি মন খারাপ করিস না। আমারও তো দোষ ছিল রে! নে, তুই ঘুমো।'

আমাকে একটা সস্নেহ চুমু খেয়ে দিদিমা ঘরের বাইরে গেল। মনটা ভারি খারাপ লাগছে। বিছানায় শুতে পারলাম না, জানলায় এসে দাঁড়ালাম। জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। মানসিক যন্ত্রণাটা যেন আমাকে বোবা করে দিয়েছে।

ছয়

এখন আমার জীবনে এমনভাবে আসবে তা ভাবিনি কখনো। এক সন্ধ্যায় চা-পান সেরে দাদুর পাশে বিছানার একধারে বসে 'প্রার্থনা-সঙ্গীত' থেকে পড়া করছি, দিদিমা চায়ের ডিস ধুচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে ইয়াকভ-মামা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ইয়াকভ-মামার চেহারাটা কেমন যেন রুক্ষ দেখাচ্ছে। ঠিক যেন একটা মুড়ো ঝাঁটার মত। ঘরে ঢুকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল না. মাথা থেকে টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে! তারপর ভয়ানক উত্তেজনার সঙ্গে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'বাবা, মিখাইল যা তা কাণ্ড করেছে! আমাদের ওখানে সন্ধ্যের সময় গিয়ে প্রচুর মদ গিলেছে, তারপর শুরু করে দিয়েছে ভীষণ পাগলামি। কাপ-ডিস ভেঙেছে, একজনের ফরমাশী দামী পোষাক ছিল, সেটা ছিঁড়েছে, জানলা ভেঙে দিয়েছে। আর গ্রিগরি ও আমাকে অকথ্য সব গালি দিচ্ছে! এখন বোধ-হয় এদিকেই আসছে। আপনার ওপর কী রাগ! রাগে ফুলে ফুলে উঠছে আর বলছে, 'বুড়োকে আমি দেখিয়ে দেব। দাড়ি উপড়ে নেব, খুন করে ফেলব।' এসব বলছে আর এদিকেই আসছে। আপনি বাইরের দিকে একটু নজর রাখুন।'

দাদু টেবিলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখটা বিকৃত হল; মনে হল নাকটা যেন ধারাল টাঙ্গির ফলার মত বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে. তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চীৎকার করে বললেন, 'শুনলে তো তোমার গুণধর ছেলের কথা! কি গুণের ছেলে! বাপকেই খুন করতে চায়! কী ভাবছ? তবে হাঁা. আমিও বলে রাখছি ও বড্ড বাড় বেড়েছে!···ওর সময় হয়ে এসেছে—'

শরীরটা টান করে কয়েকবার পায়চারি করলেন। তারপর দরজার কাছে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার খিলটা দিয়ে বন্ধ করলেন দরজাটা।

ইয়াকভ-মামার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আসলে কী হয়েছে আমি জানি।' তোমাদের দুজনের নজর ওই ভারভারার যৌতুকের টাকা ক'টার ওপর। কিন্তু একথা জেনে রেখ, সেগুড়ে বালি!' এই বলে তিনি আঙ্গুলটা ইয়াকভ-মামার দিকে নাচালেন।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ইয়াকভ-মামা বলল, 'আমাকে ওসব বলে লাভ কি?' বলে দু'পা পেছিয়ে গেল।

'তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই। তুমিও ঐ দলেই আছ।'

দিদিমা মুখে রা'টি কাটল না। কাপড়িসগুলো তড়িঘড়ি ধোওয়া শেষ করে তুলে রাখল আলমারিতে।

'আমি আপনাকে বাঁচাতেই এসেছিলাম।'

'তাই নাকি?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। বললেন, 'বেশ, বেশ! ভিজেবেড়াল সাজার কৌশলটা বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিস দেখছি! কোথায় গেলে গো গিন্নী, তোমার এই মিটমিটে শয়তান পুত্র-রত্নটির হাতে যা হোক একটা কিছু দিয়ে রাখ, উনুন খোঁচাবার লোহা, ইস্ত্রি—যাহোক একটা কিছু। আর হ্যাঁ, তোমাকে বলছি, ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ—দরজা ভেঙে যদি তোমার ভাইটি ঘরে ঢোকে তবে ধাই করে তাকে এক ঘা কষিয়ে দিও! তারপর সব দায়িত্ব আমার!'

মামা হাত দুটো পকেটে সেঁদিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

'বেশ, আমার কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করেন···'

দাদু মেঝের ওপর পা ঠুকে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাস? তোর কথায় আমি বিশ্বাস করব? কুকুরের কথায় বিশ্বাস করব, ইঁদুর বেড়ালকে বিশ্বাস করব—কিন্তু তোকে? তোকে আমি বিশ্বাস করি না। এসব তোর কাজ। তুই-ই ওকে মদ গিলিয়ে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিস। এখন হয় তুই আমাকে খুন করবি না হয় তোর ভাইকে তোকে খুন করতে হবে। যাহোক একটা কিছু তোকে করতে হবেই। কোনটা করবি, ভেবে ঠিক করে রেখে দে!'

ইতিমধ্যে দিদিমা চাপা গলায় আমাকে বললেন, 'যা তো, ছুটে ওপরের ঘরে যা। জানলা দিয়ে নজর রাখিস তোর মিখাইল-মামা আসছে কিনা। আসছে দেখলে দৌড়ে খবর দিয়ে যাবি। দৌড়ে!'

দিদিমার কথামত আমি ওপরের ঘরে জানলার পাশে জায়গা করে নিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ভয় ভয় করতে লাগল। যখন রেগে-মেগে মামা এসে হাজির হবে তখন যে কী কাণ্ডটাই না ঘটবে তা আঁচ করেই আমার ভয়। আবার মামার আসার সংবাদটা দেওয়ার মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ভার আমাকে দেওয়ায় বুকটা যেন গর্বে ফুলে উঠল। চওড়া রাস্তা, পুরু ধুলোর আস্তরণ জমেছে, আর পাথরের গোল কিনারাগুলো ধুলোয় দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা বাঁদিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই অস্ত্রোজনায়া স্কোয়ার পর্যন্ত। সেইখানেই কাদা মাটির জমিতে দাঁড়িয়ে আছে ছাই রঙের জেলখানার বিরাট বাড়ীটা। তার চারকোণে চারটে গম্বুজ রয়েছে। ওই বাড়ীটা বড় হলেও, ওতে যেন একটা বিষাদ ছায়া ফেলেছে। ডান দিকে আমাদের বাড়ীর তিনটে বাড়ীর পরেই সেন্নায়া স্কোয়ার। সেখানে গিয়ে মিশেছে ঐ রাস্তাটা। স্কোয়ারের অন্য দিকের এক প্রান্তে জেলের হলদে রঙের ব্যারাক আর ছাইরঙের গম্বুজ। এই গম্বুজ থেকে একজন লোক নজর রাখে কোথাও আগুন লেগেছে কিনা দেখতে। শেকল বাঁধা কুকুরের মত লোকটা আটক থাকে ঐ সীমার মধ্যে। কতকগুলো নালা স্কোয়ারকে চিরে দিয়েছে। তারমধ্যে একটা নালা মজে গেছে। ডান পাশে দ্যুকভ পুকুর। এই পুকুরেই আমার বাবাকে মামারা বরফের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমার

সামনে একটা গলি পথ। ঐ পথের দুধারে ছোট ছোট বাড়ি। 'তিন সাধুর গির্জা'য় গিয়ে শেষ হয়েছে গলিটা। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে বাড়ির চালগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গাছপালার ঢেউয়ের ওপর ওল্টানো নৌকো।

রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। সারা শীতের তুষার লেগে আর শরতের অবিশ্রান্ত বর্ষণে বিবর্ণ হয়েছে বাড়ির রঙগুলো। গির্জার চত্বরে যে বাড়িগুলো রয়েছে, তা দেখে মনে হয় যেন এক পাল ভিখিরি গলাগলি করে রয়েছে। আমার মনে হয়, আমি যেমন একজনের পথ চেয়ে বসে আছি, ঠিক তেমনি ওই বাড়িগুলোও অপেক্ষা করছে কোন কিছুর জন্যে। রাস্তায় যে দু' একজন যাতায়াত করছিল তাদের যেন কোন ব্যস্ততা নেই। ঠিক আরশুলা যেমন গুটি গুটি উনুনের গায়ে পা মেপে মেপে চলে, ওদের চলাফেরাটাও তেমনি। জানলায় হালকা বাতাসের ছোঁওয়া লাগছিল, সঙ্গে ছিল পিঁয়াজ আর গাজরে ঠাসা 'পিরগ' রান্নার উৎকট গন্ধ। এই গন্ধটা আমার সহ্য হয় না, ভারী বিষণ্ণ লাগে।

এ দৃশ্য আমার ভাল লাগেনি। অসহ্য লাগছিল। বুকের ভেতরটায় যেন একটা জোর আলোড়ন হচ্ছে। সাসে গললে যেমন হয়—তেমনি। তার বুদবুদগুলো যেমন ওপরে ওঠে, তেমনিভাবেই আমার ভেতরের চাপা অস্বস্তিটা ফুলে ফুলে ওঠে। আমার এই ছোট্ট ঘরটায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন ঢাকনা চাপা কফিনের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠছি আমি।

মিখাইল-মামাকে দেখলাম উল্টোদিকের গলিপথের কোণে ছাই রঙের একটা বাড়ির পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে। মাথার টুপিটা নীচে নামিয়ে দিয়েছে। শুধু মাত্র কান দুটো দেখা যাচ্ছে। পরণে খাটো লাল রঙের কোট আর হাঁটু অবধি ঢাকা বুট জুতো। তা ধুলোয় ভরা। এক হাত প্যাণ্টের পকেটে, অন্য হাতে মুঠো করে ধরেছে নিজের দাড়ি।

মিখাইল-মামাকে হঠাৎ দেখতে পেলাম। কিন্তু মিখাইল মামার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে এক লাফে রাস্তাটা পেরিয়ে কালো লোমশ হাত বাড়িয়ে দাদুর বাড়িটা গ্রাস করবে। আমার এ খবরটা নিচে গিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি কোনক্রমে নিজেকে জানলা থেকে সরিয়ে আনতে পারলাম না। পা টিপে টিপে মিখাইল-মামাকে রাস্তা পার হতে দেখলাম। যেন অতি সন্তর্পনে পা ফেলছে। এরপরই দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তারপর কাঁচের ঠুং ঠাং শব্দ। মিখাইল-মামা শুঁড়িখানায় ঢুকেছে।

দৌড়ে গিয়ে দাদুর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজা না খুলেই দাদু কর্কশ স্বরে বললেন, 'কে? কে তুমি? কি হয়েছে? শুঁড়িখানায় ঢুকেছে বলতে এসেছ? যাও, যেখানে ছিলে সেখানেই থাক গিয়ে!'

'আমার বড় ভয় করছে।'

'ভয়ের কি হল? কিচ্ছু হবে না।'

ফিরে গেলাম আমি। অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্রমশ আরো পুরু, আরো কালো হচ্ছে রাস্তার ধুলো। জানলা দিয়ে হলদে বাতি দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওধারের একটা বাড়ি থেকে তারের যন্ত্রে বাজছে এক বিষণ্ণ সুর। ভারি মিষ্টি লাগছে সেই সুর। শুঁড়িখানা থেকে যখন কেউ বের হয়ে আসত তখনই একটা

গানের রেশ শোনা যেত। কানা ভিখিরি নিকিতুশ্‌কার গাওয়া গান। নিকিতুশ্‌কার বয়স হয়েছে। এক গাল দাড়ি, বাঁ চোখের পাতা শক্ত করে আঁটা, ডান চোখটা টকটকে লাল। শুঁড়িখানার দরজা বন্ধ ও খোলার দরুণ যেন গানটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে।

এই ভিখিরিটার ওপর দিদিমার ভীষণ হিংসে। হিংসের কারণ ওর চমৎকার গলা। দিদিমা ওর গান শুনলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'লোকটার কী ভাগ্য! কী সুন্দর গায়!'

দিদিমা ওকে মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। ও লাঠিতে ভর দিয়ে বারান্দার ওপর বসে, তারপর ঝুঁকে পড়ে গান ধরে; আবৃত্তিও করে মাঝে মাঝে। দিদিমা ওর পাশে বসে। ওর গান বা আবৃত্তি শুনতে শুনতে দিদিমা নানারকম প্রশ্ন করে। বলে, 'তার মানে তোমার বক্তব্য যে মেরীমাতা র‍্যাস্বানেও গিয়েছিলেন?'

খুব শান্তভাবে সে জবাব দেয়, 'মেরীমাতা না গেছেন এমন জায়গা নেই।'

সারাটা পথ যেন ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে পূর্ণ হয়েছে। আমারও সেই ঝিমুনি ধরেছে। চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে দিদিমা যদি থাকত আমার সঙ্গে! নিদেনপক্ষে দাদুকেও যদি সঙ্গে পেতাম! আমার বাবাও বোধহয় এমনিই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার দাদু ও মামারা ওকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু দিদিমা, গ্রিগরি, ধাই বাবার খুব প্রশংসা করত। দু পক্ষ কেন বিপরীত ধর্মী আচরণ করত? আমার মায়েরই বা কি হল?

মায়ের কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কল্পনা করি, দিদিমা আমাকে যা কিছু গল্প বলে তা বুঝি মাকে নিয়েই। মা যে তার বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল তার জন্যে আমার তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবি, হয়তো মা কোন দস্যুদলের সঙ্গে সরাইখানার আস্তানায় রয়েছে। তারা ধনীদের কাছ থেকে লুঠতরাজ করে গরীব লোকদের তা দিয়ে দিচ্ছে। অথবা মা কোন বনের নিবিড় প্রান্তে এক দস্যুদলের সাথে রয়েছে। তাকে তাদের রান্না বান্না করতে হয় আর পাহারা দিতে হয়—লুঠের মাল দেখার জন্য। অথবা এও কল্পনা করি, মা যেন 'ডাকাত রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর সব ধন দৌলত গুনে দেখার জন্যে। পুণ্যময়ী মেরীমাতাও তার সঙ্গে রয়েছেন। 'ডাকাত রাজকুমারী'কে তিনি যা বলেছিলেন আমার মাকেও মনে হয় তাই বলছেন :

> 'রজত-কাঞ্চন তব তরে
> উত্তোলিত হয় নাই পৃথিবীর বক্ষ ভেদি
> লোভাতুরা, ঢাকিতে নারিবে কভু
> লজ্জাসম পৃথিবীর অফুরন্ত সম্পদ।'

এটা শুনে 'ডাকাত রাজকুমারী' যা জবাব দিয়েছিল আমার মা'ও সেই জবাবই দিচ্ছে :

> 'পুণ্যময়ী মাতা মোর, ক্ষমা কর মোরে
> কলুষ লেগেছে মোর প্রাণে;
> আত্মসুখ লাগি নহে,প্রিয়পুত্র তরে
> নিজেরে করেছি বাধ্য সম্পদ লুণ্ঠনে।'

পুণ্যময়ী মেরীমাতার মন ছিল নরম। আমার মায়ের জবাবে তিনি সন্তোষ লাভ করে বললেন :

'চতুরা শৃগালীর মত তুই,
ভারিয়া, তব চরিত্র শোধিবেনা !
যদি পথ নাহি ছাড়,
দিবস আলোকে তজ্য
তব হস্তে নিপীড়িত যেন
নাহি হয় রুশ দেশবাসী,
অরণ্য পথে কষাঘাতে জর্জর
অথবা নিহত না হয় স্তেপ-ভূমে।'

একটার পর একটা গল্প ভীড় জমাতে লাগল আমার মনের মণিকোঠায়। আমি নিজেই হারিয়ে গেলাম। মনে হল এ যেন স্বপ্ন ! হঠাৎ একটা কোলাহলের ধাক্কায় আমার সম্বিত ফিরে এল। জানলা দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, দাদু, ইয়াকভ-মামা, আর শুঁড়িখানার চাকর মেলিয়ান, মিলে মিখাইল-মামাকে বলপূর্বক বার করে দিচ্ছে। মিখাইল-মামা বার বার তেড়ে ফুড়ে আসছে আর বারবারই সমানে তার ওপর কিল চড় লাথি ঘুষি পড়ছে। মিখাইল-মামা শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে না পেরে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল, আর পাঁচিলের ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া হল ওর দুমড়ে যাওয়া টুপিটা। চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

কিছুক্ষণ পথের ওপর পড়ে থাকার পর মিখাইল-মামা উঠে দাঁড়াল। তার জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে, বিপর্যস্ত চেহারা ! রাস্তা থেকে পাথর তুলে ছুড়ে মারল দরজায়। বিকট একটা আওয়াজে সবাই সচেতন হয়ে উঠল। শুঁড়িখানার ভেতর থেকে বের হয়ে এল একপাল লোক। বাড়ির অলিন্দে অনেকগুলো উৎসাহী চোখ দেখা গেল। রাস্তাটায় যেন প্রাণের বন্যা বইল ! মনে হল, এ যেন এক রূপকথার গল্প—মনে ভয় জাগিয়ে তোলে।

এরপর দৃশ্যান্তর ঘটে ; চতুর্দিক ফাঁকা হয়ে যায়।

দরজার কাছে ট্রাঙ্কের ওপর দিদিমা বসে থাকে। শরীরটা যেন কুঁচকে গেছে। ভাল করে নিশ্বাসও পড়ছে না। আমি দিদিমার ভিজে গালে হাতের স্পর্শ দিলাম। দিদিমা বুঝি তা টের পেল না। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'হে প্রভু, তোমার দরবারে বিচার কি এতই সঙ্কুচিত হয়েছে ! আমার আর ছেলে-মেয়েদের বেলাতে কি একটু সুবিচার করবে না প্রভু ? তুমি তো দীনবন্ধু…'

বছর পেরোতে না পেরোতেই দাদু পলেভায়া স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে গেলেন। এক বসন্ত থেকে আরেক বসন্ত ; কিন্তু এই অল্প সময়েই এ বাড়িটা চিহ্নিত হয়ে গেল। পাড়ার ছ্যাচড়া ছেলেগুলো সোরগোল শুনলে দৌড়তে দৌড়তে আসত আর সারা পাড়া মাত করত, 'ওরে, কাশিরিন্‌দের বাড়িতে আবার মারামারি লেগেছে রে।'

সন্ধ্যার পর মিখাইল-মামা আসত, আর রাত অবধি অপেক্ষা করত। বাড়িতে এসময় আতঙ্ক হত। মিখাইল-মামার সঙ্গে দু'তিনজন চ্যালা জুটে যেত। ওরা সব কুনাভিনে কারখানার গুণ্ডা ধরণের ছোকরা। নালা পেরিয়ে এসে বাগানে

ঢুকত আর মাতলামি শুরু করত। বাগানে ফুলের গাছ উপড়ে দিত। একদিন স্নানের ঘরে ঢুকে স্নানঘরটা তচনচ করে দিল। জল ফোটাবার বয়লার, বেঞ্চি, তাক-সব ভেঙে চৌচির। উনুনটাকে দুটুকরো করল; মেঝে থেকে পাটাতন তুলে ফেলল। দরজাটা একেবারে ফাঁক করে ফেলল।

দাদুর মুখ কালো হয়ে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন ভাঙচুরের আওয়াজ। দিদিমা উঠোনের দিকে ছুটলেন। হারিয়ে গেলেন অন্ধকারে। শুধু শোনা গেল তার কাতর স্বর, 'মিখাইল, ওরে মিখাইল, ভেবে দেখেছিস কি, কি তুই করছিস!'

এর উত্তরে কতকগুলো গালাগালি ভেসে এল। যে অমানুষগুলো গালি দিল তারা জানেনা এসবের অর্থ কি। দিদিমার পিছু নেওয়ার কোন অর্থ নেই, কিন্তু একা থাকতেও সাহস হয় না। অগত্যা নীচে নেমে এলাম। দাদুর ঘরে আশ্রয় নিতে ঢুকে পড়লাম।

'হারামজাদা তুই এখানে কেন? বেরিয়ে যা এখান থেকে।' আমাকে দেখে দাদু খেঁকিয়ে উঠলেন।

ছুটে গেলাম ছাদের ঘরে আর তাকিয়ে থাকলাম বাগানের অন্ধকারের শূন্যতার মাঝে। দিদিমার দিকেই লক্ষ্যটা ছিল; চীৎকার করে ওঁকে ডাকতে থাকি। আমার যেন ভয় হচ্ছিল, দিদিমাকে ওরা মেরে ফেলবে।

দিদিমা ফিরে আসলেন না। আমার কণ্ঠস্বর বুঝে মিখাইল-মামা কুৎসিত ভাষায় আমার মাকে উদ্দেশ্য করে গালি দিল।

আরেক সন্ধ্যায় দাদু প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। বালিশে তোয়ালে মোড়া মাথাটা অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে মনের দুঃখে বলতে থাকেন, 'সারাজীবনটা জ্বলেপুড়ে, পাপ, অন্যায় করে এত যে পয়সা রোজগার করলাম, তা কি শুধু এই জন্যে! নিজের মুখে চুণকালি পড়বে, নচেৎ ওকে পুলিশে দিতাম আর আসছে কালই লাটসায়েবের সামনে হাজির করতাম…কিন্তু এতো লজ্জার কথা! কেউ কি কোন দিন শুনেছে যে ছেলের হাত থেকে বুড়ো বাপ-মা রক্ষা পাবার জন্যে পুলিশ ডেকেছে?' শুনে রাখরে হতভাগা, বুড়ো বয়সে এভাবেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোকেও সব কিছু সহ্য করতে হবে!'

অতর্কিতে দাদু এক লাফে বিছানা থেকে সটান উঠে দাঁড়ালেন মেঝেতে। তারপর টলটলায়মান অবস্থায় এগিয়ে গেলেন জানলার ধারে। দিদিমা ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে হাতটা ধরে বলল, 'একি! কোথায় যাচ্ছ?'

দাদু বললেন, 'একটা আলো জ্বালাও তো!' তিনি হাঁপাচ্ছিলেন।

দিদিমা বাতি জ্বালালেন, আর সেই জ্বলন্ত বাতিটা বন্দুকের মত ধরে দাদু ব্যাঙ্গের ছলে বলতে লাগলেন, 'ওরে মিশ্‌কা, তুই রাতচরা চোর! কুত্তার মত হন্যে হয়ে তুই…'

এই সময়ে একটা আধলা ইট ঘরের মধ্যে দিদিমার পাশ ঘেঁষে টেবিলে এসে পড়ল। খান খান হয়ে জানলার কাঁচ ভেঙে গেল।

'ফস্‌কেছে—।' দাদুর গলা থেকে একটা বিকৃত স্বরে বের হয়ে এল শব্দগুলো। বুঝতে পারলাম না—তিনি কাঁদছেন না হাসছেন।

দিদিমা আমাদের যেমন কোলে টেনে নেন, তেমনি ভাবে দাদুকে টেনে নিয়ে

বিছানায় শুইয়ে দিল। আর আতঙ্কের সুরে বলতে থাকল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যীশুর দোহাই, তুমি একটু চুপ কর! যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে তবে সারাটা জীবন ওকে সাইবেরিয়ায় কাটাতে হবে। ওর কি কোন জ্ঞান আছে? ওকি বোঝে যে, যা, করছে তার জন্যে ওর কি দণ্ড হতে পারে! সারাটা জীবন সাইবেরিয়ায় কাটাতে হতে পারে?'

দাদু বিছানায় শুয়ে পা দুটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'ও আমায় খুন করুক, দেখি, ও আমাকে খুন করে ফেলুক!'

বাইরে একটা হৈ চৈ এর শব্দ, কে যেন দাপাদাপি করছে। আমি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা আধলা ইটটা নিয়ে জানলার ধারে যেতেই, দিদিমা এক হ্যাচকাটানে আমাকে সরিয়ে নিল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এটা আরেক শয়তান!'

আরেকবার মিখাইল-মামা মস্ত এক লাঠি নিয়ে এল। অলিন্দে দাঁড়িয়ে সদর দরজা ভেঙে ফেলছিল। তখন দাদু সদলবলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার ভাবটা এই, মিখাইল-মামা একবার এলেই হয়! তার সঙ্গে লাঠি হাতে দুজন ভাড়াটে শা'র রুটি বেলার বেলুন হাতে শুঁড়িখানার মালিকের স্থূলকায়া বৌ। সবার পেছনে দিদিমা এগিয়ে আসার জন্যে ঠেলাঠেলি করছিল। আর করুণভাবে বলছিল, 'আমাকে ওর কাছে একবারটি যেতে দাও, আমি ওর সাথে একটু কথা বলব!'

দাদু হাতের লাঠিটা উঠিয়ে ধরে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে 'ভালুক শিকার' বলে ছবিটার সেই চাষীর মত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। দিদিমা ছুটে আসতে পা আর কনুয়ের গুঁতোয় ওকে সরিয়ে দিলেন! অপেক্ষমান চারজনেরই মধ্যে যে হিংস্রতা রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে ওদের দাঁড়ানর ভঙ্গিতে। মাথার ওপরের বাতির আলো কখনো উজ্জ্বল হচ্ছে, কখনো বা ম্লান। আর তা এসে পড়ছে ওদের মুখে। ছাদের ঘরে ওঠার সিঁড়িতে আমি দাঁড়িয়ে আছি, লক্ষ্য আমার দিদিমার দিকে, উদ্বেগটাও তারই জন্যে। দিদিমাকে ওখান থেকে সরাতে পারলেই রক্ষা পাই; খুশি হই!

ওদিকে মিখাইল-মামা সদরে আঘাত দিতে দিতে নীচের কব্জাটা ভেঙে ফেলেছে। এর জন্যে প্রতি আঘাতেই কেমন একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছে। দরজাটা আটকে আছে ওপরের কব্জার জোরে। তবে ওটার আয়ুও বোধহয় আর নেই।

দাদু নিজের দলবলকে একটা কর্কশ শব্দ বের করে বললেন, 'দেখ, ওর মাথায় মেরনা; যা মারবে, পা আর হাতে, কথাটা খেয়াল থাকে যেন!'

সদর দরজার পাশে ছিল একটা ছোট জানলা। জানলাটা দিয়ে কোনরকমে শুধু একটা মানুষ মাথা গলাতে পারে। মিখাইল-মামা ওর শার্সিটা ভেঙে দিয়েছে। কেবল একটা গর্ত আর তার কিনারায় ভাঙা কাচ লেগে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেন চোখ উপড়ে নিলে যেমন দেখায় কোটরটাকে—তেমনই দেখাচ্ছে।

দিদিমা সজোরে ছুটে ওই জানলাটার কাছে গিয়ে বাইরে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'ওরে মিশা, যীশুর দোহাই, তুই এক্ষুনি চলে যা! ওরা তোকে নুলো করে দেবে। তুই এক্ষুনি পালা!'

হাতের লাঠিটা দিয়ে মিখাইল-মামা সজোরে দিদিমার হাতে এক ঘা কষিয়ে দিল।

আমি দেখলাম একটা ভারী জিনিষ বিদ্যুতের ঝলকানির মত ওপর থেকে নেমে এসে পড়ল দিদিমার হাতের ওপর। আঘাতটা পড়ার সাথে সাথে দিদিমা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। তারপর নির্বাক ও নিশ্চল হবার আগেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুই পালিয়ে যা—মিশ—শা!'

দাদু কাৎরে উঠলেন। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'গিন্নী! হায় হায়!'

দরজা'টা ইতিমধ্যে খুলে গেছে। আর খোলা দরজার কালো ফাঁক দিয়ে এক লাফে মিখাইল-মামা ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু কোদাল ভর্তি ময়লা ফেলার মতই তাকে ঘরের বাইরে ফেলে দেওয়া হল।

শুঁড়িখানা মালিকের বৌ দিদিমাকে তুলে নিয়ে এল দাদুর ঘরে। দাদুও পেছনে পেছনে এলেন।

'হাড়টাড় ভাঙেনি তো?' দিদিমার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' চোখ না খুলে দিদিমা বলল, 'কিন্তু ছেলেটার কী দশা করছো—চুপ কেন—বল বল!'

দাদু রেগে ফুঁসে উঠে বললেন, 'আমি কি অমানুষ? চুপ করে থাক! ওর হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছি ভাঁড়ার ঘরে। এক বালতি জল ওর মাথায় ঢেলে দিয়েছি। পাষণ্ড! দেখতে চাইলে ওকে দেখতে পার! কেমন করে এমন পশু হয়ে গেল সে!'

দিদিমা যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

বিছানায় দিদিমার পাশে বসে দাদু বললেন, 'একটু সময় সহ্য কর। হাড় ঠিক মত বসানোর জন্য লোক ডাকতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই এসে গেল বলে। আর একথাও বলছি, আয়ু ফুরানোর আগেই এই হতভাগা ছেলেমেয়েদের জন্যেই আমাদের কবরে যেতে হবে।'

'যা আছে সব ওদের দিয়ে দাও।'

'ভারভারার কি হবে?'

দুজনের অনেক কথাবার্তা হল। দিদিমা শান্ত ও কাতরানো গলায় বলছিল; দাদু ছিল উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ।

এরপর এক বেঁটে আর কুঁজো বুড়ী ঘরে এল। বুড়ীটার মুখটা আকর্ণ-বিস্তৃত, মাছের মত হাঁ করে আছে সে; তলার চোয়ালটা সব সময় কাঁপছে। খাড়া নাকটা যেন ওপরের ঠোঁট দুটোকে দুভাগ করে দিয়েছে। বুড়ীর চোখ দেখা যায় না; হাতে লাঠি ভর করে পা ঘষে ঘষে চলে—মনে হয় পায়ের জোর নেই। বুড়ী এগিয়ে এল, তার হাতে ছিল একটা পুটলি। পুটলিটার ভেতর থেকে ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে।

আমার মনে হল মৃত্যু যেন বুড়ীর রূপ ধরে দিদিমাকে গ্রাস করতে এসেছে। ছুটে গেলাম বুড়ীর সামনে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে...'

দাদু আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কোনরকম দয়ামায়া না করে হ্যাচ্‌কা

টান দিলেন। তারপর ভাল করে পাঁজা-কোলা করে আমাকে নিয়ে এসে হাজির করলেন ছাদের ঘরে।

সাত

খুব কম বয়সেই আমি বুঝেছি যে আমার দিদিমা ও দাদুর ভগবান এক নয়।

খুব ভোরে দিদিমা বিছানায় বসে তার মাথার গোছা চুল আঁচড়ায়। রেশমের মত লম্বা চুলের গোছা আলগা করে পুরো ছেড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ঝাঁকুনি দেয়, আর নিজের চুলগুলোকেই আপন মনে গালি দেয়। এতে যেন মনের ঝাল মেটায়। নিশ্বাস চাপা স্বরে উচ্চারণ করে শব্দগুলো, যাতে আমি ঘুম থেকে না উঠে পড়ি।

'মুখে আগুন তোদের, মুখে আগুন।'

চুলের জট ছাড়ান হলে চুলগুলো বেণী পাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কুল কুল করে হাত মুখ ধুয়ে ফেলে। ঘুমের পরে প্রকাণ্ড মুখে চামড়ার ভাঁজগুলো গভীর হয়ে ওঠে, বিরক্তির সব চিহ্ন—হাত মুখ ধুয়ে ফেলার পরেও সেই বিরক্তির খানিকটা থাকে। এই অবস্থাতেই হাঁটু গেড়ে দিদিমা বিগ্রহের সামনে বসে পড়ে। শুরু হয়ে যায় তার প্রাতঃকালীন অবগাহন যাতে আত্মশুদ্ধি হয়, গ্লানিগুলো দূর হয়ে যায়।

মেরুদণ্ড সোজা করে, মাথাটা পিছুতে হেলিয়ে দিয়ে আবেগভরা দৃষ্টিতে তাকায় কাজানের মেরীমাতার গোলাকৃতি মুখখানার দিকে; মনের সব ভক্তি উজাড় করে দিয়ে বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বিড়বিড় করে বলে, 'পুণ্যময়ী মা, তোমার আশীর্বাদে সিক্ত হোক এই দিনটি।'

তারপর মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে। মাথা তুলে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে আবার বলতে থাকে, 'হে সকলের আনন্দের উৎস, হে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, ফুল ভারাবনত আপেল বৃক্ষের মত হে · '

ভক্তি ও আবেগকে এমনি করেই নতুন ভাষার ব্যঞ্জনায় দিদিমা রোজই প্রকাশ করে থাকে। আমি এইসব আলঙ্কারিক ভাষাগুলো শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি।

'ওগো আমার প্রাণেশ্বর, পূত, স্বর্গীয়। তুমি আত্মার আলোক-দ্যুতি, আমার রক্ষাকর্তা! তুমি স্বর্গীয় সূর্য, উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তোমার দ্যুতি। তুমি স্বর্গের পুণ্যময়ী মাতা! পাপ আমাদের দিকে ধাবমান—তুমি আমাদের রক্ষা কর পাপের হাত থেকে; আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও সব রকমের কটু কথার হাত থেকে। আর আমার যে ক্রোধের সঞ্চার হয় তা' থেকেও আমাকে রক্ষা কর···'

তার কালো চোখের গভীরে এক ফালি হাসি যেন জ্বলে ওঠে, তার বয়স কম বলে মনে হয়, সে তার ভারি হাতটা তুলে বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেয়।

'ঈশ্বরের পুত্র—হে যীশু, আমি এক অধর্মী পাপাচারীণি, আমাকে তুমি করুণা কর···স্বর্গের জননীর নামে তোমার করুণা সিঞ্চিত হোক আমার ওপর।'

তার উপাসনা হয়ে ওঠে ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনি, সরল ও নিষ্ঠাভরা অন্তর থেকে উৎসারিত স্তবস্তুতি।

দিদিমা সকালে উপাসনায় বেশি সময় দিতে পারে না। সামোভার জ্বালানোর তাগিদ থাকে তখন। দাদু বাড়ির চাকর বিদেয় করে দিয়েছেন, সুতরাং দাদুর চায়ের জন্যে যদি সকালে খানিক দেরি হয় তবে আর রক্ষে থাকে না।

দাদু সেদিন প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুরু করে দেন আর তার রেশ চলতেই থাকে, সহজে থামে না।

কোন একদিন যদি দাদুর ঘুম আগে ভেঙে যায়, তাহলে সোজা চলে আসেন ছাদের ঘরে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমার উপাসনা শোনেন ; তাঁর কালো ঠোঁটের কোণে হাসির ঝলক দেখা যায়। পরে চায়ের টেবিলে বসে দাদু মুচকি হেসে বলেন, 'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না ? কদ্দিন তোমাকে উপাসনার রীতিনীতি-গুলো শিখিয়েছি, অথচ তুমি তা গ্রাহ্য করনা। জংলীর মত কী যে সব বল, কিছুই বুঝি না তা। আর ভগবানও যে কি ভাবে এসব সহ্য করেন!'

দিদিমা অগাধ আস্থাভরা কণ্ঠে জবাব দেয়, 'ভগবান সব কিছুই বোঝেন। যেমন ভাবেই, যে ভাষায় বলা যাক না তাঁকে, নিশ্চয়ই তিনি তা বোঝেন।'

'তুমি একটা আস্ত উন্মাদ!—বুঝলে ?'

ভগবান যেন দিদিমার নিত্য সঙ্গি। জন্তু জানোয়ারদের দিদিমা তার ভগবানের কথা বলেন। তার ভগবান নির্বিকার, যে কোন মানুষ, এমনকি কুকুর, পাখি, মায় মাঠের ঘাস পর্যন্ত নিজেকে এই ভগবানের হাতে সঁপে দিতে আপত্তি করবে না। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত কিছুর ওপর তার অগাধ ভালবাসা, সবই তার কাছে সমান।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর একটা পোষা বেড়াল ছিল। বেড়ালটা ভারী সুন্দর দেখতে ; ছাই রঙ, চোখ দুটো সোনালী রঙের। শয়তানিতেও ওস্তাদ তেমনি। ও একদিন একটা স্টার্লিং পাখি ধরে ছিল। তাই দেখে দিদিমা আহত পাখিটাকে বেড়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারপর রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেড়ালটাকে বলেছিল, 'প্রাণে কি ভগবানেরও ভয় নেই, শয়তান কোথাকার!'

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী আর দারোয়ান দিদিমার ঐ কথায় হেসেছিল। এতে দিদিমা ওদের ওপর চটে গিয়ে বলল, 'তোরা কি ভাবছিস জানোয়ারেরা ভগবানের কথা জানে না ? ওরে নাস্তিকেরা, তবে শোন, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জন্তুও ভগবানের বিষয় জানে—তোদের চেয়ে এক রতিও কম নয়।'

স্থূল আর ভগ্নোৎসাহ শারাপ ঘোড়াটাকে সাজগোজ করিয়ে দিদিমা বলত, 'ওরে ভগবানের দাস, মন খারাপ কেন রে ? বুড়ো হচ্ছিস বলে বুঝি ?' ঘোড়াটা একটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ত।

কিন্তু তবু দাদু যেমন দিনের মধ্যে কথায় কথায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন দিদিমা তেমনটি করে না। দিদিমার ভগবানকে আমি বুঝি, তাঁকে ভয় পাই না। কিন্তু তাঁর সামনে মিথ্যে বলার স্পর্দ্ধা থাকে না। আর তা বলাটা আমার কাছে লজ্জা বলেই মনে হয়। এরজন্যে আমি দিদিমার কাছে মিথ্যে বলতে পারি না। ভগবান যখন এত দয়াময়, তখন তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন করাটাও অসঙ্গত আর ঠিক সেই কারণেই এ ধরণের ইচ্ছে আমার জাগেনি।

একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর সঙ্গে আমার দাদুর খুব ঝগড়া হল। আমার দিদিমাকেও সে অকথ্য গালি দিল, এমনকি একটা গাজর ছুঁড়ে মারল দিদিমার দিকে।

দিদিমা এতে শুধু শান্তভাবে বলল, 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছি!' দিদিমার এই অপমানে আমার মনে প্রতিশোধ নেবার একটা মনোভাব জন্মাল।

এরপর থেকে ঐ চিন্তাটাই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। স্ত্রীলোক-টাকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাই ভাবছি! তার চুলগুলো ছিল লাল, শরীরটা বেঢপ মোটা, মোটা চিবুক, আর চোখ নেই বললেই হয়।

পাড়াপ্রতিবেশীরা ঝগড়া করে যখন প্রতিশোধ নেয় তখন তার ধরণ ধারণ আমি দেখেছি। কেউ কেউ বেড়ালের ল্যাজ কেটে দেয়, কুকুরকে বিষ খাওয়ায়, মুরগী মেরে ফেলে, অথবা রাতের বেলায় চুপিসারে গিয়ে মাটির নীচে ভাড়ারে ঢুকে কপি বা শশার পিপেয় কেরোসিন ঢালে। আবার 'কভাস'-এর পাত্রের মুখ খুলে দেয়। কিন্তু প্রতিশোধের ঐ সব পন্থা আমার ভাল মনে হয় না। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর দুঃসাহসী কিছু একটা উপায় আমি খুঁজে বের করতে চাই।

শেষ পর্যন্ত উপায় একটা বের হল। অনেক ভেবে তবে সিদ্ধান্তে এলাম। একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী যেই মাটির নীচে ভাড়ারে ঢুকেছে অমনি আমি গিয়ে তার ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর ধেই ধেই করে মনের আনন্দে নাচতে লাগলাম; চাবিটা ছাদের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দিদিমা তখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত, তার কাছে ছুটে গেলাম। দিদিমা তো আমার উল্লাসের কারণ বুঝে উঠতে পারল না। তারপর ব্যাপারটা বুঝে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে আমাকে উঠোনে টেনে নিয়ে এল। তারপর ছাদ থেকে চাবিটা খুঁজে আনতে হুকুম দিল। দিদিমার চোটপাটের ধরণ দেখে আমি তো অবাক! একটাও কথা না বলে চাবিটা এনে দিলাম। এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখি, দিদিমা কি করে। দিদিমা শুঁড়ি-গিন্নীকে মুক্ত করল। তারপর দুজনে এগিয়ে এল আমারই দিকে। দুজনেরই মুখে স্মিত হাসি। মালিক-গিন্নী তার মোটা হাতে মুঠি পাকিয়ে আমাকে শাসাল, 'আমি তোর মজা দেখাব!' মুখে বললেও চোখে মুখে কোন প্রতিশোধ নেওয়ার মনোবৃত্তির ছাপ নেই। দিদিমা আমাকে ঘাড় ধরে রান্নাঘরে আনল। জিজ্ঞেস করল, 'হতভাগা ঢাকনাটা তুই বন্ধ করলি কেন?'

'ও কেন গাজর ছুঁড়ে মেরেছিল তোমায়?'

'ওঃ! আমার জন্যে তুই এ-কাজ করেছিস! দাঁড়া, দে- চ্ছি তোকে শয়তান! তোকে আজ ছাই-গাদায় ভরে দেব আর গায়ের ওপর ইঁদুর ছেড়ে দেব। তখন যদি বুদ্ধি হয়! দেখ সবাই, আমার রক্ষক কেমন ধারা! ফাটবার আগে এই ছোট্ট বুদবুদটাকে দেখে নাও সবাই। তোর দাদুকে যদি বলি না, মারতে মারতে পাছার ছাল ছাড়িয়ে নেবে, তা জানিস? এক্ষুনি ঘরে গিয়ে পড়ার বই নিয়ে বস্‌গে যা।'

সেদিন সারাটা দিনই দিদিমা আমার সাথে কথা বলে নি। সন্ধ্যের সময় উপাসনায় বসার আগে আমার বিছানায় এসে বসল। তারপর আমায় যেভাবে কতকগুলো কথা বলল, সত্যি বলতে আমি জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারব না। দিদিমা বলল 'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোকে আমি কতকগুলো কথা বলব, তা কখনো ভুলবি না। বড়দের ব্যাপারে : কবি না কখনো। প্রলোভনে আর পরিশ্রমে বড়রা সব জাহান্নমে যেতে বসেছে, কিন্তু তুই এখনো যাসনি। তাই তুই তোর ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে যা ভাল বুঝবি তাই নিয়ে বড় হ; যতক্ষণ না ভগবান তোর অন্তর স্পর্শ করেন, আর তোকে পথ দেখান, দেখিয়ে দেন তোকে কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানই বিচার করবেন, শাস্তি দেবেন। তুই আমি বিচার করার মালিক নই। বিচারের ভার ভগবানের।'

এই বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে ডান চোখটা একটু সরু করে বলল, 'মাঝে মধ্যে মনে হয় প্রভুও বুঝি দোষটা কার তা বুঝতে পারেন না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি তো অন্তর্যামী, সব কিছুই তো তিনি টের পান।'

দিদিমা নিষ্প্রভ কণ্ঠে জবাব দিল, 'তাই যদি হত তবে এ পৃথিবীতে অনেক কিছু, যা ঘটে, তা আর ঘটত না। প্রভু তো স্বর্গে আছেন। ওপর থেকে নীচের দিকে চেয়ে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা দেখেন। দেখেন, পাপাচারী মানুষরা কি করছে। মাঝে মাঝে মানুষের কষ্টে তার বুক ফাটে। তিনি মানুষের দুঃখে কাঁদেন আর বলেন 'হায় সন্তানেরা! তোদের কষ্টে আমার যে বুক ফাটেরে!'

একথা বলতে বলতে দিদিমার চোখে জল আসে। চোখের জল মোছার চেষ্টা না করে সে মূর্তির সামনে গিয়ে উপাসনায় বসে পড়ে।

সেদিন থেকে দিদিমার ভগবান আমার আপন হয়ে ওঠেন; তাঁকে যেন আমি আরো বেশি করে বুঝতে পারি।

আমাকে পড়াতে বসে দাদুও বলেন যে ভগবান সব দেখেন, সব জানেন, সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। মানুষের দুঃখ-বিপদে তিনি মানুষকে সাহায্য করতে আসেন। কিন্তু দাদুর উপাসনার ধরণ দিদিমার মত নয়।

সকাল বেলা উঠে, মূর্তির সামনে যাওয়ার আগে নিজেকে পরিপাটি করে তৈরী করে নেন। ভাল করে, হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরেন। মাথার চুল, দাড়ি ভাল করে আঁচড়ে নেন। আয়নার সামনে এসে ঠিক করেন সবকিছু—জামা, ওয়েস্টকোটের ফাঁকে গোঁজা কালো স্কার্ফটা। এসব কাজ শেষ হলে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ান উপাসনার জায়গায়। প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় তাকে দাঁড়াতে দেখি। কাঠের নকশা করা মেঝের এক সন্ধিস্থলে, ঘোড়ার চোখের মত দেখতে যেখানটা, সেখানে। হাত দুটো সৈনিকের মত টান টান করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান, মাথাটা নীচু করে ঝুঁকিয়ে দেন পাতলা ঋজু শরীরটা। তারপর বেশ ভারী গলায় শুরু করেন, 'হে আমাদের পরম পিতা এবং তাঁর সন্তান ও দেবাত্মার নামে।'

তা শুনে আমার প্রতিবারই মনে হয়, কথাগুলো বলার সাথে সাথেই ঘরে একটা নিঝুম স্তব্ধতা নেমে এসেছে। এমন কি মাছিগুলোরও ভনভনানি নেই; ওরাও সাবধান হয়েছে।

এরপর তিনি মাথাটা পিছুতে হেলিয়ে দেন। তাতে তার সোনালী দাড়িটা মেঝের সমান্তরাল হয়, ভুরুগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে তার উপাসনা। বেশ স্পষ্টভাবে তিনি উচ্চারণ করেন। মনে হয়, যেন দাবী জানাচ্ছেন, অথবা যেন পড়া মুখস্থ করেছেন, 'মানুষের জানা-অজানার জাল ছিন্ন হয়ে আসুক পরম বিচারের দিন···শুরু হয়ে যাক পাপ-পুণ্যের শেষ বিচার···'

বুকের ওপর চাপড় মেরে মেরে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'হে প্রভু, তোমার চরণেই আমার যা কিছু পাপ...ঐদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও প্রভু।'

প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে শুরু হয় তার স্তব-স্তুতির আবৃত্তি। ডান পায়ে তাল দিতে থাকেন। ভারি পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুন্দর, প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা; চেহারাটা আরো যেন লম্বা হয়ে উঠেছে, আরো পাতলা, আরো ঋজু।

'হে সর্ব পাপ বিনাশী। আমার অন্তরের সমস্ত পাপ দূর কর। হে স্বর্গের জননী। আমার অন্তর থেকে কান্না উঠে আসছে ; করুণা কর।'

গলার স্বরটা বিলাপের মত হয়ে, সবুজ চোখের কোণে জলের ফোঁটা চক্‌চক্ করতে থাকে, 'হে ঈশ্বর, আমাকে ভক্তি দিয়ে বিচার কর। আমার কৃতকর্ম দিয়ে বিচার করোনা। আমার শক্তির বেশি যেন আর কিছু চাপিওনা আমার ওপর।'

উত্তেজিত হাতের দ্রুত সঞ্চালনে বারবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকেন বুকের ওপর। ছাগল যেমন ঢু মারে, তেমনিভাবে দাদু মাথা নাড়তে থাকেন। কথা বলেন দ্রুততালে, নিঃশ্বাস ফেলেন ঘন ঘন। পরে বড় হয়ে বুঝেছি যে দাদু ইহুদিদের মত উপাসনা করেন।

টেবিলের ওপর রাখা সামাভোর থেকে বাষ্প উঠছে। বাড়িতে তৈরি পনীর দিয়ে ঠাসা সদ্য-সেঁকা যবের কেকের গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। প্রচণ্ড খিদেতে আমার পেটটা গর্জন করছে। দিদিমা দরজায় ঠেস দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর ভুরু কোঁচকাচ্ছে। জানালা দিয়ে সূর্য্য উঁকি দিচ্ছে। গাছের পাতায় [illegible] মত চক্‌চক্ করছে শিশির বিন্দু। ভোরের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে ধনে পাতা, কারাণ্ট আর পাকা আপেলের গন্ধ। দাদু তখনো পা নাচিয়ে একটানা সুরে আবৃত্তি করছেন, 'আমার কুয়াশার আগুন নিভিয়ে দাও হে ঈশ্বর, আমি অধম, নীচ।'

দাদুর সকাল সন্ধ্যার উপাসনার কথাগুলো আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপাসনার সময় তিনি কোন ভুল করেন কিনা বা কোন শব্দ বাদ দিয়ে যান কিনা তা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম।

দাদুর যখনই ভুল হত তখনই মনে মনে আমার একটা আনন্দ হত। যেন হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার উল্লাসে আমি মেতে উঠতাম। উপাসনার পর দাদু আমার দিকে তাকিয়ে বলত 'সুপ্রভাত!'

আমরা মাথা নত করি, তারপর নিজেরা নিজের আসন গ্রহণ করি।

'আজকের উপাসনায় 'যথেষ্ট' কথাটি বাদ পড়েছিল।' আমি দাদুকে বলি।

'তাই নাকি ? ঠিক শুনেছিস ?' সন্দিগ্ধ চিত্তে দাদু জিজ্ঞেস করেন।

'ঠিকই বলছি। এক জায়গায় তুমি বল, 'হে প্রভু আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভক্তি যেন আমার থাকে'—সেই জায়গায় যথেষ্ট কথাটা বলনি।'

অপরাধীর মত দাদু কেবল মুখে একটা শব্দ করেন, 'হুঁ!' এই মন্তব্য করার জন্য দাদু আমার ওপর একদিন বদলা নিয়েছিলেন বটে কিন্তু ঐ সময়ের জন্য ওকে বিব্রত হতে দেখেছি। তাতে আমার আনন্দই হয়েছে।

একদিন দিদিমা কৌতুক করে বলেছিল, 'তোমার উপাসনা শুনে ভগবানের একঘেয়ে লেগে গেছে। রোজ এক কথাই বল।'

'কী-ই-ই ?' রাগে ক্ষেপে ওঠেন দাদু, 'কী বলছ খেয়াল আছে ?'

'আমি কী বলছি জান ? তোমার স্রষ্টার উদ্দেশ্যে তুমি যা বলছ, তা কখনো তোমার প্রাণের কথা নয়।'

রাগে লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদু চেয়ারে বসলেন, তারপর লাফিয়ে উঠে একটা পিরিচ ছুঁড়ে মারলেন দিদিমাকে। তারপর গলার স্বরটা যেন কেমন

হল—করাত দিয়ে কাঁচ কাটার শব্দের মত আর কি! তারপর চীৎকার করে বললেন, 'ডাইনী বুড়ী, এখান থেকে দূর হয়ে যা—'।

ঈশ্বরের শক্তির উল্লেখ করলেই তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন ঈশ্বরের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার কথা। একবার একদল পাপী বন্যায় ডুবেছিল। আরেকবার পাপীদের শহর আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল। পাপের শাস্তির জন্য হয়েছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী ঈশ্বর যেন উদ্যত তরবারি, দুর্বৃত্তদের কাছে উদ্যত চাবুক। 'ঈশ্বরের অনুশাসন অমান্য করলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়।' পাতলা পাতলা বাঁকা আঙ্গুলে টেবিলের ওপর টোকা দিতে দিতে তিনি আমাকে সতর্ক করেন।

ঈশ্বর যে এ ধরণের নিষ্ঠুর তা কষ্ট-কল্পনা বলে মনে হয়। কেমন যেন বিশ্বাস হয়না। মনে হয় ঈশ্বর সম্বন্ধে দাদুর সব কথাই মনগড়া। এসব বলার অর্থ ঈশ্বরকে ভয় করি বা না করি তাকে যেন ভয় করে চলি।

আমি সপাট তার মুখের ওপর বললাম, 'আমি যাতে তোমার কথা শুনে চলি, সেই জন্যেই এসব বলছ?'

দাদুও মুখের ওপর জবাব দিলেন 'দেখনা, অবাধ্য হয়ে, মজা দেখিয়ে দিই কেমন!'

'কিন্তু দিদিমার বেলায় কি করবে?'

'ছাড় ঐ বোকা বুড়ীটার কথা। ওর কথায় কান দিবিনা। ওকে আর শোধরাতে পারা গেল না, সারাটা জীবনই একরকম রয়ে গেল। ছিটগ্রস্ত হয়ে রইল। কিছু শিখতেও পারল না। আমি তোর দিদিমাকে বলব ও যেন এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নাক না গলায়। তোকে যেন কিছু না বলে।'

'আচ্ছা এবার আমার একটা কথাব জবাব দে দেখি, পদমর্যাদার দিক দিয়ে দেবতাদের কভাগে ভাগ করা যায়, বল দেখি?'

দাদুর কথার জবাব দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা দাদু, 'উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ঠাকুরেরা' কথাটার মানে কি?

'সবই কি তোর জানা দরকার?' দাদু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারপর ওর চোখের দৃষ্টি মেঝের ওপর নামিয়ে ঠোঁট দুটো নাড়তে থাকেন। মনে হয় যেন কি চিবোচ্ছেন। খানিক পরে কি একটা ভেবে জবাব দেন, চাকুরেরা সেই শ্রেণীর লোক যারা আইনের কথায় ডুবে থাকে। আর ইচ্ছে করলে আইন গুলোও খেতে পারে।'

'আইন কি দাদু?'

'আইন? আইন হচ্ছে—যাকে বলতে পারিস—কতকগুলি নিয়ম যা' সবাই মেনে চলে।' দাদুর আত্মতৃপ্তিতে চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে। তিনি বলতে থাকেন, 'মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে আর নিজেদের ভেতর কতগুলি ব্যাপারে একমত হয়। সেই সব নিয়ম সবাই মিলে মানে। এগুলোই হল আইন। যেমন ধর, ছোটরা যখন খেলতে যায় তখন কিভাবে খেলাটা হবে···সে সম্পর্কে তারা নিজেদের ভেতর একটা নিয়ম করে নেয়। তারা ঠিক করে সেটাই আইন।'

'আর চাকুরে মানে?'

'ওরা হচ্ছে একদল খারাপ ছেলে, যারা কোন ভাবে আইন মানে না।'

'কেন?'

ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে দাদু জবাব দেন, 'ওসব তুমি বুঝবে না। মানুষ

যাই করুক, প্রভু ইচ্ছেন সবার ওপর। মানুষ চায় এক, প্রভুর ইচ্ছে অন্য। কোন কাজ সম্পর্কে নিশ্চিন্তে বলতে পারা যাবে না যে এটা হবেই। প্রভু ইচ্ছে করলে, তার এক নিশ্বাসে এই সংসার এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।'

কতগুলো কারণে সরকারী চাকুরেদের সম্পর্কেই আমার কৌতূহলটা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই এক কথাই আমি বার বার জিজ্ঞেস করলাম, 'জান দাদু, ইয়াকভ-মামা একটা গান করে, সেই গানের প্রথম দুটো কলি হল ঃ

'ঈশ্বরের চাকুরী করে দেবদূতেরা পুণ্য
শয়তানের চাকুরী করে চাকুরেরা ঘৃণ্য।'

চোখ বুজে, দাড়ির গোছা মুঠি করে দাদু চেপে ধরলেন মুখের ভেতর। তার গাল দুটো কাঁপছিল। আমি টের পেলাম, হাসি চাপতে চাইছেন তিনি। বললেন, 'তোকে আর ইয়াকভকে বস্তায় পুরে নদীতে ফেলে দিলে ঠিক হয়। ইয়াকভও হয়েছে সে রকম ; গান আর খুঁজে পায় না। আর তুইও হয়েছিস তেমনি, যে গানই হোক শুনতেই হবে। এসব হচ্ছে হতভাগাদের গান, বিধর্মীদের গান—কুৎসিত রসিকতা করা হয়েছে এই গানে।'

আমার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দাদু কী যেন ভাবলেন, তারপর একটা গভীর শ্বাস ফেলে বললেন, 'ছ্যাঃ কী মানুষ সব !'

ঈশ্বর সম্পর্কে দাদুর ধারণা হল এই যে, ঈশ্বর রয়েছে সবার ওপরে। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরে সর্বময় প্রভুত্ব তাঁর। দিদিমার মত দাদুও বিশ্বাস করে যে সব কাজেই ঈশ্বরের হাত আছে। একা ঈশ্বরের নয়, সাধু সন্তদেরও হাত আছে। আমার দিদিমা নির্দিষ্ট সংখ্যক সাধু সন্তকে মেনে চলে—নিকোলাই, ইউরি, ফ্রল ও লাভ্‌র। এঁদের সবার দয়ামায়া আছে। এরা গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়ান মানুষকে সাহায্য করতে। মানুষের মত এঁদেরও দোষ গুণ আছে। আর আমার দাদুর সাধু পুরুষরা হল সবাই শহীদ। এঁরা মূর্তি টান মেরে ফেলেছেন, সীজারদের সাথে লড়াই করেছেন এক পা পিছু না হটে। আর এই কারণেই ওদের খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, অথবা কাউকে জীবন্ত অবস্থায় শরীরের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

মাঝে মাঝে আবেগ ভরে দাদু বলেন, 'প্রভু যদি একটু সদয় হন, অন্তত পাঁচশো রুবল লাভে যদি এ বাড়ি বিক্রী করতে পারি, তবে শহীদ নিকোলাইয়ের নামে একটা বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করব।'

দিদিমা এসব শুনে হাসে, বলে, 'কী বুদ্ধি, দেখেছিস ! এমন সব কথা বলে যাতে মনে হয় যেন এই বাড়ি বিক্রী করিয়ে দেওয়া ছাড়া নিকোলাইয়ের আর কিছু কাজ নেই।'

দাদুর একটা পাঁজি ছিল। তাতে গির্জার অনুষ্ঠানসূচী দেওয়া ছিল। সেটা আমার কাছে অনেক বছর ধরে ছিল। এই পাঁজিতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দাদুর হরেক রকমের মন্তব্য লেখা ছিল। ইয়োহিম ও আন্না এই দুটো দিনের পাশে লাল কালিতে দাদু লিখেছিলেন, 'আপনাদের দয়ায় দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচেছি।'

এই দুর্ভাগ্যটা কি তা আমি জানি। নিজের অপদার্থ ছেলেদের সব সময়েই তিনি সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। এইজন্যে বন্ধকী কারবারে তিনি নেমেছিলেন। দামী দামী জিনিষ রেখে টাকা দিতেন। কে যেন পুলিশকে এ খবর দিয়েছিল।

পুলিশ আমাদের বাড়িতে তল্লাসী চালিয়েছিল। সারারাত ধরে সে কী কাণ্ড! দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তবে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি। দাদু সকাল অবধি উপাসনাই করেছিলেন। সকাল বেলা আমার সামনেই পাঁজিতে ঐ কথাগুলো লিখেছিলেন। রাত্রে খাবার আগে আমাকে 'প্রর্থনা-সঙ্গীত' বই থেকে অথবা ইয়ে ফয়েম সিরিন এর লেখা একান্ত ধর্মপুস্তকের কিছুটা পড়ে শোনাতে হয়ে যায়। রাত্রে খাবার পর তিনি আবার উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর চারদিক নিঝুম হয়। শুধু শোনা যায় দাদুর অনুশোচনা জনিত প্রার্থনা। তিনি বলে চলেন, 'হে পরম দয়াময় চিরন্তন রাজন, তুমি সব কিছু দেবার আর ফিরিয়ে নেবার মালিক। তুমি আমাকে প্রলোভন থেকে বাঁচাও…দুরাত্মাদের হাত থেকে রক্ষা কর…আমার চোখের জলে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাক।'

দিদিমাকে অনেক সময় বলতে দেখা যায়, 'ইস্ শরীরটা ভারি ক্লান্ত লাগছে। বোধহয় আজ আর ভগবানের নাম নিতে পারা যাবেনা, তার আগেই শুয়ে পড়তে হতে পারে!'

দাদু আমাকে সঙ্গে নিয়ে গির্জায় যেতেন। শনিবার সন্ধ্যার উপাসনা আর রবিবারের দুপুরের অনুষ্ঠানে আমরা যেতাম। গির্জায় গিয়েই বুঝতে পারতাম, কোন্ ঈশ্বরের ভজনা করা হচ্ছে। পাদ্রি পুরোহিতেরা ভজনা করেন দাদুর ঈশ্বরকে, আর সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতে ভজনা করা হয় দিদিমার ঈশ্বরকে।

অবশ্য আমি এখানে যে চিত্র তুলে ধরছি তা হল আমার ছেলেমানুষি বুদ্ধিতে দুই ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছিলাম তারই খুব স্থূল একটা বর্ণনা। ঈশ্বরের মধ্যে এই পার্থক্য টেনেছি বলে তখন চিন্তার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। দাদুর ঈশ্বরের প্রতি আমার থেকেছে ভয়, এবং ঐ ধরণের ঈশ্বর আমার খুব একটা পছন্দসই নয়। তিনি কাউকে ভালবাসেন না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন সবার ওপরে। মানুষের ভেতরকার সব দুরাচার আর নীচতাকেই তিনি খুঁজে বার করেন। সেদিকেই তাঁর যেন তৎপরতা বেশি। মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি অপেক্ষা করে থাকেন সেই সময়ের জন্য যখন মানুষ অনুশোচনা করবে, আর সেই কারণে শাস্তি দিতে পারলেই তিনি খুশি হন।

আমার জীবনের অনেক-কটা দিন জুড়ে ছিল প্রধানত ভগবানের চিন্তা। ভগবান আমার জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিলেন। অন্য সব ক্ষেত্রে নোংরামি আর হিংসা-দ্বেষ দেখে আমি শিউরে উঠতাম। আমার মন হয়ে উঠত ভারী। আর এসবের মধ্যে দিদিমার ভগবান ছিল উজ্জ্বলতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, তিনি সব মানুষের বন্ধু। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতাম, কেন দাদু ভগবানের এই দয়াময় রূপটা দেখেন না।

আমার উত্তেজনার জন্য আমাকে বাড়ীর বাইরে খেলতে যেতে দেওয়া হত না। বাইরে খেলতে গেলে আমার মধ্যে যে ভাবের সঞ্চার হত তাতে প্রায়ই একটা মারামারি গোলমালের সৃষ্টি হত। বন্ধু বলতে কেউই ছিলনা আমার। পাড়ার ছেলেরা আমাকে হিংসে করত। পাড়ার ছেলেরা কাশিরিন্ বলে ডাকলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যেত। এটা ওরা জানত বলেই আমাকে ঐ ভাবেই ডাকত।

'ওই দ্যাখ, কাশিরিন্ কিপটে বুড়োর নাতি আসছে রে।'

'ফেলে দে না একটা ঘুষি মেরে!'

ফলে শুরু হত মারামারি ! বয়স অনুপাতে আমার গায়ে বেশি জোর ছিল, আর মারামারিতে আমি ছিলাম পাকা পোক্ত। আমার শত্রুরাও তা' বলে। একা একা কেউই আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসত না। তাই মারামারি শুরু হলে এক দল এসে আমাকে বেপরোয়া মেরে যেত ; আর আমি হয় নাক কাটা, হাত কাটা, ঠোঁট কাটা অথবা জামা কাপড় ছিঁড়ে বাড়ি ফিরতাম। তা দেখে দিদিমা চেঁচাত, 'ওরে ছোঁড়া ! তুই আবার মারামারি করেছিস ! দাঁড়া, মজাটা দেখাচ্ছি তোকে। কোথা থেকে আরম্ভ করি ?'

দিদিমা আমার মুখ ধুইয়ে দিয়ে তামার মুদ্রা অথবা গাছ-গাছড়ার রস অথবা কোন আরক লাগাতে লাগাতে বলত, 'হ্যাঁরে, তুই কেন বাইরে বের হলে মারামারি করিস ? বাড়িতে শান্ত-শিষ্ট ছেলে অথচ বাইরে গেলেই সব ঘুচে যায় ! তোর মজা দেখাচ্ছি, দাদুকে বলব যাতে বাইরে এক পা-ও না বের হতে দেয়।'

আমার মুখে কোথাও ফোলা, কোথাও কাটা, এসব দাদুর চোখ এড়াত না। তিনি কখনো সত্যি সত্যি রাগ করেন নি। একটু গম্ভীর ভাবে শুধু বলেছেন, 'বাঃ, দেখছি মুখের ওপরে আবার শিল্পকলা করা হয়েছে ! কী আমার বীর পালোয়ান রে। এই বলে রাখলাম, রাস্তায় আর এক পা দিয়েছ তো ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব। কথাটা কানে ঢুকছে কি ?'

রাস্তায় যদি হৈ-চৈ না থাকে তবে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার থাকেনা। যেইমাত্র কানে আসে পাড়ার ছেলেরা কলকল স্বরে কথা বলছে তখনই ছুটে যাই, দাদুর শাসানির কথা আর মনে থাকেনা। ওদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে মুখ কেটে ছিঁড়ে ফুলে ওঠে, তাতে আমার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই, কিন্তু খেলার ছলে ওরা যে নিষ্ঠুরতা করে তাতে আমার সহ্যসীমা হারিয়ে যায়। এসব দেখে মাথায় রক্ত উঠে যায়। ওরা কুকুর আর মোরগের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখে। বেড়ালের ওপর অত্যাচার চালায় ; ইহুদিদের ছাগলগুলোর পেছনে অযথা তাড়া করে, মাতাল ভিক্ষুকগুলোকে মিছিমিছি ক্ষেপিয়ে তোলে, আর ধর্মভীরু ইগোশাকে বলে, 'ইগোশা, তোর পকেটে মৃত্যু আছে।' এসব আমার সহ্য হয়না।

ইগোশা,—যার কথা বললাম, তার ছিল রোগা লম্বা চেহারা, হাড় বের করা মুখ, তাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট আর শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় শরীরটা অদ্ভুতভাবে নড়ে আর চোখের চাউনিটা থাকে মাটির দিকে। কালো মুখে ছোট চোখদুটো ভারী দুঃখী মনে হয়। তা দেখে আমার ভয় ও ভক্তি দুই-ই জাগে। মনে হয়, লোকটা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে এবং তাকে সেই কারণে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু ছেলেরা তার পিছু ধাওয়া করে আর কুঁজো পিঠে ইট ছোঁড়ে। প্রথমটা সে ভ্রূক্ষেপ করেনা, যেন সে কিছু টেরই পাচ্ছে না। কিন্তু তারপর হঠাৎ টান হয়ে ফিরে দাঁড়ায়, মাথার ছেঁড়া টুপিটা ঠিক করে নিয়ে চারদিক দেখে আর আড়মোড়া ভাঙতে থাকে। দেখে মনে হয় যে সে এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠেছে।

ছেলের দল চীৎকার করে বলে, 'ইগোশা, মৃত্যু তোর পকেটে আছে ! তুই যাচ্ছিস কোথায় ? মৃত্যু তো তোর পকেটে !'

নিজের পকেটটা সে মুঠো করে নীচু হয়ে একটা ইট কুঁড়িয়ে নেয়। তারপর গালি দিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারে। গালিগালাজের ভাণ্ডারে তার জমা আছে মাত্র

তিনটে শব্দ। এদিক থেকে ছেলেরা অনেক চৌকস ; তাদের সঙ্গে ওর তুলনা হয়না। মাঝে মাঝে সে ছেলেদের তাড়া দেয়। যেতে যেতে নিজের লম্বা কোটে পা আটকে মুখ থুবরিয়ে পড়ে। কাঠির মত শুকনো হাতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলায় সে। ছেলেরা তাকে তিতিবিরক্ত করে ছাড়ে, ইট ছুড়েই চলে ; যাদের একটু সাহস আছে তারা তো সামনে এসে মাথায় মুঠোমুঠো ধূলো ছুঁড়ে দিয়ে পালায়।

আমাদের পুরনো দক্ষ কারিগর গ্রিগরি মধ্যে মধ্যে রাস্তা দিয়ে যায়। রাস্তায় যেসব দৃশ্য দেখা যায় তার মধ্যে একটা মনকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দেয়। গ্রিগরি এখন পুরো অন্ধ, রাস্তায় ভিক্ষে করে সে দিন কাটায়। সুদর্শন লম্বা চেহারা ; মুখে একটা কথা বলে না। একটা ছোটখাটো চেহারার পাকাচুল বুড়ী তার হাত ধরে নিয়ে যায়। এই বুড়ী জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সরু নাকী সুরে বলে, 'এই অন্ধ ভিখিরিকে দয়া কর বাবারা, ভগবান তোমাদের ভাল করবেন।'

গ্রিগরি মুখ খোলে না। তার কালো চশমার কাঁচ সরাসরি দেওয়াল বা জানলার দিকে, অথবা যে সামনে আসে তার দিকেই স্থির ভাবে নিবদ্ধ থাকে। মধ্যে মধ্যে ঘন দাড়িগোছায় রঙের ছোপ-ধরা হাত বুলোতে থাকে। আমি প্রায়ই তাকে দেখতে পাই। মুখে একটাও কথা বলতে শুনিনা। গ্রিগরির এই নীরবতা আমার বুকে একটা চাপ সৃষ্টি করে। আমি কোন মতেই তার সামনে যাই না, অনেক চেষ্টা করেও যেতে পারি না। রাস্তায় তাকে দেখলে আমি বাড়ির ভেতর ছুটে আসি আর দিদিমাকে বলি, 'দিদিমা, গ্রিগরি আসছে।'

একটা গোপন ব্যথায় দিদিমার মুখের রেখা টান হয়ে যায়। আমাকে বলে, 'আহা বেচারী! যা ছুটে গিয়ে ওকে এটা দিয়ে আয়!'

তার মুখের ওপরই রেগে রুক্ষভাবে অস্বীকার করি। তখন দিদিমা নিজেই বাইরে এসে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগরির সঙ্গে কথা বলতে থাকে। গ্রিগরি প্রায় কিছু বলেই না ; শুধু মুচকি হাসে।

দিদিমা কোন কোন দিন ওকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে খাওয়ায়। একবার সে আমার খোঁজ করেছিল। দিদিমা আমাকে ডেকেছিল, কিন্তু আমি একটা কাঠের বোঝার পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। আমি কিছুতেই ওর সামনে যেতে পারি না। লজ্জায় ওর সামনে মুখ তুলে তাকাতেও পারি না। আমি জানি, দিদিমারও আমার মতই মনের অবস্থা। একবার দিদিমা আর আমি ওর সম্পর্কে কথা বলছিলাম। দিদিমা তাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। তার মাথাটা মাটির দিকে হেঁট করা ছিল, ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে। আমি দিদিমার হাত ধরলাম।

শান্ত স্বরে দিদিমা প্রশ্ন করল, 'গ্রিগরি এলে তুই পালাস কেন রে? ও তোকে কত ভালবাসে—ওর মত দয়ালু লোক হয় না কি?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদু ওর খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করেন না কেন?'

'দাদু?'

থমকে গেল দিদিমা। তারপর আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ফিস-ফিস করে বলল, 'আমি তোকে বলে রাখলাম—মনে রাখবি আমার কথাগুলো। কাজটা ভাল হচ্ছে না, এজন্যে ভগবানের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবেই। আর সেই শাস্তি বড় ভয়ঙ্কর!'

দিদিমার কথা মিথ্যে হয়নি! বছর দশেক পার হয়নিকো! দিদিমা তখন চির শান্তিলাভ করেছে, আর সেই সময় আমার দাদু বাতিকগ্রস্ত হয়ে ঠিক তেমনি ভাবে শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে করুণ স্বরে জানলায় জানলায় দু-মুঠো ভাতের জন্য হাত পেতেছেন আর বলেছেন, ভাল মানুষের ছেলেরা সব, একটুকরো 'পিরোগ' খেতে দাও গো, ছোট্ট টুকরো...আর আমি কিছুই চাইনা···ছিঃ কী সব মানুষ!'

'কী সব মানুষ' এই একটা কথার মধ্যেই পুরনো মানুষটাকে চেনা যায়। এর বেশি আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কথাটার মধ্যে মনের সব জ্বালা ফুটে ওঠে, শুনলে মন স্থির থাকে না।

ইগোশা আর গ্রিগরি ছাড়া ভরোনিখা বলে একটা দুশ্চরিত্রা মেয়েছেলে ছিল। তাকে পথে দেখলে আমি ছুটে পালাতাম। প্রতি রবিবার তাকে দেখা যেত। প্রকাণ্ড শরীর, এলোমেলো বেশবাস আর মদের নেশায় মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াত সে। তার হাঁটাটা ছিল অদ্ভুত ধরণের। মনে হত সে হাঁটছে না বা মাটিতে পা ঠেকাচ্ছে না, ঝড়ো মেঘের মতই সে ভেসে আসছে। সে ভাঙা গলায় অশ্লীল গান গাইত। তাকে রাস্তায় দেখলেই লোকে পালিয়ে যেত। কেউ কেউ গা ঢাকা দিত দোকানে বা অলিগলিতে, দেওয়ালের আড়ালে। যেন ঝেঁটিয়ে রাস্তা সাফ করতে করতে সে চলত। তার মুখটা ছিল নীল, বেলুনের মত ফোলা; চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে। আর তা ঘুরছে। দেখলেই ভয় হত! মাঝে মাঝে কান্নার সুরে সে চেঁচাত, 'কোথায় গো ছেলেমেয়েরা?'

কথাটার মানে আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

প্রথমে দিদিমা খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'সব কিছুই তোর জানতে হবে?' পরে অবশ্য সংক্ষেপে বলেছিল। ঘটনাটা ছিল এই: বুড়ীর স্বামীর নাম ভরোনভ। লোকটা ছিল সরকারী চাকুরে। উচ্চপদ পাবার লোভে অফিসের বড় কর্তার হাতে সে তার বৌকে তুলে দেয়। অফিসের বড় কর্তা তার স্ত্রীকে দু-বছরের জন্য নিয়ে যায়। দু-বছর বাদে স্ত্রীলোকটি ফিরে এসে দেখল তার দুই সন্তান— এক ছেলে আর এক মেয়ে মারা গেছে, আর তার স্বামী সরকারী তহবিল ভাঙ্গার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছে। শোকে মেয়েলোকটি মদ খেতে শুরু করে, আর দিনে দিনে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এখন প্রতি রবিবার ও রাস্তায় বের হয়, আর সন্ধ্যার সময় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়।

রাস্তায় যাই ঘটুক না কেন, রাস্তার চেয়ে বাড়িটা অনেক ভাল। আমার কাছে ভাল লাগে সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর। এই সময়ে দাদু ইয়াকভ-মামার সাথে দেখা করতে বের হয়ে যান আর দিদিমা জানলার ধারে বসে আমাকে নানা গল্প ও বাবার জীবনের নানা ঘটনা বলতে থাকে।

যে স্টার্লিং পাখিটাকে দিদিমা বেড়ালের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিল, তার ভাঙা ডানাটাকে কেটে দিয়েছে, পায়ের দাঁড়ায় নিপুণ ভাবে ছোট কাঠি বেঁধে দিয়েছে। পাখিটা সুস্থ হয়ে উঠতেই দিদিমা উঠে পড়ে লেগেছে তাকে কথা শেখাবার জন্যে। দেখা যায় দিদিমা জানলার কাছে ঝোলানো খাঁচায় পাখিটার কাছে এক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আর অক্লান্ত ভাবে বলে চলেছে যা শেখাতে চায় সেই কথাগুলো। দিদিমা বলে, 'আচ্ছা এবার বল্‌তো—'পাখিকে পনির খেতে দাও!' কথাগুলো শুনে পাখিটা স্যাঙের মত গোল গোল চোখ পাকিয়ে দিদিমার দিকে

তাকায় আর খাঁচার পাটাতনের ওপর ঠক ঠক করে কাঠের পা ঠুকতে থাকে। গলাটা টান করে কখনো ঈগলের মত শিস দেয়, কাক বা কোকিলের ডাক নকল করে; বেড়ালের মত মিউ মিউ অথবা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মানুষের গলার স্বর বার করতে পারে না। দিদিমা গোমরা মুখে বলে, 'ঢের বাঁদরামি হয়েছে। এবার বল দেখি—'পাখিকে পনির খেতে দাও!'

যদি এই পালক ঢাকা বাঁদরের কিচিরমিচির শব্দের মধ্যে দিদিমার কথার সুরের অনুকরণে সুর শোনা যায় তো দিদিমা আহ্লাদে ফেটে পড়ে। নিজের হাত থেকে যবের তৈরী পনির খাওয়াতে শুরু করে দেয়। তারপর আদরের ধমক দিয়ে বলে, 'ভাবছিস, তোর শয়তানি বুঝি না? এ সবই তোর চালাকি, শয়তানি! ইচ্ছে করলে তুই কী না পারিস?'

সত্যি সত্যি কিছু দিনের মধ্যে দিদিমা পাখিটাকে কথা বলতে শিখিয়ে ছিল। পাখিটা স্পষ্ট করে পনির খেতে চাইত। দিদিমাকে দেখেই চীৎকার করে বলত, যা শুনে মনে হত—'নমস্কার।'

পাখিটা প্রথমে থাকত দাদুর ঘরে। পরে সেখান থেকে দাদু ওকে নির্বাসন দিয়েছিলেন আমাদের ছাদের ঘরে।

এই নির্বাসনের কারণ পাখিটা দাদুকে বিদ্রূপ করত। দাদুর উপাসনার ভাষাটা এবং উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট। তা শুনতে শুনতে পাখিটা খাঁচার শিকের ভেতর দিয়ে হলুদ ঠোঁট বার করে বলত, 'সত্যি, সত্যি-ই-ই-ই, খু-উ-উব সত্যি-ই-ই।'

পাখিটার এরকম ডাক শুনে দিদিমা চলে যেত। একদিন উপাসনার সময় মাঝ পথে থেমে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দাদু মেঝেতে পা ঠুকে রাগত স্বরে চীৎকার করে বলেন, 'শয়তানটাকে এখনি নিয়ে যাও, নইলে আমি ওকে শেষ করে দেব।'

এই সব ঘটনায় আমার কখনো কৌতূহল জাগে, কখনো বা মজা লাগে। এই ধাঁচের অনেক ঘটনা ঘটত আমাদের এ বাড়িতে। তবু মাঝে মাঝেই আমি বিষন্নতায় ভেঙে পড়তাম। মনে হত যেন একটা বড় বোঝা আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে। আমার এও মনে হত, যেন আমি একটা কালির দোয়াতের মত সুরঙ্গের মধ্যে রয়েছি। সেখানে কিছু দেখা যেতনা, শোনা যেতনা—কিছু অনুভবও করা যেতনা। আমার জীবন ছিল যেন অন্ধ ও ম্রিয়মান।

আট

শুঁড়িখানার মালিককে দাদু হঠাৎ আমাদের বাড়িটা বিক্রী করে দেন। কানাৎনায়া ষ্ট্রীটে তিনি আরেকটা বাড়ি কিনলেন। এই রাস্তাটা বরাবর গিয়ে খোলা মাঠে মিশেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘাসে ঢাকা, কোলাহলের লেশ মাত্র নেই। দু-পাশে সারি সারি ছোট ছোট বর্ণাঢ্য বাড়ি। এই নতুন বাড়িটা ছিল পুরনোটার চেয়ে সুন্দর, পরিপাটি, তক্তকে। সামনের দিকে গাঢ় লাল রঙ, এই লাল রঙের মাঝে একতলার তিনটে জানলার নীল খড়খড়ি আর ওপরের ঘরের জানলার ঝিলিমিলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছাদের বাঁ দিকে এল্‌ম ও লাইম গাছের ডালপালা নেমেছে। উঠোন ও বাগানের সরু সরু রাস্তা এমন গোলক ধাঁধার মত ছড়িয়ে আছে যাতে মনে হয় এই জায়গাটা লুকোচুরি খেলার জন্যই তৈরী। এই মাঝারি ধরণের বাগানটা খুব সুন্দর। লতাপাতা আর ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা থাকায় দেখতে ভাল লাগে। এক কোণে একটা চওড়া গর্ত প্রচুর আগাছায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। এখানে আগে

ছিল একটা স্নানঘর। তার ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু এখনো মাথা তুলে আছে। বাঁ পাশের সীমানায় কর্ণেল অভসিয়ান্নিকোভের আস্তাবল, ডানদিকে রয়েছে বেৎলেঙ-এর বার বাড়ি। আর বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে গোশালার মালিকানী পেত্রভনার জমি আরম্ভ হয়েছে। স্থূলকায়া লালমুখো পেত্রভনার ছিল হট্টগোল করার স্বভাব। তাকে দেখলে মনে হত যেন একটা মস্ত ঘন্টা। বাড়িটা ছিল ছোট অন্ধকার আগোছাল। দেখলে মনে হত অনেকটা মাটির সঙ্গে থেবড়ে আছে। পুরু শ্যাওলায় বাড়িটা ঢাকা পড়েছে। খোলা মাঠের দিকে ছিল দুটো জানলা। গভীর নালা মাঠটাকে যেন দুভাগ করেছে। দূরের-বনটাকে যেন এক পোঁচ নীল রঙ বলে মনে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই মাঠে সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে। শরতের রোদে তাদের বেয়নেটগুলো যেন ঝলসে ওঠে।

আমাদের বাড়িতে আর যে সব লোক থাকে তাদের আগে কখনো দেখিনি। সামনের দিকের ঘরে সস্ত্রীক এক ফৌজী লোক থাকত, সে ছিল তাতার। তার বৌয়ের ছিল গোলগাল ছোটখাটো চেহারা। সে সারাদিন হাসত, হৈ চৈ করত আর হালকা নক্সায় সজ্জিত গীটার বাজাত। চড়া আর সুরেলা একটা মজার গান সে প্রায়ই গাইত। গানটা ছিল :

'একটি মেয়েতে পীরিতি রেখে
সন্তোষে মন যে রয়না।
বিবেকটা রেখে খুঁজে ফিরে দেখে
আনো আর এক ললনা।
তবে পার লভিতে সংশয় নেই এতে
মনলোভা উপহার
সে প্রিয়তমা তবে অবিশ্যি সে হবে
সব রতনেরই সার!
সে-যে সব রতনের সার!

ওর স্বামীর চেহারাটা বলের মত গোলাকৃতি। ফুলো ফুলো নীল গাল নিয়ে সে জানলার সামনে বসে পাইপ টানে। বাদামী লাল রঙের চোখের দৃষ্টি সব সময় ঘুরপাক খায়। মাঝে মাঝে কাশতে থাকে, আর সেই কাশিতে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে আসে 'র র-রা-আ-ফ! র-র র-আফ!'

গুদাম ও আস্তাবলের ওপরে যে গরম ঘর তৈরী করা হয়েছে সেখানে দুজন গাড়ির চালক আর ভালেই নামে এক আর্দালি থাকে। আর্দালি লোকটা জাতে ছিল তাতার। ওর চেহারাটা লম্বা, মেজাজ ছিল বিষণ্ণ। গাড়ি চালকদের একজনকে সবাই পিওতর-কাকা বলে ডাকত। ছোটখাটো চেহারা, লোকটা বুড়িয়ে গেছে। অন্য জন ছিল ওর ভাইপো। নাম স্তিওপা। স্তিওপারের চেহারাটা ছিল ছিপছিপে, মসৃণ। ওর মুখটা ছিল তামার থালার মত। এদের সবাই আমাকে চিনত এবং আমার ছিল ওদের সবার প্রতি একটা কৌতূহল।

কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল এ বাড়ির অন্য একজন ভাড়াটের প্রতি। তাকে সবাই 'বাঃ বেশ' বলে ডাকত। বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের লম্বা ঘরটাতে সে থাকত। দুটো জানলা ছিল ঘরটাতে—একটা বাগানের দিকে, অন্যটা উঠোনের দিকে।

লোকটা ছিল রোগা, কুঁজো। ওর গালের কালো দো-পাট্টা দাড়ি ফ্যাকাশে মুখটাকে আরো ফ্যাকাশে করেছে। চোখে চশমা। শান্ত, নিবিরোধী মানুষ, কোন ঝুট ঝামেলায় থাকে না। চা আর খাবার তৈরি হয়ে গেলে ডাক পড়লে সে নিশ্চিতভাবেই জবাব দিত, 'বাঃ বেশ!'

দিদিমা ওকে 'বাঃ বেশ' নাম দিয়েছিল। আড়ালে ওই নামেই ওকে ডাকত; এমন কি সামনা সামনিও বলত।

প্রায়ই দিদিমা বলত, 'যা তো লেক্সেই 'বাঃ বেশ'কে বলে আয় চা দেওয়া হয়েছে।' কিংবা খাবার টেবিলে প্রায়শই দিদিমাকে বলতে শোনা যেত, 'একি 'বাঃ বেশ', কিছুই খাচ্ছেন না যে, আরেকটু নিন।'

বড় বড় কাঠের বাক্স আর মোটা বই তার ঘরে ঠাসা ছিল। এর আগে এমন দেখিনি। তার ঘরের চতুর্দিকে নানারকম তরল পদার্থে ভর্তি বোতল, তামার টুকরো লোহা ও সীসের চাঁই। তার পরনে থাকত বাদামী রঙের চামড়ার জ্যাকেট আর ছাই রঙের চেক প্যান্ট। জামা ও প্যান্টে রঙের ছিটে লাগা ছিল আর তা দিয়ে উৎকট গন্ধ বের হত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে ওই ঘরে পাওয়া যেত। কখনো সে সীসে গলায়, তামা ঝালাই করে অথবা নিক্তিতে কি যেন ওজন করে। মাঝে মাঝে তার আঙ্গুল পুড়ে গেলে চেঁচিয়ে ওঠে, নিজেই আবার পোড়া জায়গায় ফুঁ দেয়। লোকটা দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর ওপর ঝুঁকে কি যেন দেখত। চোখ তুলে চশমাটা খুলে কাঁচ দুটো মুছে এমন ঝুঁকে পড়ে ছবিগুলো দেখত যে তার চকখড়ির মত সাদা নাকটা ঠেকে যেত ছবিতে। এক এক সময়ে দেখা যেত ঘরের মাঝে বা জানলার পাশে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। চোখ বুজে মাথাটা উঁচু করে সে দাঁড়াত। এইভাবে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকত অনেকক্ষণ।

উঠোনের শেষ দিকে একটা চালা ছিল। এই চালার ছাদে উঠে উঠোনের দিকটার খোলা জানলা দিয়ে আমি লোকটাকে দেখতাম। টেবিলের ওপর এ্যালকোহল বাতির নীল শিখা দেখা যেত। বাড়ির ওপর ঝুঁকে থাকত লোকটা। তার কালো মূর্তিটা দেখতাম। মাঝে মাঝে একটা বইয়ের পাতায় কী যেন লিখত; একটা হিম আভা ঠিক্‌রে পড়ত তার চশমার কাঁচ থেকে—নীল বরফের টুকরোর মত। তাকে দেখে মনে হয় যেন এক যাদুকর। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি চালাঘরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তার দিকে তাকিয়ে দেখতাম।

মাঝে মাঝে সে যখন জানলায় এসে দাঁড়াত, তাকে জানলার ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতই দেখাত তখন। হাত দুটো পিছনে রেখে সে তাকিয়ে থাকত উঠোনের চালার দিকে। একবারও সে আমাকে দেখতে পায় না। এতে আমি অপমানিত বোধ করি। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হঠাৎ এক লাফে টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়ে; অস্থিরভাবে খাতাপত্র হাঁতড়ে কি যেন খুঁজতে থাকে।

লোকটার অনেক টাকা পয়সা থাকলে আর বেশভূষা ফিটফাট হলে তাকে দেখে আমার হয়তো ভয় হত। কিন্তু লোকটা ছিল গরীব, তার চামড়ার জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে যে কলার দেখা যেত তা ছিল নোংরা ও কোঁচকানো, বিচিত্র দাগওলা প্যান্টটা তালিমারা; তার পায়ে মোজা থাকত না, জুতোটারও কিছু ছিল না। গরীব দেখলে আমার দিদিমা দয়া করত, আর দাদু করতেন তাচ্ছিল্য। এ থেকে একটা

জিনিষ আমার শিক্ষা হয়েছিল যে গরীব লোকেরা কখনো বিপদ সৃষ্টি করে না, তাদেরকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

'বাঃ বেশ'কে এ বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে ঠাট্টা করে। ফৌজী লোকটার বৌ তাকে 'চকখড়ি নাক' বলে ডাকে। পিওতর-কাকা তাকে 'রাসায়নিক', 'কুহকী', আর আমার দাদু তাকে 'যাদুকর শয়তান' বলতেন।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি 'দিদিমা ও লোকটা কি করে গো?'

দিদিমা মুখ করে বলত, 'তোর সবেতে দরকার কি? সব ব্যাপার জানা চাই—'

আমি উত্তেজনা চেপে রাখতে পারিনি। একদিন সাহস করে আমি ওর জানলায় গিয়ে সোজা জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করছ?'

লোকটা চমকে উঠে চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের ফোস্কা-পড়া হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে আর বলল, 'হাত ধরে উঠে এস।'

সে যে আমাকে দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা দিয়ে গলে ভিতরে যেতে বলেছে তাতে তার মর্যাদা আমার চোখে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল। একটা বাক্সের ওপর গিয়ে সে বসল; আমাকে বসাল তার সামনে। আমাকে এপাশ-ওপাশ করে বহুক্ষণ ধরে দেখল। তারপর অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?'

প্রশ্নটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। কারণ দিনের মধ্যে চারবার খাবার টেবিলে ওর পাশে আমি বসি। আমি জবাব দেই, 'আমি এ বাড়ির নাতি।'

'ও হ্যাঁ, সত্যি তো!' বলে লোকটা আবার অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গিয়ে হাতের একটা আঙ্গুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমার মনে হল, কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। তাই বললাম, 'আমি এ বাডির নাতি হলেও কাশিরিন্ নই, আমি পেশকভ।'

'বাঃ বেশ' কথাটা উচ্চারণ করার সময় জোরটা 'ক'-এর ওপর না দিয়ে ভুলভাবে 'পে'-এর ওপর দিল। তারপর বলল, 'বাঃ বেশ।'

তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে আবার উঠে গেল টেবিলটার কাছে এবং বলল, 'ঠিক আছে চুপ করে থাক; গোলমাল কোর না।'

বসে বসে বহুক্ষণ ধরে লোকটার কাজকর্ম দেখলাম। একটা তামার টুকরোকে চিমটে দিয়ে ধরে উখো দিয়ে ঘষে ঘষে তামার গুঁড়ো বার করল। বেশ কিছু গুঁড়ো জমলে সেগুলো জড়ো করল একটা পুরু পাত্রে। একটা পাত্রে নুনের মত সাদা গুঁড়ো ছিল, তা মিশিয়ে দিল তামার গুঁড়োর সঙ্গে। তারপর একটা গাঢ় রঙের বোতল থেকে তরল পদার্থ পাত্রে ঢালল। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মধ্যের মিশ্রিত পদার্থ টগবগিয়ে উঠল আর ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর একটা ঝাঁঝাল গন্ধ বের হল। এতে আমি কাশতে লাগলাম

'বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে, না?' ঐন্দ্রজালিক খানিকটা দেমাকের সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে ভাই, এই তো চাই। খুব ভাল কথা।'

আমি কিছুতেই বুঝলাম না এত অহংকারের কারণ কী?

আমি ঝাঁঝাল গলায় বললাম, 'যা খারাপ তা সব সময়েই খারাপ, তা কখনো ভাল হয় না।'

চোখ পিট পিট করে সে চীৎকার করে উঠল, 'কি বললে? জেনে রেখ তোমার কথাটা সব জায়গায় খাটেনা। আচ্ছা তুমি হাড়ের খেলা খেলতে ভালবাস?'

'মানে, ঘুঁটি খেলা?

'হ্যাঁ, ঘুঁটিখেলা।'

'নিশ্চয় ভালবাসি।'

'আমি তোমায় একটা ঘুঁটি বানিয়ে দেব—কেমন? দেখবে, তোমায় কেউ হারাতে পারবে না।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়।'

'তাহলে তোমার ঘুঁটিগুলো নিয়ে এস।'

যে পাত্রটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে তা নিয়ে সে আমার কাছে এগিয়ে এল। তারপর একচোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে ঘুঁটি বানিয়ে দেব, তবে কথা দিতে হবে তুমি কখনো এখানে আসবে না। রাজি আছ?'

আমার আত্মসম্মানে লাগল। আমি জবাব দিলাম, 'এমনিই আমি এখানে আর আসব না।' এ কথাটা বলে আমি বাগানে চলে গেলাম। বাগানে এসে দেখি দাদু আপেল গাছের গোড়ায় সার দিচ্ছেন। শরৎকাল বলে গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

গাছের ডাল ছাঁটার কাঁচিটা আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, 'নে তো, র‍্যাস্‌বেরির ডালগুলোকে ছেঁটে দে।'

আমি দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দাদু, 'বাঃ বেশ' কি করে?'

দাদু রেগে মেগে বললেন, 'লোকটা ঘরটাকে নষ্ট করছে। মেঝের অনেক জায়গা পুড়িয়ে ফেলেছে। তার ওপর ওয়াল-পেপারে দাগ ধরিয়েছে, দু'এক জায়গায় ছিঁড়েছে। লোকটাকে ঘর ছেড়ে দেবার কথা বলতে হবে।'

'তাহলে ভাল হয়।' আমি এই জবাব দিয়ে ডাল ছাঁটবার কাজে লাগলাম আবার। কিন্তু আমার এই সায় জানানোটা খুব তড়িঘড়ি হয়েছিল।

দাদু বাড়ি না থাকলে বর্ষায় দিদিমা প্রায়ই রান্নাঘরে একটা ভোজের আয়োজন করত। তাতে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাই আমন্ত্রিত হত। গাড়ীর চালক, আর্দালি, এমন কি এক রসিকা ভাড়াটে সে-ও বাদ যেত না। প্রাণচঞ্চল পেত্রভনাও আসত মাঝে মাঝে। নিয়মিত আমন্ত্রিতদের মধ্যে থাকত 'বাঃ বেশ'। উনুনের পাশে এক কোণে সে বসত, নড়চড়া করত না। বোবা স্তওপা, তাতার আর্দালি ভালেইয়ের সঙ্গে তাস খেলত। তাস খেলতে খেলতে স্তিওপার ধ্যাবড়া নাকে··· টোকা দিয়ে বলত, 'আচ্ছা ঘাগী শয়তান তো তুই!'

পিওতর-কাকা নিয়ে আসত একটা মস্ত সাদা পাউরুটি আর কলসীতে ভর্তি ফলের জ্যাম। রুটিটা টুকরো করে কেটে তাতে পুরু করে ফলের জ্যাম লাগাত, তারপর হাতের ওপর রুটির টুকরো নিয়ে অতিথিদের দিকে বাড়িয়ে দিত।

অভিবাদন করার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে সে বলত, 'দয়া করে এক-টুকরো নিন।' যখন কেউ তুলে নিত, তখনই সে খালি হাতের তালুটা দেখত। যদি তাতে জ্যাম লেগে থাকত, জিভ দিয়ে চেটে নিত।

পেত্রভনা চেরি ফলের মদ নিয়ে আসত। আর রসিকা আনত বাদাম ও মিষ্টি। তারপর খাওয়া-দাওয়া সুরু হত। আমার দিদিমা এসব সবথেকে বেশি ভালবাসত।

'বাঃ বেশ' আমাকে ঘুষ দিয়ে তার ঘরে যেতে বারণ করার কিছুদিন বাদে দিদিমা একটা ভোজপর্বের আয়োজন করল। শরৎকালের একটানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাইরে বাতাস বইছে, গাছগুলো যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ঝরঝর শব্দে আর দেওয়ালে আঁচড়াচ্ছে। রান্নাঘরটা বেশ গরম। মানুষগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে; সকলকেই খুশি খুশি দেখাচ্ছে। দিদিমাকেও অন্য ধরণের লাগছে! সে শুধু কথা বলেই যাচ্ছে; যেন খই ফুটছে।

দিদিমা বসল উনুনের ধারে। তার পা-টা ছিল সিঁড়িতে। শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে দিদিমা গল্প বলতে থাকে। একটা টিনের বাতির আলো তার মুখে পড়েছে। দিদিমা যখনই গল্প বলে তখনই উনুনের ধারে উঁচু আসনটা বেছে নেয়।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'উঁচু থেকে দেখতে সুবিধে হয়, এই আর কি! শ্রোতারা তলায় থাকলে কথা বলতে সুবিধে!'

আমি দিদিমার পায়ের কাছে বসেছিলাম। জায়গাটা ছিল 'বাঃ বেশ'-এর মাথার কাছে। দিদিমা বলছিল যোদ্ধা ইভান ও ঋষি মিরনের সম্পর্কে বেশ উৎসাহ-জনক গল্প। সুললিত ভাষায় বলছিল গল্পটা। গল্পটা ছিল এরকম: গর্দিয়ান নামে এক পাপিষ্ঠ নায়ক বাস করত পৃথিবীর বুকে। সে ছিল পাপী, বিবেক বলে তার কিছু ছিল না। সত্যকে সে ঘৃণা করত, কীটের মত ছিল তার নোংরা জীবন। পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি সে ঘৃণা করত ঋষি মিরনকে। ঋষি মিরন ছিল শান্তি ও সত্যের প্রতীক। একদিন গর্দিয়ান তার অনুগত বীর যোদ্ধা ইভানকে ডেকে বলল, 'এখনি গিয়ে তুমি বুড়ো মিরনের গলাটা কেটে ফেলগে। তারপর তার পাকা দাড়ি ধরে ঐ কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে এস, সেটা আমার কুকুরগুলোকে খাওয়াতে লাগবে।'

অনুগত ইভান ছুটল মিরনের মাথা কাটতে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে এই ভেবে যে অন্যের আদেশ সে পালন করছে, বাধ্য হয়েই। ভগবানের বুঝি তাই ইচ্ছা।

পোশাকের তলায় তলোয়ারটা লুকিয়ে রেখে সে ঋষির কাছে এল। বলল, 'কেমন আছ ঠাকুরমশাই? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

ঋষির কোন কিছু বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি মৃদু হেসে ধীর স্বরে বললেন, 'আমাকে ঠকাতে এসেছ কেন? ঈশ্বরের কাছে কিছুই অজানা থাকে না। তোমার বদ মতলবটাও জানতে বাকি নেই। তোমার আসল অভিসন্ধিটা আমি জানি।'

লজ্জা পেল ইভান; আবার গর্দিয়ানের প্রতিহিংসার কথা ভেবে শিউরে উঠল। চামড়ার খাপ থেকে সে তলোয়ার বার করে ফেলল আর উঁচিয়ে ধরল সেটা। তারপর বলল, 'আমি তোমায় এমনভাবে মারতে চেয়েছিলাম যাতে তুমি টের না পাও। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। নতজানু হয়ে প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে, আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সবার জন্যে। তারপর তলোয়ারের এক ঘায়ে তোমার মাথা কেটে নেওয়া হবে।'

একটা ওক গাছের তলায় জ্ঞান-বৃদ্ধ মিরন আসন নিলেন। ওক গাছটা তাঁর সামনে হেলে পড়ল। হাসি হাসি মুখে বৃদ্ধ বললেন, 'এখনো ভেবে দেখ ইভান, তোমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সব মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে তো দেরি হবে, তাই অপেক্ষা না করে এখনি আমার মাথাটা কাটো।'

ঋষির কথা শুনে ইভান রেগে গেল। উদ্ধত স্বরে বলল, 'যা কথা দিয়েছি তাই হবে। যতদিন খুশি প্রার্থনা কর এরজন্য যদি এক যুগও অপেক্ষা করতে হয় তবে তাই করব।'

তখন ঋষি বসলেন প্রার্থনায়। আস্তে আস্তে রাত হল। রাত পেরিয়ে সকাল হল। সকালের পর সন্ধ্যা; গ্রীষ্ম থেকে এল বসন্ত। এক একটা বছর পার হতে লাগল, তেমনিভাবে ঋষি বসে প্রার্থনা করছেন। ওক গাছটা যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল, তার বীজে সৃষ্টি হল এক গহন গভীর অরণ্য। তবু ঋষি মিরন বসে রইলেন!

মিরনের প্রার্থনা আজো চলছে, অবিরাম ভাবে। পৃথিবীর সবার জন্য তিনি প্রার্থনা করে চলেছেন। তিনি কামনা করছেন, মেরীমাতার কল্যাণ-হাসির স্পর্শ লাগুক চতুর্দিকে। আর ঋষির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ইভান। তার তলোয়ারে মরচে ধরেছে, খাপ খসে পড়েছে। ধুলো হয়ে গেছে তার পোশাক, গরমে তার শরীর গলে যাচ্ছে, তবু গলেনি। পঙ্গপাল শরীরটাকে একেবারে কুড়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে, তবু দেয়নি। জানোয়ারগুলোও এড়িয়ে চলে তাকে, কেউই কাছে আসে না। ঝড়, বাদল গায়ে লাগছে না, তুষার স্পর্শ করেনা ইভানকে। ইভান অচল হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। হাত তোলার ক্ষমতাও তার নেই। একটু সরে দাঁড়াতেও পারে না। এই হচ্ছে চরম শাস্তি যা অন্যের প্ররোচনায় বিবেকহীন পাপাচারীকে ভোগ করতে হয়। প্রবীন ঋষি আজো প্রার্থনায় রত। প্রার্থনা করছেন পাপীদের জন্য। নদী যেমন মহাসমুদ্রে মেশার জন্য ছুটে চলে, তেমনি তাঁর প্রার্থনা ভগবানের কাছে ধারাস্রোতের মতই চলেছে অনন্তকাল ধরে।

গল্পের শুরুতে আমি 'বাঃ বেশ'কে একটু উত্তেজিত হতে দেখেছি। সে হাত দুটো নেড়েছিল, অনেক অঙ্গভঙ্গি করেছে; চশমাটা খুলেছে, আবার পড়েছে। অথবা চশমাটা দুলিয়ে তাল দিয়েছে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে। কখনো মাথা নেড়েছে, গাল আর কপালের ঘাম মুছেছে। কেউ কাশলে বা পায়ের কোন শব্দ হলে তার গলা থেকে আওয়াজ বের হয়েছে শ্-শ্-শ্।

দিদিমার গল্প শেষ হলে সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বিড়বিড় করে বলল, 'ভারি সুন্দর গল্প। এটা লিখে রাখা উচিত, যেন হারিয়ে না যায়। সত্যি কী অর্থপূর্ণ গল্পটা!'

স্পষ্টই বোঝা গেল সে কাঁদছে। তার চোখ দুটো সজল। ঘটনাটা অস্বাভাবিক মর্মবিদারী ছিল। সে রান্নাঘরে ঘুবপাক খেতে খেতে চশমাটা কানে লাগাবার চেষ্টা করছে, পারছে না কিছুতেই। পিওতর কাকা হেসে ফেলল, কিন্তু অন্য সবাই হতবাক হয়ে গেল।

দিদিমা বলল, 'বেশ, লিখতে চান তো লিখে নিন। এতে দোষ কি? আমি এই ধাঁচের অনেক কবিতাই জানি।'

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলল, 'না না, অন্যগুলো নয়। এই গল্পটা খাঁটি রুশদের গল্প।' ডান হাতটা সে নাড়ছিল, বাঁ হাতে ছিল তার চশমা। আবেগে সে প্রতিটা কথায় জোর দিচ্ছিল আর মেঝেতে পা ঠুকছিল। বারবার সে একটা কথা বলে চলেছে, 'নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়াটা ভুল।'

হঠাৎ সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে

অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে সে ঘর থেকে চলে গেল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই মুখ টিপে হাসল, একে অন্যের দিকে তাকাল। দিদিমা অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে সেঁদিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

লাল ঠোঁটে হাত বুলোতে বুলোতে পেত্রভনা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি ? ক্ষেপে গেল কেন ?'

পিওতর-কাকা জবাব দিল, 'তা নয়। লোকটাই ওই ধরণের।'

উনুনের ওপর থেকে নেমে দিদিমা সামোভারে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

পিওতর-কাকা আরো বলল, ভদ্রলোকেরা এমনিই হয়, এমনি খেয়ালি হয়ে থাকে।

ভালই বলল, 'বিয়ে না করলে এমনি হয়।'

সবাই হেসে উঠল। পিওতর-কাকা বলল, 'কিভাবে কাঁদছিল দেখেছ ? রুই-কাৎলা যেখানে ঘাই মারে সেখানে চুনো-পুঁটির ফরফরানি সহ্য হয় না !'

কারো কথাই ভাল লাগছিল না। একটা বিষণ্ণতা ছুঁচের মত বিঁধছিল। 'বাঃ বেশ'কে দেখে আমার অবাক লেগেছে, করুণা হয়েছে ; তার জলভরা চোখ দুটোর স্মৃতি যেন কোনমতেই ভুলতে পারছি না।

সেদিন রাতে সে বাইরে থাকল, ফিরল পরের দিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর। নিজের কাজের কথা ভেবে সে লজ্জা পেল, মুষড়ে পড়ল। আর কিছুতেই যেন মাথা তুলতে পারছে না।

বাচ্চারা যেমন দোষ করলে পরে এসে ক্ষমা চায় তেমনিভাবে সে দিদিমার কাছে এসে বলল, 'কাল বড গণ্ডগোল করে ফেলেছি, নিশ্চয়ই আপনি রাগ করেছেন ?'

দিদিমা বলল, 'আপনি তো কাউকে ঠেস্ দিয়ে কোন কিছু বলেন নি।'

আমার মনে হয় দিদিমা ওকে ভয় করে চলে। দিদিমা ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলছে না ; অস্বাভাবিক মিহি গলায় বলছে।

দিদিমার কাছে সে আরো একটু অন্তরঙ্গ হল। বল[illegible] থাকল, 'দেখুন, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি বড় একা। একা থেকে থেকে এমন একটা সময় আসে যখন মনে হয় সব উজাড় করে দিই। মনটা এমন হয়ে ওঠে যে গাছ পাথরের সঙ্গে কথা বলতে থাকি।'

দিদিমা একটু সরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে থা করেননি কেন ?'

'বিয়ে ?' শব্দটা উচ্চারণ করে ভুরু কুঁচকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লোকটার দিকে দিদিমা চেয়ে রইল। তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে আমায় দেখে রাগতস্বরে বলল, 'তোকে বলে রাখলাম, ওর কাছে ঘরঘুর করিস না, কে জানে লোকটা কী রকম !'

এ ঘটনার পর লোকটার কাছে যাওয়ার জন্য আমার উৎসাহে যেন জোয়ার এল।

লোকটা যখন বলছিল, 'আমি বড় একা' তখন তার মুখের চেহারা আমি বদলে যেতে দেখেছি, তার অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে পেরেছি। সেটা আমার মনে নাড়া দিয়েছে। লোকটার কাছে যাবার জন্যই আমি বের হলাম।

তার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম সে ঘরে নেই। ঘরটা এলোমেলো,

অপ্রয়োজনীয় অদ্ভুত সব জিনিষে ভর্তি। সেখান থেকে বাগানে এলাম। গিয়ে দেখি গুটিসুটি মেরে একটা পোড়াগুড়ির ওপর সে হাটু মুড়ে, কনুই দুটো তার ওপরে রেখে আর হাতটা দিয়ে ঘাড়ের পেছন ধরে বসে আছে। গুড়িটা ধুলো কাদায় মাখামাখি। গুড়ির একমাথা আলকুশি সোমরাজ আর ভাটের ঝোপ ছাড়িয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। এখানে এভাবে বসাটা অস্বস্তিকর। তবু সে বসে আছে—এ দৃশ্য দেখে আমার আগ্রহ বাড়ল।

পেঁচার অন্ধ দৃষ্টির মত ওর দৃষ্টিটা আমার মাথার ওপর দিয়ে দূরে চলে গেছে! তারপর হঠাৎ দেখল আমাকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি, ডাকতে এসেছ বুঝি ?'

আমি বললাম, 'না তো...'

'তাহলে এখানে কেন ?'

'এমনি এসেছি।'

'চোখ থেকে চশমাটা খুলে লাল কালো ছোপ ধরান রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সে বলল, 'নেমে এস নীচে।'

নীচে নেমে আসতেই জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারপর বলল, 'এখানে চুপ করে বস। একটা কথাও বলবে না। তুমিও বলবে না, আমিও না।'

'তুমি তো ভারী একগুঁয়ে দেখছি !'

'হ্যাঁ, আমি ভারী একগুঁয়ে।'

'বাঃ বেশ !'

বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। শান্ত সন্ধ্যাটা চমৎকার লাগছে। চারদিকে একটা বিষণ্ণতার ছাপ। সব কিছুই রঙীন। প্রতি মুহূর্তে সে রঙ পাল্টাচ্ছে ; স্যাঁত-স্যাঁতে ঠাণ্ডায় বুকচাপা. গন্ধ ছেয়ে ফেলছে সবদিক। গোলাপী আকাশে দাঁড় কাকের ঝাঁক দেখে মনে চিন্তার উদয় হয়। সবদিক নিস্তব্ধ, মৌন। পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ বা গাছের পাতা খসার শব্দটা কানে আসে। সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দের এতটা ঝঞ্ঝা তোলে। চমকে উঠতে হয় তখন ; তারপর বিশুদ্ধতার অতলান্ত গভীরে তা ডুবে যায়।

এই ধরণের মুহূর্তে যে চিন্তাগুলোর উদয় হয় তা পবিত্র। মলিনতা নেই তাতে একবিন্দুও। মাকড়সার জালের মত তা স্বচ্ছ ; সহজেই ছিঁড়ে যায়। ভাষা দিয়ে একে ধরে রাখা যায় না। খানিক ঝলসে উঠে আবার উল্কার মত মিলিয়ে যায়। নিজের অস্তিত্বকে বিষণ্ণতায় ভরে তোলে, নাড়া দেয়, যাতে চির-কালীন একটা ছাপ পড়ে মনে। এ সময়েই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে।

আমার সঙ্গীর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আপেল গাছের ডাল পালার আড়াল ভেদ করে দেখলাম, লিনেৎ পাখী উজ্জ্বল আকাশে উড়ছে। গোল্ডফিঞ্চ পাখীগুলোকে রসালো ফলের খোঁজে শুকনো শালগমে ঠোকরাতে দেখলাম। আরো দেখলাম, ছেঁড়াখোঁড়া মেঘগুলো মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর তার নীচ দিয়ে কাক চলেছে নিজেদের বাসায়—সেই কবরখানায়। এ সবেরই মানে আছে। অসাধারণ এর মানে।

আমার সঙ্গী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'ভাই, কী চমৎকার! সত্যিই চমৎকার। মাটি ভিজেছে, ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?'

তারপর যখন আঁধার রাত্রি ছেয়ে ফেলল চারদিক তখন সে বলল, 'আর নয়, এবার ওঠ।'

বাগানের দরজার কাছে এসে বলল, 'তোমার দিদিমার মত মানুষ আমি দেখিনি কখনো। কী বিশ্রি এই সংসার!'

কথাগুলো বলে চোখ বুজল। তারপর ফিসফিসিয়ে আবৃত্তি করল, 'এই হোক সেই লোকের শাস্তি—যে অপরের পরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে।'

উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে সে বলল 'কথাগুলো মনে রেখ।' বলে আমাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে।

'তুমি লিখতে পার?'

'না।'

'শিখে নাও। যখন লিখতে শিখবে তখন তোমার দিদিমার এই ছড়াগুলো লিখে নেবে। এটা একটা বড় কাজ হবে।'

এ ঘটনার পর থেকে আমি লোকটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে যাই। যখনই ইচ্ছে হত, তখনই আমি 'বাঃ বেশ'-এর কাছে যেতাম। ছেঁড়া কাপড় চোপড়ে ঠাসা বাক্সটার ওপর বসে আমি তার কাজ দেখতাম। সে সীসা গলাত, তামা গরম করত, লোহার পাতগুলোকে সুন্দর কারুকার্য করা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে নানা ধরণের জিনিষ বানাত। উখো আর সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষত সবকটাকে। তার কাছে অনেক ধরণের উখো ছিল। চুলের মত একটা সরু করাতও ছিল। তামার তৈরী নিক্তিতে সে ওজন করত সব কিছু। চীনেমাটির পাত্রে কত ধরণের তরল পদার্থ মেশাত আর, ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় ভরে উঠত ঘরটা। মাঝে মাঝে একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঠোঁট কামড়িয়ে বিড়বিড় করে বলত, 'হায়রে সারণের গোলাপ।'

'আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'তুমি কি তৈরি করছ?'

'একটা জিনিষ।'

'কি জিনিষ?'

'কি করে বলি। তোমাকে বোঝানোর মত করে বলতে পারব না।'

'দাদু বলেন, তুমি নাকি জাল টাকা তৈরী কর?'

'দাদু? হুঁ! বাজে কথা। টাকার জন্যে এমন ভাল মাথা ঘামাতে হয়নারে ভাই। এটা মনে রেখ।'

'কি বলছ! টাকা না থাকলে রুটি কিনবে কেমন করে?'

'ঠিক বলেছ। টাকা না থাকলে রুটি কেনা যায়না বটে।'

'আর মাংস?'

'হ্যাঁ, মাংসও কেনা যায় না।'

সে স্মিত হাসি হাসল; আমার ভাল লাগল তার হাসিটা। লোকে বেড়াল-ছানাকে যেভাবে আদর করে তেমনি ভাবে আমার কানের পেছনে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'ভাইটি, তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠব না। প্রতিবারই তুমি আমাকে কোণ ঠাসা করে দাও। তার চেয়ে কথাবার্তা না বলে চুপ করে থাকা যাক কিছুক্ষণ, কি বল?'

কাজ থামিয়ে সে আমার কাছে জানলার ধারে এসে বসে থাকে। আমরা দুজনে দেখি আপেল গাছটা বিবর্ণ হচ্ছে, গাছের পাতা খসে পড়ছে, উঠোনের ঘাসে আর ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। 'বাঃ বেশ' কথা বলে না, কিন্তু যা বলে তার যথেষ্ট অর্থ থাকে। যদি সে আমাকে কিছু দেখাতে চায় তবে মুখে না বলে, ঠেলা দিয়ে আমার দৃষ্টিকে সেদিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের বাড়ির উঠোনে দেখার কিছু আছে বলে মনে হয়নি কখনো। কিন্তু সে আমার পাশে বসে গায়ে ঠেলা দিয়ে বা কথা বলে এমন অনেক কিছু দেখিয়েছে যাতে আমি বিশেষ একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি। আমার স্মৃতিতে তা গভীর ছাপ রেখে গেছে।

হয়তো একটা বেড়াল ছানা উঠোন পেরোতে গিয়ে খানার জলে নিজের ছায়াটা দেখে এমনভাবে থাবা উঁচিয়েছে যেন নিজের ছায়াকেই সে মারতে চাইছে।

তা দেখে 'বাঃ বেশ' বলে, 'বেড়ালের দেমাক্ বেশি আর স্বভাবটাও অবিশ্বাসী ধরণের।'

সোনালী-লাল মোরগ 'মামাই' উড়ে গিয়ে বসেছে বেড়ার ওপরে। ডানা ঝাপটাতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়, রেগে যায়, ঘাড় টান করে ক্রুদ্ধ স্বরে কি যেন বিড়বিড় করে বকে। তা দেখে 'বাঃ বেশ' মন্তব্য করে, 'এই সেনাপতি নিজেকে হোমরা চোমরা মনে করে কিন্তু ওর সাধারণ বুদ্ধিটা একটু কমই বলা যায়।'

রুক্ষ চেহারার ভালেই বুড়ো-ঘোড়ার মত কাদার ওপর দিয়ে থপ থপ করে চলে, ফুলো ফুলো বড় গোছের মুখটা তুলে আকাশের দিকে দেখে, শরৎকালের রোদে ওর বুকের পেতলের বোতামটা ঝক্‌ঝক্ করে। ভালেই দাঁড়িয়ে হাতের বাঁকা আঙ্গুলে বোতামটা নাড়াচাড়া করে। এই দেখে 'বাঃ বেশ' বলে, 'এমন করছে যাতে মনে হয় ওটা বোতাম নয় একটা মেডেল।'

এমনি ভাবেই, 'বাঃ বেশ'-এর ওপর একটা টান এসে গেল আমার। দুঃখ আনন্দ সব সময়েই তার কাছে না এলে চলত না। যদিও সে চুপ থাকত, তবু আমাকে কথা বলতে দিত। খুশি মত আমি তার কাছে বক্‌বক্ করতাম। আমার দাদুর কিন্তু স্বভাবটা উল্টো। আমাকে কথা বলতে দেখলেই বলতেন, 'ওহে কথার জাহাজ, বক্‌বকানি থামাও।'

দিদিমা তার নিজের চিন্তায় এত ব্যস্ত যে অন্যের কথায় কান দেওয়ার মত সময় তার ছিল না।

কিন্তু 'বাঃ বেশ' আমার কথা সব সময়েই মন দিয়ে শুনত। মাঝে মাঝে বলত, 'ওটা ঠিক বললে না। ওটা বানানো কথা।'

মন্তব্যটা সংক্ষিপ্ত হলেও ঠিক সময় ঠিক ব্যাপারে যতটুকু দরকার তার বেশি হতনা। এমনভাবে বলত যাতে মনে হত সে আমার অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে আর বলার আগেই বুঝছে কোনটা ঠিক, কোনটা অবান্তর। যে কথাগুলো বরবাদ করে দিত তা করত সামান্য তিনটে কথাতেই : 'বানানো কথা ভাই।'

তার এই ক্ষমতা পরখ করে দেখার জন্যে ইচ্ছে করে গল্প বানিয়ে এমনভাবে বলেছি যেন সত্যি ঘটনা। প্রতিবারই নিশ্চিতভাবেই শুনে মাথা নেড়ে বলেছে, 'বানানো কথা ভাই।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'তুমি কি করে জানলে ?'

'আমি ? আমি ঠিক জানতে পারি।'

প্রায়ই সেন্নায়া স্কোয়ার থেকে জল আনতে আমি দিদিমার সঙ্গে যাই। এক দিন যাওয়ার পথে পাঁচজন শহুরে লোককে একজন গাঁয়ের চাষীকে পেটাতে দেখলাম। মাটিতে ফেলে একপাল কুত্তার মত তারা তাকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলছে। দিদিমা বাঁক থেকে বালতি দুটো খুলে ফেলল আর বাঁকটা লাঠির মত ঘুরিয়ে ছুটে গেল শহুরে লোকগুলোর দিকে। আমাকে বলল, 'তুই চলে যা !'

ভয় পেয়ে আমি ছুটলাম দিদিমার পেছনে। শত্রুদের লক্ষ্য করে ঢিল-পাথর ছুঁড়লাম। দিদিমা প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে বাঁক দিয়ে তাদের দমাদম পেটাতে লাগল। আরো লোক জুটল। শহুরে লোকগুলোকে মেরে তাড়ান হল। চাষীটা জখম হয়েছিল খুব, দিদিমা ওর মুখ ধুইয়ে দিল। এই ঘটনার কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। লোকটা ধূলো মাখা আঙ্গুলে নাকের পাশটা চেপে ধরেছে, ছেঁচে গেছে সেখানটা। সে আর্তনাদ করছে ! ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হচ্ছিল তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে। দিদিমাব গা ভেসে যাচ্ছে রক্তে, তার সারা শরীর কাঁপছে।

বাড়ি ফিরেই আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম আমাদের সেই বাসিন্দের কাছে। আগাগোড়া ঘটনা বলতে থাকলাম। কাজ থামিয়ে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, হাতের উখোটা তলোয়ারের মত উঁচিয়ে ধরল। চশমার ফাঁক দিয়ে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল. 'চমৎকার ! এইতো চাই। বেশ। বেশ।'

এ ঘটনায় আমি এত অভিভূত হয়েছিলাম যে তার কথায় অবাক না হয়ে অনর্গল বলতে থাকলাম। আমাকে সে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'ব্যস্, আর নয় ! যা বলতে চেয়েছ তা বলা শেষ হয়েছে। এবার থাম !'

আমি চুপ করে গেলাম। আমাকে থামিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা কষ্ট হল। পরে অবশ্য আমি বুঝতে পারলাম, যে-সময়ে থামার প্রয়োজন সে সময়েই আমাকে সে থামিয়ে দিয়েছে। সত্যি বলতে, আমার যা-কিছু বলার ছিল সবই বলা হয়ে গেছে। সে বলল, 'এসব কথা মনের মধ্যে রেখ না, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর।'

মাঝে মাঝে এমন সব কথা সে আমায় বলত যা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। একবার আমি শত্রু কলুশনিকভের কথা তাকে বলেছিলাম। সে ছিল নোভায়া স্ট্রীটের আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। ছেলেটার মোটা শরীর, মাথাটা বড। আমরা দুজনেই কেউ কাউকে হারাতে পারতাম না। আমার সমস্যার কথা শুনে 'বাঃ বেশ' বলল, 'এসব কথার দাম নেই। এ ধরণের জোরকে জোর বলে না। যত চটপট হাত-পা নাড়াতে পারবে, ততই জোর বাড়বে। বুঝতে পারছ ?'

পরের রবিবার পরীক্ষা করলাম। দ্রুত ঘুষিগুলো চালালাম। দেখলাম, কলুশনিকভকে কব্জা করতে আমার সময় লাগল না। এতে 'বাঃ বেশ' এর কথার ওপর আমার আস্থা আরো বেড়ে গেল।

সে বলত, 'সব জিনিষ আয়ত্ত করতে হলে উপায়টা জানতে হয়—কোন জিনিষ পুরোপুরি আয়ত্তে আনা শক্ত কাজ।'

কথাগুলো আমি সব সময়েই যে বুঝতাম তা নয়, কিন্তু মনে রাখতাম সেগুলো। এসব মনে থাকার কারণ হল কথাগুলো সহজ হলেও ভেতরে ভেতরে ছিল দুর্বোধ্য। যেমন একটা ঢিল, একটুকরো রুটি, একটা পেয়ালা বা হাতুড়ি—এসব জিনিষ আয়ত্তে রাখা কি শক্ত?

আমাদের এ বাড়ির সবাই কিন্তু 'বাঃ বেশ'কে পছন্দ করত না। এমন কি আমাদের বাড়ির হাসিখুশি বেড়ালটা পর্যন্ত অন্য সবাই ডাকলে কাছে যেত, কোলে উঠত, কিন্তু হাজার আদর করলেও ওর কাছে যেত না, কোলে চড়ত না। এজন্যে বেড়ালটাকে মার দিতেও আমি কসুর করিনি। কান ধরে মলে দিয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি যে এই লোকটাকে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমার নিজেরই কান্না এসে গেছে ; ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।

অবশ্য সে আমায় বলেছে, 'কি জান ভাই, আমার জামা-কাপড়ে তো এ্যাসিডের গন্ধ তাই বেড়ালটা আসতে চায় না।' কিন্তু আমাদের বাড়ির সকলে এমন কি দিদিমা পর্যন্ত বাদ যেত না—সবাই অন্য কথা বলত। সকলেই ছিল ওর প্রতি বিরূপ। আমার মনে হত এটা খুব অন্যায়, আমার কষ্টও হত।

আমার দিদিমা রেগে-মেগে জিজ্ঞেস করত, 'সব সময় ওখানে কি করিস? সাবধানে থাকবি। মাথায় যখন তুকতাক মন্তর ঢুকিয়ে দেবে তখন বুঝবি!'

আমার দাদু যতবার শুনেছেন যে আমি ঐ লোকটার কাছে গিয়েছি ততবারই আমাকে বেত মেরেছেন। আমি 'বাঃ বেশ'কে কখনো বলিনি যে সবাই ওর কাছে আসতে আমাকে নিষেধ করে। কিন্তু তার সম্পর্কে অন্যেরা কি বলে তা বলে দিই তাকে। আমি কথায় কথায় বলে ফেলি, 'দিদিমা তোমাকে ভয় করে। তুমি নাকি মন্ত্র-টন্ত্র জান, তুকতাক করে দিতে পার। আমার দাদুরও সেই ধারণা। দাদুও বলেন তুমি নাকি নাস্তিক ; ভীষণ লোক।'

কথাগুলো শুনে মাছি তাড়ানোর মত করে মাথায় ঝাঁকুনি দেয়। তার ফ্যাকাশে মুখে স্তিমিত হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আমার বুকের ভেতর কুঁকড়ে যায়, মাথাটা ঘুরে যায়।

নীচু গলায় সে বলে, 'আমি জানি এসব ; টেরও পাই কিছু কিছু। ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার—কি বল?'

'হ্যাঁ'

'কী কুৎসিত!'

শেষ পর্যন্ত তাকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করা হয়েছিল।

একদিন সকালে জল খাবার খাওয়ার পর দেখলাম তার নিজের ঘরে বসে সে একটা বাক্সে জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলছে আর গুন গুন গান গাইছে, 'হায়রে সারন-এর গোলাপ!'

আমাকে দেখেই সে বলল, 'ভায়া। এবার তাহলে বিদায় দাও। আমি চললাম।'

'কেন?'

জবাব দেবার আগে একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, 'তুমি জান না? তোমার মা আসছেন। ঘরটা তাই দরকার।'

'কে বলেছে?'

'কেন, তোমার দাদু।'

'দাদু মিথ্যে বলেছেন।'

'বাঃ বেশ' আমাকে টেনে পাশে বসাল। আমি মেঝেতে তার পাশে বসলাম। আর নীচু গলায় বলল, 'কিছু মনে কোর না ভাই, আমি ভেবেছিলাম তুমি ব্যাপারটা জানতে, আর জেনেও আমাকে কিছু বলনি। এটা তাই ভাল লাগেনি।'

যে জন্যেই হোক কথাটা আমার লাগল; আমি রেগে উঠলাম।

সে ফিক করে হাসল। হেসে বলল, 'শোন ভাই, মনে পড়ে আমার কাছে তোমায় আসতে মানা করেছিলাম?'

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

'তখন তোমার খুব কষ্ট হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাইনি। জানতাম, আমার সঙ্গে মিশলে তোমায় সবাই বকাবকি করবে।'

এমনভাবে সে বলল যেন সে আমারই বয়সী। তার কথা শুনে খুশি হলাম। মনে হল সে যা বলছে তা আমি জানি। আমি বললাম, 'আমি আগেই জানি।'

'বেশ। তাহলে ব্যাপারটা বুঝলে তো?'

আমার বুকে একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ তোমায় পছন্দ করে না কেন?'

'কেন জান ভাই? আমি অন্য কারো মত নই। আসল কারণ, আমি তাদের মত নই।'

কী বলব বুঝতে না পেরে আমি তার জামার খুঁটটা টেনে ধরলাম।

'রাগ কর না ভাই' বলে আরো ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'কেঁদো না।'

তার অজান্তেই চোখ দিয়ে চশমার কোল ঘেঁষে জল গড়িয়ে পড়ল। অন্য দিনের মত আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে থাকলাম। মাঝে মাঝে দু' একটা কথার আদান-প্রদানও হল।

সেই সন্ধ্যায় প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমাকে নিবিড় করে আলিঙ্গন করে সে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্যন্ত গেলাম। শীতে কাদা জমে রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। ঝাঁকুনি লাগছে গাড়ীতে। যতটা দেখা যায় দৃষ্টি প্রসারিত করে আমি তাকে দেখার চেষ্টা করলাম।

সে চলে যাবার সাথে সাথেই দিদিমা ঘরটা পরিষ্কার করতে হাত লাগিয়েছে। আমি ইচ্ছে করে ঘরের একোণ-ওকোণ করছি। আমার গায়ে হোঁচট্ খেয়ে দিদিমা চীৎকার করে উঠল, 'বের হয়ে যা এখান থেকে।'

'তোমরা ওকে তাড়ালে কেন দিদিমা?

'তাতে তোর কী হল?'

'তোমরা সবাই বোকা!'

আমার জবাবে দিদিমা রেগে গিয়ে ভিজে ন্যাকড়াটা দিয়ে আমাকে সপাং সপাং করে দু'ঘা কষিয়ে দিল, তারপর বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বদ্ধ পাগল হয়েছিস?'

'তুমি ছাড়া এ বাড়িতে তো সবাই পাগল।' দিদিমা এতেও চটে গেল।

রাত্রে খাবার টেবিলে দাদু বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে এই লোকটা বিদেয় হয়েছে। যতবার ওকে দেখতাম, বুকে যেন ছুরি বিঁধত। যাক্, এ্যাদ্দিনে রেহাই পেলাম।'

এসব শুনে আমার রাগ হয়েছিল। রাগে একটা চামচ ভেঙে ফেললাম। এজন্যে আমি শাস্তিও পেলাম।

এভাবে আমার প্রথম বন্ধুত্বের অবসান হল, সেই ধরণের অসংখ্য লোকের সঙ্গে, যারা নিজ-দেশে পরবাসী হয়ে থাকে, যাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিনিধি বলা যায়।

নয়

আমার ছেলেবেলাকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই মৌচাক থেকে জীবনে চলার পথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধু আহরণ করে থাকে সাধারণ মানুষ। আমার চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এদের দান রয়েছে। এই মধু কতকটা যে মাঝে মাঝে নোংরা ও তেতো হয়নি এমন নয়। কিন্তু যেহেতু ওগুলো জ্ঞান সেই হেতুই ওগুলো মধু বৈকি।

'বাঃ বেশ' চলে যাবার পর পিওত্‌র-কাকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সে ছিল দাদুর মতই রোগা আর পরিচ্ছন্ন। তবে চেহারায় বা অন্য ক্ষেত্রে সে ছিল দাদুর চেয়ে একটু খাটো। তাকে দেখে আমার মনে হত একটা ছোট ছেলে মজা করে বুড়ো সেজেছে। তার মুখটা দেখে মনে হত একটা খাঁচার মত। কতকগুলো চামড়ার ফিতে পাকিয়ে চুবড়ি বানানো হয়েছে এবং তা দিয়ে খাঁচা তৈরী হয়েছে। এই খাঁচার মত মুখে পাখির মত ছোট ছোট দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। মাথায় কোঁকরান পাকা চুল, দাড়ি চক্রের মত পাক খেয়েছে। যখন পাইপ টানে তখন তার ধোঁয়ার রঙ যেন চুলের মত দেখায়। তার কথাবার্তাটা খুব পরিচ্ছন্ন বলে শুনে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তাতে একটা চাপা বিদ্রূপ সব সময়েই প্রকাশিত হয়।

নিজের সম্বন্ধে সে বলত, 'আমার মনিব ছিলেন একজন কাউন্টেস। নাম তাতিয়ান; পিতৃদত্ত নাম লেক্সেভনা। ব্যাপারটা হল এই: তিনি আমায় একদিন বললেন, 'কামারশালার কাজ শেখ।' যেইনা কামারশালায় গেছি, অমনি ফরমান এল, 'বাগানের মালীর সঙ্গে কাজ কর।' আমার কিছুতেই আপত্তি ছিলনা। একটা কিছু হলেই হল। কিন্তু সেই প্রবাদ আছে না 'যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের হাতে লাঠি বাজে।' সুতরাং কিছুদিন বাদে আমাকে ডেকে, কাউন্টেস বললেন, 'পেত্রুশ্‌কা, তার চেয়ে তুমি মাছ ধরগে যাও।' ফরমান মতই কাজ শুরু। যখন খানিকটা মাছ ধরতে রপ্ত হয়েছে তখন আমাকে গাড়ির চালক হিসেবে পাঠান হল। তারপর থেকে আমি চালক। আরো কত কী যে হতে হত তা কে জানে! কাউন্টেসের অন্য কোন খেয়াল হবার আগেই মুক্তি-আইন পাস হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি ছাড়া পেলাম। আর তখন থেকে এ অবধি কাউন্টেসের বদলে ঘোড়াটার পিছনে ছুটছি।

ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে। গায়ের রঙ ছিল সাদা, এখন দেখে মনে হয় এক চিত্রকর মাতাল হয়ে নানা বর্ণের তুলি দিয়ে ঘোড়ার গায়ে ফুটি ফুটি দাগ দিয়েছে। পাগুলো বাঁকা, যেন উল্টে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কদাকার চেহারা,

মনে হয় যেন ছেঁড়া নেকড়ায় সেলাইয়ের নকসা করে একটা ঘোড়া করা হয়েছে। চোখে ছানি পড়েছে, হাড় গিলে মাথাটা যেন ঝুলছে। কয়েকটা পেশী আর শীর্ণ চামড়াটা যেন আটকে রেখেছে মাথাটাকে। ঘোড়াটাকে পিওতর-কাকা ভারি ভালবাসে। কখনো আঘাত করেনা, আদর করে 'তানকা' বলে ডাকে।

দাদু একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওহে, তুমি ঘোড়াটার এমন খৃষ্টান নাম দিয়েছ কেন?'

সে জবাব দেয়, 'না ভাসিল ভাসিলিচ, তোমার কথাটা ঠিক নয়। 'তানকা' নামটা খৃষ্টান নয়—খৃস্টান নাম হল 'তাতিয়ানা।'

পিওতর-কাকাও লেখাপড়া জানত এবং তার শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল। সাধু পুরুষদের মধ্যে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত দাদুর সঙ্গে। বাইবেলের সেই সব পাপীদের ব্যাপারে ওরা দুজনেই ছিল সোচ্চার। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপবাদ পেত আবেসালোম। দুজনের তর্ক ব্যাকরণগত চুলচেরা বিচারেও কেন্দ্রীভূত হত। দাদু বলতেন, 'পাপাচারবাদ', 'উচ্ছৃঙ্খলবাদ', 'মূর্তিপূজাবাদ'। পিওতর-কাকা বলত, 'পাপাচারীতা', উচ্ছৃঙ্খলচারিতা, 'মূর্তিপূজাচারিতা।'

দাদুর মুখখানা রাগে লাল হয়ে যেত। দাদু বলতেন, 'তুমি বলছ এক, আর আমি বলছি অন্য কথা। তোমার ঐ সব 'চারিতা'র কোন মূল্য নেই।'

মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পিওতর-কাকা বলত, 'তোমার 'বাদ'টা যে খুব উঁচুদরের বস্তু তা নয়। ভগবানের কাছে সেটাও খুব ভাল নয়। তোমার উপাসনা শুনে প্রভু হয় তো ভাবেন—কথাগুলো আলঙ্কারিক বটে, কিন্তু তার মূল্য কণামাত্র নেই।'

আমাকে দেখে দাদু ক্ষেপে উঠে বলতেন, 'এই লেক্সেই, তুই এখানে কেন? যা, বাইরে যা।'

পিওতর-কাকা পরিচ্ছন্ন গোছের মানুষ। উঠোনে চলার সময় পায়ের কাছে এক টুকরো হাড় বা কাঠি পড়ে থাকলে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলত, 'যত সব বাজে জিনিষ বাধার সৃষ্টি করে।'

পিওতর-কাকা দিল্‌দরিয়া লোক, কথা বলে বেশি। মাঝে মাঝে চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়, তখন মড়ার মত দেখতে লাগে। প্রায়ই দেখা যেত অন্ধকার নির্জনে সে আপন মনে বসে আছে। তার ভাইপোর মত সেও নির্বাক, বিষাদগ্রস্ত থাকত।

'পিওতর-কাকা, তোমার কি হয়েছে গো?'

জিজ্ঞেস করা মাত্র নিস্পৃহ গলায় যতটা কাঠিন্য আনা যায় সেই ভাবে বলত, 'দূর হয়ে যা।'

আমাদের এই রাস্তায় একবাড়িতে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তার কপালে ছিল আব। অদ্ভুত ছিল তার অভ্যাস। রবিবার দিন সে জানলায় বসে ছররা বন্দুক ছুঁড়ত। তার লক্ষ্য ছিল রাস্তার কুকুর, মুরগী আর বেড়াল। একদিন 'বাঃ বেশ'কে লক্ষ্য করে সে গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু জ্যাকেট ভেদ করতে পারেনি ছররাগুলো, তবে কতকগুলো এসে পড়েছিল পকেটের ভিতর। 'বাঃ বেশ' সেই ছররা নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছে। আমার দাদু তাকে নালিশ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা করেনি। শুধু বলেছিল, 'অত ঝামেলা করে লাভ কি!'

আরেকবার দাদুর পায়ে ছর্‌রা লেগেছে। দাদু ভীষণ রেগে গিয়ে লোকটির বিরুদ্ধে নালিশ করে দিয়েছিলেন। সাক্ষীও সংগ্রহ হতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ ভদ্রলোক বেপাত্তা হয়ে গেল।

রাস্তার দিকে ছর্‌রার আওয়াজ পেলে পিওতর-কাকা তাড়াতাড়ি গেট পার হয়ে বের হত। মাথায় একটা রঙচটা মস্ত কিনারাওয়ালা টুপি দিত। কোটের ভেতর দিয়ে এমন ভাবে হাত গলিয়ে দেওয়া হত যাতে পিছনের দিকটা ল্যাজের মত হয়ে যেত। প্রথম বারের পরিক্রমা কার্যকরী না হলে দ্বিতীয় বার! এমনি করে পর্য্যায়ক্রমে চলত সমানে। ঘটনাটা দেখার জন্য সবাই ভিড় করত সদরে। ফৌজি লোকটা আর তার বৌ দেখত জানলা দিয়ে। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে আসত রাস্তায়। শুধুমাত্র অভসিয়ান্নিকোভদের ধূসররঙা বাড়িটায় কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না।

পিওতর-কাকার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হত। এমন শিকারকে লোকটা উপেক্ষা করত। মাঝে মাঝে ছর্‌রা ছুঁড়ত।

'আমার পিঠের দিকে ছর্‌রা লেগেছে' পিওতর-কাকা ভারিক্কি চালে খবরটা জানায় আমাদের।

একদিন কিন্তু কাঁধে ও ঘাড়ে সপাট ছর্‌রা লাগল। দিদিমা ছুঁচ দিয়ে ছর্‌রা বার করতে করতে বলল, 'ঐ বুনো লোকটাকে এভাবে উস্কিয়ে কি লাভ হয় তোমাদের? এমন করলে একদিন চোখেই ছর্‌রা মেরে বসবে।'

কাঁধটায় ঝাকুনি দিয়ে পিওতর-কাকা বলল, আকুলিনা ইভানোভনা, আপনিও যেমন হয়েছেন! লোকটার লক্ষ্য বলতে কি কিছু আছে?'

'তাহলে ওকে প্রশ্রয় দেন কেন?'

'প্রশ্রয়? ভদ্রলোককে একটু ক্ষেপিয়ে দেওয়া আর কী!'

হাতের ছর্‌রাগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এ লোকটা বন্দুক ছোঁড়ায় আনাড়ি! তবে শুনুন, কাউন্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি। এই কাউন্টেসটি বিয়ের ব্যাপারে কোন বন্ধন মানত না।' চাকর বদলানোর মত সে প্রায়ই স্বামী বদলাত! যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়ে তার কাছে স্বামী হিসেবে ছিল সেনাবাহিনীর লোক মামন্‌ৎ ইলিচ। হ্যাঁ, হাতের তাক ছিল বটে লোকটার! বন্দুক হাতে পেলে কি না করতে পারত! ছর্‌রা সে ছুঁড়ত না, কেবল গুলি! ইগ-নাশ্‌কো নামে হাবা গোবা একটা লোক ছিল, তাকে দূরে দাঁড় করিয়ে দিত— চল্লিশ পা দূরে হবে। তার কোমরে একটা বেল্ট বেঁধে দেওয়া হত, আর বোতলটা ঝুলত দু-পায়ের মাঝে; ঠ্যাঙ দুটো ওই হাবাগোবা লোকটা যতটা সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়াত। আর মামন্‌ৎ ইলিচ গুলি ছুঁড়ত, চুরমার হত বোতলটা। একবার বোধহয় একটা ডাঁশপোকা ইগ্‌নাশ্‌কাকে কামড়েছে বা কিছু, যেই সে একটু সরেছে অমনি বুলেট এসে বিঁধল তার হাঁটুতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এল। এসেই ঠ্যাঙটা কেটে বাদ দিল! পরে সেই কাটা ঠ্যাঙটা কবর দেওয়া হল।

'ইগ্‌নাশ্‌কার কি হয়েছিল?'

'তার আবার কি হবে? সেরে উঠল সে, আর হাবাগোবাদের ঠ্যাঙ থাকা না থাকাটায় কিই বা আসে যায়? সবাই তাদের সাহায্য করে। কথায় বলে না, যার বুদ্ধি নেই তার শত্রুও নেই।'

এ গল্প দিদিমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া আনতে পারেনি। বহু গল্প ওর জানা। আমি কিন্তু অস্থির হয়েছি! জিজ্ঞেস করেছি, 'বড়লোকরা খুশি মত মানুষ খুন করতে পারে?'

'কেন পারে না? যা খুশি করতে পারে। কেউ তো আটকাবার নেই! আবার তারা নিজেরাই খুনোখুনি করে। একবার এক সৈনিক দেখা করতে এল লেক্সেভেনার সঙ্গে। মামন্‌ৎ-এর সঙ্গে কি যেন ব্যবস্থা হল! তারপর পুকুর পারে গিয়ে দুজনেই পিস্তল বাগাল। হয়ে গেল হেস্তনেস্ত। মামন্‌ৎ-এর যকৃতে গুলি লাগল! তাকে কবর দেওয়া হল, আর অশ্বারোহী সৈনিককে পাঠান হল ককেশাসে। পরে এ ব্যাপারে আর কিছু হয়নি। আর চাষাভূষোদের খুনের তো ইয়ত্তাই নেই। যত খুশি খুন করা যায়। বিশেষ করে আজকাল তো বটেই। আগে তবু ছিল চাষারা ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; আজ আর তো তা নয়।'

দিদিমা বলল, 'তখনো তো প্রাণ নিতে আফশোস দেখিনি।

পিওতর-কাকা সায় দিয়ে বলল, 'তা বটে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও খুব সস্তা ছিল সম্পত্তির দাম।'

আমার সঙ্গে পিওতর কাকার কথাবার্তা হত অন্তরঙ্গভাবে। অতি নম্রভাবে চোখে চোখ রেখে কথা বলত। বড়দের সঙ্গে এরকম ব্যবহার সে করত না। তার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা আমি পছন্দ করতাম না। যখন সে ফলের জ্যাম দিয়ে রুটি খাওয়াত, তখন আমারটাতে একটু পুরু করে দিত। বাইরে গেলে আমার জন্যে মিষ্টি কেক আর পেস্তার পিঠে নিয়ে আসত। ঠাণ্ডা মাথায় গুরুত্ব সহকারে কাকা আমার সঙ্গে কথা বলত।

'আচ্ছা, বল তো দেখি, বড়ো হয়ে তুমি কি হতে চাও? সৈনিক না কর্মচারী?'

'সৈনিক।'

'সেই ভাল। আজকাল সৈন্য হওয়া সহজ। পাদ্‌রি হওয়াটাও খুবই সোজা। শুধু চোখ বুজে চীৎকার করে যাওয়া 'পরম মঙ্গলময় প্রভু আমায় [illegible]চাও!' এই মাত্র বল, সব কাজ শেষ। সব চেয়ে সহজ কাজ জেলের কাজ। কিছু জানতে হয় না, শুধু মাত্র অভ্যাস।'

তারপর সে নিজেই অঙ্গভঙ্গি করে দেখাত কিভাবে মাছ আসে, কিভাবে টোপের পাশে ঘুরপাক খায়। টোপ ফেলার পর কি ভাবে মাকেরেল, ব্রীম বা বাম্‌ মাছ হুটোপাটি করে। সান্ত্বনার সুরে আমাকে বলে, 'তোমার দাদু যদি তোমাকে মারধোর করেন তাহলে তো তুমি একবারে ক্ষেপে ওঠ, তাই নয় কি? কিন্তু এসব ব্যাপারে ক্ষেপে ওঠার কিছু নেই। দাদু যে তোমায় মারেন তাতো তোমার ভালর জন্যেই। তা হলে শোন, লেক্সেভনার একটা গল্প বলি। মারধোর করবার কথা যদি ওঠে, তবে এরকম লোক আর হয় না। মারধোর করার জন্যে ক্রিস্তোফার নামে একটা চাকর ছিল। আর মারধোর করার ব্যাপারে লোকটা এমন পাকা পোক্ত ছিল যে আশেপাশের জমিদাররা লেক্সেভনার কাছে খবর পাঠাত, 'দয়াকরে ক্রিস্তোফারকে পাঠান। দু-একটা মারধোরের ব্যাপার আছে।' খবর পেয়েই লেক্সেভনা ক্রিস্তোফারকে পাঠাত।'

পিওতর কাকা এরপর বিশদভাবে বর্ণনা দিয়ে বলে চলে। তার বাড়ীর থাম-ওয়ালা বারান্দায় সাদা ধপধপে পোশাক পরে, নীল স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে কাউন্টেস

লাল আরাম কেদারায় বসে থাকে । আর ক্রিস্তোফার ভূমিদাসদের চাবুক মারে আর কাউন্টেস নির্বিকার ভাবে তা দেখে ।

এই ক্রিস্তোফার লোকটা র‍্যাজান থেকে এসেছিল । খানিকটা বেদে বা খখল জাতীয় লোক । লম্বা গোঁফ, দাড়ি কামিয়ে ফেলত, আর মুখটা নীলচে দেখাত ঐ কারণেই । লোকটা হাবাগোবা ছিল না, সেজে থাকত মাত্র । বাইরের উৎপাত থেকে নিছক বাঁচবার জন্যেই হয়তো । মাঝে মাঝে রান্নাঘরে এসে একপাত্র জল ভরতো আর একটা কাঠিতে আরশুলা বা গুবরে পোকা জাতীয় একটা কিছু ধরে রেখে দিত এভাবে ! নিজের কলারে উকুন থাকলে সেটাও খপ করে ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিত !'

এ ধাঁচের গল্প আমার অনেক শোনা । দাদু ও দিদিমার মুখে অনেক শুনেছি । এসব গল্পের মধ্যে অমিল যতই থাক্ একটা বিষয়ে খুব মিল খুঁজে পেয়েছি, তা হল, মানুষের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার দিক । শুনে আমার মনটা খারাপই হয়েছে শুধু । আমি বলি, 'এ গল্প নয়, অন্য গল্প বল তো ।'

গাড়ি চালকের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে । আর এই গাম্ভীর্যটা শুধুমাত্র তার চোখের পাশে এসে জড়ো হয় । তারপর সে ঘাড় নেড়ে বলে, 'তোমার দেখছি সাধ আর মেটে না । তবে অন্য একটা গল্প বলছি শোন । আমাদের একটা পাচক ছিল…'

'আমাদের মানে ?'

'কাউন্টেস লেক্সেভনার…'

'আচ্ছা তুমি কাউন্টেসকে তাতিয়ানা না বলে তাতিয়ান বল কেন ? তাতিয়ান তো পুরুষের নাম । কাউন্টেসতো পুরুষ ছিলেন না ।'

'সে কথা তো ঠিকই, কাউন্টেস মহিলাই ছিলেন । মহিলা হলেও কাউন্টেসের গোঁফ ছিল । ছোট কালো একটা গোঁফ । গায়ের রঙ ছিল কালো । জার্মান বংশে তার জন্ম । অনেকটা নিগ্রোদের মতই জাত । তারপর শোন কি কাণ্ড হল, একদিন এই পাচককে নিয়ে হল একটা মজার ঘটনা…'

মজার ঘটনাটা হল, সেই পাচক এক ধরণের মাংসের পুর দেওয়া খাবার তৈরি করেছিল । রান্নার দোষে খাবারটা নষ্ট হয়ে যায় । তখন সেই পাচককে শাস্তি হিসেবে সমস্ত খাবার গিলিয়ে দেওয়া হয় । ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে লোকটি ।

আমি রেগেমেগে বলি, 'এটা কি খুব মজার ঘটনা হল ?'

'তবে মজার ঘটনা কাকে বলে শুনি ? তুমিই বলনা ।'

'জানি না ।'

'তাহলে বক্‌বক্ কোরো না । মুখ বুজে থাক ।'

আবার একঘেঁয়ে গল্প শুরু হয় ।

কোন কোন রবিবার আমার মামাতো ভাইয়েরা বেড়াতে আসে । দু ভাইয়ের নামই সাশা । একজন মিখাইল-মামার ছেলে-গোমড়ামুখো আর ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির । অন্য জন ইয়াকভ-মামার ছেলে-ফিট-ফাট, একটু হামবড়া স্বভাবের । একদিন আমরা তিনজনে মিলে বাড়ির ছাদের ওপর থেকে দেখতে পেলাম একটা লোক কতকগুলো কুকুর-ছানা নিয়ে খেলছে, পরনে লোমের আস্তরণ দেওয়া সবুজ রঙের ঝুলের কোট । মাথার হলুদ রঙের টাকটা অনাবৃত । আমার মামাতো ভাইদের একজন প্রস্তাব দিল একটা কুকুরছানা চুরি করা যেতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে

পরিকল্পনা হয়ে গেল। আমার মামাতো ভাইয়েরা রাস্তায় দাঁড়াবে আর আমি ওদের বাড়িতে উঠে লোকটাকে ভয় দেখাব। আর যেই সে ভয়ে পালিয়ে যাবে, অমনি আমার মামাতো ভাইয়েরা এক দৌড়ে কুকুরের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে আসবে।

'কিন্তু আমি ভয় দেখাব কেমন করে?'

আমার এক মামাতো ভাই বলল, 'ওর টাকে থুথু ফেললেই ও পালাবে।' মাথার টাকে থুথু ফেলাটা খুব একটা অন্যায় নয়। কারণ এর চেয়ে বড় ধরণের অপরাধ ঘটে থাকে। সুতরাং আমার ওপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হল তা পালনে একটুও ইতস্তত করলাম না।

ঘটনাটা ঘটার পরেই প্রচণ্ড হৈ চৈ আরম্ভ হল। বেৎলংদের বাড়ি থেকে এক পাল মেয়ে, পুরুষ চড়াও হল আমাদের বাড়িতে। সবার আগে এল সুশ্রী একজন তরুণ অফিসার। যেহেতু মামাতো ভাইয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, সেহেতু তারা অপরাধী হল না। একমাত্র দাদুর হাতে আমিই মার খেলাম। দাদু আমাকে বেদম প্রহার দিলেন, যেন বেৎলংদের অপমানের প্রচণ্ডতাকে এভাবেই লাঘব করা হল।

থেঁৎলানো শরীর ও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে আমি যখন রান্না ঘরে পড়ে আছি, তখন পিওতর কাকা এল আমার সাথে দেখা করতে। ফিটফাট পোশাক, মেজাজ-টাও ভাল ছিল তখন। চাপাগলায় বলল, 'চমৎকার বুদ্ধি, মাথা খাটিয়ে বের করেছিলে তো! উচিত শিক্ষা হয়েছে। পাজী কোথাকার! সবকটাকে ধরে মাথায় থুথু ফেললে তবে ঠিক হয়। আরো ভাল হত যদি ওর গোবর ঠাসা মাথাটা লক্ষ্য করে একটা ইট ছুড়তে পারতে।'

সবুজ কোট পরা ভদ্রলোকটির চাঁচাছোলা ছেলেমানুষি মুখটার কথা আমার মনে পড়ছে। ছোটখাটো হাত দিয়ে টাক মুছতে মুছতে ভদ্রলোক সরু গলায় সখেদে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করেছিল। মনে হয়েছিল যেন কুকুর ছানারই ডাক। এটা শুনে আমার মনে একটা অনুশোচনার দুঃখ এসেছিল আর আমার মামাতো ভাইদের ওপর এসেছিল চরম ঘৃণা। কিন্তু পিওত্তর-কাকার মুখ দেখে আমি তা ভুলে গেলাম। আমাকে মারার সময় দাদুর মুখটা যেমন বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে ছিল, গাড়ি চালকের মুখটাও তেমনি হল। হাত ও পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমি পিওতর-কাকাকে বললাম, 'বের হয়ে যাও এখান থেকে।'

হেসে হেসে আর চোখ টিপে তাকিয়ে সে উনুন ছেড়ে বের হয়ে গেল। সেই দিন থেকেই এ লোকটার সাথে কথা বলার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি। কিন্তু তার গতিবিধি লক্ষ্যও করতে থাকি। কি যেন আর একটা ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কাও আমার মনে থেকে যায়। এ ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। অনেকদিন থেকে অভসিয়ান্নিকোভদের নিঃসার বাড়ির ওপর আমার একটা কৌতূহল ছিল। কেন জানিনা আমার মনে হত যে এই বাড়িটার ওপর রহস্যভরা রূপকথা রয়েছে।

বেৎলংদের বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ হয়। কয়েকটি আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী এই বাড়িতে থাকে এবং তরুণীদের সান্নিধ্য-লুব্ধ ছাত্র ও অফিসারেরা সেখানে প্রায়ই আসে। তারা সব সময়ে কথা বলে, গান করে, বাজনা বাজায়। বাড়িটাতে সর্বত্রই আনন্দের ছাপ। তকতকে জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ফুলগুলো যেন অপরূপভাবে জ্বল জ্বল করে। আমার দাদু এই বাড়িটা পছন্দ করেন না।

দাদু ঐ বাড়ির সম্পর্কে বলেন, 'বিধর্মী, নাস্তিক সব!' মেয়েগুলোর সম্বন্ধে অশালীন শব্দ প্রয়োগ করেন। পিওতর-কাকা মহা উল্লাসের সাথে আমাকে ওই শব্দের অর্থ বোঝায়। কিন্তু অভসিয়ান্নিকোভের রূঢ় ও নিঃশব্দ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাদু ভারি তারিফ করেন।

একতলা উঁচু বাড়িটা পিছন দিকে অনেকখানি লম্বা হয়ে এসে মিশেছে একটা পরিষ্কার ও খোলা উঠোনের সঙ্গে। সবুজ ঘাসে উঠোনটা ভরে গেছে। মধ্যিখানে একটা কুয়ো। দুদিকে দুটো থাম তুলে কুয়োর ওপর ছাদ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা রাস্তার দিক থেকে সরে গেছে; মনে হয় বাড়িটা আড়ালে থাকতে চায়। সামনে তিনটে সরু জানলা, জানলার কাঁচে রোদ্দুর পড়ে রামধনু রঙ ঠিকরে পড়ছে।

সদরের ডান পাশে গোলাঘর। গোলাঘরের বাড়িটায়ও সামনের দিকে তিনটে জানলা। জানলাগুলো নকল, ফ্রেম ও শার্সিটা সাদা রঙ দিয়ে আঁকা। এই নকল জানলার দিকে তাকালে মনে হয় এই বাড়িটা যেন আলাদা থাকতে চায়। শূন্য আস্তাবল আর বিরাট গাড়ি-ঘর সমেত সমস্ত সম্পত্তিটা যেন নিশব্দে নিশ্বাস ফেলে কোন এক অপমান-দগ্ধ বেদনায় অথবা প্রসুপ্ত প্রশান্ত গর্বে।

মাঝে মাঝে এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধকে উঠোনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পায়চারি করতে দেখা যায়। বৃদ্ধের গোঁফ আছে; ছুঁচের মত গোঁফ। আরেকজন বৃদ্ধকেও দেখা যায় মাঝে মাঝে। সে একটা জরাজীর্ণ ছাই রঙের ঘোড়াকে আস্তাবল থেকে বার করে নিয়ে আসে। বৃদ্ধের দু' গালে মোটা জুলপি, নাকটা বাঁকা। রোগা ঘোড়াটা উঠোনে এসে নম্র মঠবাসিনীর মত মাথা নোয়ায়। খোঁড়া বৃদ্ধ লোকটি ঘোড়াটাকে চড় মারে, শিস দেয়। তারপর আবার অন্ধকার আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার এই বৃদ্ধকে দেখে মনে হয় যে সে এখান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু অশুভ শক্তির আচ্ছন্নতায় সে যেন আটক হয়ে আছে এই বাড়িতে।

প্রতিদিনই দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উঠোনে তিনটে ছেলে খেলা করে। ওদের চেহারায় দারুণ মিল। পরনে তিন জনেরই ছাইরঙা প্যান্ট, জামা, টুপি। চেহারার দিক থেকে ওদের মিল এত বেশি। কে যে বড় আর কে যে ছোট চেনা যায় না।

আমি বেড়ার গায়ের ফাটল দিয়ে ওদের দেখি। ওদের দৃষ্টি আমার দিকে না পড়ায় আমি হতাশ হয়ে যাই। ওরা যে সব খেলা খেলে তা আমার কাছে নতুন। কোন ঝগড়া নেই, মারামারি নেই। দেখে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ওদের সাজগোজ, ওদের ভালবাসা দেখে আমার খুব ভাল লাগে। ছোটটির চেহারা বেশ ফুটফুটে; চলনে বলনে হাসি পায়। যদি ও পড়ে যায়, তাহলে বড় দুজন হাসে, ওদের হাসিতে বিদ্বিষ্ট ভাব নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওকে ওরা তোলে, রুমাল দিয়ে হাত পা মুছিয়ে দেয়। দ্বিতীয় জন বলে, 'ক্যাবলা কোথাকার।'

ওরা নিজেদের মধ্যে কখনো ঝগড়া করে না। প্রতিহিংসা নেই ওদের কারো মনে। তিনজনেই শক্ত-সামর্থ্য, উৎসাহে ডগমগ।

একদিন আমি গাছে উঠে বসেছি। ওদের দেখে শিস দিলাম। শিস শুনে ওরা আমার দিকে তাকাল, তারপর জড়ো হয়ে নিজেরা কী সব আলোচনা করল। আমার মনে হল ওরা বোধহয় আমার দিকে ইট ছুঁড়তে চায়। আমি গাছ থেকে নেমে তৈরি হলাম। পকেট ভর্তি পাথর পুরে আবার গাছে চড়ে বসলাম। কিন্তু

ওরা অন্যপাশে আবার খেলা শুরু করেছে। আমার দিকে ওদের কোন হুঁসই নেই! ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। আমি ইচ্ছে করে মারামারি শুরু করতে চাইলাম না। সাত সতের ভেবে চলেছি, এমন সময় কে যেন ওদের ডাকল, 'ছেলেরা বাড়ি এস, দেরি কোরনা।' ডাক শুনে ওরা পোষা হাঁসের মত গুটি গুটি চলে গেল। এরপর থেকে আমি প্রায়ই গাছের ওপর চড়ে বসতাম। মনে হত, ওরা বুঝি আমায় ডাকবে। কিন্তু ডাকতো আর আসে না, ওরা আপন মনে খেলে চলে। আমি মনে মনে ওদের খেলার সাথী হই—সম্বিৎ হারিয়ে হেসে উঠি বা চেঁচাই। ওরা হকচকিয়ে আমায় দেখে, তারপর নিজেরাই কী সব আলোচনা করে! আমি লজ্জা পেয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ি।

সেদিন ওরা লুকোচুরি খেলছে। মেজভাই চোর হয়েছে। গোলাঘরের কোণে সে চোখে চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে না। অন্য ভাইরা লুকোবে। বড়টা কাছেই শ্লেজ গাড়ির ভেতরে লুকোল, ছোটটা লুকোবার স্থান খুঁজে পাচ্ছে না!

যে চোর হয়েছে সে চেঁচাচ্ছে 'এক! দুই!'

ছোটটি কুয়োর কিনারায় বালতি সমেত দড়িটা ধরে বালতির মধ্যে লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি সমেত বালতি নীচে নেমে অদৃশ্য হল। কুয়োর ধারের সঙ্গে বালতির ধাক্কা লেগে ফাঁপা আওয়াজ হল।

নিঃশব্দে দড়িটা পাক খুলে নীচে নেমে গেল। আমি শিউরে উঠলাম! এর পরিণতি ভাবতে আমার দেরি হল না! সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম; চেঁচিয়ে উঠলাম 'ও কুয়োয় পড়ে গেছে।'

আমার সাথে সাথে মেজভাইও এসেছে। দড়িটা আঁকড়াতেই দড়ির টানে সে শূন্যে উঠে এল; হাতটা ছড়ে গেল। আমি ধরে ফেললাম চট করে। এরমধ্যে বড়-ভাইটাও এসেছে। আমরা দুজনে দড়ি টেনে বালতি ওঠাতে চেষ্টা করলাম।

সে আমাকে বলল, 'দয়া করে একটু আস্তে টান।'

আমরা সবাই মিলে ছেলেটাকে উদ্ধার করলাম। মারাত্মক রকম ভয় পেয়েছে ছোট ছেলেটা। ডান হাতের আঙ্গুল ছড়ে গেছে। গাল ছেঁচে গেছে, কোমর পর্যন্ত ভেজা, মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; ওপরে উঠে কাঁপতে কাঁপতেই সে হাসল। হেসে বলল, 'আমি পড়ে গিয়েছিলাম।'

'একেবারে থুনকো কোথাকার!' বলে মেজভাইটা রুমাল দিয়ে মুখের রক্ত মুছিয়ে দেয়।

'বাড়ি চল। এটা তো আর লুকোন যাবে না। তবে আর দেরি করে লাভ কি?' বড়ভাই মন্তব্য করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে মারবেনা?'

ঘাড় নেড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'কী ছুটেই না এসেছ তুমি।'

এইটুকু কথায় আমি এত অভিভূত হয়ে পড়লাম যে তার বাড়িয়ে-ধরা হাতটা পর্যন্ত ধরবার কথা মনে রইল না। শুধু মাত্র কানে এল মেজভাইকে বলছে, 'চল বাড়ি যাই, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। বাড়ি গিয়ে বলব ও ছুটতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে। কুয়োরি মধ্যে পড়েছে এসব বলে লাভ নেই।'

ছোটটা বলল, 'আমি বলব একটা জল ভরা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি।'

তারপর তিনজনই চলে গেল।

এ ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেছে যে আমি দেখলাম, যে গাছটায় আমি বসেছিলাম তার ডালটা তখনও নড়ছে।

এরপর সপ্তাহখানেক ওদের কাউকেই উঠোনে খেলতে দেখলাম না। প্রথম যেদিন খেলতে এল সেদিন কলরবটা একটু বেশি বলেই মনে হল।

বড় ভাইটা আমাকে দেখেই ঠিক বন্ধুর মত বলল, 'আমাদের সাথে খেলবে? চলে এস।'

সবাই স্লেজ গাড়ীটায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরিচয়-পর্ব সমাধা হল।

'সেদিন তোমরা মার খেয়েছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বড়ভাই বলল, 'তা খেয়েছি বইকি।'

আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না, যে এমন ছেলেদেরও মার খেতে হয়। ব্যাপারটা খুবই খারাপ লাগল আমার কাছে।

ছোটটা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পাখি ধর কেন?'

'পাখি চমৎকার গান গায়, তাই পাখি ধরি।'

'আর পাখি ধোরনা। পাখিরা উড়ে বেড়ালেই তো ভাল।'

'ঠিক আছে, পাখি আর কখনো ধরব না।'

'শুধু একটা ধরবে, আমাকে দেবে।'

'বেশ তো, কি পাখি চাও?'

'যে পাখি ফূর্তিতে থাকে—আমি খাঁচায় রেখে দেব।'

'বেশ, তোমাকে চেফ্রিঞ্চ পাখি দেব।'

একথা শুনে মেজভাইটা বলল, 'বেড়াল যখন খেয়ে নেবে, বাবা থিক্ রেগে যাবেন।'

বড় ভাই বলল, 'ঠিক বলেছ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের মা নেই বুঝি?'

'না।' বড়ভাই বলল। কিন্তু মেজভাই বলল, 'মা আছে তবে অন্য মা; থিক আমাদেল মা নয়। আমাদেল মা মলে গেছে।'

আমি বললাম, 'তা হলে তোমাদের সৎ-মা?'

বড় ভাই বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর অন্যমনস্কভাবে তিনজনই চুপ করে থাকল।

সৎ-মা যে কী তা আমি দিদিমার মুখে শুনেছি। তাদের চুপ থাকার কারণও বুঝলাম। মটরশুঁটির বিচির মত তারা তিনজন গা লাগিয়ে রইল। আমার মনে পড়ল সেই ডাইনী সৎ-মার গল্প। আসল মায়ের জায়গা নেবার জন্যে সেই ডাইনী সৎ-মা কতরকম ফন্দী এঁটেছিল। ছেলে তিনজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'কিছু ভেবনা তোমরা। তোমাদের আসল মা ফিরে আসবেন।'

বড়টা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'সে কী করে হবে? আমাদের মা তো মরে গেছে! যে মরে যায় সে কী আর ফেরে?'

বলে কী ছেলেটা! যে মরে সে আর ফেরে না? সঞ্জীবিনী জল ছিটিয়ে দিলে

কুচি কুচি করে যাদের কেটে ফেলা হয়েছে, তারাও বেঁচে ওঠে। এমন তো কত দেখা যায়, একজন লোক মরে গেছে বলে মনে করা হল, কিন্তু আসলে সে মরেনি ; ভগবান তাকে মারতে চাননি, তাকে ডাইনী ও কুহকিনীরা মেরেছে।

দিদিমার কাছে যেসব গল্প শুনেছি সেগুলো আমি উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলাম। বড় ছেলেটা হেসে বলল, 'ওসব তো গল্প—নিছক রূপকথার গল্প।'

অন্য দুভাই গল্প শুনছিল। ছোটটা ভুরু কুঁচকে ঠোঁট চেপে বসে, আর মেজটা কনুই হাঁটুর উপর রেখে অন্য হাতে ছোট ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে শুনছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোলাপী মেঘের সারি ছাদের ওপর নেমেছে। এমন সময় সাদা গোঁফওলা এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে বাদামী রঙের ঝুল-কোট, মাথায় লোমের টুপি। আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেটা কে ?'

বড়জন উঠে দাঁড়িয়ে আমার দাদুর বাড়ির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ বাড়ির ছেলে।'

'ওকে এখানে আসতে বলেছে কে ?'

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ছেলে গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে পালিয়ে গেল। ওদের দেখে মনে হল, 'ওরা যেন পোষা হাঁস।'

সেই বৃদ্ধলোকটা আমার ঘাড় ধরে গেটের সামনে নিয়ে এল। আতঙ্কে আমি কেঁদে ফেললাম। আমাকে সে এমন তড়িঘড়ি টেনে নিয়েছিল যে কান্না আসার আগেই আমি রাস্তায় এসে পড়েছি। আমাকে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে বলল, 'খবরদার ! এ বাড়িতে আর এসোনা।'

আমি রেগে মেগে জবাব দিলাম, 'শয়তান বুড়ো, তোমাকে দেখার জন্য আমি এ বাড়িতে আসিনি।'

লম্বা হাত বাড়িয়ে সে আমায় ধরে ফেলল। আর রাস্তায় যেতে যেতে বার বার বলতে লাগল, 'তোমার দাদু বাড়িতে আছে তো ?'

আমার দুর্ভাগ্য যে দাদু বাড়িতে ছিলেন। সেই ভয়ানক বুড়োর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে। দাড়িটা যেন ঠিকরে বের হয়ে আসছে। ভদ্রলোকের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই ছেলের মা এখানে নেই। আমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি। কেউ নেই যে ছেলেটার তদারকি করে। কর্ণেল, এবারের মত আপনি ক্ষমা করুন।'

একথা শুনে বুড়ো গলা খাঁকারি দিল ! সারা বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর সে ফিরে চলল। মনে হল যেন একটা থাম ! খানিক পরে পিওতর-কাকার গাড়ির মধ্যে আমাকে ফেলে দেওয়া হল।

ঘোড়ার লাগাম খুলতে খুলতে গাড়িচালক বলল, 'কি হে বাপু, আবার দেখছি একচোট হয়েছে। তবে এবার মার খেলে কেন ?'

আগাগোড়া সব ব্যাপার শুনে সে ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে কেন ? ওরা সব বড়লোকের বাচ্চা। দেখ তো, কি দুর্ভোগই না হল তোমার ! থাক্, এরপর ছেলেগুলোর ওপর শোধ নিও।'

এমনিভাবে অনেকক্ষণ বকল। আঘাত পেয়েও আমার কথাগুলো খারাপ

লাগছিল না, কিন্তু ওর মুখের হাবভাব দেখে খারাপ লাগল। আমার মনে হল এজন্য হয়তো ছেলেগুলোও মার খাবে। ওরা তো কোন দোষ করেনি।

আমি বললাম, 'ওরা কি করেছে? ওদের ওপর শোধ নেব কেন? তুমি যা বলছ, তা সত্যি নয়।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এক্ষুনি গাড়ি থেকে বের হয়ে যা।'

একলাফে গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'বোকা কোথাকার!'

'কি! এতবড় কথা—আমায় বোকা বলা? আমি মিথ্যেবাদী? তোকে আজ মজা দেখাচ্ছি।' বলে সে আমার পিছু ধাওয়া করল। উঠোনময় ঘুরপাক খেল, তবু কিছুতেই আমায় ধরতে পারল না।

রান্নাঘর থেকে দিদিমা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। সেও এল নালিশ জানাতে। বলল, 'এই বাঁদরটা আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। মুখে যা আসে তাই বলে। অথচ আমি ওর চেয়ে বয়সে পাঁচ গুণ বড়। ও আমাকে অকথ্য গালাগালি করতেও কসুর করে না।'

লোক যখন সামনা সামনি মিথ্যে কথা বলে তখন আমি হতবাক হয়ে পড়ি। এখনও এই কথাগুলো শুনে কী বলব বুঝতে পারি না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকি! দিদিমা রুক্ষভাবে বলে, 'দেখ পিওতর, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? ও তোমাকে নোংরা গালাগালি কখনই দেয়নি।'

দাদু হলে এসব কথা বিশ্বাস করতেন।

সেদিন থেকে গাড়িচালকের সঙ্গে আমার একটা মৌন শত্রুতা গড়ে উঠল। সে সুযোগের সন্ধানে থাকে; সুবিধে পেলেই লাগাম দিয়ে আমাকে এক ঘা কষিয়ে দেয়। ভাব দেখায়, যেন লেগে গেছে। আমার ধরা পাখিগুলো খাঁচা থেকে উড়িয়ে দেয়, না হলে বেড়াল লেলিয়ে দেয় পাখির ওপর। দাদুর কাছে আমার নামে নালিশও করে। যা ঘটেনি এমন সব কাণ্ড ও বলে আসে। ওকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে ও-বুড়োর সাজে আমারই মত একজন ছেলেমানুষ। আমিও কমতি যাইনা। লাপ্তিজোড়ার প্যাঁচ খুলে আলগা করে দিই, পা দিলেই ছিঁড়তে থাকে। একদিন মাথার টুপিতে মরিচ দিয়ে রাখি। টুপিটা মাথায় দেবার পর পুরো একটা ঘণ্টা হেঁচেছিল বাছাধন। আমি তার ঢিল খেয়ে পাটকেল ফিরিয়ে দিতে কোন সময়েই কার্পন্য করিনা।

ছুটির দিনে সে আমার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকত। গুপ্ত ভাবে ঐ তিনটে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে আমি ওর হাতে বহুবার ধরা পড়েছি। এই গোয়েন্দাগিরি করে সে সঙ্গে সঙ্গে দাদুকে আমার নামে বলে আসত।

ছেলে তিনটের সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধ হয়নি। ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে আমার ভালই লেগেছে। দাদুর বাড়ি আর অভসিয়ান্নিকোভের বাড়ির মাঝখানে যে আঁকাবাঁকা বেড়া আছে সেই বেড়ার একটা কোণ গাছ পালায় অন্ধকার হয়ে থাকে। এলম্, লাইম ও এলডারবেরির ঘন্ ঝোপ সৃষ্টি হয়েছে। এই ঝোপের পিছনে বেড়া কেটে আমি ফাঁক করেছি। এই ফাঁক দিয়ে তিনভাইয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওরা কখনো একা আসে, কখনো একসঙ্গে দুজনে। একজন সব সময় পাহারা দেয় কর্ণেল আসছে কি তা দেখার জন্যে।

ওরা আমাকে ওদের একঘেয়ে জীবনের কথা বলে। ভারি একঘেয়ে জীবন ওদের। শুনে আমার মনটা খারাপ হয়। অনেক বিষয়ে কথা বলি। পাখির কথা, নানা ছেলেমানুষি ঝোঁকের কথা। কিন্তু ওরা কোন দিন ওদের বাবা বা মায়ের কথা বলেনি। ওরা শুধু আমার কাছে শুনতে চায়। আমিও বলেই যাই, দিদিমার মুখে শোনা সেই সব গল্প। বলতে বলতে ভুলে গেলে ছুটে দিদিমার কাছ থেকে শুনে আসি। দিদিমা বিরক্ত হয়না এতে, বলে দেয় ভুলে যাওয়া অংশটা।

দিদিমার কথা ওদেরকে আমি প্রায়ই বলি। বড় ছেলেটা একদিন বলল, 'দিদিমারা ভালই হয়। আমাদেরও একসময় একজন চমৎকার দিদিমা ছিল...'

এই ছেলেটা কথায় কথায় 'এক সময়ে ছিল', 'এতকাল যেমন হয়ে আসছে', 'কোন এক সময়ে' প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করত। তার বলার ভঙ্গিতে মনে হত যেন সে এগারো বছরের বালক নয়, তার বয়স এক শো বছর পার হয়ে গেছে। মনে আছে, ছেলেটার হাতের তালু দুটো ছিল রোগা আর আঙ্গুল-গুলো ছিল লম্বা লম্বা। শরীরটাও ছিল রোগা-পটকা। চোখ দুটো ছিল লাজুক কিন্তু উপাসনা বেদীর বাতির মত স্বচ্ছ। অন্য দুটো ভাইকেও আমার খুব ভাল লাগত। ওদের ওপর আমার দরদ ছিল গভীর। ইচ্ছে হত ওদের জন্য একটা ভাল কিছু করি। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগত বড়জনকে।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। পিওতর-কাকা এলেও আমি টের পেতাম না। সে আমাদের চমকে দিয়ে বলত, 'আবার!'

আমি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, পিওতর-কাকা যেন মনমরা হয়ে আছে। কাজ থেকে ফেরার পর মেজাজটা কি রকম থাকে তা জানবার একটা পন্থা আমি বের করে নিয়েছি। সাধারণত সে গেট খুলত ধীরে-সুস্থে। সুতরাং দরজার কবজার আওয়াজটা হত কিচকিচ্ কক্। কিন্তু গাড়িওলার মেজাজ খারাপ থাকলে কবজাটাও তীক্ষ্ণ স্বরে আওয়াজ করত।

তার বোবা ভাইপো বিয়ে করতে দেশে গেছে, তাই কাকা একাই থাকত আস্তাবলের ওপর ছাদে তার ঘরে। সে ঘরে একটা মাত্র জানলা। ঘরের মধ্যে আলকাতরা, পুরানো চামড়া আর গায়ের ঘামের গন্ধ। এই গন্ধের জন্যে আমি তার ঘরে যেতাম না। আজকাল সে সারারাত বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোয়, দাদু এতে অসন্তুষ্ট হন।

এব্যাপারে দাদুকে বলতে শুনেছি, 'ওহে পিওতর, তুমি যে একটা অগ্নিকাণ্ড লাগাবে দেখছি!'

অন্যদিকে চেয়ে সে জবাব দিত, 'না, সে ভয় নেই। আমি বাতিটা জলের মধ্যে বসিয়ে রাখি।'

আজকাল তার চোখ দুটো অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। ভোজ-সভায় সে আসেনা, আর আমাদের জ্যামও খাওয়ায় না। তার মুখচোখ শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখের রেখা আরো গভীর হয়েছে। হাঁটাচলায় মনে হয় যেন সে রোগী। চলতে গেলে টলে যায়।

একদিন রাত্রিতে খুব বরফ পড়েছে, সকালে আমি ও দাদু বেলচায় করে বরফ সরাচ্ছি। এমন সময় সদরের দরজা খুলে একটা পুলিশের লোক ঢুকল। পিঠ ঠেস্ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দাঁড়াল সে। মোটা হাতের থ্যাবড়া আঙ্গুল নেড়ে

দাদুকে ডাকল। দাদু কাছে গেলে নাকটা তার গালের কাছে নিয়ে চাপা গলায় কি যেন বলল। শুনে দাদু আঁতকে উঠলেন। বললেন 'এখানে? কখন? আমি যদি তা মনে করতে পারতাম তবে...'

তারপর হাস্যকরভাবে লাফ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! এ যে অবিশ্বাস্য!'

'শ্-শ-শ্' পুলিশের লোকটা রূঢ়ভাবে দাদুকে বলল।

দাদু এধার ওধার দেখলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'বেলচাটা নিয়ে বাড়ি যা।'

দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব লক্ষ্য করছি। আস্তাবলের ওপর গাড়িচালকের ঘরে দুজনে ঢুকলেন। পুলিশটা ডান হাত থেকে দস্তানা খুলে বাঁ হাতের ওপর দস্তানা দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল।

'লোকটা টের পেয়েছে, ঘোড়া ফেলেই পালিয়েছে।'

দিদিমা রান্না ঘরে ছিল। আমি ছুটে গেলাম সেখানে। যা দেখেছি আর শুনেছি সবই বললাম। দিদমা আটা মাখছিল। তার সারা মুখে আটা লেগেছে। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে আমায় বলল, 'নিশ্চয়ই চুরি করেছে কোথাও। যা, তুই খেলতে যা। তোর ওসবে দরকার নেই।'

আমি ছুটে গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালাম। দেখি, দাদু সদরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মাথায় টুপি নেই, দৃষ্টি আকাশের দিকে। বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে চলেছেন। মুখটা রাগে লাল হয়েছে, মাঝে মাঝে একটা পা ছুঁড়ছেন মেঝেতে।

আমাকে দেখেই ক্ষেপে উঠে তিনি বললেন, 'ফের এসেছিস তুই এখানে? বললাম না বাড়ি যেতে?'

আমি রান্নাঘরে পালিয়ে এলাম, দাদুও আমার পিছু পিছু এলেন। দিদিমাকে ডাকলেন, 'গিন্নী একটু বাইরে এসতো।'

পাশের ঘরে দুজনের ফিস ফিস করে কথা হল। ফিরে আসার পর দিদিমার মুখ দেখে আমি টের পেলাম একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, কি হয়েছে গো? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?'

নীচু গলায় দিদিমা বলল, 'তুই বকিস না তো।'

সারাদিন বাড়ির আবহাওয়াটা থমথমে। দাদু ও দিদিমা মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন। ওদের যা কথাবার্তা হচ্ছে তা সংক্ষিপ্ত, বোঝা যায় না। এতে ভয়টা আরো বেড়ে গেল।

গলাটা পরিষ্কার করে দাদু দিদিমাকে বললেন, 'মূর্তির সবকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও তো।'

খাওয়া শেষ হল অতি দ্রুত। মনে হল, কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করা হচ্ছে। দাদু ত্রস্তভাবে গাল ফোলাতে লাগলেন আর বিড়বিড় করে বললেন, 'শয়তান ভর করলে আর নিস্তার নেই। এই ধরনা লোকটার কথা। দেখে তো মনে হয় কত দয়ালু, দেবতায় ভক্তিটক্তিও আছে, এ হয়তো কখনো অধর্ম করবেনা। কিন্তু এই লোকটা কী অপকর্মই না করেছে!'

দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শীতকালের দিন যেন ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলল। যতই সময় গেল, এ বাড়ির আবহাওয়াটা ততই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল।

সন্ধ্যায় আরেক জন পুলিশ এল। লোকটার চেহারা মোটা, মাথাটা লাল। রান্না ঘরে একটা বেঞ্চিতে বসে নাক ডেকে ঝিমোতে লাগল সে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা মালুম হল কেমন করে?'

'এ তো সহজ ব্যাপার। পুলিশের কাছে কিছুই অজানা থাকে না।' লোকটা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর জবাব দিল।

আমি জানলায় দাঁড়িয়ে একটা মুদ্রা মুখে পুরে গরম করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল তুষার ঢাকা জানলার ফাঁকে বিজয়ী সেন্ট জর্জের একটা ছাপ তোলা।

হঠাৎ সদরে একটা হুটোপাটির শব্দ হল; দড়াম করে দরজা খুলে গেল। চৌকাঠের ওপর পেত্রভনা দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করল সে, 'দেখুন গিয়ে আপনাদের বাগানের পেছনে কি ঘটেছে।'

তারপর পুলিশ দেখে সে ছুটতে শুরু করল। পুলিশের লোকটা তার স্কার্ট ধরে তাকে আটকেছে। সন্ত্রস্ত স্বরে সেও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়াও। তুমি কে? কি হয়েছে?'

পেত্রভনা চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি দুধ দুইবার জন্য বাইরে এসেছি। হঠাৎ দেখি কাশিরিনদের উঠোনে এক জোড়া বুট জুতোর মত কী যেন রয়েছে।'

দাদু রাগে চীৎকার করলেন, 'মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাসনা মাগী! আমাদের উঠোনে কি আছে আর না আছে তুই কেমন করে দেখবি? উঠোনের বেড়া যথেষ্ট উঁচু, তাতে ফুটোও নেই। ওপর থেকে দেখা যায়? সব, সব মিথ্যে কথা! বাগানে কিছু হয়নি।'

পেত্রভনা একটা হাত দাদুর দিকে বাড়িয়ে আর এক হাতে মাথা চেপে ধরে বলল, 'শোন বাপু! আমি মিথ্যে কথাই বলেছি। হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ে চলার দাগ বেড়া পর্যন্ত গিয়েছে। এক জায়গায় বরফ পায়ে মাড়ানো হয়েছে। তখন আমি বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে উঁকি মারি। দেখি, সেই লোকটা ওখানে পড়ে আছে।'

'কে—এ—এ?'

একটা ভয়ার্ত চীৎকার উঠল। রান্নাঘরের সকলেই পাগলের মত ছুটল উঠোনের দিকে। সেখানে বরফ ঢাকা গর্তে পিওতর পড়ে আছে। একটা পোড়া খুঁটিতে পিঠটা ঠেস দেওয়া, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। আর ডান কানের নীচে একটা গভীর ক্ষত। মনে হয় যেন একটা লাল মুখ। ধারের নীলচে অংশগুলো দাঁতের মত লাগছে। আমি ভয়ে চোখ বুজলাম। দেখলাম ঘোড়ার লাগামের ছুরিটা কোলের ওপর পড়ে আছে; পাশেই ডান হাতের কালচে আঙুলগুলো বেঁকে গেছে। বাঁ হাত বরফে গোঁজা। শরীরের চাপে খানিকটা বরফ গলেছে; আর শরীরটা বসে গেছে বরফের স্তূপে। এতে তাকে আরো ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। ডানদিকের বরফে লাল ছোপ ধরে গেছে। পাখির মত লাগছে ছোপটার আকার। মাথাটা নত হয়ে ঠেকেছে বুকে। কোঁকড়ান দাড়ি উঠেছে ওপরে। দাড়ির নীচে মস্ত পেতলের ক্রুশটা ঝুলছে। রক্তের ছাপ শুকিয়ে ক্রুশটাকে যেন ছবির মত করে ফ্রেমে এঁটে দিয়েছে। চারদিকে কলরব; আমার যেন মাথাটা ঘুরছে। পেত্রভনা চেঁচিয়ে চলেছে। পুলিশের লোকটা তাকে ধমকে চলে যেতে বলছে। দাদু চেঁচাচ্ছেন, 'খবরদার! পায়ের দাগগুলো যেন মুছে না যায়!'

হঠাৎ তিনি ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন।

উচুঁগলায় কর্তৃত্বের সুরে দাদু পুলিশকে বললেন, 'মিথ্যে এসব চেঁচাচ্ছেন। সবই ঈশ্বরের লীলা। আপনারা যাই করুন না কেন সবই নিস্ফল।'

তখন সবাই চুপ করে গেল। মৃতের দিকে তাকিয়ে সবাই বুকে ক্রুশ আঁকছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

বেড়া ডিঙিয়ে অনেকে এসেছে এপারে। ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বারবার, কিন্তু হৈ চৈ করেনি কেউ। দাদু হতাশার সুরে চেঁচিয়ে চলেছেন 'ওগো, পড়শীরা, কী করছ তোমরা! আমার ফুলের গাছগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল। তোমাদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই?'

আমার হাত ধরে দিদিমা বাড়ীর ভেতরে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, ও কী করেছিল?'

কান্না চেপে দিদিমা বলল, 'তা তো দেখলিই এতক্ষণ।'

সেদিন সারা সন্ধ্যে এবং রাতে অনেক লোকের আনাগোনা হল। পুলিশের হাঁকডাকও চলল। পাদরির মত দেখতে একটা লোক খাতায় কী সব লিখতে লিখতে বলল, 'কী করে? কী করে?

দিদিমা সবাইকে চা-খেতে দিল। চায়ের টেবিলে একটা গোলগাল লোক বসেছিল। তার গোঁফ আছে, মুখে বসন্তের দাগ। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'ওর আসল নাম কেউ জানেনা। এইটুকু জানা গেছে যে ও এলাথমার লোক। ওর সঙ্গে যে বোবা কালা লোকটা ছিল সে আদপে বোবা কালা কিছুই নয়। সে একথা স্বীকারও করেছে। আর একজন ওদের সঙ্গে ছিল সেও স্বীকার করেছে সব কথা। বহুদিন ধরে এই দলটা এসব কাজ করে বেড়াচ্ছে। হাত পেকে উঠেছে। ওদের কাজটা ছিল গির্জার সম্পত্তি লুট করা...'

পেত্রভনা ঘামছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'কী কাণ্ড মাগো!'

তাকের ওপর শুয়ে আমি দেখছি লোকগুলোকে। মনে হল ওরা যেন কত বেঁটে মোটা আর কুৎসিত?

দশ

এক শনিবার ভোরবেলায় বুলফিঞ্চ পাখি ধরতে আমি পেত্রভনার বাগানে গেলাম। কিন্তু একটা পাখীও ধরা দিল না। বুকে লাল রঙের ছিটে দেওয়া পাখি, ভারী দেমাকি দেখায়। রূপোলী বরফের ওপর তারা ঘোরে ফেরে। উড়ে যায় ঝোপের মধ্যে, সেখানে গাছের ডালে চিকচিকে বরফের গুঁড়োর মধ্যে পাখিগুলো ফুলের মত দুলতে থাকে। দৃশ্যটা সুন্দর বলে আমার হতাশা আসেনি। আমি যে একাগ্র শিকারী তা-ও নয়। কোন ঘটনার ফলাফলের চেয়ে তার প্রতিক্রিয়াটাই মনে ছাপ সৃষ্টি করে। পাখিদের জীবনযাত্রা দেখতে আর তাদের নিয়ে চিন্তা করতে আমার বড় ভাল লাগে।

শীতের নিস্তব্ধ দিনে বরফ ঢাকা মাঠের ধারে বসে পাখির কিচির-মিচির ডাক শোনার চেয়ে আনন্দ আর কী আছে! অনেক দূর দিয়ে চলে যায় একটা ত্রয়কা। ঘন্টা বাজে টিং টিং করে। ঠিক যেন রুশ দেশের বিষণ্ণ লার্কি পাখী।

ঠাণ্ডায় আমার হাড়ে কাঁপুনি এল। যখন মনে হল আমার কানগুলো জমে আসছে তখন আমি ফাঁদ আর খাঁচা নিয়ে বেড়া টপকে চলে এলাম। আমাদের

বাড়ির দরজা খোলা। প্রকাণ্ড চেহারায় এক চাষী তিন ঘোড়ার স্লেজ গাড়ীটাকে রাস্তায় বার করে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলোর গা থেকে ভাপ বের হচ্ছে। মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে লোকটা। আমার হৃৎপিণ্ডটা কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে পড়ল।

'এ গাড়িতে কে এসেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে ফিরে হাতের তলা দিয়ে লোকটা দেখল, তারপর লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বলল, 'পাদ্‌রি মশাই এসেছেন!'

পাদরি মশাইকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা ছিল না। যদি তিনি এসে থাকেন তবে খুব সম্ভব ভাড়াটের বাড়িতে এসেছেন।

'হুট্‌হুট্‌! চলরে আমার মানিক!' চাবুকের ঘা দিয়ে লোকটা চীৎকার করে বলল। একলাফে ঘোড়া ছুটল; বাতাসে টিং টিং শব্দ উঠল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে যেতে দেখলাম। তারপর গেট বন্ধ করে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু রান্না ঘরে ঢুকেই শুনলাম আমার মায়ের গম্ভীর গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'বেশ তো, তোমরা কি চাও? আমার মাথা কেটে নেবে নাকি?'

হাতের খাঁচা আর ফাঁদ ফেলে আমি ছুটলাম পাশের ঘরে। গায়ের কোটটাও খোলার অবসর হল না, দাদু আমাকে আটকে দিলেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি যেন একটা ঢোক গিলে যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,' আচ্ছা যাও।'

...ায় এসে হাঁতড়ে চললাম। উত্তেজনায় ও ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট আমার আঙুল-গুলো কাঁপছিল। কিছুতেই দরজার তালা লাগানোর আংটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়ালাম। মুখে রা কাটতে পারছিলাম না।

মা বলল, 'এই তো, এসেছিস এতক্ষণে! আরে ব্বাপ। কত বড় হয়েছিসরে! চিনতে পারছিস না? কী কাণ্ড বল তো? জামা কাপড়ের কী হাল! কান দুটো দেখছি ঠাণ্ডায় জমে গেছে। মা শিগ্‌গির গিয়ে একটু হাঁসের চর্বি এনে দাওতো।' ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে গা থেকে জামা কাপড় খুলে মা আমায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, মায়ের দীর্ঘ উন্নত গড়ন! তুল তুলে লালরঙের পোষাক তার গায়ে। পুরুষের জামার মত চওড়া। বড় বড় কালো বোতাম কাঁধ থেকে নীচ পর্যন্ত কোনাকুনি নেমেছে। এ ধরণের পোশাক আমি আর কখনো দেখিনি! মায়ের মুখটা যেন কেমন ছোট হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে চোখগুলো হয়েছে আরো বড়, আরো গভীর। চুলগুলো আরো সোনালী হয়ে উঠেছে!

আমার গায়ের ময়লা জামাগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে মা ধমক দিয়ে বলল, 'কিরে, চুপ কেন? আমাকে দেখে খুশি হস্‌নি? কী ময়লা জামারে বাবা!'

তারপর আমার কানে হাঁসের চর্বি ঘষল। ভারি ব্যাথা লাগল, কিন্তু মায়ের গা থেকে একটা সুগন্ধ বের হচ্ছে বলে আমার সব ব্যাথা ভুলে গেলাম। মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তেজনায় কথা বলতে পারলাম না। দিদিমা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেছে, এমনকি দাদুকেও ভয় করে না। ভারিয়া রে, ভারিয়া...'

'মা, তুমি বাপু ঘ্যানর ঘ্যানর বন্ধ কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মায়ের সঙ্গে যেন এ বাড়ির কিছুই খাপ খায় না! মা আসতেই চারদিকের

সব কিছু পুরনো, ময়লা বলে মনে হয়। এমনকি আমি নিজেও যেন দাদুর মত বুড়ো হয়ে গেছি।

দু-হাঁটুর মধ্যে আমাক চেপে ধরে উষ্ণ হাত দিয়ে মাথার চুলগুলোকে নাড়তে নাড়তে মা বলল, 'তোর চুল কাটতে হবে দেখছি। এবার তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। কিরে, লেখাপড়া করবি তো?'

'লেখাপড়া তো আমি করি।'

'আরো শিখতে হবে। ইস্, কী গাঁট্টা গোট্টা হয়ে উঠেছিস রে?' আমায় আদর করে মা বলে উঠল।

দাদু এমন সময় ঘরে ঢুকলেন। তার মুখটা থম থম করেছে, রেখায় পূর্ণ, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। দাদুকে দেখে আমাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে মা জোরে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তাহলে আমি কি করব? চলে যাব এখান থেকে?'

দাদু নখ দিয়ে জানলার বরফ আঁচড়াতে আঁচড়াতে চুপ করেই থাকলেন, একটা কথাও বললেন না। সারা ঘরটা উৎকণ্ঠায় ভরা। আমার দু' চোখ আর কান যেন বাড়তে বাড়তে সারা অবয়ব জুড়ে বসেছে, মনে হচ্ছে বুকটা যেন ফেটে পড়ছে।

'লেক্সেই, তুই বাইরে যা তো' চাপা গলায় দাদু বললেন।

'কেন? ও কেন বাইরে যাবে?' আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে মা বলল, 'তুই খবরদার বাইরে যাবিনা।'

মা উঠে দাঁড়াল। তারপর সূর্যাস্তের লাল মেঘের মত ভাসতে ভাসতে অপর দিকে গিয়ে দাদুর পাশে দাঁড়াল।

'বাবা, আমার কথা শোন··'

'চুপ!' তার দিকে ফিরে চেরা গলায় দাদু বললেন।

'আমায় অমন ধমক দিয়ে বললে কিছু লাভ হবে না।' মা নাচু গলায় বলল।

'ভারভারা।' ডিভান ছেড়ে দাঁড়িয়ে শাসানির ভঙ্গিতে আঙ্গুল নেড়ে দিদিমা বলল।

দাদু একটা চেয়ারে বসে বিড়বিড় করে আপন মনে কী যেন বলতে লাগলেন।

'কি হল ব্যাপারটা? দাঁড়াও, আমাকে একটু ভাবতে দাও···আমি একটু ভাবি···কোথা দিয়ে যে কী হয়ে যাচ্ছে!' তারপর আহত পশুর মত প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আমাদের মুখে চুন কালি লেপেছিস তুই।'

'তুই এখান থেকে যা তো।' দিদিমা আমাকে বলল। মনে একটা দুঃখ নিয়ে আমি রান্না ঘরে এলাম, উনুনের ওপর উঠে বসলাম। সেখান থেকে পাশের ঘরের সব কথা শোনা যায়। শোনা গেল একবার সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, আরেকবার সবাই চুপ চাপ। বোঝা গেল, আমার মায়ের একটা বাচ্চা হয়েছে, আর মা তাকে অন্য একজনের কাছে দিয়ে এসেছে। আমি কিছুতেই বুঝলাম না দাদু কী জন্য রাগ করছেন। দাদুর মত না নিয়ে বাচ্চা হয়েছে বলে, না মা বাচ্চাটাকে আনেনি বলে?

এক সময় দাদু এসে রান্না করে ঢুকলেন। মুখ চোখ লাল, এলোমেলো চেহারা। ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছেন তিনি। দিদিমাও পিছনে পিছনে এল। ব্লাউজের কোন দিয়ে চোখের জল মুছছে সে। বেঞ্চির ওপর ধপ্ করে বসে দু-ধারটা আঁকড়ে

ধরল। মুখখানা কুঁকড়ে রয়েছে, ছাই রঙের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছে; দাদুর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল দিদিমা।

'এবারের মত তুমি ওকে ক্ষমা কর; যীশুর দোহাই, একবার মুখ তুলে চাও। অনেক বেশি শক্ত আর মজবুত নৌকোও ভরাডুবি হচ্ছে। বড় মানুষদের ঘরে কিংবা বড় বড় ব্যবসায়ীদের বাড়িতে এসব ঘটনা কি ঘটে না? শত শত ঘটছে। একবার তাকিয়ে দেখ কী সুন্দর মেয়ে। দোষ কার নেই? তুমি এবারের মত ক্ষমা কর!'

শরীর এলিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেন দাদু। দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তা তো বটেই, সত্যিই তো। তোমার আর কী, তুমি তো হাত বাড়িয়ে বসে আছ, সবার দোষই তোমার কাছে মাফ হয়ে যায়…উঃ কী মানুষ এরা!'

এরপর দিদিমার কাঁধটায় জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চাপা স্বরে দাদু বললেন, 'শুধুমাত্র মানুষ নয়, ঈশ্বরও আছেন। ঈশ্বর এত সহজে ক্ষমা করেন না। এই দ্যাখনা, আমরা কবরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। আর তো এই শেষ কটা দিন, এখনো শাস্তিভোগ চলছে। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, আশা ভরসার কিছু নেই। আমাদের ভিখিরির মত মরতে হবে। দেখে নিও তুমি, ভিখিরির মত মরতে হবে আমাদের।'

দাদুর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে দিদিমা সান্ত্বনার সুরে বলল, 'তাতে কি হয়েছে?' কপালে যদি থাকে তো ভিখিরিই হতে হবে! ভয়ের কী আছে? তোমাকে কিছু করতে হবেনা। তুমি ঘরে থাকবে, আমি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরব দোরে দোরে। সবাই আমাকে ভিক্ষে দেবে, না খেয়ে মরতে হবেনা। আমি যদ্দিন আছি, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। এসব ভেবে মাথা গরম কোরনা।'

দাদুর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। হঠাৎ ছাগলের মত মাথা নেড়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। দিদিমার হাতের মধ্যে তাকে এতটুকু দেখাল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি বললেন, 'তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে। নেহাতই বোকা! অথচ তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি ছাড়া কেউই নেই। কিন্তু তোমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে খাটো। যেটুকু আছে তা খোয়াতে কতক্ষণ! একবার ভেবে দেখতো, এই ছেলেমেয়েদের জন্যে কী না করেছি! শেষ বয়সে কিছুই রইল না, এক কণাও না।'

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। দু' গাল বেয়ে ঝরে পড়ল জল। উনুন থেকে নেমে আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। কাঁদতে লাগলাম এই আনন্দে যে আমার মা এসেছে, দাদু ও দিদিমা এমন অভাবনীয় কোমলতার মধ্যে মনের কথা বলছেন যে তাদের দুঃখের ভাগী হয়েছি আমি। দুজনেই আমাকে ধরে আদর করলেন, চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

'এই যে বিচ্ছু বদমাস্, তুই আছিস এখানে?' আমার কানে কানে দাদু ফিস্ফিসিয়ে বলল, 'এখন আর কি? তোর মা এসে গেছে, তুই কি আর আমার কাছে আসবি, দরকারটাই বা কি? মনে থাকবে কী এই বুড়ো শয়তান দাদুকে? কীরে, তুই কী বলিস? আর ঐ করুণাময়ী দিদিমাকেও ভুলে যাবি। ওতো শুধু জানে আদর দিয়ে পরকাল ঝরঝরে করতে… হুঃ কী সব মানুষ!'

আমাদের দুজনকে সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রাগতভাবে

বললেন, 'আমাদের ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে, সবাই এখান থেকে যেতে চায়,…হাঁ করে দেখছ কী, ডেকে আন মেয়েটাকে…তাড়াতাড়ি করে যাও!'

দিদিমা রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল। দাদু মাথা নীচু করে কোণের দিকে গিয়ে বললেন, 'পরম করুণাময় ভগবান, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমার অবস্থা?'

তারপর নিজের বুকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। শুধু এখনকার কথা নয়, দাদু সাধারণতঃ যেভাবে ঈশ্বরের কাছে কথা বলেন তা আমার ভাল লাগে না। ভারি একটা অহংভাব থাকে তার মধ্যে।

আমার মা ঘরে ঢুকল, তার লাল পোষাকের খুশিভরা ঝলক উঠল ঘরের ভেতর। টেবিলের ধারের বেঞ্চটাতে একপাশে দাদু ও একপাশে দিদিমাকে নিয়ে বসল মা, জামার আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল দুজনের কাঁধ। খুব নরম সুরে আর প্রত্যেকটা কথার ওপরে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কথা বলল মা; দাদু ও দিদিমা নির্বাক হয়ে মায়ের কথা শুনল। দাদু ও দিদিমাকে মায়ের পাশে খুব ছোট দেখাতে লাগল। আমার মনে হল, আমার মা হচ্ছে ওদের মা, আর ওরা দুজন হল ছেলেমেয়ে।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে আমি তাকের ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যায় দাদু ও দিদিমা তাদের সব সেরা পোষাকে গির্জার উপাসনায় গেলেন। সর্দার কারিগরের পোষাকে আর রেকুনের লোমের কোট গায়ে দিয়ে দাদুর চেহারার শোভা বেড়ে গেল। এক গাল হাসি নিয়ে দাদুর দিকে চোখ টিপে আর মাকে একটা গুঁতো মেরে দিদিমা বলল, 'দেখ্‌রে, তাকিয়ে দেখ্‌, তোর বাবা কেমন পরিপাটি ছাগল সেজেছে।'

মা হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর ঘরের মধ্যে যখন কেউ রইল না তখন মা পা মুড়ে ডিভানের ওপর বসে পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল।

'কেমন আছিস? ভাল নয়, না?'

'না, আজকাল তেমন ভাল লাগে না।'

'সত্যি? যা তোর মনে আসে বলে যা।'

দাদুর সম্পর্কে কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই আমি সেই বাসিন্দাটার কথা বলতে শুরু করলাম। কি চমৎকার লোক ছিল সে, কেউ তাকে পছন্দ করত না, শেষ পর্যন্ত দাদু তাকে বিদেয় করলেন। মায়ের মুখ দেখে মনে হল এসব শুনতে তার ভাল লাগছে না। মা বলল, 'এবার অন্য কিছু বল্‌, শুনি।'

তখন আমি তাকে সেই তিনটে ছোট ছেলের কথা বললাম। আর বললাম বুড়ো কর্নেল কীভাবে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শুনে মা বলল, 'একেবারে চামার।' এরপর চুপ হয়ে গেল; চোখ কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মা, দাদু তোমার ওপর এত রেগে গেছেন কেন?'

'আমারই দোষ রে!'

'তুমি যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে তাহলে এমন হত না…'

আমার মুখে একথা শুনে মা চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হো হো করে হেসে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'তবে রে দুষ্টু ছেলে! এসব কথা কখনো মুখে আনবি না। একটা কথাও

নয়। এসব চিন্তাও মাথায় আনবি না কক্ষনো।' শান্ত ও কঠোর স্বরে অনেক কথা মা বলে গেল, সেগুলোর একবর্ণও বুঝলাম না আমি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিবুকে টোকা মেরে আর ভুরু দুটো নাচিয়ে ঘরময় পায়চারি করে চলল।

টেবিলেতে বাতি জ্বলছে। তা থেকে গলে গলে মোম পড়ছে। একটা আয়না থেকে ঠিকরে পড়ছে বাতির আলো। লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়া মেঝেতে পড়েছে। কোণের মূর্তির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে। চাঁদের আলোয় রূপোলী হয়ে উঠেছে তুষারাবৃত জানলাগুলো। ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে মা যেন শূন্য দেওয়াল ও সিলিং-এর মধ্যে কী একটা খুঁজছে।

'তুই শুতে যাবি না?'

'যাব।'

'কখন?'

'একটু পরে।'

'তাইতো, বিকেলে তো তুই ঘুমিয়েছিস, না!' আমার তা মনেই ছিল না।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে!'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?' তারপর এগিয়ে এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। মায়ের চোখের চাউনিতে আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। চোখ ফেটে জল বের হল।

'কাঁদছিস কেন রে?'

'আমার ঘাড়ে ব্যথা করছে।'

কিন্তু তার চেয়ে বুকের ভেতর ব্যাথাটা ছিল আরো বেশি। আমি বুঝলাম, মায়ের পক্ষে এ বাড়িতে বসবাস করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। একদিন না একদিন মাকে যেতেই হবে।

মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটা পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে মা বলল, 'বড় হলে তোকে তোর বাবার মত দেখতে হবে। দিদিমা তোকে বাবার কথা বলেনি?'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদিমা ওকে খুব ভালবাসত। সেও তোর দিদিমাকে ভালবাসত তেমনি...'

'আমি জানি মা।'

মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে রইল মা। শেষে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল তা; তারপর বলল, 'এই ভাল হল।'

বাতির আলো না থাকাতে ঘরের ভেতরটা যেন স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা সেই কুশ্রী ছায়াগুলো আর নেই। তার বদলে নীল চাঁদের আলোয় ঘর ভরে উঠেছে। জানলার কাঁচে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রূপোলী আভা।

'আচ্ছা মা, এখানে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে গো?'

অনেককটা শহরের নাম করল মা। যেন অনেক দিনের কথা, ঠিক মত মনে আসছে না। এমনিভাবেই ভেবে ভেবে নামগুলো বলল। সারাটাক্ষণ মা বাজ পাখির মত ঘরে পাক খেতে লাগল।

'এ পোশাক তুমি কোথায় পেলে গো?'

'এটা আমি নিজে তৈরি করেছি। নিজের সব কিছু নিজেই তৈরি করি।'

মা যে সবার থেকে আলাদা তা ভেবে আমার ভাল লাগে। কিন্তু মা যে কথা বলছে না তা দেখে আমার কষ্ট হল। আমি প্রশ্ন না করলে মা কথা বলে না। তারপর মা আবার এসে ডিভানে আমার পাশে বসল। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। এক সময় দাদু ও দিদিমা গায়ে মোম আর ধুপের গন্ধ নিয়ে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন।

থমথমে আবহাওয়ায় সে রাতে আহারপর্ব শেষ হল। আমরা কথা বললাম খুবই কম, যেটুকু বললাম, তা এত সতর্কভাবে যাতে কারো পাতলা ঘুম ভেঙে যেতে না পারে।

একটুও সময় নষ্ট না করে মা 'পার্থিব' শিক্ষায় আমাকে শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা করল। 'মাতৃ ভাষায় প্রথম পাঠ' নামে বইটা কিনে দিল আমাকে। কিছু দিনের মধ্যে মাতৃভাষায় বর্ণমালা শিখে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে মা আমায় কবিতা মুখস্থ করাতে চাইল। আর তা করতে গিয়ে দুজনের প্রাণান্তকর অবস্থা সৃষ্টি হল।

আমাকে প্রথম যে কবিতাটা মুখস্থ করান হয়েছিল তা হল এই,

'অসীম শূন্যের দিকে পথখানি এঁকে বেঁকে যায়,
খামারের আশে পাশে ঘর বাড়ি রয়েছে সেথায়,
গাঁইতি বা কোদালেতে এ পথ হয়নি সৃজন,
হাজার হাজার লোক এপথে করেছে পদ সঞ্চারণ।'

কবিতাটা আবৃত্তি করতে আমার সব সময়েই ভুল হত। এঁকেবেঁকে না বলে ছেঁকেছেঁকে বলতাম, কোদালকে কোটাল বলতাম, পদসঞ্চার না বলে অন্য কি একটা যেন বলতাম।

মা আমাকে শুদ্ধ করে দিত, 'আচ্ছা, ভেবে দেখতো রাজপথের বেলায় কখনো ছেঁকেছেঁকে হয়? বল্ এঁকেবেঁকে। বুঝলি? ভুলবিনা কেমন?'

কথাটা আমিও বুঝতাম। কিন্তু তবু আবৃত্তি করার সময় বেরিয়ে আসত সেই ভুল ছেঁকেছেঁকে। আর ভয়ে আমার বুক দুড়দুড় করত।

শেষকালে মা একদিন রেগে গিয়ে বলল আমার মাথায় কিছু নেই, আমি একেবারে এক রোখা। নিজের নামে এই কথা শুনে আমার মনে লাগল। আমি চেষ্টা করলাম যাতে আমার এই ঝঞ্ঝাটে লাইনগুলো ভুল না হয়। মনে মনে যখন আবৃত্তি করি ভুল হয় না। কিন্তু বলতে গেলেই নিশ্চিতভাবে সব গুলিয়ে ফেলি। শেষকালে এ লাইনগুলো বিষ হয়ে উঠল। তখন শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করে তুললাম, আর মনে মনে অর্থহীন লাইনগুলোকে দেখে আনন্দ পেলাম।

কিন্তু এ আনন্দ আমার কাছে তীক্ষ্ণ বাণের মত হয়ে উঠল। একদিন মায়ের কাছে পড়া করছি, কোথাও ভুল করিনি, এমন সময়ে মা আমাকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলল। তখন আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে কবিতা আমার মুখ থেকে নির্গত হল তা এই—

'রাজপথ গাছপথ রথ চলে ঘর্ঘর
ধর সবে শাবল-মাদল বাকল মর্মর।'

ব্যাপারটা যে কী ঘটল বুঝলাম না। টেবিলের ওপর দুহাতে ভর দিয়ে মা উঠে দাঁড়াল, তারপর প্রতি কথায় জোর দিয়ে বলল—

'কোত্থেকে শিখেছ এটা?'

আমার বুক দুর দুর করছে। বললাম 'জানিনা।'

'তবুও বলো আমাকে!'

'এই এমনি বললাম।'

'কেন এমনি বললে?'

'একটু মজা করার জন্যে।'

'যাও, ওই কোণে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কন?'

'যাও বলছি'—মা ধমক দিয়ে উঠল।

'কোন কোণে?

মা কোন জবাব দিল না। কিন্তু এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে আমার জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছু থাকলনা। আমি কী করছি আর মা আমাকে কী বলছে এসব বোধ আমার মন থেকে মুছে গেল। ঘরের কোণে রয়েছে একটা গোল টেবিল; টেবিলের ওপর ফুলদানিতে কিছু ফুল আর শুকনো ঘাস রয়েছে। মিঠে গন্ধ বের হচ্ছে। আরেকটা কোণে রয়েছে একটা গালিচা ঢাকা ট্রাঙ্ক। তৃতীয় কোণে বিছানা রয়েছে আর অপর কোণে দরজা।

আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি মাকে বললাম, 'মা, তুমি আমাকে কী করতে বলছ তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

মা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। কপাল আর গাল ঘষতে ঘষতে বলল, 'তোমার দাদু তোমাকে কি কখনো কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেন নি?'

'কখন?'

'যখনই হোক, দাঁড় করিয়েছে কিনা জবাব দাও।' টেবিলে সশব্দে ঘুষি মেরে মা চেঁচিয়ে উঠল।

'কই আমার ঠিক মনে পড়েনা তো।'

'কোণে দাঁড় করিয়ে রাখাটা যে একটা শাস্তি তা জাননা?'

'না। কেন? এটা শাস্তি কিভাবে?'

'পোড়া কপাল আমার!' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মা বলল, 'এদিকে এসো দেখি।'

মার কাছে এসে আমি বললাম, 'মা, তুমি আমায় বকছ কেন?'

'একটা কবিতা মুখস্থ করতে পারিস না? বার বার কেন ভুল হয়?'

আমি মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে চোখ বুজে মনে মনে বললে আমি কবিতাটা যেমন লেখা আছে তেমনিই বলতে পারি, কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করলে অন্য শব্দ এসে পড়ে।

'ঠিক কথা বলছিস তো? বানানো নয় তো?'

'আমি বানিয়ে বলছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলাম। হঠাৎ আরেকবার একটু সময় নিয়ে চিন্তা করতেই কবিতাটা নির্ভুল ভাবেই বলে ফেললাম। শুনে নিজেই অবাক হলাম।

তখন আমার মুখটা লাল হয়েছে, কান দুটো জ্বলছে। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমি লজ্জায় যেন মরে যাই আরকি! চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল আমার দৃষ্টি। আমি দেখলাম, মার মুখটা হতাশার কালো ছায়ায় ভরে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'কিরে, এবার কি করে হল ? মা বলল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি সত্যিই বানিয়ে বলছিলে।'

'কী জানি। আমি অনিচ্ছায় এসব...'

মাথা নীচু করে মা বলল, 'তোর সঙ্গে পারা দায়। এ যার তার কর্মও নয়! আচ্ছা, তুই যা!'

দিনের পর দিন মা আমায় অনেক কবিতা মুখস্থ করাল। কবিতাগুলো কিছুতেই মনে রাখতে পারিনি। কবিতার লাইনগুলো উল্টে পাল্টে এবং নতুন শব্দ যোগ করে বিকৃত করে তোলার বদ্ ইচ্ছে আমাকে ভয়ঙ্কর ভাবে পেয়ে বসল। আমাকে এজন্য ভাবনা চিন্তা করতে হয়না, বিদঘুটে শব্দগুলো আপনা থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জড়ো হয়। এই শব্দগুলো এসে কবিতার আসল শব্দগুলোকে হটিয়ে দেয়। প্রায়ই আমার মনে হয় যে কবিতার লাইনগুলো আমার মন থেকে ক্রমশই ফিকে হয়ে যায় আর অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনা। মনে পড়ে প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কির লেখা একটা কবিতা যা আমাকে বড় ঝামেলায় ফেলেছিল। কবিতাটা হল এই,

'কাকলি মুখর ভোর থেকে রাতের আঁধারে
বুড়োবুড়ি—স্বামীহারা অনাথার দল
এক মুষ্টি ভিক্ষা লাগি ফেলে অশ্রুজল।'

এই কবিতার তৃতীয় লাইনটা আমার কিছুতেই মনে পড়ে না, আবৃত্তি করার সময়ে সেটা সব সময়েই বাদ দিয়ে যাই। লাইনটা হল এই, 'হাত পেতে ভিখ চায় অসহায় স্বরে।' শেষ পর্যন্ত মা আমার ওপরে তিক্ত হয়ে ওঠে, দাদুর কাছে গিয়ে আমার এই স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা বলে।

দাদু শুনে বলেন, 'ছেলেটা একবারে গোল্লায় গেছে। ওর স্মৃতিশক্তিতে কোন গোলমাল নেই। এই আমার প্রার্থনাগুলো, যতটা আমার মনে না থাকে তার চেয়ে ঢের বেশি ওর মনে থাকে। ওর স্মৃতিটা যেন ঠিক পাথরের মত। যেটা একবার দাগ কাটে, চিরকাল তাই-ই থেকে যায়! উত্তম মধ্যম দেওয়ার দরকার হয়েছে আর কি!'

দিদিমাও দাদুর মতে সায় দিল।

'রূপকথার গল্প আর গানগুলো তো মনে থাকে। গান আর কবিতায় তফাৎ কিসের ?'

এ সবই ঠিক কথা। আমি বুঝলাম, আমার দোষ। কিন্তু যেই কবিতা মুখস্থ করতে যাই অমনি নানা নতুন শব্দ এসে পড়ে আরশুলার মত গুট গুট করে।

'আমাদের গৃহমুখে সারাটা দিন
কানা খোঁড়া ভিখিরিরা হয়ে অন্নহীন
খেতে চায় একমুঠো, বিস্তর কাঁদে
ভিক্ষা অন্ন লভে, পড়ে পেত্রভনার ফাঁদে।
পেত্রভনার গোয়ালেতে আছে কত গাই
নগদে সে সব কেনে তাই।
এরপর মদ্যপানে চলে হুটোপুটি—
নেশার চোটেতে তারা খায় লুটোপুটি।'

রাত্রিতে দিদিমার পাশে শুয়ে আমি তার কাছে বইয়ের পড়া আর নিজের বানানো কবিতা বলি। মাঝে মাঝে দিদিমা এসব শুনে হাসে। অনেক সময়ে তিরস্কার করে বলে, 'এই দ্যাখ্, ইচ্ছে করলে তুই সব পারিস!' ভিখিরিদের নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা তামাসা করা ঠিক নয়। যীশুও তো ভিখিরিই ছিলেন্। সাধু-সন্তরা সকলেই তো ভিক্ষুক। আমি নিজের কবিতা আবৃত্তি করি,

'ভিখিরিদের আমি
দেখতে পারি না মোটে
যেমন পারি না দাদুকে।
তাই প্রভুকে বলি
আমার ক্ষমতা সীমিত
পথ দেখাও প্রভু—
কী করে যে আমি
পোড়া ভাগ্যকে আর দাদুর বেতকে
কলা দেখাতে যে পারি।'

দিদিমা ক্ষেপে বলে ওঠেন, 'পাজি ছেলে তোর মুখ খসে যাবে। দাদু শুনলে আস্ত রাখবেন না তোকে।'

'শুনুক্ না—'

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিদিমা বলে, 'হ্যাঁ রে তুই তোর মাকে জ্বালাতন করিস কেন? এমনিতেই তো তোর মায়ের জ্বালার শেষ নেই, তার ওপর যদি তোকে নিয়ে জ্বলতে হয় তাহলে বাঁচবে কি করে ও?'

'কেন, জ্বলতে হয় কেন?'

'চুপ কর হতভাগা, তোর সে খবরে দরকার কি?'

'আমি জানি, দাদুর জন্যে তো?'

'ফের বকছিস!'

ভারি খারাপ লাগছে আমার, একটা বিশ্রী হতাশায় ভেঙে পড়ছি আমি, তবু জানি না আমি কেন আমার এ মনোভাব মার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। আমি আরো ভয়হীন ও অবাধ্য হয়ে উঠি। আমার মায়ের আমাকে লেখাপড়া শেখানোর তাগিদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখাটাও আমার কাছে শক্ত হয়ে ওঠে। অঙ্ক নিয়ে খুব কষ্ট হয় না, হাতের লেখা অভ্যাস করা আর ব্যাকরণটা বোঝা এ দুটোই আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার দাদুর বাড়িতে মা খুব খুশি নয়। ঐ চিন্তা আর সব চিন্তাকেই ছাপিয়ে আমার মনকে ভাবিয়ে তোলে। যতদিন যায় মা মনমরা হয়ে ওঠে, সবার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, বাগানের দিকে চেয়ে আনমনা হয়ে বসে থাকে। দিন দিন আমার মা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে! এখানে আসার পর মা ছিল প্রাণবন্যায় ডগমগ। এখন কিন্তু তার চোখে কালি পড়েছে; চেহারার দিকে তার হুঁশ নেই, চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়। দোমড়ান ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়ায়। পরিপাটি ভাবটা যেন উবে গেছে। মাকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। মা থাকবে সুন্দর ভাবে ঝকঝকে তকতকে, মা হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর—এই ছিল আমার কল্পনা।

আমাকে পড়াতে বসলে মা অন্যমনস্ক হয়ে যায়; জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে ক্লান্ত স্বরে, আর তার জবাব আমি যা দিই, তা অনেক সময় ভুলে যায়। মায়ের মেজাজটা কদিন হল বড় খিটখিটে হয়েছে। কারণে অকারণে মা রেগে ওঠে, ধমকাতে থাকে। এ সব আমাকে আঘাত দেয়। মা হবে ন্যায়পরায়ণা রূপকথার গল্পের মায়ের মত—এটাই আমি চাই। মাঝে মাঝে আমি মাকে বলি, 'মা, তোমার কি আমাদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগছে না?'

মা ধমক লাগিয়ে বলত, 'তোর নিজের কাজ করগে।'

আমি একদিন টের পেলাম যে আমার দাদু এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন যাতে আমার মা ও দিদিমা দুজনেই ভয় পেয়েছে। প্রায়ই দেখতে পাই দাদু মায়ের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে কি সব বলে। দাদুর স্বর শুনে মনে হত যেন রাখাল ছেলে নিকানোরের কাঠের বাঁশির কিচকিচানি সুর ভেসে আসছে।

একদিন তো মা জোরে চীৎকার করে উঠে বলল, 'না, কক্ষনো নয়, না-না-না।'

এরপরে সদরের আওয়াজ ও দাদুর চীৎকার শোনা গেল। ঘটনাটা সন্ধ্যা-বেলায় ঘটেছে। দিদিমা তখন রান্না ঘরে বসে দাদুর জন্য একটা শার্ট সেলাই করছিল। সেলাই করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করছিল। সদরে ঠাস করে আওয়াজে দিদিমা কান পেতে কি যেন শুনল, তারপর বলল, 'হায় ভগবান! মেয়েটা ভাড়াটেদের ঘরে গেল!'

দাদু রান্না ঘরে দৌড়ে এসেছেন; এসে দিদিমার মাথায় ঘা কয়েক বসিয়ে দিয়েছেন। তারপর নিজের ব্যাথা পাওয়া হাতটায় হাত বুলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বুড়ী-ডাইনী! তোকে একটা কথা বললে পেটে সে কথা থাকেনা?'

দিদিমা মাথার টুপিটা ঠিক করতে করতে বলল, 'তুমি হলে একটা আস্ত বোকা। ভাব কি আমাকে? তোমার ভয়ে মুখ বুজিয়ে থাকতে হবে? এই বলে রাখলাম, তোমার মতলব যা টের পাব তা আমি ওকে জানিয়ে দেব…'

একথা শুনে দাদু দিদিমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর দমাদম করে তার মাথায় ঘুষি মারতে লাগলেন। দিদিমা বাধা দিল না। শুধু বলল, 'মারো, যত খুশি পার মেরে যাও, বোকা বুড়ো যত খুশি মার।'

আমি তাকের ওপর বসেছিলাম। এসব দেখে স্থির থাকতে না পেরে দাদুকে কম্বল, বালিশ, জুতো ছুঁড়তে লাগলাম। দাদু রেগে ছিলেন, তাই আমার দিকে চাইলেন না একবারও। দিদিমা মেঝেয় পড়ে গেল, আর দাদু তার মাথায় বেশ কয়েকটা লাথি মারলেন। শেষবেশ টাল সামলাতে না পেরে জলের একটা পাত্র উল্টে দিয়ে নিজেই চীৎপটাং হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে থুথু ছিটিয়ে ফুঁসতে লাগলেন। তারপর রান্নাঘর থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন সোজা ওপরে নিজের ঘরে। যন্ত্রণায় দিদিমা কাতরাচ্ছে। বেঞ্চটার ওপর কোনরকমে উঠে বসল। মাথার চুলের জট ছাড়াতে লাগল। তাক থেকে একলাফে আমি নীচে নেমে পড়লাম।

রাগতভাবে দিদিমা বলল, 'ঢের হয়েছে। নে, এবার এই বালিশ আর সব জিনিষগুলো ঠিক জায়গায় তুলে রাখ। বালিশ ছুঁড়ে বীরত্ব ফলানো হচ্ছে। তুই

যে কেন সব ব্যাপারে নাক গলাস! আর এই শয়তানটাও হয়েছে তেমনি। বুড়ো হয়েছে তবু যখন তখন মাথা গরম করে বসে।'

হঠাৎ দিদিমা একটা চীৎকার করে ওঠে। ভুরু কুঁচকে আমাকে ডেকে বলল, 'দ্যাখতো, এখানটায় খুব ব্যাথা করছে কেন?'

দিদিমার মাথায় ভারি চুলের গোছা সরাতেই আমার চোখে পড়ল। একটা চুলের কাঁটা দিদিমার মাথার চামড়ায় ঢুকে আছে। কাঁটাটা আমি টেনে তুলে ফেললাম। তখনই চোখে পডল আরেকটা কাঁটা অমনিভাবে বিঁধে আছে। আমার হাতের আঙ্গুলগুলো যেন আড়ষ্ট হল।

আমি বললাম, 'বরং মাকে ডেকে আনি। আমার খুব ভয় করছে।'

হাত ঝাঁকিয়ে দিদিমা বলল, 'কি বললি? মাকে ডেকে আনি? ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে দেখেনি বা শোনেনি এসব। আর তুই কিনা তাকে ডাকতে যাচ্ছিস! যা, এক্ষুনি বের হয়ে যা এখান থেকে!'

লেস বোনা দক্ষ আঙ্গুল দিয়ে চুলের গোছার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল কোথায় চামডায় কাঁটা বিঁধেছে। সাহস করে আমিও হাত চালিয়ে আরও দুটো কাঁটা টেনে বার করলাম।

'ব্যাথা লাগছে?'

'এমন কিছু নয়। কাল গরম জলে স্নান করলে সব ব্যাথা চলে যাবে।' তারপর আদরের সুরে দিদিমা আমাকে বলল, 'বোকা আমার, মানিক আমার, তোর মাকে গিয়ে আবার বলিসনা যে দাদু আমাকে এভাবে মেরেছে। এমনিতে দুজনাই দুজনার ওপর রেগে আছে। বুঝলি? বলিস না কক্ষনো।'

'না, বলবনা।'

'এই তো চাই! ভুলে যাসনি যেন! আচ্ছা, এবার এদিকটা একটু ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। দ্যাখতো আমার মুখে কোন দাগ আছে কিনা? নেই তো? ভাল। কোন গোলমাল নেই। একবারে ডেজি ফুলের মত তাজা।'

একথা বলে দিদিমা মেঝে মুছতে শুরু করল। আবেগের সুরে আমি বললাম, 'দিদিমা, তুমি যেন ঋষির মত। তোমাকে মারে, তোমার ওপর এত অত্যাচার করে, তবু তুমি নির্বিকার থাক, কখনো শোধ নিতে চাওনা।'

'দূর, বাজে বকবি না! আমি হলাম ঋষি! আচ্ছা লোককে শেষ পর্যন্ত ঋষি বানালি!'

বকতে বকতে দিদিমা ঘর মুছে চলল! দরজার কাছে সিঁড়িতে বসে আমি ভাবতে লাগলাম কিভাবে দাদুর কৃতকর্মের শোধ নেওয়া যায়।

আমার সামনে এই প্রথম দাদু দিদিমাকে মারধোর করল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার লাল চোখ দুটো আর তার মাথার উড়ু উড়ু লাল চুলগুলো। রাগে আমি জ্বলছি। কিছুতেই ভাবতে পারছিনা কিভাবে তাকে জব্দ করা যায়।

দুদিন বাদে ওপরে দাদুর ঘরে এলাম। একটা খোলা সিন্দুকের সামনে বসে দাদু কতকগুলো কাগজপত্তর বার করে দেখছেন। পাশেই রয়েছে তার প্রিয় সাধুদের ছবি সম্বলিত সেই পাঁজিটা। পুরু মোটা ছাইরঙের কাগজ। বারটা, বার মাসের জন্য। প্রতিটা কাগজে দিনগুলোর জন্য চৌকো চৌকো ঘর কাটা, আর

সেই ঘরেতে সাধুদের ছবি। এই পাঁজিটাকে দাদু মূল্যবান সম্পত্তি মনে করেন। যদি কখনো আমার ওপর তার দয়া হয় তবে একমাত্র আমাকেই পাঁজিটা দেখান। পাঁজির সেই ছোট ছোট বুড়োর ছবি দেখতে আমার বেশ ভাল লাগে; একটা আবেগে আমার মন ভরে যায়। এই সব সাধুদের কয়েকজনের জীবনীও আমি জানি। যেমন কিরিক, উলিতা, শহীদ ভারভারা, পানতেলেই মোন্ এবং আরো অনেকের। বিশেষভাবে ভগবানের অনুগত আলক্সেইয়ের করুণ জীবনী আমাকে বিচলিত করে তোলে। আমার দিদিমা ওঁর সম্পর্কে কত ভাল ভাল ছড়া কাটে। তা শুনে আমি আবেগে উথলে উঠি। পাঁজির কয়েকটা ছবির দিকে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। উপলব্ধি করি, পৃথিবীতে কোনকালেই শহীদের অভাব হয়নি।

সেদিনই আমি ঠিক করে ফেললাম যে পাঁজিটাকে আমি কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেব। ঈগল পাখির সীলমাহর দেওয়া একটা নীল কাগজ নিয়ে দাদু জানলার কাছে যেতেই আমি পাঁজির কতকগুলো পাতা মুঠো করে নিয়ে নীচে চলে এলাম। তার পর দিদিমার টেবিল থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে সোজা চলে এলাম উনুনের ওপর এবং সাধুদের মাথাগুলো কাটতে শুরু করে দিলাম। একসারি সাধুদের মাথা কাটতেই আমার মন দুঃখে ভরে গেল। তখন আর মাথা না কেটে চৌকো দাগ বরাবর কাটতে লাগলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সারিতে কাঁচি চালানোর আগেই দাদু এসে হাজির হলেন দরজার সামনে।

'কার হুকুমে পাঁজি নিয়েছিস?'

হঠাৎ তাকের ওপর ছড়ানো কাটা চৌকো কাগজগুলোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। মুঠো করে কাগজগুলো তুলে নিলেন। তাকিয়ে দেখলেন সেগুলো। একমুঠো শেষ হলে আরেক মুঠো। দাদু যখন ব্যাপারটা বুঝলেন তখন হাঁ হয়ে গেলেন। তার দাড়ি কেঁপে উঠল, আর ঘন ঘন নিশ্বাস নেওয়াতে কাগজের টুকরোগুলো উড়তে লাগল।

'এ কী করেছিস?' শেষ পর্যন্ত তার গলা দিয়ে একটা চীৎকার বেরিয়ে এল। কথাটা বলেই তিনি আমার পা ধরে হ্যাচকা টান দিলেন। আমি শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছিলাম, দিদিমা ধরে ফেলল আমাকে।

দাদুর গলা থেকে চীৎকার বের হয়ে এল, 'তোকে আমি খুন করব।'

হঠাৎ মা এসে হাজির হয়েছে। আমি একটা কোণে দাঁড়িয়ে, মা ঠিক তার সামনে। দাদু ঘুষি মারতে শুরু করল আমার ও দিদিমার মাথায়।

মা হাত দিয়ে ঘুষিগুলো ঠেকিয়ে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! মাথা ঠাণ্ডা কর। পাগলামি কোর না।'

জানলার পাশে বেঞ্চে বসে দাদু কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে! সব শত্রু! বাড়ি শুদ্ধ সবাই!'

রুক্ষ চাপা গলা শোনা গেল, 'হৈ চৈ বাধাতে তোমার লজ্জা করছেনা?'

দাদু চোখ বুজে, দাড়িটা ওপরের দিকে উঁচু করে লাথি ছুড়লেন। আমার মনে হল দাদু বুঝি আমার মায়ের সামনে হৈ চৈ করার জন্যই লজ্জিত হয়ে চোখ বুজে আছেন।

পাঁজির টুকরো কাগজগুলো হাত দিয়ে সমান করতে করতে মা বলল, 'ক্যালিকোর ওপরে আঠা দিয়ে সেঁটে দেব এগুলো। তখন পাঁজিটাকে আরো

সুন্দর দেখাবে, মজবুতও হয়ে যাবে। এমনিতে তো কাগজগুলো পুরনো হয়েছে, খসে পড়ছে।' পড়তে বসে আমি যখন বুঝতে পারতাম না, তখন যেভাবে মা আমাকে বোঝাত, তেমনি ভাবেই বলছিল। হঠাৎ দাদু উঠে দাঁড়ালেন, জামা প্যান্ট ঠিক করে নিয়ে একটু কেশে বললেন, 'ঠিক আছে আজকের মধ্যে যেন সেঁটে দেওয়া হয়। অন্যগুলো এনে দিচ্ছি।'

বাইরে যেতে যেতে দরজায় চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দাদু বললেন, 'ছেলেটাকে একবার ভাল মত পিটুনি দেওয়া দরকার।' আঙ্গুল তুলে আমার দিকে শাসানির ভঙ্গিতে বললেন।

'হ্যাঁ, তাই দরকার।' মা একথায় সায় দিল। আমার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, তোর কাণ্ডজ্ঞান সব ঘুচে গেছে?'

'আমি ইচ্ছে করে করেছি এসব। দাদু যদি আর কখনো দিদিমাকে মারে আমি তাহলে ওর দাড়ি উপড়ে নেব।'

দিদিমা গা থেকে ছেঁড়া ব্লাউজ খুলছিল। বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠল, 'এই তোর কাউকে না বলা! এই তোর কথা রাখার নমুনা! তোর জিভ ফুলে ঢোল হোক। আর কোনদিন যেন জিভ নাড়তে না হয়!'

দিদিমার দিকে একবার তাকিয়ে মা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কবে মেরেছে রে?'

দিদিমা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, 'ভারভারা, তোরও কী কাণ্ডজ্ঞান ঘুচে গেছে! ওকে এসব জিজ্ঞেস করছিস? আর তোর ওতে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?'

মা দিদিমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাগো, মা মণি আমার!'

'থাক্, ঢের হয়েছে। মা মণি না আর কিছু। আমি যাই এখন। দুজনে দুজনের দিকে তাকাল শুধু, তারপর সরে বসল। ওদিকে বাইরের ঘর থেকে ভেসে আসছে দাদুর পায়চারির শব্দ।

এখানে আসার পর থেকে ফৌজী লোকটার হাসিখুশি বৌয়ের সাথে মার ভাল ভাব জমেছিল। প্রায় সন্ধ্যায়ই মা ওর ঘরে যেত। বেৎলেংদের বাড়ির ভাল ভাল তরুণী আর অফিসাররা এখানে আসত। দাদু এটা পছন্দ করতেন না। প্রায়ই রাত্রে খেতে বসে চামচে নেড়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, 'আবার সেই খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি শুরু হয়েছে। যাক্, সব চুলোয় যাক্।'

কিছুদিন যেতে না যেতে তিনি সব ভাড়াটেকে উঠে যেতে বললেন। ভাড়াটেরা উঠে যেতে দু'গাড়ি আজেবাজে আসবাব নিয়ে এসে বোঝাই করলেন ফাঁকা ঘরগুলোতে, দরজায় তালা মারলেন। বললেন, 'দরকার নেই আমার ভাড়াটেতে। এবার থেকে আমি নিজেই লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব।

তারপর প্রতি রবিবার নিমন্ত্রণপর্ব শুরু হল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে লাগল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন দিদিমার মাসতুতো বোন মাত্রিওনা ইভনোভনা। এই হৈ চৈ করা ধোবানীর নাকটা প্রকাণ্ড। সিল্কের পোশাক পড়েন, সোনালী রঙের টুপী দেন মাথায়। তার সঙ্গে দুই ছেলে আছে। একজনের নাম ভাসিলি—সে নকশার কাজ করে। পরণে তার ছাই রঙের পোশাক, লম্বা তার চুল, হাসিখুশি মেজাজ। অপরজন ভিক্টর—ঘোড়ার মত মাথা, বসন্তের দাগওলা লম্বা মুখ। সদরে ঢুকে যখন সে জুতো থেকে রবারের ওভারসু খোলে তখন

ক্লাউনের মত পিনপিনে গলায় তার সুর শোনা যায়—আন্দ্রেই বাবা, আন্দ্রেই বাবা…

শুনে আমার আতঙ্ক হয়। ইয়াকভ-মামা তার গীটার নিয়ে আসে। আরেকজনও আসে। তার ঘড়ি মেরামতির ব্যবসা। টাক মাথা, একটা চোখ কাণা। ভারি চুপ চাপ লোকটা। পরনের লম্বা কালো কোটটার জন্যে তাকে মঠের সন্ন্যাসী বলে মনে হয়। ঘরের কোণে তার জায়গা বাঁধা। পরিস্কার কামানো চিবুকে একটা আঙ্গুল দিয়ে সে মাথা হেঁট করে বসে থাকে। রঙটা তার কালো, এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। কথা বলে কম, আর এক কথাই সে বার বার বলে 'সব ঠিক হবে—ব্যস্ততার কিছুই নেই।'

প্রথম দিন তাকে দেখে আমার অনেক দিন আগেকার (তখনও নোভায়া ষ্ট্রীটে আমরা থাকি) একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। একদিন শুনি রাস্তায় ড্রাম বাজছে। সেই বাজনায় একটা অশুভ বার্তা প্রচ্ছন্ন ছিল। বাইরে এসে দেখি প্রকাণ্ড একটা কালো গাড়ি ঘিরে একদল সৈন্য ও লোকজন। কয়েদীদের জেল থেকে ময়দানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ীর ভেতরে লাল গোল টুপী পরা একটা লোক ছিল, হাতে পায়ে তার শেকল বাঁধা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে শেকল ঝনঝন করে বাজছে। লোকটার গলা থেকে একটা কালো বোর্ড ঝুলছে। আর তাতে গোটা গোটা সাদা হরফে কী যেন লেখা রয়েছে।

লোকটা মাথাটা এমন ভাবে রেখেছে যাতে মনে হচ্ছে যেন সে ওই বোর্ডে কি লেখা আছে তা পড়তে চায়। ঘড়িওলার সঙ্গে মা আমার পরিচয় করিয়ে বলল, 'আমার ছেলে।' আমি পিঠের দিকে দুহাত রেখে পিছিয়ে এলাম।

একটা আতঙ্কজনক ভঙ্গিতে মুখের ভেতর হাঁ-টা ডান কান পর্যন্ত ছড়িয়ে লোকটা বলল, 'ব্যস্ত হয়ে কি লাভ?' তারপর আমার কোমরের বেল্টটা ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আমাকে উল্টে পাল্টে দেখল, ঠিক যেন জহুরীর দেখা। তারপর তারিফ করে বলল, 'না, ঠিক আছে। ছেলেটা শক্ত সমর্থ আছে।'

আমি চামড়ার একটা আর্ম চেয়ারে এসে বসলাম। চেয়ারটা এত বড় যে আমি তার মধ্যে অনায়াসে শুয়ে ঘুমতে পারি। দাদু প্রায়ই বলেন এটা নাকি প্রিন্স গ্রুজিনস্কির চেয়ার। চেয়ারে বসে আমি দেখলাম বড়দের একটু ফুর্তি করার জন্য কতরকম চেষ্টা করতে হয়। আর দেখলাম সেই ঘড়িওলার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কিভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। মুখটা তার তেলাল; কি যেন একটা জিনিষ গলে পড়ছে। সে যখন হাসতে থাকে তখন তার পুরু ঠোঁটটা ডানদিকে সরে যায় আর ঝোলের মধ্যে মাংসের টুকরো যেমন ভাসে তেমনি ভাসতে থাকে। কুলোর মত কান দুটো নড়তে থাকে। ভুরুটা কখনো ওপরে ওঠে, কখনো বা চোয়ালের হাড়ের দিকে সরে আসে। আমার মনে হয় যে, কান দুটোকে সে ভাঁজ করতে পারে। মাঝে মাঝে মুষলের মত গোল গাঢ় রঙের জিভটা চক্রাকারে ঘুরিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। দেখে শুনে যতটা মজা হল, তার চেয়ে ঢের বেশি খুশি হলাম। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারলাম না। অতিথিরা রম্-এর সঙ্গে চা খেল। পেঁয়াজ পুড়ে যাওয়ার মত গন্ধ বের হচ্ছিল পানীয় থেকে। দিদিমার তৈরি মদও তারা খেল। কোনটা সোনালী, কোনটা সবুজ আবার কোনটা আলকাতরার মত রঙ। খাবারের মধ্যে ছিল ভারেনেৎস, মধু আর পোস্ত দিয়ে তৈরী কেক। অতিথিরা ঘামতে লাগল আর দিদিমার

সুখ্যাতি করল। এক পেট খেয়ে মুখ লাল করে, আনন্দে চেয়ারে অলসভাবে হেলান দিয়ে ইয়াকভ-মামাকে গান গাইতে বলল। ইয়াকভ-মামা গীটারে সুর তুলে বিরক্তিকর খ্যানখ্যানে গলায় শুরু করল :

'হায়রে পূর্ণতায় ভরা সে এক জীবন
উন্মাদনা এল তায় অকারণ ;
কাজান মেয়েটিরে দেখেছে সবাই,
তাকে বলেছি যা' ছিল মনে, সব কথাই।'

বিষণ্ণ লাগল গানটা। দিদিমা বলল, 'অন্য একটা গান ধর ইয়াকভ ; যাকে বলে সত্যিকারের গান। মত্রিয়া, তোর মনে পড়ে, কত সব গান শুনতাম?'

ধোবানী বেশ ভারিক্কী চালে বলে, 'বোন, সে সব গান আর শোনা যায় না। আজকালকার গানই যেন পাল্টে গেছে।'

ইয়াকভ-মামা আধখোলা চোখে এমনভাবে দিদিমাকে দেখল যাতে মনে হল দিদিমা যেন অনেক অনেক দূরে রয়েছে।

গান তার বন্ধ হয়নি। গীটারের বাজনা আর তার ঐ হেঁড়ে গলার গান চলতে থাকে।

ঘড়িওলার সঙ্গে দাদু আলাপ করছেন আর মাঝে মাঝে কী যেন হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন। ঘড়িওলা মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল আর তার মুখে একটা ধীর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। অন্যদিনের মত মা সের্গেয়েভদের পাশে বসে ভাসিলির সঙ্গে কথা বলছিল। ভাসিলি চাপা গলায় বলছিল, 'কথাটা ঠিক ; তবে ভেবে দেখতে হবে।'

ভিক্টর পরিতৃপ্তির হাসি হাসছিল, আর মেঝের ওপর পা ঘষে, সরু গলায় গাইতে লাগল, 'আন্দ্রেই বাবা, আন্দ্রেই বাবা…'এ গান শুনে সবাই অবাক হয়ে তাকাল।

ওর মা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল। গর্বিত মনে হল তাকে। বলল, 'এসব থিয়েটারের গান। আজকাল থিয়েটারে এ ধরণের গান হয়!'

এই ধরণের দু' একটা রবিবার পার না হতেই এক রবিবারের দুপুরে ঘড়িওলা এসে হাজির। পূর্বাহ্নকালীন উপাসনা শেষ হয়েছে, মায়ের ঘরে বসে আমি মাকে সাহায্য করছি! মা পুরনো পুঁতির কাজ করা এমব্রয়ডারি থেকে সুতো খুলছিল। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল বাইরে থেকে। দিদিমার মুখটা একবার ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। আর সেই সময়ের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ভারিয়া, সে এসেছে রে!'

মা যেমন বসেছিল, তেমনিই বসে রইল। তার মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন এলোনা। দরজাটা আবার খুলে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'ভারভারা, এখনি তৈরি হয়ে এস আমার সঙ্গে।'

মা তেমন ভাবেই বসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এস না। ঈশ্বর তোমার সহায় হন। এ নিয়ে তর্ক কোর না। সবদিক দিয়েই ভাল এই লোকটি। চৌকষ, কর্মীলোক আর লেক্সেই-এরও সত্যিকারের বাপের কাজ করতে পারবে।'

দাদু খুব গুরুত্ব সহকারে বলছেন, আর উরুতে হাত বুলোচ্ছেন। এটা দেখে

মনে হচ্ছে যেন মা'কে থাবা বাড়িয়ে ধরতে চান, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন।

মা শান্তভাবে জবাব দিল, 'না তা হয়না। আমি তো বলেই 'দিয়েছি, এ হবার নয়।'

দাদু দু-হাত বাড়িয়ে দুম দুম শব্দে মায়ের দিকে তেড়ে মেরে এসে বললেন, 'আসবি তো আয়, নইলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব।'

মা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তার ফ্যাকাশে। চোখ দুটোতে কুটিলতার ছাপ। গা থেকে স্কার্ট খুলে ফেলল মা। তার পরিধানে শুধু একটা পেটিকোট ছাড়া আর কিছুই রইল না। এমনি অবস্থায় দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস এবার! টানতে টানতে নিয়ে যাও আমায়।'

দাঁত কড়মড়িয়ে দাদু বললেন, 'ভাল হচ্ছেনা ভারভারা, শিগগির জামা কাপড় পর বলছি।'

দাদুকে সজোরে সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মা। চীৎকার করে বলল, 'কই আসছ না যে? চল!'

দাদু রেগে উঠলেন। বললেন, 'তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভয় পাইনা। চল।'

মা দরজা খুলে ফেলল। মা'র পেটিকোটটার একধার ধরে দাদু বসে পড়লেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'ওরে শয়তানী, এভাবে তুই মুখে চুনকালি দিসনা!'

দিদিমা মায়ের পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতর মাকে নিয়ে গেল, মুরগীকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি। বিড়বিড় করে বলল, 'ভারভারা, তোর কী বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ হয়েছে রে· লজ্জা শরমের মাথা খেয়েছিস হতভাগী।'

মাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা এঁটে দিল। তারপর একহাতে দাদুকে টেনে তুলে বলল, 'বুড়ো, তোমার ভীমরতি হয়েছে।'

দাদুকে তুলে ডিভানের ওপর বসিয়ে দিল দিদিমা। কাপড়ের পুতুলের মত দাদুর মাথাটা শিথিল হল; মুখটা হাঁ হয়ে গেল। মার দিকে তাকিয়ে দিদিমা ধমকে উঠল, 'জামা কাপড় পরে নে না! হাঁ করে দেখছিস কি?'

স্কার্ট আর ব্লাউজটা মেঝে থেকে কুড়োতে কুড়োতে মা বলল, 'আমি ওই লোকটার কাছে যাব না কিন্তু।'

আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে দিদিমা বলল, 'একটা পাত্র করে খানিকটা জল নিয়ে আয় তো ·· শিগগির আসবি।'

দিদিমার কথা বলাটা ছিল খুব চাপা গলায় কিন্তু আদেশের ভঙ্গি ছিল তাতে। একছুটে আমি বারান্দায় এলাম। সেখান থেকে টের পেলাম সামনের ঘরে কে যেন পায়চারি করে চলেছে। এও শুনলাম মা বলছে, 'আমি কাল এ বাড়ি থেকে চলে যাব।'

স্বপ্ন চালিতের আমি রান্না ঘরের জানলায় এসে বসলাম।

দাদুর গলার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। দিদিমা ফিস্‌ফিস্ করে বলে চলেছে। দরজা বন্ধের আওয়াজ হল। তারপর নিস্তব্ধ, থমথমে ভাব। হঠাৎ মনে পড়ল আমাকে কেন এখানে পাঠান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি এক পাত্র জল নিয়ে এলাম বাইরের ঘরে। দেখতে পেলাম বাড়ির সামনের দিক থেকে ঘড়িওলা বেরিয়ে আসছে

আর ফারের টুপিটায় টোকা দিচ্ছে। ভাঙা গলায় সে কাতরাচ্ছে। ঘড়িওয়ালার পেছনে পেছনে দিদিমা আসছে। হাত দুটো পেটের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে শান্তভাবে বলছে, 'ব্যাপারটা বুঝছেন তো? কাউকে তো আর জোর করে ভাল লাগান যায়না!'

ঘড়িওলা দরজা পেরিয়ে উঠোনে এল। দিদিমা ওখানে দাঁড়িয়েই ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। তার সারা শরীরটা কাঁপছিল। দিদিমা হাসছে না কাঁদছে তা মালুম হলনা আমার। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল?'

এক ঝটকায় জল ভর্তি পাত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে দিদিমা বলল, 'জল আনতে কোন রাজত্বে গিয়েছিলি? দরজা বন্ধ কর।' জল ছলকে পড়ল আমার পায়ে।

দিদিমা মায়ের ঘরে চলে গেল, আমি এলাম রান্নাঘরে। সেখান থেকে শুনতে পেলাম মায়ের ঘর থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। যেন ঘরেতে সবাই কোন ভারি জিনিষ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

ভারি সুন্দর দিনটা। শীতের রোদ্দুর জানলার শার্সী ভেদ করে ঘরে এসে পড়ে। টেবিলে বিকেলের খাবার সাজানো। সীসে মেশান টিনের তৈরী ডিস আর কাঁচের পাত্রগুলো ঝক্মক্ করছে। কাঁচের পাত্রে আছে সোনালী কভাস পানীয়। দাদুর তৈরি মেঠো ফুলের গন্ধযুক্ত ভদ্কাও রয়েছে। জানলার শার্সীর তুষার গলে গেছে। সেখান দিয়ে আমি দেখলাম, বাড়ির ছাদে বরফ জমেছে। চক্মক্ করছে রূপোলী টোপর মাথায় বেড়াগুলো আর পাখির বাসা।

খিলেনে আমার ধরা পাখিগুলো খাঁচায় ঝুলছে। রোদ্দুর এসে পড়েছে তাতে। মনের আনন্দে চেফিঞ্চ পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। বুলফিঞ্চের দল ছুটোপাটি করছে আর গোল্ডফিঞ্চগুলো গান জুড়েছে। এই সুন্দর দিনের আনন্দ ও উজ্জ্বলতার কোন ছাপ আমার মনে দাগ কাটতে পারছেনা। এটা একটা অযাচিত দিন, এর সবই অযাচিত মনে হয়। ইচ্ছে করে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিই, দিতামও তাই। খাঁচা খুলতে যাব, এমন সময় দিদিমা এসে হাজির হল তড়িঘড়ি।

উনুনের ধারে এগিয়ে গেল দিদিমা। বলল, 'হায় পোড়া কপাল! বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে গা।' বলতে বলতে দিদিমা উনুনের ভেতর থেকে 'পিরোগ' টেনে বার করল। ওপরের পোড়া ছালটায় টোকা মারল। তারপর মুষড়ে পড়ল।

'ইস্ একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোদের জ্বালায় কি কিছু করার জো আছে। রাক্ষসের গুষ্টি, তোদের ঝড়ে উড়িয়ে নেয়না কেন রে! বন্যায় ভাসায় না কেন তোদের। অমন প্যাঁচার মত মুখে তাকিয়ে দেখছিস কি? ভাঙ্গা কলসির টুকরোর মত তোদের সব কটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলে তবে আমার শান্তি!'

দিদিমা কাঁদতে শুরু করল। পিরোগটা উল্টে পাল্টে দেখছে আর পোড়া ছালে টোকা লাগাচ্ছে। চোখের জলে পোড়া পিরোগটা ভিজে যাচ্ছে।

মা ও দাদু রান্নাঘরে ঢুকল। পিরোগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল দিদিমা। টেবিলের ডিসটা ঝন্ঝন্ করে উঠল। দিমিমা ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'দেখ, কি হল এটার। তোমাদের দোষেই তো এসব হল। তোমরা উচ্ছন্নে যাও।'

মায়ের মেজাজটা শান্ত হয়েছে। মনটাও ভাল। দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করল। দাদুকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তিনি মনে মনে খুব দমে গেছেন।

দিদিমার চোখে রোদ এসে পড়েছে। চোখ পিট্ পিট্ করে বলল, 'যা হবার তা হয়েছে। প্রভু এমনটিই করেন। তিনি একটু কৃপণ স্বভাবের। কয়েক বছরেরটা শোধ দেয় এক মুহূর্তে। সুদের ধার ধারেন বলে মনে হয়না। বস ভারিয়া, যা হবার তা হয়েছে।'

দাদুকে কেমন যেন অভিভূতমনে হল। খেতে বসে শুধু ঈশ্বরের কথা বললেন। বললেন অধার্মিক আহার-এর কথা ; আর বাপ হলে যে কত কিছু সহ্য করতে হয় ও কত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তা বলতে থাকলেন। দিদিমা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'হয়েছে বাপু, হয়েছে। 'বক্‌বক্ না করে খাওয়ায় মন দাও।'

মা হাসছে। চক্‌চকে মনে হচ্ছে তার চোখ দুটো। আমাকে কনুয়ের গুতো মেরে মা বলল, 'কি, ভয় পেয়ে ছিলি তো ?'

আমি যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। এখনই বরং অস্বস্তি লাগছে, কিছুতেই বুঝছিনা আমার কি হয়েছে।

প্রতি রবিবারের মত অনেক খাওয়া হল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই মাত্র আধ ঘন্টা আগে এই লোকগুলো নিজেদের ভেতর কি প্রচণ্ড গণ্ডগোল করছিল। কিন্তু এখন কিছু নেই। আমার মনে হল এদের কাছে বোধহয় এসবের কোন গুরুত্ব নেই। এদের স্বভাবই এই। কান্নাকাটি, চোটপাট, আবার পরের মুহূর্তে কিছুই নেই। কতবার এ-ধরণের ঘটনা ঘটেছে, আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রথম প্রথম এ-ধরণের ঘটনায় মনে দাগ কাটত ; এখন আর কিছু হয় না।

অনেক কাল বাদে আমি বুঝেছি রুশ দেশে এহেন জীবনই স্বাভাবিক। একদিকে দারিদ্র, অন্যদিকে বৈচিত্রহীনতা। তাই তারা এভাবেই জীবনের দুঃখকে ভুলতে চাইত দুঃখের মধ্যে দিয়ে ! জীবনে যদি বৈচিত্র না থাকে, তবে দুঃখকেও আশীর্বাদ বলে মনে হয়। ঘরে আগুন লাগলেও তা উপভোগের দৃশ্য হয়ে যায়। আঁচিল হয় ভাবলেশহীন মুখের শোভা··

এগার

এই ঘটনার পর থেকে আমার মায়ের প্রতাপ আরো বেড়ে গেল এ বাড়িতে। আমার মা-ই এ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে উঠল। দাদু অনাবশ্যকভাবে যেন মিইয়ে পড়লেন, একদম চুপচাপ হয়ে গেলেন।

দাদু আর এখন বাড়ি থেকে বের হন না। ওপরের ঘরে একা একা বসে তিনি বই পড়েন। বইয়ের নাম, 'আমার বাবার লেখা থেকে'। বইটা তিনি যত্ন করে রাখেন—সিন্দুকের ভেতর চাবি দিয়ে। অনেকবার দেখেছি, বইটা বের করার আগে তিনি হাত ধুয়ে নেন। বইটা ছোট, পাটকেলে রঙের চামড়ায় বাঁধান। নীলরঙের পরিচয়পত্রে লেখা ছিল, 'আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাসহ পরমপূজনীয় ভাসিলি কাশিরিন্‌কে।'

লেখার নীচে যে নাম সই করা আছে তা ছিল বড় অদ্ভুত। সইয়ের শেষে একটা উড়ন্ত পাখির অলঙ্করণ রয়েছে। দাদু বইটা হাতে দিয়ে অতি সাবধানে চামড়ার বাঁধাই আবরণ খুলে চোখে রূপোর ফ্রেমের চশমা এঁটে পড়তে থাকেন। কখনও তার নাকটা কুঁচকে তিনি চশমা ঠিক করেন। এ বইয়ের কথা অনেকবার আমি জিজ্ঞেস করেছি। প্রতিবারই তিনি বলেছেন, 'এখনো তোমার জানার সময় আসেনি। সবুর কর, মরার সময় তোমায় এ বইটা দিয়ে যাব আর আমার রেকুনের লোমের কোটটাও দেব।'

মায়ের সাথে আজকাল আর দাদুর তেমন কথাবার্তা হয় না। যা-ও বলেন অতি নম্রভাবেই বলেন। মা যখন কিছু বলে তখন দাদু মন দিয়ে শোনেন ; তারপর বিড়বিড় করে জবাব দেন, 'যা খুশি কর...'

তার ট্রাঙ্কে নানা ধরণের দামী আর অদ্ভুত সব পোষাক জমা আছে। সিল্কের সার্ট, সাটিনের জ্যাকেট রেশমী রূপাখচিত সারাফান, কিকা ও কোকোন্নিক, উজ্জ্বল সব রুমাল ও স্কার্ফ, মর্দোভীয় হার ও বিচিত্র সব পাথর ও পুঁতি। জিনিষগুলো তিনি মায়ের ঘরে নিয়ে এসে যখন টেবিলে রাখতেন তখন মা প্রশংসা করলে তিনি বলতেন, 'আজকাল কি আর লোকে এমন সাজপোশাক পরে। আমাদের সময়ে সাজপোশাকের যেমন ঘটা ছিল, তেমনি খুব দামী আর চমৎকার পোশাক পরত। তবে সাজপোশাকে বাহার থাকলেও মানুষের জীবন ছিল সাদাসিধে। অনেক বেশি মিলে মিশে থাকত। এগুলো তোর কাছেই রইল ; খুশিমত ব্যবহার করিস।'

একদিন কয়েক মুহূর্তের জন্য মা বের হয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর ফিরে এল ; পরনে সোনালী কাজ করা নীল রঙের সারাফান আর মুক্তাখচিত কিকা। দাদুর সামনে মাথা নুইয়ে বলল, 'মাননীয়ের কি এ পোশাক পছন্দ হচ্ছে— ?'

দাদু যেন খুশিতে ফেটে পড়লেন। মার চারপাশে ঘুরে ফিরে হাত পা নেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'ওরে ভারভারা, যদি তোর টাকা থাকত আর কাছাকাছি ভাল মানুষ থাকত!'

মা বাড়ির সামনের দুটো ঘরে থাকত। প্রায়ই অতিথি আপ্যায়ন করত। অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনাগোনা করত মাক্সিমোভ-ভ্রাতৃদ্বয়। একজন পিওতর, প্রচণ্ড শরীর আর সুন্দর চেহারার একজন অফিসার, তার মস্ত সোনালী দাড়ি আর নীল চোখ। ঐ ভদ্রলোকের টাকে থুথু ফেলার অপরাধে দাদু আমাকে মেরেছিলেন। অন্যজন হল ইয়েভগেনি,—ফ্যাকাশে লম্বা চেহারা, সরু লম্বা ঠ্যাঙ, ছুঁচলো ছোট কালো দাড়ি চোখ দুটো যেন কুলের মত। সোনালী বোতাম আর দু'কাঁধে সরু সরু সোনালী প্রতীক চিহ্ন দেওয়া। সে সব সময়ে সবুজ পোশাক পরে। মাথায় লম্বা চুল, ওগুলো কপালে এসে পড়ে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো প্রায়ই সরিয়ে নেওয়া ও মাতব্বরী চালে হাসাটা হল তার অভ্যাস। আর সব ব্যাপারেই সে একটা কথা বলে, 'আমি যেভাবে ব্যাপারটা দেখি তা হল…'

মা আধবোজা চোখে মন দিয়ে লোকটার কথা শোনে আর প্রায়ই হেসে উঠে বলে, 'ইয়েভগেনি ভ্যাসিলিয়েভিচ, কিছু মনে করবেন না, আপনি বোধহয় এখনো ছেলেমানুষ আছেন।'

হাঁটুতে হাত চাপড়ে মাকে অফিসার ভদ্রলোকটি বলেন, 'ঠিক কথা, একেবারে ছেলেমানুষ।'

বড়দিনের ছুটিটা বেশ আনন্দেই কাটল। মা তার বন্ধুদের নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় ভাল পোশাক পরে বেড়াতে যেত। মায়ের পোশাকটায় জৌলুষ ছিল সব চেয়ে বেশি।

এই দলটা বাড়ি ছেড়ে বাইরে বের হলেই বাড়িটায় একটা গভীর বিষণ্ণতা বিরাজ করত। মনে হত, বাড়িটা যেন অন্ধকারে ডুবে গেছে। হাঁসেরবুড়ো

মত নিঃশব্দে বেরিয়ে দিদিমা ঘরগুলো ঝাড়া-মোছা করত, আর দাদু উনুনে হেলান দিয়ে পিঠ গরম করতে করতে আপন মনে বলত, 'থাকুক, যেভাবে খুশি, দেখিয়ে দিয়ে কী হবে…'

বড়দিন শেষ হলে আমাকে ও মিখাইল-মামার ছেলে সাশাকে মা একসঙ্গে স্কুলে ভর্তি করাল। সাশার বাবা আরেকটা বিয়ে করেছে, তাই ওর সৎ-মা ওকে দুচোখে দেখতে পারেনা। ছেলেটাকে সৎ-মা এমন মার মারত যে দাদুকে অনেক বলে কয়ে তবে দিদিমা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে।

মাস খানেক আমরা স্কুলে গিয়েছিলাম। একমাস স্কুল গিয়ে আমার মনে হয়েছে এইটুকুই শিখেছি, যে আমাকে যদি নাম জিজ্ঞেস করা হয় আর আমি যদি জবাব দিই 'পেশ্‌কভ' তবে তা ঠিক হবেনা ; বলতে হবে, 'আমার নাম পেশ্‌কভ।' আর মাষ্টারমশাইকে এইভাবে কখনো বলা উচিত নয় যে, 'আমার ওপর চোটপাট করিস না, আমি তোকে একটুও ভয় পাই না।'

স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু মামাতো-ভাইয়ের তা নয়। গোড়া থেকেই তার স্কুল ভাল লেগেছে ; তাছাড়া বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকের সাথে। একদিন হল কি, ক্লাশে সে ঘুমিয়ে পড়ে চীৎকার করল, 'না, কক্ষনো নয়!' তারপর জেগে উঠে মাষ্টারমশাইকে বলে ক্লাশ থেকে চলে যায়। এ ব্যাপারটা নিয়ে ছেলেরা তাকে অনেক ক্ষেপিয়েছে।

পরদিন সেন্নায়া স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আজ তুই যা, আমি একটু একাই বেড়িয়ে আসি।'

বরফের মধ্যে বইগুলো চাপা দিয়ে সে চলে গেল। জানুয়ারী মাসের উজ্জ্বল দিন। ঝক্‌ঝক্ করছে সূর্যের আলো, যেন পৃথিবীটা হাসছে। মামাতো ভাইকে দেখে আমার হিংসা হল। কিন্তু মার কথা ভেবে আমি স্কুলেই গেলাম। সাশা যে বইগুলো বরফচাপা দিয়ে রেখেছিল তা যেকোন মুহূর্তে চুরি হতে পারত এবং তাই হল। ফলে দ্বিতীয় দিন সে স্কুলে গেল না। কারণ বই খোওয়ানর জন্য তার স্কুলে যাওয়া হল না। তিন দিনের দিন স্কুল পালানর ব্যাপারটা দাদু বুঝতে পারলেন।

দুজনেরই ডাক পড়ল বিচারের জন্য। আমাদের জেরা করার জন্য দাদু, দিদিমা ও মা বসলেন রান্নাঘরের টেবিলে। দাদুর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সাশা এমন সব কথা বলল যা আমার আজো মনে আছে।

'তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুল গেলেনা, ব্যাপারটা কি ?'

ভয়ে ভয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে সাশা বলল. 'স্কুলের পথ ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি।'

'তা লেক্সেইয়ের সঙ্গে গেলে না কেন ? সে তো আর পথ ভোলেনি ?'

'তাকেও তো আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম…'

'লেক্সেইও হারিয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ'

'কী ভাবে হারাল ?'

একটু ভেবে সাশা বলল, 'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না ; কী ভয়ানক তুষারঝড় উঠেছিল যে…'

তুষারঝড়ের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল, কারণ সেটা ছিল রোদ্দুরে ঝকঝকে একটা উজ্জ্বল দিন। সাশা নিজেও মুচকি হাসল। দাদু উপহাসের সুরে বলল, 'তা তুমি লেক্সেইয়ের হাত বা কোমরের বেল্ট শক্তভাবে চেপে ধরতে পারতে।'

'আমি তো ধরেছিলাম কিন্তু বাতাসের যা ধাক্কা তাতে আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম।'

ধীরে ধীরে হতাশভাবে কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে সে। নিস্ফল, এলোমেলো মিথ্যে কথায় আমি অস্বস্তি বোধ করি। সাশার এ ধরণের আচরণের কোন মানে বুঝি না।

সেদিন দুজনেই আমরা মার খেলাম। দমকলের একজন অবসর পাওয়া লোককে রোজ আমাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাখা হল। লোকটার এক হাত মুচকে গিয়েছিল। সাশার ওপর নজর রাখতে তাকে বলা হয়েছিল, সাশা যেন কিছুতেই জ্ঞানের পথ থেকে সরে না যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থাও ব্যর্থ হল। পরদিন স্কুলে যাচ্ছি, যাওয়ার পথে পার্কের সামনে আসতেই সাশা জুতোজোড়া খুলে এক পাটি ডান দিকে অন্য পাটি বাঁ দিকে ফেলল। তারপর মোজা পায়ে ছুট দিল পার্কের ভেতর। বুড়ো লোকটা ঘাবড়ে গেল। ভয়ও পেল সে। অবশেষে জুতোজোড়া খুঁজেপেতে কুড়িয়ে নিয়ে, আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

এরপর সারাটা দিন ধরে দাদু, দিদিমা ও মা সাশাকে পলাতক আসামীর মত খুঁজতে লাগল। সন্ধ্যায় মঠের কাছে চিরকোভের শুঁড়িখানার সামনে তাকে পাওয়া গেল। সে ওখানে ক্রেতাদের সামনে নেচে তাদের মনোরঞ্জন করছিল। এ দৃশ্য দেখে সবাই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে কিছু বলাও গেল না। তাকের ওপর আমার পাশে শুয়ে সে নীচু গলায় বলল, 'আমার সৎ-মা আমায় দেখতে পারে না, বাবাও তাই, ঠাকুর্দা আমাকে ভালবাসেনা। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করব কোথায় ডাকাতরা থাকে। জেনে নিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কীসের জন্য থাকব এখানে? তখন আমার কথা ভেবে কষ্ট হবে, দেখিস! চল না, দুজনেই যাই এক সাথে, যাবি?'

আমার তখন মানসিক অবস্থাটা বাড়ি ছেড়ে পালাবার মত ছিল না। কেননা আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমি লেখাপড়া শিখব—একজন সোনালী দাড়িওলা অফিসার হব। মামাতো-ভাইকে আমার মনের কথা জানাতেই সে সায় দিল। বলল, 'ঠিক আছে, তুই অফিসার হবি আর আমি ডাকাত দলের সর্দার হব। এরপর হয় তুই মরবি না হয় আমি মরব। তুই হয় ধরা পড়বি নয় তো আমি। আমি কিছুতেই তোকে খুন করব না।'

'আমিও তোকে খুন করব না।'

এভাবে একমত হওয়ায় আমাদের আলোচনা শেষ হল।

দিদিমা ঘরে ঢুকল। উনুনের ওপরের তাকে শুয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে লাগল, 'মাণিকরা, বাপ-মায়ের আদর না পাওয়া দস্যি ছেলেরা…'

আমাদের জন্যে দিদিমার অনেক দরদ ছিল। সেই দরদভরা মন নিয়ে সাশার সৎ-মার নিন্দে করল; সাশার সৎ-মা মোটা নাদেজ্দা হল গিয়ে এক শুঁড়িখানার মালিকের মেয়ে। সাশার সৎ-মার কথা বলতে বলতে দিদিমা সব সৎ-মা আর সৎ-বাপের নিন্দে করতে লাগল। কথায় কথায় শুরু করল জ্ঞানী-

ঋষি আয়োনের গল্প। আয়োন তখন খুব ছোট, কিন্তু তখনই তিনি নিজের সৎ-মার ওপরে ভগবানের ন্যায়বিচারের দণ্ড নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। আয়োনের বাপ ছিল সাদা হ্রদের জেলে ; আর তার ছিল এক দজ্জাল বৌ। সে তাকে টেনে এনে ছিল সর্বনাশের পথে।

একদিন তাকে ছলাকলায় ভুলিয়ে মদ খাওয়াল, মদের নেশায় বেহুঁস করে ঘুম পাড়াল।

ওক কাঠের তৈরি এক ডিঙির মধ্যে, কফিনের মত সরু আর অন্ধকার এক ডিঙিতে তুলে নিল তার অচেতন শরীরটা। মেপ্‌ল কাঠের দাঁড় টেনে নৌকো বেয়ে নিয়ে চলল নিজে। সে চলতে থাকে যেখানে জল ফুঁসছে আর অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এক লজ্জাহীনার নিষ্কৃতির অপেক্ষায়। ডিঙি থেকে ঝুঁকে, দুলিয়ে, নড়িয়ে, উল্টে দিল সেটা। কেউ জানলনা, হ্রদের অতলে পাথরের মত তলিয়ে গেল ওর স্বামী।

এরপর সর্বনাশী ফিরে এল সাঁতার দিয়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ে মরাকান্না শুরু করল। মৃতের নামে চীৎকার করে হাঁকাহাঁকি করল। যে স্বামীকে সে খুন করল, তার জন্যই মায়াকান্না কাঁদতে লাগল।

গাঁয়ের লোকেরা সবাই দুঃখ প্রকাশ করল। বিধবার বেশ দেখে তার জন্যে সবাই চোখের জল ফেলল। এত কম বয়সে বিধবা হওয়ায় আর অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় সবাই তাকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, ঈশ্বরের বিধান কেউ বদলাতে পারে না, মানুষের জন্মমৃত্যু তারই হাতে।

কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন মাত্র এই মায়াকান্নায় গলেনি। সে হল তার সতীনের ছেলে আয়োনুশ্‌কা। সে সৎ-মার বুকে হাত রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করিনা ; তুমি কুচক্রী, রাত্রিচরা পাখির মত সুখপিয়াসী, তুমি বিশ্বাসহন্তা! তোমার ঐ মায়াকান্না কোন মতেই আমায় টলাতে পারবেনা। তুমি বাইরে যতই দুঃখের ভাব দেখাও, ভেতরে ভেতরে তুমি আনন্দ পেয়েছ। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড নেমে আসুক। কেউ একটা ছুরি ছুঁড়ে দিক আকাশে। যদি আমি অপরাধী হই তবে আমার বুকে ছুরি বিঁধে যাক, আর যদি তুমি হও তো তোমার বুক বিদ্ধ হোক ছুরির ফলায়।

একথা শুনে সৎ-মা ধীরভাবে মুখ ফেরাল। তার চোখে হিংস্রতার ছাপ। সে উঠে দাঁড়াল ; তীব্র ব্যঙ্গ করে বলল, 'নির্বোধ না হলে এমন হতে পারে। শয়তানীর গর্ভে জন্ম হয়েছে তো! তুমি তোমার মায়ের গর্ভপাত! পাপের কথা বলছ! মিথ্যে কথা বলছ। তুমি কোন পাপচক্রান্ত করেছ?' যারা দাঁড়িয়ে শুনছিল এসব কথা তারা বুঝল, 'ব্যাপারটা অমঙ্গলে ভরা।'

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল ; বুকের ভেতরটা তাদের ভারী হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে তারা চাপা স্বরে আলোচনা করল ব্যাপারটা।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একজন জেলে। অভিবাদন করে সে বলল, 'এখানে যারা সৎ আছ তাদেরকে বলছি। সেই ধারাল ছুরি এনে দাও আমাকে ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, ছুরিটা নিয়ে আমি আকাশে ছুঁড়ব। তারপর ছুরি আপনা থেকে পাপীর বুক বিদ্ধ করবে। খুন হবে পাপী।

ছুরি নিয়ে আসা হল। বুড়ো তার এক মাথা পাকাচুল ঝাঁকিয়ে ছুরিটা ছুঁড়ল আকাশে। ঘন নীল আকাশে ছুরিটা মিলিয়ে গেল।

তারা ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল। অপেক্ষা করল কখন ছুরি নেমে আসবে তার জন্য। টুপি খুলে তারা সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াল; রাত্রি হল। হ্রদের ওপারে ঊষার রক্তিম আলপনা এঁকে দিয়ে গেল কে। সং-মার উল্লাসের শেষ নেই! এমন সময় বাবুই পাখির মত নেমে এল সেই ছুরি সুদূর আকাশ থেকে। তীরের মত বিদ্ধ করল সং-মার বুক।

ধার্মিক লোকেরা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করল, 'জয় হোক ঈশ্বরের বিধান!'

তারপর সেই বৃদ্ধ এল আয়োনুশ্‌কার কাছে। তাকে এক আশ্রমে নিয়ে গেল। সেই আশ্রম ছিল কেরজেনৎস নদীর ধারে। অনেক দূরে, যেখানে রয়েছে রূপকথার সহর কিতেজ···'

পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি গায়ে আমার লাল গুটি বেরিয়েছে; আমি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছি। বাড়ির পিছনদিকে এক চিলে কোঠার ঘরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হল। বহুদিন আমি সে ঘরে থাকলাম। চোখ বন্ধ করে হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমি রইলাম। দুঃস্বপ্নে কাটল আমার দিনগুলো। দুঃস্বপ্ন দেখে একদিন মরতে বসেছিলাম। বাইরের লোক বলতে দিদিমাই একমাত্র আসত আমার কাছে। চামচ করে খাইয়ে দিত আমাকে, রূপকথার গল্প বলত। একদিন সন্ধ্যায় একটা কাণ্ড ঘটল। তখন আমি বেশ সেরে উঠেছি, আমার হাতে পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র হাতে দস্তানা পরিয়ে রাখা হয়েছে, যেন আমি মুখচোখ না চুলকিয়ে ফেলি। নির্দ্দিষ্ট সময় বয়ে গেল, দিদিমা তখনো এলনা। এতে আমার কেমন যেন ভয় ভয় হল। হঠাৎ মনে হল, চিলে-কোঠা থেকে সিঁড়িতে নামবার মুখে একটা ধূলোভর্তি জায়গায় দিদিমা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুহাত ছড়ান, ঘাড়ে একটা ক্ষতচিহ্ন, পিওতর-কাকার যেমনটি দেখেছি। ধূলো আর নোংরা কোণ থেকে এক প্রকাণ্ড বেড়াল জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখে তাক করে আছে।

বিছানা থেকে নেমে পা আর কাঁধ দিয়ে গুতো মেরে আমি জানলার সার্শি ভেঙে ফেললাম। বাইরে জানলার নীচে বরফ জমেছিল, তার মধ্যেই পড়লাম। সন্ধ্যায় মা অতিথি অভ্যাগত নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই কাঁচ ভাঙার শব্দ কানে গেল না। আমার হাড় ভাঙেনি, শুধুমাত্র কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে, আর ভাঙা কাঁচে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সারা শরীর। আমার পা পঙ্গু হয়ে গেল! তিন মাস আমি হাঁটতে পারলাম না। নিজের ঘরে চুপ-চাপ শুয়ে শুনতাম বাড়ির মধ্যে রোজকার জীবনের বিচিত্র সব কোলাহল; মানুষ যাতায়াতের শব্দ।

ছাদের ওপরে তুষারঝড় হত। বাতাসের আছড়ানি পড়ত চিলের ছাদে। চিমনির ভেতর মরাকান্নার মত বাতাসের গোঙানি আর আগুনের চিমনির খড়খড়িতে লেগে খট্‌খট্‌ শব্দ হত। দিনের বেলায় কাক ডাকার শব্দ আর রাতে দূরের মাঠে নেকড়ের সশব্দ হুঙ্কার আমার কানে আসত।

এই বিচিত্র শব্দজালে আমার আত্মার পূর্ণতা এল। তারপর ধীর পদবিক্ষেপে, অপরূপ রূপের বিভায় ভাস্বর হয়ে এল বসন্ত। আমার জানলার ভেতর দিয়ে সে উঁকি মারল। শুরু হয়ে গেল বসন্তের আগমনের ফলে নানা শব্দ। বেড়ালের চীৎকার কানে আসতে লাগল, তুষারকণা গলে পড়ে মাটিতে, ছাদের ওপর থেকে

বরফ গড়িয়ে পড়তে থাকে আর ঘন্টা বাজার এমন একটা শব্দ ভেসে আসে দূর থেকে, যা শীতে কখনো শোনা যায় না।

দিদিমা আমাকে দেখতে আসে—আমি কেমন আছি। দিদিমার মুখ দিয়ে আজকাল প্রায়ই ভদ্‌কার গন্ধ বের হয়। সে গন্ধ ক্রমশই বাড়তে থাকে। আমার ঘরে সে একটা প্রকাণ্ড সাদা চায়ের পাত্র নিয়ে এসে বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখে, আর আমাকে বলে, 'লক্ষ্মী মানিক আমার, তোর ঐ পিশাচ দাদুকে বলবি না।'

'দিদিমা, তুমি এত করে মদ খাচ্ছ কেন ?'

'চুপ! বড় হলে বুঝবি কেন মদ খেতে হয়।'

এরপর চায়ের পাত্রের নলটা মুখে দিয়ে দিদিমা এক ঢোক গিলে নেয়। জামার খুঁট দিয়ে মুখ মোছে, বেদম হেসে বলে তারপর, 'লক্ষ্মী মাণিক আমার, কাল তোমাকে কোন্ কথাটা বলেছি ?'

'আমার বাবার কথা।'

'কতটা পর্যন্ত বলেছি ?'

কোন পর্যন্ত বলা হয়েছে শুনে নেবার পর দিদিমা ঘন্টার পর ঘন্টা বলে চলে।

একদিন দিদিমাকে ক্লান্ত আর মনমরা লাগছিল। মদ না খেয়ে দিদিমা আমার ঘরে এসে বাবার কথা অনেক বলেছিল।

'শোন্ দাদু, কাল রাত্রে তোর বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি। হেজেল গাছের একটা ডাল হাতে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তোর বাবা যেন ছুটে চলেছে। জিভ বার করে একটা কুকুর ওর পিছু ধাওয়া করছিল। আজকাল প্রায়ই আমি তোর বাবা-মাক্সিম সাভাতেয়েভিচকে স্বপ্নে দেখি। মনে হয় ওর আত্মা শান্তি পায়নি, আমাদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে…'

তারপর কয়েক সন্ধ্যা দিদিমা আমায় বাবার গল্প বলেছে। দিদিমার মুখ থেকে অন্য সব গল্পের মত বাবার গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে। আমার বাবা ছিল সৈনিকের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা পরে অফিসার হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার অধস্তনদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর অপরাধে তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। সাইবেরিয়াতেই আমার বাবা জন্মান। ওর ছেলেবেলাটা কষ্টে কেটেছে। এজন্য কয়েকবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। একবার বাবা পালালে ঠাকুর্দা শিকারী কুকুর নিয়ে খরগোশ খোঁজার মত বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আরেকবার পালানর পর ঠাকুর্দা বাবাকে ধরে নিয়ে এসে এমন ভাবে বেদম মার দিয়েছিল যে প্রতিবেশীরা এসে বাবাকে উদ্ধার করে এবং তাকে লুকিয়ে রাখে।

আমি দিদিমাকে বললাম 'চিরকালই ছোটদের ওপর মারধোর করার রীতি চলে আসছে, কি বল ?'

দিদিমা সহজ ভাবে উত্তর দিল, 'ছিল বৈকি।'

বাবা যখন খুব ছোট তখন ওর মা মারা যায়, আর যখন বছর ন'য়েক বয়স তখন বাবাও মারা গেল। বাবার ধর্মবাপ ওকে পোষ্যপুত্র নিল। বাবার ধর্মবাপ ছিল ছুতোর মিস্ত্রী; সে বাবাকে পের্ম শহরে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজে ঢুকিয়ে দিল। বাবা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কিছুদিন তার জীবিকা ছিল অন্ধদের হাতধরে রাস্তায় বাজারে পথ দেখিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তার যখন ষোল

বছর বয়স হল তখন বাবা নিজ্‌নিনভ্‌গরোদে এসে হাজির হয়েছিল। সেখানে কলচিনের ষ্টিম বোটে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজে যোগ দিল। দেখতে দেখতে বছর কুড়ি বয়সের সময় বাবা একজন পাকা মিস্ত্রী বনে গেল। অঙ্গসজ্জায় তার মত অভিজ্ঞ মিস্ত্রী ছিল না কেউ। যে কারখানায় বাবা কাজ করত তা ছিল কোভালিহা স্ট্রিটে আমার দাদুর বাড়ির পাশে।

দিদিমা হেসে হেসে বলল, 'বেড়াটা নীচুই ছিল, আর এমন লোকও আছে যারা বেড়ার আগল মানে না। একদিন হল কী আমি আর ভারিয়া দুজনায় বাগানে ঘুরে ফিরে র‍্যাস্‌পবেরী ফল তুলছি, এমন সময় তোর বাবা এক লাফে বাগানে হাজির। আমি তো অবাক! তারপর দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে সে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। লম্বা চওড়া দৈত্যাকৃতি চেহারা, পরনে সাদা শার্ট আর ভেলভেটের ট্রাউজার। পা ছিল খালি; মাথাটাও খালি। চামড়ার একটা ফিতে দিয়ে মাথার চুল বেঁধে রেখেছে। মানুষটা কেন এসেছিল জানিস? তোর মাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। এর আগেও কয়েকবার জানলার সামনে দিয়ে যেতে দেখেছি। যতবার দেখেছি, ততবারই মনে হয়েছে কী চমৎকার চেহারা লোকটার! যখন আমার কাছে সে এল তখন তাকে বললাম, 'বাপু, সোজা রাস্তায় না এসে এমন বাঁকা পথ ধরলে কেন?' একথা শুনে সে সোজা আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর বলল, 'আকুলিনা ইভানোভনা, দোহাই আপনার, আমি আপনার পায়ে নিজেকে সঁপে দিলাম; একবার মুখ তুলে চান, আমার আর ভারিয়ার দিকে। যীশুর দোহাই, আমাদের দুজনের যাতে বিয়ে হয় সে ব্যবস্থা করে দিন।' কাণ্ডটা বোঝ! কথা বলব কী, একেবারে থ' হয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি আপেল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোর মা হতভাগী হাত নেড়ে মানুষটাকে ইঙ্গিতে কি সব বলছে। দু'চোখ তার জলভরা, তার মুখটা টকটকে লাল, যেন র‍্যাস্‌পবেরি ফলের মতই। আমি বললাম, 'তোমাদের দুজনারই কাঁচা বুদ্ধি। ব্যাপারটার গুরুত্ব তাই তোমরা বুঝতে পারছ না। এ ধরণের কিছু করার চেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল। আর ভারভারা, তোকেও বলিহারি, তোরও কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? আর তোমাকেও বলি,...তুমি যে কত গর্হিত কাজ করতে চলেছ তা বুঝছ না? তুমি তার সমান মর্যাদার লোক বলে মনে কর নিজেকে?' যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে তোর দাদু ছিল একজন গণ্যমান্য লোক; পয়সাওলা লোক। চার চারটে বাড়ি, অগাধ সম্পত্তি, তখনো ভাগাভাগি হয়নি এসব কিছু। এই ঘটনার কিছুদিন আগে সবাই তোর দাদুকে জরি, ফিতের টুপী আর ইউনিফর্ম উপহার দিয়েছিল। তোর দাদু ন'বছর একটানা কাজ করেছে কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে। সে সব কী দিনই না গেছে! তোর দাদুর তখন কী অহংকার! এ অবস্থায় আমি কী করি! যেটুকু না বললে নয় তাই বলি ওদের। ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। ওদের দুজনেই মুষড়ে পড়েছিল। দেখে আমার করুণা হল। আমার কথা শুনে তোর বাবা বলল, 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তিনি আমার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। সুতরাং বিয়ের জন্যে ওকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। আর পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাইছি।' শোন কথা! ও আমার মেয়েকে নিয়ে পালাবে, তাতে সাহায্য করব। আমি ওকে

ভাগাতে চাইলাম। এমন কি হাত নেড়ে শাসালাম, তবু সরল না। বলল, 'আপনি আমার গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে পারেন, কিন্তু সাহায্য আপনাকে করতেই হবে।' এমন সময় ভারভারা বলল, 'শোন মা, আমরা দুজন গত মে মাস থেকে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছি। শুধু বিয়েটা দরকার!' একথা শুনে আমার বসে পড়ার মত অবস্থা হল। কী কাণ্ড মাগো!

হাসিতে দিদিমার শরীরটা কেঁপে উঠল। একটিপ নস্যি নিয়ে চোখের জল মুছে নিশ্বাস নিতে নিতে সে বলতে থাকে, 'তুই এখনো ছোট আছিস, তাই দুজনের স্বামী-স্ত্রী হওয়া আর বিয়ে হওয়ার তফাৎটা তুই বুঝবি না। কিন্তু কোন মেয়ের যদি বিয়ের আগে বাচ্চা হয় তবে তার থেকে কলঙ্কজনক ঘটনা আর কিছু থাকে না। একথাটা বড় হয়েও মনে রাখবি। কখনো কোন মেয়েকে লোভ দেখিয়ে এসব করিস না। কোন মেয়েকে এভাবে ফেলে পালান আর আইনের চোখে ছেলেকে জারজে পরিণত করার চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। আমার কথা মনে থাকবে তো? মনে রাখবি মেয়েদের দরদ ও প্রীতির চোখে দেখতে হয়। স্ত্রীলোককে ভালবাসবি অন্তর দিয়ে—শুধু আমোদ করার জন্যে নয়। জানবি একথাগুলো ফেলনা নয়।'

কথাগুলো বলে দিদিমা যেন তন্ময় হয়ে গেল। তারপর নিজের কথার খেই ধরে এগিয়ে চলল, 'শোন তাহলে। আমি তো ব্যাপারটার হদিশই পেলাম না। মাক্সিমের মাথায় একটা চাটা মারলাম; ভারভারার চুলের মুঠি ধরে টানলাম। কিন্তু ওসব করে লাভ কি? তোর বাবা বলল, 'মারধোর করে কি উপায় বের হবে?' তোর মা বলল, 'একটা উপায় ভাবা উচিত।' আমি তখন বললাম, 'পয়সা কড়ি কিছু আছে?' সে বলল, 'ছিল। ভারিয়ার জন্যে একটা আংটি কিনে, তা খরচ হয়ে গেছে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কি মাত্র তিন রুবলই ছিল?' সে বলল, 'না, প্রায় একশো।' যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময় জিনিষপত্তরের দাম ছিল সস্তা, টাকাটা ছিল মাগগি: তোর মা ও বাবা ছিল একবারে ছেলেমানুষ। দুজনেরই মগজে কিছু ছিল না। তোর মা বললে, 'তুমি পাছে দেখে ফেল তাই আংটিটা আমি মেঝের পাটাতনের ভেতর রেখে দিয়েছি। আংটিটা বিক্রি করলে টাকা আসবে।' এমনি ধরণের কথা বলে ওরা। ছেলেমানুষী সব কথা! যা হোক, তিনজনে মিলে ঠিক হল, ঐ সপ্তাহেই বিয়ে হবে; আমি গিয়ে পাদ্রির সাথে কথা কয়ে আসব। কথা হল বটে, কিন্তু কান্নায় যেন আমি ভেঙে পড়ছি! তোর দাদুর ভয়ে বুকটাও দুরদুর করছে। আর ভারভারাও আতঙ্কিত। যা হোক, সব ঠিক করে ফেললাম শেষ পর্যন্ত। তোর বাবার এক শত্রু ছিল। তোর দাদুর কারখানায় সে কাজ করত—সর্দার কারিগর। লোকটার স্বভাব ছিল হিংসুটে ধরণের। আমাদের ওপর তার দৃষ্টি ছিল অনেক দিন ধরে। তাই সহজেই সে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল। তারপর বিয়ের দিন তো এল। আমার একমাত্র মেয়ে, তাই সব চেয়ে ভাল পোশাকে তাকে সাজালাম। বাইরে একটা ত্রয়কা অপেক্ষা করছিল। ভারভারা গাড়ীতে গিয়ে উঠল, মাক্সিম শিস দিতেই গাড়ি চলতে লাগল। চোখের জল আটকে আমি বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু বাড়ি ফিরেই আমি সেই শয়তানের মুখোমুখি হলাম। সে বলল, 'আমার কোন মতলব নেই, কেউ যদি সুখী হতে চায় তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আকুলিনা ইভানোভনা, আমার তরফে দাবি হল মাত্র পঞ্চাশ রুবল।' আমার হাত একরকম খালিই ছিল। টাকার জন্য আমার কোন

আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর টাকা থাকলেও আমার জমিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল না। সুতরাং কথার জবাব দিলাম বোকার মত, 'আমার হাতে একটা পয়সাও নেই।' সে বলল, 'তা হলে কথা দাও পরে দেবে?' আমি জবাব দিলাম, 'পরে পাব কোথা থেকে?' সে বলল, 'কেন? বড়লোক কর্তার তহবিল থেকে পঞ্চাশ রুবল সরাতে কষ্ট কী?' আমি বোকামি করলাম। আমার উচিত ছিল কথা বলে তাকে তখনকার মত থামিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা না করে আমি তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলাম। আমার বাড়ি ঢোকার আগেই সে বাড়ি ঢুকে হৈ চৈ সুরু করে দিল।'

দিদিমা চোখ বুজল। অস্পষ্ট একটা হাসি রেখায়িত হল তার মুখে!

'সে দৃশ্য ভাবলে আজো আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে যে কী কাণ্ড ঘটে গেল ক্ষণিকের মধ্যে! পাগলা বুনো জন্তু যেমন তেড়ে ফুড়ে ওঠে তোর দাদুও তেমনি ভাবে হুঙ্কার করতে লাগল, তার পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা অসম্ভব ছিল বইকি। কতদিন ভারভারার বিয়ের ব্যাপারে বড় মুখ করে সে বলেছে যে বড় ঘরে তার বিয়ে দেবে। শেষকালে কিনা এই ঘরে, এই ছেলের সঙ্গে! তবে ব্যাপার কি জানিস্, পুণ্যময়ী মেরীমাতা যার সঙ্গে যার জোট বেঁধে রেখেছেন তা অন্যথা হবার নয়। তোর দাদু এমন ভাবে উঠোনে দাপাদাপি শুরু করল যেন ওর সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা। সবাই জড়ো হয়েছে। ইয়াকভ, মিখাইল, কোচমান ক্লিম, আর সারা মুখে ফুট ফুট দাগ-ওলা সর্দার কারিগর লোকটা—সবাই এল তৈরি হয়ে। দেখলাম, দাদুর হাতে একটা লাঠি আর ভারি ওজনের ঝোলান চামড়ার ফিতে। মিখাইলের হাতে ছিল বন্দুক! আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল দৌড়বাজ আর গাড়িটাও হালকা ধরণের। আমি মনে মনে ভাবলাম যে ওরা অবশ্যই ধরা পড়বে। হঠাৎ, ভারভারার ভার রয়েছে যে দেবদূতের ওপর, তাঁরই দয়াতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি একটা ছুরি নিয়ে ঘোড়ার লাগামটা কেটে দিলাম। আমার মনে হয়েছিল, লাগাম কাটলে জোয়ালটা চলার সময় আলগা হয়ে যাবে আর গাড়ি অচল হয়ে পড়বে। অবশ্য হচ্ছিলও তাই, গাড়ির জোয়াল আলগা হতে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। তোর দাদু, মিখাইল আর ক্লিম প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। ভগবানের অশেষ দয়া এই যে ওরা যখন শেষবেশ গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হল তখন বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেছে।

এ বাড়ির লোকেরা কিন্তু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাক্সিমের ওপর। মাক্সিমও কম যায়না। সে যেমন লম্বা চওড়া, তেমনই গায়ে অসীম শক্তি। মিখাইলকে সে সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলল। এতে ওর হাতটা গেল ভেঙ্গে। ক্লিম তো এক ঘুষিতে চিৎপাত। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তোর দাদু, ইয়াকভ আর সেই কারিগর ভয়েই কাছে এল না।

কিন্তু মাক্সিম রাগলেও মাথা খুব ওর গরম হয় না। রাগকে ও ঘৃণা করে। তোর দাদুকে সে বলে, 'আপনার হাতের লাঠি রাখুন। আমি শান্তি চাই। ভগবান আমাকে দয়া করে যা দিয়েছেন আমি তাই নিয়েছি। এখন কোন মানুষের সাধ্য নেই যে এই দানকে ছিনিয়ে নিতে পারে। আপনার কাছ থেকেও আমি শুধু এ-ই চাই।' তারপর আমাদের বাড়ির লোকেরা ফিরে আসে। গাড়িতে বসে তোর দাদু হেঁকে বলল, 'ভারভারা, তোকে চিরজন্মের মত বিদায় দিলাম। তুই আমার মেয়ে বলে আর পরিচয় দিবিনা। এমন মেয়ের আমি মুখ দেখতে চাইনা। তোর মরন-বাঁচনে

আমার কিছু যাবে আসবে না।' বাড়ি ফিরে তোর দাদু আমায় বেদম মার মারল। মুখ বুজে এই মার হজম করা ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকল না। আমি জানতাম, প্রথম চোট শেষ হলে তোর দাদু শান্ত হবে, আর যা ঘটার তা ঘটবেই। এরপর তোর দাদু আঙুল নেড়ে শাসানির ভঙ্গিতে আমাকে বলল, 'শোন আকুলিনা, তোমার মেয়ের সঙ্গে এ বাড়ির সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। মনে করবে তোমার কোন মেয়ে নেই—বুঝেছ?' আমি মনে মনে বলি, 'তুমি ঐ লাল চুলওলা মাথা নেড়ে যতই বলনা কেন, রাগ পড়ে গেলে এসব আস্ফালনের কথা মনে থাকবে না।'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি দিদিমার গল্প শুনছিলাম। দিদিমার গল্পের কোন কোন অংশ শুনে খুব অবাক হয়েছি। আমার মায়ের বিয়ের ব্যাপারে দাদুর মুখে অন্য ধাঁচের কথা শুনেছি। দাদু বলেছেন, 'তিনি এ বিয়ের বিরোধী ছিলেন। তাই মাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেননি। দাদুর কথা অনুসারে মায়ের বিয়েতে দাদু নিজেও উপস্থিত ছিলেন। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দিদিমাকে জিজ্ঞেস করি, দিদিমা ও দাদুর বক্তব্য দু-ধরণের কেন? কিন্তু তা বলতে পারিনি। তাছাড়া দিদিমার বর্ণনাটাই আমার ভাল লেগেছে। সেটাই ছিল চমকপ্রদ। দিদিমা গল্প বলে দুলে দুলে, মনে হয় যেন নৌকো ভেসে চলেছে। গল্পের যে অংশে দুঃখ বা আতঙ্ক থাকে সেখানে দিদিমা আরো দুলতে থাকে। একহাত তুলে ধরে চোখ বুজে ঘনভুরু কাঁপিয়ে দিদিমা গল্প বলে। মুখে একটা হাসির ঝিলিকও খেলে যায়! জগতের সব কিছুর মধ্যে একটা অন্ধ ক্ষমা আছে, যা দেখে আমি প্রায়ই অভিভূত হয়ে পড়ি—কিন্তু এক এক সময় মনে হয় দিদিমা যেন প্রবল প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম। প্রথম দু'সপ্তাহ আমি কোন পাত্তাই পেলাম না ভারভারা কোথায় আছে। তারপর একটা বাচ্চা ছেলে এসে আমাকে খবর দিল। ওরাই তাকে পাঠিয়েছে। পরের শনিবার গির্জার সান্ধ্য উপাসনায় যাবার অছিলায় আমি সোজা ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। অনেক দূরে থাকে ওরা—সুয়েতিনস্কি স্ট্রীটের এক বাড়িতে—কারখানার কুলি মজদুর আর নানা ধরণের লোক রয়েছে এই বাড়িতে। বাড়িটা নোংরা আর সর্বদা হৈ চৈ লেগেই আছে। ওদের সেদিকে হুঁশ নেই। দুটো বেড়াল ছানার মত ওরা ঘড়ঘড় আওয়াজ করে খেলে চলে। আমি ওদের জন্য চা, চিনি, কিছু ফসল দানা, জ্যাম, শুকনো ব্যাঙের ছাতা আর কিছু টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিলাম। টাকা পয়সা ঠিক কত তা আমার জানা নেই। তোর দাদুর থলে থেকে যা পেরেছি তাই চুরি করেছি। নিজের জন্য যখন নয়, তখন চুরি করতে দোষ নেই। তোর বাবা কিন্তু কিছুতেই তা নিতে চায় না। বলে, 'আমরা ভিখিরি নাকি?' ভারিয়াও ওর সুরে সুর দিয়ে বলে, 'মা, তুমি এত সব জিনিস এনেছ কেন?' কিন্তু এসব বললে কি হবে, জিনিসগুলো আমি ঠিকই দিয়ে এসেছি। মাক্সিমকে আমি বললাম, 'হ্যাগা বোকা ছেলে! ভগবান সাক্ষী করে তুমি না আমায় মা বলেছ? আর এই বোকা মেয়েটা, এই তো আমার পেটের মেয়ে! নিজের মাকে অসম্মান করলে ভাল হয় কখনো? এ শিক্ষা পেলি কোথায়? পৃথিবীর মাকে অসম্মান করলে স্বর্গের মা অসন্তুষ্ট হন, তার চোখের জল পড়ে।' আমার একথা শুনে মাক্সিম অভিভূত হয়ে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর নাচানাচি সুরু করে দিল! এমনকি আমাকে নিয়ে নাচল কিছুক্ষণ। লোকটার গায়ে সত্যিই

কি শক্তি! যেন বুনো ভালুক। আর ভারিয়ার তো মেঝে পা-ই পড়েনা। স্বামীর গরবে গরবিনী সে, ময়ূরের মত পেখম তুলে ঘুরে বেড়ায়। তারপর এমন পাকার মত 'সংসারের' কাহিনী বলতে শুরু করল যে তা শুনে আমি হেসে বাঁচিনা! ওদিকে চায়ের সাথে যে 'ভাক্রুশকা'গুলো খেলাম তা চিবোনো যায় না; মানুষ তো মানুষ নেকড়েরও দাঁত ভাঙবে। আর ঘরে যে পনির তৈরি করেছিল তা খেতে যেন বালি আর কাঁকর দিয়ে তৈরি মণ্ডার মত।

এভাবে কাটল বেশ কিছুদিন। তুই তখন তোর মায়ের পেটে এসেছিস। তখনও তোর দাদু টু শব্দটি করেনা। ভারি এক রোখা ঐ শয়তান বুড়োটা। বুড়ো ভেতরে ভেতরে টের পেত যে আমি মেয়ে জামাইয়ের কাছে যাই। এমন ভাব দেখাত যে যেন বুঝছেনা। বাড়িতে ভারভারার নামগন্ধও করত না। কেউ মুখেও আনত না, আমিও চুপচাপ থাকতাম। কিন্তু আমি জানতাম হাজার হলেও বাপতো বটে, একদিন না একদিন ভুলবেই। শেষবেশ নরম হল। একদিন তুষার ঝড়ের রাত। এক পাল ভালুকের মত জানলাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চায় বাতাস। গোঁ গোঁ আর্তনাদ করে চিমনিগুলো, নরকের শয়তানগুলো যেন নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ওপরে; তোর দাদু ও আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি, কারো চোখে ঘুম নেই, হঠাৎ আমি বলি, 'কা ভয়ঙ্কর রাত। গরীব মানুষগুলোর কী হচ্ছে। বিশেষ করে যাদের মনে শান্তি নেই, তাদের আরো কষ্ট।' আমার কথা শুনে তোর দাদু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'ওরা কেমন আছে?' আমি জবাব দিই, 'ভাল আছে।' দাদু বলল, 'জবাব দিলে যে, কাদের কথা বলছি বলতো?' আমি বলি, 'হয়েছে, খুব হয়েছে, অমন করে নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কী? এতে কি কেউ শান্তি পাচ্ছে?' তোর দাদু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'গবেটটার কী খবর? ওটা একেবারেই গবেট—!' তোর দাদু কাকে গবেট বলেছিল বুঝতে পারছিস নিশ্চয়?—তোর বাবাকে। আমি বলি, 'আসল গবেট কারা জান? যারা নিজেরা খেটে খায়না, অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকে। তোমার দু'ছেলে ইয়াকভ আর মিখাইলের কথা ভাবতো একবার! গবেট যদি কেউ থাকে তবে ওরাই দুটো আছে। এ বাড়িতে' খেটে পয়সা কামাই করছ তুমি, আর ওরা কুটোটি নেড়েও তোমাকে সাহায্য করেনা। একথা শুনে তোর দাদু মুখে যা আসে তাই বলতে থাকে। আমি নাকি ঝগড়াটে, বোকা, ডাইনী—আরো অনেক কিছু। আমি মুখে রা কাটিনা। তোর দাদু বলে, 'বলিহারি তোমায়, একটা লোক এল—তার সম্বন্ধে কিছু জানা নেই, চেনা নেই, শোনা নেই—অথচ তুমি হুট করে সায় দিয়ে দিলে।' আমি চুপ করেই থাকলাম। শেষকালে মনের সমস্ত ঝাল ঝেড়ে তোর দাদু যখন শান্ত হল তখন আমি বললাম, 'তুমি তো একবারটি গেলে পার। নিজের চোখে পরখ করে আসতে পার কেমন চমৎকার দুজনে রয়েছে।' তোর দাদু বলল, 'হাঁ, আমিই তো যাব ·· কেন, ওদের এত দেমাক কিসের? ওরা আসতে পারেনা?' তোর দাদু যেই একথা বলল অমনি আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি, ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দিই। তা দেখে দাদু বলে, 'হয়েছে গো হয়েছে, খুব হয়েছে, আমার বুকটা কি পাষাণে তৈরি?' তোর দাদু আমার মাথার বেণিটা খুলতে শুরু করে দেয়। বেণি খুলে মাথার ঘন চুল নিয়ে খেলা করা তোর দাদুর একটা স্বভাব ছিল। এমন করতে ভালবাসত সে। তোর দাদুর মনটা তখন খারাপ ছিলনা রে! পরে এক সময় তার মাথায় যখন

ঢুকল যে তার মত বুদ্ধিমান লোক আর নেই, তখনই মনটা ওর ছোট হয়ে গেল। বুদ্ধিশুদ্ধির দফা শেষ হল।

তারপর কি হল জানিস, তোর বাবা মা দুজনে এল এ বাড়িতে। সেদিন ছিল 'সর্ব-পাপক্ষয় রবিবার।' কী পরিচ্ছন্ন আর শ্রী সম্পন্ন মানুষ দুটো। তোর দাদুর পাশে যখন মাক্সিম দাঁড়াত তখন তোর দাদু ওর কাঁধের নীচে পড়ে থাকত। মাক্সিম এসে বলত, 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, মনে করবেন না যে আমি যৌতুক উপহার নিতে এসেছি। আমি আমার স্ত্রীর পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি এখানে।' তোর দাদু একথা শুনে হাসল। হেসে হেসে বলল, 'থাক্, এখন আর বাইরে থাকা চলবেনা। আমার সাথে এ বাড়িতেই থাকতে হবে।' মাক্সিম বলল, 'এ ব্যাপারে ভারিয়া যা বলবে তাই-ই হবে।' তখন শুরু হল অনেক তর্ক-বিতর্ক। দুজনকে থামানো দায়! তোর বাপকে আমি চোখ টিপে, টেবিলের তলা দিয়ে পা চেপে ধরে সামলাতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে ছিল একরোখা। সে গোঁ ধরে নিজের কথা বলতে থাকে। তার চোখ দুটো ছিল সুন্দর, খুশিতে ভরা; ভুরু ছিল গভীর। মাঝে মাঝে ভুরু নামিয়ে সে যখন তাকাত তখন মনে হত যেন পাথরে তৈরি তার মুখটা। তখন সে আমার কথাই শুনত। অন্যেরা কথা বললেও সে কিছু শুনত না। আমি আদপে নিজের ছেলেদেরও ওর মত ভালবাসতাম না। ও নিজেও বুঝত একথা। ও আমাকেও ভালবাসত গভীরভাবে। ও কি করত জানিস? আমাকে কোলে তুলে নিয়ে সারা ঘর ঘুরে বলত, 'তুমি হলে আমার প্রকৃত মা, মাটি-মায়ের মতই তুমি আমার মা! ভারভারাকে যতটা না ভালবাসি তার থেকেও বেশি 'ভালবাসি তোমায়।' তোর মায়ের দুষ্টুমিও কম ছিল না। একথা শুনে মাক্সিমের দিকে ছুটে এসে রাগ দেখিয়ে বলত, 'তাই নাকি? ওহে কপি-কর্ণ, শালগমের ছা! তোমার সাহস তো কম নয়।' তারপরে শুরু হয়ে যেত দৌড়োদৌড়ি। কী সব দিন গেছেরে যাদু আমার। নাচতেও জানত বটে তোর বাপ! অমন নাচ কাউকে নাচতে দেখিনি। গানও জানত চৎকার। অন্ধ ভিখিরিদের কাছে শেখা কিনা! অন্ধ ভিখিরিদের মত অমন গান গাইতে আর কেউই পারে না।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম। দুজনে উঠে এল আমাদের বাড়ির বাগানের দিকের অংশে। সেখানে একদিন দুপুরে তোর জন্ম হল। তোর বাবা রোজ দুপুরে যেত আসত। বাড়ি এসে তোর ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক শুনে একবারে অস্থির হয়ে পড়ল। ভাবটা এমন দেখাল যে এ জগতে বাচ্চা বিয়োবার মত সৎ কাজ আর কিছু নেই। তারপর আমাকে কাঁধে করে সোজা উঠোন পেরিয়ে এসে হাজির হল তোর দাদুর কাছে আর বলল, একটা নাতি হয়েছে আপনার।' এ কাণ্ড দেখে তোর দাদুতো থ' বনে গেল। হেসে বলল, 'তুমিতো আচ্ছা শয়তান দেখছি মাক্সিম!'

তোর মামারা কিন্তু ওকে সুনজরে দেখেনি কোনদিন। কারণ হল এই যে, ও মদ খেত না। কথায়ও কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠত না। কত রকম যে ফন্দি ফিকির আঁটতো তা কেউ বুঝত না। এটাই হয়েছিল ওর কাল! একবার 'লেন্ট' উপবাসের দিন ঝোড়ো বাতাস বইছে। হঠাৎ শোনা গেল কানে তালা দেওয়া একটা অমানুষিক শিসের শব্দ। গোটা বাড়িটা যেন কাঁপছে। সকলেই শঙ্কিত হল, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল। তোর দাদুতো দৌড়ঝাঁপ করতে লাগল। আর্তস্বরে চেঁচাতে

শুরু করল, মূর্তিগুলোর নীচের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আর সবাই যেন প্রার্থনা করতে বসে! হঠাৎ যেমন শব্দ উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ সব শব্দ নিঃশেষে চুপ হয়ে গেল। টু-শব্দটি নেই। এতে আগের চেয়েও ভয় পেল সকলে। তোর ইয়াকভ-মামা কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। সে বলল, 'দেখতে হবেনা এ মাক্সিমের কাণ্ড।' কথাটা মিথ্যে ছিল না। পরে মাক্সিম নিজেই বলেছে সেদিন সে চিলে কোঠার জানলায় কতকগুলো বোতল রেখে দিয়েছিল এমনভাবে, যাতে বাতাসের ধাক্কায় বোতল থেকে শিস দেওয়ার মত করে শব্দ হতে থাকে। শুনে তোর দাদু মাক্সিমকে সাবধান করে দিয়ে বলে, 'আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, একটু বুঝে শুনে চলার চেষ্টা কর; না হলে সাইবেরিয়ায় চালান হয়ে যেতে পার।'

একবার এমন শীত পড়ল যাতে স্তেপভূমি থেকে নেকড়েরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে পালিয়ে আসে। এই নেকড়ের জ্বালায় সবাই অস্থির হত। কুকুর পাওয়া যেতনা তখন, ঘোড়া ভয়ে পালাত। এমনি সময়ে তোর বাবা রাত্রে পায়ে স্কি এঁটে বন্দুক নিয়ে বের হত শিকার ধরতে। নেকড়ের ছাল ছাড়িয়ে তার ভেতর অন্য জিনিষ পুরে চোখে কাঁচ লাগিয়ে দিত। দেখে বোঝা যেতনা যে এটা আসল নেকড়ে নয়। এক রাতে তোর মিখাইল-মামা পায়খানায় গিয়েছিল। হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল, তার কথা বলার শক্তি ছিলনা। চোখ দুটো কপালে উঠেছে, চুল খাড়া হয়ে গেছে। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। ছুটে এসে প্যান্টের পায়ে জড়াজড়ি হওয়ায় সে ধপাস করে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নেকড়ে।' একথা শুনে সবাই ছুটে গেল হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে। গিয়ে দেখে সত্যিই তাই। একটা নেকড়ের মাথা বেরিয়ে আছে। মাথাটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হল। লাঠির বাড়িও দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। সেটা নড়াচড়া করেনা, যেমন ছিল তেমনই রইল। তখন পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল ওটা নেকড়ে নয়, শুধুমাত্র নেকড়েয় চামড়া। মাথায় অন্য কিছু পুরে দেওয়া হয়েছে, আর সামনের পা দুটো সিন্দুকের সঙ্গে পেরেক দিয়ে লাগান হয়েছে। এ কাণ্ডের জন্য তোর দাদু একেবারে ক্ষেপে লাল হয়েছিল। অমন রাগ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। কিছুদিন পরে ইয়াকভও ওর সঙ্গে ভিড়ে গেল! হয়তো মাক্সিম একটা কার্ডবোর্ড কেটে মানুষের মাথায় খুলি তৈরি করছে আর চটের খোসা দিয়ে তৈরি করেছে চুল। তাতে রঙ দিয়েছে। তারপর দুজনে মিলে বেরিয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটাকে লোকের বাড়ির জানলার সামনে এটে দিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই পড়শীরা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। মাঝে মাঝে চাদর জড়িয়ে দুজনে রাস্তায় বের হয়। একবার তো ঐ মূর্তি দেখে এক পাদ্রি ভয় পেয়ে এক পাহারাদারের শরনাপন্ন হল। পাহারাদারতো আরো ভয় পেল। সে চেঁচাল, 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। দিনের পর দিন এমনি চলল। ফন্দি আঁটার আর শেষ নেই। ওরা নিজেদের গোঁ ধরেচলতে থাকে। লোকের পেছনে এমনভাবে না লাগার জন্য কতবার আমি বলেছি, ভারিয়াও বলেছে— তার ইয়ত্তা নেই! কিন্তু কে কার কথা শোনে, বলতে গেলে মাক্সিম হেসে ওঠে। বলে, লোকে যখন না ভেবেই এমন হাস্যকর কাণ্ডে ভয় পায় তখন নাকি তার খুব মজা লাগে। এরপর আর কি করে কথা বলা যায় বলতো?

মানুষকে এভাবে অপদস্থ করার এই স্বভাবের জন্যেই সে নিজেও মরতে

বসেছিল! তোর মিখাইল-মামার স্বভাবটা ঠিক তার বাপের মত—যেমন ছোট মন আর তেমনি মনের মধ্যে একটা আক্রোশ পুষে রাখে। মিখাইল মনে মনে ঠিক করল, যে করেই হোক তোর বাবাকে পৃথিবী থেকে সরাবে। শীতের শুরুতে একদিন বেড়াতে যাওয়ার মতলব আঁটল ওরা। ওরা সংখ্যায় ছিল চারজন—মাক্সিম, তোর দুই মামা, আর একজন পাদ্‌রি (একজন কোচ্‌মানকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অপরাধে এই পাদ্‌রিটিকে পদচ্যুত করা হয়)। ইয়ামস্কায়া স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে ওরা যায় দ্যাকভ পুকুরের দিকে—যেন সেখানে ওরা স্লাইডিং করতে যাচ্ছে। তোর বাবাও সঙ্গে যায়। কিন্তু দ্যাকভ পুকুরে পৌঁছেই ওরা তোর বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বরফের একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। মনে আছে হয়তো, এ ঘটনাটা তোকে আগেও বলেছি একবার।'

'মামারা এত নিষ্ঠুর কেন?'

একটিপ নস্যি নিয়ে দিদিমা নীচু গলায় জবাব দিল, 'ওরা বোকা। একেবারেই আস্ত বোকা। বোকা শুধু নয়, ধূর্তও বটে; ইয়াকভটার তো এখনো জ্ঞানগম্যি কিচ্ছু নেই···হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আর সে যতবারই ভেসে উঠে হাত দিয়ে বরফের কোণাটা ধরতে চেষ্টা করল, ওরা পায়ের বুট দিয়ে ততবারই ওর আঙুলগুলোকে থেতলে দেয়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে মাক্সিম ছিল স্বাভাবিক অবস্থায়, আর তোর মামারা ছিল পুরো মাতাল। কোন রকমে ও গর্তের মাঝখানটিতে ভেসে থাকে আর জল থেকে নাক উচু করে কোনক্রমে নিশ্বাস নিতে থাকে। তোর মামারা ওর মাথা লক্ষ্য করে বরফ ছোঁড়ে, কিন্তু তাতেও ওকে ঘায়েল করতে পারেনা। তোর মামাদের যখন ধারণা হল যে আর ওদের চেষ্টা করতে হবে না, এমনিতেই ও জলে ডুবে মরবে—তখন ওরা চলে যায়। তারপর দু-হাতে ভর দিয়ে যা হোক করে ও জল থেকে উঠে আসে এবং সোজা ছুটে পালায় পুলিশের কাছে। দেখেছিস তো, পুলিশের সদর দপ্তরটা হল পার্কটার ঠিক পাশেই। থানার সার্জেন্ট ওকে এবং আমাদের বাড়ির সকলকেই জানত। তাই প্রথমে সার্জেন্ট ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাইল।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে আবেগের সুরে দিদিমা বলতে লাগল, 'মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের আত্মাকে ভগবান চিরশান্তি দিন! সে ছিল নির্ভেজাল মানুষ। খাঁটি পথে থাকার পুরস্কার সে পাবেই! পুলিশের কাছে গিয়ে সে আসল ঘটনা একেবারেই বলল না। বলল, দোষটা তার নিজের; মদ খেয়ে বেহুস অবস্থায় সে আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। সার্জেন্ট তার কথা বিশ্বাস করেনি, বলেছিল, সে মিথ্যা কথা বলছে। মাক্সিম যে মদ খেত না তা সে জানত। পুলিশের লোকরা তার সারা গায়ে ভদ্‌কা ঢেলে দেয়, শুকনো পোশাক আর একটা গরম ভেড়ার চামড়ার কোট পরিয়ে দেয়। তারপর নিয়ে আসে বাড়িতে। সার্জেন্টের সঙ্গে আসে আরো দুজন লোক। ইয়াকভ ও মিখাইল তখনো বাড়ি ফেরেনি, বাপ-মার মর্যাদা বাড়াতেই বোধহয় অন্য কোথাও মদ গিলতে গিয়েছিল। মাক্সিমকে দেখে তোর মা আর আমি তো একেবারেই চিনতে পারিনি, সারা শরীর লাল হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো থেৎলানো—রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, রগের কাছে সাদা সাদা বরফের মত কি যেন লেগেছে, কিন্তু সেগুলো কিছুতেই গলছে না। পরে বোঝা গেল যে তার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে।

ভারভারা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'মাক্সিম, কী হাল করেছে ওরা তোমার!' ওদিকে সেই সার্জেন্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আর হাজার রকম প্রশ্ন করছে। আমার কেমন যেন মনে হল, ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। তখন সার্জেন্টের কাছে ভারভারাকে পাঠিয়ে মাক্সিমের কাছে আসল ঘটনাটা জানবার চেষ্টা করি। ফিস্‌ফিস্ করে মাক্সিম বলল, 'আগে মিখাইল আর ইয়াকভকে খুঁজে বার কর। ওদের বল, ওরা যেন পুলিসের কাছে বলে যে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—ওরা গিয়েছিল পোক্রভকার দিকে, আর আমি প্রিয়াদিলনি গলির দিকে। ওদের ভাল করে বলে দিও যেন পুলিসের কাছে এই কথাগুলো ঠিক করে বলে, না হলে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।' তখন আমি তোর দাদুর কাছে ছুটে যাই। গিয়ে বলি, 'তুমি সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বল, আমি গেটের কাছে ছেলেদের অপেক্ষায় আছি।' তারপর তার কাছে দুর্ঘটনা ও বিপদের কথা খুলে বললাম। শুনে তোর দাদু রাগে কাঁপতে থাকল। পোশাক পরতে পরতে বিড়বিড় করতে থাকে, 'আমি জানতাম! এমন যে ঘটবে তা আমি জানতাম!' অবশ্য তোর দাদুর এই কথাটা ঠিক নয়—কিছুই জানত না সে! তারপর আমার গুণধর ছেলেরা বাড়ি ফিরল। আচ্ছা করে দুজনের কান মলে দিলাম। মিশ্‌কার মদের নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। কিন্তু ইয়াকভের পেটে বোধহয় একটু বেশি পড়েছে, সে তখনো আবোল-তাবোল বকছে, 'আমি কিছু জানিনা! এটা মিশ্‌কার কাণ্ড—ও-ই তো পালের গোদা!' যাইহোক, সার্জেন্টকে কোন রকমে শান্ত করা হল। লোকটা খারাপ ছিল না, যাবার সময়ে সে বলে গেল, 'আপনারা খেয়াল রাখবেন। যদি আপনাদের বাড়িতে কোন গণ্ডগোল হয় তো অপরাধীকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব।' সার্জেন্ট চলে যেতে তোর দাদু মাক্সিমের কাছে গিয়ে বলে, 'তোমাকে আর কী বলব বাবা, আমি ভাল করেই জানি, তুমি না হয়ে অন্য কেউ হলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যেত। আর ভারভারা, তোকেও ধন্যবাদ, এমন একজন সৎ লোককে আমাদের বাড়িতে আনতে পেরেছিস।' সে-সময়ে তোর দাদু ইচ্ছে করলে খুব চমৎকার কথা বলতে পারত। অবশ্য এখন আর সে-লোক নেই, আজকাল মানুষটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে আর বুকের ভেতরটাকে কুলুপ এঁটে রেখেছে। ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিলাম না। মাক্সিম কাঁদতে শুরু করে; রোগীর মত যেন প্রলাপ বকতে থাকে, 'ওরা কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল? আমি কি অপরাধ করেছি? মাগো, কেন ওরা একাজ করল?' আমাকে সব সময়েই ডাকত 'মাগো' বলে, ঠিক যেমনভাবে শিশুরা মাকে ডাকে; কক্ষণো শুধু 'মা' বলত না। আর ওর স্বভাবের মধ্যেও এমন অনেক কিছুই ছিল যা শুধু শিশুদের মধ্যেই থাকে। 'কেন? মাগো, কেন?' ও জিজ্ঞেস করে চলে। আমি আর কি করতে পারি? নিরুত্তর হয়ে বসে থাকি আর ওর সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদি। তবে ওরাও তো আমার ছেলে, ওদের জন্যেও আমার দুঃখ হয়। তোর মা করে কি, পট্‌পট্ করে ব্লাউজের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলে এমন এলোমেলো চেহারা করে বসে থাকে যে মনে হতে পারে যে সে এইমাত্র কারো সঙ্গে লড়াই করেছে। ও হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'চল মাক্সিম, আমরা এখান থেকে চলে যাই! আমার ভাইরা আমাদের শত্রু; ওদের দেখলেই ভয় হয়! চল, চলে যাই এখান থেকে।' মেয়েকে ধমক দিই, 'তুই

আর আগুনে খড় দেবার চেষ্টা করিস না, এমনিতেই বাড়িতে যথেষ্ট ধোঁয়া হয়েছে। এমন সময় তোর দাদু সেই দুটো নির্বোধকে পাঠিয়ে দেয় মাক্সিমের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। মেয়েটা করে কি, মিশ্‌কার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে, 'এই নাও তোমার ক্ষমা।' আর তোর বাবা বারবার সেই একই প্রশ্ন করে চলে, 'ভাই, তোমরা কি করে একাজ করলে? তোমরা তো আরেকটু হলে আমাকে সারা জীবনের মত পঙ্গু করে দিতে! আমার আঙুলগুলো যদি না থাকত তাহলে তো আর আমি কাজ করে খেতে পারতামই না!' যাইহোক কোন রকমে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলা হল। তারপর তোর বাবা সাত সপ্তাহ কি তারও বেশি শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে খালি বলত, 'মাগো, চল, আমরা অন্য কোন শহরে চলে যাই। এখানে আর ভাল লাগে না, তোমাদের বিষণ্ণ জীবন।' তারপরেই তাকে আস্ত্রাখানে পাঠান হয়। আস্ত্রাখানে জারের যাবার কথা ছিল, সেই উপলক্ষে বিজয়-তোরণ তৈরি করবার ভার পড়ে তোর বাবার ওপরে। বসন্তকালে প্রথম যে স্টীমবোট ছাড়ে তাতেই ওরা চলে যায়। আমার মনে হল, আমার বুকের আধখানা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মাক্সিমেরও ভারি কষ্ট হয়েছিল, ও বারবার আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে বলল। কিন্তু খুশি হয়েছিল ভারভারা, এত খুশি হয়েছিল যে লুকোবার চেষ্টাও করেনি বেহায়া পাষাণীটা! এইভাবে তারা চলে গেল···ব্যস···'

একঢোঁক ভদ্‌কা গিলে, একটিপ নস্যি নিয়ে, জানলার বাইরে তাকিয়ে স্মৃতি-মন্থন করতে করতে দিদিমা বলল, 'তোর বাবার সঙ্গে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক নেই অথচ আমরা ছিলাম অভিন্ন আত্মা···'

মাঝে মাঝে দিদিমার গল্প বলার মধ্যে দাদু এসে ঘরে ঢুকতেন, পাখির মত মুখটা তুলে গন্ধ শুঁকতেন বাতাসে আর সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকাতেন দিদিমার দিকে। খানিকক্ষণ গল্প শুনে বিড়বিড় করে আপন মনেই বলতেন, 'মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানানো গল্প!'

একদিন দাদু আচমকা জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'লেক্সেই, তোর দিদিমা কি এখানে এসে মদ খায়?'

'না।'

'তুই মিথ্যে বলছিস—তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, তুই মিথ্যে বলছিস···' অবিশ্বাসের ভাব নিয়েই চলে গেলেন দাদু! দাদুর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে প্রবাদবাক্য বলল দিদিমা, 'জলে নাড়া দিলে, মাছে যায় চলে!'

একদিন দাদু এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। মেঝের থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'গিন্নী···'

'উঁ?'

'ব্যাপারটা দেখছ তো?'

'দেখছি।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'কপালের লেখা। মনে আছে, সেই ভদ্রলোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?'

'নিশ্চয় আছে।'

'এখন মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'তবু তার এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই, সে এখন গরীব।'

'যাক্‌গে, মেয়ের ব্যাপার মেয়ে নিজেই বুঝুক।'

দাদু চলে গেলেন। আমার মনে হতে লাগল, একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে। দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলে?'

আমার পায়ে মালিশ করতে করতে দিদিমা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, 'সব কথাই তোর জানতে হবে? এইটুকু বয়সেই যদি সব কথা জেনে নিবি তাহলে বড় হলে আর জানবার কিছুই যে বাকি থাকবে না' বলে সে আপন মনে হেসে উঠল।

'হায় রে লেক্সেই, তোর দাদুর আজ কী হাল! ভগবানের চোখে কতটুকু সে? একটা বালিকণার মত! কাউকে কিছু বলিসনা লেক্সেই, তুই জেনে রাখ, তোর দাদুর নিজের বলতে আজ আর কিছু নেই—শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারিয়েছে। এক ভদ্রলোককে মোটা টাকা ধার দিয়েছিল, বেশ কয়েক হাজার রুবল হবে। সেই ভদ্রলোক একেবারে ফতুর হয়ে গেছে।'

নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে বহুক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকল। তাঁর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সারা মুখটা ভরে গেল একটা থম্‌থমে বিষণ্ণতায়।

'কী ভাবছ দিদিমা?'

'ভাবছি কোন্ গল্পটা বলি তোকে। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে বলল, 'আচ্ছা শোন, তাহলে ইয়েভস্তিগনেই-এর গল্পটাই বলি, কেমন? গল্পটা হল এই :

'ইয়েভস্তিগনেই নামে এক যে ছিল বুড়ো ডীকন—
ভাবত মনে মনে প্রকাণ্ড তার দাম।
অগ্নিসম উজ্জ্বল তার নেই কোন তুলনা
জার পুরোহিত সবার থেকেও অপার মহিমা।
দোকানদার বা ব্যবসায়ী—ধর্তব্য নয়
আর কেউ নাই তার মত কী অপরূপ চেহারা!
অহং ভাবের ময়ূর কিংবা বোকা মুরগীর সম
চাউনি ছিল পেঁচার মত চলা ফেরায় বকমকম্‌
প্রতিবেশী সবার তরে আছে রাত্রিদিন
বড় বড় বুলি আর কত অনুশাসন।
সকাল থেকে রাত অবধি বিরাম মোটে নাই
ঝালাপালা হল যে কান সবাই খোঁজে ঠাঁই।
এ পৃথিবীর কিছুই যে তার নয়কো মন-মত
সব ব্যাপারেই দোষত্রুটি আবর্জনা যত।
তাকিয়ে দেখে ছাদের পানে—ছাদটা নিচু অতি
ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে কষে—গাড়ির নেইকো গতি।
কামড় দেয় আপেলফলে—ফলটা নয় মিঠে
রোদে বসে শরীর ফেলে পায়না আরাম মোটে।
যতই দেখে দুনিয়াকে ততই বলে সে'

চোখ ঘুরিয়ে, গাল ফুলিয়ে গল্প বলতে থাকে দিদিমা। তার মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত বোকামির ছাপ। সুর করে করে সে বলতে থাকে,

'পৃথিবীটা গড়ার ফিকির ভাল মতই জানি।
সৃষ্টিকর্তা হতাম যদি দেখাতাম এই ক্ষণে
এই পৃথিবী হত ভাল আরও হাজার গুণে।
কিন্তু আমার নেইকো সময় নেইকো কোন সাধ,
কত কাজের মানুষ আমি করবনা তা বরবাদ!'

এক মুহূর্ত থেমে চাপা স্বরে বলে চলল আবার,

'হঠাৎ সেদিন শয়তানেরা এসে হাজির হয়
বলে তাকে এ পৃথিবীর কিছুই তোমার পছন্দ তো নয়?
চল তবে সবাই মিলে নরকে তাড়াতাড়ি
মনোলোভা আগুন সেথায় আহা মরি মরি।'
কথা শুনে শুনে ডীকনমশাই যেই না শুধু দাঁড়ায়
জোড়া শয়তান চাপে পিঠে ঘাড়টি চেপে হায়।
অন্যরা সব কামড়ে ছিঁড়ে আঁকড়ে ধরে তাকে
ডীকনমশাই নাকাল ভারি মুখ বুজে তো থাকে।
শয়তানের ঠেলা খেয়ে—পড়েন গিয়ে শেষে
আগুন যেথায় ফুঁসছে সেথায় প্রচণ্ড আক্রোশে।
এবার বল ডীকনমশাই ভাল লাগবে কিনা?'
সারা দেহ ভাজা-ভাজা, চোখটা রক্তপানা।
তবুও তার দেমাকীভাব বজায় রাখে সে
মুখ বাঁকিয়ে গরম হয়ে বলে, 'জানি জানি,
নরকের আগুনটা হয় চোখ ঝলসানো বটে
ধূম্র জালের বাড়াবাড়ি ভালতো নয় মোটে।

ঘুমে এলান টানা সুরে গল্পটা শেষ করে সে, তারপর মুখের চেহারা বদলে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ইয়েভস্তিগনেই কিছুতেই হার মানেনি। লোকটার একটা মস্ত গুণ ছিল যে নিজের একরোখামি ভাবটা বজায় রাখতে পারত সব সময়ে, ঠিক তোর দাদুর মত। নে রাত হয়ে গেছে অনেক, এবার ঘুমো···

আমার মা কখনো সখনো আমাকে দেখবার জন্যে ওপরে আসত। আসলেও বেশিক্ষণ থাকত না, দু-একটা কথা বলেই চলে যেত তড়িঘড়ি করে। মা দেখতে সুন্দর হয়েছে, আরো ভাল ভাল পোশাক পরে—কিন্তু দিদিমার মতো মার মুখে-চোখেও কেমন যেন নতুন ভাব, মা কী যেন লুকিয়ে রাখতে চায়। ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি তা নিয়ে অনেক ভাববার চেষ্টা করি।

দিদিমার গল্প বলার ওপর আমার আর তেমন আগ্রহ নেই। একটা আতঙ্ক দিনের পর দিন আমার মধ্যে বেড়ে ওঠে। এমনকি দিদিমা যখন বাবার সম্বন্ধে গল্প বলতে শুরু করে, তখনো এই আতঙ্ক আমার মন থেকে দূর হয়ে যায় না।

একদিন আমি সপাট দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না কেন গো দিদিমা?'

চোখে হাত চাপা দিয়ে দিদিমা শিউরে উঠে জবাব দিল, 'তা আমি কী করে জানব? ওসব দেবতার ব্যাপার—ঈশ্বরের রাজ্য। আমাদের মত সামান্য মানুষের পক্ষে ওসব বোঝা দায়।'

প্রায়ই রাত্রে যখন আমার ঘুম আসত না, আমি তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম গাঢ় নীল আকাশে তারার মিছিল চলেছে। কল্পনায় নানা করুণ গল্পের ছবি ফুটে উঠত। আর সেই প্রত্যেকটা গল্পেরই নায়ক ছিল আমার বাবা। তিনি যেন একা একাই যাচ্ছেন, তার হাতে একটা লাঠি, আর একটা লোমশ কুকুর চলেছে ঠিক তার পিছুপিছু···

বার

একদিন বিকেলবেলায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম, আমার পাদুটোতেও সাড়া জেগেছে। বিছানার ধার দিয়ে পাদুটোকে ঝুলিয়ে দিলাম; তখন পাদুটো অসাড় ও অবশ মনে হল। সে যাইহোক, একটা উপকার হল এ-ব্যাপারে; আমার পাদুটো যে আস্ত আছে এবং আমি ভবিষ্যতে যে হাঁটা-চলা করতে পারব এই বিশ্বাসটুকু আমার মনে ফিরে এল। এই অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন একটা তীব্র আনন্দ এনে দিল যে আমি চিৎকার করে উঠলাম এবং মেঝের ওপরে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। অবশ্য চেষ্টাটা বিফল হল, আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম। কিন্তু তবু হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলি দরজার দিকে; সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসি আর ভাবি, আমাকে দেখে নিচের সবাই কি-ভাবেই না আঁতকে উঠতে পারে।

এখন আমার ঠিক মনে নেই, ঐরকম অবস্থায় কী করে আমি মায়ের ঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, আমি দিদিমার কোলে শুয়ে আছি আর আমার আশে-পাশে অপরিচিত অনেক লোকের ভিড়। সবুজ রোগা এক বুড়ীও ছিল ঐ ভিড়ের মধ্যে।

ঘরের অন্য সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে গম্ভীর গলায় বুড়ী বলল, 'ওকে র‍্যাস্‌পবেরি জ্যাম দিয়ে একটু চা খেতে দাও, আর একটা কম্বল চাপা দিয়ে দাও মাথা থেকে পা অবধি।'

আগাগোড়া বুড়ীর সবটাই সবুজ। পরনের পোশাক সবুজ, টুপী সবুজ, মুখ সবুজ, বাঁ-চোখের নিচের আঁচিলটা সবুজ, এমন কি আঁচিলের মাঝখানে যে এক-গাছি চুল ছিল তাও সবুজ ঘাসের মত দেখতে। তলার ঠোঁটটা নিচে নামিয়ে আর ওপরের ঠোঁটটা উঁচুতে তুলে, সবুজ দাঁতগুলো বার করে এবং আঙুল খোলা লেসের কালো দস্তানাপরা হাত দিয়ে চোখদুটো আড়াল করে বুড়ী আমাকে এক-দৃষ্টে দেখল।

আমি আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা এ কে গো?'

অসন্তুষ্ট ভাবে দাদু জবাব দিলেন, 'ইনি তোমার আরেকজন ঠাকুমা হতে চলেছেন।'

আমার মা মুচকি হাসল। তারপর ইয়েভগেনি মাক্সিমোভকে গুঁতো মেরে আমার দিকে ঠেলে বলল, 'আর এই হচ্ছে তোর বাবা।'

আরো অনেক কথা মা তাড়াতাড়ি বলে গেল কিন্তু আমার মাথায় তার এক রত্তিও ঢুকল না। চোখদুটো একটু কুঁচকে মাক্সিমোভ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'খোকা, আমি তোমাকে এক বাক্স রং কিনে এনে দেব।'

ঘরের মধ্যে জ্বলজ্বলে আলো! কোণের টেবিলে রুপোর ঝাড়বাতি জ্বলছে; প্রত্যেক ঝাড়ে পাঁচটি করে মোমবাতি জ্বলছে, ঝাড়বাতিগুলোর ঠিক মাঝখানে

দাদুর প্রিয় মূর্তি, মা গো কেঁদো না!' মোমবাতির আলোয় মূর্তির মুক্তোখচিত ফ্রেম যেন ঝল্‌সে উঠছে, গলে গলে পড়ছে বলে মনে হয়। স্বর্ণাভ মুকুটের বসানো গাঢ় লাল পাথরগুলো ঝকমক করছে। জানলার বাইরের অন্ধকার থেকে কতকগুলো অস্পষ্ট মুখ জানলার শার্সিতে নাক চেপে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আমার চারদিকে দুলে উঠছে সমস্ত কিছু। সেই সবুজ বুড়ীটি ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপরে, তার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার কানের পিছন দিক পরীক্ষা করে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই…'

আমাকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়ে দিদিমা বলল, 'মূর্ছা গেছে বোধহয়।'

তখন আমি মূর্ছা যাইনি, শুধু চোখ দুটো বন্ধ করে ছিলাম। আমাকে নিয়ে যখন দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল আমি বললাম, 'তুমি আমাকে আগে এসব কথা বলনি কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। ব্যস, এখন আর একটাও কথা নয়।'

'প্রতারকের দল…'

আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিদিমা নিজেই বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। আর আমাকে বারবার বলতে লাগল, 'ওরে কেঁদে নে রে, প্রাণ ভরে কেঁদে নে!'

তখন কাঁদবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ওপরের এ ঘরটা ছিল ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। আমার শরীরটা কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা নড়ছে আর কিচ-কিচ শব্দ হচ্ছে। সেই সবুজ বুড়ীটা যেন দাঁড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না। আমি যেন ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলাম। দিদিমা আমাকে একা ঘরে রেখে চলে গেল।

এর পরের কয়েকটা দিন কাটল নিতান্ত নিরুৎসাহ একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে। বিয়ের কথা ঘোষণা করেই আমার মা চলে গেছে। বাড়ির মধ্যে একটা রুদ্ধ নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

একদিন সকালে একটা বাটালি হাতে নিয়ে আমার দাদু হাজির। শীত-জানলার পুটিং তিনি ঐ বাটালিটা দিয়ে কেটে কেটে তুলে ফেলছেন। এরপর দিদিমা এক বালতি জল আর খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে এসে হাজির হল।

নীচু গলায় দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর কী গো?'

'কিসের খবর জিজ্ঞেস করছ?'

'তুমি কী খুশি?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দিদিমা আমাকে যে-জবাব দিয়েছিল দাদুকেও সেই একই জবাব দিল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। ব্যস, এখন আর একটাও কথা নয়।'

এই সব কথার একটা বিশেষ অর্থ আছে। বিরাট অপ্রিয় একটা ঘটনা গোপন করতে চাইছে কথাগুলো। এমন একটা ঘটনা যা সবাইকে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হচ্ছে, অথচ মুখে যা উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

শীত-জানলার কপাটটা সাবধানে খুলে দাদু সেটা নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। দিদিমা গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানলায়। বাইরে বাগানের স্টার্লিং আর

চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। উনুনের নীল টালিগুলো যেন ঔদাসীন্যে ফ্যাকাশে হয়েছে। ঐদিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা শিউরে উঠল। আমি সাবধানে বিছানা থেকে উঠে এলাম।

'এখন আর খালি পায়ে চলা ফেরা করিস না বাপু', দিদিমা আমাকে সাবধান করে দিল।

'আমি একটুখানি বাগানে যাচ্ছি।'

'একটু পরে যাস। এখনো মাটি ভিজে রয়েছে।'

দিদিমার কথা মেনে চলার ইচ্ছে আমার ছিল না। বড়দের কাছে থাকতে এখন আর আমার একেবারেই ভাল লাগছে না।

ফ্যাকাশে সবুজ রঙের কচি কচি ঘাসের ডগা ইতিমধ্যেই মাটি ভেদ করে মাথা তুলেছে। আপেল গাছগুলো ছেয়ে গেছে নতুন মঞ্জরীতে। পেত্রভনার বাড়ির বরফ-গলা মাটির গন্ধে আমার যেন নেশা লাগছে। বরফের ভারে নুয়ে-পড়া বাদামী রঙের আগাছায় চিহ্নিত হয়ে আছে কালো গর্তটার কিনারা। এখানেই পিওতর-কাকা তার নিজের গলায় ছুরি বিদ্ধ করেছিল। সারা বাগানের মধ্যে এই আগাছাগুলোই সবচেয়ে কদর্য দেখতে। এই আগাছাগুলো আর আগুনেপোড়া এই নিঃসঙ্গ খুঁটিগুলো এই বসন্ত-আবহাওয়ায় একেবারেই বেখাপ্পা। এক কথায়, সারা বাগানের মধ্যে এই গর্তটাই হল গায়ে জ্বালা ধরার মত একটা বেমানান ব্যাপার। আমার কেমন একটা জিদ চেপে গেল যে এক্ষুণি গিয়ে আগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলি, ইট আর আগুনে পোড়া খুঁটিগুলোকে সরিয়ে দিই সেখান থেকে, যত জঞ্জাল জড়ো হয়েছে সব ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিষ্কার করে দিই জায়গাটা, তারপর নিজের জন্যে একটা ঘর তৈরি করি সেখানে—যেটা হবে বড়দের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে আমার নিরালায় গ্রীষ্মযাপনের স্থান। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে লেগে পড়লাম। এতে আমার উপকারও হল। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমি বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে ভুলে যেতে লাগলাম। সত্যি যে ভুলে গেলাম এমন নয়, ক্ষতটা রয়ে গেলেও যন্ত্রণাটা কিন্তু কমে গেল ধীরে ধীরে।

আমার দিদিমা ও মা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে থাকে, 'অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন রে?' এ-প্রশ্নের জবাব কী দেব ভেবে পাই না। বাড়ির কারো ওপরই আমার রাগ নেই, কিন্তু বাড়ির কোন ব্যাপারই আমার ভাল লাগে না, সবাই যেন আমার কাছে পর হয়ে উঠেছে। সেই সবুজ বুড়ী প্রায়ই আসে আমাদের বাড়িতে; কখনো বিকেলের খাবার সময়ে, কখনো চায়ের সময়ে, কখনো বা রাত্রের খাবার সময়ে। এসে বসে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় যেন পুরনো বেড়ার জীর্ণ খুঁটি।

তার চোখদুটো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে মুখের সঙ্গে সেলাই করা রয়েছে। কোটরের গর্তের মধ্যে চোখদুটো অতি অনায়াসে ঘুরপাক খায়; সমস্ত কিছু সে দেখে, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। ভগবানের বিষয়ে কথা বলবার সময় ছাদের পানে ওর চোখদুটো নিবদ্ধ হয়, আর এ সংসারের বিষয়ে কথা বলবার সময় সে তাকায় মেঝের দিকে। তার ভুরুদুটোকে দেখে মনে হয় কোন

একটা অজানা পদ্ধতিতে ভুষির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। চওড়া চওড়া দাঁতগুলো দিয়ে যা কিছু সে মুখের মধ্যে পোরে তা এক নিমিষেই গুঁড়িয়ে ফেলে। খাবার সময়ে কাঁটাটা ধরে অদ্ভুতভাবে বেঁকানোর ভঙ্গিতে হাতের ছোট আঙ্গুল উঁচিয়ে থাকে। কানের সামনে গোলগোল বলের মত হাড় চক্কর মেরে ঘোরে আর কানদুটো নড়তে থাকে। মুখের চামড়া হল্‌দে এবং কুঁচ্‌কনো, আর এত বেশি মাজাঘষা যে যা দেখলে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকে। আর এই চামড়ার ওপরে আঁচিলের সবুজ চুলগাছা নড়াচড়া করে। মা ও ছেলে দুজনেই এত বেশি মাজাঘষা যে ওদের কাছে ঘেঁষতে আমার কেমন যেন ভয় করে। আমাদের দেখা হওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন বুড়ী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল, ধুনো আর ধোবিখানার সাবানের গন্ধওলা তার শুক্‌নো হাতে আমি যেন চুমু খাই। কিন্তু যতবারই এই ভেবে সে উপস্থিত হয়েছে, ততবারই আমি তাকে কাটিয়েছি।

বুড়ী তার ছেলেকে বারবার বলেছে, ‘বুঝলে তো ইয়েভগেনি, ছেলেটাকে ভালমত শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে একটু ভদ্রদস্তুর করা দরকার।’

একথা শুনে ইয়েভগেনি বাধ্য ছেলের মত ভুরু কুঁচকে মাথা নুইয়ে দেয়। একটা কথাও বলে না। বুড়ীর এই সবুজ উপস্থিতির সামনে সবাই ভুরু কোঁচকায়।

বুড়ীকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। বুড়ীর ছেলেকেও সহ্য করতে পারি না। আমার এই বিদ্বেষ এত বেশি যে এজন্যে আমাকে বেদম প্রহারও সহ্য করতে হয়েছে।

একদিন আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছি। বুড়ী হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, ‘বাছা আলিওশা, অমন রাক্ষসের মত গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছ কেন? খাবার গলায় আটকাবে যে!’

আমি করলাম কী, খাবারের টুকরোটা মুখ থেকে বার করে নিয়ে কাঁটায় বিঁধিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম ওরই দিকে।

‘খেতে যদি আপনার লোভ হয়ে থাকে তো এই নিন।’ আমি বললাম।

মা আমাকে একটানে টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে লজ্জাকর-ভাবে আমাকে বন্ধ করে রাখা হল ছাদের ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই দিদিমা উঠে এল ওপরের ঘরে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে তার সে কী হাসি।

‘আরে, বাপ! কোথায় যাই রে আমি! তোর মাথায় এত বদবুদ্ধিও জমা থাকে!’

দিদিমার মুখে হাত চাপা দেওয়ার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। দিদিমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাতে উঠে এলাম এবং সেখানে চিম্‌নির পেছনদিকে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, আমার ভয়ানক ইচ্ছে করে, ওদের সবাইকে মুখের ওপরে যা-তা বলি, ওদের সবাইকেই খানিকটা জব্দ করে দিই। এই ইচ্ছেকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। চেপে রাখাটা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে! অবশেষে বাধ্য হয়েই আমাকে এই শক্ত ব্যাপারটাই আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

একদিন আমি করলাম কী আমার ভাবী সৎ-বাপ আর ভাবী ঠাকুমা যে

চেয়ার দুটোতে বসে, তার ওপরে চেরি-আঠা মাখিয়ে রাখলাম। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই শক্তভাবে এঁটে গেল চেয়ারে—সে এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটল। এজন্যে দাদু তো আমাকে ধরে আচ্ছা করে পিটুনি দিলেন। এসব হয়ে যাবার পরে মা উঠে এল আমার ছাদের ঘরে। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে শক্তভাবে চেপে ধরে বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই ওদের সাথে এমন দুষ্টুমি করিস কেন বল তো? তোর এই দুষ্টুমির জন্যে আমাকে যে কতখানি ভুগতে হয় তা যদি তুই একবারও জানতিস!'

মা'র দু-চোখ ভরে জল টলটল করে, গালের ওপরে আমার মাথাটা চেপে ধরে মা। মা'র মারের চেয়েও এতে বেশি কষ্ট অনুভব করতাম। আমি মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যদি আর না কাঁদে তাহলে আমি কক্ষণো মাক্সিমভদের সঙ্গে লাগব না।

আমাকে মা নীচু গলায় বলল, 'এই তো চাই। আর কক্ষণো দুষ্টুমি করিসনা। এই দ্যাখ্ না, শীগ্‌গিরই আমাদের বিয়ে হবে, বিয়ের পরই আমরা যাব মস্কো। মস্কো থেকে ফিরে এলে তুইও সঙ্গে থাকবি আমাদের। ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ খুব ভাল লোক—যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি মনটাও নরম। দেখিস তুই, তোরও ওকে ভাল লাগবে। তোকে আমরা হাইস্কুলে ভর্তি কর দেব। তারপর তুইও হবি ওর মত ছাত্র। তা হলে পরে তুই ইচ্ছে করলে ডাক্তার বা অন্য কিছু হতে পারবি। লেখাপড়া যে শেখে তার আর কিছুই অসাধ্য থাকে না। যা, এবার বাইরে গিয়ে একটু খেলা কর···'

আমার মনে হতে লাগল, এই 'তারপর' বা 'তা হলে পর' ইত্যাদি কথাগুলো সিঁড়ির ধাপের মত পর পর নেমে গেছে আর সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ক্রমশই মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে এক অন্ধকার নিঃসঙ্গতার মধ্যে গিয়ে পড়ছি। আমার জন্যে ভবিষ্যতের যে চিত্র মা এঁকেছে তাতে আমি কিছুমাত্র আনন্দিত নই। ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে দিই কথাটা বলে।

'মা, তুমি আর বিয়ে কোর না। আমি নিজে কাজ করে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করব।'

কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারিনি। মা যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখন আমার মনটা নরম হয়ে একেবারে গলে যায় আর মায়ের জন্যে মস্ত কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে কোন দিনই মা'র কাছে বলিনি।

এদিকে বাগানে আমার পরিকল্পনামত কাজ করে চলেছি। আগাছা-গুলোকে টেনে টেনে তুলছি আর গোড়া থেকে কেটে দিচ্ছি। ইটের গাঁথুনি তুলছি, গর্তের ঢালু কিনারের চারদিক থেকে ইট সাজিয়ে সেগুলি দিয়ে তৈরি করছি বেশ চওড়া একটা আসন যাতে শোওয়াও চলতে পারে। নানা রঙের কাঁচ আর ডিস ভাঙা টুকরো নিয়ে চমৎকারভাবে বসিয়ে দিয়েছি ইটের ফাঁকে গাঁথুনির মধ্যে। সূর্যের রোদ্দুর এসে যখন পড়বে তখন এই কাঁচ আর ডিসের টুকরোগুলো গির্জার উপাসনা-বেদীর মতো চক্‌চক্ করে ঝল্‌সে উঠবে।

মনোযোগের সঙ্গে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে একদিন আমার দাদু বললেন, 'বাঃ, মাথা ঘামিয়ে চমৎকার তৈরি করেছিস তো! তবে কি জানিস, আগাছাগুলোর শেকড় কিন্তু মাটিতেই রয়ে গেছে, ওগুলো ঠিক পরে মাথা চাড়া

দিয়ে উঠবে। আচ্ছা, ওজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর, আমাকে একটা কোদাল এনে দে, আমি মাটি খুঁড়ে শেকড়গুলো বার করে দিই।'

কোদাল আনতেই তিনি প্রথমে থুথু দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিলেন, তারপর হুম হুম শব্দ করে জমিটা খুঁড়তে শুরু করে দিলেন।

'এই নে আগাছার শেকড়গুলো ফেলে দে। দেখিস, তোর জন্যে আমি এখানে সূর্যমুখী আর হলিহক্‌'এর চারা লাগিয়ে দেব। তাহলে যা সুন্দর হবেনা জায়গাটা, ভারি সুন্দর হবে ··'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কোদালে ঠেস দিয়ে অচল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি ক্ষুদে ক্ষুদে, কুকুরের মত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'দাদু তোমার কী হল?'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখটা মুছে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'হুঁঃ, এর মধ্যেই শরীরে ঘাম বেরিয়ে গেছে। বাবাঃ, পোকাগুলো কি-রকম কিলবিল করছে দেখছিস!'

আবার খুঁড়তে শুরু করে দিলেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসব করে কিচ্ছু লাভ নেই। মিথ্যে এসব করা, ভাই। এই বাড়িটা আমাকে যত তাড়াতাড়ি হয় বিক্রি করে দিতে হবে। খুব সম্ভব শরৎকালের মধ্যেই। তোর মায়ের বিয়ের যৌতুক দিতে হবে, সেজন্যে অনেক টাকার দরকার। বুঝলি কিনা, আর যে-ভাবেই থাকুক না কেন, অন্তত তোর মা'র যেন কখনো থাকা-খাওয়ার কষ্ট না হয় ..'

কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একবার হাতটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন স্নানঘরের পিছনে; তিনি বাগানের ওই কোণে কতকগুলো উর্বরক্ষেত্র তৈরি করছেন। আমি নিজেই খুঁড়তে শুরু করলাম এবং আচমকা কোদালটা লাগল গিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে, বড় আঘাত পেলাম।

এই আঘাতের জন্যে মায়ের বিয়েতে আমি আর যোগ দিতে পারিনি। কোনমতে গেট পর্যন্ত হেঁটে এসে দূর থেকেই মায়ের যাওয়া দেখেছি। মা মাক্সিমভের হাতটা ধরে আছে আর মাথা নিচু করে পথ চলছে। পাথর বসানো ফুটপাথের ফাটল দিয়ে কচি কচি ঘাসের ডগা মাথা উঁচু করে আছে, সেই ঘাসের ডগাগুলোকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলছে মা, দেখে মনে হয় যেন পেরেক বসানো রাস্তা দিয়ে মা হাঁটছে।

কোনরকম ধুমধাম না করেই বিয়ের পর্ব শেষ হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের শেষে যে চায়ের আসর বসল সেখানেও কোনরকম হৈ-চৈ হলনা। চা-খাওয়া হয়ে যেতেই একটুও দেরি না করে মা নিজের ঘরে গিয়ে জিনিষপত্র গুছোবার কাজে লেগে গেল। আমার সৎ-বাপ এসে আমার পাশে বসল, তারপর আমায় বলল, 'মনে আছে তো, তোমাকে সেদিন বলেছিলাম যে এক বাক্স রঙ উপহার দেব। কিন্তু এখানকার বাজারে ভাল রঙ কিনতে পাওয়া যায় না। আমার নিজের রঙের বাক্সটাও দেওয়া চলে না। মস্কোয় গিয়ে সেখান থেকে তোমাকে এক বাক্স রঙ পাঠিয়ে দেব।'

'আমি রঙের বাক্স নিয়ে কী করব?'

'কেন, ছবি আঁকবে, ছবি আঁকতে তোমার ভাল লাগে না?'

'আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

'তবে তোমার জন্যে আমি অন্য কিছু পাঠাব।'

এই সময়ে আমার মা ঘরে ঢুকে বলল, 'আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসব। তোমার বাবা পড়াশুনো শেষ করে পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেলেই ফিরে আসব আমরা।'

এমনভাবে দুজনে আমার সঙ্গে কথা বলছে যেন আমি আর ছোটটি নই। এটা ভারি ভাল লাগল আমার। কিন্তু যে-লোকের দাড়ি গজিয়েছে সে এখনো পড়াশুনা করছে একথা শুনে আমার খুব অবাক লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী পড়েন?'

'জরিপবিদ্যা।'

'জরিপবিদ্যা' জিনিসটা কি, জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছিল না আমার। বাড়ির আবহাওয়াটা কেমন যেন বিষন্ন হয়ে রয়েছে একটা থমথমে নিস্তব্ধতায়; লোমশ কিছুর খসখসানি হচ্ছে যেন। ব্যাকুল হয়ে আমি রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছি; আরো তাড়াতাড়ি রাত্রিটা নেমে আসুক। উনুনের দিকে পেছন ফিরে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাদু আধবোজা চোখে তাকিয়ে দেখছেন জানলার বাইরে সবুজ বুড়ীটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে আর বিড়বিড় করে মা'কে বাক্সপেঁটরা বাঁধতে সাহায্য করছে। দিদিমা দুপুর থেকেই মদে বেসামাল ছিল। তাই যাতে উল্টোপাল্টা কিছু কাণ্ড করে না বসে, পরিবারের নাম না ডুবোয় সেইজন্যেই তাকে ছাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল।

পরদিন সকালেই মা চলে গেল। চলে যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমাকে অনায়াসে তুলে নিল মাটি থেকে এবং বুকের ওপর চেপে ধরে স্থির অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমাকে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি, কেমন?'

'ওকে বলে যা যেন আমার অবাধ্য না হয়।' তখনো গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় দাদু বললেন।

'শুনছিস তো, দাদু কি বলেছেন।' আমার মাথার ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মা আমাকে উপদেশ দিল। আমি আশা করছিলাম, মা হয়তো আমাকে অন্য কিছু বলবে। মায়ের কথার মাঝখানে এভাবে বাধা দেওয়াতে আমি দাদুর ওপরে চটে গেলাম।

দুজনে গিয়ে গাড়িতে চেপে বসল। গাড়িতে ওঠবার সময় কিসে যেন মা'র পরনের স্কার্টটা আটকে গেল। বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল স্কার্টটা খুলতে। খুলতে গিয়ে মা হিমসিম খেয়ে রেগে উঠল।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? দ্যাখ্ না গিয়ে, স্কার্টটা কোথায় লেগেছে!' দাদু আমাকে বললেন। কিন্তু আমার নিজের মনের বিষন্নতা তখন আমাকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মাক্সিমভের পরনে ছিল আঁটসাঁট নীল ট্রাউজার। ট্রাউজার মোড়া পা দুটো সতর্কভাবে গুটিয়ে নিয়ে সে বসল। তার হাতে কতকগুলো পুঁটলি দিল দিদিমা। পুঁটলিগুলোকে সে হাঁটুর ওপরে পরপর সাজিয়ে থুতনি দিয়ে চেপে রইল।

'ঠিক আছে ঢের হয়েছে!' ফ্যাকাশে কপালটা কুঁচকে সে আমতা-আমতা করে বলল।

অন্য একটা গাড়িতে উঠে বসেছে সেই সবুজ বুড়ী আর তার বড় ছেলে। বুড়ী বসে আছে ঠিক মোমের পুতুলের মত টান হয়ে আর তার বড় ছেলে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে দাড়ি ঘষছে আর একটানা হাই তুলে চলেছে।

'তাহলে আপনাকে যুদ্ধেই যেতে হবে, কী বলুন?' দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যা, তা তো যেতেই হবে।'

'খুব ভাল কথা। ওই তুর্কীগুলোকে মোক্ষম ধোলাই দেওয়া দরকার।'

তারা রওনা হয়ে গেল। বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে মা রুমাল নাড়ল, দিদিমা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদুও অনবরত চোখের জল মুছছেন।

'ভাল হবে না···এই বিয়ের ফল কক্ষণো ভাল হতে পারে না...' বিড়বিড় করে বললেন দাদু।

একটা টুলের ওপর বসে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। একসময়ে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে গাড়ি দুটো চোখের বাইরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরেও যেন একটা কপাট সশব্দে বন্ধ হল। এতটুকুও ফাঁক থাকল না··· একেবারে নিশ্চিদ্র···

তখনো সকাল হয়নি। রাস্তা জনশূন্য, বাড়ির জানলাগুলো তেমনি খড়খড়ি-বন্ধ। এমন শূন্যতা এর আগে আমি আর দেখিনি। দূরের কোথা থেকে যেন এক রাখালের বাঁশির বিলাপী সুর ভেসে আসে।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে দাদু বললেন, 'আয়রে, চা খাবি আয়। মনে হচ্ছে, আমার কাছে পড়ে থাকাটাই তোর ভাগ্যের লিখন। পাথরের ওপর দেশলাইয়ের কাঠির মতন আমার সঙ্গে লেগে থাকবি।'

সকাল থেকে রাত অবধি আমরা দুজনে নিঃশব্দে বাগানের কাজ করি। দাদু মাটি খোঁড়েন, র‍্যাস্‌প্‌বেরির ঝোপ ছাঁটেন, আপেলগাছের ছালের ওপরের শ্যাওলা ঘষে ঘষে ওঠান, শুঁয়োপোকাগুলোকে মেরে ফেলেন—আর আমি লেগে থাকি আমার নিভৃত ঘরটাকে আরো পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলার জন্যে। আগুনে পোড়া খুঁটিকে কেটে ফেলে দাদু বাঁশ পুঁতেছেন; আমি আমার পাখির খাঁচাগুলো সেই বাঁশেই ঝুলিয়ে রাখি। শুকনো ঘাসপাতার চাঁচ বুনে বুনে রোদ আর শিশির থেকে আড়াল করে রেখেছি আমার এই ঘরটাকে। স্থানটি সত্যিই মনোরম হয়ে উঠেছে।

আমার দাদু বলেন, 'তুই যে নিজেরটা নিজেই করে নিতে শিখছিস এটা সত্যিই সুখের কথা।'

জীবন সম্পর্কে দাদুর মতামতের আমি যথেষ্ট মূল্য দিই। বসবার যে জায়গা-টুকু আমি ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকেছি সেখানে তিনি মাঝে মাঝে এসে বসেন। কথা বলেন ধীরে ধীরে, কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে—যেন অনেক চেষ্টা করে প্রতিটা শব্দ মুখের ভেতর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে তাকে।

'এখন থেকে তোর মায়ের সঙ্গে তোর আর কোন সম্পর্ক রইল না। তুই একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেলি। এবার তোর মায়ের আরো ছেলেপুলে হবে। তোর চেয়ে তাদের ওপরেই তার টানটা হবে বেশি। আর তোর দিদিমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, সব সময়েই মদে বেহুঁশ হয়ে থাকছে।'

কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যান, অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলেন না। মনে হয় যেন কান পেতে কোন কিছু শুনছেন। তারপর আবার একসময়ে তার মুখ থেকে একটা একটা করে গুরুগম্ভীর শব্দ বেরিয়ে আসে।

'তোর দিদিমার এভাবে মদে বেহুঁশ হওয়ার ঘটনা এই নিয়ে দু-বার হল। প্রথমবার এমনি হয়েছিল, যখন মিখাইলকে পল্টনে ডেকে পাঠায়। এই বোকা বুড়ীটার কথা শুনে সেবার আমি ছেলেটার জন্যে রিক্রুট সার্টিফিকেট কিনে আনি। এখন মনে হচ্ছে, ছেলেটা যদি সত্যি পল্টনে যেত তাহলে হয়তো ভালই হত ওর পক্ষে। এমনটা হয়তো হতে পারত না। হুঁঃ, কী সব মানুষ! আমি আর ক'দিন? শিগগিরই মরতে হবে। তার মানে তোর আর কেউ থাকবে না, তুই একেবারে অনাথ হয়ে যাবি। বুঝলি তো? তোকে একাই পাড়ি দিতে হবে এই ভব সংসারে। দ্যাখ, একটা কথা বলি, নিজের হুকুম তামিল করে চলতে শিখিস কিন্তু কক্ষণো অপরের হুকুম তামিল করে চলবি না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার করবি ধীরস্থির ভাবে,কিন্তু নিজে যে-পথে চলবি ঠিক করেছিস তা থেকে একপাও সরে দাঁড়াবি না। সবার কথা শুনবি, কিন্তু নিজের বিবেচনায় যা ভাল মনে হবে সেটাই করবি…'

বর্ষার দিনগুলো বাদে সারা গ্রীষ্মটা আমি বাগানেই কাটাই। এমন কি, গরম হলে রাত্রেও বাগানেই ঘুমিয়ে থাকি। দিদিমা আমাকে একটুকরো ফেল্‌ট্‌'এর কাপড় দিয়েছে, তাই দিয়ে আমার বিছানার কাজ চলে। দিদিমা নিজেও মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে রাত কাটায়; একরাশ খড় নিয়ে এসে আমার বিছানার পাশে শুয়ে পড়ে। আমাকে শুয়ে শুয়ে গল্প বলে। অন্য ধরণের দু-একটা মন্তব্যে মাঝে মাঝে সেই গল্পের খেই হারিয়ে যায়। তার মন্তব্যগুলো ছিল এই ধরণের: 'দ্যাখ্, দ্যাখ, একটা তারা খসে পড়ছে! ও হল মাটি-মায়ের কথা মনে-পড়া উৎকণ্ঠিত কারো আত্মা। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে একজন খাঁটি মানুষের জন্ম হচ্ছে।'

অথবা দিদিমা বলত: 'ওই দ্যাখ্‌রে, একটা নতুন তারা উঠেছে! কী অসীম তার ঐশ্বর্য! ভাব তো একবার—কত দূরে রয়েছে। এই আকাশ। এই আকাশ হচ্ছে ভগবানের মুক্ত বসান উত্তরীয়।

দাদু বিড়বিড় করে বলেন। 'সাধে কি আর বোকা বলি! মরবার পথ তৈরি হচ্ছে। কোমরে গেঁটে বাত ধরবে যে—নয়তো চোরের দল এসে গলা কাটবে'…

সূর্য অস্ত যায়। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল চ্যুতি আগুনের নদীর বন্যার মত বয়ে যায় সারা আকাশে আর সেই আগুন যখন নিভতে থাকে তখন বাগানের সবুজ ভেলভেটের ওপরে সোনালী-লাল ছাইয়ের গুঁড়ো ঝরে পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায়, নিখিল-বিশ্ব আঁধার হয়ে যাচ্ছে আর রাতের উষ্ণতায় অবগাহন করছে। রৌদ্র করে সিক্ত গাছের পাতাগুলো ডালের ওপরে যেন ঝিমিয়ে পড়ে, ঘাসের ডগাগুলো মাটিতে মাথা নুয়ে দেয়। চারদিকে অসীম ঐশ্বর্য ও কমনীয়তা; গানের সুরের মত

নরম একটা সুগন্ধ চারদিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাজনার সুর ভেসে আসে দূরে মাঠের সৈনিকদের তাঁবু থেকে। মায়ের ভালবাসার মত দীপ্ত প্রোজ্জ্বল একটা অনুভূতি জেগে ওঠে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে; নিঃশব্দতা তার উষ্ণ আর নরম স্পর্শ দিয়ে শান্ত করে আমার মনকে। সারাদিনে যা কিছু ধূলো আর জঞ্জাল জমে ওঠে, যা কিছু ভুলে যাওয়া উচিত—সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে মুছে যায়। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকতে তখন আমার কী ভালই না লাগে। একটা একটা করে তারা ফোটে আকাশের গায়ে; আর প্রত্যেকটা তারা আকাশের গভীরতাকে নতুন করে প্রকাশিত করে। সেই সুদূরপ্রসারী গভীরতা মানুষকে আলতোভাবে মাটি থেকে তুলে ধরে—তখন কিছুতেই বোঝা যায় না, পৃথিবীটা সংকুচিত হতে মানুষটার সমান হয়েছে, না, মানুষটা আশ্চর্যভাবে প্রসারিত হতে হতে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এক হয়ে মিশেছে। তারপর নিঃশব্দতা আরো বেড়ে যায়, অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সর্বত্র ছোট ছোট ঝঙ্কার তুলে অদৃশ্য তারগুলো যেন কেঁপে ওঠে। একটা ঘুমন্ত পাখি গান গায়, একটা শজারু খস্‌খস্ শব্দে ছুটে চলে, একটা মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে—আর এই প্রত্যেকটা সুর লহরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক একটা রূপ আছে, এই বিশিষ্টরূপের জন্যেই এই শব্দগুলোকে দিনের বেলার বিভিন্ন শব্দ থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়; আর প্রত্যেকটা সুরলহরীর নিজস্ব এই রূপ স্পর্শ-কাতর নিঃশব্দতায় আরো সুন্দর, আরো ভাস্বর হয়ে ওঠে।

দিনের মৃত্যু হচ্ছে। ঝরে পড়েছে দিনের শেষ পাতাগুলো—একর্ডিয়নের সুরমূর্চ্ছনা, স্ত্রী-কণ্ঠের হাস্যরোল, পাথর বাঁধানো রাস্তায় তলোয়ারের আঘাতের শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

আর মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরের রাস্তা বা খোলা মাঠের দিক থেকে মাতালের সোরগোল ও ছুটে-চলার ধুপধাপ শব্দ শোনা যায়। এই শব্দগুলো এতবেশি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যে এগুলো কখনই মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

দিদিমা ঘন্টার পর ঘন্টা হাতের ওপরে মাথা দিয়ে চোখ খুলে শুয়ে থাকে। নিজের আবেগেই বলে চলে পুরনো সেই দিনের কথা। কথাগুলো আমি শুনছি কি শুনছি না, সেদিকে দিদিমার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অবশ্য কাহিনী নির্বাচনে তার এমন একটা দক্ষতা ছিল যা প্রতিটা রাত্রিকেই বিশেষ সৌন্দর্য ও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

দিদিমার কথার সুরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম যখন ভাঙল তখন মুখের ওপরে রৌদ্র এসে পড়েছে আর কানের কাছে পাখিরা গান গাইছে। রৌদ্রের উত্তাপে সকালবেলার বাতাসে মাতন লাগে, আপেল গাছের পাতাগুলো গা-ঝেড়ে শিশির ঝরায়, সবুজ ঘাসগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে তা কাঁচের মত স্বচ্ছ মনে হয়, ঘাসের ওপর থমকে থাকে পাতলা কুয়াসা। সূর্যের আলো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আর লাইলাক-রঙা আকাশ নীল হয়ে ওঠে ক্রমশই। দৃষ্টির বাইরে আকাশের উঁচু থেকে ভেসে আসে লার্কপাখির গান। নবজাত দিনের সমস্ত শব্দ আর বর্ণ শিশিরবিন্দুর মত ঝরে পড়ে আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করে আর বলতে না পারা এক অনাবিল আনন্দে ভরে যায় আমার অন্তর। মনে ইচ্ছে জাগে, দিনের কর্মতৎপরতার মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিই, মনের মধ্যে কোন জটিলতা না রেখে সবার সঙ্গে মিলে যাই একাত্ম হয়ে।

আমার সারা জীবনের মধ্যে এই সময়েই আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি ও স্থিরতা এসেছিল। এই গ্রীষ্মকালটিতে আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে একটা চেতনা জেগে ওঠে। সে-সময়ে লোকজনকে আমি এড়িয়ে চলি। অভসিয়ান্নিকোভদের বাড়ির ছেলেদের ডাকাডাকি ও চিৎকার কানে আসে, তবুও ওদের সঙ্গে খেলার সাথী হতে ইচ্ছে করে না। আমার মামাতো ভাইরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন খুশি তো হই-ই না, বরং প্রতিমুহূর্তে ভয় হয় ওরা আমার বাগানটাকে না নষ্ট করে দেয়। এই বাগানটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজের হাতে তৈরি জিনিসের প্রথম নিদর্শন।

দাদুর কথা শুনতেও আমার আর ভাল লাগে না। কথাগুলো যেন ক্রমশই কাটা-কাটা ও নালিশে ভরে উঠেছে। দিদিমার সঙ্গে প্রায়ই তার ঝগড়া লাগে। আর দিদিমাকে তখনই তিনি বাড়ি থেকে বের করে দেন। আর যখনই এ-ধরণের ঘটনা ঘটে দিদিমা তখনই গিয়ে ওঠেন ইয়াকভ-মামা কিংবা মিখাইল-মামার বাড়িতে। কখনো এমনো ঘটে যে কিছুদিন তিনি বাড়িই ফেরেন না। বাধ্য হয়ে দাদুকেই নিজের হাতে রান্না বান্না করতে হয়। রান্না করতে গিয়ে চিৎকার আর গালিগালাজ শুরু করেন, আঙ্গুল পুড়িয়ে, কাপ-ডিস ভেঙে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন এবং দিনের পর দিন আরো বেশি ভাবে কৃপণ হয়ে ওঠেন।

মাঝে মাঝে বাগানের মধ্যে আমার ঘরটাতে আসেন। বেশ খোস মেজাজে ঘাসের চাপড়ার ওপরে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। তারপরে একসময়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'কারে, মুখে তোর কথা নেই কেন?

'জানি না!'

তারপরেই শুরু হয় তাঁর উপদেশদান পর্ব। তিনি বলতে থাকেন, 'আমাদের আর কতটুকু দামই বা বল। কেউ আমাদের কোন কিছু শেখাতে আসবে না—সব কিছুই আমাদের শিখে নিতে হবে। এত বই লেখা হয়েছে, এত স্কুল তৈরি হয়েছে—কিন্তু সে-সব পরের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। আমাদের নিজেদেরটা নিজেদেরই করে নিতে হবে।'

বলতে বলতে নিজের চিন্তাতেই ডুবে যান, নিথর-নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে-সময়ে তার দিকে তাকাতে ভয় করে।

ঐ বছরেই শরৎকালে দাদু বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। বাড়িটা বিক্রি করার আগে একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে দুঃখ ভেজা অথচ কঠিন গলায় দিদিমার কাছে বললেন ব্যাপারটা, 'গিন্নী, তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা এ্যাদ্দিন ধরে আমিই করেছি। কিন্তু আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। এবার থেকে তোমার ব্যবস্থা তোমাকেই করে নিতে হবে।'

কথাটা শুনে দিদিমা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। মনে হল, যেন অনেক দিন থেকেই তিনি ঠিক এই কথাগুলোই দাদুর মুখ থেকে শোনার জন্য তৈরিই ছিলেন। ধীরে-সুস্থে নস্যির কৌটা বার করে নাকের মধ্যে নস্যি ঠেসে জবাব দিলে, 'এতে কী আর হয়েছে! যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে তবে তো। এছাড়া করার কি আছে!'

একটা অন্ধ গলির পুরনো একটা বাড়ির মাটির নীচের দুটো অন্ধকার ঘর ভাড়া নিলেন দাদু। বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে দিদিমা একটা লম্বা ফিতে লাগানো বাকলের

তৈরি জুতো নিয়ে গুঁজে দিল উনুনের নীচে। এরপর হাঁটু মুড়ে বসে বাড়ির উপদেবতাকে ডাকতে লাগল 'হে বাড়ির উপদেবতা, তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি দৃশ্যমান হও। তোমার বাহন তৈরি—চেপে বস বাহনটাতে। তারপর আমাদের সৌভাগ্যকে বহন করে নিয়ে চল আমাদের নতুন বাড়িতে।'

দাদু বাইরের উঠোনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'আবার অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু করেছ। ধর্মকর্ম আর কিছু থাকল না দেখছি! খবরদার, থাম বলছি! আমার মুখে কালি লেপতে তোমাকে দেব না!'

ওগো তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে বাধা দিও না। বাধা দিলে অমঙ্গল হবে! কিছুতেই তা তুমি ঠেকাতে পারবে না!' দিদিমা সাবধান করে দিতে চাইল। কিন্তু দাদু ততক্ষণে রেগে লাল। দিদিমার এসব কাজ বন্ধ করে দিলেন।

এরপর তিনদিন ধরে চলল বাড়ির পুরনো আসবাবপত্রগুলো বেচাকেনার কাজ। পুরনো মালের আড়ৎদার একদল তাতারের কাছে দাদু বিক্রি করলেন আসবাবগুলোকে, প্রচণ্ড হাঁকাহাঁকি করে আর গালাগালি দিয়ে দরাদরি করলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল দিদিমা; কখনো হাসছে, কখনো বা কাঁদছে, কখনো নীচু গলায় বলছে, ভাঙুক, সব জিনিস ভাঙুক!' বাড়ি উজাড় করে নিয়ে যাক সবকিছু!'

আমার খেলার জায়গা এই ঘরটাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমারও কান্না পাচ্ছিল।

আমাদের যাওয়ার জন্যে দুটো গাড়ি এল। মালপত্র ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা যে গাড়িটাতে আমি চেপে বসলাম, সেটা চলতে চলতে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যেন আমাকে ছিটকে ফেলে দেবে।

এই ঘটনার বছর দুই পরে আমার মা মারা যায় এবং এই দুটো বছরের প্রতি মুহূর্তেই এই ভাবটাই আমাকে তাড়া করেছে। সব সময়ে মনে হত আমাকে যেন কিসের একটা ঝাঁকুনি অনবরত ছিটকে ফেলে দিতে চায়।

নীচের তলার ঘরদুটোয় উঠে আসার কিছুদিন পরেই মা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। মার শরীরটা রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আচমকা একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করছে তার বড় বড় চোখদুটো। সবকিছুকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা দেখল যেন তার নিজের বাপ-মাকে এবং তার নিজের ছেলেকে সে এই প্রথম দেখছে। একটাও কথা না বলে মা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওদিকে আমার সৎ-বাপ ঘরের ভেতর অনবরত পায়চারি করছে, শিস্ দিচ্ছে, গলা খাঁকারি দিচ্ছে, পিঠমোড়া করে হাত রেখে আঙুল কচলাচ্ছে।

'আরে কত বড় হয়ে গেছিস রে!' দুই হাতের উষ্ণ তালুর মধ্যে আমার মুখখানা ধরে আমার মা বলল। মায়ের পরনে বাদামী রঙের একটা ঢিলেঢালা পোশাক—পেটের কাছটায় উঁচু হয়ে ঢোল হয়ে আছে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সৎ-বাপ বলল, 'নমস্কার খোকা, তুমি কেমন আছ বল?' ঘরের বাতাসটা শুঁকে নিয়ে আবার বলল, 'ঘরটা বড় স্যাঁৎসেঁতে দেখছি তো।'

খুব শ্রান্ত আর এলোমেলো দেখাচ্ছিল দুজনকেই। আমার মনে হল ওদের দুজনকে অনবরত শুধু ছুটতে হয়েছে এবং আপাতত দুজনেরই যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হল হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেওয়া।

আমরা চুপচাপ চা খেলাম। আবহাওয়াটা থমথম করছে। জানলার শার্সির ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, আর দাদু তাকিয়ে দেখছেন সেদিকে।

‘তাহলে ঘরে আগুন লেগে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়েছ?’

‘একেবারে সর্বস্বান্ত,’ রুক্ষ স্বরে আমার সৎ-বাপ বলল, ‘আরেকটু হলে আমরাও রক্ষা পেতাম না, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না আমাদের।’

‘হুঁ, আগুন তো আর যা-তা ব্যাপার নয়।’

দিদিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর কানে কানে আমার মা কি যেন বলল। শুনতে শুনতে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মত চোখমুখ করে দিদিমা তাকিয়ে রইল। আবহাওয়াটা আরো বেশি থমথমে হয়ে গেল।

হঠাৎ দাদু তিক্তকণ্ঠে শান্তভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘ইয়েভগেনি ভ্যাসিলিয়েভিচ, লোকে বলে ওসব আগুন টাগুন বাজে কথা, তুমি তাস-খেলায় সর্বস্বান্ত হয়েছ।’

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মত হিম-শীতল স্তব্ধতা নেমে এল; শুধু জানলার শার্সিতে বৃষ্টি পড়ার ঝিমঝিম শব্দ আর সামোভারের জল ফোটার শোঁ শোঁ আওয়াজ।

‘বাবা!’ কিছুক্ষণ পরে আমার মা কথা বলল।

‘বাবা!’ দাদু তিক্ত একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘এবার? এবার কী হল? তখন আমি বলিনি যে ত্রিশ বছরের মেয়ের পক্ষে কুড়ি বছরের একটা ছোকরাকে বিয়ে করবার মত পাগলামি আর কিছু হতে পারে না। কেমন, এবার শিক্ষা হল তো? আর এদিকে তুমি এখানে, চমৎকার! নয় কী? তোকে ভদ্রঘরের বৌ করেছে, না? এখন কেমন লাগছে?’

একথার পর চারজনেই একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল। সবচেয়ে বেশি চিৎকার করল আমার সৎ-বাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি সদরের দিকে চলে এলাম এবং একটা কাঠের স্তূপের ওপর হতভম্ব হয়ে বসে পড়লাম। এখন যাকে আমি দেখছি, সে কক্ষণো আমার মা হতে পারে না। আমার মা ছিল একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। ঘরে থাকার সময়েই এই ধারণা খানিকটা আমাকে উতলা করেছিল, কিন্তু এখন বাইরের এই অন্ধকারে বসে পুরনো দিনের মাকে আমার খুব স্পষ্টভাবে মনে হতে লাগল।

পরের ঘটনাগুলো আমি ভুলে গেছি। শুধু এটুকু মনে আছে, সর্মোভোর একটা নতুন বাড়িতে আমাকে উঠে আসতে হয়েছিল। বাড়িটা কাঠের, দেওয়াল-গুলোতে কাগজ আঁটা নেই। পাট গুঁজে দেওয়া হয়েছে ফাটলগুলোতে— অসংখ্য আরশুলার সঙ্গে বাস করতে হবে। রাস্তার দিকের ঘর দুটোতে থাকে আমার মা ও আমার সৎ-বাপ, আর দিদিমা ও আমি থাকি রান্নাঘরে। রান্নাঘরে একটামাত্র জানলা; জানলাটা খুললে একটা ছাদ দেখা যায়। তার পেছনে আকাশে কালো ছবির মত ফুটে ওঠে কারখানার কালো কালো চিমনি। চিমনিগুলো থেকে পাক খেয়ে খেয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ওঠে আর শীতকালের বাতাসে সেই ধোঁয়া সারা অঞ্চলে জুড়ে বসে। সেই চিমনির ধোঁয়ার তেল-চিটে গন্ধে আমাদের এই ঠাণ্ডা ঘরগুলো সব সময়ে ভরে থাকে। ভোর না হতেই কারখানার বাঁশি নেকড়ের মত হেঁকে ওঠে ‘উ-উ-ওয়া! উ-উ-ওয়া!’

একটা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে জানলার ওপর দিকের শার্সি দিয়ে তাকিয়ে

দেখলে কারখানার আলো ঝলমলে গেট দেখতে পাওয়া যায়। গেটটা বুড়ো ভিখিরির ফোকলা মুখের মত হাঁ করে আছে, আর ক্ষুদে মানুষগুলোকে যেন পালে পালে গিলছে। দুপুরবেলা আবার কারখানার বাঁশি বাজে; কারখানার গেট আরেকবার তাদের কালো কালো ঠোঁটগুলো ফাঁক করে দেয় আর বেরিয়ে পড়ে যেন এক অতল গহ্বর। সেই গহ্বর থেকে জীর্ণ ও শ্রান্ত অবস্থায় উগরে উগরে বার করে দেয় সেই সব ক্ষুদে মানুষগুলোকে; কালো একটা স্রোতের মত রাস্তা থেকে রাস্তায় যায় সেই মানুষের দল। তুষার-তাড়িত বাতাস যেন তার শুকনো সাদা হাত দিয়ে তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। সারি সারি ছাদ ও বরফের পাড়ের ওপরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকে আরেকটা পাণ্ডুর বর্ণের সমতল ছাদ—যা কল্পনাকে ব্যাহত করে এবং অবাঞ্ছিত একঘেঁয়েমিতে দৃষ্টিকে আহত করে।

সন্ধ্যার সময়ে কারখানার ওপরে আকাশে আবছা একটা লাল আভা জমে থাকে। আলোর রেখা পড়ে চিমনির কিনারগুলোতে আর তাই দেখে মনে হয়—চিমনিগুলো মাটি থেকে আকাশে উঠছে না, আকাশের ধূসর মেঘ থেকেই যেন নেমে আসছে নিচের দিকে; আগুন গিলে খাচ্ছে আর পরম তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলছে আর হুঙ্কার দিচ্ছে। দিনের পর দিন একই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আমার মনের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হয় আর একটা প্রতিহিংসার জ্বালা অনুভব করি। দিদিমা গেরস্থালির সব কাজই করে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের কামাই নেই—রান্না করে, ঘর মোছে, কাঠ কাটে, জল তোলে। সারাদিনের পর সন্ধ্যের দিকে আর চুপ করে থাকতে পারে না, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। মাঝে মাঝে রান্না হয়ে যাবার পরে সে একটা তুলোর জ্যাকেট পরে স্কার্টটা তুলে ধরে বেরিয়ে যায় শহরের দিকে। বলে, 'যাই, একটু দেখে আসি বুড়ো কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব দিদিমা!'

'পাগল হয়েছিস তুই! ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাবি যে! কি রকম হাওয়া বইছে দেখছিস না!'

বরফে চাপা পড়া রাস্তার কোন হদিশ খুঁজে পাওয়া ভার। তার ওপর দিয়েই পুরো সাত ভার্স্ট পথ হেঁটে দিদিমা শহরে যায়।

আমার মা অন্তঃসত্ত্বা; শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ফুলে উঠেছে। লম্বা পাড় বসান একটা ছাইরঙা ছেঁড়া শাল গায়ে জড়িয়ে মা বসে থাকে। এই শালটাকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। এই শালটা মুড়ি দিলে মায়ের দীর্ঘ সুন্দর চেহারাটা কেমন বিকৃত দেখায়। শালের পাড়টা ঝুলছে, দেখে আমার গা জ্বলে ওঠে; এই পাড়টা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এই কারখানা, এই গোটা জায়গাটাই আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। একটা পুরনো ছেঁড়া ফেল্টের জুতো পায়ে দিয়ে মা বেড়ায়, কাশে, আর কাশতে গিয়ে মস্ত পেটটা কেঁপে ওঠে। মা'র পাণ্ডুর নীল চোখদুটোয় একটা কঠোর ও শুষ্ক ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে যায়। কিংবা ফাঁকা দেওয়ালের দিকে মৃতের মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মা, মনে হয় যেন দেওয়ালে তার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, হয়তো

পুরো একটা ঘন্টাই কেটে যায়—সেদিকে খেয়ালই হয় না। রাস্তাটা যেন একটা চোয়ালের মত। চোয়ালে যেমন কতকগুলো দাঁত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালো আর বিশ্রী হয়, বাকিগুলো খসে পড়ে; আর এই খসে-পড়া দাঁতের জায়গায় লাগান হয়ে থাকে চোয়ালের তুলনায় বেমানান সব থ্যাবড়া থ্যাবড়া নতুন দাঁত, রাস্তাটাকেও তেমনিই বেখাপ্পা দেখায়।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'এমন বিশ্রী জায়গায় আমরা থাকি কেন?'

'চুপ, একথা একেবারে বলিসনা।' মা জবাব দেয়।

আজকাল মা আমার সঙ্গে খুব কম কথা বলে। যেটুকু বলে তাও হচ্ছে শুধু ফাইফরমাশ, 'এটা নিয়ে আয়, ওটা নিয়ে যা; যা তো দোকানে একবার...ইত্যাদি।

বাইরে খেলাধুলো করতে যেতে আমাকে প্রায় একেবারেই বারণ করে দেওয়া হয়েছে। মা আমাকে সহজে ছাড়ে না। বাইরে গেলেই আমি সঙ্গিদের হাতে বেদম মার খেয়ে আসি। মারামারি করে আমি যা আনন্দ পাই এমন আর কোন কিছুতেই পাইনা। আমার সমস্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে এই কাজেই লেগে থাকি। মা আমাকে বেল্টের বাড়ি মারে, কিন্তু যতই শাস্তি পাই ততই প্রতাপের আমার রোখ বেড়ে যায়। ফল হয় এই যে, পরের বার মারামারি করার সময় আমার গোঁয়ার্তুমিটা আরো বেশি বেড়ে যায় আর বাড়ি ফিরলে মা আমাকে আরো বেশি শাস্তি দেয়। একবার তো মাকে আমি শাসিয়ে জানিয়ে দিই যে যদি আমাকে এভাবে মারধোর করা হয় তাহলে আমি মায়ের হাত কামড়ে দেব আর বাইরে মাঠে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরব। আঁৎকে উঠে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আস্ত একটা জানোয়ার তৈরি হয়েছিস দেখছি।'

মানুষের মনের যে প্রাণবন্ত আর রামধনুর মত উজ্জ্বল ভাবটুকুর নাম ভালবাসা, তা আস্তে আস্তে আমার মন থেকে উবে যেতে থাকে। আর সে জায়গায় দেখা দেয় সকলের বিরুদ্ধে ও সবকিছুর বিরুদ্ধে দ্বেষের নীল ঝলক, তুষের আগুনের মত অসন্তোষ, আর এই বীভৎস রকমের তাৎপর্যহীনতায় আমি একেবারেই একা— এমনি একটা ধারণা।

আমার সৎ-বাপ আমাকে শাসন করে আর আমার মায়ের সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। এই লোকটা সব সময়েই শিস্ দেয় আর কাশে, আর একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকা-বাঁকা দাঁত খোঁটে। প্রায়ই ঝগড়া করে আমার মায়ের সঙ্গে আর এই ঝগড়াটা ক্রমশই বেড়ে চলে। মাকে এমন নিরস ও দূরত্বের ভঙ্গিতে ডাকে যা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ঝগড়ার সময় রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। স্পষ্টই বুঝতে পারি যে তার কথাগুলো আমি শুনি, এটা সে চায় না। কিন্তু সেই ভারি আর রুক্ষ গলার স্বর শোনবার জন্যে আমি ওৎ পেতে থাকি।

একদিন শুনলাম, মেঝেতে পা ঠুকে সে চিৎকার করে বলছে, 'কুত্তী, জানিস যে তোর ওই জয়ঢাক পেটটার জন্যে আমি লোকজনকে বাড়িতে আনতে পারি না!'

শুনে আমি থ বনে গেলাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ছাদের সঙ্গে এমন জোরে মাথাটা ঠুকে গেল যে আমার জিভে দাঁত বসে গেল।

প্রতি শনিবারই দলবেঁধে মজুরেরা আসে আমার সৎ-বাপের কাছে। কোম্পানির দোকান থেকে খাদ্য কেনার জন্যে মজুরদের কুপন বরাদ্দ আছে; কুপনগুলো ওরা বিক্রি করে। কারখানা থেকে এই কুপনগুলো দেওয়া হয় মজুরির বদলে আর আমার সৎ-বাপ সেগুলো অর্ধেক দরে কেনে। মজুরদের সঙ্গে সে দেখা করে রান্নাঘরের টেবিলের সামনে বসে, মুখে বেশ একটা দেমাকী ভাব ফুটিয়ে তোলে আর প্রতিটা কুপন হাতে নিয়ে উপেক্ষার সঙ্গে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে, 'দেড় রুবল।'

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, যীশুর দোহাই...'

'দেড় রুবল।'

এই বিপর্যয়কর ও অন্ধকার জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মা'র যখন আঁতুড়ঘরে যাবার সময় হয়ে এল, তখনই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দাদুর বাড়ি। দাদু তখন কুনাভিনো অঞ্চলে পেশ্চানায়া স্ট্রিটে একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়িটার কাছেই নাপোলনায়া গির্জার সমাধিস্থান। দাদুর ঘরটা ছোট আর এই ছোট ঘরে একটা বিরাট রুশ উনুন ছিল। উঠোনের দিকে ছিল দুটো জানলা।

'এই যে, এসেছিস!' আমাকে দেখে দাদু একটু যেন শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'কথায় বলে না যে, মা'র চেয়ে বড় আপন নেই, কিন্তু তোর বেলায় কথাটা মোটেই খাটে না। এই বুড়ো-শয়তান দাদুটাই হয়ে উঠল তোর সব থেকে আপনজন! হুঁঃ, কি সব মানুষ!'

এই বাড়িটার সঙ্গে সবে আমি কিছুটা পরিচিত হয়েছি, এমন সময় বাচ্চা কোলে নিয়ে আমার মা ও দিদিমা এসে হাজির হল। মজুরদের প্রতারণা করার অপরাধে কারখানার চাকরিটা খুইয়েছে আমার সৎ-বাপ। কিন্তু বন্ধুবান্ধবকে ধরাধরি করে সঙ্গে সঙ্গে রেলস্টেশনের ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছে।

তারপর বেশ কিছুটা ফাঁকা সময় কেটে যাবার পর আবার আমাকে পাঠান হল মা'র সঙ্গে থাকার জন্যে। এবারে পাথরে তৈরি একটা বাড়ির মাটির তলার ঘর। সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল আর প্রথম দিন থেকেই আমি স্কুল-জীবন পছন্দ করতে পারলাম না।

আমার স্কুল যাবার পোষাকটা ছিল এইরকম: পায়ে মা'র একজোড়া জুতো; পরনে দিদিমার ব্লাউজ কেটে তৈরি কোট, হলদে শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমার পিছনে লাগতে শুরু করে দিত আর গায়ের হলদে শার্টটার জন্যে সবাই ঠাট্টা করে আমার নাম রেখেছিল, 'রুইতনের টেক্কা'। ছেলেদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে আমাকে খুব বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু স্কুলের পাদরি আর শিক্ষকমশাই প্রথম থেকেই আমাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন।

শিক্ষকমশাইটির টাকমাথা ও হলদে মুখ। মাঝে মাঝে তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ে। নাকের ফুটোয় তুলো গুঁজে দিয়ে তিনি ক্লাশে ঢোকেন, ডেস্কের সামনে নিজের জায়গাটাতে বসে নাকিসুরে প্রশ্ন করেন আমাদের। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে নাক থেকে তুলো টেনে বের করে মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখেন। তার মুখটা থ্যাবড়া আর কাঠ-খোট্টা। মুখের রঙটা তামার মত, মুখের ভাঁজে ভাঁজে সবুজ একটা আস্তরণ পড়েছে। কিন্তু তার মুখের যে জিনিস দেখে সবচেয়ে বেশি গা ঘিন্ ঘিন্ করত তা হল তার কুৎকুতে চোখ দুটো। সারা মুখের সঙ্গে এই চোখদুটোর যেন একটুও মিল নেই। আর এই চোখদুটো

সারাক্ষণ আমার ওপরে নিবদ্ধ থাকত। তখন আমার এমন একটা অবস্থা হত যে ইচ্ছে হত হাত দিয়ে আমার মুখটা মুছে নিই।

প্রথম প্রথম ক্লাশে আমি বসেছিলাম সামনের বেঞ্চিতে, শিক্ষকমশাইয়ের একেবারে সামনে। ক্রমশ সেটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল যে শিক্ষকমশাই আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, এবং নাকিসুরে আমাকেই শুধু বলে চলেছেন, 'পেস্কো-ও-ভ, জামাটা বদলে আসবে!' পেস্কো-ও-ভ, মেঝেতে পা ঘোষো না! পেস্কো-ও-ভ, তোমার জুতো থেকে মেঝেয় কাদা লাগছে।'

আমিও ছেড়ে কথা কই না। মাথা থেকে সব মারাত্মক ধরণের প্যাঁচ বের করে তাকে নাস্তানাবুদ করি। একদিন করলাম কী, একটা আধ-পচা তরমুজ যোগাড় করে সেটা আধ খানা করে কেটে নিলাম। তারপর সেটাকে একটা কপিকলে ঝুলিয়ে রাখলাম অন্ধকার বাইরের ঘরের দিকে দরজার ওপরে। দরজাটা খুললেই তরমুজের টুকরোটা শূন্যে উঠে যায় কিন্তু শিক্ষকমশাই যেই দরজাটা বন্ধ করলেন অমনি সেটা নেমে এসে টুপির মত থপ করে তার টাক মাথায় পড়ল। এই ঘটনার পরে স্কুলের পাহারাদার শিক্ষকমশাইয়ের চিঠি নিয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিল। ফলে বেশ একচোট পিটুনি খেতে হল আমাকে।

আর একবার তার ডেস্কের ড্রয়ারে নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখেছি। এতে হাঁচতে হাঁচতে তাঁর অবস্থা এমন হল যে বাধ্য হয়ে তিনি ক্লাশ ফেলে চলে গেলেন। তিনি নিজে আর আসতে পারলেন না, তার এক জামাইকে ক্লাশ করতে পাঠিয়ে দিলেন। এই জামাইটি হল এক অফিসার। সে ক্লাশে এসে আমাদের দিয়ে শুধু গান গাওয়ালো। তারমধ্যে একটা হচ্ছে, 'ভগবান জারকে দীর্ঘজীবী করুন!' অন্যটা, 'স্বাধীনতা, আমার প্রিয় স্বাধীনতা!' কেউ বেসুরো গাইলে সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে তার মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারে। তার টোকা মারার ভঙ্গিটা ভারি মজার; খুব শব্দ হয় বটে কিন্তু এতে ব্যথা লাগে না।

ধর্মপুস্তক যিনি পড়ান তিনি একজন তরুণ বয়সী পাদরী, মাথায় ফুলো ফুলো ঘন চুল এবং চেহারাটা ছিল সুন্দর। তিনি আমাকে পছন্দ করতেন না এই কারণে যে 'বাইবেলের গল্প' বইটা আমার ছিল না, আর তার কথা বলার ভঙ্গিটা আমি নকল করতাম।

ক্লাশঘরে ঢুকেই তার প্রথম কাজ ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা, 'পেশকভ, তুমি বই এনেছ, না আননি? হ্যাঁ। বইয়ের কথা বলছি।'

'না, আনিনি। হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ'-এর অর্থ?'

'না।'

'যাও, বাড়ি চলে যাও! হ্যাঁ, বাড়ি। কারণ তোমার মত ছেলেকে পড়াবার ইচ্ছে আমার নেই। হ্যাঁ, একেবারেই ইচ্ছে নেই!'

বাড়ি ফিরে যেতে আমার আপত্তি ছিল না। তাহলে আমি স্কুল-ছুটির সময় না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের নোংরা রাস্তাগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারি এবং চারপাশের বিচিত্র হট্টগোলে পূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য করতে পারি।

পাদরিমশাইয়ের মুখটা বেশ সুন্দর, ঠিক যিশুর মুখের মত। মেয়েলি চোখ

ঠোঁ থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ে। ছোট ছোট হাত ; বই, রুল বা কলম বা অন্য যা-কিছুর ওপরে সেই হাতের ছোঁয়া পড়ে, মনে হয় যেন তিনি সেটাকে আদর করছেন ! মনে হয়, প্রতিটি জিনিষকে তিনি ভালোবাসেন, প্রতিটি জিনিষকে তিনি জীবন্ত বলে মনে করেন,—পাছে অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করলে এই জিনিষগুলোর ব্যথা লাগে। তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপরে তার স্নেহটা এর চেয়ে কমই ছিল, তবুও ছেলেমেয়েরা তাকে ভালবাসত।

স্কুলে আমি মোটামুটি ভালই নম্বর পেয়েছি কিন্তু তবুও আমাকে জানান হল যে আমার বদমাইশির জন্যে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। খবরটা শুনে আমি উদ্বিগ্ন হলাম। ব্যাপারটা যদি এরকম ঘটে তবে নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারের ফলাফল আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। আমার মা'র মেজাজটা ক্রমাগতই খিট্‌খিটে হচ্ছে এবং আজকাল প্রায়ই সে আমাকে মারধোর করে।

কিন্তু এই চরম বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেলাম। বিশপ ক্রিশান্‌ফ আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এলেন—একেবারে হঠাৎই। আগে থেকে কোন খবর ছিল না। যতদূর আমার মনে আছে বিশপ ক্রিশান্‌ফের পিঠে কুঁজ ছিল।

ছোটখাটো মানুষটা—পরনে কালো পোশাক ; তিনি যখন ক্লাশঘরে ঢুকে ডেস্কের সামনে আসন গ্রহণ করলেন তখন খুশি ও অন্তরঙ্গতার একটা অজানা হাওয়ায় ক্লাশঘরটা ভরে গেল।

জামার মস্ত আস্তিনের ভেতর থেকে ছটো হাত বার করে তিনি বললেন, 'ওহে বাপধনেরা, এস, একটু গল্পগুজব করা যাক।'

নাম ধরে ধরে তিনি এক-একজনকে ডেস্কের সামনে ডেকে পাঠালেন। আমার পালা এল তালিকার একেবারে শেষে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বয়স কত? সত্যি? বাঃ, এইটুকু বয়সেই কী শরীর তোমার! অনেক রোদেজলে এমন চেহারা হয়েছে নিশ্চয়ই?'

রোগা রোগা হাত, আঙ্গুলের নখগুলো লম্বা আর ছুঁচলো। একটা হাত রাখলেন টেবিলের ওপরে, অন্য হাতে ধরলেন মুখের অল্প কয়েক গোছা দাড়ি। স্নেহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ধর্মপুস্তকের যেসব গল্প তোমার ভাললাগে তার মধ্যে একটা বল দেখি।'

যখন আমি তাকে বললাম যে ধর্মপুস্তকের পাঠ্য বই আমার নেই, সেহেতু কোন গল্প বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তিনি টুপিটা ঠিকঠাক করে বসে বললেন, 'বই না থাকলে তো চলবে না। এসব তো তোমাকে বাপু শিখতেই হবে—বুঝেছ? বইয়ের গল্পগুলোর কথা থাক। আচ্ছা, অন্যের মুখেও তো কিছু শুনে থাকতে পার—যে কোন একটা গল্প বা যা-হোক—তাই একটা বল দেখি শুনি। তুমি 'প্রার্থনা-সঙ্গীত' পড়েছ? বেশ, বেশ! উপাসনা করতে শিখেছ? বাঃ, কে বললে তুমি কিছু জান না? আচ্ছা, কোন সাধু-মহাপুরুষের জীবনী জানা আছে? কি বললে, ছড়ায় বলতে পার? তুমি যে দেখছি একেবারে পণ্ডিত হয়ে উঠেছ হে!'

এমন সময়ে আমাদের স্কুলের পাদরিমশাই এসে হাজির হলেন। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, আর তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছেন। বিশপ তাকে আশীর্বাদ করলেন, তারপরেই তিনি আমার নামে অভিযোগ করতে লাগলেন বিশপের

কাছে। হাত উঠিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বিশপ বললেন, 'একটু সবুর করুন! ঈশ্বরানুগৃহীত আলেক্সেই-এর গল্পটা একটু শোনাও দেখি···'

একটা পংক্তি ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা মনে করবার জন্যে একটু থামতেই তিনি বললেন, 'ভারি চমৎকার ছড়া, কী বল বাবা? মনে হচ্ছে, এ গল্পটা ছাড়াও আরো অনেক গল্প তোমার জানা আছে। আচ্ছা, রাজা ডেভিডের গল্পটা জানা আছে? বেশ, বেশ। তাও জান? ভারি খুশি হলাম তোমার কথা শুনে!'

আমি বুঝতে পারছিলাম, এই গল্পগুলো শুনতে তার খুবই ভাল লাগছে এবং ছড়া তিনি খুবই ভালবাসেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি বলে চললাম। আমাকে বাধা না দিয়ে চুপ করে শুনে গেলেন তিনি, শেষকালে বললেন, 'তুমি কি 'প্রার্থনা-সঙ্গীত' থেকে বর্ণপরিচয় শিখেছ? কে তোমাকে পড়িয়েছিলেন? তোমার দাদু? লোক ভাল নয়? তোমার দাদু খারাপ-মানুষ! ছি, ছি, এমন কথা বলতে নেই! আর তুমি বুঝি খুব দুষ্টুমি কর?'

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম কিন্তু অপবাধ স্বীকার কবি। শিক্ষকমশাই আর পাদরিমশাই ফলাও করে আমার অপরাধের বর্ণনা দিতে লাগলেন। নীচের দিকে চোখ নামিয়ে বিশপ শুনলেন ওদের কথা। শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শুনছ তো, তোমার সম্পর্কে ওঁরা কী বলছেন? এদিকে এস।'

একটা হাত রাখলেন মাথার ওপরে, তার হাতে সাইপ্রেসের গন্ধ। বললেন, 'তুমি এরকম দুষ্টুমি কর কেন?'

'স্কুল আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না? শোন বাবা, তোমার একথা শুনে বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে কোথাও একটা গলদ রয়ে গেছে। স্কুল যদি তোমার ভাল না লাগে তাহলে বলব যে তুমি খারাপ ছেলে। কিন্তু তোমার পরীক্ষার নম্বর তো বলেনা যে তুমি খারাপ ছেলে। নিশ্চয়ই কোথাও একটা গলদ আছে।'

আলখাল্লার ভেতর থেকে ছোট একটা বই বার করে তিনি লিখলেন, 'পেশকভ আলেক্সেই'। আর বলতে লাগলেন, 'তোমার এই দুষ্টুমি যদি বন্ধ করতে পার বাবা, তবে তোমার মঙ্গল হবেই। একটু-আধটু দুষ্টুমি করলে ক্ষতি নেই, ওতে কেউই কিছু মনে করবে না! কিন্তু দুষ্টুমির মাত্রাটা বেশি হলেই সবার পক্ষেই তা অসহ্য হয়ে ওঠে। কি ঠিক বলিনি বাবারা?'

'ঠিক বলেছেন।' কলকণ্ঠে সকলে জবাব দিল।

'আচ্ছা, এবার তোমাদের কথা বলতো শুনি। তোমরা সবাই খুব লক্ষ্মী ছেলে, না?'

'না, না, আমরা মোটেই তা নই।' ছেলেরা হেসে জবাব দিল।

বিশপ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর এমন একটা অবাক হওয়া সুরে কথা বলতে থাকলেন যে শিক্ষকমশাই ও পাদরিমশাই পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

'শোন তোমাদের বলি, তোমাদের মত বয়সে আমিও খুব দুষ্টু ছিলাম। কেন আমাদের ও-রকম দুষ্টুমির ভাব আসে জান?'

ছেলেরা হাসতে থাকে। তিনি তাদের প্রশ্ন করেন, প্রশ্নগুলো এমন কৌশলে করেন যে ছেলেরা নিজেদের কথার জালে নিজেরাই আটকা পড়ে যায়। ভারি

একটা ফুর্তির আবহাওয়া এসে গেছে ক্লাশঘরের মধ্যে, ফুর্তিটা ক্রমশই জোরালো হয়ে ওঠে। শেষকালে একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'তোমাদের মত দুষ্টু ছেলেদের ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না! কিন্তু আমার যাবার সময় হয়েছে, এবার আমাকে যেতে হবে।'

চওড়া আস্তিনটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন সমস্ত ক্লাশের উদ্দেশে, 'বেঁচে থাক বাবারা সব। সৎ কাজে মন দাও। জগৎ-পিতা আর তাঁর সন্তানের নামে, পরম আত্মার নামে, আমি তোমাদের এই আশীর্বাদই করছি। বিদায়।'

'বিদায় প্রভু! তাড়াতাড়ি আবার আসবেন!' ছেলেরা চেঁচিয়ে জবাব দিল।

মাথা নেড়ে তিনি জবাব দিলেন, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। আমি তোমাদের জন্যে বই নিয়ে আসব।' তারপর শিক্ষকমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আজ ওদের ছুটি দিন!'

আমাকে নিয়ে সদরের কাছে এসে তিনি চাপা কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, তোমাকে কথা দিতে হবে যে আর কক্ষণো এমন দুষ্টুমি করবে না। কথা দিচ্ছ তো বাবা? তুমি কেন যে এমন দুষ্টুমি কর তা আমিও বুঝি, কিন্তু বাবা, একটু ধৈর্য ধরে চল। আচ্ছা চলি এবার, কেমন?'

কথাগুলো শুনে আমি খুবই অভিভূত হলাম। অদ্ভুত একটা আবেগ বুকের মধ্যে উথলে উঠল: অবস্থা এমন হল যে, আমার শিক্ষকমশাই যখন আমাকে ক্লাশ শেষ হবার পর আটকে রেখে উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন যে এবার থেকে আমাকে ভেড়ার মত বাধ্য হয়ে চলতে হবে, তখনো আমি স্বেচ্ছায় ও মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলাম।

কোটটা পরতে পরতে সস্নেহে পাদরিমশাই বললেন, 'তোমাকে এখন থেকে আমার ক্লাশ করতে হবে। হ্যাঁ, করতে হবে। আর চুপ করে বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, চুপ করে।'

স্কুলের গোলমাল মিটল। কিন্তু বাড়িতে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলাম। একদিন একটা রুবল চুরি করলাম মা'র তহবিল থেকে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কখনো চিন্তা করিনি। একদিন সন্ধ্যার সময় মা যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল আর আমি বাচ্চাটাকে আগলে বাড়িতে ছিলাম। চুপ করে বসে বসে যখন ভাল লাগছিল না তখন যা-হোক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আমার সৎ-বাপের একটা বই টেনে নিলাম। বইটার নাম, 'চিকিৎসকের স্মারকলিপি'। লেখকের নাম জোর্জ ডুমা। বইটা ওল্টাতে ওল্টাতে পাতার একটা ভাঁজে একটা এক রুবল ও একটা দশ-রুবলের নোট দেখতে পেলাম। বইটার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি। বইটা বন্ধ করে রেখে দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। রুবলটা যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে সেটা দিয়ে শুধু যে 'বাইবেলের গল্প' বইটাই কেনা চলে তা নয়, 'রবিনসন ক্রুশো' বইটাও কিনতে পারি। 'রবিনসন ক্রুশো' নামে যে একটা বই আছে, এ খবরটা আমি অল্প কিছুকাল হল জেনেছি। এক শীতের দিনে টিফিনে আমি ছেলেদের কাছে রূপকথার গল্প বলছিলাম, হঠাৎ একটা ছেলে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'হুঁঃ, এসব রূপকথার গল্পের কোন মাথা-মুণ্ডু নেই, গল্পের মত গল্প বলতে রবিনসন ক্রুশো, সত্যিকারের গল্প যাকে বলে!'

ছেলেদের দলে আরো কয়েকজন 'রবিনসন ক্রুশো' পড়েছে। তারা সকলেই বইটার সুখ্যাতি করল। দিদিমার গল্পকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় আমি মনে খুবই আঘাত পেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে করেই হোক রবিনসন ক্রুশো বইটা যোগাড় করব এবং বইটা পড়ে নিয়ে দেখিয়ে দেব যে দিদিমার গল্পের চেয়ে বইটা এমন কিছু ভাল নয়!

পরদিন আমি যখন স্কুলে এলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল 'বাইবেলের গল্প', এণ্ডারসনের রূপকথার দুটো খণ্ড, তিন পাউণ্ড সাদা রুটি আর এক পাউণ্ড সসেজ। ভলাদিমির গির্জা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে যে অন্ধকার ছোট বইয়ের দোকানটা আছে সেখান থেকেই 'রবিনসন ক্রুশো' বইটা কিনেছি। বইটা খুবই পাতলা, হলদে মলাট, মলাট উল্টিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম ও এক দাড়িওলা লোকের ছবি। লোকটার মাথায় ছিল ফারের টুপি আর কাঁধে বাঘের ছাল। এই দেখে আমি মোটেই আকর্ষণ বোধ করিনি। বরং রূপকথার বইয়ের পুরনো আর ছেঁড়া বাঁধাইটুকু পর্যন্ত আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে।

টিফিনের সময়ে অনেকক্ষণ ছুটি। সেই সময়ে ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা করে আমি রুটি আর সসেজ খেলাম, তারপর সকলে মিলে 'বুলবুল' নামে গল্পটা পড়তে শুরু করলাম। ভারি চমৎকার গল্প, একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই মনকে কেড়ে নেয়।

'চীনদেশে সব মানুষই চীনা, এমন কি সম্রাটও চীনা।' আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে, এই লাইনটির সহজ সরস সুর; এবং তাড়াতাড়ি আশ্চর্য রকমের ভাল আরো কিছু আমাকে মুগ্ধ করল!

'বুলবুল' গল্পটা স্কুলে শেষ পর্যন্ত পড়বার সময় পাইনি। বাড়ি ফিরেই এক কাণ্ড। মা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চিমনি ঝাড়ছিল, আমাকে দেখেই থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুই একটা রুবল নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ! এই যে, বই কিনেছি'

সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করল। আমার হাত থেকে রূপকথার বইগুলো কেড়ে নিল এবং কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে আমি আর কখনো বইগুলো খুঁজে না পাই। মার দেওয়ার চাইতেও এই শাস্তিটাই আমার কাছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল।

এরপর দিনকয়েক আমি স্কুলে যাইনি। ইতিমধ্যে আমার সৎ-বাপ আমার এই চুরির কথা কারখানার লোকদের কাছে গল্পচ্ছলে বলেছে, আবার কারখানার লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছে; ফলে ছেলেদের মুখে মুখে স্কুলেও এই গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যতদূর বুঝেছি এভাবেই গোটা ব্যাপারটা গড়িয়েছিল। তারপর আমি যেদিন আবার প্রথম স্কুলে গেলাম, সবাই আমাকে ডাকল নতুন একটা নামে: 'চোর'। সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট এই নামটা কিন্তু অসঙ্গত। রুবলটা যে আমি নিয়েছি এ ব্যাপারটা গোপন করার কোন চেষ্টা আমি করিনি, ব্যাপারটা আমি তাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেউই আমার কথা বিশ্বাস করল না। তাই বাড়ি ফিরে আমি মাকে স্পষ্টই জানালাম যে আমি আর স্কুলে যাব না।

আমার মা ছিল আবার অন্তঃসত্ত্বা। জানলার ধারে বসে খাওয়াচ্ছিল আমার

ভাই সাশাকে। ধূসর মুখটা ফিরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত আর ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, মুখটা হাঁ হল মাছের মত।

'তুই মিথ্যে বলছিস,' মৃদুস্বরে মা বলল, 'তোর রুবল নেবার কথা অন্যে শুনবে কেমন করে?'

'তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ।'

'নিশ্চয় তুই তাদের বলেছিস। সত্যি কথা বলতো—বলেছিস কিনা? খবরদার যা-তা বলবিনা—কাল আমি স্কুলে গিয়ে নিজেই খোঁজ করে আসব কে একথা বলেছে!'

আমাকে যে বলেছে সেই ছাত্রটার নাম করলাম। শুনে মা'র মুখটা যেন মুষড়ে গেল আর চোখে জল টল টল করল।

রান্নাঘরে উনুনের পেছনদিকে পুরনো কাঠের বাক্স সাজিয়ে আমার জন্যে বিছানা তৈরি ছিল, সেখানে গিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে শুনলাম, পাশের ঘরে আমার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'হায় প্রভু! হায় প্রভু!'

তেলচিট্‌চিটে গরম ছেঁড়া কম্বলগুলোর গন্ধ অসহ্য লাগল আমার। বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছিস? আয়, আমার কাছে আয়।' আমাকে মা ডাকল।

তারপর মেঝের ওপরে পাশাপাশি বসলাম দুজনে! সাশা মা'র কোলে শুয়ে আছে আর মার জামার বোতাম ধরে টানাটানি করছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই মাথা নেড়ে বলে, 'বুবম' মানে, বোতাম।

মা'র গা ঘেঁষে আমি বসে ছিলাম। মা একটা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'জানিস্‌তো, আমরা খুবই গরীব। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা কোপেক···প্রত্যেকটা কোপেক···'

মা তার উষ্ণ হাত দিয়ে আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরেছে। মা যে কথাগুলো বলতে চাইছে তা আর কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

'চামার, একেবারে চামার!' হঠাৎ কথাগুলো বেরিয়ে এল মা'র মুখ থেকে। ঠিক এই কথাগুলো মা'র মুখে আগে আরেকবার আমি শুনেছিলাম।

'মার···' সাশা মা'র কথাটাকে নকল করতে চেষ্টা করল।

ভারি অদ্ভুত এই বাচ্চাটা! ল্যাকপেকে চেহারা আর বিরাট মাথা! চোখদুটো ওর আশ্চর্য রকমের নীল, আর হাসি হাসি চোখে এমনভাবে তাকিয়ে দেখে যেন কিছু একটা ঘটবে বলে সে আশা করছে। অস্বাভাবিক অল্প বয়সেই সে কথা বলতে শুরু করেছে। কক্ষণো কাঁদে না, চরম আনন্দের মধ্যে বাস করছে যেন। সে এত দুর্বল যে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু আমাকে যখনই দেখে ভারি খুশি হয়। ছোট্ট হাতদুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় আর ওর আঙুলগুলোতে সব সময়েই কি করে জানি না ভায়োলেটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এই বাচ্চাটা হঠাৎ মারা গিয়েছিল, অথচ একদম অসুখ বিসুখ ছিল না। সকাল-বেলাতেও নিজের আনন্দে নিজেই মশগুল ছিল, আর সন্ধ্যেবেলায় যখন গির্জার সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছিল তখন কবর দেবার জন্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওর পরের ভাই নিকোলাইয়ের জন্মের ঠিক পরমুহূর্তে।

স্কুলে গিয়ে সকলের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিয়ে আসবে বলে মা যে কথা দিয়েছিল তা রেখেছিল। তারপর থেকে আমি নিয়মিত লেখাপড়া করছি। কিন্তু আবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে আবার আমাকে দাত্ত্র কাছে চলে যেতে হল। ঘটনাটা হল এই যে: একদিন চা খাবার সময়ে আমি উঠোন থেকে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার মা উদ্বিগ্ন হয়ে চিৎকার করছে- 'ইয়েভগেনি, ইয়েভগেনি, তোমার পায়ে পড়ি তুমি যেও না!'

আমার সৎ-বাপ জবাব দিল, 'বাজে কথা বোল না!'

'কিন্তু আমি জানি যে তুমি ওই মেয়েলোকটার কাছেই যাও।'

'বেশ করি যাই—তাতে কী হল?'

দুজনেই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে মা বলল, 'কী নীচ আর অপদার্থ চামার হয়ে গেছ তুমি!'

তারপরেই শুনলাম, আমার সৎ-বাপ আমার মা'কে পিটচ্ছে, আমি ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম—দেখি আমার মা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, পিঠ আর কনুই দিয়ে একটা চেয়ার শক্তভাবে চেপে ধরে আটকে রেখেছে নিজেকে, মাথাটা হেলে পড়েছে পেছনদিকে, অস্বাভাবিক রকম চকচক করছে তার চোখদুটো—আর মা'র ঠিক সামনে ফিটফাট নতুন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সৎ-বাপ, লম্বা পা তুলে মাকে লাথি মারছে। রুপোর বাঁট লাগানো একটা ছুরি তুলে নিলাম টেবিলের ওপর থেকে—আমার বাবার যেসব জিনিস মা'র কাছে ছিল তার মধ্যে এই ছুরিটা ছাড়া আর একটাও অবশিষ্ট ছিল না। তারপরে আমার সৎ-বাপের শরীরের পাশের দিকটা লক্ষ্য করে গায়ের সব শক্তি দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিলাম।

আমার সৎ-বাপের কপাল ভাল বলতে হবে, আমার মা ঠিক সময়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ছুরিটা তার কোট বিদ্ধ করে গায়ের চামড়া ছুঁয়ে গেছে মাত্র। কাৎরে উঠে একপাশটা চেপে ধরে সে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। আর্ত চিৎকার করে আমার মা শক্তমুঠোয় আমাকে ঠেসে ধরল মেঝের ওপরে। উঠোন থেকে ফিরে আমার সৎ-বাপ মা'র হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল আমাকে।

এতসব কাণ্ডের পরেও আমার সৎ বাপ সেদিন সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছিল। উনুনের পেছনদিকে যেখানে আমি শুয়েছিলাম, সেখানে মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আলতোভাবে আমাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেয়ে বলল, 'কিছু মনে করিসনা, দোষ আমারই। কিন্তু তোরও কি মাথা খারাপ হয়েছিল? ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলি!'

আমি যে-জবাব দিয়েছিলাম সেই বক্তব্য সম্পর্কে আমার মনে কোন রকম অস্পষ্টতা ছিল না। মা'কে জানিয়ে দিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এই যে, আমি আমার সৎ-বাপকে খুন করব এবং তার পরে নিজেও আত্মঘাতী হব! আরেকটু হলে করেও বসতাম তাই—অন্ততঃ একবার চেষ্টা তো করে দেখতাম। এখনো পর্যন্ত চোখের সামনে দেখছি সেই কলুষিত পা-টাকে। উজ্জ্বল রঙের ফেট্টি লাগান; ট্রাউজার পরে সেই পাটা বাতাসে দুলছে আর একটা স্ত্রীলোকের বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে যখন বর্বরের মত এই রুশ জীবনের ঘৃণিত দিকটার কথা চিন্তা করি তখন আমার মনে জাগে, এ-সব কথা নতুন করে বলার কোন মানে আছে

কিনা। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আমার দৃঢ় ধারণা যে কথাগুলো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ এ হচ্ছে সেই সময়কার এক অতি ভয়ঙ্কর ও বাস্তব সত্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর মূল তুলে উপড়িয়ে ফেলা যায়নি। এ হচ্ছে এমন এক সত্য যা পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে এবং আমাদের এই লজ্জাকর ও ভয়ঙ্কর জীবন থেকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে, যেন এর কোনরকম চিহ্ন মানুষের স্মৃতিতে আর মানুষের আত্মায় না থাকে।

তাছাড়া, এই সমস্ত বীভৎসতাকে বর্ণনা করার কাজে যে হাত দিতে হয়েছে, তার পেছনে আরো বাস্তব কারণ রয়েছে। এই বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠতে হয়, এমনিতে অতি চমৎকার মানুষকেও এই বীভৎসতা বিকৃত চরিত্রের করে তোলে, কিন্তু তবুও রুশ জাতির এখনো এমন তারুণ্য ও উদ্দাম প্রাণশক্তি আছে যে এই বীভৎসতাকে সে একেবারেই মুছে ফেলতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবেই তা মুছে যাবে।

আমাদের জীবনকে দেখে আশ্চর্য হতে হয় শুধু এইজন্যেই নয় যে, এই জীবনের একদিকে আছে পশুসুলভ প্রচণ্ড একটা নোংরামি যা দিনের পর দিন জড়ো হয়েছে; আশ্চর্য হতে হয় এই জন্যেও যে জীবনের আড়ালে এক সুস্থ সৃজনশীল শক্তিও রয়েছে। তার ফলে সংশক্তির প্রভাব বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে এটুকু আশ্বাসও জাগে, একদিন না একদিন আমাদের দেশের মানুষ এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করবে আর উজ্জ্বল মানবিকতায় অধিষ্ঠিত হবে।

তের

আবার সেই দাদুর সঙ্গে থাকা শুরু হয়ে গেল।

'কী রে হতভাগা, এসেছিস!' টেবিলের ওপরে অস্থিরভাবে আঙুলের টোকা দিতে দিতে দাদু আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আমি কিন্তু তোকে আর খাওয়াতে পারবনা বলে রাখছি। এবার তোর ভার তোর দিদিমাকেই নিতে হবে।'

দিদিমা বলল, 'আমি সে ব্যবস্থা করব। এ আর এমন কি শক্ত কাজ!'

'আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে,' দাদু হুঙ্কার ছেড়ে, আর তারপর শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললেন আমার কাছে, 'জানিস তো, আমাদের এখানে সব আলাদা আলাদা, যার যার, তার তার।'

জানলার কাছে বসে বসে দিদিমা লেস বুনছিল। তার হাতের শলাকা আনন্দের সুরে টুংটাং শব্দে বেজে উঠল, নিচে পেতলের পিন বসান ছোট্ট বালিশটা বসন্তের রোদে সোনালী সজারুর মত ঝকঝক্ করছে। আর চেহারার দিক থেকেও দিদিমা এতটুকু বদলায়নি, মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের এক মূর্তি। কিন্তু দাদু আরো রোগা হয়ে গেছেন, তার গায়ের চামড়ায় অনেকটা ভাঁজ পড়েছে, মাথার লাল চুল পাতলা হয়েছে। তার চালচলনে যে একটা প্রশান্ত আড়ম্বর ছিল তা আর আজ নেই, তার বদলে মেজাজটা গরম আর খিটখিটে হয়েছে, কিছু না কিছু নিয়ে সব সময়েই গণ্ডগোল করেন; সবুজ চোখ দিয়ে সবকিছুই দেখেন সন্দেহ ভরে।

দিদিমা ও দাদুর মধ্যে কিভাবে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে সেকথা হাসতে হাসতে দিদিমা আমাকে বলল। থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি জিনিসগুলো দিদিমাকে দিয়ে দাদু বলেছেন, 'এগুলো সব তোমার। ব্যাস, এই পর্যন্তই। এছাড়া আর কিছু চাইতে এস না আমার কাছ থেকে।'

একথা বলে দিদিমার সব পুরনো পোশাক এবং সম্পত্তি বলতে সামান্য যা

ছিল, তার মধ্যে শেয়াল-কোটটা তিনি নিয়েছেন। সাতশো রুবলে বিক্রি করেছেন রূপোর জিনিসগুলো। আর এই সাতশো রুবল সুদে ধার দিয়েছেন নিজের ধর্ম-পুত্রকে; এই ধর্মপুত্রটি একজন দীক্ষিত ইহুদী, ফলের ব্যবসা করে সে। নির্লজ্জ রকমের লোভী হয়ে উঠেছেন দাদু, এত বেশি লোভ তার যে, সেটা প্রায় অসুখে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরনো দিনের পরিচিত লোকজনের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। এদের কেউ কেউ ধনী ব্যবসায়ী, কেউ বা কারিগর, সকলেই তার পুরনো সহকর্মী। তিনি এদের কাছে গিয়ে বলেন যে ছেলেরা তার সর্বনাশ করেছে এবং এই বলে টাকা চান। পুরনো দিনের খাতিরে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করত এবং দরাজ হাতে টাকাও দিত। বাড়ি ফিরে এসে মোটা মোটা নোটের তাড়া দিদিমার নাকের নিচে নাড়িয়ে ছোট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলত, 'দেখে নাও, ভাল করে দেখ! কেউ দেবে তোমাকে এত টাকা? এর দশ ভাগের একভাগ টাকা যদি কেউ তোমাকে দেয় তো কি বলেছি!'

এই টাকাটা আমার দাদু সবেমাত্র পরিচিত দুজন লোককে সুদে ধার দিলেন। একজনকে সবাই চাবুক বলে ডাকে; পশুর লোমের ব্যবসা করে লোকটা। তার লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় টাক। অপরজন হচ্ছে একটি বোন, একটা দোকান আছে। গালটা তার লাল, কালো চোখ, ঝোলাগুড়ের মত মিষ্টি ও নাদুসনুদুস চেহারা।

বাড়ির মধ্যে সবেতেই ভাগাভাগি। একদিন হয়ত দিদিমা তার নিজের টাকায় খাবার কিনে এনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে, দাদু পরের দিন রুটি ও খাবার কিনে আনেন। যেদিন দাদুর পালা পড়ত সেদিন খাওয়া-দাওয়াটা যাচ্ছেতাই হত। দিদিমা কিনে আনত সেরা মাংস আর দাদু কিনত কলজে ও নাড়িভুঁড়ি। চা আর চিনির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আলাদা আলাদাই ছিল, তবে চা তৈরি হত একটাই পাত্রে! প্রতিবার চায়ের পাতা জলে দেওয়ার পরে দাদু আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'দাঁড়াও, দেখি কতটা চা দিয়েছ?'

তারপর চায়ের পাতাগুলো হাতে নিয়ে খুব সাবধানে একটা একটা করে গুণতেন।

'তোমার চায়ের পাতাগুলো হচ্ছে গিয়ে সরু আর আমার গুলো মোটা মোটা। আমার চায়ে লিকার ভাল হয়—কাজেই তোমার চায়ের ভাগটা আমার চেয়েও বেশি হওয়া উচিত।'

তারপর লক্ষ্য করেন, তার নিজের পাত্রের চা দিদিমার পাত্রের চায়ের মতই ঠিক একরকমই কড়া হচ্ছে কিনা অথবা দিদিমা নিজের কাপে যতবার চা ঢালছেন তার কাপেও ঠিক ততবারই চা ঢালা হচ্ছে কিনা।

শেষবার চা ঢালার সময় দিদিমা জিজ্ঞেস করে, 'আরেক কাপ শেষবারের মত হবে নাকি?'

চায়ের পাত্রের ভেতরটা দেখে নিয়ে দাদু বললেন, 'আচ্ছা বেশ, আরেক কাপ হয়ে যাক শেষবারের মত।'

এমন কি মূর্তির প্রদীপে যে তেলটুকু খরচ হয় তাও দুজনকে পালা করে কিনে আনতে হত; আর এ সব ঘটনা পঞ্চাশ বছর একটানা ঘর করার পরে।

প্রত্যেক ব্যাপারে দাদুর এ ধরণের খুঁতখুঁতুনি দেখে আমি মজাও পেতাম আর

বিরক্তও হতাম। দিদিমা কিন্তু শুধু মজাই পেত। দিদিমা আমাকে বলত, 'এসব কথা মনে রাখবি না! এতে আর এমন কী হয়েছে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বাতিক সৃষ্টি হয়েছে—এই আর কি। চার কুড়ি বয়স পার হল! ব্যাপারটা একবার ভাবত দেখি! অমন বয়সে একটু-আধটু বাতিক হয়েই থাকে—সেটুকু সহ্য করতেই হয়, এতে কারুরই কিছু যায় আসে না। চিন্তার কিছু নেই, যে ভাবেই হোক দু-মুঠো ঠিকই জুটিয়ে নিতে পারব।'

আমিও রোজগারের ধান্দা শুরু করি। প্রতি রবিবার ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি একটা থলে নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হাড়ের টুক্রো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পেরেক ও কাগজ কুড়োই। বিশ কিলো ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কাগজ বা ধাতুর বদলে আবর্জনার কারবারিরা আমাদের কুড়ি কোপেক দিত আর বিশ কিলো হাড়ের টুকরোর জন্যে আট বা দশ কোপেক। আমি আবর্জনা কুড়োই সারা সপ্তাহ ধরে; রবিবার ছাড়া অন্যদিনগুলোতে স্কুল ছুটির পরেই সাধারণত বের হতাম। প্রতি শনিবারে আমার রোজগার হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোপেক। ভাগ্য ভাল হলে কোন সপ্তাহে এর চেয়ে বেশিও হত। রোজগারের পয়সা দিদিমার হাতে এনে দিতাম। দিদিমা পয়সাগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের স্কার্টের পকেটে রেখে দিত। চোখ নিচু করে আমার তারিফ করত, 'সোনা আমার, মাণিক আমার, কী বলে যে তোকে আমি আশীর্বাদ করি! দেখছিস তো, আমাদের কোন দিন উপোস করতে হবে না! আমরা তো সবই করতে পারি!'

একদিন আমার চোখে পড়ল, আমার রোজগারের পয়সার পাঁচকোপেক হাতে নিয়ে দিদিমা নিঃশব্দে কাঁদছে। তার নরম নাকের ডগা থেকে একফোঁটা চোখের জল ঝুলে রয়েছে।

আমি সহজেই টের পেয়ে গেলাম যে রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে যত না লাভ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভ হয় কাঠগোলাগুদাম থেকে কাঠ চুরি করে আনতে পারলে। কাঠের গুদাম আছে ওকা নদীর ধারে, আর বালুচর বলে একটা দ্বীপে। এই দ্বীপে বছরে একবার করে মেলা হয়, সেখানে ধাতু বেচাকেনা হয়। এই উদ্দেশ্যে কাজ চালানর মত অস্থায়ী সব ঘর তৈরি হয়। মেলা শেষ হয়ে গেলে ঘরগুলো খুলে ফেলে কাঠ আর তক্তা সাজিয়ে রাখা হয় থাক দিয়ে। বসন্তকালে নদীর জল বেড়ে না ওঠা পর্যন্ত এই কাঠগুলো বালুচর দ্বীপেই থেকে যেত। ভালমত একটা তক্তা এনে দিতে পারলে গৃহস্থদের কাছে দশ কোপেক দাম পাওয়া যেত। সারা দিনে দু-তিনটে তক্তা চুরি করা অসম্ভব ছিল না। অবশ্য এক বিষয়ে নজর রাখতে হত যে, যদি কোন একটা দিনে কুয়াশা হত বা বৃষ্টি পড়ত তখন পাহারাদাররা গিয়ে ঢুকত ঘরের মধ্যে, সেই দিনগুলোতেই অভিযান চালাতে হত।

অভিযান চলত সদলবলে; সবার ওপরে সবার টান আছে এমনি ছেলে-ছোক্‌রাদের একটা দল। এই দলে ছিল মর্দোভীয় ভিখিরি-মায়ের দশ বছরের শান্তশিষ্ট ছেলে সান্‌কা, ভিখিরির ছেলেটা, নরম প্রকৃতির ছিল, কখনো কারো অনিষ্ট করত না; এই দলে আশ্রয়হীন কস্ত্রমাও ছিল। ওর চেহারাটা ছিল কঙ্কালসার। খোঁচা খোঁচা চুল, প্রকাণ্ড কালো চোখ। ওর যখন বয়স তের বছর, সে-সময়ে এক জোড়া পায়রা চুরি করার অপরাধে ওকে এক শিশুশোধনাগারে পাঠান হয়েছিল। সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে ও আত্মহত্যা করেছিল। তাতার ছেলে খাবিও, বছর বার বয়স, এই দলভুক্ত ছিল। অসাধারণ ছিল ওর গায়ের জোর। উদার ও সরল স্বভাবের

মিশ্রণ ঘটেছিল তার মধ্যে। আরো আছে ভোঁতানাক ইয়াজ—বছর আটেক বয়স, এক কবরখননকারী ও কবরখানার পাহারাদারের ছেলে, মাছের মত নির্বাক থাকত। ছেলেটা অসুখে ভুগছে। এছাড়া আমাদের দলে আরেকজন ছিল সে হল বয়সের দিক থেকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। নাম গ্রিশ্‌কা চুরকা। তার মা বিধবা, সেলাইয়ের কাজ করে। এই ছেলেটা ছিল অত্যন্ত ন্যায়বান ও প্রখর বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং ঘুষোঘুষিতে রীতিমত ওস্তাদ। আমরা সবাই একই রাস্তায় থাকতাম।

আমাদের এই অন্যায় চুরিকে অপরাধ বলে মনে করা হত না। যারা ছোট ব্যবসাদার, আধপেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে, চুরিই ছিল তাদের অধিকাংশের অন্নসংস্থানের প্রায় একমাত্র উপায়। বছরে দেড় মাস ধরে যে মেলা হত তার আয় সারা বছরের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থঘর 'নদীপথে বাড়তি আয়' করত। তার মানে নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা ধরে, অল্প-স্বল্প মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেয়। তার বেশি সময়েই নজর থাকে চুরির দিকে; ভলগা আর ওকা নদীর ধারে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায়, জাহাজঘাটায় অথবা বজরায় নদীর পাড়ে যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারে তাই-ই আত্মসাৎ করে। কে কত বেশি জিনিস হাত সাফাই করতে পেরেছে তাই নিয়ে রবিবারের দিন বড়রা নিজেদের মধ্যে বড়াই করে, আর ছোটরাও তা শুনে শুনে শেখে।

বসন্তকালে যখন মেলার তোড়জোড় চলতে থাকে তখন কর্মব্যস্ত কারিগর ও মজুরেরা সারা দিনের কাজের শেষে মদ খেয়ে চুর হয়ে দলে দলে রাস্তায় বের হয়। আর ঠিক এই সময়েই শুরু হয়ে যায় এই অঞ্চলের বাচ্চাদের পকেটকাটার মরশুম! এই বিশেষ ব্যবসাটার মধ্যে যে অন্যায় কোন কিছু আছে তা একেবারেই মনে করা হয় না এবং বড়দের চোখের সামনেই নির্ভয়ে এই কাজ চালান হয়। সাধারণত চুরি করা হয় ছুতোর মিস্ত্রীর হাতুড়ি, ফিটার মিস্ত্রীর চিমটে, গাড়ির বল্টু। এ সব কিন্তু আমাদের দলটি চুরি করত না।

'আমি ভাই, চুরির ব্যাপারে নেই—মা শুনলে রেগে যাবে।' চুরকা বলল একদিন।

খাবি বলে, 'আমিও নেই। ওসব করতে আমার ভয় করে।'

কস্ত্রমা সাধারণত চোরের সঙ্গ এড়িয়ে চলত আর 'চোর' শব্দটা সে উচ্চারণ করত বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই। যদি কখনো সে দেখে, কোন ছেলে একজন মাতালের পকেট মারছে তাহলে তখন সে সেই ছেলের পেছনে তাড়া করত আর তাকে পাকড়াও করতে পারলে নির্দয়ভাবে মার দিত। ছেলেটার মুখটা ছিল বিষণ্ণ; বড় বড় চোখ, আর হাবভাব চালচলন সব সময়েই বড়দের মত। পথ চলত খালাসীদের মত হেলে দুলে। অনেক চেষ্টার পর সে স্বরকে গুরুগম্ভীর ও বাজখাঁই করে তুলত। সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বুড়োটে ভাব ফুটে উঠত। আর ভিয়াখিরের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, চুরি করা একটা মস্ত পাপ।

কিন্তু বালুচর থেকে খুঁটি বা তক্তা পাচার করে নিয়ে আসাটাকে আমরা একেবারে অন্য ধরণের কাজ বলে মনে করতাম। একাজে আমাদের কারো ভয় নেই এবং এমন একটা কৌশল আমরা বের করেছি যে কাজটা করা আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার হবার পরে কিংবা কুয়াশার দিনে ভিয়াখির আর ইয়াজ সকলের চোখের সামনে দিয়েই গিয়ে হাজির হয় বালুচর দ্বীপে। পায়ের

নিচে এবড়োখেবড়ো গলা বরফ, তার ওপর দিয়েই প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। ওদের দুজনেরই চেষ্টা থাকত যাতে পাহারাওলাদের দৃষ্টি ওদের ওপর পড়ে। ইতিমধ্যে আমরা চারজনে গা ঢাকা দিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসি। ওদিকে পাহারাওলা ভিয়াখির আর ইয়াজের ওপরেই নজর রাখতেই ব্যস্ত থাকে, সেই অবসরে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে তক্তাগুলো বাছাই করতে শুরু করে দিই। তারপর ঐ সঙ্গি দুজন নানা অছিলায় পাহারাওলাদের অপদস্থ করে পালিয়ে যায় আর আমরাও ফিরতি পথ ধরি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে থাকে একটা করে দড়ি; দড়ির একদিকে বড় একটা বাঁকানো পেরেক থাকে; এই পেরেকটাকে আটকে দেওয়া হয় তক্তার সঙ্গে, যাতে বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে তক্তাটা কেটে নিয়ে যাওয়া যায়। আচমকা আমরা হয়ত পাহারাওলাদের নজরে পড়েছি, আর যদি পড়েও থাকি তাহলেও পাহারাওলারা আমাদের ধরতে পারে না। তক্তাগুলো বিক্রি করে লাভের অঙ্ক ছয়টি সমান ভাগে ভাগ করা হত। প্রত্যেকের ভাগে পড়ত পাঁচ কিংবা সাত কোপেক করে।

একদিন পেট পুরে খাওয়ার পক্ষে এই-ই ছিল অনেক। কিন্তু ভিয়াখির যদি তার মা'কে ভদ্‌কার টাকা না দিত তাহলে তার মা তাকে ধরে মারধর করত। কস্ত্রমার অনেক দিনের সখ ছিল যে সে পায়রা পুষবে এবং তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবার জন্যে সে টাকা জমাত। চুরকার মা রোগে ভুগছিল, তাই মা'র চিকিৎসার জন্যে চুরকার প্রতিটা পয়সার দরকার ছিল। খাবিও পয়সা জমাত, কারণ যে শহর থেকে সে এখানে এসেছিল, সেখানে আবার সে ফিরে যেতে চায়। খাবির এক মামা শহর থেকে তাকে নিতে এসেছিল কিন্তু নিজ্‌নি নভ্‌গরদে এসে পৌছানর অল্প কিছুদিন পরেই তার মামা জলে ডুবে মারা যায়। যে শহর থেকে খাবি এসেছিল তার নাম সে ভুলে গেছে; শুধু এটুকুই মনে আছে যে, শহরটা হচ্ছে ভলগার কাছে কামা নদীর তীরে।

কেন জানিনা আমাদের মনে হত খাবির কল্পনার এই শহরটা খুবই একটা মজার ব্যাপার। আমরা এই শহরের কথা তুলে টারাচোখ তাতার ছেলেটাকে প্রায়ই খ্যাপাতাম,

'অতি অপরূপ শহর আছে যে
খোঁজ করি হয়ে হন্যে
দৃষ্টি চলেছে চারদিক পানে
নীচুতে অথবা শূন্যে।'

প্রথম প্রথম এই ছড়া শুনেই খাবি আমাদের ওপর খেপে যেত। কিন্তু একদিন ভিয়াখির তাকে বলল, 'হয়েছে, খুব হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা অমন তামাসা করেই থাকে, তাই বলে অমন রাগ করতে হয় নাকি?'

মিষ্টি স্বরে কথাগুলো সে বলে। আমরা যে ওর নাম 'পায়রা' রেখেছিলাম তা অযৌক্তিক ছিলনা।

এতে তাতার ছেলেটা লজ্জা পেত। তারপর থেকে আমরা পেছনে লাগলেও ও আর গায়ে মাখত না, এমন কি ও নিজেই কামা নদীর ধারের ঐ শহরটা সম্পর্কে তৈরি ছড়া নিজেই সুর করে বলতে শুরু করত।

কিন্তু তবুও তক্তা চুরি করার চেয়ে রাস্তার টুকিটাকি কুড়নোটাই আমরা বেশি

পছন্দ করি। আর বিশেষ করে বসন্তকালে তো কথাই ছিলনা; তখন একাজে খুবই মজা। বরফ গলে যায় আর বৃষ্টির জল ধুয়ে দিয়ে যায় খোলা মেলার মাঠ। সে-সময়ে মেলার মাঠ থেকে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়নি, সত্যেই আবর্জনার স্তূপে খুঁজলেই পেরেক বা ধাতুর টুকরো পাওয়া যেত। মাঝে মাঝে তামা ও রুপোর মুদ্রাও আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু পাহারাওলারা দেখলেই তাড়া করত এবং আমাদের থলেগুলো কেড়ে নিত। পাহারাওলাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের দু-কোপেক করে ঘুষ দিতে হত, নইলে হাতে-পায়ে ধরতে হত। আসল কথা, পয়সা উপায় করাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু এই পয়সা উপায় করার মধ্যে দিয়েই আমাদের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝগড়া যে হয়নি তা নয়, কিন্তু কখনো মারামারি হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

আমাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে তা ভিয়াখির মিটমাট করে দিত। রাগ করার যে কারণই থাকুক না কেন, ওর কথাগুলো ছত খুবই সহজ ও সাধারণ, কিন্তু এতেই আমরা অবাক হতাম এবং নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই লজ্জা পেতাম। এমন কি কথাগুলো বলে ভিয়াখির নিজেও অবাক হয়ে যেত। ইয়াজকে খুব জঘন্য সব ফিকির আঁটতে দেখেও ও কোন দিনই রাগ করেনি বা শংকিত হয়নি। এসব ও গ্রাহ্যই করত না; ও বলত, এসব হচ্ছে বোকামি; এসবের কোন মানে নেই। আর একথা বলে সে শান্তভাবে সব কিছু উড়িয়ে দিত।

ও প্রশ্ন করত, 'আচ্ছা বলতো, তুই এসব কাজ করিস কেন?' আর ওর প্রশ্ন শুনে সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারত যে, সত্যি সত্যিই এসব কাজের আদপে কোন মূল্যই নেই।

ওর নিজের মায়ের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, মাকে বলে, 'আমার মর্দোভীয়নী।' আমাদের কারো কাছে কোন দিনই মনে হয়নি যে এই কথাগুলোর মধ্যে একটা মজা লুকিয়ে আছে।

দুটো গোল সোনালী চোখের ঝিলিক তুলে হাসতে হাসতে সে বলত, 'গত রাতে আমার মর্দোভীয়নী একেবারে মদে চুর হয়ে বাড়ি ফেরে। তারপরে সদরের সিঁড়ির ওপরেই উবু হয়ে বসে গান জুড়ে দেয়। গান গেয়েই চলে, থামার নাম নেই আর—এমনি বেহায়া! ধাড়ী মুরগীর মত।'

চুরকা গুরুগম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী গান গাইছিল রে?'

ভিয়াখির ওর মায়ের গাওয়া গানটা গেয়ে শোনায়; সরু চড়া গলা, আর গানের সঙ্গে সঙ্গে চাপড় মারতে থাকে হাঁটুতে। গানটা হল এই:

'ঠক্ ঠক্ ঠক্!
রাখাল এক টোকা দিয়ে যায় শার্সিতে
মন বসেনা ঘরে আমার কোন মতে!
সূর্যি যখন হেলে পড়ে পশ্চিমে—বেজে ওঠে বাঁশি
রাখাল ছেলের মধুর সুরে ভারি মিঠে হাসি।
আচাম্বিতের সে গান শোনে লোক
ঠক্ ঠক্ ঠক্!'

ও এমনি ধরণের অনেক অনেক মজার গান জানত আর গাইতে পারত

চমৎকার। তারপর সে বলে এরপর কী হল শোন, 'ওখানে, ওই সদরের চৌকাঠেই মা ঘুমিয়ে পড়ে ; আর খোলা দরজা দিয়ে সে কি গা শিউরে ওঠা ঠাণ্ডা হাওয়া। এই হিম জামাকাপড় ফুঁড়ে আমার সর্বাঙ্গে যেন বিঁধতে থাকে। আর সেই বিশাল চেহারাটা দরজা থেকে সরিয়ে আনি এ ক্ষমতাই নেই। সকাল হয়ে গেলে বলি, 'আচ্ছা কেন বল ত তুমি এত বেশি মদ খাও ?' সে জবাব দেয়, 'আর ক'টা দিন একটু মুখ বুজে সহ্য কর, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে !'

'ঠিকই তো, তোর মা বেশিদিন আর বাঁচবে না। ওর সারা শরীরটা কি-রকম ফুলে উঠেছে দেখেছিস তো ?' অভিভূত হয়ে চুরকা বলতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোর মা মরে গেলে মন খারাপ হবে না রে ?' আমার এ প্রশ্ন শুনে ভিয়াখির অবাক হয়েই জবাব দেয়, 'তা হবে বৈকি। আলবাৎ হবে। সে যে সত্যিই ভাল মেয়ে।'

আমরা সবাই জানি, ভিয়াখিরের মা ওকে প্রায়ই মারে। তবুও আমাদের অগাধ বিশ্বাস যে, মানুষ হিসেবে সে ভাল। আর তাই, কোন দিন আমাদের লাভের ভাগ কম হলে চুরকা বলত, 'ভিয়াখিরের মা'কে ভদ্‌কা কিনে দেবার জন্যে সবাই একটা একটা কোপেক দিয়ে দাও। নইলে ভিয়াখিরকে ওর মায়ের হাতে মার খেতে হবে।' চুরকা ও আমি ছাড়া দলের মধ্যে আর কেউ লিখতে পড়তে জানত না। এজন্যে ভিয়াখির আমাদের ওপর হিংসে করত।

ইঁদুরের মত ছুঁচলো কান টেনে ধরে নরম গলায় সে বলত, 'আমার এই মর্দোভীয়নী যেদিন মরবে, সেদিনই আমি স্কুলে ভর্তি হব। মাস্টারমশাইয়ের পায়ে মাথা কুটে রাজি করাব, তারপর লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে আর্চবিশপের বাগান তদারকীর কাজ নেব। আর এই কাজ আর্চবিশপের বাগানে না হয়ে, জারের বাগানেও হতে পারে।

ঐ বছরেই বসন্তকালে ভিয়াখিরের মর্দোভীয়নীটি কাঠের স্তূপে চাপড় পড়ল। এক বোতল ভদ্‌কা তার সঙ্গে ছিল। গির্জার নতুন বাড়ির জন্যে এক বুড়ো চাঁদা সংগ্রহ করছিল—সেও চাপা পড়ল একই সঙ্গে। ভিয়াখিরের মাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। গুরুগম্ভীর ভাবে চুরকা ভিয়াখিরকে বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গেই থাকবি। আমার মা তোকে অক্ষর চিনিয়ে দেবে।' এই ঘটনার অল্পদিন পরেই দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ভিয়াখির পড়তে লাগল, 'মুদিরদো কান।' লেখাগুলো পড়তে পেরে সে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলল। চুরকা শুধরে দিয়ে বলল, 'দূর গাধা। মুদিরদো কান নয়, মুদির দোকান।'

'জানি রে বাবা, জানি। তবে কি জানিস, কাব্য গুলিয়ে যায়।'

'কাব্য নয়, বাক্য !'

'অক্ষরগুলো যেন নেচে বেড়ায়। অক্ষরগুলোকে কেউ একজন পড়লে অক্ষরগুলোর তাতে খুশি আর ধরে না।' ও গাছ আর ঘাসকে ভালবাসত। ওর ভালবাসার বহর দেখে আমরা অবাক হতাম আর লজ্জাও পেতাম।

আমাদের এই অঞ্চলে জমি ছিল বালুকাময়। গাছ গাছড়া প্রায় নেই বললেই চলত। গাছগাছড়া বলতে উঠোনের এখানে ওখানে ছিল দু-একটা সরু সরু উইলো, কুঁকড়ন এলডারবেরির ঝোপ বা বেড়ার ধারে সকলের অলক্ষ্যে শুকনো কিছু ঘাস। আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই ঘাসের ওপর বসত তাহলেই ভিয়াখির রেগে যেত আর প্রচণ্ড ধমক লাড়িয়ে বলত, 'ঘাসগুলোর দফারফা করছ কেন ?

বালির ওপরে বসতে পার না? ঘাসের ওপর বসা আর বালির ওপর বসা তো একই কথা।'

ও যদি হাজির থাকে তবে আমাদের গাছগাছড়ায় হাত দেবার সাহস কারো হতনা। এলডারবেরির ঝোপে ফুল ফুটে থাকলে, তার একটা শিষ বা একা নদীর ধারের উইলো গাছের একটা ডাল—কোন কিছুই আমরা ভাঙতাম না।

অবাক হয়ে কাঁধ নেড়ে ও বলত, 'আচ্ছা, শয়তানি করে এভাবে যে জিনিসপত্র নষ্ট করিস—এতে কি লাভ হয় বল তো?'

এসব কথা শুনে আমরা লজ্জা পেতাম!

প্রতি শনিবার আমরা একটা খেলা খেলতাম। এই খেলার তোড়জোড় চলত সারা সপ্তাহ ধরে। তোড়জোড় বলতে রাস্তা থেকে ফেলে দেওয়া গাছের ছালের চটিজুতো কুড়িয়ে রাখতাম। শনিবার সন্ধ্যায় যখন সাইবেরিয়ার জাহাজঘাটা থেকে তাতার খালাসিরা ফিরে যেত তখন আমরা রাস্তার মোড়ে কোন একটা আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাদের দিকে চটিজুতোগুলো ছুঁড়ে মারতাম। প্রথমে ওরা রেগে যেত, আমাদের পেছনে তাড়াও করত; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেরাই এটাকে খেলা ভেবে মেতে উঠত। তখন ওরাও এই লড়াইয়ের কথা ভেবে গাছের ছালের চটিজুতো দিয়ে নিজেদের অস্ত্রাগার ভরিয়ে তুলত। আমরা কোথায় চটিজুতো লুকিয়ে রাখতাম সেটা ওরা লক্ষ্য করত আর মাঝে মাঝে তা চুরি করতে আসত।

আমরা প্রতিবাদ করতাম, 'এভাবে খেলা হয় না।'

ওরা তখন চুরি-করা জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নিত। এরপর শুরু হত লড়াই। সাধারণত ওরা দাঁড়িয়ে থাকত খোলা জায়গায়, আর আমরা জোরে চিৎকার করতে করতে ওদের চারপাশে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতাম আর হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম। তারস্বরে ওরাও চিৎকার করত, আর একটা চটিজুতো খুব ভালভাবে তাক্ করে ছুঁড়ে মারত। আর সেই জুতোয় পা আটকে গিয়ে আমাদের কেউ যদি বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত, অমনি ওরা গলা ফাটিয়ে অট্টহাস্য করে উঠত।

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে খেলা চলত। ছোট ব্যবসাদাররা কোণে দাঁড়িয়ে দেখত আমাদের কাণ্ডকারখানা। মুখে অবশ্য আমাদের অনেক তিরস্কার করত; না করলে ভালও দেখাত না। কিন্তু জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি চলত সমানে; ছাইরঙা, ধুলোমাখা পাখির মত শূন্যে উড়ে বেড়াত জুতোগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভীষণ ভাবে আঘাতও পেত। কিন্তু লড়াইয়ের আনন্দে কোন আঘাত বা যন্ত্রণা আমরা গায়ে মাখতাম না।

তাতাররাও আমাদের মতই উত্তেজিত হয়ে ওঠত। লড়াই শেষ হলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ওরা নিজেদের বাড়িতে যেত। ওরা আমাদের খেতে দিত ঘোড়ার মাংস আর শাকসবাজির একটা অদ্ভুত রান্না। ঘন চা ও পিঠেও দিত খাওয়ার পরে। এই লোকগুলোর চেহারা ছিল প্রকাণ্ড, গায়ের জোরে একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাবে মনে হত। ওদের ভারি ভাল লাগত। ওদের স্বভাবের মধ্যে একটা কিছু ছিল, যাতে মনে হত ওরা শিশুর মতই সরল আর সাদাসিধে। আমি বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম এই দেখে যে ওরা কখনো রাগারাগি করত না আর প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের ওপর ছিল ভারি দরদ।

প্রাণ খোলা হাসি হাসত ওরা, সে-হাসি যেন থামতেই চাইত না। একজন ছিল (এই লোকটি কাসিমভ'এর চাষী, নাকটা ভাঙা ছিল, রূপকথার বীরের মতই ছিল তার গায়ের জোর; একবার সে একটা দশমণি গির্জার-ঘন্টা বজরা থেকে তুলে পাড় ভেঙে ডাঙায় গিয়ে উঠেছিল)—সে হাসতে শুরু করলে গাঁক গাঁক করে হুংকার ছাড়ত আর চিৎকার করে বলত, 'উ-উ! উ-উ! মুখের কথা—আকাশের চিড়িয়া! কথা যদি শুনলে তবে চিড়িয়া ধরা পড়ল! আর সোনার মুদ্রাই শুধু হল আসল কথা!'

সে একদিন তো ভিয়াখিরকে হাতের তালুতে বসিয়ে একেবারে শূন্যে তুলে ধরল। বলল, 'আকাশে থাকার সোয়াদটা বোঝ।'

বৃষ্টির দিনে আমরা জড়ো হতাম ইয়াজের বাড়িতে। গোরস্থানের মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়িতে ইয়াজ তার বাবাকে নিয়ে থাকত। ইয়াজের বাবার ছিল বাঁকা তোবড়ান শরীর, লম্বা লম্বা হাত, মাথায় ও মুখে খোঁচা খোঁচা নোংরা চুল। তার মাথাটাকে দেখে মনে হত বোঁটার মত লিকলিকে ঘাড়ের যেন একটা শুকনো শালগম। দিল খুশ থাকায় হলদে হলদে চোখদুটোকে সরু করে বিড়বিড় করে সে বলে চলত, 'দয়া কর প্রভু, রাত্রিবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঁ হুঁ!'

আমরা খানিকটা চা, চিনি, রুটি আর ইয়াজের বাবার জন্য সামান্য ভদ্‌কা কিনে নিয়ে যাই।

চুরকা হুকুম দিত, 'ওরে চাষী, পাজী কোথাকার, সামোভারে আগুন দিয়ে দে তো দেখি!'

একথা শুনে পাজী চাষী হাসত, হুকুম মতই ও কাজ করত। জল ফুটে উঠতে উঠতে আমরা নিজেদের ব্যাপারগুলো একটু আলোচনা করে নিতাম। সেও আমাদের পরামর্শ দিত, 'নজর রেখো বাবারা, পরশুদিন ক্রুসভদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের একটা খাওয়া আছে। এতে অনেক হাড় পড়বে কিন্তু!'

সবজান্তা চুরকা বলত, 'ক্রুসভদের বাড়িতে একটা মেয়েলোক রান্না করে, সে একটাও হাড় পড়ে থাকতে দেয় না। সবই নিজে নিয়ে নেয়।'

জানলা দিয়ে বাইরে কবরখানার দিকে তাকিয়ে ভিয়াখির বলত, 'শিগগিরই আবার জঙ্গলে ঢোকা যাবে।'

ইয়াজ খুব কমই কথা বলত। বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে ও শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত সবার দিকে। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে কতকগুলো পুতুল পেয়েছিল। আমাদের সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখাত। পুতুল বলতে ছিল একটা কাঠের সেপাই, একটা ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া, কয়েকটা বোতাম, কয়েক টুকরো পেতল।

ওর বাবা টেবিলের ওপরে পেয়ালা সাজিয়ে দিত, সামোভার নিয়ে আসত। পেয়ালাগুলো ছিল কিম্ভূতকিমাকার, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল ছিল না। কস্ত্রমা চা ঢালত। বুড়ো ভদ্‌কা খেয়ে সোজা গিয়ে উঠত উনুনের ওপরে আর সেখান থেকে লিকলিকে ঘাড় নিচু করে প্যাঁচার মত তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে আর বিড়বিড় করে বলত, 'উচ্ছন্নে যা! উচ্ছন্নে যা! তোরা মানুষ নাকি? হুঁঃ! তোরা হলি গিয়ে একদল চোর! দয়া কর প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই।'

'আমরা চোর নই।' ভিয়াখির বলত।

'ছোট চোর আর কি।'

ইয়াঙ্কের বাবার বকবকানি শুনে যখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম, তখন চুরকা ধমক দিয়ে বলত, 'চুপ কর বলছি, পাজী চাষী!'

ইয়াঙ্কের বাবা বসে বসে ফিরিস্তি দিত, এখানকার কতজন লোকের অসুখ করেছে; তারপর জল্পনা-কল্পনা করত এদের মধ্যে কে আগে মরবে এইসব আর কি। তার কথা শুনতে ভিয়াখির, চুরকা ও আমার ভাল লাগত না। ইয়াঙ্কের বাবাকে দেখে মনে হত, কে আগে মরবে ভাবতে পেরেই যেন সে খুশিতে মন ভরিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে এতটুকু দয়ামায়া দেখা যেত না। আর যখন সে বুঝতে পারত যে এসব কথা শুনতে আমরা রাজী নই, তখন ইচ্ছে করে আরো বেশি বলত।

এভাবেই সে আমাদের পেছনে লাগত।

'হুঁ, হুঁ, বাবারা, মহারাজদেব মনে অমনি ভয় ঢুকে গেছে! এই আমি বলে রাখলাম, শুনে রাখ, ওই যে মোটা হোঁৎকা গোছের লোকটা আছে, সে শিগগিরই পটল তুলবে। তারপর পচে মাটির সঙ্গে মিশতে ওর অনেক দিন লাগবে!'

আমরা তাকে থামিয়ে দিই বটে, কিন্তু কিছুতেই একেবারে তার মুখ বন্ধ করতে পারি না।

'আর দেখে নিস, তোদের পালাও এই এল বলে! ছাইগাদার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে খাবার জোটাস, তোদের আয়ুও কি খুব বেশি দিন বলে মনে করিস নাকি তোরা!'

ভিয়াখির বলল 'বেশ, বেশ, মরবই তো। ভালই হবে, মরলে পরে আমরা সবাই দেবদূত হব।'

'দেবদূত হবি তোরা? তোরা।' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত ইয়াঙ্কের বাবা। তারপরেই হেসে লুটিয়ে পড়ত এবং আবার মরা মানুষের যাচ্ছেতাই সব গল্প বলে উত্যক্ত করত আমাদের।

মাঝে মাঝে গুনগুনে চাপা গলায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করে দিত, 'ওরে শোন, শোন। এই গত পরশুদিন এক মহিলাকে কবর দিতে এনেছিল। মহিলাটির আবার এক অদ্ভুত ইতিহাস। খোঁজ নিয়ে আমি সব জানতে পেরেছি। ভাবিস কি তোরা?'

প্রায়ই সে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করত। মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই অতি নোংরা মন্তব্য করত। কিন্তু তার গল্পগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা উদ্বিগ্নতার সুর ও প্রশ্ন থেকে যেত, যাতে মনে হত সে যেন ভেবেচিন্তে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতেই আমাদের সাহায্য চাইছে। মন দিয়ে আমরা শুনতাম। থেমে থেমে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যে মাঝে মাঝে সে কথা বন্ধ করে দিত। কিন্তু যা-ই বলুক না কেন, তার কথাগুলো আমাদের মনে একটা বিশ্রী ছাপ ও কাঁটা বেঁধার মত জ্বালা সৃষ্টি করত।

'মেয়েটিকে ওরা জিজ্ঞেস করে, 'কে আগুন দিয়েছিল?' মেয়েটি জবাব দেয় 'আমি আগুন লাগিয়েছিলাম!' 'বললেই হল, সেদিন রাত্রে তো তুই হাসপাতালে ছিলি!' মেয়েটি আবার বলল, 'আমি আগুন লাগিয়েছিলাম।' এই একটা কথা সে বার বার বলে। কেন সে বলছিল কে জানে। দয়া করো প্রভু, রাত্রিবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই। হুঁ হুঁ!'

এই একঘেঁয়ে ও বিষন্নতায় ভরা কবরখানায় মাটি খুঁড়ে যে-কজন লোককে সে কবর দিয়েছে তাদের সকলের জীবন-কাহিনী সে জানত। যখন সে কথা বলত তখন মনে হত যেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সমস্ত বাড়ির অন্দরমহলের দরজা আমাদের সামনে সে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। সেই খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকি আর দেখি বাড়ির বাসিন্দারা কি ভাবে দিন কাটায়। মনে হয় কাজটা মোটেই তাচ্ছিল্যের নয়, এর মধ্যে ভারিক্কী ধরণের ব্যাপার কিছু একটা আছে। তাকে দেখে মনে হত শুধু কথা বলেই সে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বাইরে যেই অন্ধকারের আবরণ নেমে আসে তখন চুরকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি বাড়ি গেলাম—নাহলে আমার মা ভয় পাবে। তোরা কেউ যাবি নাকি?'

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম। ইয়াজ আমাদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত এল। সদরটা বন্ধ করে দিল, বাখারির দরজার ওপর চোয়াড়ে কালো মুখটা চেপে ধরে আমাদের চাপা গলায় বিদায় দিল!

ওকে আমরাও বিদায় জানাই। এই কবরখানার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যেতে আমাদের মন চায় না, অস্বস্তি লাগে ভীষণ। একদিন কস্ত্রমা ফেরার পথে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে চেয়ে বলল, 'কোন দিন সকালে উঠে না শুনতে হয় যে ওর মৃত্যু হয়েছে।'

চুরকা প্রায়ই জোর দিয়ে বলত যে আমাদের মধ্যে ইয়াজের অবস্থা সকলের চেয়ে খারাপ। কিন্তু ভিয়াখির একথা মানতে চাইত না।

'আমাদের অবস্থা খারাপ তো নয়। খারাপ কেন হবে?' ঐরকম জোর দিয়েই সে বলত।

ভিয়াখির কথা আমি সমর্থন করি। বাইরের এই বাধাবন্ধ-হারা জীবন আমার খুব ভাল লাগে। আর আমি আমার সঙ্গীদেরও খুবই পছন্দ করি। ওদের সান্নিধ্য পেয়ে আমার মন এক নতুন ভাবাবেগে ভরে যায়। মনের মধ্যে সব সময়ে ইচ্ছে হয়, ওদের সাহায্য আর উপকার করি। আর এই ইচ্ছাই আকুল করে তোলে আমাকে।

এদিকে স্কুলে আমি পড়লাম এক বিভ্রাটে। স্কুলের ছেলেরা আমাকে 'ভবঘুরে ও আবর্জনা কুড়ুনে' বলে ডাকে। একদিন একটা ঝগড়া হয়ে যাবার পর ওরা মাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে যে আমার থেকে নাকি জঞ্জালের গন্ধ বের হয়! সেজন্য আমার পাশে বসা কিছুতেই সম্ভব নয়। মনে পড়ে, একথা শুনে আমার খুবই কষ্ট হত এবং এ ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর আবার স্কুলে যেতে আমার খুবই খারাপ লাগত। ছেলেদের এই নালিশটা ছিল নিছক মনগড়া; এটা ওদের ঝগড়া পাকানর ফিকির ছাড়া কিছু নয়। আমি রোজ সকালে বেশ ভাল করেই স্নান করতাম আর যে জামাকাপড়গুলো পরে রাস্তার আবর্জনা কুড়োতাম সেগুলো কস্মিন কালেও পরে স্কুলে যেতাম না।

যাই হোক আমি তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় পাস করে গেলাম। ভালকরে লেখাপড়া করার জন্য আমাকে উপহার হিসেবে একটা সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেট দেওয়া হল এবং একটা বাইবেল, একখণ্ড ক্রিলভের উপকথা আর 'ফাতা সরগানা।'

আরো যা পেলাম তা হল কাগজের মলাট দেওয়া দুর্বোধ্য একটা বই। উপহারগুলো নিয়ে আমি বাড়ি এলাম। সেগুলো দেখে দাদুর খুব আনন্দ

হল এবং তিনি বেশ অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি আমায় বললেন যে বইগুলোকে সযত্নে রেখে দেওয়া দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বইগুলো নিজের সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিলেন। এদিকে গত কয়েকদিন ধরে দিদিমা অসুস্থ; তার হাতে একটাও পয়সা ছিল না। দাদু বিড়বিড় করে মনের ঝাল প্রকাশ করে বলতেন, 'আমার সর্বনাশ তোরাই করবি দেখছি—তোদের গিলিয়েই আমাকে ফতুর হতে হবে.'

ব্যাপার দেখে আমি একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে বইগুলো পঞ্চান্ন কোপেকে বিক্রি করে দিলাম। পয়সাটা এনে দিদিমার হাতে তুলে দিই। সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেটটার ওপরে হিজিবিজি কেটে সেটা নষ্ট করে ফেললাম। তারপর সার্টিফিকেটটা দাদুর হাতে খুলে দিলাম। হিজিবিজি লেখাগুলো দাদুর চোখে পড়ল না। তিনি সেটা সযত্নে তুলে রাখলেন।

স্কুল শেষ হবার পর আমি আবার রাস্তার জীবনে ফিরে গেলাম। বসন্তকাল এসেছে; এখন এই রাস্তার জীবনে আগের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ রয়েছে। এখন আমরা আরো বেশি পয়সা উপায় করতে পারি। রবিবার দিন পুরো দল মাঠে কিংবা জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ি, ফিরে আসি সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরে। একটা মিঠে ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়ে, আর দলের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়।

কিন্তু এই জীবনের স্থায়িত্ব বেশিদিন থাকেনি। আমার সৎ-বাবার আবার চাকরি চলে যায় এবং সে যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আমার মা ও ছোট ভাই নিকোলাই এসে ওঠে দাদুর বাড়ি। এদিকে দিদিমা চলে গেছে একজন ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে, সেখানে সে যীশুখৃস্টের শয্যাবরণীর ওপরে সূচীশিল্পের কাজ করছে এবং সেখানেই তাকে থাকতে হচ্ছে, সেই জন্যে ছোটভাইটাকে দেখাশোনার ভার নিতে হল আমাকে।

আমার মা কথা বলে না, তার শরীরটা রক্তহীন হয়ে পড়েছে—এমন কি একটা পা নাড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। ছোট ভাইয়ের পায়ের গোড়ালিতে একটা বিষাক্ত ঘা হয়েছিল, বাচ্চাটা এত দুর্বল ছিল যে কাঁদতে পর্যন্ত পারত না। খিদে পেলে ভীষণ গোঙাত আর পেট ভরা থাকলে ঝিমিয়ে পড়ে থাকত আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলত। বেড়ালের মত ঘড় ঘড় করে একটা আওয়াজ বের হত ওর গলা থেকে!

একদিন দাদু বাচ্চাকে খুব ভাল করে দেখে বললেন, 'ওর এখন দরকার একটু ভাল খাওয়া দাওয়ার। কিন্তু তোদের এতগুলোকে খাওয়াবার সামর্থ্য আমার নেই। কি বলিস?'

নিঃশ্বাস টেনে টেনে ঘ্যান ঘ্যানে গলায় মা বলল, 'ওর জন্যে আর কতটুকুই বা দরকার।'

'ওর জন্যে একটুখানি—ওর জন্যে আরো একটুখানি—সব মিলিয়েই তো অনেকখানি।' বিরক্তির সঙ্গে হাতটা নেড়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'নিকোলাইয়ের পায়ে একটু রোদ-হাওয়া লাগা দরকার। ওকে নিয়ে বাইরে বালির ওপর শুইয়ে দে।'

আমি কয়েক বস্তা শুকনো পরিষ্কার বালি নিয়ে এলাম। জানলার নিচে

যেখানে রোদ এসে পড়ে, সেখানে ঢাললাম। তারপর দাদু যেরকম বলেছেন সেইভাবে ছোট ভাইকে ঘাড় পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলাম বালির মধ্যে। বাচ্চাটাকে দেখে আমার মনে হল এভাবে থাকতে ওর ভাল লাগছে। একরকম হয়েই ও বসে থাকে: আরামে চোখ বুজে আসে আর তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। কি অশ্চর্য ওর চোখ দুটো। মনে হয় নীল মণিটাকে ঘিরে আরো ফিকে সাদা নীল একটা চক্র দিয়েই ওর চোখদুটো তৈরি হয়েছে। ছোট ভাই'আমার খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। মনে হয়, আমার চিন্তা ভাবনাগুলো ও সবই বুঝতে পারে। জানলার নিচে ওর পাশে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে ভেসে আসে দাদুর কিচ্‌কিচে গলার আওয়াজ, 'মরতে তো বোকারাও পারে। তুমি যদি জানতে কী ভাবে বেঁচে থাকতে হয়...'

মায়ের কাশির শব্দ শোনা যায়, অনেকক্ষণ ধরে সেই কাশি চলে।

নিকোলাই তার ছোট হাতদুটো বালির থেকে টেনে বার করে আনে; ফ্যাকাশে মাথাটা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর মাথায় পাতলা রুপোলি চুল, মুখটা বুড়োটে ধরণের আর গম্ভীর প্রকৃতির।

যদি কোন বেড়াল বা মুরগী কাছে আসত তাহলে নিকোলাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত; তারপর এক সময়ে আমার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে মুচকি হাসত। ওর এই হাসি দেখে আমার ভাল লাগত না। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকতে হয় বলে আমার ভারি বিশ্রী লাগত—এটা কি ভাইটা টের পেত? ও কি বুঝতে পারত যে আমার ইচ্ছে হত তক্ষুণি এখান থেকে উঠে যাই আর রাস্তায় গিয়ে আমার দলবলের সঙ্গে মিলে যাই।

উঠোনটা ছিল ছোট আর আবর্জনায় পরিপূর্ণ। সদর থেকে উঠোনের পেছনদিকের স্নানঘর পর্যন্ত এলোমেলো কাঠের গুদাম ও চালা গলাগলি করে থাকত। চালার ওপরে স্তূপ করে রাখাছিল তক্তা, কাঠের গুঁড়ি, ভিজে চ্যালা-কাঠ আর ভাঙা নৌকোর টুকরো। বসন্তকালে যখন বরফ গলে নদীতে জল বেড়ে ওঠত সেই সময়ে ওকা নদী থেকে সংগৃহীত হত এগুলো। নদীর জলে ভেজা কাঠ ছড়ান থাকত সারাটা উঠোনে। কাঠগুলো যখন রোদে শুকোত তখন একটা পচা গন্ধ বের হত তা থেকে।

আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই ছিল একটা কসাইখানা। প্রায় রোজই ভোরে শোনা যেত বাছুর আর ভেড়ার আর্তচিৎকার। আর রক্তের গন্ধ এত ঝাঁঝালো হয়ে উঠত যে আমার মনে হত, ধুলোভরা বাতাসে যেন সূক্ষ্ম একটা জালের মত রক্ত ছেয়ে আছে। দুই শিঙের মাঝখানে খাঁড়ার ঘা নেমে আসবার সাথে সাথে জানোয়ারগুলোর চিৎকার শোনা যেত। আর নিকোলাই তখন ভুরু কুঁচকে ঠোঁট ফোলাত। দেখে মনে হত যেন জানোয়ারের ডাক ও নকল করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে 'ফু' 'ফু' শব্দছাড়া আর কিছুই বের হত না।

দুপুরে দাদু জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দিতেন, 'খাবার তৈরি!'

তিনি নিজেই বাচ্চাটাকে কোলের ওপরে তুলে খাওয়াতেন। রুটি আর আলু নিজে চিবিয়ে নিয়ে গুঁজে দিতেন বাচ্চার ঠোঁটের ফাঁকে। বাচ্চার সারা মুখে আর ছুঁচলো ছোট্ট থুতনিতে রুটি আর আলু মাখামাখি হয়ে যেত। এইভাবে অল্প একটু খাওয়ানোর পরেই তিনি বাচ্চার গায়ের জামাটা তুলে ফুলো ফুলো

পেটের ওপরে টোকা দিতে দিতে বলতেন, 'কি জানি বাপু পেট ভরেছে কিনা। নাকি, আরকটু খাবে ?'

'দেখতে পাচ্ছ না ও হাত বাড়িয়ে দিয়ে রুটিটা ধরতে চাইছে ?' ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বিছানায় শুয়ে মা বলে ওঠে।

'তাহলেই হয়েছে! বাচ্চাদের আর কি বোধশক্তি আছে যে পেট ভরেছে কিনা তা বুঝতে পারবে ?' একথা বলার পর তিনি আমার মুখ থেকে একটা দলা বার করে বাচ্চার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। এই ধরণের খাওয়ানো দেখে আমার দারুন লজ্জা হত। আমার গলার কাছটায় কী যেন উঠে এসে শ্বাসরোধ করত, ভেতরে বমির ভাব পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত। শেষে দাদু বলতেন, 'ব্যাস অনেক হয়েছে। এবার ওকে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যা।'

নিকোলাইকে কোলে তুলে নিয়ে আসার পরেও সে কেঁদে কেঁদে খাবার টেবিলের দিকে হাত বাড়াত। মা বিছানায় উঠে তার লম্বা হাড-কটকটে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় বাচ্চাকে নেবার জন্যে। মা এত রোগা হয়ে গেছে যে তাকে দেখে মনে হয় যেন ডালপালা ছাঁটা একটা পাইন গাছ।

আজকাল মা প্রায় কথা বলেই না। কখনো-সখনো দু-একটা কথা যা বলে সেগুলো তার সারা বুকের একটা হাঁপনি তুলে বুকটাকে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসে। মা সারাটা দিন পড়ে থাকে ঘরের কোণে। আর এই অবস্থায় নিঃশব্দে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আমি বুঝতে পারি, মায়ের মৃত্যু আসন্ন। আর দাদুর কথা শুনে এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছে। দাদু আজকাল বড বেশি আর বড ঘন ঘন মৃত্যুর কথা বলে থাকেন ; সন্ধ্যার সময়ে বিশেষ করে বলেন যখন বাইরে থেকে পচা গন্ধ বাতাস ভারি করে ভেসে আসে।

ঘরের কোণে মূর্তির প্রায় নিচে দাদুর বিছানা। জানলা ও মূর্তির দিকে মাথা দিয়ে শোয়ার অভ্যেস তার। রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিডবিড করে বলেন, 'আর কি, এবার মরবার সময় তো হয়েছে। এবার সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই ? তাঁর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব ? খেটে খেটে সারাটা জীবন পাত করে ফেললাম, কাজ ছাডা একটা দিন বেকার কাটাইনি। কিন্তু কী লাভ হল তাতে ? নিজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি !'

উনুন আর জানালার মাঝখানে মেঝের ওপরে আমি ঘুমোই। জায়গাটা আমার পক্ষে খুবই ছোট। বাধ্য হয়ে আমার পা-দুটোকে ঢুকিয়ে দিতে হয় উনুনের গর্তের মধ্যে। সেখানে আরশুলাগুলো আমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটা থেকে অন্য দিকে লক্ষ্য রাখার সুবিধা আছে। রান্না করতে গিয়ে দাদু প্রায়ই জানলার শার্সিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। যে শলাকা বা বাঁশ দিয়ে তিনি রান্নার পাত্রগুলো নামিয়ে রাখেন তারই উল্টো দিকের ঘা লেগে শার্সিগুলো ভেঙে যায়। আমি দেখি, আর একটা হিংস্র আনন্দে খুশি হই। বাঁশের মাথাটা কেটে ফেললেই আর কোন গোলমাল থাকে না ; এই সামান্য বুদ্ধিটুকু দাদুর মত বুদ্ধিমান লোকের মাথায় কেন যে আসত না, তা আমার কাছে একটা আশ্চর্যের ও উদ্ভট ঘটনা বলে মনে হত।

একদিন কী হল, উনুনের উপরে কি যেন ফুটছিল, এমন সময় বাঁশটা ধরে তিনি এমন এক হ্যাঁচকা টান দিলেন যে উনুনে বসানো মাটির পাত্রটা উলটে গিয়ে ভেঙে

গেল, জানালার দুটো শার্সি আর শার্সির ফ্রেম চুরমার হয়ে গেল। এত বড় একটা দুর্বিপাক দাদু সহ্য করতে পারলেন না, তিনি মেঝের ওপরে বসে পড়ে কেঁদে ফেললেন আর দুঃখ করতে লাগলেন, 'প্রভু! হায়! হায়!'

তিনি বেরিয়ে যাবার পরে আমি রুটি কাটবার ছুরিটা নিয়ে বাঁশের মাথায় খানিকটা অংশ ছেঁটেকেটে বাদ দিয়ে দিলাম। দাদু ফিরে এসেই আমার কীর্তি দেখে একেবারে রাগে আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেআক্কেলে! নরকের কীট কোথাকার! করাত দিয়ে কাটতে পারলি না? শুনতে পাচ্ছিস না? করাত রে, করাত! তাহলে বাড়তি কাঠের টুকরোটা দিয়ে বেলুন তৈরি করে বিক্রি করা যেতে পারত। শয়তানের যতসব ঝাড় এসে জুটেছে আমারই কপালে!'

দাদু কথাগুলো বলেই সদরের দিকে ছুটে গেলেন। আর সেই সময় মা আমাকে বলল, 'কেন তুই সব ব্যাপারেই সর্দারি করিস? নিজেরটা নিয়েই থাকবি সবসময়।'

আগস্ট মাসের এক রবিবারের দুপুরে আমার মায়ের মৃত্যু হল। এর কিছুদিন আগে আমার সৎ-বাপ বাইরে থেকে ফিরেছে আর একটা চাকরিও জুটিয়েছে। সে থাকত স্টেশনের পাশে একটা ছোট পরিষ্কার বাড়িতে। দিদিমা ও নিকোলাই সেখানে আগেই চলে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই মায়েরও যাবার কথা।

যে দিন মা মারা গেল সেই দিনই সকালবেলা মা আমাকে বলেছিল, 'যা তো রে, ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচকে এক্ষুণি একবার ডেকে নিয়ে আয়।' তার গলার স্বর ক্ষীণ কিন্তু এমনিতে যেমন থাকে তার চেয়ে স্পষ্ট ও হাল্কা।

বিছানায় মা উঠে বসল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে দিল সারা শরীরটাকে; তারপর বলে উঠল, 'দেরি করিসনা—দৌড়ে যা!'

আমার মনে হচ্ছিল, মা যেন হাসছে। একটা নতুন আলোর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে তার চোখে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুনতে পেলাম, আমার সৎ-বাপ গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে গিয়েছে। সেখানে দিদিমা আমাকে দোকানে পাঠাল নস্যি কিনতে। দোকানে নস্যি ছিল না, তাই ইহুদী দোকানদার মহিলা আমাকে দাঁড় করিয়ে নস্যি তৈরি করে দিল।

শেষকালে অবার যখন আমি দাদুর বাড়িতে ফিরে এলাম তখন দেখি, মা টেবিলের কাছে বসে আছে। তার পরনে ছিল ফিকে নীল রঙের পরিষ্কার পোষাক, পরিপাটি করে চুলগুলো আঁচড়ানো। ঠিক সেই আগের দিনের মতই তার দেমাকী চেহারা। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরীরটা ভাল লাগছে—না?' কেন জানি না হঠাৎ আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

ছলছলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'এদিকে আয়, এতক্ষণ কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি?'

আমি জবাব দেবার কোন সময়ই পেলাম না। তার আগেই মা আমার চুলের মুঠি ধরে টেবিলের ওপর থেকে করাতের মত একটা লম্বা ছুরি তুলে ছুরিটার চ্যাপ্টা ফলা দিয়ে আমাকে মারতে শুরু করে দিল। মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত মার হাত থেকে ছুরিটা পড়েই গেল।

'তুলে আন! নিয়ে আয় এখানে!'

আমি ছুরিটা তুলে টেবিলের ওপরেই রাখলাম। মা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি গিয়ে বসলাম উনুনের ধারে, সেখান থেকে ভয়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মায়ের দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কোণের বিছানার দিকে, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে শুয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তার হাতের নড়াচড়াটা এলোমেলো, দু-বার হাতটা এলিয়ে পড়ল বালিশের ওপরেই। রুমালটা দলা পাকিয়ে গেল তাদের আঙুলের মধ্যে।

'জল!'

পাত্র থেকে পেয়ালা ভর্তি করে জল নিয়ে আমি সামনে ধরলাম। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে মা একটোক জল খেল, তারপর ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল কোণের মূর্তির দিকে, তারপরে আমার দিকে; ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল। মনে হল মা যেন হাসছে; তারপর তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের ওপরে। দু হাতের কনুই শরীরের দু দিকে শক্তভাবে অঁাটা; হাতদুটো ধীরে ধীরে চলেছে বুকের ওপরে, গলার কাছে। সবার অলক্ষ্যে একটা ছায়া ঘনিয়ে এল মুখের ওপর। এবার মুখের হলদে চামড়া টান হয়ে রয়েছে, নাকটা ধারালো। মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু নিঃশ্বাস বের হল না।

পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল এই দাঁড়ান যেন অনন্তকাল ধরে চলছে। আমার দৃষ্টির সামনে মা'র মুখটা শক্ত ও পাণ্ডুর হয়ে গেল।

দাদু ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, 'মা মরে গেছে।'

তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলে তোর লাভ কি হচ্ছে?' তারপর তিনি উনুনের কাছে গিয়ে কড়াই ও বাঁশের ঘটাং ঘটাং শব্দ করে 'পিরোগ' তুলে আনতে লাগলেন উনুনের ভেতর থেকে। আমি জানি, আমার মা মরে গেছে, সুতরাং আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদুর দিকে, দাদু নিজের থেকেই ব্যাপারটা টের পাক।

আমার সৎ-বাপ ঘরে ঢুকল। ওর পরনে ছিল লিনেনের কোট, মাথায় সাদা ক্যাপ, একটাও কথা না বলে সে একটা চেয়ার তুলে মায়ের বিছানার কাছে নিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ তার হাত থেকে চেয়ারটা খসে পড়ল, পেতলের শিঙা বাজানোর মত গলার আওয়াজ করে বলল, 'আরে! মরে গেছে!'

দাদু অন্ধের মত বিছানার কাছে টলতে টলতে এগিয়ে এলেন; তার হাতের মুঠোয় বাঁশটা ধরা ছিল আর চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল কোটর থেকে।

মায়ের কবর যখন শুকনো বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হল তখন দিদিমা অন্য সব কবরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াল। অন্ধের মত হোঁচট খেল একটা ক্রুশে, মুখে চোট লেগে মুখটা কেটে গেল। ইয়াজের বাবা দিদিমাকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। সেখানে দিদিমা যখন ক্ষতস্থানটা ধুচ্ছিল তখন ইয়াজের বাবা আমার কাছে এসে চাপা গলায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, 'দয়া কর প্রভু; রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই। কি ব্যাপার তোমার? এসব ব্যাপারকে কখনো মনে ঠাঁই

দেবে না। সব ঠিক বলিনি ঠানদি? গরীব ধনী সবাইকেই আসতে হবে এ জায়গায়। ঠিক বলিনি ঠানদি? কি গো?'

জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। যখন ফিরে এল, তখন তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর ভিয়াখিরকে নিয়ে এসেছে টানতে টানতে।

'দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কি রয়েছে,' একটা ভাঙা জুতোর-নাল বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলল, 'কি সুন্দর এই জিনিস বল তো! আমি আর ভিয়াখির তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছি। এটা যে নিশ্চিত কোন একজন কসাকের জুতো থেকে খসে পড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই! ভিয়াখিরের কাছ থেকে এটা আমি কিনে নেব ভাবছিলাম—দু কোপেক দামও দিতে চেয়েছিলাম ওকে...'

ভিয়াখির দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল, 'কেন মিথ্যে বলছ?' এদিকে ইয়াজের বাবা চোখদুটো পিটপিট করে আমার সামনে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিল।

'ভিয়াখির কেমন মাল দেখছ তো? আচ্ছা, শোন, না আমি নয়, ভিয়াখির নিজেই তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছে...'

কবরস্থান থেকে হতে দিদিমা নিজের নীল ও ফুলে-ওঠা মুখে একটা রুমাল জড়াল; তারপর আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ি। কিন্তু আমি বাড়ি যেতে চাইলাম না। আমি জানতাম, বাড়িতে গেলে এখন শেষকৃত্যের খাওয়াদাওয়া হিসেবে মদ খাওয়া চলবে এবং হয়ত এজন্যে একচোট ঝগড়াও হবে। গির্জা থেকে তখন আমরা বেরিয়ে আসিনি, এমন সময় শুনেছিলাম মিখাইল-মামা ইয়াকভ-মামাকে বলছে, 'আজ বেশ ভাল করে মদ-টদ টানা যাবে, কি বলিস?'

ভিয়াখির আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করল। সেই জুতোর নালটা সে গলায় ঝুলিয়েছে, আর চেষ্টা করছে ওটাকে জিভ ঠেকাতে। ইয়াজের বাবা হাসছে, ইচ্ছে করেই জোরে জোরে হাসছে, তা বেশ বোঝা গেল। আর সমানে চিৎকার করে চলেছে, 'চেয়ে দেখ, ওর কাণ্ডকারখানা দেখ!' যখন দেখল যে এত কিছু করার পরেও আমি বিন্দুমাত্র কৌতুক অনুভব করছি না তখন সে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বলল, 'এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! অমন মনমরা হয়ে পড়ো না। সবাইকেই মরতে হয়। এমন কি পাখিরাও মরে। শোন—যদি চাও তো আমি তোমার মায়ের কবরের ওপরে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দিতে পারি। তাহলে কেমন হয়? চল না এখনই মাঠে যাই। তুমি যাবে, ভিয়াখির যাবে, আমি যাব, আমাদের সাথে ইয়াজও যাবে। আমরা সবাই মিলে ঘাসের চাপড়া কেটে নিয়ে এসে কবরের ওপরে সুন্দরভাবে বসাব আর তখন কবরটা দেখে মনে হবে যে, এর বুঝি আর জুড়ি নেই।'

এই পরিকল্পনা বেশ ভাল লাগল আমার। তারপর আমরা সকলে মিলে মাঠের দিকে এলাম।

আমার মায়ের শেষকৃত্য হবার কিছুদিন পর দাদু আমাকে বললেন, 'শোন লেক্সেই, তোমাকে গলায় মেডেলের মত এভাবে ঝুলিয়ে রাখব, তা তো আর হতে দিতে পারা যায় না। এখানে আর তোমার ঠাঁই হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে একা বের হয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে...'

সেই কারণে আমি জীবনের পথে পা বাড়ালাম।

জীবনের পথে

এক

শেষ পর্যন্ত শিক্ষানবিশ হলাম। শহরের প্রধান রাস্তার ধারে একটা শৌখিন জুতোর দোকানের ভৃত্য।

আমার মনিব গোলগাল, বেঁটে, ঝাপসা মুখ। সবুজাভ দাঁত। ফিকে ঘোলাটে চোখ। মনে হল যে লোকটা অন্ধ। নিশ্চিত হবার জন্য আমি তাকে ভেংচি কাটলাম।

'মুখ ভেংচাবি না বলে দিচ্ছি।' শান্ত অথচ কড়া স্বরে মনিব বলে।

ভাবতেই আমার ঘৃণা বোধ হয় যে ঐ দুটো ঘোলাটে চোখ আমাকে দেখছে। বিশ্বাস করতেই পারি না। আমি ভেংচি কাটছি এটা হয়ত ও ধারণা করেই নিয়েছে।

'বলে দিয়েছি না একবার, মুখ ভেংচাবি না।' পুরু পুরু ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে সে আমাকে আরো ধীর শান্ত স্বরে বলে, 'আর ঐ হাত চুলকানো বন্ধ কর।' ওর শুকনো গলার স্বর যেন আমাকে তাড়া করছে, 'মনে রাখিস, শহরের প্রধান রাস্তায় একটা প্রথম শ্রেণীর দোকানে কাজ করছিস। পাথরের মূর্তির মত ভৃত্যকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

পাথরের মূর্তি যে কি সে সম্পর্কে আমার আদৌ ধারণা নেই এবং আমি আমার হাত চুলকানো বন্ধ করতে পারি না, কারণ কনুই পর্যন্ত আমার দুটো হাতই খোস চুলকানিতে ভরা। নির্মমভাবে গোটাগুলো যেন আমার চামড়ার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

'বাড়িতে কি কাজ করতিস?' আমার হাত দুটোর দিকে ক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে মনিব জিজ্ঞেস করে।

যখন আমি তাকে তা বলি, তখন পাকা চুল ভরা বুলেটের মত তার মাথাটা নড়ে ওঠে এবং খোঁচা দিয়ে বলে, 'ধাঙড়ের কাজ ভিক্ষের চাইতেও খারাপ, চুরির চাইতেও জঘন্য।'

'চুরিও করেছি।' আমি বলি। বলার মধ্যে আত্মপ্রসাদের একটু ভাব যে না ছিল তা নয়।

শোনা মাত্র থাবার ওপর ভর দিয়ে বেড়াল যেমন ওঁত পেতে দাঁড়ায় তেমনি দু-হাতে ভর দিয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে ঘোলাটে চোখের স্থবির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কি? তুই বলছিস চুরি করেছিলি?'

কেমন করে কী চুরি করেছিলাম আমি ব্যাখ্যা করি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঐ ব্যাপার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুই যদি আমার জুতো বা টাকাকড়ি চুরি করিস, তবে এই অল্প বয়সেই জেলে দিয়ে ছাড়ব।' খুব শান্ত স্বরেই বলে কথাটা, কিন্তু আমার ভীষণ ভয় লাগে, এবং মনটা যেন আরো বেশি বিরূপ হয়ে ওঠে তার ওপর।

দোকানে মনিব ছাড়া আরো দুজন কর্মচারী আছে। আমার মামাতো

ভাই সাশা (ইয়াকভের ছেলে) এবং বড়োবাবু—মানুষটা ফিটফাট, তোষামুদে, লালচে রঙের দুটো গাল। সাশার পরনে বাদামি রঙের একটা ফ্রক-কোট, ধোপ-ভাঙ্গা সার্ট, নিচু ট্রাউজার, গলায় টাই। অহঙ্কারে সে আমার দিকে তাকালও না।

প্রথম যেদিন দাদু আমাকে এখানে নিয়ে আসেন সেদিন তিনি সাশাকে ডেকে বলেছিলেন আমাকে কাজকর্ম কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে। কেউকেটা গোছের একটা ভাব করে ভ্রূ বাঁকিয়ে সাশা বলেছিল, 'প্রথমে ওকে আমার হুকুম মেনে চলতে শিখতে হবে!'

দাদু আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'ওর বাধ্য হয়ে চলিস। তোর চাইতে বয়সেও বড় আর চাকরিতেও ওপরে।'

'মনে থাকে যেন ঠাকুরদার কথা।' মেজাজ নিয়ে তাকিয়েছিল সাশা।

তার পদমর্যাদার সুযোগ সে প্রথমদিন থেকেই আমার ওপর নির্মমভাবে নিতে শুরু করল।

মনিব ধমক দিয়েছিল সাশাকে, 'তোর চোখ পাকানো বন্ধ কর, কাসিরিন।'

'কই, আমি চোখ পাকাইনি তো।' মাথা নিচু করে সাশা প্রত্যুত্তর দেয়। কিন্তু মনিব তাকে ছাড়েনি, 'অমন মুখগোমরা করেও থাকবি না। খদ্দেররা তোকে ছাগল ভেবে ভুল করতে পারে।' বড়বাবু তোষামোদের হাসি হেসে ওঠে।

মণিবের ঠোঁট দুটো বিস্ফারিত হল। তখন সাশা লাল হয়ে কাউন্টারের আড়াল হল।

এরকমের কথোপকথোন আমার খারাপ লাগত। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করত ওরা যাতে আমার মধ্যে মধ্যে মনে হত, এরা যেন বিদেশী ভাষায় কথা বলছে।

যখনই কোন মহিলা এসে উঠত দোকানে, তখনই মনিব পকেটের ভেতর থেকে হাত তুলে আলতোভাবে গোঁফে তা দিত। মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠত ওর মুখে; দুটো গাল টান টান হয়ে উঠত। কিন্তু ব্যঞ্জনাহীন তার ঘোলাটে চোখ দুটোর কোন ভাবান্তর ঘটত না। বড়বাবু সটান দাঁড়িয়ে, কনুই দুটো দু পাশে চেপে ধরে তোষামোদের ভঙ্গিতে হাত কচলাত। ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো আড়ালের ইচ্ছায় সাশা চোখ পিট্‌পিট্ করত। আর আমি গোপনে হাত চুলকোতে চুলকোতে বিক্রির সমারোহ দেখতাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

বড়বাবু সর্বদা কোন মহিলার সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে তার পায়ে জুতো পরিয়ে দেবার সময় অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতের আঙুলগুলো টান টান করে দিত। তার হাত দুটো কাঁপত এবং এমনভাবে পা ছুঁত যেন তার ভয় পা-টা না ভেঙ্গে ফেলে। অবশ্য পা-টা সাধারণত বেশ মোটা সোটাই থাকত; মনে হত একটা উল্টে রাখা বোতল—যার মুখের দিকটা নিচু।

একবার এক মহিলা ঝট্‌কা লাথির ভঙ্গিতে পা নেড়ে বললেন, 'আহ্, ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে যে।'

'এটাই আসলে শিষ্টতা।' তাড়াতাড়ি জবাব দিল বড়বাবু।

মহিলাদের সামনে সে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করত যে দেখলেই হাসি পেত এবং আমি আমার হাসি চাপবার জন্য পিছন ফিরে দাঁড়াতাম। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকানোর লোভও সামলাতে পারতাম না। বড়বাবুর ক্রিয়াকলাপ এমনই

অদ্ভুত আর হাস্যজনক যে মনে হত আমি কখনো জীবনে এমন মোলায়েম-ভাবে আঙুল টান টান করার নৈপুণ্য কিংবা অমন দক্ষতার সঙ্গে অন্যের পায়ে জুতো পরাবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারব না।

সাশাকে সঙ্গে নিয়ে মনিব প্রায়ই তার পেছনের ছোট ঘরে চলে যেত খদ্দেরের সামনে বড়বাবুকে একা রেখে। একবার আমার মনে আছে, লালচুলো এক মহিলার পায়ের ওপরে হাত বুলাতে বুলাতে বড়বাবু হঠাৎ তার হাতের আঙুলের ডগাগুলো জড়ো করে চুমু খেয়েছিল।

'ইস্, কী দুষ্টু লোক আপনি।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন মহিলাটি।

ঠোঁটে চকাৎ আওয়াজ করে বড়বাবু বলল, 'আহ্!'

আমি এত জোরে হেসে উঠেছিলাম যে পড়ে যাবার মুহূর্তেই দরজার হাতলটা ধরে ফেলতে সেটা খুলে গেল আর তার কাঁচে মাথাটা গেল ঠুকে, কাঁচটা ভেঙ্গে পড়ল। বড়বাবু আমার দিকে পা উঁচিয়ে তেড়ে এল এবং আমার মনিব তার সোনার পোখরাজ আংটিটা দিয়ে গাট্টা মেরে মেরে আমার সমস্ত মাথাটা ফুলিয়ে দিল। সাশা আমার কান মলতে চেষ্টা করল। সন্ধ্যার পর সেদিন বাড়ি ফেরার পথে সে আমাকে ভীষণভাবে ধমকাল, 'এমনি ভাবেই তোর শিক্ষা হবে। বাপ, অত হাসির কী হয়েছিল?'

তারপর সে আমাকে বোঝাল যে বড়বাবুর প্রতি মেয়েরা যত বেশি আকৃষ্ট হবে ব্যবসায়ের দিক থেকে ততই ভাল।

এমনকি যদি কোন মহিলার জুতোর প্রয়োজন নাও হয় তবু বাড়তি একজোড়া কিনতে আসবে সে কেবলমাত্র ঐ সুপুরুষ লোকটাকে আরো একবার দেখবার জন্য, তুই কি তা বুঝিস না! তোকে কিছু শেখানোটাই বৃথা!'

তার কথায় আমি রেগে গেলাম। দোকানের কেউ আমাকে কখনো কিছু শেখাবার চেষ্টা করেনি, সাশা তো দূরের কথা।

রোগা ঝগড়াটে এক মেয়েছেলে—রাঁধুনী, প্রত্যেক দিন সকালে আমার মামাতো ভাইয়ের এক ঘণ্টা আগেই আমাকে জাগিয়ে দিত। সামোভার গরম করতাম আমি, কাঠ বয়ে আনতাম সবগুলো উনুনের জন্য, রাতের এঁটো বাসন মাজতাম এবং মনিব বড়োবাবু ও সাশার জামাকাপড় ব্রাস করতাম, জুতো পরিষ্কার করতাম। দোকানে ঝাঁট দেওয়া, ধুলো ঝাড়া, চা তৈরী, খদ্দেরদের বাড়ি প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদির পরও বাড়ি আসতাম খাবার নিয়ে যেতে। যখন আমি এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তখন সাশাকে দরজার সামনে দাঁড়াতে হত আমার স্থানে, আর এতে তার মর্যাদায় লাগত। সে চিৎকার করে বলত, 'ওরে পাজি! আমি তোর কাজ করব না!'

মাঠে মাঠে, বনে বনে, ঘোলাজলের নদী ওকার পারে অথবা কুনাভিনোর কাঁকর ভরা পথে পথে স্ব-ইচ্ছায় ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যাস ছিল। আমার কাছে তাই বর্তমান অস্তিত্ব একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগত। আমি আমার দিদিমা এবং বন্ধুদের হারিয়েছি, একটা লোকও নেই কথা বলার মত। আমার মনে হত, এই কৃত্রিম গণ্ডির জীবন পিষে ক্ষয় করে দিচ্ছে আমাকে।

কিছু না কিনেই অনেক সময় মহিলারা চলে যেতেন এবং তখন আমার মনিব এবং তার দুই কর্মচারী বেশ চটে যেত।

'কাশিরিন, জুতোগুলো তুলে রাখ।' মনিব হুকুম করত, তার আল্গা হাসির মুখোশটা পড়ত খসে, 'শুয়োরের বাচ্চি! এখানে এসেছে শুঁকতে! বাড়িতে বসে বসে গতর করেছে। তাই বলদি বুড়ি ঠিক করল, দোকান ঘুরে আসি। ওঃ, যদি আমার মাগি হত! ও, দেখিয়ে দিতাম খুব করে।'

লম্বা নাকওলা, কালো চোখ আর রোগা চেহারার মনিবের বৌ অবশ্য এমনভাবে মনিবকে ভর্ৎসনা করত, তেড়ে আসত যে মনে হত যেন ও তার চাকর।

বিনম্র নমস্কার জানিয়ে আর মিষ্টি ভাষার পরিবেশনে প্রায়ই কোন ভদ্রমহিলাকে বিদায় দেবার পর তাকে ঘিরে মনিব আর তার কর্মচারীরা মিলে এমন সব নোংরা নির্লজ্জ টিপ্পনী কাটত যাতে আমার ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে তাকে বলে আসি, ওরা তার সম্পর্কে কী সব আলোচনা করছে।

সাধারণত আমি জানতাম পিছনে কুৎসা করা মানুষের স্বভাব, কিন্তু এরা তিনজনে প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন সব কথা বলত যা শুনলে গা জ্বালা করত। দুনিয়ায় ওরাই যেন হচ্ছে একমাত্র সৎ এবং ওদেরই কেবল অধিকার অন্যের সম্পর্কে রায় দেবার। ওরা হিংসে করত সকলকেই, কারোরই প্রশংসা করত না, এবং প্রত্যেককেই ঘিরেই কিছু নোংরা গল্প ওদের জানা ছিল।

দোকানে একদিন এক যুবতী এলেন, চোখ দুটো উজ্জ্বল, গোলাপী গাল, ভেলভেটের জোব্বা গায়ে, গলা ঘিরে নরম কালো ফারের কলার। প্রস্ফুটিত ফুলের মতই যেন ফুটে আছে তার মুখখানা। তিনি যখন জোব্বাটা খুলে সাশার হাতে দিলেন তখন দু-কানের হীরের দুটো দুল ঝকমকিয়ে উঠল, শরীরের মাপের ধুসর নীল পোশাকে তার উজ্জ্বল সুকুমার দেহ সৌষ্ঠব ফুটে উঠল আরো! সুন্দরী ভাসিলিসার কথা মনে পড়ল আমার ওকে দেখে। এবং আমি নিশ্চিত হলাম যে, অন্ততপক্ষে উনি রাজ্যপালের স্ত্রী হবেন। ওরা একটু বিশেষভাবেই তাকে আপ্যায়ন করল। মুখে মিষ্টি মধুর স্বর নিয়ে আগুনের উপাসকের মত নতজানু হল ওরা। আর পাগলের মত তিনজনেই দোকানের ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে ছুটোছুটি শুরু করল, তাদের ছায়া ঝাঝিয়ে উঠল শো কেসের কাঁচে, এবং এতে মনে হল, সব কিছুই বুঝি এখন জ্বলেপুড়ে নতুন রূপ ও রেখায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

দামী এক জোড়া জুতো যখন খুব তাড়াতাড়ি পছন্দ করে যুবতীটি চলে গেলেন, তখন মনিব তার জিভ দিয়ে হিস হিসিয়ে উঠল, 'খানকী!'

'বাস্তবিক একটা অভিনেত্রী।' বিড বিড করে বলল বড়বাবু।

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে যুবতীটির কজন প্রেমিক আছে, এবং সে কেমন উত্তাল জীবন যাপন করে, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় জমল।

খাওয়ার পর মনিব একটু গড়িয়ে নেবার জন্য দোকানের পেছন দিকের ছোট ঘরটায় গেল। আমি কিছু ভিনিগার ঢেলে দিলাম তার সোনার ঘড়িটার পেছনের ডালা খুলে। ঘুম ভাঙ্গার পর যখন সে ঘড়িটা হাতে দিয়ে দোকানে এল, তখন আমার খুব মজা লাগল।

'ব্যাপার কী বল তো! আমার ঘড়িটা হঠাৎ-ই থামতে শুরু করেছে! এমন তো আগে কখনো হয় নি। ভেবে দেখ, থামছে! এটা কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয় কি?'

দোকানে হৈ চৈ আর বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সত্ত্বেও এত একঘেয়ে লাগত আমার যে প্রায়ই ভাবতাম, কী করলে আমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে?

সর্বাঙ্গে তুষারাবৃত রাস্তার মানুষজন দ্রুত হেঁটে যেত দোকানের সামনে দিয়ে। শবানুগমনে ওদের যেন দেরি হয়েছে, তাই কবরখানার দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে কফিনের সঙ্গ ধরতে। পরিশ্রমে ধুকতে ধুকতে তুষার স্তূপের ভেতর দিয়ে চলেছে মালগাড়ির ঘোড়াগুলো। লেন্ট পরবের সময় বসে প্রতিদিন দোকানের পেছনের গির্জার ঘন্টা বেজে যেত করুণ সুরে। ঐ বিরামহীন ঘন্টাধ্বনির ফলে মনে হত মাথার ওপরে বালিশ দিয়ে কে যেন পিটে চলেছে: —ব্যথাহীন কিন্তু অসাড় করে আনে চেতনা।

একদিন যখন উঠোনে বসে সদ্য আসা একটা মালের প্যাকিং খুলছিলাম তখন গির্জার চৌকিদার এসে আমাকে প্রস্তাব দিল। কুঁজো, বুড়ো, নড়বড়ে ন্যাকড়ার পুতুলের মত। জীর্ণ জামা পরণে, মনে হচ্ছিল, কুকুরে আঁচড়ে দিয়েছে।

'চুরি করে এক জোড়া গালোশ আমাকে এনে দেবে খোকা?' সে জিজ্ঞেস করল।

কোন জবাব দিলাম না আমি। একটা খালি প্যাকিং বাক্সের ওপরে সে বসল, হাই তুলল, ঠোঁটের ওপরে ক্রুশের চিহ্ন করল। তারপর আবার অনুরোধ করল, 'দেবে না?'

'চুরি করা অন্যায়।' তাকে আমি জানালাম।

'কিন্তু তবুও চুরি হয়। শোন খোকা, বুড়ো মানুষের কথা মান্য কর।'

যারা আমাকে ঘিরে আছে, তাদের থেকে এ অন্যরকম বলে খুব ভাল লাগল। সে আমার সম্পর্কে নিশ্চিত হল যে আমি রাজী হলাম, জানলা গলিয়ে গলিয়ে একজোড়া গালোস ওকে এনে দেব।

'ভাল,' বেশ শান্ত গলায় সে বলল; মনে হল না তেমন খুশি হয়েছে। 'কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকে ঠকাবে না তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার মনে হচ্ছে কাউকে ঠকাবার মত মানুষ তুমি নও।'

সে সেখানে কিছুক্ষণ বসে রইল, জুতোর ডগা দিয়ে ভিজে নোংরা বরফের ওপর আঁচড় কাটল, তারপর সে তার পাইপটা ধরাল এবং হঠাৎ-ই আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল, 'আর কেমন হয়, আমি যদি তোমাকে ঠকাই? তোমার মনিবের কাছে যদি এই গালোশজোড়া নিয়ে গিয়ে বলি যে আধ রুবলে তুমি এটা আমার কাছে বেচে দিয়েছিলে, তাহলে? এর দাম দু-রুবলের ওপরে। আর তুমি বেচেছ আধ রুবলে। সামান্য পকেট খরচার জন্য—কেমন?'

আমি স্থবির হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, শাসানিটাকে এর-মধ্যেই যেন সে কার্যে রূপান্তরিত করেছে। আর ও তেমনি ধীরভাবে ন্যাকা সুরে বলে চলেছে পায়ের দিকে তাকিয়ে। ওর মাথার চারপাশে উড়ছে নীল ধোঁয়া।

'তোমার মনিবই যদি আমাকে পাঠিয়ে থাকে—ধর তোমাকে পরীক্ষার জন্যই বলে থাকে—দেখতো ছেলেটা চোর-ছাঁচোড় কি না, তাহলে?'

'আমি তোমাকে গালোশ দেব না।' রেগে গিয়ে বললাম।

'কথা যখন দিয়েছ একবার তখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই!' আমার হাতটা ধরে আমাকে সে টেনে নিল। আমার কপালের ওপর তার বরফের মত ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টিপে টিপে বলল, 'তুমি কি করে রাজী হলে অমন করে, গালোশ হাতে হাতে দেবে বলে ফেললে। কি?'

'নিজেই তো চেয়েছিলে তুমি, অস্বীকার করতে পার ?'

'কত কিছুই তো চাইতে পারি আমি। যদি বলি গির্জা থেকে চুরি করে আন, তবে তুমি তা আনবে না কি ? কেমন করে মানুষকে এতটা বিশ্বাস কর শুনি ? বোকারাম !' আমাকে ঠেলে সে উঠে দাঁড়াল।

'চোরা গালোশে কোন প্রয়োজন নেই আমার। তেমন একজন বাবুও নই আমি যে যেমন করেই হোক আমাকে গালোশ পরতেই হবে। ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। কিন্তু যখন তুমি আমাকে এতখানি বিশ্বাস করলে, তাই এস বলি, আসছে ইষ্টারের সময় তোমাকে আমি ঘন্টি ঘরে চড়তে দেব। তুমি ঘন্টা বাজাতে পারবে আর শহরটাও দেখতে পারবে ভাল করে।'

'শহর আমার দেখা।'

'কিন্তু ঘন্টিঘর থেকে তা দেখতে আরো সুন্দর।'

জুতোর ডগা দিয়ে বরফ ঠেলতে ঠেলতে সে চলতে শুরু করল, ধীরে ধীরে ; তারপর অদৃশ্য হল গির্জার একটা কোণার দিকে। ওর যাওয়ার দিকে চোখ রাখতে রাখতে বেদনায় অস্বস্তিতে আমার অন্তর ভারি হয়ে এল। বুড়ো কি সত্যিই আমার সঙ্গে রসিকতা করল,—না আমাকে পরীক্ষার জন্য মনিবই ওকে পাঠিয়েছিল ? দোকানে ফিরে যেতে ভরসা হচ্ছিল না।

'কী করছিস এতক্ষণ এখানে ?' চীৎকার করে উঠোনে নেমে এল সাশা।

দারুণ রেগে হঠাৎ প্যাকিংবাক্স-ভাঙ্গা হাতুড়িটা তুলে ওকে তেড়ে উঠলাম।

আমি জানতাম ও আর বড়বাবু মনিবের মাল থেকে চুরি করে। একেক জোড়া বুট বা জুতো চুরি করে উনুনের চিমনির ভেতর লুকিয়ে রাখে। তারপর দোকান বন্ধ করে যাবার সময় কোটের হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যায়। খুব খারাপ লাগত আমার, ভয় হত ; কারণ মনিবের সেই সে দিনের শাসনের কথা ভুলে যাই নি আমি।

'চুরি করিস তুই ?' জিজ্ঞেস করেছিলাম সাশাকে।

'আমি না, এসব বড়বাবু করে,' একটু রেগে গিয়েই উত্তর দেয় সাশা, 'আমি তাকে সাহায্য করি কেবল। বড়বাবু বলে, 'যা তোকে বলব তাই করবি।' যদি না করি তবে সে আমার পেছনে লাগবে, ক্ষতি করবে। আর মনিব তো নিজেই একসময় দোকানের কর্মচারী ছিল। এসব সেও জানে। কিন্তু মুখ বুজে থাকবি তুই !'

কথা বলতে বলতে আয়নার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল সাশা আর বড়বাবুর মত অস্বাভাবিকভাবে আঙ্গুলগুলো টান টান করে টাই ঠিক করছিল ; আমার থেকে সে যে বয়সে বড় তাই যেন বুঝিয়ে দিত বিভিন্ন ভাবভঙ্গি করে। আর আমার ওপর মাতব্বরী করার অধিকার তার আছে। আমাকে গাল দিত গম্ভীর ভারি গলায়। যদিও ওর চাইতে আমি লম্বা ছিলাম, শরীরে জোরও ছিল বেশি, তবু আমাকে কেমন যেন বিশ্রী ধরণের দেখাত। ওর চেহারা ছিল নধর, মসৃণ। ফ্রক-কোট পরলে ওকে একটা কেউকেটাই মনে হত আমার—কিন্তু তবু ও কেমন যেন হাস্যকর। রাঁধুনীকে একদম দেখতে পারত না সাশা। অবশ্য মেয়েছেলেটাও ছিল অদ্ভুত ধরণের, মন্দ কি ভাল কখনো ঠিক করা যেত না।

'লড়াই দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে আমার'—কালো জ্বলন্ত চোখ দুটো

ডাগর ডাগর করে সে বলত, 'তা সে যার লড়াই-ই হোক না কেন—মোরগ, কুকুর কিংবা চাষাদের—সব সমান আমার কাছে।'

কখনো যদি উঠোনে মোরগ কিংবা পায়রার লড়াই শুরু হত, তাহলে যে কোন কাজেই থাক না, ফেলে দিয়ে তক্ষুণি ছুটে জানলায় এসে দাঁড়াত। যতক্ষণ না তা শেষ হয়, কোন কিছুই আর তার কানে ঢুকত না। সাশাকে আর আমাকে ডেকে বলত সন্ধ্যাবেলায়, 'তোরা এইখানে বসে আছিস কেন, ছেলেরা? কেন তোরা বাইরে যাস না, বেশ লড়াই করিস না কেন?'

সাশা হঠাৎ রেগে উঠত, 'আমি ছেলে নই; বোকাবুড়ো দোকানের ছোটবাবু।'

'থাক্, কিছু এসে যায় না তাতে। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুই আমার কাছে ছেলেই থাকবি।'

'গেঁড়ে মাথার বোকা বুড়ী!'

'শয়তান খুবই চতুর, কিন্তু ঈশ্বর তাকে পছন্দ করেন না।'

ওর কথা বলার ধরণেই বিশেষ করে সাশা খেপে যেত। সাশা যখন ওর পিছনে লাগত, ও তখন এমন একটা ভাব করে তাকাত যে সাশার তাতেই হয়ে যেত। বলত, 'ফুঃ খুদে আরশুলা! ঈশ্বরের সৃষ্টিছাড়া কোথাকার!'

ওর বালিশে আলপিন ঢুকিয়ে রাখতে সাশা আমাকে অনেকদিন বলেছে; বলেছে, ঘুমন্ত অবস্থায় ওর মুখে ঝুল-কালি মাখিয়ে দিতে কিংবা এই ধরণেই কিছু একটা কৌতুক করতে। কিন্তু আমি রাঁধুনীকে বেশ ভয় পেতাম। কারণ, জানতাম ধরা পড়ে যাব ওর হাতে। ওর ঘুম হালকা, রাতে জেগে প্রায়ই আলো জ্বালত, তারপর বসে থাকত একটা কোনের দিকে চুপ করে। কোন সময়বা উঠে এসে উনুনের পিছনে আমার বিছানায় বসত, আর আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'মাঝে মাঝে আমি ঘুমোতে পারি না, আলিওশা। অস্থির লাগে। আমাকে কিছু বল।'

আধো ঘুমে কোন গল্প বলে যেতাম আর সে শান্ত হয়ে বসে শুনত। এতে আমার মনে হত ওর গরম শরীর থেকে গলান মোম আর ধুনোর গন্ধ বেরিয়ে আসছে, খুব তাড়াতাড়ি ও যেন মরবে। এক্ষুণি, হয়ত এই মুহূর্তে। গলার আওয়াজ বাড়িয়ে দিতাম ভয়ে। কিন্তু ও আমাকে থামিয়ে দিত তক্ষুণি—।

'শিস্! তুই তো এই জারজগুলোকে জাগিয়ে দিবি দেখছি, আর ওরা ভাববে তুই আমার পিরিতের নাগর।'

এইভাবে প্রতিদিন সে বসে থাকত। হাঁটুর ভেতর হাত দুটো ঠেলে, হাড জিরজিরে পা দুটো শক্ত করে চেপে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ত। হাতে তৈরী মোটা রাত্রিবাসের ভেতর থেকেও ওর পাঁজরার আর চ্যাপ্টা বুকের হাড়গুলো চোপসানো পিপের খাঁজের মত স্পষ্ট হয়ে থাকত। এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'মরে গিয়ে জালা-যন্ত্রণা জুড়োতে সাধ হয়।' কিংবা কখনো অদৃশ্য কারুকে উদ্দেশ্য করে বলত, 'এই তো আমি আমার জীবনটা প্রায় কাটিয়েই দিলাম, কিন্তু কি হল?'

কখনো ভীষণ উদাসীনতায় আমাকে আমার গল্প বলার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলত, 'এখন ঘুমিয়ে পড়!' তারপর চুপটি করে উঠে হারিয়ে যেত রান্নাঘরের অন্ধকারের ভেতর।

'ডাইনী বুড়ী!' সাশা ওকে আড়ালে বলে থাকে।

সাশাকে একদিন বললাম এই কথা ওকে মুখোমুখি বলতে।

'ভাবছিস ভয় পাই!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সাশা। কিন্তু পরেই কপালে রেখা টেনে বলল, 'না, ওর মুখোমুখি বলব না ; হতেও তো পারে ও সত্যিকারের ডাইনী।'

সকল সময়ই বিরক্ত, খিটখিটে মেজাজ মেয়েছেলেটির। কারুর চাইতে একটু বেশি দয়া মায়া ও আমাকে করত না। ভোর ছ'টায় আমার পা ধরে টেনে চিৎকার করত, 'অনেক হয়েছে তোর নাক-ডাকা। কাঠ নিয়ে আয়! সামোভার গরম কর! আলুর খোসা ছাড়া!'

এতে সাশারও ঘুম ভেঙ্গে যেত।

'কি নিয়ে চ্যাচাচ্ছ এত?' বিরক্ত হয়ে উঠত সে। 'আমি মনিবের কাছে নালিশ করব, তুমি আমাকে ঘুমোতে দাও না।'

রাত-জাগা দুটো ট্যাবা ট্যাবা চোখে সে একবার সাশার দিকে তাকিয়ে হাড়-জিরজিরে দেহটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভেতর চলে যেত। 'হুঃ, ভগবানের অনাসৃষ্টি কোথাকার! যদি তুই আমার সতীনের ব্যাটা হতিস তবে পিটিয়ে সোজা করে দিতাম না!'

'জাহান্নামে যা!' সাশা জোরে চিৎকার করত।

'দাঁড়া, তারপর দোকানে যাবার পথে সাশা বলত, 'ওকে দূর করবার ব্যবস্থা করছি। রান্নায় নুন মিশিয়ে দেব ওর অজান্তে, সব রান্নাই যদি নুন কাটা হয় তবেই ওকে তাড়িয়ে দেব ; কিংবা কেরোসিন ফেলে দেব। তুই কি এটা করতে পারবি?'

'কেন তুই-ই কর না।

'ভীতু কোথাকার!' সাশা গুমড়ে উঠত।

রাঁধুনীটা মরল, আমাদের চোখের খুব সামনেই। সামোভার তুলতে গিয়ে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কাত হয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে পড়ল, রক্তের ধারা নেমে এল মুখ বেয়ে, যেন কেউ ওকে ওর বুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

ও মারা গেছে, আমরা দুজনেই বুঝতে পারলাম কিন্তু ভয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম নিঃশব্দে। যখন আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না, সাশা তখন একছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ; আমি রাস্তার আলোর দিককার জানলার কাঁচের সাথে মিশে রইলাম। মনিব এল। চিন্তান্বিত মুখে ওর পাশে ঝুকে পড়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে বলল, 'মরে গেছে। ঠিক আছে।' তারপর সে কোনের দিকে রাখা অদ্ভুতকর্মা নিকোলাইয়ের ছোট্ট মূর্তিটার দিকে ফিরে ক্রুশ করল আর প্রার্থনা শেষ হলে দরজার দিকে মুখ তুলে আদেশ করল, 'কাশিরিন! পুলিশে খবর দে!'

একজন পুলিশ এল। কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরল। শেষে একটা মুদ্রা পকেটে পুরে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরল সঙ্গে একটা মালটানা গাড়ির কোচম্যানকে নিয়ে। তারা রাঁধুনীর মাথা আর পা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। মনিবের স্ত্রী এসব দেখছিল দরজার ফাঁক দিয়ে। আমাকে ডেকে বলল, 'মেঝেটা ভাল করে পরিষ্কার কর।'

'সন্ধ্যার মধ্যেই মারা গেছে ; ভালই হল।' মনিব বলল।

কিন্তু কেন যে ভাল হল তা আমি বুঝতে পারলাম না।

'আলো নেভাস না।' বিছানায় যাবার সময় অপ্রত্যাশিত স্বরে বলল সাশা।

'ভয় হচ্ছে ?'

সাশা বেশ কিছুক্ষণ মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশ্চুপ রইল। নির্ঘুম রাত কান পেতে কি যে শুনছে। একটু বাদেই হয়ত ঢঙ ঢঙ ঘন্টা বেজে উঠবে। আমার মনে হল, শহরের সমস্ত মানুষই হয়ত ভয়ে চিৎকার করে উঠে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করে দেবে।

'আয়, দুজন উনুনের ওপর শুই।' কম্বল থেকে মুখ বার করে সাশা ধীর গলায় বলল।

'উনুনের ওপরটা গরম।'

আবার চুপচাপ হয়ে পড়ল সাশা। শেষে বলল, 'হঠাৎই মারা গেল, না ? আমি মনে করতাম ও একটা ডাইনী। না, ঘুম আসছে না।'

'আমিও পারছি না ঘুমোতে।'

সাশা বলতে শুরু করল, কেমন করে কবর থেকে উঠে আসে মৃত মানুষ, রাতভর শহরময় ঘুরে বেড়ায় আর তাদের ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজে।

'মৃত মানুষদের কেবলমাত্র শহরটার কথাই মনে থাকে, রাস্তাঘাট ঘরবাড়ির কথা মনে থাকে না।' সাশা ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

রাত আরো গভীর হল। অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে উঠল। সাশা তার মাথা তুলল, 'আমার বাক্সে কী আছে দেখবি ?'

কী এমন বস্তু আছে, অবাক হয়ে বহুদিন ভেবেছি, যা সাশা বাক্সে লুকিয়ে রাখে ? বাক্সটা সর্বদা সে তালা দিয়ে রাখত আর খুলত অতি সতর্কে। কখনো যদি উঁকি দিয়ে দেখতে চেয়েছি, অমনি চিৎকার করে উঠত, 'কী, দেখছিস কী।'

এখন আমি বললাম, 'দেখা।'

সে বিছানার ওপর উঠে বসল এবং তার স্বভাবসিদ্ধ ভারিক্কী স্বরে আদেশ করল পায়ের কাছে বাক্সটা এনে রাখতে। গলায় ঝোলান ক্রুশের সঙ্গে সরু একটা চেনে রাখত চাবিটা। প্রথমটায় রান্নাঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভারিক্কী কায়দায় ভ্রু কাঁপাল, তারপর খুলে ফেলল তালাটা। বাক্সের ডালাটার ওপর কয়েক-বার ফুঁ দিল—যেন ওটা গরম। অবশেষে ডালাটা খুলে ভেতর থেকে অনেকগুলো আণ্ডারওয়্যার বের করল। ওষুধের খালি বাক্স, চায়ের প্যাকেটের ওপরকার বিভিন্ন রঙের কাগজ, মাছের ফাঁকা টিন ইত্যাদি নিয়ে বাক্সটার অর্ধেক ভর্তি।

'ওগুলো কী ?'

'দেখবি দাঁড়া।'

দু-পায়ের ভেতরে চেপে ধরে বাক্সটা, সাশা ঝুঁকে পড়ল। তারপর উচ্চারণ করল, 'হে স্বর্গের পিতা···'

নানান রকমের খেলনা দেখব বলে আমি আশা করেছিলাম। কোনদিন খেলনা পাই নি আমি। বাইরে, খেলনার প্রতি আমি আমার অবহেলা দেখতাম কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের হিংসা করতাম খুব, যাদের খেলনা থাকত।

সাশার কাছে নিশ্চয়ই খেলনা আছে আর তার জন্যই সে অহঙ্কারী, আমি ভাবতাম লজ্জায় সে সব লুকিয়ে রাখে। এরজন্য আমি তাকে মনে মনে প্রশংসাও করতাম।

সে বাক্সটা খুলল। প্রথমে বের করল একজোড়া চশমার ফ্রেম। সেটা মুখে এটে গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকাল : কাঁচ নেই। 'এগুলো এরকমই, কাঁচ থাকে না।'

'দেখি আমি একবারে পরে!'

'এগুলো তোর চোখে লাগবে না। যাদের চোখ গাঢ়, এগুলো তাদের জন্যই।' আমাকে পাত্তা না দিয়ে বলল সাশা। কিন্তু হঠাৎ গলাটা জোর হল তার, ভয়ে ভয়ে সে রান্নাঘরের দিকে তাকাল।

একটা জুতোর টিনের মধ্যে রয়েছে কতকগুলো বোতাম।

'রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি এইগুলো, আমি নিজেই পেয়েছি সব, একত্রে সাঁইত্রিশটা।' বেশ গর্বের সঙ্গে বলল সাশা।

তৃতীয় বাক্সটা কতকগুলো পেতলের বড় কাঁটায় ভরা, এগুলোও রাস্তায় পাওয়া। দরজার হাতল একটা পেতলের, হাতির দাঁতের গোলাকার হাতল একটা, মহিলাদের মাথার চিরুনি একটা আর 'স্বপ্ন ও ভাগ্য গণনা' এই নামের একখানা বই। এছাড়া এই ধরনের আরো অনেক কিছু।

যখন আমি ন্যাকড়া আর হাড় কুড়িয়ে ফিরতাম তখন ইচ্ছা হলে আমি এইসব বাজে জিনিষের দশগুণ জমাতে পারতাম একমাসেই। আমার মনটা দমে গেল সাশার সম্পদ দেখে! বিরক্তি আর করুণা দুই ই হল ওর ওপর। সে নিবিড় ভাবে প্রতিটি জিনিষ দেখছে, গর্বে হাত বুলচ্ছে; ওর মোটা ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে গর্বে। চোখের ড্যালা ড্যালা ভাব থেকে যেন মমতা আর কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু চশমার জন্যই ওর ঐ কচি মুখটা কেমন অদ্ভুত হয়েছে!

'এইসব দিয়ে কি করবি?'

ফ্রেমের ভেতর দিয়ে একবার এক পলক তাকাল, তারপর বয়ঃসন্ধির ভাঙা সুরে বলল, 'তোকে কিছু দেব, নিবি?'

'না, ধন্যবাদ।'

ওর সম্পদের প্রতি আমার তাচ্ছিল্য দেখে প্রথমটায় চুপ করে রইল, পরে বলল, 'একটা তোয়ালে নে। আয় আয় আমরা ভাল করে সব পরিষ্কার করি, সব নোংরা হয়ে গেছে ধূলো পড়ে।'

সেগুলো ঘসে ঝেড়ে ঝকমক্ করে সাজিয়ে রাখার পর সে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল। বাতাসের ঝাপটা লাগে জানলার গায়ে, কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়ে গেছে।

'বাগানের মাটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তোকে এমন একটা জিনিষ দেখাব, তুই অবাক হয়ে যাবি।' মুখ না ঘুরিয়েই সাশা বলল। ওর কথার উত্তর না দিয়ে বিছানার ভেতর প্রবেশ করলাম আমি।

কিছুক্ষণ পর আবার সে লাফিয়ে উঠল। নখ দিয়ে দেয়াল খামচাতে খামচাতে উচ্চারণ করল, 'আমার ভয় করছে। হে ঈশ্বর, আমার ভীষণ ভয় করছে। প্রভু, দয়া কর!' ওর গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারলাম ও ভীত।

এদিকে আমিও ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। রাঁধুনী যেন আমার পেছন ফিরে জানলার কাঁচে কপাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মোরগের লড়াইয়ের সময় যেমন দাঁড়াত।

সাশা চেপে চেপে কাঁদল আর নখ দিয়ে দেওয়াল আঁচড়াল। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল ওর দুটো পা। জলন্ত কয়লার ওপর হেঁটে যাচ্ছি, এম্‌নি একটা অনুভূতিতে কোনরকমে রান্নাঘরের মেঝেটা পেরিয়ে আমি ওর পাশে গেলাম, শুয়ে পড়লাম। আর দুজনেই অনেক কান্নার পর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন পর আমরা একটা ছুটির দিন পেলাম, সেদিন মাত্র দুপুর পর্যন্ত কাজ করে খেতে ফিরে এলাম। মনিব আর তার স্ত্রী ঘুমোতে যাবার পর বেশ রহস্যভরা গলায় সাশা বলল, 'চল যাই।'

মনে মনে টের পেলাম, সে আমাকে সেই জিনিষটাই দেখাতে নিয়ে যেতে যায়, যা দেখে আমি অবাক হয়ে যাব।

আমরা বাগানের ভেতর গেলাম। দুটো বাড়ির মাঝখানে একটুকরো ফাঁকা জমি, সেখানে দশ পনেরটা পুরণো লাইম গাছ দাঁড়িয়ে, যাদের প্রশস্ত মোটা গুঁড়িগুলোতে শ্যাওলা পড়েছে এবং তাদের কালো কালো শূন্য ডালপালাগুলো মরার মত আকাশের দিকে তাকিয়ে। এদের মধ্যে একটা দাঁড়কাকেরও বাসা নেই। বিশাল সমাধি স্তম্ভের মত গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আর এই কটা লাইম ছাড়া এখানে অন্য কোন ঝোপঝাড় বা একটুকুও ঘাসের চিহ্ন নেই। ইটের পথটুকু লোহার মত কালো আর কঠিন হয়ে আছে। এবং পাতার ফাঁকে যেখানে যেটুকু খালি জমি চোখে পড়ে তাও নোংরা জলা ডোবার মত হয়ে আছে।

সাশা বাড়িটার কোনের দিকে মোড় ফিরল, রাস্তার বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল, দাঁড়াল একটা লাইম গাছের তলায়, সেখানে সে সামনের বাড়ির জানলার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তারপর নীচু হয়ে বসে দু-হাত দিয়ে পাতা সরাতেই বেরিয়ে এল একটা গিঁট শিকড়, ঠিক তার পাশেই মাটির মধ্যে গভীর করে ডোবান দুটো ইট। সে ইট দুটো তুলে ফেলল, সেখানে দেখা গেল চালা বানানোর এক টুকরো টিন; তার নীচে একটা তক্তা। শেষ পর্যন্ত বড একটা গর্ত আবিষ্কার হল—সেটা শিকড়ের তলা পর্যন্ত প্রসারিত।

সাশা দেশলাই ঠুকে এক টুকরো মোমবাতি ধরাল। এরপর আলোটা গর্তের ভেতরে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'দেখ, ভয় পাস না যেন।'

আসলে ভয় পেয়েছিল ও নিজেই। তাকে ম্লান দেখাল। হাতের আলোটা কাঁপতে থাকল থরথর করে। বিশ্রীভাবে [illegible] ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, চোখ উঠল ছলছল করে। ফাঁকা হাতটা আড়াল করে রাখল পেছনে। আমার ভেতরেও ছড়িয়ে পড়ল ওর ভয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমি তাকাই দরজার মত ঐ শেকড়টার নিচ দিয়েই। আরো তিনটে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে সাশা, যাতে গর্তটা নীলাভ আলোয় ভরে উঠেছে। গর্তের ফাঁকটা সাধারণ টবের মতই গভীর কিন্তু অনেকখানি চওড়া। দেওয়ালে রঙিন কাঁচ আর চিনেমাটির ভাঙ্গা টুকরো আঁটা। ছোট্ট একটা কফিন মাঝখানের উঁচু স্থানে। টিনের টুকরো দিয়ে তৈরি। জরিদার রেশমী কাপড়ের মত কী একটা দিয়ে কফিনখানার আধখানা

অংশ ঢাকা। আর তার ভেতর থেকে চড়ুই পাখির একটা ধূসর পা ও ঠোঁটটা বেরিয়ে আছে। তার মাথার ওপরে ছোট ডেস্কেতে ছোট একটা পেতলের ক্রুশ। দীপদানির ভেতরে জ্বলছে মোমবাতির টুকরো। তিনদিক সোনালী আর রূপালী প্যাকেটের কাগজে ঢাকা।

গর্তের খোলা দিকটার দিকে মুখ করে সরু দীপ-শিখাগুলো কাঁপছে, ভেতরটা নানা রঙের আলোর ছটায় হালকা উজ্জ্বল। মাটি, মোম, পচে যাওয়া নোংরার গন্ধ মিলেমিশে আমার নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আর যেন আমার চোখের ভেতরেই কাঁপতে শুরু করেছে ভাঙ্গা রামধনুর রঙগুলো। সমস্তটা মিলিয়ে দম আটকে আসার মত বিস্ময়ে আমার ভয় কেটে গেল।

সাশা জিজ্ঞেস করল, 'চমৎকার, না?'

'এটা কি, কি হবে?'

'সমাধি স্তম্ভ,' সাশা ব্যাখ্যা করল, 'ঠিক সেরকম, না?'

'জানি না।'

'ঐ চড়ুইটাই শব। অলৌকিকভাবে হয়ত একদিন ওর দেহটা একটা পবিত্র স্মৃতি-ফলক হয়ে উঠবে। কারণ, ওর মৃত্যু হল নিষ্পাপ-আত্মদান কিনা।'

'মৃত অবস্থায় পেয়েছিলি এটাকে?'

'না, গোয়ালের মধ্যে এসে পড়েছিল। টুপি দিয়ে ধরে পিষে মেরেছি আমি।'

'কেন?'

'এমনি।' সাশা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'চমৎকার, না?'

তাড়াতাড়ি তক্তাটা টেনে দেবার জন্য গর্তের মুখে ঝুঁকে পড়ল সাশা। তার ওপরে টিন ঢাকা দিল। এরপর ইট দুটো চাপা দিয়ে হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে উষ্মাপূর্ণ স্বরে বলল, 'কেন তোর ভাল লাগল না শুনি?'

'চড়ুইটার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন হঠাৎই অন্ধ হয়ে গেছে সে। আমার বুকের ওপরে একটা ধাক্কা মেরে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হাবা! হিংসা হচ্ছে তোর, তাই বললি ভাল লাগে না! কি ভাবিস, কানাতনায়া ষ্ট্রিটের তোর বাগানে যা বানিয়েছিলি সেটা আরো সুন্দর হয়েছিল, না?'

'অবশ্যই, অনেক সুন্দর হয়েছিল সেটা!' নিজেই আমি গোপন ঘর বানিয়েছিলাম একটা। আর সেটার কথা মনে পড়াতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে জবাব দিলাম।

হঠাৎ ফ্রক কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সাশা। আস্তিন গোটাল। হাতের তালুতে থুথু ছিটিয়ে বলল, 'আয় তবে, লড়াই করে ফয়শালা করি।'

লড়বার ইচ্ছে আমার একদম ছিল না। সব কিছুকে নিয়ে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিল। সাশার রুক্ষ মুখটাও সহ্য করতে পারছিলাম না।

সে ছুটে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বুকে ধাক্কা মেরে চিৎ করে ফেলল আমাকে। তারপর পা দুটো দুদিকে ছড়িয়ে আমার ওপর ভর দিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'বাঁচতে চাস, না মরতে?'

আমার গায়ের জোর ওর চাইতে বেশি, রাগটাও হয়েছিল প্রচণ্ড। একটু

পরই দু-হাত মাথার ওপরে তুলে সাশাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হল মাটিতে। গাঁ গাঁ করতে শুরু করল সে; আর আমি দারুণ ভয় পেয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম ওকে। কিন্তু ও আমাকে হাত পা ছুঁড়ে এগুতে দিল না। আমি সত্যি ঘাবড়ে গেলাম। কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে দূরে সরে দাঁড়ালাম। সে মাথা তুলে বলল, 'এবার তোকে মোকায় পেয়েছি, মনিব যতক্ষণ না এসে দেখে, ততক্ষণ নড়ব না একটুকু, তোর নামে নালিশ করব, তাড়িয়ে ছাড়ব তোকে।'

সাশা আমাকে অভিসম্পাত করতে লাগল, শাসাতে লাগল। আর এতে আমি ক্ষেপে গেলাম। গর্তটার কাছে ছুটে গিয়ে ইট দুটো টেনে ছুঁড়ে ফেললাম। সমস্ত কফিনটা টেনে তুলে আছড়ে ফেললাম বেড়ার ওপাশে। আর ভেতরের সবকিছু দু-পা দিয়ে পিষে দিলাম নষ্ট করে।

'আচ্ছা! আচ্ছা! দ্যাখ্ তবে!'

আমার রাগের এক অদ্ভুত কাজ হল সাশার ওপরে। উঠে বসে নিথর দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি যখন থামলাম, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। ধুলো ঝাড়ল, ফ্রক-কোটটা তুলে কাঁধের ওপর রেখে স্থির ক্ষোভে-আক্রোশে আমাকে ডাকল, 'এবার দেখে নিস! কয়েকদিন যাক্! তোর জন্যেই তৈরি করেছিলাম। ওটাত ডাইনীর জাদুমন্ত্র! দেখবি এইবার!'

ধপ করে বসে পড়লাম আমি। সাশার কথাগুলোই ধাক্কা মেরে যেন ফেলে দিল আমাকে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। আর একবারও আমার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল সাশা। ওর শান্ত ভাবটাই আমাকে যেন ধূলিসাৎ করে দিল।

আমি ঠিক করলাম, পরের দিনই শহর ছেড়ে, মনিব ছেড়ে, সাশা, সাশার জাদুমন্ত্র—এই সব ছেড়ে, এই অর্থহীন বিষাদময় জীবন থেকে পালিয়ে যাব।

পরদিন ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডাকতে এসে নতুন রাঁধুনী চিৎকার দিয়ে উঠল, 'হাঃ ঈশ্বর তোর মুখে এগুলো কি?'

ভয়ে ভয়ে মনে হল আমার জাদুমন্ত্রের ফল ফলেছে!

শেষ পর্যন্ত রাঁধুনীটা এত জোরে হেসে ফেলল যে আয়নার দিকে তাকিয়ে আমিও আর না হেসে পারলাম না। আমার মুখে কে যেন বেশ পুরু করে ঝুল কালি লেপটে দিয়েছে।

'সাশা করেছে, না?' প্রশ্ন করলাম।

হাসতে হাসতে বলল রাঁধুনি, 'হয়ত আমিই করেছি।'

জুতো পালিশ করতে লাগলাম। একটার ভেতরে হাত ঢোকাতেই পিনের একটা খোঁচা খেলাম।

'আচ্ছা, এই তবে জাদুমন্ত্র!' আমি মনে মনে ভাবলাম।

সবগুলো জুতোর মধ্যেই পিন আর পেরেক, এমনভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে যাতে হাত দিলেই আমার হাতে ফোটে! ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলাম এক ঘটি, তারপর ঘুমন্ত কিংবা ঘুমের ভান করে আঁকড়ে পড়ে থাকা যাদুকরের মাথায় মহা আনন্দে তাই ঢাললাম।

তবু মন তৃপ্ত হল না; কফিনটার কথা মন থেকে কোন রকমেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না। সেই চড়ুইটাকেও ভুলতে পারছিনা, কুঁকড়ে পড়া ধূসর দুটো পা,

ম্লান মোমের মত সেই ঠোঁট দুটো। আর বহুবর্ণের সেই মৃদু আলো ; যা নাকি খুক পিট পিট করছিল রামধনুতে পরিণত হবার অযথা চেষ্টায়। মনের মধ্যে কফিনটা যেন ক্রমশই বেড়ে উঠত। তার ঘরগুলো বড় হতে হতে কেঁপে উঠত জীবন্তের মতই।

আমি ঠিক করেছিলাম সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই পালিয়ে যাব। কিন্তু দুপুরে কেমন যেন একটা তন্দ্রা এসেছিল তেলের ষ্টোভে ঝোল গরম করতে করতে। উতলে ঝোল পড়তে আরম্ভ করেছিল। আর তাড়াহুড়োয় ষ্টোভ নেভাতে গিয়ে ঝোলশুদ্ধ কড়া উল্টে আমার হাতে পড়ল। ফলতঃ আমাকে পাঠান হল হাসপাতালে।

হাসপাতালের সেই বিভীষিকার কথা ভুলিনি আজো। চারপাশে ধূসর শাদা পোশাক পরা মূর্তির ভিড়। ঝলসান হলুদ শূন্যতার মধ্যে কাতড়ানো, বিড়বড় করা, ক্রাচে ভর করে একটা লম্বা লোক। গোঁফের মত মোটা ভ্রু-দুটো, লম্বা কাল দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিৎকার, 'মহামান্য বিশপের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাব আমি।'

হাসপাতালের খাটগুলোকেও কতকগুলো কফিন মনে হত আর তার সিলিংয়ের দিকে নাক উঁচিয়ে রাখা রোগীদের মনে হত মৃত চড়ুই। হলুদ দেয়ালগুলো দুলত, সিলিংটা ফুলে উঠত জাহাজের পালের মত। মেঝেটা দুলত দোলনার মত খাটগুলোকে দোলাতে দোলাতে। সমস্ত কিছু কেমন ভাবলেশহীন, আশাহীন। জানলার ওপাশে বাইরে পাতা-হারানো ডালপালাগুলো যেন কোন অদৃশ্য হাতের চাবুকের মত উঁচুতে উঠে থাকত। দরজার পথে একটা লাল চুলওলা ফঙ্কালসার শবদেহ যেন খাটো খাটো কঙ্কালসার হাত দুটো নিয়ে শবের আচ্ছাদন জড়িয়ে নাচছে, চিৎকার করছে, 'তোমাদের মত পাগলদের মধ্যে থাকব না আমি।'

'মহামান্য বিশপ্!' আর্তনাদ করে উঠছে ক্রাচে ভরকরা লোকটা।

দিদিমা, দাদু এবং অন্যান্য আরো অনেকের মুখেই বলতে শুনেছি যে হাসপাতালে মানুষকে মেরে ফেলে ; আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে, আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম। চশমা চোখে একজন মহিলা—তার শরীরেও যেন মৃতের পোষাক, কাছে এল। তারপর আমার শিয়রে ঝোলান স্লেটে খড়িমাটি দিয়ে কি যেন লিখল, আমার চুলের ভেতর খড়িমাটির গুড়ো পড়ছিল ঝরে।

'কি নাম তোমার ?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'নাম নেই আমার।'

'নাম নেই ?'

'না।'

'বাজে বকো না, বেত খাবে তাহলে।'

আমার তো কেমন নিশ্চিত ধারণাই ছিল ওরা আমাকে বেত মারবে, আর সেই কারণে ইচ্ছে করেই জবাব দিই নি। বেড়ালের মত শব্দ করে কথা বলছিল মহিলা। শেষে বেড়ালের মতই নিঃশব্দে চলে গেল।

দুটো আলো জ্বলল, এবং তাদের হলদে গোলক দুটো, যেন কার হারানো দুটো চোখ সিলিংয়ের ওপর থেকে ঝুলে মিটমিটিয়ে দুলতে লাগল, পরস্পর যেন মিশতে চাইছে তারা।

'এস, তাস খেলা যাক্।' কে যেন কোনের দিক থেকে বলে উঠল।

'একটা হাত দিয়ে কেমন করে খেলব ?'

'ওহো, তবে ওরা তোমার একটা হাত কেটে ফেলেছে নাকি ?'

কথাটা শুনে আমার মনে হল তাস খেলার জন্যই সম্ভবত ওর একটা হাত কেটে ফেলেছে ওরা। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, মেরে ফেলার আগে ওরা আমাকে আর কি কি করবে ?

হাত দুটো জ্বলছিল আমার, টন টন করছিল, কেউ যেন আমার হাতের হাড়-গুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। ভয়ে, ব্যথায়, চোখ বন্ধ করে চেপে চেপে কাঁদতে লাগলাম আমি। কেউ যাতে আমার চোখের জল দেখতে না পায় সে জন্য চোখের পাতা বন্ধ করে রাখলাম। তবু দু'চোখ ছাপিয়ে আমার কানের ভেতরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাত এল। যে যার খাটে উঠে রোগীরা কম্বলে তাদের গা ঢাকা দিল। প্রতি মুহূর্তেই নিস্তব্ধতা গভীর আর ঘন হতে শুরু করল। কেবলমাত্র সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে কোণের দিক থেকে কার যেন বিড়বিড় করা কণ্ঠস্বর শোনা গেল!

'ফল কিছুই হবে না এতে! ও হল একটা জানোয়ার আর মেয়েটাও একটা জানোয়ার!'

আমি চাইছিলাম দিদিমাকে চিঠি লিখি, সময় থাকতে থাকতে সে যেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু লিখতে পারলাম না হাতের জন্য। কাগজও ছিল না তা ছাড়া। পালিয়ে যাব ঠিক করলাম।

মনে হল রাতের বুঝি আর শেষ নেই। নিঃশব্দে খাটের কোন দিয়ে পা নামিয়ে দিলাম। এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে। দরজায় একটা পাল্লা খোলা। আর সেখানে বুড়ো একটা লোক বারান্দার বেঞ্চে শুয়ে আছে, তার মাথার পাকা চুলে ধোঁয়া উড়ছে। কোটরে ঢুকে পড়া চোখ দুটো যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। লুকোবার মত সময় হল না আমার!

'কে ওখানটায় ঘোরাঘুরি করছ? এদিকে এস।' গলার স্বরটা শান্ত এবং আদৌ ভীতিজনক নয়। কাছে এগিয়ে গেলাম। দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া পাকা চুল চারদিকে জ্বলে পড়েছে রূপোলি জ্যোতির্মণ্ডলের মত। কোমরে ঝুলছে এক থোকা চাবি। চুল দাড়িগুলো আরেকটু বড় হলে লোকটাকে দেখাত ঠিক সেইন্ট পিটারের মত।

'তোমার হাতই বুঝি পুড়ে গেছে? রাত অনেক, ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? ঘোরাঘুরির কি কোন নিয়ম নেই?'

মুখের ওপর একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে সে হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে নিল।

'ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে সবাই ভয় পায় এখানে এসে। কিন্তু তেমন কিছুই নেই এখানে ভয় পাবার মত। আমি কারোর কোন ক্ষতি হতে দিই না। সিগারেট খাবে? বেশ, বেশ, সিগারেট খাওনা তুমি। এখনো খুব ছোট আছ তো। আর দু'এক বছর যাক, তোমার মা-বাবা কোথায় থাকেন? মা বাবা নেই? ঠিক আছে, তুমি তার জন্য ভেব না। তাদের ছাড়াই তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। অবশ্য সাদা পাখনা যদি না গজায়।'

অনেক দিন পর এমন একজন মানুষ পেলাম যে সহজ সরল আন্তরিকতার সঙ্গে সাবলীল ভাবে কথা বলল। সে কথা শুনতে কি ভালই না লাগছিল।

সে আমাকে বিছানায় নিয়ে এল। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললাম, 'আমার কাছে একটু বস!'

'তা বসছি।' বলল সে।

'তুমি কে?'

'আমি সৈনিক! একজন খাঁটি সৈনিক যে ককেশাসে লড়াই করেছি। বাস্তবিক লড়াই। তাই স্বাভাবিক। সৈনিকের জীবন তো যুদ্ধ করার জন্যই। আমি যুদ্ধ করেছি হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে, চেরকেশীয়দের সঙ্গে, পোলীয়দের সঙ্গে। যুদ্ধ, বুঝলে ভাই, একটা মস্ত বড় শয়তানী।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজেছিলাম। খুলে দেখি, সৈনিকটির স্থানে দিদিমা আর সৈনিকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'ওরা তাহলে সকলেই মারা গেছে! আহা!'

সূর্যের আলো চঞ্চল শিশুর মত খেলা করছে, সোনালী আলোয় একবার যা উজ্জ্বল হচ্ছে পরক্ষণেই যাচ্ছে তা লুকিয়ে; নতুন করে আবার ঝাঁপ দিচ্ছে।

আমার মুখের ওপর নুয়ে দিদিমা বলল, 'কী হয়েছে তোমার, সোনা! ওরা মেরেছে তোমাকে? ঐ লাল চুলওলা হায়নাটাকে বলে দিয়েছি আমি...'

'একটু দাঁড়ান, নিয়ম মত সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আমি।' যেতে যেতে বলল সৈনিকটি।

'সৈনিকটি আমাদের গ্রামবাসী, তার দেশ বালাখনায়।' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে বলল দিদিমা।

তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। কথা না বলে তাই চুপ করে রইলাম। ডাক্তার এসে আমার হাতদুটো ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। এরপর দিদিমা আর আমি একটা গাড়ি চড়ে চললাম শহরের মধ্য দিয়ে।

'তোর দাদুর মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে,' দিদিমা বলল, 'বেশ কিপটে হয়েছে। এইতো সেদিন ওর বন্ধু ফ্লীস্ত—ফার-কারবারি—ওর প্রার্থনায় বইয়ের ভেতর থেকে একশ রুবলের একটা নোট চুরি করে নিয়েছিল। আর তাই নিয়ে কি ঝামেলাই না হল!'

উজ্জ্বল রোদ উঠেছে আর মেঘগুলো শাদা পাখির মত ডানামেলে উড়ে চলেছে আকাশ পেরিয়ে। আমরা বরফ-জমা ভল্গা পেরোলাম তার বুকের ওপর তক্তা-পাতা পথে। বরফ ভাঙ্গার শব্দ শোনা গেল। শপ্‌শপ্‌ শব্দ করে তক্তার নিচেকার জল ছলকে ছলকে উঠছে। বাজারের গির্জার চূড়োর লাল গম্বুজ-গুলোর ওপরের সোনালী ক্রুশগুলো ঝকমক করছে। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হল পথে। প্রশান্ত মুখ। পথ বেয়ে চলেছে এক বোঝা রেশমি কোমল উইলো নিয়ে। বসন্ত আসছে আর খুব তাড়াতাড়িই আসছে ইস্টার উৎসব।

আমার অন্তস্থল গান গেয়ে উঠছিল ঠিক যেন ভরত পাখির মত।

'তোমাকে আমি খুব ভালবাসি দিদিমা!'

আমার কথায় একটুকুও আশ্চর্য না হয়ে দিদিমা বলল, 'তাতো বাসবি-ই—

তুই যে আমার আপনারজন···অহঙ্কার না করেও বলতে পারি যে যারা নিতান্তই পর তারাও আমাকে ভালবাসে। মেরি মাতাকে ধন্যবাদ!'

তারপর আবার একটু হেসে বলল, 'মেরি মাতার আর কি—ওঁর ছেলে তো এরমধ্যেই বেঁচে উঠবেন, কত আনন্দ করবেন। কিন্তু আমার মেয়ে ভারিয়া···'

তারপর চুপ করে রইল সে।

দুই

উঠোনে দাদুকে দেখলাম, হাঁটু মুড়ে কুড়োল দিয়ে বাঁশের ফালি চাঁচছিলেন। আমাকে দেখেই কুড়োল এমন ভাবে তুললেন, মনে হল ওটা ছুঁড়ে মারবেন আমার মাথায়। এরপর টুপি খুলে ঘৃণা আর বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'আসুন আসুন সাহেব। চাকরিটা তাহলে শেষ। ভালই তো নিজের পেট এখন থেকে নিজেই চালাবার কথা ভাববেন,—যেমন করেই হোক! হুঃ।'

হাত নাড়িয়ে দিদিমা তাকে থামাল, 'জানি, সব জানা আমাদের।' ঘরের ভেতর সামোভার ফুটোতে ফুটোতে দিদিমা বলল, 'এখন পথে বসাল তোর দাদু। টাকাকড়ি যা ছিল হিসেব ছাড়াই সব দিয়ে দিয়েছে ধর্ম-পুত্র নিকলাইকে—তার হয়ে খাটাবার জন্য। হয়েছিল কি, তা ঠিক জানিনা, কিন্তু ওর সব শেষ হয়ে গেছে, টাকাপয়সা সব। গরিবদের কোনদিনই আমরা সাহায্য করি নি—হয়ত তাই। ভগবান হয়ত ভেবেছেন, 'আমি কেন এত দয়া দেখাব কাশিরিনদের প্রতি?' আর এই ভেবেই তিনি সমস্ত কেড়ে নিয়েছেন।'

চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখে দিদিমা আবার বলতে শুরু করল, 'যাতে ভগবান একটু সদয় হন তার জন্য চেষ্টা করছি, বুড়োটার প্রতি যাতে খুব নির্মম না হন। রাত হলে বেরিয়ে যাই; দান ধ্যান করি নিজের পয়সা থেকেই। তোর যদি ইচ্ছে হয় তাহলে আজ রাতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে বের হব। আমার হাতে সামান্য পয়সা আছে।'

দাদু ঘরে এলেন, মুখ চোখ বিকৃত। 'তোরা কি খাচ্ছিস দেখতে এলাম' বললেন তিনি।

উত্তরে দিদিমা বলল, 'তোমার থেকে খাচ্ছি না। তোমার যদি সাধ হয় তবে আমাদের সঙ্গে বসে যেতে পার। অনেক আছে, হয়ে যাবে।'

টেবিলে বসলেন দাদু। বললেন, 'আমাকে এক কাপ দাও।' একটু নরম সুর তার স্বরে।

ঘরের আসবাবপত্রগুলো ঠিক আগের মতই আছে। মায়ের কোণটা কেবল শূন্য—দুঃখ ব্যাকুলতায় ভরা। দাদুর খাটের ওপর এক টুকরো কাগজ, তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা, 'আমার আত্মাকে রক্ষা করুন যীশু। আমার মৃত্যুর আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত প্রতিটি দিন তিনি যেন তাঁর করুণা দেন আমাকে।'

জবাব দিলেন না দাদু। একটু বাদে মুচকি হেসে বলল দিদিমা, 'ওটার দাম একশ রুবল।'

'কী দরকার?' রেগে উঠলেন দাদু, 'যা কিছু আছে আমার পথের লোক ডেকে সব দিয়ে দেব।'

'দেবার মত বাকি আর কি! ছিল যখন তখন তো কিছু দিতে বুক ভেঙে যেত।' শান্তভাবে বলল দিদিমা।

'চুপ কর।' চিৎকার করে উঠলেন দাদু।

আগে যেমন ছিল, এখনো সবকিছু তেমনই আছে।

কোণে সিন্দুকের ওপরে রাখা ঝুড়ির ভেতরে জেগে উঠল কোলিয়া। ভারি পলকের তলায় ওর চকচকে নীল চোখদুটো ঢেকে আছে বললেই হয়। ও যেন আগের থেকে আরো বেশি ধূসর, ক্লান্ত, ক্ষীণজীবি হয়েছে। আমাকে চিনতে পারল না, পাশ ফিরল।

পথে বের হয়ে কয়েকটা দুঃসংবাদ পাই। ভিয়াখি নেই। খৃষ্টের মৃত্যু সপ্তাহে বসন্ত হয়ে মারা গেছে। খাবি গেছে শহরে। ইয়াজের দুটো পা-খসে গেছে, বার হতে পারে না। এই খবরগুলো বলতে বলতে চোখ কালো কস্ত্রোমা রেগে যায়; বলল, 'ছেলেগুলো তাড়াতাড়ি মরে যাচ্ছে!'

'কেবল ভিয়াখিরই তো মারা গেছে।'

'একই কথা। পাড়া থেকে চলে যাওয়াটা মরারই সমান। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, জানা চেনা হল, আর অমনি হয় তাকে দূরে পাঠান হল কাজের জন্য, নয় মারা গেল। তোদের পাড়ায় চেস্নকোভদের বাড়ি নতুন লোক ইয়েভ্‌সেয়েঙ্করা এসেছে। তাদের ছেলে আছে একটা। নাম, ন্যুশ্‌কা। ছেলেটা বেশ চালাক চতুর। দুটো মেয়ে আছে একটা খুব বাচ্চা আর একটা খোঁড়া। ক্রাচ নিয়ে হাঁটে। কিন্তু দেখতে ভাল।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে আবার বলল, 'চুরকা ও আমি তার প্রেমে পড়েছি। সারাদিন ঝগড়া করি।'

'মেয়েটার সাথে?'

আমি জানতাম বড় বড় ছেলেরা, মায় বয়স্করাও প্রেমে পড়ে। প্রেমে পড়ার স্থূল দিকগুলো কী তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু কথাটা শুনে মনটা দমে যায়। কস্ত্রোমার জন্যে দুঃখ হল। জ্বলন্ত দুটো কাল চোখ আর চোয়াড়ে চেহারার ওকে দেখলে যেন কেমন অস্বস্তি লাগে আমার।

সেদিন সন্ধেবেলা খোঁড়া মেয়েটার সাথে দেখা হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ ওর হাত ফসকে ক্রাচটা পড়ে গিয়েছিল। মোমের মত আঙুলগুলো দিয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরে ও দাঁড়াল। কেমন অসহায়, দুর্বল লাগছিল ওকে। ক্রাচটা তুলে দেবার চেষ্টা করি কিন্তু হাতের ব্যাণ্ডেজের জন্য পারছিলাম না। অনেক চেষ্টা করে ঘেমে উঠলাম। মুখ টিপে টিপে ও হাসছিল তখন।

'তোমার হাতে কী হয়েছে?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

'পুড়ে গেছে।'

'হায় আমারও পা খোঁড়া। তুমি এ বাড়িতেই থাক? অনেক দিন হাসপাতালে ছিলে? আমিও ছিলাম। অ-নে-ক দিন!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা।

শাদা পোশাকটা পুরনো, তবে ধোপভাঙ্গা। চুলগুলো সাজিয়ে আঁচড়ান। মোটা খাটো বেণীটা বুকের দিকে ঝোলান। চোখ দুটো ডাগর, গভীর। সেই গভীরতা থেকে আগুনের নীলাভ শিখা উঠে যেন শুকনো মুখটাকে উজ্জ্বল করেছে। মিষ্টি হাসি—তবু ওকে আমার ভাল লাগল না। ওর ক্ষীণ শরীরটা যেন বলছে, আমাকে ছোঁবে না।'

আমার বন্ধুরা কি করে যে এই মেয়েটার প্রেমে পড়ল।

'আমি দীর্ঘদিন অসুখে আছি।' সে আমাকে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল, তার স্বরে ধরা পড়ল সামান্য গর্বের সুর। 'আমাদের পড়শী মেয়েছেলেটা আমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে হিংসায় আমাকে তুকতাক করল। আচ্ছা, হাসপাতালে খুব খারাপ লাগত, না?'

'হুঁ।'

ওর সামনে কি রকম অস্বস্তি লাগছিল। ঘরের ভেতর চলে আসি।

তখন প্রায় মধ্য রাত। নিঃশব্দে এসে দিদিমা আমাকে জাগাল, 'চল যাই, অপরের ভাল করলে দেখবি তোর নিজের হাত খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে…'

আমাকে অন্ধের মত ধরে তিনি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলল। স্যাঁতস্যাঁতে কালো রাত। তীব্র নদীর মত বয়ে যাচ্ছে বাতাস। নিচের ঠাণ্ডা বালুতে পা শিরশির করছে। খুব সতর্কভাবে দিদিমা শহরের লোকদের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়াল। তিনবার ক্রুশ করল। পরে পাঁচটা করে পয়সা আর তিনখানা করে বিস্কুট জানলার তাকে রেখে তারা-শূন্য আকাশে তাকিয়ে আরো একবার ক্রুশ করে ধীরে ধীরে বলল, 'ওহে পবিত্র স্বর্গের রাণী! তোমার চোখে আমরা সবাই পাপী, আমাদের দয়া কর মা!'.

বাড়ি ছেড়ে যতই দূরে যাচ্ছি ততই অন্ধকার ঘন হচ্ছে। সেই সীমাহীন অন্ধকার যেন চাঁদ আর তারাগুলোকে গিলে ফেলছে। একটা কুকুর চিৎকার শুরু করল। তার দুটো চোখ জ্বলছিল অন্ধকারে। ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম।

'ভয় নেই, ওটা কুকুর,' বলল দিদিমা, 'ভূত পেত্নী বের হবার সময় পেরিয়ে গেছে। মোরগ ডাকছে এখন।'

কুকুরটাকে ডেকে দিদিমা মাথার ওপরে হাত বুলিয়ে আদর করল।

'তুতু, তুই আমার নাতিকে আর ভয় দেখাসনে।'

কুকুরটা আমার পায়ে গা ঘসল। এরপর আমরা তিনজনেই চলতে শুরু করলাম। বারোবার দিদিমা জানলার তাকে তার 'গোপন দান' রেখে এল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। অন্ধকারের ভেতরে এখন বাড়িঘরগুলো ঝাপসা হয়ে ফুটে উঠেছে। চিনির মত শাদা হয়ে ফুটে উঠছে নাপোলনায় গির্জার ঘন্টিঘর। কবরের পাশের ইটের দেয়ালগুলো যেন বাঁশের বেড়ার মত ফাঁকা ফাঁকা।

'তোর বুড়ি দিদিমা এখন ক্লান্ত। বলল দিদিমা, 'ঘরে ফেরার সময় হল। ঘুম ভাঙলে গিন্নীরা দেখবে মেরী মাতা তাদের সন্তানদের জন্য কিছু দান রেখে গেছেন। কিছু না থাকলে লোকে এসব যত্নসহকারে তুলে নেয়। হায়! আলিওশা দুঃখীরা কি কষ্টেই যে দিন কাটায়! তবু তাদের কেউ দেখে না।

অনুতাপ সেইখানেই। ঈশ্বর যেমন আমাদের সকলের জন্য চিন্তা করেন, সবাইকে দেখেন, আমাদেরও উচিত সকলের জন্য চিন্তা করা। যাক, আমি খুশি তুই আবার আমার কাছে ফিরে এসেছিস বলে।

আমিও আনন্দিত হয়ে উঠলাম। খুব প্রচ্ছন্নভাবে আমি টের পেলাম, এমন একটা কিছুর সংস্পর্শে আমি এসেছি জীবনে কখনো যা ভুলতে পারব না। খেঁক-শিয়ালের মত মুখ ধূসর কুকুরটা কাঁপতে কাঁপতে আমার পাশে পাশে চলছে। ওর চোখ দুটো—অসহায়ের মত।

'কুকুরটা কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?'

'থাকতে যদি চায় থাকবে না কেন ? একখানা বিস্কুট দিচ্ছি ওকে। আরো দুখানা আছে। চল, যাই ঐ টুলটার ওপরে বসি। কেন জানি না খুব ক্লান্তি লাগছে···'

একটা গেটের কাছে টুলে দুজন বসলাম। কুকুরটা নিচে শুকনো বিস্কুট চিবোতে লাগল। দিদিমা তখন গল্প শুরু করল, 'এখানে একজন ইহুদি মেয়ে থাকে। পরপর ন'টা ছেলেপুলে তার। 'কি করে চলে তোমার, মইসেয়েভনা ?' জিজ্ঞেস করলাম একদিন ওকে। 'ভগবান চালান। নইলে, আর কী করে চালাব ?' উত্তরে বলল মেয়েটি।'

আমি দিদিমার উষ্ণ গায়ের সঙ্গে মিশে থেকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার দ্রুতবেগে সীমানা ছাড়িয়ে বয়ে চলে জীবনস্রোত। প্রতিটি নতুন নতুন দিনের বিভিন্ন ঘটনা আমার মনে নানান ছাপ ফেলে যায়, কোনটা মুগ্ধ করে, কোনটা ভয় ধরায়, দুঃখী করে, কোনটা বা ভাবিয়ে তোলে।

দুদিন পার না হতেই ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে ঘনঘন দেখার, ওর সাথে দুটো কথা বলার, অন্তত পক্ষে গেটের সামনের বেঞ্চটার ওপরে শুধু ওর পাশে চুপ করে বসে থাকার জন্য আমার মনটা অধীর হয়ে উঠল। ওতেই যেন সুখ। মেয়েটা পাখির মত পবিত্র, পরিষ্কার। কসাকদের জীবন সম্পর্কে গল্প বলে চমৎকার। দোন্ অঞ্চলে ছিল সে অনেক দিন, তার কাকার কাছে। কাকা মাখন কারখানার একজন কারিগর, ওর বাবাও ছিলেন একজন ফিটার মিস্ত্রি, পরে নিঝনি-নভগরোদে চলে আসেন তিনি।

'আরো একজন কাকা আছে আমার, সে কাজ করে জারের প্রাসাদে।'

ছুটি-ছাটার দিন পাড়ার সকলে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। তরুণ তরুণীরা গির্জার কবর স্থানে নাচ গানের আসরে যায়। বড়রা সরাইখানায় ঢোকে। কেবল গিন্নীরা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে মহল্লায়।

তাদের ঝগড়া, গালগল্পে জেগে ওঠে মস্ত বড় কোলাহল। ছেলেরা বল, গোরদ্‌কি, লাপ্‌তা আর শোরমাজ্‌লো খেলে। মায়েরা ভাল বলে খেলার জন্যে। আবার কখনো খারাপ খেলার জন্য বকে দেয়। কানে তালা লাগান হৈ-চৈ যেমন বিরাট, ফুর্তিও সীমাহীন। বড়দের উপস্থিতি আর উৎসাহে, তীব্র প্রতি-যোগিতায় খেলতে শুরু করি। তবু ফাঁক পেলে কস্ত্রোমা, চুরকা আর আমি খোঁড়া মেয়েটার কাছে যাই, নিজেদের গুনগীতি করি।

'এক আঘাতে কেমন ন-টা ঘুঁটি ফেললাম, দেখলে ল্যুদ্‌মিলা ?'

মেয়েটা মিষ্টি হাসি হাসে, আর মাথা নাড়ায়।

প্রথমটায় আমরা তিনজনই চাইতাম একসঙ্গে খেলতে। কিন্তু এখন দেখছি চুরকা আর কস্ত্রোমা বিপরীত দলে খেলতে চায়। ওরা ওদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুজন দুজনকে আক্রমণ করে। এমন কি মারপিট কান্নাকাটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। একদিন দুজনে এমন ভীষণ মারপিট শুরু করল যে বড়রা ওদের গায়ে জল ঢেলে-দিয়ে, ছাড়াতে বাধ্য হল। মনে হল দুটো কুকুর ওরা।

বেঞ্চে ল্যুদমিলা বসেছিল। ওর ভাল পা-টা মাটিতে ঠুকছিল। মল্লবীরেরা ওর কাছে গিয়ে পড়লে, ক্রাচ দিয়ে ঠেলে, ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'থাম।'

ওর মুখটা ম্লান হয়ে এসেছিল। চোখ দুটো ঘোলাটে, আতঙ্কিত, যেন এখনি অজ্ঞান হবে!

অন্য একদিন গোরদ্কি খেলায় চুরকার কাছে ভীষণভাবে হেরে লজ্জায় ক্ষোভে কস্ত্রোমা আড়তের আড়াল হয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! জোরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরার জন্য চোয়ালের মাংসপেশী ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। শুকনো মুখটা পাথরের মত শক্ত। গভীর কালো দুটো চোখ থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল নেমে আসছে। ওকে সান্ত্বনা দিতেই ও কান্না গিলে বলল, 'অপেক্ষা কর, ইট মেরে ওর মাথা ফাটাব, দেখে নিস!'

চুরকার হাঁটা-চলায় দেখা গেল একটা উদ্ধত ভাব। টুপিটা মাথার একপাশে হেলিয়ে পকেটে হাত দিয়ে পাড়ার ভেতরে ঘুরে বেড়াত বিয়ের বয়সী ছেলেদের মত!

'আমি সিগারেট ধরেছি।' কায়দা করে চুরকা বলল। 'এর মধ্যেই চেষ্টা করেছি দু-একবার। কিন্তু এখনো গা গুলিয়ে ওঠে।'

সব মিলে মনটা কেমন বিরক্ত হচ্ছিল আমার। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম বন্ধুদের হারাতে বসেছি। মনে হল, ল্যুদমিলাই হচ্ছে এর জন্য দায়ী।

একদিন উঠোনে আমি যখন হাড়, ছেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি জঞ্জাল বেছে আলাদা আলাদা করছিলাম, ল্যুদমিলা এল ক্রাচে ভর দিয়ে, ডান হাতটা নাড়িয়ে দুলতে দুলতে। তিনবার মাথা নুইয়ে বলল, 'কস্ত্রোমা তোমার সঙ্গে গিয়েছিল?'

'হুঁ।'

'আর চুরকা?'

'চুরকা আমাদের সঙ্গে খেলে না এখন। তোমারই দোষে হয়েছে এটা। তোমার প্রেমে পড়ে ওরা দুজনে মারপিট করে।'

মুখ চোখ লাল হল ওর, তবু পরিহাসের সুরে বলল, 'বাজে বোকো না, আমার দোষ হবে কেন?'

'তুমি ওদের প্রেমে পড়তে দিয়েছ কেন?'

'আমার প্রেমে পড়বার জন্য আমি তো আর তোষামোদ করিনি।' ল্যুদমিলা রেগে বলল, 'যত সব বাজে কথা। আমি ওদের চাইতে বয়সে বড়, এখন আমার চোদ্দ। বয়সে বড় মেয়েদের প্রেমে কেউ আবার পড়ে নাকি?'

'তুমি কবতে পার না যেন!' ওকে ব্যথা দেবার জন্যেই চেঁচিয়ে বললাম, 'ওই দোকানদারনীকে দেখনি, খাঁস্তের বোন, দস্তুর-মত বয়েস হয়েছে ওর। কিন্তু ছেলেরা কেমন ওর পেছন পেছন ঘোরাঘুরি করত—দেখনি?

ফিরে আমার মুখোমুখি হতেই ল্যুদমিলার ক্রাচটা বালির মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেল।

'তুমি মোটেই চিন্তা কর না।' কেঁদে উঠে বলল ল্যুদমিলা। ওর চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল, 'দোকানদারনীটা হচ্ছে একটা খারাপ মেয়েছেলে। কিন্তু আমি—আমাকেও কি তাই ধরেছ? আমার এখনো বয়স হয়নি। আমার গায়ে হাত দিয়ে ন্যাকামো করবে তেমন পাওনি আমাকে। 'কামচাদাল্‌কা' বইটার দ্বিতীয় অংশ যদি তুমি পড়তে তাহলে এ ধরণের কথা বলতে না কখনোই।'

বিড়বিড় করতে করতে ল্যুদমিলা চলে গেল। আমার দুঃখ হল কিছুটা ওর জন্য। মনে হল, যেন ওর কথার ভেতরে সত্য আছে। কিন্তু সেটা কী, জানা হয়নি আমার। আমার বন্ধুরা কেন ন্যাকামো করত? আর বলে কিনা প্রেমে পড়েছে!

আমার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে দু'কোপেকের লাড্ডু কিনে নিয়ে এলাম পরের দিন। ওটা ল্যুদমিলার প্রিয় মিষ্টি।

'নেবে ?'

'চলে যাও! তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই না আমি!' রাগের ভান করে বলল ল্যুদমিলা।

খানিক পরেই লাড্ডুগুলো তুলে নিতে নিতে বলল, 'কাগজে মুড়ে আনলেও তো পারতে। দেখছ তোমার হাত দুটো কী অপরিষ্কার।'

'হাত ধুয়েছিলাম। কিন্তু এগুলো যে ওঠে না।'

ওর শীর্ণ কোমল হাতে আমার হাতটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ল্যুদমিলা।

'হাত দুটো তো একদম শেষ করেছ।'

'তোমার আঙুলেও তো খোঁচা খোঁচা দাগ।'

'ওগুলো হয়েছে সুঁচের ফোঁড়ে। অনেক সেলাই করতে হয় কিনা।'

তারপর চারদিকে একবার দেখে নিয়ে ল্যুদমিলা বলল, 'চল, কোথাও যাই, লুকিয়ে দুজন মিলে 'কামচাদালকা' বইটা পড়ি। পড়বে ?'

তেমন জায়গা খুঁজতে বেশ সময় লাগল। শেষে স্নানের ঘরে ঢোকার পথটাই ঠিক হল। স্থানটা অন্ধকার। তবু আমরা জানলার ধারে গিয়ে বসতে পারি। জানলার ওপাশে গোয়ালের চালা আর কসাইখানার মাঝে আস্তাকুঁড়ের মত একটু জায়গা। এদিকটায় কেউ সাধারণত আসে না।

ল্যুদমিলা বসল জানলার ধারে। খোঁড়া পা-টা বেঞ্চের ওপরে ছড়িয়ে ভাল পা-টা রাখল মেঝের ওপরে। চোখের সামনে খোলা বই। পাতাগুলো কোণ ভাঙা। দ্রুত ঢেলে চলেছে অজস্র প্রাণহীন দুর্বোধ্য কথার স্রোত। তবুও আমি অভিভূত হলাম। দেখতে পাচ্ছি ওর গভীর দুটো চোখের ভেতর থেকে দুটো নীল শিখা উঠে বইটার পাতার ওপরে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে জলে ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ দুটো। অজানা দুর্বোধ্য শব্দগুলো পড়ে গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঐ শব্দগুলোকে নিয়ে মনে মনে বিভিন্নভাবে ভেঙেচুরে কবিতায় সাজাবার চেষ্টা করলাম। মনটা এদিকে আটকে থাকার জন্য বইটার বিষয়বস্তু যে কী তা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

কুকুরটা আমার কোলে ঘুমোচ্ছে। ওর নাম দিয়েছি 'ঝড়ো'। কারণ, লম্বা ঠ্যাংগুলো নিয়ে ও ছোটে ঝড়ের মত। আর শরৎকালের ঘূর্ণি হাওয়া চিমনির মুখে ধাক্কা খেয়ে যেমন গর্জে ওঠে ওর গর্জন ঠিক তেমনি।

'শুনছ তো ?' প্রশ্ন করে ল্যুদমিলা।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। শব্দের ভ্রমে আমার উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল। ওগুলোকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে গানের কথার মত করে তোলার চেষ্টায় আরো উৎসুক হলাম আমি। সে গানের প্রতিটা কথা যেন হয় এক একটা তারার মত উজ্জ্বল প্রদীপ্তিময়।

অন্ধকার নেমে এল। বইটা নামাল ল্যুদমিলা।

'চমৎকার, না ?' বলল ল্যুদমিলা, 'বলেছিলাম না বইটা ভারি ভাল।'

তারপর থেকে প্রায়ই আমরা স্নানের ঘরে ঢোকার পথে গিয়ে বসতাম। ল্যুদমিলা 'কামচাদালকা' পড়া বন্ধ করতে আমি আরো খুশি হলাম। বইটার ঐ

অফুরন্ত গল্প সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কিছুই বলতে পারতাম না। অফুরন্ত বলছি কারণ দ্বিতীয় অংশের পর আছে তৃতীয় অংশ। আমরা শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় অংশ থেকে। ল্যুদমিলা বলছিল, চতুর্থ অংশও আছে নাকি বইটার।

বৃষ্টির দিনে আমরা খুব খুশি হতাম, অবশ্য দিনটা শনিবার না হলে। সেদিন স্নানের ঘরে জল গরম করা হত।

অঝর ধারায় বৃষ্টি নামত। ঘরের বার হত না কেউ। তাই আমাদের দিকে কারুরই আসার কোন সম্ভাবনা থাকত না। ল্যুদমিলা ভীষণ ভয় পেত, পাছে কেউ আমাদের দেখে ফেলে।

'তাহলে কী ভাববে ওরা?' ধীরকণ্ঠে বলেছিল ল্যুদমিলা।

আমারও ভয় ছিল। কোন কোন সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে আমরা গল্প-গুজব করে কাটাতাম। দিদিমার বলা গল্প কখনো শোনাতাম আমি কিংবা ল্যুদমিলার কাছ থেকে শুনতাম মেদ্‌ভেদিৎসা নদীর পারে কসাকদের কথা।

'খুব চমৎকার ও দেশটা!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলত ল্যুদমিলা, 'এখানকার মত না। এটা তো ভিখিরীদের দেশ।'

আমি ভাবছিলাম বড় হলে মেদ্‌ভেদিৎসা নদী দেখতে যাব।

কিছুদিন পরে স্নানের ঘরের পথে বসার আর আমাদের প্রয়োজন থাকল না। ল্যুদমিলার মায়ের কাজ হল ফারকারবারীদের ওখানে। ছোট বোন স্কুলে যায়, ভাই যায় টালির কারখানায়। বর্ষা বাদলের দিনে আমি গিয়ে ল্যুদমিলার ঘরকন্নায় সাহায্য করি।

'আমরা ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত ঘর করছি।' হেসে বলে ল্যুদমিলা।

'কেবলমাত্র শুই না একসঙ্গে, এই যা। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর চাইতেও ভালমত ঘরকন্না করছি আমরা। মানে, স্বামীরা তো আর তাদের স্ত্রীদের সাহায্য করে না।'

কিছু পয়সা হলে আমি মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি। দুজনে মিলে চা খাই। তারপর সামোভারটা আবার ঠাণ্ডা করি জল ঢেলে, ল্যুদমিলার মা যাতে টের না পায় যে আমরা সামোভার গরম করেছিলাম। মাঝে মাঝে দিদিমা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। লেস বুনতে বা সেলাই করতে করতে অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প বলে সব। এছাড়া যেদিন দাদু শহরে যান, সেদিন ল্যুদমিলা আমদের ঘরে আসে। সে সব দিনে আমরা উত্তাল হয়ে যাই, ভোজ লাগাই দারুণ।

দিদিমা বলত, 'বেশ ভাল যাচ্ছে আমাদের, নারে? নিজের পয়সায় খাবো-দাবো, তাতে কে কি বলবে?'

আমাদের বন্ধুত্বে দিদিমা উৎসাহ দিত. 'কেবল বোকার মত কোন কাজ করে না বসলে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে ভাব হওয়াটা খুবই ভাল।'

এরপর বোকামীর কাজটা যে কী, তা বুঝিয়ে বলতেন সোজাভাবে। তার ব্যাখ্যা ছিল সুন্দর, প্রেরণাময়। আমাকে বোঝাল দিদিমা, ফুল যতক্ষণ পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত ছুঁতে নেই। কারণ সে ফুল গন্ধও দেয় না, ফলও ধরে না। বাস্তবিক কোন রকমের 'বোকামীর কাজ' করার ইচ্ছে আমার ছিল না।

কিন্তু তারজন্য ল্যুদমিলা আর আমার মধ্যে যে সেই সব না-বলা নিষিদ্ধ কথার আলোচনা হত না, তা নয়। অবশ্য, আলোচনা হত প্রয়োজনে। কারণ স্থূল যৌন-সম্পর্কের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ আমাদের চোখের সামনে আসত—যাতে আমরা বেশ মর্মাহত হতাম।

ল্যুদমিলার বাবা ইয়েভসেয়েঙ্কো। সুপুরুষ, বয়সে প্রায় চল্লিশ। মাথার চুল ও গোঁফ কোঁকড়া কোঁকড়া। প্রশস্ত ভুরু। একটা বিজয় গর্বের ভঙ্গি করে ভুরু তুলে তাকাত। অদ্ভুত রকমের কম কথা বলার লোক। কোনদিন আমি তার মুখে একটা কথাও শুনেছি, মনে পড়ে না। যখন সন্তানদের আদর করত, তখন কালা-বোবা মানুষের মত কেবল একটা শব্দ করত মুখে। এমন কি স্ত্রীকে যখন মারত তখনও মুখে কথা থাকত না।

ছুটির সন্ধ্যায় গায়ে জড়াত একটা নীল জামা, আর মখমলের চওড়া পাজামা। চক্‌চকে বুট। কাঁধে চামড়ার ফিতের সঙ্গে বড একটা একর্ডিয়ন নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াত। অনেকটা হাতিয়ারওলা সৈনিকের মত। মানুষ-জনের ভিড বিকেলের হাওয়ায়, আমাদের গেটের সামনে জমে উঠত। রাজহংসের মত মন্থর গতিতে মেয়েরা আর গিন্নীরা চোখের কোণে লজ্জা-লুব্ধ দৃষ্টি রেখে ইয়েভসেয়েঙ্কোর দিকে তাকাতে তাকাতে দল বেঁধে চলে যেত। কেউ বা তাকাত ক্ষুধার্ত চোখে। নিচের ঠোঁটটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে দুটো কালো চোখের সন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত ইয়েভসেয়েঙ্কো। নারীদের সেই নীরব দৃষ্টি-বিনিময়, নিয়তির টানের মত মন্থর গতিতে এই পুরুষটির সামনের শোভাযাত্রার মধ্যে কেমন যেন একটা ন্যক্কারজনক মনোভাব ফুটে উঠত। মনে হত ইয়েভসেয়েঙ্কোর তরফ থেকে একটু সাড়া পেলেই পথের নোংরা ধুলোর ওপরে লুটিয়ে পড়বে যে কেউ।

'চোখ মারছে ওদিকে, দেখো না! ছাগল! বেহায়া শুয়োর কোথাকার!' দাঁতে দাঁত রেখে বিড়বিড় করে উঠত ল্যুদমিলার মা। ওকে ঠিক মুড়ো ঝাঁটার মত লাগত। রোগাপটকা লম্বা শুকনো মুখ। টাইফয়েডে ভোগার জন্য মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা।

পাশে বসে থাকত ল্যুদমিলা। বিভিন্ন রকমের কথা বলে চেষ্টা করত মায়ের মন অন্যদিকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু পারত না।

'দূর হ এখান থেকে, লেংড়ী।' ধমকে উঠত ওর মা। সীমাহীন অস্বস্তিতে চোখ পিটপিট করত। তার সরু সরু মঙ্গোলীয় চোখ দুটো ছিল আশ্চর্য রকমের নিষ্প্রভ আর নিথর। যেন কিছুর সঙ্গে আটকে গেছে, কিংবা কিছু একটা টেনে ধরেছে।

'রাগ কোর না মা, লাভ নেই।' বলত ল্যুদমিলা, 'দেখ দেখ, পাটিয়ালের বিধবা বৌয়ের সাজগোজের ঘটা দেখ!'

'যদি তোদের তিন-তিনটেকে এই হাতে মানুষ করতে না হত তবে ওর চাইতে অনেক বেশি সাজগোজ করতে পারতাম আমি। তোরাই তো আমার হাড় মজ্জা খেয়ে শেষ করেছিস—গিলে খেয়েছিস।' পাটিয়ালের বিধবা বৌয়ের বিশাল দেহটার দিকে চোখ রেখে কান্নাভরা নির্মম স্বরে বলে ফেলত ওর মা।

পাটিয়ালের বিধবাকে দেখতে যেন একটা ছোটখাট বাড়ির মত। বারান্দার

মত উঁচু ঠেলে বেরিয়ে আসা বুকখানা। আঁট বাঁধা সবুজ রঙের রুমালের ফাঁকে ওর লাল মুখ দেখে আমার মনে পড়ত সূর্যাস্তের লাল আলোয় ঝক্‌মক্ করে ওঠা ঢালু ছাতের ঘুলঘুলির কথা।

একর্ডিয়নটা বুকের কাছে এনে দোলাতে দোলাতে বাজাত ইয়েভসেয়েঙ্কো। অজানা দূরকে ডাক দিয়ে যন্ত্রের ভেতরে জেগে উঠত অপূর্ব সুরঝঙ্কার! চারপাশের শিশুরা ছুটে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তার পায়ের কাছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে চুপ করে শুনত।

'একটু দাঁড়াও, কেউ কোনদিন বেদম ধোলাই দিলে তবে ঠিক হবে।' শাসাত ইয়েভসেয়েঙ্কোর স্ত্রী।

আড় চোখে ক্ষণিক তাকাত ইয়েভসেয়েঙ্কো। জবাব দিত না।

খ্‌লীস্তের দোকানের বেঞ্চটার ওপরে যেন আটকে গিয়ে বসে পড়ত। পাটিয়ালের বিধবা শুনত ওর বাজনা। মাথাটা নুয়ে পড়ত এক পাশে। দ্রুত নিশ্বাসে বুকখানা ওঠা নামা করত।

অস্তগামী সূর্য তার গোলাপী আলো দিয়ে গির্জার ওপাশের দূরের মাঠখানাকে ধুয়ে দিত। পথের ওপর নদীর মত ঝক্‌ঝকে পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত সচল-মাংসের প্রবাহ। তাদের পায়ে পায়ে শিশুরা। মত্ত বাতাস। রোদে তপ্ত বালুর ভেতর থেকে জেগে উঠত একটা মিশ্র গন্ধ। তার ভেতরে কসাইখানা থেকে ভেসে-আসা চর্বির মিষ্টি গন্ধটাই বেশি উগ্র। এছাড়া আছে রক্তের গন্ধ, আর ফারকারবাবীব উঠোনের থেকে আসে চামড়ার নোনা ঝাঁঝ। মেয়েদের বকবকানি, পুরুষদের মাতাল কথাবার্তা, শিশু-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার, একর্ডিয়নের সুর ঝঙ্কার সব কিছু মিলে যেত এক উত্তাল ছন্দে। যেন উর্বরা পৃথিবীর বিশাল দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। সমস্ত কিছুই স্থূল, নগ্ন—নির্লজ্জের মতই যা পাশবিক, নিজের সগর্ব শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য যা এতখানি উন্মত্তের মত অধীর, সেই অন্ধকার-জীবনস্রোতেই কেমন একটা অপরিসীম প্রবল বিশ্বাস জেগে উঠত।

এই এক ঘেয়ে কোলাহলের ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে দু-চারটে কথা অন্তরে আঘাত করে যায়, স্মৃতিতে ঠাই নেয়।

'একসঙ্গে সবাই মিলে তো আর ওকে ছিঁড়ে খাওয়া যাবে না। পালা করে করতে হবে।'

'আমরা যদি আমাদের না দেখি তবে কে আর দেখবে?'

'ভগবান মেয়েমানুষকে গড়েছেন কেবলমাত্র তামাসার জন্যেই?'

রাত হয়ে আসে। আরো মুখর হয়ে ওঠে বাতাস। কোলাহল শেষ হয়। ছায়ার পোশাক পরে কাঠের ঘরবাড়িগুলো যেন ফেঁপে ফুলে যায়। ঘুমোবার জন্য কিছু শিশুকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ঘরে। কেউ কেউবা ওখানেই বেড়ার ছায়ায়, মায়েদের পায়ের কাছে বা কোলের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ে। একটু বড় ছেলেরা এখন ধীর, অনুগত। ইয়েভসেয়েঙ্কো সবার অলক্ষ্যে সরে পড়েছে, যেন গলে শেষ হয়েছে। পাটিয়ালের বিধবা বৌও উধাও। গির্জা পেরিয়ে অনেক দূরের কোন এক স্থান থেকে যেন ভেসে আসছে একর্ডিয়নের গভীর সুর। ওখানেই বেঞ্চের ওপর নুয়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে ল্যুদমিলার মা, বেড়ালের মতই পিঠটা বেঁকে থাকে তার। দিদিমা চা খেতে যান দাইয়ের সঙ্গে। দাই আর ঘটকী দুই-ই সে।

ও ছিল আমাদের পড়শী। লম্বা-চওড়া চেহারা। মনোহর হাঁসের ঠোঁটের মত নাক। চ্যাপ্টা পুরুষালী বুকের ওপরে একটা সোনার মেডেল—'মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করার জন্যে পুরস্কার।' পাড়ার সকলে ওকে ভয় পায়। বলে 'ডাইনী।' শোনা যায় এক সময়ে এক কর্ণেলের তিনটে বাচ্চা আর অসুস্থ স্ত্রীকে একটা জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর থেকে বের করে এনেছিল সে।

দিদিমা আর ও—দুজনে সই। রাস্তায় দেখা হলে অনেক দূর থেকেই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে দুজন দুজনকে হেসে অভ্যর্থনা করে।

আমাদের গেটের কাছে বেঞ্চের ওপরে ল্যুদমিলার কাছে বসে আছি আমি আর কস্ত্রোমা। ল্যুদমিলার ভাইকে কুস্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাক দিয়েছে চুরকা। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে বালির ভেতরে দাপাদাপি করছে।

'থাম!' ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে ল্যুদমিলা।

কালো চোখের বাঁকা দৃষ্টি ফেলে ল্যুদমিলার দিকে তাকিয়ে শিকারী কালিনিনের গল্প বলে যাচ্ছে কস্ত্রোমা। নোংরা বুড়ো কালিনিন, শয়তানীভরা দুটো চোখ। গাঁয়ের সকলে ওর কুখ্যাতির কথা জানত। ক-দিন আগে মারা গেছে কালিনিন, কিন্তু—কস্ত্রোমা বলল, 'কবরস্থানের মাটিতে কবর না দিয়েই ওর কফিনটা রাখা হয়েছে অন্যান্য কবর থেকে ভিন্ন করে। কালো কফিনটা লোহার একটা ফ্রেমের ওপরে বসান। ঢাকনায় শাদা রঙের আঁকা একটা ক্রুশ, একটা বর্শা, একটা নলখাগড়া আর দুটো হাড়ের ছবি।'

অনেকে বলে প্রতিদিন রাত্রে বুড়ো নাকি কফিনের মধ্য থেকে উঠে এসে মোরগ ডেকে ওঠার আগে পর্যন্ত কবরস্থানের ভেতরে কী খুঁজে খুঁজে ফেরে।

'ওসব ভয়ঙ্কর কথা বলিস না!' অনুরোধের সুরে বলল ল্যুদমিলা।

'ছেড়ে দে আমাকে!' ল্যুদমিলার ভাইয়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে চেঁচিয়ে উঠল চুরকা। তারপর কস্ত্রোমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে বলল, 'মিথ্যে কথা বলছিস কেন? আমি এই চোখে মাটি খুঁড়ে কফিনটাকে কবর দিতে দেখেছি। ওপরটা তো খালি রেখেছে স্মৃতিফলক বসাবার জন্যে। তাছাড়া ওর প্রেতাত্মা রাতে কবরস্থানের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়—এ গুজব তো ছড়িয়েছে ঐ মাতাল কামারটা!'

'বেশ, অতই যদি জানিস তো যা না, কবরস্থানে রাত কাটিয়ে আয় না!' জবাব দিল কস্ত্রোমা। কিন্তু ওর দিকে ফিরে পর্যন্ত দেখল না।

দুজনে শুরু হল কথা কাটাকাটি। একটু ম্লান হয়ে মাথা নেড়ে ল্যুদমিলা মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মা, অতৃপ্ত আত্মা কি রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ, বেড়ায়' বলল ওর মা। প্রশ্নটা যেন বহু দূর থেকে তাকে ফেরাল।

দোকানীর ছেলে—ভালিওক। সুপুষ্ট গোলগাল দেখতে। গাল দুটো লাল। বছর কুড়ি বয়স। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। আমাদের কথাবার্তা শুনে বলল, 'আমি বিশ কোপেক আর সেই সঙ্গে দশটা সিগারেট বাজি ধরছি। কেউ যদি তোরা কবরস্থানে ভোর পর্যন্ত কফিনটার ওপরে শুয়ে থাকতে পারিস তো দেব। কিন্তু যদি ভয় পেয়ে চলে আসিস তবে আমি আমার ইচ্ছেমত যত খুশি কান মলব। কি, রাজী?'

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল। সে নীরবতা ভেঙ্গে ল্যুদমিলার মা বলল, 'কি সব বাজে বকছিস! বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের এ সব করতে বলা ঠিক নয় তোর।'

'এক রুবল দাও, আমি যাব।' বলল চুরকা।

'কেন, বিশ কোপেকে ভয় থাকবে বুঝি?' ব্যঙ্গ করে বলে কস্ত্রোমা। 'বল ভালিওক, বল এক রুবলই দেব, কিছুতেই ও যাবে না দেখিস। কেবলমাত্র বাহাদুরী দেখাচ্ছে!'

'আচ্ছা, এক রুবলই হবে।'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায় চুরকা। তারপর বেড়াটা ধরে ধীরে ধীরে সরে যায়। মুখের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে পেছন থেকে তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিয়ে ওঠে কস্ত্রোমা। আর উদ্বেগভরা কণ্ঠে বলে ল্যুদমিলা, 'কেন যে এত বড়াই করা?'

'ভীতু কাপুরুষের দল,' ব্যঙ্গ করে বলল ভালিওক, 'ওরা আবার এখানকার সেরা লড়ুইয়ে সব! ছো! কুত্তার বাচ্চা, তোরা হলি সব তাই!'

ওর ঐ অপমান সহ্যাতীত। দুচক্ষে আমরা দেখতে পারি না এই দিঘুটে ছোঁড়াটাকে। সব সময়েই ও বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের উস্কে দেয় খারাপ কাজ করার জন্য। মেয়ে আর গিন্নীদের নিয়ে যত নোংরা কথা বলে। তাদের সঙ্গে অশ্লীল কৌতুক করতে শেখায়। ছেলেরা ওর কথা-মত কাজ করে আর ধোলাই খায়। কেন যেন ও আমার কুকুরটাকে সহ্য করতে পারে না। দেখলেই ঢিল ছোড়ে। একদিন রুটির ভেতরে সূঁচ পুরে দিয়েছিল।

কিন্তু চুরকাকে ওভাবে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে আমার আরো বেশি খারাপ লাগছিল।

ভালিওককে বললাম, 'দাও রুবল, আমি যাব।'

হো হো করে অট্টহেসে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করে ল্যুদমিলার মায়ের হাতে রুবল রাখতে গেল সে।

'আমার দরকার নেই ও টাকায়; আমি নেব না।' বলে রেগে চলে গেল ল্যুদমিলার মা। ল্যুদমিলাও অস্বীকার করল টাকাটা রাখতে। এতে আমাদের আরো খেপিয়ে তোলার অবকাশ পেল ভালিওক। আর পিড়াপীড়ি না করে আমিও উঠে যাচ্ছিলাম, ঠিক সে সময়ে দিদিমা এল। এ সমস্ত কথা শুনে সে রুবল নিয়ে ধীর গলায় বলল, 'কোটটা গায়ে জড়িয়ে নে। আর একটা কম্বল নিয়ে যা সঙ্গে; ভোরের দিকে শীত পড়বে।

দিদিমার কথায় ভরসা পেলাম যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে না।

ভালিওক চুক্তি করিয়ে নিল যে যাই হোক না কেন, ভোর পর্যন্ত কফিনটার ওপরে শুয়ে কিংবা বসে কাটাতে হবে। এমন কি বুড়ো কালিনিন হামাগুড়ি দিয়ে, যখন উঠে আসতে শুরু করবে তখন কফিনটা যদি নড়ে ওঠে—তবুও। যদি আমি তখন লাফিয়ে চলে আসি তবে রুবল পাব না।

'মনে রাখিস, সারারাত আমি তোর ওপরে নজর রাখব!' ভালিওক বলল।

কবরস্থানের দিকে যখন যাচ্ছি, দিদিমা তখন আমার মাথায় ক্রুশ করে বলল, 'কখনো যদি কিছু দেখছিস মনে হয়, ভয় পাসনে। মেরী মাতার স্তব করিস!'

তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম, ঘটনাটা শেষ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলাম মনে মনে। ভালিওক, কস্ত্রোমা ও আরো কয়েকটা ছেলে চলল আমার সাথে। ইটের দেয়াল লাফিয়ে নামতে গিয়ে কম্বলে পা জড়িয়ে পড়ে গেলাম। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই এমনভাবে লাফিয়ে দাঁড়ালাম যেন তলার বালিই ঠেলে তুলে দিল। দেয়ালের ওদিকে শুনতে পেলাম উঁচু হাসির শব্দ। বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হিম স্রোত ওঠা নামা করতে লাগল।

কালো কফিনটায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একদিকে বালি ভর্তি, অন্যদিকে কাঠামোর ছোট্ট পা গুলো বেরিয়ে আছে। যেন কেউ চেষ্টা করেছিল টেনে ওঠাতে, পারেনি। কফিনটার ওপরে এক কোণে বসে চারদিকে তাকালাম। নুড়িভরা কবর জুড়ে ঘন বোনা পাংশু ক্রুশের সারি। ওগুলোর লিকলিকে ছায়া যেন কঙ্কাল হাত দিয়ে কবরের স্তূপগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে। ক্রুশগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে সরু রোগা বার্চ গাছ। ওগুলোর ডালপালা যেন আলাদা আলাদা কবরগুলোর ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করছে। ডালপালাগুলোর জালি ছায়ার নিচে মাথা উঁচিয়ে আছে আগাছা। এই ধূসর জীর্ণতাই সব চেয়ে ভয়ানক। এক বিরাট তুষার স্তূপের মত কবরস্থানের গির্জাটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। থেমে থাকা মেঘের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে মুমূর্ষু চাঁদ।

আস্তে আস্তে পাহারাদারের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে ইয়াজের বাবা 'বোকা চাষী।' যত দড়ি টানছে, ছোট ঘণ্টাটার দুঃখী স্বরের আগেই চালের একটা ঢিলে বাতার সঙ্গে দড়িটার ঘসা লেগে ভেসে উঠছে একটা করুণ শব্দ।

মনে পড়ল পাহারাদারের প্রার্থনা, 'হে প্রভু, ঘুমহীন রাত্রির থেকে আমাদের বাঁচান।'

মারাত্মক লাগছিল। দম আটকে আসছিল। সারা গায়ে ঘাম ঝরতে লাগল, অথচ রাতটা ঠাণ্ডা। কালিনিন বুড়ো যদি কফিনের মধ্য থেকে উঠে আসতে শুরু করে, তাহলে কি পাহারাদারের ঘর পর্যন্ত ছুটে গিয়ে পৌঁছতে সময় পাব!

কবরস্থানটা ভালই চেনা। বহুদিন ইয়াজ আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কবরস্থানের ভেতরে খেলেছি। ওখানে ঐ গির্জার কাছে মায়ের কবর।

সবাই এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি। মাঝে মাঝে রাস্তার দিক থেকে ভেসে আসছে হাসির টুকরো, টুকরো টুকরো গানের কলি। পাহাড়ের কোথাও থেকে, রেল রাস্তার বালির ঢিপির কাছ থেকে কিংবা পাশের কাতীজোভকা গাঁয়ের ভেতর থেকে উঠে আসছে একর্ডিয়নের বেদনাবিধুর তীক্ষ্ণ সুর। কামার মিয়াচভ—পাকা মাতাল, দেয়ালের ওদিকের পথ বেয়ে টালমাটাল পায়ে আসছিল। ওকে চিনতে পারলাম ওর গান শুনে।

'মা আমাদের দুষ্ট বড়
দেমাক ভারি তার
পাত্তা যেন পাওনা ছিল
শুধুই বাবার।'

জগতের জীবনময় এই শেষ স্পন্দনগুলো শুনে মন চাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিটা ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে আরও নিস্তব্ধতা গভীর হয়ে উঠল। এবং সে নিস্তব্ধতা যেন নদীর স্রোতের মত কূল ছাপিয়ে, মাঠের বুক ভাসিয়ে, সব কিছু ডুবিয়ে, মুছে নিশ্চিহ্ন করে চলেছে। আমার আত্মা যেন এক সীমাহীন অতল শূন্যতার ভেতরে হারিয়ে গেল; মিলে গেল এক শূন্যময় মহাসমুদ্রের ভেতরে। সেখানে কেবল সুদূরের তারারা বেঁচে, ঝিকমিক্ করছে, বাকি সবকিছুই নিঃশেষ, মৃত আর অবাঞ্ছিত।

কম্বলটা ভাল মত গায়ে জড়িয়ে আটোসাটো মেরে বসলাম গির্জার দিকে মুখ রেখে। কফিনটা সামান্য মচ করতে কিংবা বালির ঝরঝরানির শব্দ উঠতেই চমকে উঠলাম।

পেছনে মাটির ওপরে কিছু একটা পড়ল ধপ করে। আবার শব্দ হল। একটা ইটের টুকরো এসে পড়ল কফিনটার ধারে। ঘটনাটা ভয় পাবার মতই, কিন্তু পরেই বুঝতে পারলাম ভালিওক আর তার সঙ্গিরা দেয়ালের ওপাশ থেকে ঢিল ছুঁড়ছে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য। তবুও ধারে কাছে যে মানুষ আছে এটা ভেবে মনটা চাঙা হয়ে উঠল আমার।

মায়ের কথা চিন্তা করতে শুরু করলাম। সিগারেটের স্বাদ নিয়েছিলাম বলে মা একদিন আমাকে মেরেছিল। আমি বলেছিলাম, 'মেরো না। এমনিতেই আমার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। আমার গা ঘোলাচ্ছে।'

পরে উনুনের পেছন দিকে গিয়ে বসেছিলাম। শুনলাম, মা দিদিমার কাছে বলেছে, 'এমন নির্মম ছেলে! কারো জন্যে সামান্য মায়া দয়া নেই!'

শুনে খুব দুঃখ হল মনে। মা যখনই মারত, তার জন্য কষ্ট হত; মনে মনে লজ্জা হত মার খাবার মত কিছু না করেও মার খাচ্ছি বলে।

কিন্তু সত্যিসত্যি জীবনে এরকম অনেক কিছু ঘটে যায় যা কষ্টের। যেমন ধরা যাক বাইরের ঐ মানুষগুলো। ওরা ভাল করেই জানে, আমার পক্ষে কবরস্থানে একা থাকা কি দারুণ ভয়াবহ। তবুও ওরা চেষ্টা চালাচ্ছে আমাকে আরো ভয় পাইয়ে দিতে। কেন? ইচ্ছে হয় আর্তনাদ করে বলি, 'তোরা, জাহান্নামে যা!'

কিন্তু সেটা কম বিপজ্জনক নয়। কে জানে শয়তান কথাটা কি ভাবে ধরবে? নিশ্চিত যে শয়তান আমার ধারেকাছেই কোথাও আছে।

বালির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ছড়িয়ে আছে অভ্রের গুঁড়ো। চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। তা দেখে মনে পড়ল, একদিন একা নদীতে একটা ভেলায় শুয়ে থেকে জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার চোখের খুব কাছে ভেসে উঠল একটা মাছ। মাছটা কাত হয়ে ঘুরতে মনে হল যেন মানুষের গাল। গোল গোল পাখির মত চোখ করে তাকিয়ে আমার দিকে। তারপর ডুব দিয়ে ঝরা পাতার মত ভাসতে ভাসতে জলের অনেক নিচে হারিয়ে গেল।

আমার স্মৃতি সক্রিয় হল। আমার কল্পনা বিভিন্ন বিভীষিকাময় ছবির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিল, এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করবার জন্য আমি আমার জীবন থেকে বহু ঘটনার স্মৃতি মনের ভেতর সাজাবার চেষ্টা করছিলাম।

যেমন মনে পড়ল, একবার একটা শজারু তার ছোটছোট শক্ত পায়ে বালির রাস্তায় হেঁটে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল ঘরো-ভূতের কথা। তেমনি ছোট্ট, তেমনি রোগাপটকা।

মনে পড়ল, দিদিমা কেমন করে উনুনের ধারে বসে মন্ত্র আওড়াত, 'হে খুদে ঘরো-ভূত, তুমি খুব ভাল, ঘরের সমস্ত আরশুলাগুলোকে খেয়ে নাও।'

শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে দৃষ্টিশক্তির বাইরে আকাশ লাল হয়ে উঠছে। ভোরের ঠাণ্ডায় আমার দুটো গাল শিরশির করছে। চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে আসছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লাম। হোক যা হবার!

দিদিমা আমার ঘুম ভাঙ্গাল। পাশে দাঁড়িয়ে আমার গায়ের কম্বল টানতে টানতে বলেছিল, 'ওঠ্ ওঠ্! শীতে জমে গেছিস? হ্যাঁ রে, খুব ভয় পেয়েছিলি না কি?'

'পেয়েছিলাম কিন্তু কাউকে যেন বোল না। ওরা যেন জানতে না পারে।'

'কেন, কি হবে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল দিদিমা, 'ভয় পাবার মত যদি কিছু নাই দেখলি তবে আর তোর বড়াই করার মত থাকবেটা কি?'

বাড়ি ফিরলাম। পথে কোমল স্নেহের সুরে দিদিমা বলল, 'জীবনের সমস্ত কিছুই তোকে এমনিভাবে পরখ করে দেখতে হবে, বাছাধন! শিখতে হবে নিজেকেই। নিজে নিজে জানতে না পারলে অন্য কেউই তোকে কিছু শেখাবে না।'

সন্ধ্যার মধ্যেই পাড়ার 'বীরপুরুষ' হয়ে গেলাম। সবাই জিজ্ঞেস করল, 'খুব ভয়াবহ নাকি রে?'

যখন বললাম 'ভয়েরই তো!' তখন মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা বলল, 'দ্যাখ, বলেছিলাম না?'

দোকানদারনী বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, 'তার মানে লোকে যে বলে কালিনিন কবর থেকে উঠে আসে, তা একদম বানানো কথা? যদি তাই হত, যদি সে কবর থেকে বেরিয়ে আসত, তবে কি সে ওই ছেলেটাকে দেখে ভয় পেত ভাবছ? এমন এক চড় মারত ছেলেটাকে যে কবরস্থান থেকে কোথায় উধাও হত কে জানে।'

বিস্ময় আর অনুরাগে ল্যুদমিলা আমার দিকে চেয়ে রইল। দাদুও যেন খুব খুশি। একাধিকবার আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছিলেন! কেবল চুরকা মুখ বেজার করে বলল, 'ওর পক্ষে এটা খুবই সোজা—ওর দিদিমা তো ডাইনী!'

তিন

আমার ভাই কোলিয়া ভোরের তারার মতই অলক্ষ্যে হারিয়ে গেল একদিন। একটা কুঁড়েঘরে কাঠের গাদার ওপরে পুরানো ছেঁড়া কাঁথ-কম্বল পেতে ঘুমোতাম আমরা তিন জন—কোলিয়া, দিদিমা আর আমি। জীর্ণ দেয়ালের ওপাশে বাড়িওলার মুরগীর ঘর। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা শুনতে পেতাম মোটা-সোটা মুরগীগুলোর ডাক, ডানার ঝটপটানি। আর প্রতি ভোরে ঘুম ভাঙত একটা সোনালী রঙের মোরগের প্রশস্ত চিৎকারে।

'তোর মাথাটা কেটে দেয়া উচিত!' একদিন ভোরে জেগে উঠে বলল দিদিমা। অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে ছিল। শুয়ে থেকে দেখছিলাম দেয়ালের সরু সরু লম্বা ফাটলের ভেতর দিয়ে আসা সূর্যের আলোর ক্ষীণ রেখা। রূপকথার গল্পের মত ধুলো-কণাগুলো নাচানাচি করছে সেই আলোর ভেতর। কাঠের গাদায় ইঁদুরগুলো হুড়োহুড়ি করছে। কালো ছিটের ডানামেলে লাল গুবরে পোকাগুলো ঘোরাফেরা করছে এদিক ওদিক।

এক একদিন মুরগীর ঘরের ঐ দম আটকে-আসা দুর্গন্ধের থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি ঘর ছেড়ে গুটিসুটি বেরিয়ে ছাদের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। ওখান থেকে তাকিয়ে দেখতাম পড়শিরা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে—ঘুমের ফলে মুখগুলো হয়েছে ফুলো-ফুলো, চোখগুলো ঢাকা।

একটা জানলার ভেতর থেকে মুখ দেখতে নৌকোর মাঝি ফেরমশিনভ। মাথায় জট রুক্ষ-নোংরা। বদরাগী মাতাল। ফোলা ফোলা চোখের পলক দুটো

সামান্য মেসে রোদের দিকে মুখ করে শুয়োরের মত শব্দ করে উঠত। দু'হাতে মাথার পাতলা চুলগুলো ঠিক করতে করতে উঠোনে নেমে আসতেন দাদু। ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধোবার জন্য তাড়াতাড়ি যেতেন স্নানের ঘরের দিকে। খাড়া নাক আর মুখভর্তি ছিট্‌ছিট্‌ দাগের জন্য বাড়িওলার ঝগড়াটে রাঁধুনিটাকে ঠিক যেন একটা কোকিলের মত লাগত। আর মোটা-সোটা একটা পায়রার মতই মনে হত বাড়িওলাকে। মানুষ দেখলেই কেন জানি আমার মনে পড়ে কোন না কোন পাখি বা পশুর কথা।

পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর সকাল। তবু আমার মনটা কি রকম যেন ভেঙ্গে যেত। সাধ হত ছুটে গিয়ে মাঠের ভেতরে যাই, যেখানে একটু নিরালায় বসতে পারব। জানতাম, এই উজ্জ্বল দিনটাকে মানুষ নষ্ট করে ফেলবেই।

একদিন যখন ছাদের শুয়েছিলাম, দিদিমা ডাকল। পরে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কোলিয়ার বিছানাটা দেখিয়ে ভারি গলায় বলল, 'কোলিয়া মরে গেছে।'

লালশালুর বালিশ থেকে ওর মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে ফেল্টের তোষকের ওপরে। সমস্ত শরীর নীল আর নগ্ন। গায়ের জামাটা গলার দিকে উঠে এসেছে। বেরিয়ে পড়েছে কৃশকায় পেট আর খোসপাঁচড়াভরা দুটো পা। হাত দুটো পিঠের নিচে ভাঙ্গা, মনে হল যেন ওঠবার চেষ্টা করেছিল। মাথাটা একদিকে নুয়ে আছে।

'মরে বেঁচেছে' চুলের ভেতর চিরুনী চালাতে চালাতে বলল দিদিমা, 'এরকম হাড় জিরজিরে বাচ্চা কি আর বাঁচে!'

দাদু ঘরে এলেন। মৃতদেহটার চারপাশে বার দুয়েক পায়চারি করে খুব সতর্কতায় বাচ্চাটার বোজা চোখের পলক দুটো আলতোভাবে ছুঁলেন।

'অপরিষ্কার হাতে ছুঁয়ো না ওকে!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে চিৎকার করল দিদিমা।

'জগতে এল—নিঃশ্বাস নিল—খেল-দেল—তারপর সবকিছু শেষ হল…' বিড়বিড় করে বললেন দাদু।

'খেয়াল আছে, কি বলছ!' ঝঙ্কার দিয়ে তাকে থামাল দিদিমা।

শূন্য দৃষ্টিতে ড্যাবড্যাব করে কিছুক্ষণ দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠোনে চলে গেলেন দাদু, 'কর যা খুশি, কবর দেবার মত পয়সা নেই আমার।'

'হা রে মুখপোড়া!'

আমি বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম সেই সন্ধ্যায়। পরদিন ভোরে কোলিয়াকে কবর দেয়া হল। আমি গির্জায় যাইনি। সৎকারের সমস্ত সময়টা মায়ের কবরের পাশে বসে রইলাম। মায়ের কবরটা খোঁড়া হয়েছে ছোট্ট ভাইটাকে তার কাছে রাখার জন্য। কুকুরটা আর ইয়াজের বাবা আছে আমার পাশেই। কবর খুঁড়তে এতটুকু হয়রানি হয়নি তার তবুও বার বার বড়াই করল সে আমার কাছে, 'তোমার সঙ্গে আমার জানাচেনা আছে বলেই, নয়ত একটা রুবলই নিতাম।'

হলুদ গর্তটার ভেতর থেকে বের হয়ে আসছিল একটা বিশ্রী গন্ধ। ভেতরের দিকে কতকগুলো শ্যাওলা পড়া কালো তক্তা চোখে পড়ল। আমি ইচ্ছে করেই নড়াচড়া করছিলাম, বালি পড়ে যাতে তক্তাগুলো ঢাকা পড়ে।

'এসব ইয়ার্কি করবিনা ছোঁড়া।' পাইপে টান দিতে দিতে বলল ইয়াজের বাবা।

একটা ছোট্ট শাদা কফিন নিয়ে এল দিদিমা। গর্তটার ভেতরে লাফ দিয়ে পড়ল 'বোকা চাষী।' দিদিমার কাছ থেকে কফিনটা তুলে সেই শ্যাওলা ধরা তক্তাগুলোর পাশে নামিয়ে রেখে আবার লাফ মেরে উঠে এল। পা আর কোদাল ঠেলে ঠেলে বালু চাপা দিতে থাকল। দাদু আর দিদিমা ওকে সাহায্য করলেন নিঃশব্দে। পুরুত ঠাকুর নেই। নেই কোন ভিখারি। অসংখ্য ক্রুশের ভিড়ের ভেতর কেবলমাত্র আমরা চারটি প্রাণী।

পাহারাদারকে পয়সা দিতে গিয়ে ধমকের সুরে দিদিমা বলল, 'তুমি কিন্তু আমার ভারিয়ার বাসা নাড়াচাড়া করেছ। বল, কর নি?'

'আমার উপায় ছিল না। এমন কি পাশের কবরের খানিকটা জমিও নিতে হয়েছে। ঠিক আছে। ওতে এমন কিছু হয়নি।'

কবরের কাছে মাথা নামিয়ে প্রণাম করল দিদিমা। নাক টেনে খানিকটা কাঁদল তারপর হাঁটতে শুরু করল। পুরানো ফ্রককোটটা গায়ে জড়িয়ে টুপিটাকে চোখের দিকে নামিয়ে পেছনে পেছনে চললেন দাদু।

'অনাবাদি জমিতে বীজ ছড়িয়েছিলাম আমরা।' হঠাৎ বলে উঠলেন দাদু। তারপর চষা খেতে কাকের মত লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।

'উনি কি বললেন?' দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ভগবানই জানেন। ওনার ভাবনা উনিই বোঝেন।' বলল দিদিমা।

বেশ গরম। আস্তে আস্তে দিদিমা এগিয়ে চলল। তপ্ত বালির ভেতরে তার দুটো পা ডুবে ডুবে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে রুমালে মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে।

খুব কষ্টে জিজ্ঞেস করি, 'কবরস্থানে ঐ যে কালো মত—ওটাই কি আমার মায়ের কফিন?'

'হাঁ,' শুকনো স্বরে বলল দিদিমা, 'ঐ বুড়ো বেকুফ গোরখন্দটা...। এক বছরও হয়নি এখনো, এরই মধ্যে ভারিয়ার পচন শুরু হয়েছে! এটা হয়েছে ঐ বালির জন্যই—জল চোঁয়ায়। মাটিই ভাল এর চেয়ে।'

'সবাই কি পচে যায়?'

'সবাই। একমাত্র যারা সাধু তারা বাদে।'

'তুমি পচবে না কখনো।'

থেমে পড়ল দিদিমা। মাথার ওপরে আমার টুপিটা ঠিকভাবে বসিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'ওসব ভাবতে নেই। আগেভাগে ওসব কথা ভাবতে নেই, বুঝেছিস?'

কিন্তু আমি নিজের মনে ভাবতেই লাগলাম, 'মৃত্যু কি ভীষণ কুৎসিত, কি ভীষণ নোংরা! কি জঘন্য!'

আমার খুব খারাপ লাগছিল।

বাড়িতে ফিরে দেখি এর মধ্যেই দাদু সামোভার ঠিকঠাক করে টেবিল সাজিয়ে নিয়েছেন।

'চা খাওয়া যাক। বেশ গরম পড়েছে। আমি নিজেই করছি—তোমার জন্য।'

তারপর দিদিমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'কি বল তুমি—ঠিক আছে?'

হাত ঝামটা দিয়ে দিদিমা বলল, 'বলার আর কি আছে !'

'তা বটে। প্রভুর অভিশাপ পড়েছে আমাদের ওপরে। এক এক করে কেড়ে নিচ্ছেন। হাতের আঙুলগুলোর মত সমস্ত সংসারটা যদি শক্ত হয়ে মুঠো বেঁধে থাকত—।'

অনেকদিন এমন ধীর গলায়, এমন আপোষের সুরে কথা বলেননি দাদু। মন দিয়ে ওর কথা শুনতে লাগতাম। ধারণা করলাম, আমার মনের ব্যথা হয়তো খানিকটা হাল্কা হবে এবার। ভুলতে পারব ঐ বিবর্ণ হলদে গর্তটাকে আর গর্তটার ভেতরের কালো ছোপছোপ সেই দাগগুলোর কথা।

কিন্তু কঠিন স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দিদিমা, 'থাম বাপু! সারাজীবন ধরেই তো তুমি বলে আসছ ঐ এক কথা, তাতে কারুর কিছু লাভ হয়েছে? লোহার গায়ে পড়া মরচের মত সমস্তটা জীবনই তো মানুষকে কুরে কুরে খেয়ে এসেছ।'

গজ গজ করে দাদু দিদিমার দিকে তাকালেন, তারপর চুপ করে গেলেন।

সকালবেলা যা দেখেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় গেটের কাছে বসে ল্যুদমিলাকে বলছিলাম সে সব কথা। কিন্তু মনে হল, সে সব তাকে একটুও রেখাপাত করল না।

'বাপ-মা না থাকাই ভাল। আমার মা-বাবা দুজনেই যদি মরে যেত তবে বোনটাকে ভাইয়ের কাছে রেখে মঠে গিয়ে বাকি জীবনটা সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটাতাম। এছাড়া কিইবা আর করতে পারি বল? খোঁড়া, কর্মে অপটু বলে বিয়ে হবে না কখনো। আর হলেও একগাদা খোঁড়া ছেলেপুলে তো হবে।'

বুদ্ধিমতির মত ল্যুদমিলা সব বলছিল, পাড়ার গিন্নি-বান্নিরা যেমন করে বলে। কিন্তু সম্ভবত সে দিনের থেকেই ওর ওপরে আমার আর একটুও আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য এরপর থেকে আমার জীবনের ধারাও এমন হয়ে উঠল যে দেখা সাক্ষাত হত কখনোসখনো!

ভাই মারা যাবার ক-দিন পরে একদিন দাদু ডেকে বললেন, 'আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাস। ভোরে আমি তোকে জাগাবখন। তারপর দুজনে বন থেকে কাঠ আনতে যাব।'

'আমিও তুলব গাছগাছালি।' বলল দিদিমা।

একটা জলা জায়গার ওপরে ফার আর বার্চে'র বনটা আমাদের বাড়ি হতে মাইল তিনেক দূরে। ঝোপ জঙ্গল আর ভেঙ্গে পড়া শুকনো ডালপালায় ভর্তি। একদিক ওকা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, অন্যদিক এসে পড়েছে মস্কো সড়কে। নিচে ঝোপ-ঝাড়, তারই ওপরে উঁচু উঁচু কালো তাঁবুর মত গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করা অসংখ্য পাইন গাছের সমাহার। লোকে ওগুলোকে বলে, 'সাভেলের কেশর'।

এই বনজ-সম্পদ কাউন্ট শুভালভের সম্পত্তি। কিন্তু এটা দেখাশোনার দিকে তার তেমন খেয়াল নেই। কুনাভিনোর লোকেরা মনে করত যেন বনটা তাদেরই। ঝোপঝাড় কাটত; মরা গাছ ফালি করত। অনেক সময় জ্যান্ত গাছও বাদ পড়ত না! শরৎকালে দল বেঁধে লোকজন আসত কুডুল আর কোমরে দড়ি জড়িয়ে নিয়ে শীতের দিনের জন্যে জ্বালানি কাট সংগ্রহ করতে।

ভোর হবার আগেই শিশির-ভেজা রূপোলি-সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে তিনজনে

হাঁটতে শুরু করলাম। দিয়াতলভি পাহাড়ের রক্ত-রাঙা ধার ঘেঁষে রক্ত-রাঙা ওকা নদীর ওপরে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে রাশিয়ার মদির সূর্য। শান্ত ওকার ঘোলাটে বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ফিন্‌ফিনে ঘুমপাড়ানি বাতাস। শিশিরের ভারে হেলে পড়ছে সোনালী অতসী। মাটির ওপর খসে পড়ছে অপরাজিতা। ঘাসের গুচ্ছের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন রঙের কাশ-ফুল। উজ্জ্বল তারার মত ফুটে আছে অসংখ্য 'সন্ধ্যামণি'।

অন্ধকারের গভীরতার মধ্য দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ঘন বন যেন এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ফারগাছগুলো যেন ডানা ছড়িয়ে দেয়া মস্তবড় পাখি; আর বার্চগুলো' তরুণী মেয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে জলাভূমির সোঁদা গন্ধ। লক্‌লকে জিভ বের করে আমার কুকুরটা হাঁটছে আমার পাশে পাশে। মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মাটি শুঁকছে। তারপর খেঁকশিয়ালের মত মাথাটা দোলাচ্ছে এদিক-ওদিক।

দিদিমার জ্যাকেটটা পরেছেন দাদু। মাথায় ছেঁড়া একটা জীর্ণ টুপি। লিকলিকে পা-য়ে যতই বনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন ততই আপন মনে মুখ চেপে চেপে হাসছেন। যেন একটু পরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কারো ওপরে। দিদিমার পরনে কালো স্কার্ট, সঙ্গে নীল রঙের জামা, মাথায় একটা শাদা রুমাল। এত তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে যে তার সঙ্গে তাল রাখা কষ্টকর।

যতই বনের দিকে ঢুকছি, দাদুর উৎসাহ যেন ততই বাড়ছে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ নিচ্ছেন। তারপর কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমে অস্পষ্টভাবে। পরে সুন্দর সহজভাবে। যেন ক্রমশই নেশার ঘোরে পড়ে যাচ্ছেন তিনি।

'বন হল ঈশ্বরের বাগান। কেউ লাগায়নি। লাগিয়েছে বাতাস—তার স্বর্গীয় নিশ্বাস। বয়েস থাকতে সেই ঝিগুলি পাহাড়ের কাছাকাছি যখন আমি মাঝির কাজ করতাম,—আঃ! আলেক্সেই, সেই আমি যাসব দেখেছি, তুই কখনো তা দেখতে পাবি না। ওকার পাড় ধরে কাসিমভ থেকে মরুম পর্যন্ত বনের পর বন। হয়তো ভলগা পার হয়ে উরাল পর্যন্ত চলে গেছে সে বন। অসীম অপূর্ব সে এক জিনিস।'

আড়চোখে দিদিমা আমাকে চোখ টিপল; আর চষা খেতের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে দাদু মুঠো মুঠো কথার বীজ ছড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। সে বীজগুলো যেন আমার স্মৃতির ভেতরে গেঁথে শেকড় ছড়াতে লাগল।

'একবার সূর্যমুখীর বীজের তেল বোঝাই করে বড় একটা নৌকো নিয়ে এগোচ্ছিলাম সারাতভ থেকে 'মাকার দিন'-এর মেলায়। ফোরম্যান ছিল কিরিল্লো। পুরেখ্-এর মানুষ। আমার যতদূর মনে আছে আসাফ নামে কাসিমভের এক তাতার ছিল চালানদার। তারপর ঝিগুলি পৌঁছতেই উজান বাতাসের পাল্লায় পড়লাম। আমাদের শক্তি সবটুকু কেড়ে নিল। উপায় না পেয়ে পারে নৌকা ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। তারপর কিছু ফুটিয়ে নেয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে উঠলাম পাড়ে। তখন মে মাস। ভলগা তখন সমুদ্দুর। হাঁসের পালের মত ঢেউ উঠছে ওর বুকে। হাজার হাজার ঢেউ ছুটছে কাস্পীয় সাগরের মুখের দিকে। বসন্তে সবুজ ঝিগুলির পাহাড়গুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তার ওপরে শাদা মেঘ।

সূর্য সোনা ছড়াচ্ছে মাটির বুকে। মন ভরে যাচ্ছিল। নিচে নদীর বুকে তখন উত্তুরে বাতাস। কিন্তু এখানে পাড়ের ওপর গরম, মিষ্টি গন্ধ ভরা। সন্ধ্যার দিকে আমাদের সেই কিরিল্লো—বেশ ভারিক্কি-গোছের চাষী, একসময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে মাথার ওপর টুপিটা খুলে বলল, 'শোন তোমরা, আমি আর তোমাদের কর্তা নই কিংবা গোলামও নই। তোমরা নিজেরা নিজেরা চলে যাও, আমি বনে চললাম!' শুনে তো সবাই হাঁ হয়ে গেলাম। কে কখন এমন কথা শুনেছে? মনিবের কাছে আমাদের হয়ে জবাবদিহি করার কেউ না থাকলে, যাব কেমন করে? মাথাটা ফেলে মানুষ তো আর হেঁটে চলে ফিরতে পারে না। অবশ্য এটা ঠিক যে এটা ভলগা। তাই বলে, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। তাছাড়া মানুষ পশুর চাইতেও হিংস্র। কখনই পিছপা হয় না। আমরা তাই ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিরিল্লোর সেই কথা, 'তোমাদের রাখালি করে আমি আর এভাবে দিন কাটাতে চাই না। চললাম বনে।' আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছিল ওকে মারধোর দিয়ে বেঁধে রাখার কথা। কিন্তু কেউ কেউ আবার ওরই মতের। একদল চেঁচিয়ে উঠল, 'থাম!' আর চালানদার তাতার বলল, 'আমিও যাব ওর সঙ্গে!' সত্যি সত্যি ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে উঠল। মনিবের কাছে এর মধ্যেই তাতারের পাওনা দু-খেপের দাম। আর তেসরা খেপেরও এই অর্ধেক পথ চলে এসেছে—সে দিনের হিসেবে বেশ কিছু টাকা। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা হল্লা করলাম। কিন্তু রাতে দেখা গেল আমাদের জন পনের যোল বাদে, বাকি সাতজনে উধাও হয়েছে। বন মানুষকে এমনি ভাবেই ডাকে।'

'ওরা কি ডাকাত হবে বলে গেল?'

'হয়ত ডাকাত, কিংবা সাধু। সে সময় লোকে অত কিছু পার্থক্য দেখত না।'

দিদিমা ক্রুশ করল।

'হায়, ভগবানের জননী! মানুষের কথা ভাবতে বসলে বুকের মধ্যটা মোচড়ায়।'

'কোন দিকে গেলে শয়তানের হাতে পড়ব সেটুকু বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধি ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের আছে।'

একদিকে শীর্ণ ফারের জঙ্গল অন্যদিকে কাদাময় জলাভূমি। মাঝখানের স্যাঁতস্যাঁতে পথ ধরে আমরা বনের ভেতর ঢুকলাম। ভাবছিলাম, কিরিল্লোর মত চিরকালের জন্য বনে হারিয়ে যাওয়া কী চমৎকার। সেখানে মারামারি, মাতলামো, হল্লা নেই, ভোলা যায় দাদুর লোভের কথা, বালির নিচে মায়ের কবরের কথা।

একটা শুকনো জায়গায় পৌঁছতেই দিদিমা বললেন, 'কিছু একটু খাবার সময় হয়েছে এবার। বসে যাও!'

চুপরির ভেতর থেকে বের করলেন খানিকটা রুটি, কাঁচা রসুন, একটু শশা, নুন আর কাপড়ে জড়ান কিছুটা ঘরে-তৈরী পনীর। চনমন করে উঠে চোখ পিট্‌পিট্ করে দাদু দেখলেন সবকিছু।

'বটে, আমি তো কিছুই সঙ্গে আনিনি।'

'ঢের আছে, সকলের হয়ে যাবে।'

ব্রোঞ্জ রঙের উঁচু একটা পাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সকলে বসলাম। বাতাসে ধুনোর গন্ধ। মাঠের বুক থেকে একটা মৃদু বাতাস ঘাসের আগাগুলোকে নুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। দিদিমা নানান রকমের গাছ-গাছড়া তুলে চলেছে আর আমাকে

বলছে কলা আর সেন্ট জন ইত্যাদি লতার ঔষধির কথা আর ফার্ণ, এ'টেল, গোলাপ-জামের আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথা।

ঝোপ জঙ্গল কাটতে শুরু করলেন দাদুই। আর সেগুলো টেনে এক স্থানে জমা করার কথা আমার। কিন্তু পালিয়ে দিদিমার পেছন পেছন ঘন বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। মাঝে মধ্যে ঝুঁকে পড়ছে নরম মাটির ওপরে, যেন ডুব দিচ্ছে জলে। চলতে চলতে নিজের মনে মনে বকছে, 'এবার ব্যাঙের ছাতা অনেক আগেই দেখা দিয়েছে। এর মানে ফলন হবে খুব সামান্য। গরিবদের দিকে ভাল করে তাকাচ্ছ না প্রভু, যাদের কিছুই নেই ব্যাঙের ছাতাই তাদের খাদ্য।'

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে হাঁটছি তার পেছন-পেছন যাতে না দেখে ফেলে। ঈশ্বরের সঙ্গে, ব্যাঙ কিংবা ঘাসের সাথে তার কথাবার্তায় বাধা দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

কিন্তু তবুও দিদিমা আমাকে দেখে ফেলল।

'কী রে, দাদুর কাছ থেকে লুকিয়ে এসেছিস, না?'

বিভিন্ন রকমের গাছ-গাছালিতে ছড়ান কালো মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে দিদিমা বলতে লাগল কেমন করে একবার ঈশ্বর মানুষের ওপরে ভীষণ রেগে সমস্ত প্রাণীশুদ্ধ পৃথিবীটাকে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

'কিন্তু তার আগেই তার মা সব রকম বীজ কুড়িয়ে ঝুড়িতে লুকিয়ে রেখে-ছিলেন। বন্যা শেষ হলে তিনি গেলেন সূর্যের কাছে। বললেন, 'পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিক শুকিয়ে দাও, সাধু লোকেরা চিরকাল তোমার গুণকীর্তন করবে!' এরপর সূর্য পৃথিবী শুকিয়ে দিল। আর তখন তিনি তার লুকান বীজ সব ছড়িয়ে দিলেন। প্রভু তাকিয়ে দেখলেন: পৃথিবী আবার ঘাস, লতা, পশু, পাখি, মানুষজনে ভরে উঠেছে। 'কার এমন সাহস আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করে?' বললেন তিনি। মা স্বীকার করলেন। কিন্তু পৃথিবীকে অমন খালি দেখে ভেতরে ঈশ্বরের নিজেরও দুঃখ হচ্ছিল। তাই তিনি বললেন, 'খুব ভাল করেছ তুমি মা।'

গল্পটা ভীষণ ভাল লাগল আমার। আশ্চর্যও লাগছিল। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি হয়েছিল এরকম? মেরী মাতা তো বন্যার অনেক পরে জন্মেছিলেন।'

এবার দিদিমার আশ্চর্য হবার পালা।

'কে বলেছে তোকে একথা?'

'স্কুলে বইতে আছে…।'

শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওসব কথায় কান দিসনে। বইতে যা আছে ভুলে যা সে সব কথা; যত সব আজগুবি লেখা থাকে বইতে।' তারপর একটু মৃদু হেসে বললেন, 'কি সমস্ত বানিয়েছে, ভাবতো একবার! যতসব মূর্খের দল! মা ছাড়াই যেন ঈশ্বর জন্মেছেন! কে তবে তাঁকে পেটে ধরেছেন শুনি?'

'আমি জানি না।'

'তবে দ্যাখ। ঐ সব বইয়ের শিক্ষা শেষকালে ঠেকে গিয়েছে 'আমি জানিনা তো!'

'পুরুত বলছিলেন, মেরী মাতা জোয়াকিম আর আন্নার সন্তান! তার মানে, তিনি হচ্ছেন মারিয়া জোয়াকিমোভনা?'

আগুনে ঘি পড়লে যেমন হয় তেমনি হঠাৎ জ্বলে উঠে তীব্রদৃষ্টিতে দিদিমা

আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তোর পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেলব আবার যদি ওকথা মনেও ভাবিস।' একটু পরে আবার বলল, 'মেরী মাতা চিরদিন আছেন, সকলের জন্মাবার অনেক আগে থেকে। ঈশ্বর জন্ম নিয়েছেন তাঁর পেটে। তারপর…'

'তবে যীশু কোত্থেকে এলেন ?'

কেমন একটু বিব্রতবোধ করে চোখ বুজল দিদিমা।

'যীশুখ্রীষ্ট ? অ্যাঁ, হ্যাঁ…খ্রীষ্ট ?'

আমি জিতে গেছি বুঝলাম। সৃষ্টির রহস্যজালে জড়িয়ে ফেলেছি দিদিমাকে। এতে মনটা দমে গেল।

সূর্যের সোনালী আলোর রেখা-ঘেরা নীল কুয়াশার ভেতর দিয়ে আমরা বনের ভেতরে আরো এগুতে লাগলাম। গভীর বনের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। স্বপ্নালু ধ্বনি। মানুষকে স্বপ্নালু করে দেয়। কিচির-মিচির শব্দে ডাকছে ছাতারে, চটক পাখি, ডাকছে কোকিল, বৌ-কথা-কও। অক্লান্ত গান শোনাচ্ছে সোনালী পাখার হলুদ পাঁখি। সবুজ রঙের ব্যাঙগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে পায়ের নিচে। শিকড়ের নিচের ফোঁকরের ভেতর থেকে সোনালী মাথা দেখিয়ে উঁকি মারছে হেলে সাপ। খুদে খুদে দাঁত দিয়ে কট্‌কট্‌ করতে করতে পাইন গাছের ডালের ভেতরে লেজ দোলাচ্ছে কাঠবিড়ালী। দেখবার জিনিস অজস্র, অসংখ্য। কিন্তু তবুও চোখের তৃষ্ণা মেটে না—আরো দূরে যেতে চাই, দেখতে চাই আরো।

'হে মেরী মাতা, জগতের আলো।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রার্থনা করে বলল দিদিমা।

মনে হল যেন বনটা দিদিমার, কিংবা দিদিমা বনের। ভালুক-মায়ের মত সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে চলেছে সে, সব কিছুর প্রশংসা করতে করতে ; তখন মনে হচ্ছিল তার দেহ থেকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বনে। সব থেকে মজা লাগছিল আমার, যখন দেখছিলাম তার পায়ের চাপে নুয়ে পড়া শ্যাওলাগুলো আবার তার পায়ের পেছনে-পেছনে মাথা ঠেলে উঠছিল।

আমি তখন ভাবছিলাম ডাকাত হয়ে ধনীর কাছ থেকে সমস্ত লুট করে গরিবদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে কী ভালই না হয়। সবাই যদি থাকতে পেত আনন্দে, পেট ভরে খেতে পেত, ভুলে যেত হিংসা দ্বেষ, হিংস্র কুকুরের মত একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করা—তাহলে কি ভালই না হত। যদি দিদিমার ঈশ্বর কিংবা তার মেরী মাতার কাছে একবার যাওয়া যেত তাহলে কী ভালই না হত। গিয়ে সমস্ত কিছু—মানুষ কী ভীষণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়—সে সব সত্য কথা, খোলাখুলি বলতাম তাঁদের কাছে। বলতাম, কী নোংরাভাবে, কী নিদারুণভাবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ঐ ভয়ানক বালুর ভেতরে কবর দেয়। তারপর মেরী মাতার যদি বিশ্বাস হয়, তিনি আমাকে এমন জ্ঞান দিন যাতে আমি এসব বদলে দিয়ে তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। মানুষ যদি আমার কথা শোনে, আমাকে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই আমি সুন্দর জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারব তাদের। আমার এখনো অল্পবয়েস। তাতে কি ? যখন মঠে খ্রীষ্টের কাছে জ্ঞানীগুণীরা উপদেশ নিতে এসেছিলেন, তখন খ্রীষ্টও তো আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড় ছিলেন।

এসব চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, যেহঠাৎ একটা গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম। মরা ডালের খোঁচায় একটা পাশ ও মাথার পেছনের খানিকটা চামড়া কেটে গেল। গর্তের ঠাণ্ডা চট্‌চটে কাদার ভেতরে বসে লজ্জার সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে নিজে উঠে আসার শক্তি আমার নেই। চিৎকার করে দিদিমাকে ঘাবড়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও নেই।

হ্যাঁচকা টানে আমাকে টেনে তুলল দিদিমা। তারপর ক্রুশ করতে করতে বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ! গর্তটা ফাঁকা ছিল তাই রক্ষে! কিন্তু যদি ভল্লুক থাকত, তবে কী হত?'

চোখ থেকে ঝরে-পড়া জলের ভেতর দিয়ে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর ছোট্ট একটা নালাতে নিয়ে আমাকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিলেন, ব্যথা সেরে উঠবার জন্যে কাটা-ছড়া জায়গাগুলোতে কতগুলো পাতা লাগিয়ে তার ব্লাউজটা দিয়ে বেঁধে দিল। এরপর আমাকে নিয়ে এল রেলের পাহারাদারের ঘরে। কারণ হেঁটে বাড়ি ফেরবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

প্রায় প্রতিদিনই বলতাম দিদিমাকে, 'বনের ভেতর যাই, চল!'

খুব আনন্দের সঙ্গেই রাজী হত দিদিমা। শরৎকালের শেষ পর্যন্ত এইভাবে আমরা গাছ-গাছালি, ফল-মূল, ব্যাঙের ছাতা, বাদাম ইত্যাদি কুড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম।

এসব বিক্রি করে দিদিমা যা রোজগার করত তাই দিয়ে আমরা চালাতাম।

'পরগাছার দল!' কর্কশভাবে বলে উঠতেন দাদু। যদিও তার কিছু আমরা ছুঁতাম না।

বন আমার মনে এক শান্ত সমাহিত ভাব জাগিয়ে তুলল, এবং তা আমার ভেতরের সমস্ত ব্যথা, সমস্ত বেদনা দূর করে দিল। ভুলিয়ে দিত সমস্ত ক্ষোভ। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরে জেগে উঠল অনুভব শক্তির এক অপূর্ব তীক্ষ্ণতা। চোখ কান সজাগ হল। আর প্রখর হল স্মৃতিশক্তি। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আরো বেড়ে উঠল।

দিদিমাকে যতই কাছে পাচ্ছি ততই যেন আরো বেশি অবাক হচ্ছি আমি। আমার কাছে চিরকালই তার আসন সকলের ওপরে, সংসারে সকলের চাইতে বেশি করুণাময়ী, সকলের চাইতে বেশি বুদ্ধিমতী সে। আমার এ ধারণা ক্রমেই যেন সে আরো বদ্ধমূল করতে লাগল। একদিন ব্যাঙের ছাতা তুলে ঘরে ফেরার সময় বনের কিনারায় এসে একটু বিশ্রামের জন্যে দিদিমা বসল। আর ব্যাঙের ছাতা আরো খুঁজতে খুঁজতে আমি একটু দূরে গিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দিদিমার গলার শব্দ পেয়ে ফিরে দেখি স্থির হয়ে পথের ওপরে বসে তুলে আনা ব্যাঙের ছাতার শেকড় ছাড়াচ্ছে। তাঁর পাশে একটা ধূসর লিক্‌লিকে কুকুর লালাসিক্ত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'চলে যা, চলে যা এখান থেকে,' বলে চলেছে সে, 'ভগবান স্মরণ করে পালা!'

খুব বেশিদিন নয় ভালিওক আমার কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। আর তাই ঐ নতুন কুকুরটাকে লোভ দেখিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ছুটে ওপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখ না ঘুরিয়েই কুকুরটা অদ্ভুতভাবে পিঠ বাঁকাল। নীল চোখের তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে। একটু পরে লাফিয়ে চলে গেল

বনের ভেতরে। এটার চলার ভঙ্গি মোটেই কুকুরের মত নয়। আমি শিস্ দিতেই সে গভীর ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

'দেখলি তো?' দিদিমা হেসে বলল, 'আমিও প্রথমে মনে করেছিলাম ওটা কুকুর। শেষে ভাল করে দেখলাম, দাঁতগুলো সুঁচের মত ধারালো। নেকড়ের মত ঘাড়টা। আমার ভয়ও হল। তারপরে ভাবলাম, যদি ওটা নেকড়ে হয় তবে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। ভাগ্যিস গরমের দিন, এ সময় নেকড়েরা একটু শান্ত থাকে!'

দিদিমা বনের ভেতরে কখনো পথ হারাত না। দেখে শুনে ঠিক বাড়ি ফিরতে পারত। গাছ গাছালির গন্ধ পেয়ে ধরতে পারত কোথায় কোন জাতের ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। আমাকেও পরীক্ষা করত মাঝে-মধ্যে।

'বল তো কোন গাছের নিচে লাল ব্যাঙের ছাতা হয়? কেমন করে বুঝবি কোন সিরয়েজ্‌কাগুলো ভাল আর কোনগুলো বিষাক্ত? আর কোন জাতের ব্যাঙের ছাতা ফার্ণের ঝোপে থাকে?'

গাছের ছালের ওপরে ছোট্ট একটু আঁচড় দেখেই বুঝতে পারত কাঠ-বেড়ালীর গত কোনদিকে। আর তক্ষুনি আমি আম গাছে উঠে ওদের বাসা খালি করে ওদের শীতের দিনের জন্যে জমান বাদামগুলো পেড়ে আনতাম। এক এক সময়ে এক একটা বাসা থেকে পাঁচ সের পর্যন্ত বাদাম পেতাম।

একবার কাঠবেড়ালীর বাসা থেকে বাদাম পাড়বার সময় এক শিকারীর গুলির সাতাশটা ছর্‌রা আমার ডান পাঁজরে বিঁধল। সুঁচ দিয়ে এগারোটা বের করেছিল দিদিমা। বাকিগুলো বহুদিন আমার চামড়ার ভেতরে ছিল; পরে নিজের থেকেই বেরিয়ে পড়ে।

আমাকে নিশব্দে ব্যথা সহ্য করতে দেখে দিদিমা খুব খুশি হত। বলত, 'লক্ষী আমার! ব্যথা সহ্য করা মানে একটা লড়াই জেতা!'

ব্যাঙের ছাতা, বাদাম ইত্যাদি বিক্রি করে যখনই হাতে কিছু পয়সা জমত তখনই জানলার তাকে তাকে দিদিমা তার গোপন দান রেখে আসত। অথচ তার পরনে থাকত ছেঁড়া জামাকাপড়। এমন কি পরবের দিনেও বের হত ঐ পোশাকেই।

'ভিখিরীরও অধম—মান-সম্মান সব খোয়াল আমার।' দাদু বিড়বিড় করতেন।

'কি হল তাতে। তুমি তো আর কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ নও আমার, যে বিয়ের যুগ্যি বর খুঁজে ফিরতে হবে তোমাকে।'

এরকম ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হতে লাগল দুজনার মধ্যে।

'অন্য কারো থেকে এমন কিছু বেশি পাপ করিনি আমি,' ক্ষোভে চিৎকার করতেন দাদু, 'তবুও সবার চেয়ে বেশি শাস্তি পাচ্ছি!'

দাদুকে খোঁচা দিয়ে দিদিমা বলত, 'কে কেমন তা শয়তান ভালই জানে।' তারপর দিদিমা আর আমি, আমরা দুজনে যখন একা থাকতাম তখন আমার কাছে খুলে বলত ব্যাপারটা, 'বুড়োটা শয়তানকে ভীষণ ভয় করে। দেখ না, ভয়ে ভয়েই কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। হায় রে পোড়ারমুখো!'

সে বছর গোটা গ্রীষ্মকালটা বনে বনে ঘুরে আমার শরীরটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। কিন্তু তার ফলে আমি বেশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়লাম। খেলার সঙ্গিসাথীদের

সম্পর্কে, ল্যুদমিলার সম্পর্কে সমস্ত আকর্ষণ মুছে গেল। ল্যুদমিলার বুদ্ধিমত্তা এখন কেমন যেন পানসে, বিরক্তিকর মনে হতে লাগল।

একদিন আপাদমস্তক ভিজে দাদু শহর থেকে ফিরলেন। শরৎকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল ভীষণ। দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে চড়ুইয়ের মত গা ঝাড়া দিতে দিতে বলে উঠলেন, 'শোন কুঁড়ের বাদশা, কাল থেকে তোকে কাজে যেতে হবে।'

'কোথায় ?' বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল দিদিমা।

'তোমার বোন মাত্রিওনার কাছে, কাজ করবে তার ছেলের কাছে...'

'কাজটা কিন্তু তুমি ভাল পছন্দ করনি !

'চুপ, বেকুফ বুড়ি ! এমনও তো হতে পারে যে তারা ওকে নক্‌সা-নবীশ বানিয়ে দেবে।'

আর কোন কথা না বলে দিদিমা মাথা নোয়াল।

সেদিন সন্ধ্যেয় আমি ল্যুদমিলাকে বললাম, 'আমি শহরে চলে যাচ্ছি।'

'আমাকেও তাড়াতাড়ি শহরে নিয়ে যাবে।' চিন্তিত মুখে বলল ল্যুদমিলা। 'বাবার ইচ্ছে আমার পা-টা কেটে বাদ দেয়। তারা বলেছে আমি নাকি তাতে ভাল হতে পারব !

গ্রীষ্মকালটায় ও আরো যেন রোগা হয়েছে। মুখে একটা নীল আভা পড়ছে। আর চোখ দুটো আরো বড় বড় হয়েছে।

'ভয় লাগছে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হুঁ।' বলে ল্যুদমিলা নীরবে কাঁদতে শুরু করল। ওকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা খুঁজে পেলাম না। শহরের জীবন সম্পর্কে আমি নিজেই আতঙ্কিত। অসহায় এক বেদনাবিধুর নীরবতায় আমরা দুজনে ঘন হয়ে পাশাপাশি বসে থাকলাম বহুক্ষণ।

গরমকাল হলে দিদিমাকে বলতাম, চল ভিক্ষে করি। যেমন করত সে ছেলেবেলায়। আর ল্যুদমিলাকেও সঙ্গে নিতে পারতাম। ছোট্ট একটা গাড়িতে বসিয়ে ওকে আমি টেনে নিয়ে চলতাম।

কিন্তু এটা শরৎকাল। ভিজে বাতাসের ঝাপটায় পথ ঘাট উড়িয়ে নিচ্ছে। সীমাহীন মেঘে আকাশটা ঢাকা। পৃথিবী বিবর্ণ, পঙ্কিল, বিষাদময়... !

চার

আবার ফিরে এলাম শহরে। কফিনের মত দেখতে দোতালা একটা সাদা বাড়ি। যেন অনেকগুলো লোক ধরাবার জন্যে তৈরি। বাড়িটা নতুন। তবুও মনে হয় যেন হাঁপাচ্ছে। ভিখিরির হাতে হঠাৎ কিছু কড়ি এসে পড়লে যেমন সে হাবাতের মত দুহাত মেলে অস্থির হয় ঠিক তেমনি অবস্থা। বাড়িটার পাশের দিকটার রাস্তার দিকে মুখ। রাস্তার সামনের তলায় আটটা জানলা। আর যে পাশটা সামনের দিক হওয়া উচিত ছিল, সে দিকে চারটে জানলা। নিচের জানালাগুলো পেছনের উঠোনে যাবার সরু গলি-পথের ওপরে। দোতলার জানলাগুলো ঘেরা বেড়ার মাথা ডিঙিয়ে সামনের একটা নোংরা পাহাড়ী খাদ আর ধোবানীর কুঁড়ে ঘরের দিকে চেয়ে আছে।

রাস্তা বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু সেখানে নেই। বাড়ির সামনের ঐ নোংরা খাদটার দু-জায়গায় দুটো নালা বয়ে গেছে। বাঁ দিকটা কয়েদীদের বসতি

পর্যন্ত প্রসারিত। তারই কাছে খাদের পারে গৃহস্থেরা নোংরা জঞ্জাল ফেলার ছিটাল করেছে। ফলে খাদের নিচটায় জমে উঠেছে সবুজ রঙের ভারি কাদা। ডানদিকে খাদটা শেষ হয়েছে পচা জভেজ্‌দিন পুকুরের কাছে। মাঝখানটা আমাদের বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে। বিছুটি, আমরুল, চোরকাঁটা আর ময়লা আবর্জনায় ভরা। বাকি জায়গাটায় বাগান করেছেন পুরুত দরিমেদন্ত পক্রোভ্‌স্কি। বাগানের ভেতরে আছে একটা গ্রীষ্মাবাস। সবুজ রঙের পাতলা কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি। এমন পাতলা যে, ঢিল পড়লে ভেঙে যায়।

জায়গাটা একদিকে অসম্ভব গুমোট আর অন্যদিকে দারুণ নোংরা। খোলা মাঠ আর তাজা বনে বেড়িয়ে অভ্যাস থাকাতে শহরের এই ভয়ঙ্কর বিষণ্ণ কোণে এসে পড়ায় মনটা ব্যাখ্যাতীতভাবে ভেঙে পড়ল।

খাদের ওদিকে তাকিয়ে সারি সারি ভাঙাচোরা পুরানো বেড়া। তারই ভেতর থেকে আবিষ্কার করলাম বাদামী রঙের সেই বাড়িটাকে—জুতোর দোকানে বয়-এর কাজ করার সময় যে বাড়িটায় থাকতাম। ঐ বাড়িটা কাছাকাছি থাকায় মনটা আরো খারাপ হল। কেন যে আবার আসতে হল সেই পুরানো জায়গায়!

নতুন মনিবের সঙ্গে আলাপ হল। সে আর তার ভাই আগে আমার মায়ের কাছে যেত। ওর ভাই এমন অদ্ভুত সুরে গান গাইত যে ভারি মজা লাগত শুনে, 'আন্দ্রেই পাপা, আন্দ্রেই পাপা।'

ওরা কেউ-ই এতটুকু বদলায়নি বড় ভাইয়ের নাক ঈগলের মত, লম্বা চুল আর হাসিখুশি। মোটামুটি সহৃদয় মানুষ। আর ছোট জন—ভিক্তর, ওর মুখ তেমনি দাগে ভরা, ঘোড়ার মত লম্বাটে। ওদের মা আমার দিদিমার বোন। কিন্তু জেদী, আর খিট্‌খিটে। বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে। বৌয়ের চোখ দুটো কালো। গায়ের রঙ এত সাদা আর এমন মোটা-সোটা যে দেখলে মনে হয় যেন ময়দার রুটি।

প্রথম যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই সে আমাকে দুবার জানিয়েছে, 'তোর মাকে আমি একবার চুমকির কাজ করা একটা সিল্কের ব্লাউজ দিয়েছিলাম···'

ও আমার মাকে উপহার দিয়েছিল আর মা সেটা নিয়েছিল, কেন জানি কথাটা আমার আদৌ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, 'দিয়েই যদি থাক তবে অত ঘোষণা করবার কি আছে?'

আচমকা অবাক হয়ে তাকাল সে।

'কী ব-ল্‌-লি? কার সঙ্গে কথা বলছিস খেয়াল আছে?'

মুখে ফুটে উঠল চাপ চাপ লাল দাগ। চোখ পাকাল কিছুক্ষণ। তারপর স্বামীকে ডাকল।

হাতে কম্পাস, কানে পেনসিল আঁটা, তার স্বামী ঘরে এল। বৌয়ের সমস্ত কথা শুনে আমাকে বলল, 'ওকে আর অন্য সকলকে তোমার আপনি বলা উচিত, বেল্লেল্লাপনা ঠিক নয় তোমার!'

তারপর একটু ক্ষেপে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব বাজে ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত কোর না বলে দিলাম।'

'বাজে—মানে? তোমার তো নিজেরই আত্মীয়!'

'চুলোয় যাক আত্মীয়!' চিৎকার করে বলে উঠেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরা যে দিদিমারই আত্মীয় তা আমিও তেমন মানতে পারতাম না। দেখে-

শুনে আমার ধারণা হল, পরের চাইতে নিজের লোকেরাই পরস্পরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বেশি। পরস্পরের দুর্বলতা, খারাপ দিক, অন্য যে কারুর থেকে ভাল জানে বলেই তারা বেশি করে রটনা রটায়, ঝগড়া করে, আর কথায় কথায় লাঠালাঠি করে।

মনিবকে ভাল লাগত আমার। ওর একটা বিশেষ ভঙ্গি, তা হল মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলোকে পেছনের দিকে কানের ওপাশে ঠেলে দেওয়া। তা দেখে কেন জানি না আমার 'বাঃ বেশ' মানুষটার কথাই মনে পড়ে। লোকটা মাঝে মধ্যে দিল-খোলা হাসি হাসে। তখন তার ধূসর চোখদুটো সরলতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঈগল পাখির মত নাকের দুদিকে ফুটে ওঠে অদ্ভুত দুটো রেখা।

'ঢের হয়েছে, মুরগীর ছানারা, থাম এবার?' খাটো খাটো ঘন দাঁতের পাটি বের করে হেসে বলে ওর মা আর বৌকে।

প্রতিদিন ঝগড়া করে দুজনে। দেখে অবাক লাগে কত সামান্যতেই ওরা আগুন হয়ে ওঠে! ভোর হতে না হতেই দুটো মেয়েমানুষ এলোমেলো বেশে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে। যেন আগুন লেগেছে বাড়িতে। সমস্ত দিন তেমনি দাপাদাপি করে কাটায়। কেবল দুবেলা খাওয়ার সময়ে আর চায়ের সময়ে যা একটু থামে। খাবার সময়ে এমন ঠেসে খায় যে তার আর হিসেব থাকে না। দুপুরে খাবার সময়ে শুরু হয় রান্নার সমালোচনা। বড় রকমের একটা ঝগড়ার জন্যে কথা শানান হয়। শাশুড়ি যাই রান্না করুক না কেন বৌ বলে, 'আমার মা কখনো এটা এমন রাঁধতেন না।'

'তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আরো খারাপ হত!'

'না, হত না—এর চেয়ে অনেক ভাল হত।'

'তাহলে তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়েই থাক না কেন?'

'এ বাড়ির গিন্নী যে আমি!'

'তাহলে তুমি আমাকে কি মনে কর?'

'অনেক হল, এবার থাম ঝগড়াটে মুরগীর ছানারা!' স্বামীটা বলে, 'ব্যাপারটা কি? তোমরা দুজনেই পাগল হলে নাকি?'

এ বাড়ির সব কিছুই এত অদ্ভুত আর এত হাস্যকর যে তা আর বলবার নয়। রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরের দিকে আসতে ছোট্ট সরু একটা পায়খানাওয়ালা স্নানের ঘরের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। সমস্ত বাড়িতে ওটাই একমাত্র স্নানের ঘর। খাবার, সামোভার ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই বয়ে আনতে হয় ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে, যার জন্য অনেক সময় অনেক হাসি ঠাট্টার, অনেক মজার মজার ঘটনাও ঘটে যায়। অনেক কাজের মধ্যে স্নানের টবে জল আছে কি না সেটা দেখাও আমার কাজ। এই স্নানের ঘরের ওপাশে রান্নাঘরে আমার থাকবার জায়গা। দরজাটার পাশেই ছাদওয়ালা বড় ফটক। একদিকে উনুনের তাতে মাথাটা গরম হলেও, অন্য দিকে ফটকের ফাঁক দিয়ে বাতাসের ঝাপটা এসে পা দুটো ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেয়। শোবার সময়ে মেঝের সবগুলো গালিচা তুলে পায়ের ওপরে জড় করে রাখি।

বসবার ঘরটাও ফাঁকা ফাঁকা, গুমোট। ঘরে দুটো বড় আয়না, দুটো টেবিল, সোজা পিঠওলা বারখানা চেয়ার আর গিলিট করা ফ্রেমে খানকয়েক ছবি—'নিভা' মাসিকপত্রের গ্রাহক হবার উপহার। ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরে কিছু চটকদার

গদির চেয়ার আর টেবিলে ভরা। তাকে রূপোর বাসন, টি সেট ইত্যাদি সাজান। বৌয়ের বিয়ের সময়ে পাওয়া। আর কয়েকটা বাতি। আকারে আকৃতিতে একটা অন্যটার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে যেন। এগুলোই হচ্ছে ঘরটার মধ্যে সব থেকে গৌরবের জিনিস। জানলাহীন শোবার ঘরে আছে একটা বড় খাট, এছাড়া ট্রাঙ্ক, আর আলনা। ওগুলো থেকে ভেসে আসে তামাকপাতা আর ঘৃতকুমারী লতার গন্ধ। এ ঘর তিনটা প্রায় সময়েই ফাঁকা থাকে। আর গোটা পরিবারটা ঐ ছোট্ট খাবার ঘরটার ভেতরে গিয়ে ঠাসাঠাসি করে থাকে। আটটার চায়ের পর্ব শেষ হলেই দুভাই টেবিল সাজিয়ে বসে। টেবিলের ওপরে সাদা কাগজ বিছিয়ে নেয়। আঁকার সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, পেনসিল, ইণ্ডিয়া ইঙ্কে ভরা প্লেট। এরপর দুভাই মুখোমুখী বসে দুদিকে কাজে লেগে যায়। টেবিলটা প্রায় ঘরের সমান কিন্তু নড়বড়ে। ছোট গিন্নী বা ধাই বাচ্চাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রতিবার টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

'এখান দিয়ে না এসে পার না?' একদিন খেঁকিয়ে ওঠে ভিক্তর।

মুখখানা হাঁড়ির মত করে গিন্নী তার স্বামীকে বলে, 'ভাসিয়া, ওকে বারণ করে দাও, যেন আমার সঙ্গে ঝগড়া না করে।'

'বেশতো তুমিও তাহলে টেবিল নাড়িও না।' শান্ত হয়ে বলে ওর স্বামী।

'কিন্তু আমি গর্ভবতী, আর এ ঘরটায় এমন গাদাগাদি ··'

'ঠিক আছে, আমরা আমাদের কাজকর্ম নিয়ে বসবার ঘরে যাচ্ছি।'

'কি যা তা বলছ, বসবার ঘরে কাজ করে—একথা শুনেছে কেউ?'

স্নানের ঘরের দোরের পথে বুড়ো গিন্নী মাত্রিওনা ইভানভনা মুখ বাড়াল। রান্নাঘরের উনুনের তাপে মুখখানা বিটের মত লাল হয়ে উঠেছে।

'শোন্ কথা ভাসিয়া,' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো গিন্নী, 'এখানে বসে বসে তোরা আঙুল ব্যথা করে খেটে খেটে হয়রান হবি, আর সে বলছে চার চারটে ঘরেও নাকি ওর বাচ্চা বিয়োনো চলবে না। যাই বল এক রাজকন্যা এনেছিস বটে, তবু যদি মাথায় এতটুকুও মগজ থাকত!'

একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল ভিক্তর।

'ঢের হয়েছে থাম!' ধমকে উঠল ছোট গিন্নীর স্বামী।

এদিকে শাশুড়ির উদ্দেশ্যে একরাশ খিস্তিখাস্তা করে বৌ চেয়ারের ওপরে আছড়ে পড়ে ন্যাকা সুরে কান্না জুড়ল।

'আমি চলে যাব! মরব আমি!'

'আমার কাজ নষ্ট করছ, জাহান্নামে যাও সব!' খেঁকিয়ে উঠল স্বামী। ক্লান্তিতে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। 'পাগলা গারদ হয়েছে আর কি। আমরা এখানে যে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছি, সে তো তোমাদেরই খাওয়ানো পড়ানোর জন্যে। যত সব ঝাড়াটে মুরগীর ছানার দল!'

প্রথম প্রথম এই ধরণের বিশ্রী কথাবার্তায় ভয় পেতাম। বিশেষ করে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম যে দিন ছোট গিন্নি রুটি কাটা ছুরিটা নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে অসম্ভব চিৎকার করছিল। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই ভরকে গেল। তারপর স্বামীটা দরজার কাছে গিয়ে পিঠ কুঁজো করে দাঁড়াল। আমাকে হুকুম করল তার ওপরে উঠতে। জানলা ভেঙে দোরের খিলটা খুলতে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠের ওপরে লাফিয়ে উঠে দরজার কাঁচটা ভেঙে ফেললাম। কিন্তু খিলটা খোলার চেষ্টা করতেই বৌটা ছুরির বাঁট দিয়ে আমার মাথায় মারতে শুরু করল। তবুও কোন রকমে খিলটা খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই ওর স্বামী লাফিয়ে পড়ল বৌটার ওপরে। টেনে হিঁচড়ে ওকে বসার ঘরে এনে, হাত মুচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিল। পরে রান্নাঘরে গিয়ে ফুলে-ওঠা মাথাটার পরিচর্যা করবার সময় বুঝতে পারলাম যে আমার সমস্ত পরিশ্রমটাই বৃথা হয়ে গেছে। ছুরিটা এমন ভোঁতা যে গলা তো দূরে থাক হাতের চামড়াও কাটা যেত না। এভাবে মনিবের পিঠে ওঠবার প্রয়োজন ছিল না। চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়েই ভাঙতে পারতাম জানলাটা। তাছাড়া লম্বা কারো পক্ষে ছিটকানিটা খোলা তো খুবই সহজ ছিল। শুধু হাতটা একটু লম্বা হলেই হত। সেই থেকে এমন ধরণের ঘটনায় আমি আর ভয় পেতাম না।

দু ভাই-ই গির্জার গায়ক দলের লোক। কাজ করতে করতে কখনো কখনো ওরা গুনগুন্ করে গান গাইত। দাদা চড়া গলায় খাদে ধরত :

'গভীর জলে দিলাম ফেলে
কোন কন্যার আংটি...'

সরু গলায় ছোট ভাই ধরত চড়া সুরে :

'সেই সাথে হারাল মোর
সকল সুখ শান্তি।'

বাচ্চাদের ঘর থেকে ছোট গিন্নীর চাপা গলার ভর্ৎসনা ভেসে আসত, 'মাথা গরম হল না কি ভাসিয়া! জান না বাচ্চা ঘুমচ্ছে?' কিংবা বলে, 'তুমি বিয়ে করা মানুষ ভাসিয়া, কুমারী মেয়েদের নিয়ে গান গাওয়া এখন আর তোমাকে মানায় না। তাছাড়া একটু পরেই সন্ধ্যা উপাসনার ঘন্টা বেজে উঠবে!'

'বেশ, তাহলে আমরা গির্জের গানই গাইব।'

কিন্তু আমার মা ঠাকরুণ জিদ ধরে বলল যে গির্জের গান যেখানে সেখানে গাওয়া উচিত নয়। আর বিশেষ করে, স্নানের ঘরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এখানে তো নয়-ই।'

'অসহ্য!' মনিব ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'না, আমাদের অন্য ঘরেই যেতে হবে দেখছি!'

একটা নতুন টেবিল কেনা দরকার এ কথাটাও মনিব ঠিক এমনি ভাবে গত তিন বছর ধরে বলে আসছে।

ওরা পাড়া-পড়শীদের সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেই আমার মনে পড়ত জুতোর দোকানের সেই সব গাল-গল্পের কথা। ভাল করেই টের পেতাম আমার মনিবরাও মনে মনে ভাবে, তারাই শহরের মধ্যে সবচাইতে সজ্জন লোক। সঠিক চালচলন আচার-ব্যবহারের সব কিছু রীতি-নীতি আইনকানুন তাদের আয়ত্তে। আর ঐ ধারণা দিয়েই তারা প্রত্যেকটা মানুষকে বিচার করে। তাদের ঐ ব্যাপারটার ওপরে আমার মনে এমন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠত যে সেগুলো ভাঙতেই যেন আমি আনন্দ পেতাম।

আমাকে ভীষণ খাটতে হত। একটা ঝিয়ের সমস্ত কাজ করার পরেও প্রতি বুধবার রান্নাঘরের মেঝে ধুয়ে মুছে সাফ করতে হত। মেজে চক্চকে করে রাখতে

হত সামোভার আর পিতলের অন্য সব জিনিসপত্র। প্রতি রবিবার সবগুলো ঘরের মেঝে আর সিঁড়ি দুটো মাজাঘসা করতে হত। তাছাড়া উনুনের জন্য কাঠ বয়ে আনতাম, তরকারী কুটতাম। সওদা আনতে গিন্নীর সঙ্গে যেতাম বাজারে। মুদীর দোকানে আর ডাক্তারখানায় যেতে হত। মোটমাট সবই করতে হত আমাকে।

বড় ঠাকরুণ দিদিমার বোন—একরোখা খিটখিটে—রোজ ভোর ছটায় উঠত। কোন রকমে চোখমুখ ধুয়ে মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বহুক্ষণ তার নিজের জীবন সম্পর্কে, ছেলে আর ছেলের বৌয়ের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করত।

'হে প্রভু!' হাতের সমস্ত আঙুলগুলো জড়ো ক'রে কপালে লাগিয়ে কান্নার সুরে বলত, 'আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। যদি দয়া হয় তবে দাও শুধু একটু বিশ্রাম, আর সামান্য শান্তি!'

তার এই সব ন্যাকা কান্না আর প্রার্থনার চোটে আমার ঘুম ভেঙে যেত। কম্বলের নিচ থেকে মুখ বের করে দেখতাম। শরতের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ প্রভাত আর তার কন্‌কনে শীতের মধ্যে ভীষণভাবে ক্রুশ করার সময় ওর ধূসর দেহখানা নুয়ে পড়ত। ছোট্ট মাথা থেকে রুমালটা খসে পড়ত, আর তখন পাতলা শাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ত ঘাড়ের কাছে। বাঁ হাতে শিথিলভাবে মাথার রুমালটা ঠিক করতে করতে বলত, 'বেকুফ তেনাটুকু নিয়ে আর পারি না!'

ভীষণভাবে কপাল, কাঁধ আর পেট চাপড়ে বিড়বিড় করে বলত, 'আমাকে যদি তুমি ভালবাস, হে প্রভু, তাহলে আমার ঐ ব্যাটার বৌটাকে শাস্তি দাও। আমাকে অপমান করার উপযুক্ত শাস্তি যেন ও পায়। আর আমার ছেলের যেন চোখ ফোটে—সে যেন বুঝতে পারে সত্যি সত্যি ও কী ধরণের মেয়েমানুষ আর ভিক্তরই বা কী ধরণের ছেলে। হে প্রভু, ভিক্তরকে দয়া কর। তাকে তোমার করুণা দাও।'

ভিক্তর ঘুমত রান্নাঘরে একটা উঁচু মাচার ওপরে। মায়ের প্রার্থনায় সেও জেগে উঠত। ঘুম-জড়ান চোখে চিৎকার করত, 'এই ভোরে বক্‌বক্ শুরু করেছে মা! অসহ্য!'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঘুমোবার চেষ্টা কর।' নরম করে বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকত, কিন্তু পরক্ষণই খেঁকিয়ে বলত, 'ওদের অস্থিমজ্জা রক্ত জমে যাক, শুকিয়ে যাক!'

আমার মনে পড়ে দাদুর মত মানুষও প্রার্থনায় এতখানি বিষ ঢালতেন না।

আমাকে ডেকে তুলত সে প্রার্থনা হলে, 'ওঠ! শুয়ে থেকে আর কুঁড়েমি করবি না, এর জন্যে তোকে পয়সা দিয়ে রাখা হয়নি। সামোভার জ্বালা, বাইরে থেকে কাঠ নিয়ে আয়। অ্যাঁ! সন্ধ্যেবেলা কাঠ বুঝি গুছিয়ে রাখিস নি!'

উঠে পড়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ করতাম যাতে ঐ বুড়িটা না গজরায়। কিন্তু ওকে তৃপ্ত করা অসম্ভব। ঘূর্ণি ঝড়ের মত গজরাতে গজরাতে ঘরময় দাপা-দাপি জুড়ে দিত। 'আস্তে, নচ্ছার! ভিক্তরের ঘুম ভাঙালে আমি মজাটা দেখিয়ে দেব, দেখিস। যা ছুটে দোকানে।'

হপ্তার দিনে প্রাতরাশের জন্যে দুপাউণ্ড করে ময়দার রুটি আসত আর ছোট গিন্নীর জন্যে আসত দু'কোপেকের একটা বন রুটি। বাড়িতে নিয়ে আসতেই দুই

গিন্নী জিজ্ঞেস করত, 'মেপে দেয়ার সময়ে সঙ্গে ছোট আর এক টুকরো দেয়নি বুঝি? এদিকে আয় তো, মুখ দেখা।'

তারপরই উল্লাসে চিৎকার করত, 'খেয়ে নিয়েছে টুকরোটা। ও খেয়ে নিয়েছে। ওর দাঁতে গুঁড়ো লেগে আছে।'

অবশ্য মেজাজ যখন ঠিক থাকত তখন প্রায়ই বলতে শুনেছি ওদের, 'ছেলেটা খাটে কিন্তু খুব।'

'পয়-পরিষ্কার বোধও আছে বেশ।'

'কিন্তু ভারি বেয়াড়া।'

'কার কাছে মানুষ তা ভেবে দেখ!'

দুজনেই চায়, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার চোখে ওরা আধপাগল। কোন দরকার নেই ওদেরকে আমার। কোন কথাই শুনতাম না আমি। মুখে মুখে কথা বলতাম। ছোট গিন্নী আমাকে লক্ষ্য রাখত, তার কথা শুনে আমার মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়। তাই বার বার আমাকে মনে করিয়ে দিত।

'কখনো ভুলিসনে যে তোকে আমরা একটা ভিক্ষুকের পরিবার থেকে তুলে এনেছি। তোর মাকে একবার আমি একটা চুমকির কাজ-করা ব্লাউজ দিয়েছিলাম!'

আমিও বলে ফেললাম একদিন, 'সেই ব্লাউজটার বদলে আপনি কি আমার গায়ের চামড়া খুলে নিতে চান?'

'বলে কি! এ ছেলে তো দেখছি বাড়িঘরে আগুন দিতে পারে!' ভয়ে চিৎকার করে ওঠে ছোট গিন্নী।

'হায় রে! আমি কেন ঘরে আগুন দিতে যাব?

দুজনেই মনিবের কাছে অসংখ্য অভিযোগ করত আমার নামে। আর সেও কর্কশ গলায় বলত, 'ঠিক মত চল হে ছোকরা।'

কিন্তু একদিন বেশ বিরক্ত হয়ে মা আর বৌকে বলল, 'তোমরা বেশ। সব সময় ছেলেটাকে ঘোড়া তাড়াবার মত করে চালাও; অন্য কেউ হলে কবেই পালিয়ে যেত; নয়ত কাজের চাপে মরে যেত।'

এতে দুজনেই প্রচণ্ড রাগের চোটে কেঁদে ফেলে আর কি।

'কোন সাহসে তুমি ওর সামনে এই কথা বলছ, শুনি? লম্বা-চুলওলা বেকুফ কোথাকার।' রাগে জ্বলে উঠে পা আছড়ে চিৎকার করে উঠল ওর বৌ, 'একথা শোনার পরে ও আর আমাকে মান্য করবে? ভুলে যেও না আমি পোয়াতী।'

মা-টাও কান্নার সুরে বলল, 'ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন। কিন্তু মনে রাখিস আমার কথা, ছেলেটাকে তুই-ই নষ্ট করবি, ভাসিলি।'

দপ্‌দপ্‌ পা ফেলে চলে গেল দুজনে।

'দেখলি তো, কী কাণ্ডটাই না বাধিয়েছিস, খুদে শয়তান,—আমি তোকে তোর দাদুর কাছে পাঠিয়ে দেব। ঠিক তাই করব, দেখিস। আবার সেই ন্যাকড়া কুড়নোর কাজ করতে হবে তোকে।' কর্কশ স্বরে ধমকে উঠল মনিব।

'আপনাদের সঙ্গে থাকার চাইতে ন্যাকড়া কুড়নো ঢের ভাল।' অপমান সহ্য করতে না পেরে আমিও বলে ফেললাম, 'আমাকে আনার সময়ে এনেছিলেন শিক্ষানবীশ হিসেবে। কিন্তু কি শিক্ষা দিচ্ছেন আমাকে? কেমন করে জঞ্জাল সাফ করতে হয়, না?'

মনিব আলতো ভাবে আমার চুলের মুঠো চেপে ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একেবারে বর্বর হয়েছিস একটা। সেটি একদম চলবে না, বুঝলি।'

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মনিব আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু দুদিন পরে একটা পেনসিল, টি-স্কোয়ার, রুল, আর খানিকটা গোটান কাগজ হাতে করে রান্নাঘরে এল।

'ছুরি-টুরিগুলো মেজে পরিষ্কার করে, এটার নকল করে রাখিস।' বলল মনিব।

নক্সাটা হল একটা দোতলা বাড়ির সামনের দিক। অসংখ্য জানলা আর প্লাস্টারের কাজ করা।

'এই যে একজোড়া কম্পাস। সবগুলো লাইন মেপে কাগজের ওপরে ফুটকি দিয়ে দাগ ফেলবি, তারপর রুল ফেলে জুড়ে দিবি—প্রথমে লম্বালম্বি—সেটা হবে সমান্তরাল। তারপরে নিচে—লম্বা। নে শুরু কর!'

এমন একটা পরিচ্ছন্ন কাজ পেয়ে আর পড়াশুনা করতে পারব এই আশায় মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। কাগজ আর যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে চেয়ে অবাক হলাম; বুঝতে পারছিলাম না।

যাই হোক, তক্ষুণি হাত ধুয়ে কাজে বসে গেলাম। সমস্ত সমান্তরাল রেখাগুলো চিহ্ন দিয়ে একে একে জুড়ে দিলাম। বেশ চমৎকার হল। শুধু কেমন করে যেন তিনটে রেখা বেশি হল। তারপর লম্বালম্বি দাগগুলো কাটলাম। আর তার পরই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে সমস্ত বাড়িটার চেহারাই অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। জানলাগুলো দেয়ালের মাথায় চড়ে বসেছে। একটা জানলা তো বাড়ির বাইরে গিয়ে ঝুলছে। সদর দরজাটা হামাগুড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে পড়েছে। কার্নিশ ছাদের চাইতে উঁচুতে উঠে গেছে; ঘুলঘুলিটা চিমনির মাথার ওপরে বসেছে।

আমি কেঁদে ফেললাম, কিম্ভূতকিমাকার নক্সাটা দেখে বহুক্ষণ ধরে বুঝতে চেষ্টা করলাম, কেমন করে এটা সম্ভব হল। অবশেষে ঠিক করলাম, কল্পনা দিয়ে শুধরে নেব এটাকে। সমস্ত কার্নিশে, ছাদের কিনারায় বসালাম কাক, চড়ুই, পায়রার ছবি। মাটিতে জানলার সামনে আঁকলাম পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েপড়া মানুষ। তাদের হাতে দিলাম ছাতা। তাতেও মানুষগুলোর বিকলাঙ্গত্ব ঘুচল না। তারপর গোটা ছবিটায় তেরছা দাগ কেটে কেটে মনিবকে দেখালাম।

মনিব চোখ তুলে দেখল। একগাছা চুল পাকাতে পাকাতে গম্ভীর স্বরে বলল, 'এটা কি হল?'

'বৃষ্টি পড়ছে;' বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'বৃষ্টি পড়ে যখনত খন বাড়িগুলোকে এমনি বাঁকা দেখায়। কারণ বৃষ্টি পড়ে তেরছা হয়ে। এগুলো হচ্ছে সব পাখি। কার্নিশে কার্নিশে লুকিয়ে বসে আছে। বৃষ্টি হলে ওরা এমনি করেই বসে থাকে। আর ঐ মানুষগুলো বাড়ির দিকেই ছুটে চলেছে। একটা মেয়ে পড়ে গেছে এখানটায়। আর এ হচ্ছে একটা লেবুওলা...'

'সত্যি এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।' বলল মনিব। হাসির দমকে এমনভাবে মাথাটা ঝুলে পড়ল যে চুলগুলো কাগজের ওপরে লুটোপুটি খেতে লাগল।

'তোকে চাবকে দেওয়া উচিত। ঠিক তাই। ঝগড়াটে খুদে চড়ুই কোথাকার!'

ছোট গিন্নী ঘরে এল। পেটটা হাড়ির মত ফুলে উঠেছে। আমার আঁকা ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল। স্বামীকে বলল, 'দাও না বেশ করে দু'ঘা লাগিয়ে!'

'আরে না, না, আমিও প্রথম প্রথম এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারিনি।' খুব সহজভাবে জবাব দিল মনিব।

একটা লাল পেনসিল দিয়ে আমার ভুলগুলো দাগ দিয়ে দিল। তারপর আরেকটা কাগজ দিয়ে বলল, 'আবার চেষ্টা কর। যতক্ষণ না ঠিক মত দাঁড়ায়—।'

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় অনেকটা ভাল হল। শুধু একটা জানলা নেমে এল বারন্দার ওপরে। কিন্তু জনমানবশূন্য বাড়িটাকে দেখে আমার তেমন ভাল লাগল না। তাই নানান রকমের লোকজনে ভরে দিলাম। জানলায় বসে তরুণীরা পাখার হাওয়া খাচ্ছে। যুবকরা সিগারেট টানছে। একজনের সিগারেট নেই কিন্তু নাকটা লম্বা। সদর দরজায় একটা গাড়ি আর একটা কুকুর।

'আবার ঐ সব আজেবাজে জিনিস এঁকে নষ্ট করেছিস কেন?' মনিব রেগে উঠল।

বুঝিয়ে বললাম যে মানুষজন ছাড়া বাড়িটাকে কেমন শূন্য শূন্য লাগছিল। কিন্তু সে গালি দিয়ে বলল, 'চুলোয় যাক! যদি শিখতে চাস তবে যেমনি বলব তেমনিই করতে হবে। একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে ওগুলো—।'

শেষ পর্যন্ত ঠিক আসলটার মত করে একটা আঁকতে পারায় মনিব বেশ খুশি হল।

'চেষ্টা করলে কি করতে পারিস দেখলি তো? এমনি করে যদি চেষ্টা করিস তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি করতে পারবি।'

এরপর নতুন কাজ দিল, 'আমাদের ফ্ল্যাটের একটা নক্সা আঁক। দরজা জানলাগুলো সব কোথায় কিভাবে আছে দেখে নে. আমি দেখিয়ে দেব না। সব নিজে নিজে করতে হবে!'

রান্নাঘরে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, কোথা থেকে, কিভাবে শুরু করা যায়?

কিন্তু শুরুতেই আমার নকসা-আঁকা শেষ!

বুড়ো গিন্নী আমার কাছে এসে দাঁড়াল! তারপর বিদ্বেষের সুরে বলল, 'বটে, নক্সাদার হতে চাস, না?'

আমার চুল ধরে মাথাটা এমনভাবে টেবিলে ঠুকে দিল যে ঠোঁট আর নাক থেঁতলে গেল। তারপর দাপাদাপি শুরু করে দিল। আমার আঁকা ছিঁড়ে, যন্ত্রপাতি মেঝের ওপরে ফেলে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আবার করে দেখ! কি করি দেখিস! নিজের মায়ের পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে—বাইরের লোক দিয়ে কাজ করাতে চায়—সেটাই ওর মতলব।'

মনিব ছুটে এল। পেছনে পেছনে এল তার বৌ। তারপর শুরু হল একটা প্রলয়! তিনজনই তিনজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিৎকার, চেঁচামেচি, গর্জন। শেষে হৈ চৈ মিটল মেয়েরা যখন চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে আর মনিব আমাকে ডেকে বলল, 'আপাতত নয় ছেড়েই দে। আঁকাজোকা বন্ধ রাখ। দেখলি তো অবস্থা!'

লোকটার জন্য দুঃখ হল আমার। এমন মুষড়ে পড়া অসহায় ভাব। চিরদিনই এই মেয়েছেলেরা চেঁচিয়ে ওকে দাবিয়ে রাখছে।

আমি আগেই টের পেয়েছিলাম যে বুড়ি চায় না আমি কাজ শিখি। তাই চেষ্টা করত আমার কাজে বাধা দিতে। আঁকতে বসার আগে জিজ্ঞেস করতে হত তাকে, 'আর কি কোন কাজ আছে আমার?'

'থাকলে বলব,' রুক্ষভাবে জবাব দিত, 'যোগ্যতা তো ঐ পর্যন্তই। পারিস শুধু টেবিলে বসে বসে সময় কাটাতে।'

কিন্তু একটু পরেই হয় আমাকে কোন কাজে পাঠাত, না হলে বলত, 'আহা, কি রকম ঝাঁটই দিয়েছিস সিঁড়িতে। কোণে কোণে ধূলো বালি রয়েছে! যা, আবার ঝাঁট দে।'

গিয়ে দেখতাম কোথাও ধূলো বালির চিহ্নটুকুও নেই।

'বটে, আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাস তুই?' চিৎকার জুড়ে দিত বুড়ি।

একদিন আমার আঁকার সমস্ত ছবির ওপরে সে আঠা ঢেলে দিল। আর একদিন ঢেলে দিল এক বোতল প্রদীপের তেল। ছোট ছেলেদের মত সে এইসব করত। তেমনি তার ধূর্ততা, ও তেমনি তা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা। ওর মত এত সহজে তাড়াতাড়ি কাউকে চটে যেতে দেখিনি আমি কখনো। সবকিছু নিয়েই সবার বিরুদ্ধে ও নালিশ করতে পারে। এমন দেখিনি আমি। মানুষ সাধারণত অভিযোগ করতে ভালবাসে; কিন্তু গায়করা গান গেয়ে যেমন আনন্দ পায়, ওর আনন্দ যেন তেমনি নালিশের মধ্যেই।

ওর পুত্রস্নেহটাও এক ধরণের পাগলামি। তার এইসব দেখে আমার মজাও লাগত, আবার ভয়ও হত। প্রায়ই ভোরের প্রার্থনার শেষে উনুনের ওপরে দাঁড়িয়ে ভিক্তরের মাচার কোনায় কনুইয়ে ভর দিয়ে দারুণ আবেগে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'আদরের খোকা, প্রাণের প্রাণ আমার! হিরের টুকরোর মত নিখাদ, নির্মল। দেবদূতের পাখার মত হাল্কা। বাছা আমার ঘুমোচ্ছে। ঘুমো ঘুমো! মন তোর সুখ-স্বপ্নে ভরে যাক। পরমাসুন্দরীর চাইতেও সুন্দরী—ধনী রাজকন্যা কিংবা সওদাগর-কন্যার স্বপ্ন দেখ। শত্রুরা জন্মাবার আগেই যেন মরে যায়। আর শত বছর পরমায়ু হোক তোর বন্ধুদের। হাঁসের পেছনে হাঁসীদের মত মেয়েরা তোর জন্য পাগল হোক!'

এক নিদারুণ বেদনাময় কৌতুক আমি অনুভব করতাম। রুচিহীন কুঁড়ের বাদশা ভিক্তরকে লম্বা নাক আর রঙচঙে ডোরাকাটা পোশাকে দেখাত ঠিক একটা কাঠঠোকরার মত; আর তেমনি গোঁয়ার আর মূর্খ।

মায়ের এই ধরণের প্রার্থনায় কোন কোন দিন তার ঘুম ভেঙ্গে যেত। ঘুম জড়ান চোখে গজগজ করে উঠত, 'জাহান্নামে যাও। কেন এখানে দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত শরীরে থুথু দিচ্ছ? নাঃ, তোমার সঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে দেখছি।'

তখন সাধারণত শান্ত হয়ে নেমে আসত বুড়ি। তারপর একটু হেসে বলত, 'ঘুমো ঘুমো! বেকুফ কোথাকার।'

আবার কোন কোনদিন পা দুটো অবশ করে উনুনের ধারে বসে হাঁপাতে থাকত। মনে হত যেন জিভটা পুরে গেছে। তারপর ঐ অবস্থাতেই বলত,

'কি? তুই তোর মাকে নরকে পাঠাচ্ছিস, বেজন্মা, আমার আত্মার কলঙ্ক কোথাকার। শয়তান নিজের হাতে তোর মত একটা অভিশপ্ত শেল আমার বুকে বিঁধে দিয়েছে। জন্মের আগে কেন পচে মরলি না?'

রাস্তার মাতালের মত নোংরা ভাষার স্রোত বইত তার মুখে। শুনে ভয় করত আমার।

খুব সামান্য ঘুমোত বুড়ি। আর ঘুমের মধ্যেই ছট্‌ফট্‌ করত। রাতে কোন কোন দিন কয়েকবার নেমে আসত উনুনের ওপর থেকে। আর যে মাচাটার ওপরে আমি ঘুমোতাম তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাকে জাগিয়ে দিত।

'কি হল?'

'চুপ!' ক্রুশ করে অন্ধকারের ভেতরে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে হিস হিস করে বলত, 'হে প্রভু · হে নবী ইলিয়া· হে শহিদ ভারভারা···অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

কাঁপা হাতে একটা মোমবাতি জ্বালাত। লম্বা নাকশুদ্ধ বিশ্রী ফোলা গোল মুখ আর ধূসর দুটো চোখ আবছা আলোয় বিকৃত জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্থিরভাবে পিট্‌পিট্‌ করত। রান্নাঘরটা বড়; কিন্তু সিন্দুক ইত্যাদি জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসিতে ঘরটায় জায়গা কম। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে নিরালায়। মূর্তির সামনে জ্বলছে একটা প্রদীপ। দেয়ালের গায়ে ছুরিগুলো তুষার খণ্ডের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তাকের ওপরে কালো কালো রান্নার হাঁড়িকুড়িগুলোকে দেখতে বিশ্রী ও বিদ্‌ঘুটে লাগছে।

নদীর পাড় থেকে জলে নামার মত বুড়ি উনুন থেকে নামত খুব সতর্কতার সঙ্গে। তারপর পা দুটো টেনে টেনে কোণের দিকে চলে যেত– যেখানে নোংরা জলের বালতির ওপরে কলসীটা কাটা মাথার মত বসান রয়েছে।

তারপর জলের একটা কলসী থেকে চোঁচোঁ শব্দ করে খানিকটা জল খেয়ে জানালার কাঁচের জমা তুষারের পর্দার মধ্যে দিয়ে বনের দিকে তাকিয়ে থাকত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'হে প্রভু আমাকে কৃপা কর। আমার আত্মার প্রতি করুণা কর।' নিঃশ্বাস চেপে বলে উঠত।

কোন দিন বাতি নিভিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে তিক্তকণ্ঠে বলত, 'আমাকে কেউ ভালবাসে না, হে প্রভু, কেউ চায় না আমাকে!'

এক এক দিন উনুনের দিকে যাবার সময়ে চিমনির কাছে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করত। তারপর ভেতরে হাত দিয়ে দেখত ড্যাম্পারটা ঠিক আছে কি না। কালিতে ভরে যেত হাতটা। তারপর সম্মহিতের মত ঢলে পড়ত গভীর ঘুমে।

যখন বুড়ির ওপরে রাগ হত তখনই ভাবতাম দাদু কেন ওকে বিয়ে করেননি। বুড়িটা তাহলে বেশ করে শায়েস্তা করতে পারত তাকে। আর বুড়িটাও পেত তার যোগ্য জুটি! ওর যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্তে আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠত। মাঝে মধ্যে আবার ওর তুলোর মত ফুলো মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠত। জলে ভরে উঠত দুটো চোখ। বলত, 'মনে করিস আমি খুব সুখে-শান্তিতে আছি? ছেলে পেটে ধরলাম, দেখেশুনে বড় করলাম, মানুষ করলাম। কিন্তু কি পাচ্ছি আমি তার বদলে? রাঁধুনির মত হেঁশেলে খেটে মরছি। এ কি

সহ্য করার মত ? ঐ মাগীকে এনেছে আমার ছেলে আমার জায়গায় বসাতে। ওর রক্তমাংসের আপন জনের জায়গায়। এটা কি ঠিক হয়েছে ?'

'না, তা ঠিক হয়নি।' সহজভাবেই বলি আমি।

'তাহলে দেখছিস তো ?'

তারপর ছেলের বৌয়ের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা বলতে শুরু করত, 'স্নানের সময় মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে যা দেখার সব দেখে নিয়েছি। কি দেখে ব্যাটাটা ও রকম মজল ? ওই মাল দেখে কোন পুরুষ আবার মজে নাকি ?'

স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে ভীষণ অশ্লীল সব কথা বলত বুড়ি। প্রথম প্রথম ভীষণ খারাপ লাগত আমার। কিন্তু পরে বেশ উৎসাহ দেখিয়েই শুনতাম। মনে হত, ঐসব কথার ভেতরে যেন কিছু কিছু নির্মম সত্য রয়েছে।

'মেয়েমানুষের শক্তি বিপুল। ঈশ্বরকে পর্যন্ত ঠকিয়ে ছেড়েছে,' টেবিল চাপড়ে জোর গলায় বলে উঠত বুড়ি, 'ইভের জন্যেই তো গোটা মানুষ জাতটাকে নরকে যেতে হল, সে কথা ভুলিস না।'

এক উঠোনেই আমাদের বাড়িটার মত আর একটা বড় বাড়ি ছিল। বাড়িটার আটটা ঘরের মধ্যে চারটেতেই থাকত অফিসাররা। একটায় থাকত সেনা দলের পুরুত। উঠোনে সবসময়েই ভিড় থাকত। সহিস, চাকর আর তাদের বান্ধবী—রাঁধুনী, ধোপানী আর ঝি চাকরাণীর দল। রান্নার ঘরে নাটক আর রোমান্স জমে থাকত সারা দিনরাত, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিত চোখের জল, ঝগড়া, মারমারি। সেনারা নিজেদের ভেতর শাবল নিয়ে মারামারি করত। কখনো সখনো ওরা মারামারি করত বাড়িওয়ালার মজুরদের সঙ্গে। সব সময়েই মেয়েদের ধরে পেটান হত। উঠোনটা ভরে থাকত লাম্পট্য আর ব্যভিচারে—বলিষ্ঠ জোয়ানদের সীমাহীন পাশবিক লালসায়। সকালে চায়ের সময়, দুপুরে আর রাত্রে খাওয়ার সময়ে শুনতাম মনিব আর মনিব-গিন্নীর জীবনের এই স্থূল যৌন দিক, উঠোনের ভেতরে যা হোক না কেন, সমস্ত কিছুই বুড়ির নখদর্পণে থাকত। উৎফুল্ল সহকারে সেগুলো বলে যেত।

দুটো ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটিয়ে শুনত বৌ। ভিক্তর হো হো করে হাসত! কিন্তু মনিবের চোখে মুখে ফুটে উঠত একটা বিরক্তির ছাপ। বলত, 'অনেক হল, এখন থাম মা।'

'হায় রে, আমি দুটো কথা বলি তাও তোর সহ্য হয়না।'

'ঠিক আছে মা। এখানে বললে কি হয়েছে। বলছে তো নিজেদের মধ্যে।' মাকে উৎসাহ দিত ভিক্তর।

মায়ের জন্য বড় ছেলের ঘৃণা বোধ হত। মায়ের কাছে একা থাকা সাধারণত এড়িয়ে চলত। কারণ একা পেলেই ওর মা বৌয়ের বিরুদ্ধে নালিশের ঝড় তুলত। তারপর পয়সা চাইত। তাড়াতাড়ি দু-তিনটে রুবল আর কিছু খুচরো গুঁজে দিত মার হাতে। বলত, 'টাকাকড়ি নেওয়াটা তোমার বোকামো ; অবশ্য তার মানে এই নয় যে আমি দিতে অস্বীকার করছি—কিন্তু তোমার ঠিক নয়।'

'শুধু ভিখিরীদের জন্য—আর উপাসনার জন্য কয়েকটা মোমবাতি কিনব ...।

'ভিখিরীদের জন্য! ভিক্তরের সর্বনাশ করে ছাড়বে তুমি মা।'

'আপন ভাইকে তুই দেখতে পারিস না। তোর মনে পাপ আছে।'

বিরক্তিতে হাত নেড়ে পালাত বড় ছেলে।

মায়ের সঙ্গে ভিক্তরের ব্যবহার ছিল কর্কশ, অবহেলার। খেত রাক্ষসের মত। রবিবার রবিবার বুড়ি প্যানকেক বানাত; ভিক্তরের জন্য একটা টিনে ভরে লুকিয়ে রাখত ঘুমোবার সোফাটার নিচে। উপাসনা থেকে ফিরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ভিক্তর। আর গজগজ করত ও, 'আর দুটো বেশি রাখতে পার নি, কিপ্‌টেবুড়ি?'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, নইলে কেউ দেখবে।'

'কেউ যদি দেখে তো বলব বুড়ি আমার জন্যে চুরি করে এনেছে।'

একদিন টিনটা থেকে গোটা দুই পিঠে খেয়ে নিয়েছিলাম। তার জন্য আমাকে মেরেছিল ভিক্তর। আমি ওকে দেখতে পারতাম না, সেও দেখতে পারত না আমাকে। পেছনে লাগত। দিনে তিনবার আমাকে দিয়ে ওর জুতা পালিশ করাত। মাচার ওপরে শুয়ে আমার মাথার দিকে থুথু ফেলত।

ওর দাদা যেমন সবাইকে 'ঝগড়াটে মুরগির ছানা' বলে, বোধহয় তার অনুকরণেই ভিক্তরও কতকগুলো কথা তৈরি করেছিল। সে তাতে মজা পেতে। কিন্তু সে-কথাগুলো ছিল যেমনই অদ্ভুত হাস্যকর, তেমনি বোকা, অর্থহীন।

'মা, সোজা হয়ে দাঁড়াও। আমার মোজা কোথায়?'

আর কতকগুলো অর্থহীন প্রশ্ন করে আমাকেই বিরক্ত করত। যেমন, 'বলত আলেক্সেই, কেন লেখা থাকে নীল আর লোকে বলে নীল? কেন লোকে রাত্রি আর কানা না বলে রাতকানা বলে?'

ওদের কথাবার্তায় ঘেন্না ধরত আমার। দিদিমা-দাদুর সুন্দর ভাষা শুনে শুনে মানুষ আমি, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না ওদের বিপরীত শব্দ জুড়ে কথা বলার মানে। যেমন 'ভয়ঙ্কর মজার', 'খাবার জন্য মরছে', 'নিদারুণ আনন্দ।' আমি বুঝতাম না, মজা কি করে ভয়ঙ্কর হয়, আনন্দ কি করে হয় নিদারুণ কিংবা খাওয়ার সঙ্গে মরারই কি বা সামঞ্জস্য!

'এভাবে বলাটা কি ঠিক?' প্রশ্ন করতাম ওদের।

'দেখ, দেখ, উনি আবার এসেছেন আমাদের ওপরে মাষ্টারী করতে।' রেগে গিয়ে বলত ওরা, 'ছোড়ার কান দুটো তুলে নেওয়া উচিত।'

'কান দুটো তুলে নেয়া', জানতাম এ কথাটাও ভুল। শাক তুলতে পার, ফলও তুলতে পার, কিন্তু কান তুলতে পার না।

কান যে তোলা যায়, এটা প্রমাণ করতে ওরা আমার কান মলে দিত। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হত না। পরক্ষণেই উল্লাসে বলে ফেলতাম, 'কিন্তু কৈ, আমার কান তো তোলা গেল না?'

আমার চারপাশেই হৃদয়হীনতা, আর কুৎসিত নির্লজ্জতা। কুনভিনোর পথে পথে বেশ্যাখানা আর রূপ-পসারিণীদের ভিড়ের কমতি ছিলনা, তবু তা এতখানি নয়। সে নোংরামি, সে নষ্টামির পেছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সহ্যাতীত খাটুনি, দৈন্য দুর্দশা, অর্ধাহার, দুঃখ কষ্ট রয়েছে তার মূলে। কিন্তু এখানে মানুষ আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটায়। শ্রমের স্থান জুড়ে আছে অর্থহীন হৈ-হল্লা। আর সব কিছুর মধ্যে একটা নিদারুণ শঠতা আর বিরক্তিকর ক্লান্তির কালো ছায়া।

প্রকট দুঃখ বেদনায় দিন কাটত আমার। কিন্তু দিদিমা দেখতে এলে আরো বেশি আঘাত পেতাম। সে যখনই আসত, এসে ঢুকত রান্নাঘরের পেছনের

দরজা দিয়ে। তারপর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করে প্রায় মাটির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ছোট বোনকে প্রণাম করত। তার এই প্রণাম একটা বোঝার মত আমাকে পিষে মারত।

'ও, তুই এসেছিস, আকুলিনা?' শুষ্ক মুখে নেহাৎ মামুলীভাবেই বলত বুড়ো গিন্নী।

তখন দিদিমাকে আমি চিনতে পারতাম না। এমন বিনীত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াত যে তার সমস্ত চেহারাটাই যেত বদলে। দরজার পাশে নোংরা জলের বালতিটার কাছে একটা টুলে নিঃশব্দে বসত—যেন কোন অপরাধ করেছে, এমন ভাব। শান্ত ধীর সুরে জবাব দিত বোনের কথার।

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ক্ষেপে যেত। রেগে বলতাম, 'ওখানে বসেছ কেন?'

'চুপ কর। তুই এ বাড়ির কর্তা নোস!' সস্নেহে অথচ একটু ধমক দিয়ে বলত দিদিমা।

'ঐ তো, সব জায়গায় ও নাক গলাবে! তা যতই বক আর যতই মার।' নালিশ করত গিন্নী বুড়ী।

কোন কোন দিন বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলত তার দিদিকে, 'শেষ পর্যন্ত তাহলে ভিক্ষে শুরু করলি, আকুলিনা?'

'তেমন খারাপ তো আর কিছু নয়।'

'সেটা লজ্জার সেইটাই তো খারাপ!'

'লোকে বলে যীশু নিজে ভিক্ষে করতেন।'

''মূর্খ নাস্তিকেরা বলে। আর তুই কিনা কান দিস ওদের কথায়! নেহাৎ বেকুফ তুই। যীশু ভিক্ষুক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আর লেখা আছে, তাঁর আবির্ভাব হবে জ্যান্ত আর মরা উভয়েরই বিচার করার জন্যে। এমন কি যারা মরেছে তাদেরও, মনে রাখিস। তাঁর হাত থেকে কোথাও পালিয়ে রক্ষে নেই। এমন কি যদি নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করেও ফেলিস, তবুও না! তোদের—তোর আর ভাসিলির অহঙ্কারের শাস্তি তিনি দিচ্ছেন। তোদের কাছে যখন সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম তখন যে তাড়িয়ে দিয়েছিলি সেইজন্যে। কী চমৎকার বড়লোক আত্মীয় আমার!'

'আমার ক্ষমতা মত সব সময়েই তো কিছু না কিছু করেছি তোমাদের জন্য,' বিচলিত না হয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় জবাব দিত দিদিমা, 'কিন্তু ভগবান নিজেই এমনি করে আমাদের শাস্তি দেবার কথা ভেবেছেন…'

'এতেও হয়নি তোদের, এতেও হয়নি…'

দিদিমার বোন তার ক্লান্তিহীন জিভ দিয়ে দিদিমাকে দাবড়ে যেত। তার সেই খোঁতখোঁতানি শুনে অবাক হয়ে ভাবতাম, এসব কী করে সহ্য করে দিদিমা। এ সময়ে দিদিমাকেও ভাল লাগতনা আমার।

ছোট গিন্নী ঘরে আসে! মাথা ঝাঁকায়—যেন কৃপা করছে।

'আসুন খাবার ঘরে! ঠিক আছে—চলে আসুন!'

দিদিমা যেতে গেলে পেছন থেকে খেঁকিয়ে ওঠে তার বোন, 'পা দুটো মুছে যা, হাড়িডসার শুঁটকী।'

খুব খুশি হয়েই মনিব দিদিমাকে আপ্যায়ন করে, 'আরে, সন্ন্যাসিনী আকুলিনা যে ? কেমন আছ ? কাশিরিন বুড়ো ঠিক আছে তো ?'

আন্তরিকতার সঙ্গে হেসে কথা বলে দিদিমা, 'বড্ড ঘামছ যে ? কাজ করছ না কি এখনো ?'

'খেটেই যাচ্ছি। জেলখানার বন্দীর মত।'

মনিবের সঙ্গে খুব হৃদ্যতার সাথে কথাবার্তা বলত দিদিমা,—বয়ঃজ্যেষ্ঠের মতই। মনিব কখনো কখনো বলত আমার মায়ের কথা, 'হুঁ—ভারভারা ভাসিলিয়েভনা। কি চমৎকার মেয়ে! একটি বীরাঙ্গনা।'

'মনে আছে, আমি তাকে চুমকির কাজ করা একটা ব্লাউজ দিয়েছিলাম ?' দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ওর বৌ।

'হাঁ, আছে।'

'ব্লাউজটা ছিল ঠিক নতুনের মত!'

'হুঁ, ব্লাউজ—ব্লাউজ না ফ্লাউজ—জীবনটাই একটা পরিহাস!' বিড়বিড় করে বলে মনিব।

'কি বললে ?' জিজ্ঞেস করে বৌ।

'ও কিছু না, কিছু না। সুখের দিন যা ছিল সব চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে ভাল লোকেরা।'

উদ্বিগ্ন সুরে বৌ বলে, 'এ সব কথার কি যে মানে!'

তারপর দিদিমাকে নিয়ে যায় নতুন খোকা দেখাতে। শুধু বসে থাকি আমি একলা, চায়ের পেয়ালা, চামচ ইত্যাদি এঁটো বাসন তুলতে।

'চমৎকার মানুষ তোর ঐ দিদিমা।' কোমল আবেশভরা কণ্ঠে বলত মনিব।

এই কথাটার জন্য আমি ওর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। দিদিমাকে একা পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললাম. 'কেন তুমি আস এখানে ? বোঝনা কী রকমের মানুষ ওরা।'

'ওরে আলিওশা, সব কিছুই বুঝতে পারি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল। তার অপূর্ব মুখে এমন একটা স্নেহভরা মধুর হাসি ফুটে ওঠে যে আমিই লজ্জা পাই। সে দেখতে পায়, বুঝতে পারে, সবকিছু—এমন কি এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরে কি চলেছে—তাও।

সন্তর্পণে চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাছাকাছি কেউ আছে কি না দেখে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে দরদ ঢেলে বলল, 'সত্যি, আসতাম না আমি এখানে। আসি কেবল তোর জন্য। নইলে ওদের সঙ্গে আমার কি ? তোর দাদুর ভারি অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টাই থাকতে হয় তার কাছে। তাই আর কাজ করতে পারি না। ফলে পয়সাকড়িও নেই। ওদিকে আবার মিখাইল তার ছেলে শাসাকে তাড়িয়েছে বাড়ি থেকে। তাই তাকেও খেতে পরতে দিতে হচ্ছে। ওদের সঙ্গে কথা ছিল তোকে এখানে দেবার জন্য বছরে ছটা করে রুবল দেবে। তাই ভাবলাম আপাতত যদি একটা রুবলও দেয়। প্রায় ছ'মাস কাজ হল তোর এখানে, তাই না ?' তারপর একটু নুয়ে আমার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, 'ওরা বলে দিল, আমি তোকে যেন একটু বকে যাই। বলল, তুই নাকি খুব অবাধ্য। আর কয়েকটা দিন যদি কষ্ট করে কাটাস, লক্ষ্মী সোনা আমার। চেষ্টা করে দেখ দু'একটা বছর —যতদিন না নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারিস। দেখিস একটু চেষ্টা করে!'

আমি কথা দিলাম। কিন্তু বড্ড কঠিন এই কথা রাখা। এই সহ্যাতীত বিরক্তিকর জীবনের ভারে নুয়ে পড়ছি আমি। সকাল থেকে সন্ধ্যে শুধু দুমুঠো ভাতের জন্য খেটে খেটে মরছি। বেঁচে আছি যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে।

মাঝে মাঝে ভীষণ ইচ্ছে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু অভিশপ্ত শীতকাল চলেছে পুরোদমে। রাতে বইত তুষার ঝড়। ঠাণ্ডায় কড়ি-বর্গাগুলো মড়মড় করত। কি করে পালাই ?

বাড়ির বাইরে খেলতে যাওয়া আমার নিষেধ ছিল। অবশ্য সময়ও পেতাম না। নানান রকমের বিশ্রী নোংরা কাজের ভেতর শীতের বেলাটা হারিয়ে যেত।

কিন্তু গির্জায় যেতেই হত আমাকে—শনিবারের সান্ধ্য উপাসনায় আর রবিবারের শেষ উপাসনা আসরে।

গির্জায় যেতে খুবই ভাল লাগত আমার। একটা অন্ধকার খালি কোণে দাঁড়িয়ে মূর্তির মঞ্চটার দিকে চোখ রেখে মনে মনে তারিফ করতাম। মনে হত যেন মোমের আলোয় ওটা গলে সোনালী স্রোতের মত পাথরের মেঝের ওপরে বয়ে চলেছে। কালো মূর্তিগুলো মৃদু দুলছে, আর তার ওপরে রাজার দুয়োরের সোনার ঝালর থেকে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। নীল বাতাসে সোনালী মৌমাছির ঝাঁকের মত দুলছে সারি সারি ঝোলান মোমের আলো। আর মেয়েদের মুখগুলো যেন ফোটা ফুল।

উপাসনার সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সমস্ত কিছুই যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুই যেন জেগে উঠেছে এক অদ্ভুত রূপকথার রাজ্যে। পিচের মত ঘন কালো অন্ধকারের ভেতরে সমস্ত গির্জেটাই যেন দোলনার মত দুলছে ধীরে ধীরে।

কখনো মনে হত গির্জেটা যেন হ্রদের নিচে ঢাকা পড়েছে। দুনিয়া থেকে এত দূরে যেখানে ভিন্ন রকম জীবন কাটান যেতে পারে। আমার এই ধারণাটা হয় দিদিমার সেই কিতেমের গল্প থেকে। উপাসনা সঙ্গীত, ধীর সুরে প্রার্থনার সুর, সব মিলিয়ে যখন তন্ময় হয়ে পড়তাম তখন প্রায়ই মনে মনে আওড়াতাম সেই করুণ গাথা :

'অশ্বপৃষ্ঠে, সর্বাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত
সেই বর্বর তাতার দল এল তারপর,
অবরুদ্ধ হল সুন্দরী কিতেঝগ্রাদ
ভোরের প্রার্থনার সেই পূণ্য মুহূর্তে।
হে প্রিয় বিশ্বের প্রভু,
হে পবিত্র মেরী মাতা,—
এস, ঈশ্বরের দাসানুদাসদেরকে রক্ষা কর,
যেন তারা তাদের প্রার্থনা সমাপ্ত করতে পারে
তোমার বাক্য, সুধা, ভক্তি ও বিনম্রতায়।
কলঙ্কের স্পর্শ থেকে তুমি তোমার এই গীর্জা রক্ষা কর,
রক্ষা কর, কুমারীদের কৌমার্য,
ঘাতকের হাত থেকে বৃদ্ধ আর দুর্বলদের।
ঈশ্বরের আসন টলল এই ব্যাকুল আর্তনাদে,
এই করুণ প্রার্থনায় তিনি প্রজ্জ্বলিত হলেন,

ভগবান জিহোবা তখন পুণ্যাত্মা দেবদূত মিখাইলকে ডেকে বললেন,
'অবতীর্ণ হও মর্তে আর প্রবল ভূমিকম্পে
কম্পিত কর ঐ কিতেঝগ্রাদ,—
প্রবল জলস্রোতে ঢেকে দাও তাকে,
যাতে ঈশ্বরের ভক্তরা নিবিষ্টচিত্তে মগ্ন থাকতে পারে প্রাণভরা প্রার্থনায়
সকাল থেকে সন্ধ্যা, বছরের পর বছর—অনন্তকাল।'

মৌচাকে যেমন মধু থাকে, আমার অন্তরটাও সে রকম কানায় কানায় পূর্ণ ছিল দিদিমার মুখের ছড়া ও কবিতায়।

গির্জেয় গিয়ে আমি কখনো প্রার্থনা করিনি। দিদিমার ঈশ্বরের কাছে দাদুর সেই সব হিংসুক প্রার্থনা আর প্যানপ্যানানো স্তোত্র আওড়াতে কেন জানি সংকোচ হত। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আমি যেমন ওগুলো অপছন্দ করি দিদিমার ঈশ্বরও ঠিক তেমনিই অপছন্দ করেন, তাছাড়া ওগুলো বইতে লেখা আছে। অর্থাৎ কোন লেখাপড়া জানা লোকের মতই ঈশ্বরের সেগুলো ভাল মুখস্থ আছে।

তাই আমার অন্তর যখনই কোন সুমধুর বেদনায় ব্যাকুল হত, কিংবা সারা-দিনের ছোটখাটো ব্যথায় আহত হত, আমি তখন মনে মনে নিজের প্রার্থনা নিজেই তৈরির চেষ্টা করতাম। নিজের অদৃষ্টের কথা একটু ভাবতেই সাবলীল ভাবেই কথা তৈরি হয়ে উঠে আসত।

সে দিনের নিজের তৈরি অনেক স্তোত্র এখনো আমার মনে আছে। শিশু মনের প্রতিক্রিয়া এমনই গভীর দাগ কেটে রেখে যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ভারি আনন্দ হত আমার গির্জেয় যেতে—আগে মাঠে মাঠে, বনে বনে ঘুরে যেমন আনন্দ পেতাম। আমার শিশুমন ইতিমধ্যেই আঘাত পেয়েছে, জীবনের স্থূল রূঢ়তায় এর মধ্যেই পোড় খেয়েছে। তবু এখানকার অস্পষ্ট নিবিড় স্বপ্নে তা খানিকটা জুড়োত।

যে দিন ভীষণ শীত পড়ত, বা প্রবল তুষার-ঝড় আকাশটাকে পর্যন্ত মেঘের ঘোমটা জড়িয়ে শহরের বুকে দাপাদাপি করত আর ঝরা তুষারের স্তূপের নিচে মাটি উঠত জমে, সেদিন মনে হত কোন দিনও বুঝি আর মাটি দেখা যাবে না, ফুটে উঠবে না জীবনের চিহ্ন। এমন একটা উপলব্ধি এলেই আমি গির্জায় যেতাম।

আর রাত ভাল থাকলে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হত। এপথ ওপথ করে খুঁজে বেড়াতাম নির্জনে কোণাখামচি। পাখায় ভর দিয়ে উড়বার মত জোরে হাঁটতাম। আকাশের চাঁদের মত নিঃসঙ্গ, একাকী। বরফের ওপরের আলোর ঝিলিমিলি মুছে দিয়ে আগে আগে ছুটে চলত আমার ছায়া। অদ্ভুত ভঙ্গিতে থাম আর বেড়ার গায়ের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে সে ছায়া এগিয়ে যেত। গায়ে ভেড়ার চামড়া পরে পথের মাঝখান দিয়ে কখনো কখনো আসত পাহারাওলা। হাতে তার ঝুমঝুমি আর পাশে হাঁটত কুকুর।

কোন কোন দিন চোখে পড়ত হাসিখুশি অল্প-বয়সী তরুণী। সঙ্গে তাদের প্রণয়ীরা। আর অমনিই আমি মনে মনে নিশ্চিত হয়ে বসতাম যে ওরাও এসেছে সান্ধ্য উপাসনা থেকে পালিয়ে।

মাঝে মাঝে কোন আলোকোজ্জ্বল খোলা জানলা থেকে ভেসে আসত হালকা অজানা গন্ধ। যেন এক অপরিচিত অচেনা জগতের আভাস। সেই

জানলার নিচে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ নিতাম! আর ভাবতাম, বুঝতে চেষ্টা করতাম, কী ধরণের মানুষজন থাকে এখানে, কেমনইবা তাদের জীবন? যে সময়ে সমস্ত গণ্য মান্য লোকদের সান্ধ্য উপাসনায় কাটানোর কথা, তখন ওরা এখানে হাসছে, গল্প করছে, এক অদ্ভুত ধরণের গিটার বাজাচ্ছে। জানলার পথে ভেসে আসছে তার মিষ্টি সুর।

বিশেষ করে তিখনভস্কায়া আর মারত্তীনভস্কায়া—এই দুটো নির্জন রাস্তা যেখানে মিশেছে সেই মোড়ে নিচু একটা একতলা বাড়ি আমাকে সব থেকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল। স্রোত টাইডের আগে যখন সবেমাত্র বরফ গলতে শুরু হয়েছে সেই সময়ে এক জোৎস্না রাতে আমি হঠাৎ চলে আসি বাড়িটার কাছে। খোলা জানলার পথে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত সুর। যেন খুব ভাল শক্তিশালী কোন একজন লোক মুখ বুজে সুর ভেঁজে চলেছে। কথাগুলো অস্পষ্ট, কিন্তু গানটা যেন ভীষণ পরিচিত, বোধগম্য। কী যেন একটা তারের যন্ত্র বিরক্তিকরভাবে বাধা দিচ্ছিল গানটার সাবলীল গতিপ্রবাহে—যার জন্য শুনতে পাচ্ছিলাম না ভাল মত। একটা খোঁটার ওপরে বসলাম। ভাবলাম যে, সুরটা নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত আর শক্তিশালী কোন বেহালার। শুনতেও কষ্ট হচ্ছে। এক এক সময়ে এত জোরে বাজছে যেন সমস্ত বাড়িটা কাঁপছে। জানলার কাঁচগুলো বেজে উঠছে ঝন্‌ঝন্ শব্দে। তুষারবারি ঝরে ঝরে পড়ছে ছাদ বেয়ে। আর আমার দু-গাল বেয়ে নেমে আসছে চোখের জল।

আমাকে খোঁটাটার ওপর থেকে ঠেলে ফেলবার আগে পর্যন্ত টের পাইনি যে পাহারাওলা এসেছে।

'এখানে ঘোরাফেরা করছিস কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ঐ বাজনার জন্য।'

'কী হল তাতে? পালা এখান থেকে।'

তাড়াতাড়ি পাড়াটা ঘুরে ফের বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু ততক্ষণে বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। হালকা খুশির ঝলক ভেসে ভেসে আসছে জানলার পথে। কিন্তু আগের সেই ব্যথাভরা করুণ সুরের সঙ্গে মিল এত কম যে আমার ধারণা হচ্ছিল যে সুরটা যেন আমি শুনেছিলাম স্বপ্নের আবেশে।

প্রায় প্রতি শনিবারই আসতাম ঐ বাড়িটার সামনে। তখন বসন্তকাল। একদিন দুপুর রাত পর্যন্ত একটানা চলেছিল বাজনা। বাড়িতে ফিরে মার খেয়েছিলাম সেদিন।

শীতের আকাশভরা তারার নিচে শহরের নির্জন পথে ঘুরে ঘুরে প্রচুর সম্পদ আহরণ করতাম। ইচ্ছে করেই বেছে নিতাম শহরতলীর পথ। বড় রাস্তায় অনেক আলো। হঠাৎ যদি মনিবদের বন্ধুবান্ধব কেউ দেখে ফেলে তারা টের পাবে আমি সান্ধ্য উপাসনায় যাইনি। তাছাড়া সদর রাস্তায় থাকে মাতাল, বেশ্যা, আর পুলিস। ওরা আমার বেড়ানোটাই নষ্ট করে দেবে। কিন্তু নির্জন রাস্তায় একতলার জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেক কিছু। অবশ্য যদি পর্দা ঢাকা না থাকে।

এই সব জানলার পথে অনেক কিছু দেখেছি আমি! প্রার্থনা করতে, চুমু খেতে, মারপিট করতে, তাস খেলতে, শব্দহীন গভীর আলোচনা করতে।

আমার চোখের ওপর দিয়ে মাছের ঝাঁকের মত চলে যেত বিচিত্র সব নির্বাক দৃশ্যাবলী—যেমন দেখা যায় চলচ্চিত্রে।

একদিন একটা একতলার জানলার ভেতর দিয়ে দেখলাম দুজন মহিলাকে। একজনের বয়েস খুবই কম, আর একজন ওর চাইতে একটু বড়। ওরা বসে আছে একটা টেবিলের সামনে। ওদের মুখোমুখি বসে একটি ছাত্র। লম্বা চুল। নানান কায়দায় কী একখানা বই ওদের পড়ে শোনাচ্ছে। চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে কম বয়সের মেয়েটি বেশ মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। কঠিন রেখায় কুঁচকে উঠেছে ভ্রূ দুটো। বড় মেয়েটি খুবই রোগা। চুলগুলো ফাঁপানো। হঠাৎ সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছাত্রটি বইটা রেখে দিল। ছোট মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে চলে যেতেই ছাত্রটি ফাঁপানো চুল মেয়েটির কাছে হাঁটু ভেঙে বসে ওর দুটো হাত চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকল।

অন্য একদিন একটা জানলার পথে দেখলাম বিশাল দেহ লম্বা চওড়া দাড়িওলা একজন লোক লাল জামা পরা একটি মেয়েমানুষকে কোলে বসিয়ে ছোট ছেলের মত দোল দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল লোকটা গান করছে। কারণ ওর মুখটা ফাঁক হচ্ছিল মাঝে মাঝে, আর চোখ দুটো ঘুরছিল। খিল্‌খিল্‌ হাসতে হাসতে মেয়েটি পা দুটো শূন্যে ছড়িয়ে ওর হাতের মধ্যে লুটোচ্ছিল। মেয়েটিকে আবার তুলে গান গেয়ে চলল লোকটা, আর মেয়েটিও তেমনি হাসতে লাগল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম ওদের। তারপর চলে এলাম। বুঝলাম ওদের এ স্ফূর্তি রাতভোর চলবে।

এমনি কত না দৃশ্য আজীবনের জন্যে আমার স্মৃতিতে বসে গেছে। প্রায়ই এই সব দৃশ্য খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হত। ফলে মনিবদের মনে সন্দেহ জাগত। তারা প্রশ্ন করত আমাকে, 'কোন গির্জেয় গিয়েছিলি? কোন পুরুত স্তোত্র পড়াল?'

শহরের সমস্ত পুরুত চেনা ওদের। আর বাইবেলের কোন অধ্যায় পড় হচ্ছে তাও জানা। আমার বানানো কথা ধরে ফেলতে ওদের অসুবিধে হত না।

মহিলারা দুজনেই দাদুর ঈশ্বরকে পুজো করে—ভয় দিয়ে, দুঃখ দিয়ে সে ঈশ্বর পুজো দাবি করেন। তাঁর নাম সব সময়েই লেগে থাকে ওদের ঠোঁটের আগায়। এমনকি ঝগড়া করবার সময়ও।

'দাঁড়া না, ঈশ্বর তোকে কি সাজা দেন দ্যাখ্‌। তোর গায়ের মাংস কুঁচকে যাবে। খানকী!' দুজন দুজনকে শাসাত।

লেণ্ট পর্বের প্রথম রবিবার বুড়িগিন্নী পিঠে ভাজছিল। কিন্তু কড়া থেকে উঠছিল না পিঠে। লেগে লেগে যাচ্ছিল।

'জাহান্নামে যা!' রেগে চিৎকার করল বুড়ি। আগুনের আঁচে মুখটা ফুলে উঠেছে।

তারপর হঠাৎ কড়াটা শুঁকেই ওর মুখটা কালো হল। মেঝের ওপরে কড়াটা ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'হায় রে কপাল, কড়ায় যে চর্বি লেগে আছে। পবিত্র সোমবারে নোংরা পোড়াতে ভুলে গেছি।'

হাঁটু মুড়ে বসে সজল চোখে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে প্রভু, পাপ করেছি, ক্ষমা কর। তুমি করুণাময়, আমার মত একটা নির্বোধ বুড়িকে সাজা দিও না। হে দয়াল'।

নষ্ট পিঠেগুলো দেয়া হল কুকুরকে। কড়াটা পুড়িয়ে নেওয়া হল। কিন্তু এরপর ছোট গিন্নী যখন-তখন বুড়িকে খেঁাটা দিত, 'লেন্ট পর্বে আপনি তো অপরিষ্কার কড়াতে পিঠে ভেজেছেন!' দুজনার মধ্যে ঝগড়া বাধলেই শুনিয়ে দিত বৌ।

সাংসারিক প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ওরা ঈশ্বরকে টেনে আনত অপরিসর জীবনের অন্ধকার কোণে। হয়ত মনে করত প্রত্যেকটা মুহূর্ত ওরা ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যয় করছে। সামান্যতম ব্যাপারে ভগবানকে টেনে আনার এ অভ্যেসটা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হল। নিজের অজান্তেই দৃষ্টি পড়ত কোণের দিকে। মনে হত, কোন এক অদৃশ্য চোখের দৃষ্টি যেন আমার ওপরে রয়েছে। রাতে ভয়ে হাত পা হিম হয়ে যেত। যেন ভয়টা উড়ে আসত রান্নাঘরের কোণে অনবরত জ্বলে থাকা প্রদীপ শিখাটা থেকে।

কি করে যে ভয়টা কাটিয়ে উঠেছিলাম তা এখন আর মনে নেই। তবে কাটিয়েছিলাম অল্প দিনের মধ্যেই। স্বভাবতই দিদিমার করুণাময় ঈশ্বর কৃপা করেছিলেন। তাছাড়া মনে পড়ে তখনো একটি সরল সত্যে আমি সচেতন ছিলাম: কোন অপরাধ আমি করিনি। আর যদি আমি নির্দোষই হয়ে থাকি তবে এমন কোন ধারা নেই যাতে আমি শাস্তি পেতে পারি। অন্যের পাপের জন্যে আমাকে কখনো দায়ী করা যায় না।

সকালের উপাসনা থেকে পালাতাম—বিশেষ করে বসন্ত কালে। পুনরুজ্জীবিত প্রকৃতির এক দুর্নিবার শক্তি আমাকে গির্জা থেকে দূরে ডেকে নিত। তার ওপরে যদি দু'কোপেক পেতাম বেদীর ওপরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবার জন্যে তাহলে তো চিন্তাই ছিল না। ঐ দু'কোপেকে হাড়ের ঘুঁটি কিনে উপাসনার সমস্ত সময়টা খেলে কাটিয়ে দিতাম। ফলে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়া ছিল অবধারিত। একদিন ওরা খ্রীষ্টের শেষ ভোজন পর্বে রুটি উৎসর্গ করার জন্যে, আর মৃত আত্মার মুক্তির প্রার্থনার জন্যে দশটা কোপেক দিয়েছিল আমাকে। পয়সাটা আমি বেমালুম উড়িয়ে দিলাম। ফলে ছোট ধর্মযাজক যখন বেদীর ওপর থেকে প্রসাদী রুটির থালা নিয়ে এল, তখন আমি তা থেকে অন্যের একখানা রুটি তুলে নিলাম।

খেলার দিকে আমার ভীষণ ঝোঁক ছিল। আর খেলতেও পারতাম একটানা অনেকক্ষণ। গায়ে জোর ছিল যেমন আর তেমনি ছিল উৎসাহ! ফলে অল্প দিনের ভেতরেই বল, হাড়ের ঘুঁটি আর গোরদ্কি খেলায় সারাটা জেলায় আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

লেন্ট পর্বের সময়ে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হল আমাকে। প্রতিবেশী দরিমেদন্ত পক্রোভস্কি নামে এক পুরুতের কাছে গেলাম পাপ স্বীকারের জন্য। ভেবেছিলাম, লোকটা খুব কড়া মেজাজের। তাছাড়া তার ওপরে আমি যে সব অন্যায় করেছি তা তিনি সবই জানেন। ওর গ্রীষ্মাবাসের ক্ষতি করেছি ঢিল ছুঁড়ে। ওর ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছি। এমন আরো অনেক কিছু করেছি যার জন্যে ওর কুনজরে পড়াটাই স্বভাবিক। যখন ওর ছোট্ট পুরানো গির্জেয় দাঁড়িয়ে পাপ স্বীকারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন সব কিছুই আমার মনে পড়ল, ফলে বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম।

পুরুত দরিমেদন্ত খুব সহৃদয়ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

'আরে, আমাদের পড়শী যে!' সহজ হেসে বললেন তিনি, 'বেশ, হাঁটু মুড়ে বস! বল কি পাপ করেছ?'

এক টুকরো মোটা মখমলের কাপড়ে তিনি আমার মাথাটা ঢেকে দিলেন। মোম আর ধুনোর গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে কথা বলতে চাই তা বলা যেন আরো কঠিন হয়ে উঠল।

'তুমি গুরুজনের আদেশ মেনে চল?'

'না।'

'বল, আমার আত্মায় পাপ— !'

কিন্তু খুব অবাক হলাম যখন নিজের থেকেই বলে উঠলাম, 'খ্রীষ্টের শেষ ভোজন পর্বের কালে অন্যের উৎসর্গে দেয়া রুটি চুরি করেছিলাম।'

'কী বলছ? কোথায়?' একটু ভেবে নিয়ে ধীরে সুস্থে জিজ্ঞেস করলেন পুরুত।

'তিন সাধুর গির্জেয়, পকরোভ ক্যাথিড্রালে, নিকোলা —'

'বটে, বটে, সবগুলো গির্জেয়ই করেছ বলছ—খুবই খারাপ কাজ করেছ, খোকা। পাপ। বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ।'

'বল, আমার আত্মায় পাপ। নির্বোধ ছেলে, খাবার জন্য চুরি করেছিলে বুঝি?'

'কোনদিন খাবার জন্য, কোন দিন হাড়ের ঘুঁটি খেলায় পয়সা নষ্ট করবার জন্য। বাড়িতে তো প্রসাদী রুটি আনতে হবেই, তাই চুরি করে আনতাম।'

পুরুত দরিমেদন্ত অস্ফুট স্বরে কি যেন বললেন। তারপর আরো কিছু প্রশ্ন করে হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, 'গোপন ছাপাখানার প্রকাশিত কোন বই পড়েছ?'

প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

'নিষিদ্ধ বই। পড়েছ কখনো একটাও?'

'না, পড়িনি…'

'ঠিক আছে, তোমার সব পাপ মার্জনা হল। উঠে দাঁড়াও।'

বিস্ময়ে আমি তার মুখে চোখ রাখলাম। মুখখানা তার কেমন চিন্তামাখা সহৃদয়। মনে মনে লজ্জা হচ্ছিল।

সমস্ত পাপ যাতে স্বীকার করি তার জন্য এখানে পাঠাবার আগে মনিব গিন্নীরা আমাকে অনেক ভয় দেখিয়েছিল।

'আপনার গ্রীষ্মাবাসে আমি ঢিল ছুঁড়েছিলাম।' বললাম।

পুরুত মুখ তুলে বললেন, 'সেটাও অন্যায়। যাও, এখন যাও

'আর আপনার কুকুরটাকেও।'

আমার দিকে না ফিরে ডাকলেন, 'পরের জন।'

ক্ষুব্ধ হই মনে মনে। মনে হল আমি যেন ঠকে গেছি। এই স্বীকারোক্তির চিন্তা আমার সমস্ত শিরা উপশিরায় কাঁপন ধরিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। এতটুকুও আগ্রহের ব্যাপারও নয়। একমাত্র আগ্রহের ব্যাপার হল ঐ প্রশ্নটা —নিষিদ্ধ বইগুলো সম্পর্কে। মনে পড়ল সেই একতলার ঘরে দুটো মেয়ের সামনে ছাত্রটির বই পড়া। মনে পড়ল সেই 'বাঃ বেশ' ছবিওলা লোকটাকে। তারও অমনি অনেক রহস্যজনক ছবিওলা মোটা মোটা কালো মলাটের বই ছিল।

পরের দিন পনেরটা কোপেক দিয়ে আমাকে খৃষ্টের শেষ ভোজন পর্বের উৎসবে পাঠাল। সেবার ইষ্টার দেরিতে এসেছিল। আগেই বরফ গলতে শুরু করেছিল। রুক্ষ পথে অল্প অল্প ধুলো জমেছে। রোদভরা দিন।

গির্জের দেয়ালের কাছে কয়েকজন মজুর বসে মহা উৎসাহে হাড়ের ঘুঁটি খেলছিল। মনে মনে ভাবলাম না হয় একটু পরেই যাব উপাসনার আসরে—

'আমাকে নেবে ?', জিজ্ঞেস করলাম।

'খেলতে হলে এক এক কোপেকের দান।' মুখে বসন্তের দাগ, লালচুলওলা একটা লোক বলল বেশ মেজাজ দেখিয়ে।

উত্তরে আমিও তেমনি মেজাজ দেখিয়েই বললাম, 'বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় ঘুঁটিতে দান রাখছি তিন কোপেক।'

'দেখি পয়সা।'

খেলা শুরু হল।

রুবল ভাঙ্গিয়ে তিনটে কোপেক রাখলাম দুটো ঘুঁটির নিচে। যে এই ঘুঁটিজোড়া ফেলতে পারবে সেই পাবে পয়সা। কপাল ভাল আমার। দুজনে ঘুঁটি ছুঁড়ল, দুজনেই ব্যর্থ হল। মানে, আমি ছ'কোপেক জিতে গেলাম। আর জিতলাম আমার থেকে অনেক বড়দের কাছে। ফলে আমার বুকটা গর্বে দশহাত চওড়া হল।

'ওর দিকে খেয়াল রাখিস, নয়তো জিতের পয়সা নিয়ে পালাবে।' কে একজন বলে উঠল। এতে রাগ হল আমার।

'বাঁ দিকের ঘুঁটিতে ন'কোপেক।' তীক্ষ্ণ স্বরে আমি বলে উঠলাম।

আমার গোঁয়াতুঁমী ওদের ওপরে তেমন প্রভাব সৃষ্টি করল না। কেবল আমার সমবয়সী একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর দিকে নজর রাখিস। বরাত ভাল শয়তানটার। আমি ওকে চিনি!'

'কী বললি, শয়তান ? বটে, দেখা যাক।' রোগা চেহারার একটা মজুর বলল। গায়ের গন্ধে মনে হল সে ফারকারবারী।

খুব সতর্কতার সঙ্গে আমার ঘুঁটি লক্ষ্য করে ফেলে দিল।

'এবার কেমন ?' আমার মুখের দিকে নুয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ডানদিকের ঘুঁটিতে তিন কোপেক।' উত্তরে বললাম।

'তাও নেব।' বুক ফুলিয়ে বলল ফারকারবারী। কিন্তু ওর তাক ব্যর্থ হল।

পরপর তিনবারের বেশি ঘুঁটির নিচে দান ধরার নিয়ম নেই। অন্যের ধরা দানে খেলতে থাকি। চার কোপেক আর অনেক ঘুঁটি জিতলাম। কিন্তু পরে আবার আমার দান ধরার পালা এলে সব হারালাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই উপাসনা সভা শেষ হল। ঘন্টা বাজছে। গির্জা থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে।

'কি হে, মজাটা টের পেলে তো।' বলতে বলতে আমার চুলের মুঠি ধরার জন্য এগিয়ে এল ফারকারবারী। কিন্তু আমি ঝটকা মেরে পালিয়ে এলাম। রবিবারের পোশাক-পরা একটা ছেলেকে ধরলাম পথে। খুব নম্রভাবে প্রশ্ন করলাম, 'উপাসনা সভা থেকে ফিরছেন তো ?'

'যদি ফিরেই থাকি তো কি হয়েছে ?' উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

জানতে চাইলাম, 'কোন পুরুত কেমন উপাসনা করলেন ?'

মাথা নেড়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাল ছেলেটা, 'বটে। তার মানে তুই উপাসনা থেকে পালিয়ে এসেছিস। তাই না ব্যাটা নাস্তিক ? কিছু বলব না আমি তোকে। বাপ আচ্ছা করে ধোলাই দিক, ঠিক হবে।'

ছুটে বাড়ি এলাম। নিশ্চিত জানতাম বাড়ি এলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে। আর বুঝতে পারবে যে আমি গির্জায় যাইনি।

কিন্তু আমাকে অভিনন্দিত করার পরে বুড়ি কেবল একটা প্রশ্নই করল, 'ছোট পুরুতকে কত দিলি ?'

'পাঁচ কোপেক।' মুখে যা এল বলে দিলাম।

'তিন কোপেক দিলেই হত। দু'কোপেক তাহলে তোর থাকত বেকুফ।'

বসন্তকাল। প্রত্যেকটা দিন আগের দিনের চাইতে নতুন নতুন পোশাক পরিচ্ছদে দেখা দিচ্ছে। আরো সুন্দর, আরো বেশি উজ্জ্বল। কচি ঘাস আর বার্চের সবুজ পাতা থেকে ভেসে আসে মদির গন্ধ। ভীষণ ইচ্ছে হত ছুটে চলে যাই, মাঠের ভেতরে উষ্ণ মাটির বুকে চিত হয়ে শুনি ভরত-পাখির গান। কিন্তু তার বদলে এখানে বসে আমি পরিষ্কার করছি শীতের গরম পোশাক, আর সেগুলো ভাঁজ করে বাক্সে তোলার কাজে সাহায্য করছি। তামাক পাতা গুঁড়ো করছি ; ঝাড়ছি ঘর দোরের ধুলো। অনাবশ্যক বিশ্রী কাজে পেটে মরছি সকাল থেকে সন্ধ্যে।

বিশ্রামের সময়েও কিছু করার উপায় নেই। আমাদের নোংরা রাস্তায় কোন আকর্ষণ থাকত না। উঠোন জুড়ে ক্লান্ত বদমেজাজী গর্ত-খোঁড়ার দল, রাঁধুনী আর ধোপানীদের ভিড়। রোজ সন্ধ্যায় তাদের উৎকট দেহবিলাস চলত—যেগুলো আমার কাছে খুবই জঘন্য লাগত। ইচ্ছে হত অন্ধ হয়ে যাই।

একটুকরো রঙিন কাপড় আর একটা কাঁচি নিয়ে ঢুকে পড়তাম চিলেকোঠায়। ঝালর কেটে সাজাতাম কড়ি-বর্গা। তাতে অন্তত সেই একঘেয়ে নিদারুণ বিরক্তি কিছুটা হালকা হত। এক অদম্য ইচ্ছে হত আমার, ছুটে এমন কোথাও যাই যেখানে মানুষ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না, ঝগড়া করে না ; প্রতিমুহূর্তে নালিশ, অভিযোগ দিয়ে ঈশ্বরকে জর্জরিত করে না।

ইস্টারের আগের শনিবার ওরানস্কি গির্জা থেকে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ভাদিমিরস্কায়া পবিত্র মাতার মূর্তি আনা হল আমাদের শহরে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পবিত্র মাতার মূর্তি থাকবে এ শহরের অতিথি হিসেবে। আর এই সময়ে ভেতরে গির্জার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বাড়ি যাবে ঐ মূর্তি।

হপ্তার-দিনে এক সকালে আমার মনিব-বাড়িতে আনা হল তাঁর মূর্তি। আমি তখন পেতলের জিনিসপত্র মাজাঘসা করছিলাম। শুনলাম, পাশের ঘর থেকে মনিব-গিন্নী চেঁচিয়ে উঠল, 'ছুটে যা, দরজা খুলে দে। ওরানস্কায়ার পবিত্র মাতার মূর্তি নিয়ে এসেছেন।'

চর্বি আর ইটের গুঁড়ো লাগা নোংরা হাতেই ছুটে নিচে নেমে দরজা খুলে দিলাম।

দরজার সিঁড়িতে অল্প বয়সী একজন সাধু। তার এক হাতে লণ্ঠন, আর অন্য হাতে ধুনুচি।

'বড্ড দেরী হল দোর খুলতে,' সাধু বিড়বিড় করে বললেন, 'এস, হাত লাগাও।'

শহরবাসী দুজন লোক ভারি মূর্তিটাকে অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে বয়ে ওপরে নিয়ে এল। কোণের দিকে কাঁধ লাগিয়ে নোংরা হাতেই সাহায্য করলাম ওদের। পেছন পেছন মোটা-সোটা আর একজন সাধু বিরক্তিভরা কর্কশ স্বরে স্তোত্র পড়তে পড়তে থপ্‌থপ্ করে ওপরে উঠলেন, 'হে পবিত্র মাতা, আমরা তোমার মধ্যস্থতা প্রার্থনা করি।'

'হয়ত নোংরা হাতে ধরেছি বলে পবিত্র মাতা আমার হাত দুটো অবশ করে দেবেন।' আমি ভয়ে ভয়ে ভাবছিলাম।

ঘরের কোণের দিকে দুটো চেয়ার পেতে পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে তার ওপরে মূর্তিটা রাখা হল। দুপাশ থেকে দুজন অল্প বয়সী সাধু মূর্তিটা ধরে আছেন। তাদের সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল চোখ, চুলগুলো ফাঁপানো, হাসি হাসি মুখ। দুটি দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল তাদের।

উপাসনা শুরু হল, 'হে সৌভাগ্যবতী ঈশ্বর জননী...!' চুলের ভেতরে ফুলো ফুলো লালচে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে হিডহিড়ে সুরে মোটা পুরুত বলতে শুরু করলেন, 'হে পবিত্র মাতা! তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ কর আমাদের মাথায়।' ক্লান্ত স্বরে গেয়ে চললেন সন্ন্যাসীরা।

পবিত্র মাতাকে আমি ভালবাসতাম। দিদিমার কাছে শুনেছি তিনিই পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলেছেন আনন্দে। ভরিয়ে তুলেছেন যা কিছু সুন্দর তার সব কিছু দিয়ে দুঃখীদের সান্ত্বনা দিতে। তারপর যখন চুম্বন করার পালা এল, বড়রা তখন কেমন করে চুম্বন করল তা না দেখেই আমি কাঁপতে কাঁপতে পবিত্র মাতার মূর্তির কাছে গিয়ে তার মুখে ঠোঁট চেপে ধরলাম।

কার যেন একটা বলিষ্ঠ হাত আমাকে ধাক্কা মেরে দরজার ওপাশে কোণের দিকে ঠেলে ফেলল। মূর্তিটা নিয়ে সন্ন্যাসীরা কখন চলে গিয়েছিল জানি না। শুধু মনে আছে মেঝের ওপরে আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখানে আমাকে ঘিরে মনিব গিন্নী দুশ্চিন্তায় আলোচনা করছিল কী আমার ভাগ্যে আছে কে জানে।

'পুরুতকে গিয়ে সব জানাতে হবে। এ সব আমাদের চেয়ে তিনিই ভাল বোঝেন। ওরে বেকুফ্।' মৃদু ভর্ৎসনায় মনিব বলল, 'পবিত্র মাতার ঠোঁটে চুমু খেতে নেই, এটাও জানিস না? স্কুলে খুব শিক্ষা পেয়েছিস, না!'

বহুদিন চোরের মত ভয়ে ভয়ে কাটল। একেই তো আমি নোংরা হাতে পবিত্র মাতার মূর্তি ছুঁয়েছি, তারপর চুমু খেয়েছি অন্যায়ভাবে। এর জন্যে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এরজন্য আমি সাজা পাব।

কিন্তু পরে দেখা গেল পবিত্র মাতা আমার সেই ভালবাসাবশতঃ না বুঝে করে ফেলা পাপ ক্ষমা করেছেন। কিংবা তাঁর দেয় শাস্তি এতই লঘু যে কখন আমার অজান্তেই এই সব ভাল মানুষদের হাতের ঘন ঘন মারধরের ভেতর সেটা সমাপ্ত হয়েছে তা জানতেই পারিনি।

মাঝে মধ্যে বুড়িটাকে রাগাবার জন্য নিরীহ মানুষের মত ভাব করে বলতাম, 'মনে হচ্ছে পবিত্র মাতা শাস্তি দিতে ভুলে গেছেন আমাকে।'

বুড়ি বলত, 'অপেক্ষা কর, সময় যায়নি এখনো।'

চায়ের প্যাকেটের লালচে কাগজ, পাতা, টিনের পাত ইত্যাদি আরো খুঁটিনাটি

দিয়ে ঝালর কেটে কড়িবর্গা সাজাতাম আমি। কখনো যেমনি তেমনি ছড়া বানাতাম, গাইতাম গির্জার সুরে।

একদিন মনিব চিলেকোঠায় এল। আমার কাজ দেখল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ধুত্তরি সব! একটা অদ্ভুত ছেলে তুই পেশকভ। কী যে হবি তুই, তাই ভাবি···যাদুকর। হ্যাঁ। কিছুই বলা যায় না···'

তারপর আমাকে প্রথম নিকোলাইয়ের সময়কার একটা পাঁচ কোপেকী মুদ্রা দিল।

খুব সরু একটা তার দিয়ে সেটাকে মেডেলের মত করে আমার সেই কারু-শিল্পের মাঝখানে সবচেয়ে ভাল জায়গায় ঝুলিয়ে দিলাম। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল সেটা উধাও হয়ে গেছে। সন্দেহ রইল না যে বুড়িটাই চুরি করেছে।

পাঁচ

শেষ পর্যন্ত একদিন পালিয়েই গেলাম। তখন বসন্তকাল। প্রাতরাশের জন্য একদিন রুটি কিনতে গিয়ে দেখি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে রুটিওলা একটা ভারি বাটখারা ছুঁড়ে মেরেছে তার কপালে। বৌটা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। চারদিকে ভীড় জমে উঠল। সবাই ধরাধরি করে তাকে একটা গাড়ি করে নিয়ে চলল হাস-পাতালে। আমিও চললাম গাড়ির পেছনে পেছনে। তারপর দেখি নিজের অজান্তেই কেমন করে যেন পৌঁছেছি ভলগার পারে। হাতে তখন বিশ কোপেক।

নির্মল হাসিতে ডুবে গেছে বসন্তকালটা। কূল ছাপিয়ে ভলগার বান বয়ে চলেছে সুদূরে। বহুদূর পর্যন্ত মাটির বুক জুড়ে সতেজ জীবন। আর এমনি দিনের সকালবেলাটায় ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকার মত মনিবের বাড়িতে লুকিয়েছিলাম! সিদ্ধান্ত নিলাম আর ফিরব না সেখানে। কুনাভিনোয়ে দিদিমার কাছেও যাব না। কথা রাখতে পারলাম না বলে লজ্জা হচ্ছিল আমার। এছাড়া দাদু এই ঘটনার জন্য দারুণ ক্ষেপে যাবেন!

নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে কাটালাম দু-তিন দিন। জাহাজের খালাসীরা খেতে দিত। রাতে তাদের সঙ্গেই ঘুমোতাম জেটির ওপরে। একদিন তাদের একজন খালাসী বলল, 'এমনি করে ঘোরাফেরা করলে তো কোন লাভ হবে না খোকা! "দবরি" জাহাজে যাও। ওরা থালা বাসন মাজার লোক খুঁজছে একজন।'

গেলাম। লম্বা চেহারার দাড়িওলা এক স্টুয়ার্ড চশমা-পরা ঘোলাটে চোখে তাকাল আমার দিকে।

'মাসে দু' রুবল মাইনে।' ধীর স্বরে সে জানাল, 'পাসপোর্ট আছে?'

পাসপোর্ট ছিল না। একটু ভাবল স্টুয়ার্ড। তারপর বলল, 'তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, যা।'

ছুটে গেলাম দিদিমার কাছে। আমার এ কাজে রাজী হল দিদিমা। দাদুকে বলল সরকারী ভিসা অফিসে গিয়ে আমার জন্য পাসপোর্ট যোগাড় করে আনতে। সে নিজেই জাহাজ পর্যন্ত এল আমার সঙ্গে।

'বেশ,' আমাকে লক্ষ্য করে বলল স্টুয়ার্ড, 'এস তাহলে।'

জাহাজের গলুইয়ে ও নিয়ে এল আমাকে। সাদা কোট আর টুপি-পরা লম্বা চওড়া একটা লোক টেবিলে বসে চা খেতে খেতে সিগারেট টানছিল। আমাকে তার সামনে একটু ঠেলে এগিয়ে দিল স্টুয়ার্ড, 'বাসন মাজার লোক।'

বলেই সে চলে গেল। গজগজ করে উঠল বাবুর্চি। কালো গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠল তার যখন পেছন থেকে স্টুয়ার্ডকে লক্ষ্য করে বলল, 'সস্তায় পেলে শয়তানকেও তুই কাজে লাগাবি, তা জানি!' ছোট করে ছাঁটা কালো চুলে-ভরা মাথাটা রাগে ঝাঁকিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাল। তারপর কালো চোখ পাকিয়ে গাল ফুলিয়ে ধমকে উঠল, 'কে তুই?'

লোকটাকে একদম পছন্দ হল না আমার। শাদা ধবধবে পোষাক পরা সত্ত্বেও কেমন যেন নোংরা মনে হচ্ছিল তাকে। আঙুলগুলো রোমশ। লম্বা লম্বা চুল গজিয়েছে বড় বড় দুটো কানে।

বললাম, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

চোখ পিটপিট করে তাকাল। ধীরে ধীরে ওর মুখের সেই রুক্ষ ভয়ঙ্কর চেহারা পাল্টে গেল। লাল দুটো গালে ঢেউ তুলে ফুটে উঠল দরাজ হাসি। ঘোড়ার মত দাঁতগুলো দেখা গেল। গোঁফজোড়া ঝুলে পড়ল আলতোভাবে। মোটাসোটা ভালমানুষ এক গৃহিনীর মত লাগছিল ওকে।

বাকি চা-টা পরিষ্কার একটা গ্লাসে ঢেলে দিয়ে একখানা রুটি বড় এক টুকরো সসেজের সঙ্গে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

'নে চার্লা। মা-বাপ আছে? চুরি করতে পারিস? চিন্তা নেই, এখানে সবাই চোর; দুদিনেই ঠিক তালিম দিয়ে নেব।'

ঘোঁত ঘোঁত করে বলল কথাগুলো। দাড়ি কামানোর ফলে ফুলো ফুলো গাল দুটো নীল হয়ে উঠেছে। নাকের কাছের মাংসের ওপরে ছেয়ে আছে জালি জালি উপশিরা। মোটের ওপর নুয়ে পড়েছে একটা ফুলো ফুলো লালচে নাক আর নিচের পুরু ঠোঁটটা যেন ঘৃণায় ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা ধোঁয়া ছাড়ছে। দেখে মনে হয় এইমাত্র ফিরে এসেছে স্নানাগার থেকে। কারণ, ওর গা থেকে বার্চ পাতা আর মরিচের ব্রাণ্ডির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গলা আর কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমার খাওয়া শেষ হলে, হাতের মধ্যে একটা রুবল গুঁজে দিয়ে বলল, 'তোর জন্য দুটো বিব্ এপ্রন কিনে আন, যা! আচ্ছা দাঁড়া, আমিই কিনে আনছি।'

টুপিটা সামলে নিয়ে ভল্লুকের মত থপ্থপ্ করতে করতে দুলতে দুলতে ডেক থেকে নামতে লাগল লোকটা।

রাত। স্বচ্ছ চাঁদ দ্রুততালে জাহাজ ছেড়ে বাঁয়ের মাঠের দিকে ছুটে চলেছে। শাদা ঘের দেওয়া কালো চিমনিওলা সেকেলে ধরণের ধূসর রঙের জাহাজটা ধীর মন্থর গতিতে রুপোলী জলের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। গাঁয়ের মধ্য থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। মেয়েরা আনন্দে গান গাইছে। তাদের গানের ধুয়ো 'আইলুলি' শোনা যাচ্ছে 'হেল্লিলুজার' মত।

লম্বা তারের দড়িতে বাঁধা একটা বজরা টেনে নিয়ে চলেছে জাহাজটা। বজরার রঙও ধূসর। তার ডেকের ওপরে বড় একটা লোহার খাঁচা; খাঁচার ভেতরে নির্বাসিত কঠোর শ্রমের কয়েদী। গলুইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে শান্ত্রী। মোমের আলোর মত চিক্‌মিক্ করছে তার হাতের বেয়নেট। ঘন নীল আকাশে তারাগুলোকেও মনে হচ্ছে ছোট ছোট মোমবাতির মত। বজরার ওপরের সবই নীরব, নিস্তব্ধ, চাঁদের আলোয় ভরা। লোহার খাঁচার গারদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গোল

গোল ধূসর ছায়া। ওরা কয়েদী, ভলগার দিকে তাকিয়ে আছে। ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে জল। কাঁদছে কিংবা হাসছে ভীরু হাসি। সবকিছু মিলে জেগে উঠেছে কেমন যেন গির্জের আবহাওয়া। এমন কি তেলের গন্ধটাও যেন ধুনোর গন্ধের মত।

বজরাটার দিকে চোখ রাখতে রাখতে মনে পড়ে গেল খুবই ছেলেবেলার কথা। সেই আস্ত্রাখান থেকে নিঝ্‌নি-নভগোরদ যাওয়া। মায়ের সেই মূর্তির মত ভাবলেশহীন মুখ। মনে পড়ল দিদিমাকে, যে আমাকে এই কঠোর অথচ কৌতূহলভরা জীবনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। দিদিমার কথা মনে পড়লে ভুলে যাই জীবনের ঘৃণ্য কুৎসিত দিকটার কথা। সব কিছুই যেন তখন পালটে যায়—সব কিছুই যেন মনে হয় আরো বেশি আকর্ষণীয়, আরো বেশি আনন্দময়। লোকজনকে তখন যেন আরো ভাল লাগে, আর ভালবাসতে সাধ হয়।

রাত্রের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমার চোখে জল ভরে আসে। ঐ বজরাটা তন্ময় করে রাখে। ওটাকে দেখতে একটা কফিনের মত। স্রোতস্বিনী নদীর এই বিশাল বিস্তীর্ণ বুকের ওপরে, এই ধ্যানমগ্ন নিরালা উষ্ণ রাতে দারুণ বেখাপ্পা লাগে ওটাকে। নদীর পাড়ের অসমান তীর কখনো উঠছে, কখনো নামছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডের গতিও দ্রুততর হয়ে উঠছে। অন্তরে জেগে উঠছে সুন্দর সুষ্ঠু জীবনের কামনা, মানুষকে সেবা করার আকাঙ্খা।

যাত্রীদের চালচলনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব ছিল। ওরা, কি তরুণ কি প্রবীণ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সবাই যেন একই রকম। আমাদের জাহাজটা চলেছিল মন্থর গতিতে। কাজের তাড়া যাদের বেশি তারা যায় ডাক-জাহাজে ; আর যাদের তাড়া নেই, তারাই আসে আমাদের জাহাজে। সারাদিন ওরা খায় দায় আর এক গাদা থালা বাসন, কাঁটা চামচ ছুরি এঁটো করে। আর আমার কাজ সেই এঁটো থালা বাসন মাজা, ছুরি কাঁটা মেজেঘসে চকচকে করে রাখা। ভোর ছটা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত আমাকে এই নিয়ে কাটাতে হয়, বিকেলে দুটো থেকে ছটা আর রাতে দশটা থেকে বারোটা একটু কম কাজ থাকে। কারণ, তখন যাত্রীরা খাওয়ার পরে কেউ চা খায় কেউ আবার বিয়ার ভদ্‌কা টানে। এ সময়ে ওয়েটারদেরও কাজ থাকে না। সাধারণত ওদের একটা দল ফানেলের কাছে টেবিলে বসে চা খায়। ওদের সঙ্গে থাকে বাবুর্চি স্মুরি আর তার সহকারী ইয়াকভ ইভানভিচ। থাকে মাক্সিম। মাক্সিম রান্নাঘরের বাসন ধোয়। আর থাকে সেরগেই,—ও যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করে। লোকটা কুঁজো, চওড়া মুখে বসন্তের দাগ। তেল-চকচকে মুখ। ময়লা দাঁত দেখিয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ হাসতে হাসতে ইয়াকভ ইভানভিচদের শোনায় যত অশ্লীল গল্প। তখন গোমড়া মুখ মাক্সিম তার শক্ত চোখে অন্যদের লক্ষ্য করতে করতে শুনে যায় নিঃশব্দে। ওর চোখের রঙটা কেমন তা বোঝা যায় না।

'মানুষ খেকো। মর্দোভীয়!' মাঝে মাঝে গমগমে স্বরে হেঁকে ওঠে বড়বাবুর্চি।

একদম সহ্য করতে পারি না আমি এই লোকগুলোকে। মোটা টেকো ইয়াকভ ইভানভিচের মুখে প্রায় সময়েই লেগে থাকে মেয়েদের কথা। সবসময়েই তা বলে অশ্লীল ঢঙে। ওর মুখ ভর্তি নীল নীল গুটি। ভাবলেশহীন চওড়া গালের ওপরে একটা আঁচিল। আঁচিলটার ওপরে লাল চুল। ওটা সব সময়েই খোঁটে। কোন আলাপী মহিলা-জাহাজে এলেই কাঙালের মত ও তার পেছন পেছন ঘুর ঘুর

করে বেড়ায়। কথা বলে আলতো মিষ্টি সুরে, ঠোঁট দুটো ভরে যায় থুতুতে আর নোংরা জিভটা বের করে চটপট তা চাটতে থাকে। ওকে দেখে কেন জানি আমার মনে হত যে, সরকারী জল্লাদের চেহারা নিশ্চয়ই ঠিক এমনি মোটাসোটা তেলতেলে হবে।

'আরে কেমন করে মেয়েমানুষকে গরম করতে হয় তা জানতে হয়।' ও বলছিল একদিন সেরগেই আর মাক্সিমের কাছে। মনোযোগ দিয়ে ওরা শুনছিল আর ফেঁপে উঠছিল লাল হয়ে।

'মানুষখেকো!' ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল স্মুরি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তারপর আমাকে বলল, 'উঠে আয় পেশকভ!'

ওর ঘরে যেতে চামড়ায় বাঁধানো একটা ছোট্ট বই আমার হাতে তুলে দিয়ে ঠাণ্ডা গুদাম ঘরের দেয়ালের দিকে বাঁধা বাক্সের ওপরে উঠে শুয়ে পড়ে বলল, 'পড়ে শোনা!'

একটা কেক-এর ঝুড়ির ওপরে বসে ভীষণ বাধা ছেলের মত পড়তে আরম্ভ করলাম, 'তারা ভরা প্রচ্ছায়া স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশস্ত ক্ষেত্র। মূর্খ ও তত্ত্বজ্ঞানী হতে তা মুক্ত...'

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে গজ্‌গজ্‌ করে উঠল স্মুরি, 'যত সব উট। কি লিখেছে দ্যাখ!'

'বাঁ দিকের খোলা বুকের অর্থ একটা নিষ্পাপ হৃদয়।'

'কার বাঁ দিকের বুক খোলা?'

'কার সে কথা লেখা নেই।'

'তাহলে তার মানে মেয়েমানুষের বুক। উঃ খানকী।'

দুটো হাত জড়ো করে মাথার নিচে রেখে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজল স্মুরি। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের কোণ থেকে এনে এমনভাবে টানল যে ওর বুকের ভেতর থেকে কী যেন শিষ দিয়ে বেজে উঠল আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল মুখটা। মাঝে মাঝে মনে হত ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পড়া বন্ধ করে ঐ অভিশপ্ত বইটার দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকতাম।

'পড়!' খেঁকিয়ে উঠত স্মুরি।

'তখনি সেই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি জবাব দিলেন, "তাকিয়ে দ্যাখ হে আমার সাধু ফেরে সুভারিয়ান...।'

'সেভেরিয়ান।'

'লেখা আছে সুভারিয়ান।'

'জাহান্নামে যাক! নিচের দিকে কিছু কবিতা আছে, সেখান থেকে শুরু কর।

সুতরাং আমিও শুরু করতাম:

'হে নির্বোধ প্রাণী,
তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না, আমাদের কাণ্ডকারখানা,
যতই বুঝতে চাওনা কেন
তোমাদের দুর্বল মগজে এইসব গ্রহণ করতে পারবে না।
সন্ন্যাসিদের যত গুন্ গুন্ মন্ত্রের গুঞ্জন
সেও কখনো তোমাদের বোধগম্য হবে না, হবে না।

'থাম!' চিৎকার করে উঠত স্মুরি, 'এ কি কবিতা হল! দে, বইটা আমার হাতে দে!'

দারুণ রেগে উঠে বার কয়েক ঐ মোটা নীল মলাটের বইটার পাতা ওল্টাত। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিত বাক্সের তলায়।

'অন্য একটা বই পড়...।'

আমার কপাল মন্দ যে ওর লোহায় বাঁধানো ট্রাঙ্কটার ভেতর বই ছিল অনেক। তারমধ্যে ছিল, 'ওমিরের কথামৃত', 'গোলন্দাজ বাহিনীর স্মৃতি কথা', 'লর্ড সিদেনগেলির পত্রাবলি', 'অনিষ্টকারি কীট ছারপোকা উচ্ছেদ করা ও তাদের অনিষ্ট রোধ করার উপায়।' অনেক বই ছিল যেগুলোর শুরুও নেই শেষও নেই। এক এক সময়ে বাবুর্চি ওগুলো আমাকে পড়তে দিত—শিরনামা পড়তে বলত। পড়লে রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বলত, 'কি সব ওরা লেখে! শয়তান ব্যাটারা। যেন অহেতুক গালের ওপরে থাপ্পড় মারছে। গারভাসি! গারভাসি দিয়ে কি হবে আমার? প্রচ্ছায়া!'

অদ্ভুত শব্দ আর অজানা নামগুলো আমার মাথায় ঠাঁই নিত; উত্যক্ত করত। জিভ শুড়শুড় করত বার বার সেগুলো উচ্চারণের জন্য। যেন বার বার উচ্চারণ করলেই ওগুলোর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। জানলার বাইরে অবিরাম জল ছিটিয়ে আর গান গেয়ে চলত নদী। ডেকের ওপরে যেখানে জাহাজের লোকেরা আর আগওলারা জড় হয়ে বসত একটা প্যাকিং বাক্স ঘিরে, গান গাইত কিংবা বুনতো সূতোর বুনন, অথবা তাস খেলে যাত্রীদের পয়সাকড়ি জিতে নিত, সেখানে চলে যাবার জন্য মনটা উসখুস করে উঠত। ওদের সঙ্গে বসে ওদের সহজবোধ্য কথাবার্তা শুনতে কি ভালই না লাগত—সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখতাম আমার পাড়ের দিকে—যেখানে পাইনের গুঁড়িগুলো তামার তারের মত টান টান উঠে গেছে ওপরের দিকে। মাঠের বুকে বয়ে যাওয়া জোয়ারের জল এক এক জায়গায় আটকে অজস্র ছোট ছোট হ্রদ সৃষ্টি করেছে। টুকরো টুকরো ভাঙা আয়নার মত সেই হ্রদের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে নীল আকাশ। জাহাজটা পাড় থেকে দূরে, বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে চলত। তবুও সন্ধ্যার প্রশান্ত ছায়ায় তীর থেকে ভেসে আসত কোন এক অদৃশ্য গির্জে'র ঘন্টাধ্বনি। মনে পড়িয়ে দিত শহর আর তার লোকজনের কথা। রুটির টুকরোর মত ছোট একটা জেলে ডিঙ্গি ভাসছে জলের বুকে! ধীরে ধীরে চোখের ওপর ভেসে উঠছে একটা গাঁ। ছোট ছোট কতকগুলো ছেলে জলে নেমে জল ছিটচ্ছে। লাল জামা পরা একজন কৃষক হলদে ফিতের মত বালুর ঢালু পথ বেয়ে হেঁটে আসছে। দূর থেকে সবকিছুই সুন্দর লাগত। সবকিছুই মনে হত খেলনার মত—অদ্ভুত, ছোট ছোট রঙিন। স্নেহমাখা দরদভরা সুরে কিছু একটা চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করত আমার—নদীর পাড় আর ঐ বজরাটার উদ্দেশ্যে।

ধূসর রঙের বজরাটা আমাকে মুগ্ধ করে রাখত। ওর থ্যাবড়া নাক দিয়ে ঘোলা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলার দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে কাটাতে পারতাম। দড়ি বাঁধা শুয়োরের মত বজরাটাকে টেনে চলেছে স্টিমারটা। লোহার খাঁচার ভেতরে পশুর মত বসে থাকা লোকগুলোর মুখ দেখার জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠত। পেরম্-এ পৌঁছে যখন ওদের

পাড়ে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছিল তখন সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সামনে দিয়ে ধূসর আকৃতির কয়েকজন লোক গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে শেকল বাজিয়ে চলে গেল। পিঠের বোঝার চাপে নুয়ে পড়েছে তারা। তাদের ভেতর আছে পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, তরুণ, আছে সুন্দর আর কুৎসিত। ঠিক অন্য সব মানুষেরই মত। শুধু পার্থক্যের মধ্যে ওদের পোশাকগুলো আলাদা, আর মাথার চুল কামিয়ে শ্রীহীন করে দেয়া হয়েছে। ওরা ডাকাত, কিন্তু দিদিমার কাছে কত সুন্দর গল্পই না শুনেছি ওদের সম্পর্কে।

ওদের যে কোন লোকের তুলনায় স্মুরিকেই বরং বেশি ডাকাত বলে মনে হত।

'ঈশ্বর, ওদের মত কপাল যেন আমার কখনো না হয়!' বজরাটার দিকে চোখ রেখে বিড়বিড় করে উঠত সে।

একদিন কথায় কথায় ওকে বললাম, 'তুমি হলে রাঁধুনি আর ওরা হল কেউ চোর, খুনি—এটা কেমন করে?'

'আমি রাঁধুনি নই, বাবুর্চি। রাঁধুনি হয় মেয়েমানুষরাই।' ঘেউ ঘেউ করে বলে উঠল। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলল, 'মানুষে মানুষে তফাত তা নির্ভর করে মাথার ওপরে। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা—কেউ আবার একেবারে নিরেট। ভাল বই পড়লে তবে মানুষ চালাক চতুর হয়। যেমন যাদুবিদ্যা আর ঐ ধরণের সব বই। সব রকমের বই পড়তে হবে তবেই তো ভাল বইয়ের খোঁজ পাবি।'

সব সময়েই আমাকে বলত সে, 'পড়, পড়ে যা। একটা বই যদি বুঝতে না পারিস তবে সাতবার করে পড়বি। সাতবারেও না হলে, বারো বার।'

জাহাজের সকলের সঙ্গে তার ব্যবহার খুবই রুক্ষ। এমন কি গম্ভীর মানুষ স্টুয়ার্ডের সঙ্গেও। যখনই কারো সঙ্গে কথা বলত, তখনই নিচের ঠোঁটটা অবজ্ঞায় বেঁকে যেত তার, গোঁফ মোচড়াত। কথাগুলো যেন ছিটকে পড়ত পাথরের টুকরোর মত। তবে আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল ভদ্র, মনযোগী। কিন্তু ওর সেই মনযোগের ভেতর এমন কিছু একটা ছিল যাতে আমার বেশ ভয় লাগত; দিদিমার সেই বোনের মত কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মনে হত তাকে।

'থাম, পড়িসনা আর।' বলে উঠত সে, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকত। মৃদু মৃদু শ্বাস পড়ত নাক দিয়ে। বিরাট ভুঁড়িটা দুলে দুলে উঠত। হাত দুটো মৃতের মত আড়াআড়ি রাখত বুকের ওপরে। কাটা দাগে ভরা রোমশ আঙ্গুল-গুলো নড়াচড়া করত; মনে হত কোন অদৃশ্য কাঁটা দিয়ে মোজা বুনছে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিড়বিড় করে বলে উঠত, 'যেমন ধর, মগজ! খাটিয়ে দেখ, কি-ই না করা যায় মগজ খাটিয়ে! কিন্তু এই মগজ পরিমাণে খুবই কম, আর অসমান। সবার মাথায় যদি সমান মগজ থাকত—কিন্তু তা হয় না। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না, আবার কারো ইচ্ছেই হয় না বুঝতে!'

কথাগুলো থেমে থেমে বলতে বলতে ওর সৈনিক জীবনের গল্প শোনাত আমাকে। ওর গল্পের কোন মাথামুণ্ড খুঁজে পেতাম না; মজাও লাগত না। কারণ ও কখনো শুরু থেকে গল্প বলত না। যেখান থেকে খুশি শুরু করত।

তাই রেজিমেন্ট কমাণ্ডার সৈনিকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে কি বলেছিল লেফটেনেন্ট?' যা যা বলেছিল সবই ঠিক মত বলে গেল। কারণ সৈনিকেরা সত্যি কথা বলতে বাধ্য। লেফটেনেন্ট এমনভাবে ওর

দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা পাথরের দেয়াল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ নামাল।'

ভীষণভাবে শ্বাস টেনে বিড়বিড় করে বলত বাবুর্চি, 'যেন কে কি বলবে তা সব আমি জেনে বসে আছি। ওরা লেফটেনেন্টকে ধরে জেলে পুরল। আর ওর মা… হায় রে ভাগ্য। আমাকে কেউ কখনো কিছু শেখালনা।'

গরম পড়েছিল। সব কিছু কাঁপছে, গুঞ্জন তুলছে। কেবিনের ধাতব দেয়ালের বাইরে চাকা ঘুরছে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে। ছিলকে ছিলকে উঠছে জল। পোর্টহোলের গা বেয়ে বিস্তীর্ণ স্রোত ধেয়ে চলেছে। দূরে একফালি মাঠ। গাছগুলো অস্পষ্ট-ভাবে ভেসে উঠছে চোখে। এসব শব্দ এমন সহজ হয়ে গেছে যে আমার মনে হয় সব কিছুই যেন নীরব। যদিও জাহাজের গলুইয়ের ওপরে একজন খালাসী একটানা সুরে বলে চলেছে, 'সা-তে সাত, সা-তে সাত… '

ইচ্ছে হত, এ সব থেকে নিস্পৃহ হয়ে যাই। কিছু শুনব না, করব না—কেবল রান্নাঘরের গরম চর্বির গন্ধ থেকে দূরে কোথাও একটু ছায়ায় বসে তন্ময়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, নীরবে জলের ওপর দিয়ে কেমন করে ভেসে চলেছে এই শান্ত ক্লান্ত জীবন।

'পড়!' কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠত স্মুরি।

প্রথম শ্রেণীর পরিচারকেরা ওকে ভয় করত। মনে হয় স্বল্পভাষী নিরীহ স্টুয়ার্ডও মনে মনে দারুণ ভয় পায় ওকে।

'এই শুয়োর!' মদের দোকানের লোকটাকে চিৎকার করে ধমকে উঠত সে, 'এদিকে আয় ব্যাটা চোর, মানুষখেকো প্রচ্ছায়া!'

জাহাজী, খালাসী, আগরওলা সকলেই ওকে সামলে চলত। সকলেই ওকে তোষামোদ করত ওর একটু কৃপা পাবার জন্য। সে সুরুয়া থেকে মাংস তুলে দিত ওদের, পরিবার পরিজনের খবর নিত। শুনত তাদের গ্রামীন জীবনের কথা। তেল কালি মাখা বাইলোরুশীয় আগরওয়ালাদের সকলেই অবহেলার চক্ষে দেখত। রুশীরা ওদের বলত চামরী গাই। আর খেপাত এই বলে, 'চামরী গাই, চামরী গাই, ঝোলাটা ওকে দাও না ভাই।'

এরজন্য ভীষণ রেগে যেত স্মুরি। ওর সর্বাঙ্গ ফুলে উঠত। টকটকে লাল হত মুখখানা। ধমকে উঠত আগরওয়ালাদের, 'তোদের সঙ্গে ঐ রকম লাগতে দিস কেন? মুখ ভেঙে ফেলতে পারিস না? নচ্ছার কাৎসাপ-এর দল!'

একদিন সারেঙ্গ—খুবই সুন্দর চেহারার বদমেজাজী একটা লোক, স্মুরিকে বলল, 'চামরী গাই-ও যা খখল-ও তাই, দুই-ই এক।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চি খপ্‌ করে ওর কোমরের বেল্ট আর জামার কলার ধরে শূন্যে তুলে ঝাঁকানী দিয়ে বলল, 'আছড়ে একেবারে ছাতু করে দিই?'

প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লাগত। শেষ হত মারপিটে। কিন্তু স্মুরির গায়ে কেউ কখনো হাত তুলত না। কারণ তার গায়ে ছিল অমানুষিক শক্তি, এছাড়া ক্যাপটেনের স্ত্রী ওকে সুনজরে দেখত। মহিলাটি লম্বা, দীর্ঘাঙ্গী। মুখখানা খানিকটা পুরুষালী। মাথার চুলগুলোও ছেলেদের মত খাটো করে ছাঁটা।

স্মুরি প্রচুর ভদ্‌কা টানত: কিন্তু কোন দিনই মাতাল হত না। সকাল থেকেই মদ খেতে শুরু করত। বার চারেকের টানে একটা গোটা বোতল শেষ। তারপর

সারা দিন ঢক্‌ঢক্‌ করে চালাত বিয়ার। ওর মুখখানা ক্রমে টকটকে লাল হয়ে উঠত। মানুষ অবাক হলে যেমন তার চোখ দুটো বড় হয় তেমনি বিস্ফারিত হত চোখ।

কখনো মাঝে মধ্যে সন্ধ্যায় ডেকে বসে চুপচাপ কাটিয়ে দিত। তখন মনে হত একটা বিশাল শ্বেত মূর্তি গম্ভীর মুখে অপসৃয়মান সুদূরের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। এ সময়ে সবাই ওকে সমীহ করত। কিন্তু আমার কেন জানি করুণা হত ওকে।

কখনো ইয়াকভ ইভানভিচ বেরিয়ে আসত রান্নাঘর থেকে। আগুনের আঁচে মুখটা লাল; সমস্ত শরীরে ঘাম। টাক পড়া মাথায় হাত বুলিয়ে হতাশ ভাবে হাতদুটো নেড়ে চলে যেত। কিংবা দূর থেকে ডেকে বলত, 'মাছটা লেগে যাচ্ছে।'

'স্যালাড তৈরি কর যা।'

'কেউ মাছের ঝোল বা সিদ্ধ চেয়ে বসলে, তখন কি হবে?'

'ওরা যা পাবে তাই-ই গিলবে।'

ভরসা করে এক এক দিন আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

'কি চাই?' চেষ্টা সহকারে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করত সে।

'কিছু না।'

'আচ্ছা বেশ।'

একদিন আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, লোকদের আপনি অত ভয় দেখান কেন? এমন ভাল মানুষ আপনি!'

জিজ্ঞেস করাতে ও একটুও খেপল না দেখে অবাক হলাম।

'ভাল মানুষ কেবল তোর কাছে,' প্রত্যুত্তরে বলল। তারপর একটু চিন্তিত সুরে সহজ ভাবেই বলল, 'ভাল হয়ত সবার কাছেই। কিন্তু সেটা বুঝতে দিই না। কাউকে বুঝতে দিতে নেই যে তুই ভাল মানুষ। তা হলেই তারা তোকে একেবারে পেয়ে বসবে। জলার মধ্যে একটা শুকনো স্থান পেলে মানুষ যেমন সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভাল মানুষের খোঁজ পেলেই লোকে তার কাঁধে চড়ে দু-পায়ে দলতে থাকে। যা, আমার জন্য খানিকটা বিয়ার নিয়ে আয়তো।'

একের পর এক গ্লাশ বিয়ার টেনে গোঁফটা চেটে আবার বলল, 'আর একটু যদি বয়স হত, তবে অনেক কিছুই শেখাতে পারতাম তোকে। শোনাবার মত কথা কিছু আমার জানা আছে—একেবারে অপগণ্ড যাকে বলে তা নই। তোকে বই পড়তে হবে। যা কিছু জানার বই পড়লেই তা জানতে পারবি। বই হচ্ছে একটা দুর্লভ বস্তু। একটু বিয়ার খাবি?'

'না, ও আমার ভাল লাগে না।'

'বেশ, বেশ, মদ ধরিসনা। মদ খাওয়াটা ভীষণ দুঃখের। মদ হল শয়তানের তৈরি। আমার যদি পয়সা থাকত, তোকে স্কুলে ভর্তি করে দিতাম। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ ষাঁড়ের মত হয়। জুতো মার, কেটে মাংস বানাও—ষাঁড় পারে শুধু লেজ নাড়তে, আর কিছু না।'

ক্যাপটেনের বৌ ওকে গোগলের একটা বই পড়তে দিয়েছিল। 'ভীষণ প্রতি-হিংসা' বইখানা আমি ওকে পড়ে শোনালাম। খুব ভাল লাগল আমার। কিন্তু স্মুরি রেগেমেগে খেঁকিয়ে উঠল, 'একদম বাজে, আজগুবি গল্প। অন্য ধরণের বই নিশ্চয়ই ওখানে পাওয়া যাবে।'

বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে আর একখানা বই পালটে নিয়ে এল ক্যাপ-টেনের বৌয়ের কাছ থেকে।

'এই নে, এটা পড, 'তারাস' ; 'আর একটা নাম যেন কি ?' কি তা ভাবতে ভাবতে গম্ভীরভাবে পড়তে আদেশ দিল আমাকে, 'গল্পটা কি দেখ। ক্যাপটেনের বৌ তো বলল দারুণ ভাল বই। কার কাছে ভাল ? হয়ত ওর কাছে। কিন্তু আমার কাছে খারাপ। কেমন করে চুল ছাঁটে দেখছিস ? কান দুটো ছেঁটে ফেললেও পারত !'

তারাস যখন অস্তাপকে লড়াই করার জন্য আহ্বান করল—ঠিক তখন বাবুর্চি হো হো করে হেসে উঠল।

'কেমন লাগল কথাটা ?' জিজ্ঞেস করল, 'একজনের আছে বুদ্ধি আর এক-জনের বল। যাহোক সব লেখে, উটের দল !' গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। থেকে থেকে উস্‌খুস করে উঠল, 'হুঁ, আজগুবি। এক কোপে একটা মানুষকে কেউ কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ফাঁক করতে পারে না। কিছুতেই না। কিংবা বর্শায় গেঁথেও একটা মানুষকে তুলে ফেলা যায় না। ভেঙে যাবে যে। আমি নিজে বুঝি, সৈনিক ছিলাম যে আমি !'

আন্দ্রেইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল স্মুরি, 'জঘন্য ছেলে, না ? একটা মেয়েমানুষের জন্য কি না ! হুঁ !'

কিন্তু তারাস যখন তার নিজের ছেলেকে গুলি করল, তখন বাক্সের কোণ থেকে ওর পাদুটো ঝুলে পড়ল। দুহাতে বাক্সের দড়ি আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল সে। ধীরে দু'গালে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা হয়ে ঝরতে লাগল মেঝের ওপরে। নিঃশ্বাস নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলল, 'হাঃ ঈশ্বর ! হাঃ ঈশ্বর।'

সে হঠাৎ ধমকে উঠল আমাকে, 'পড়ে যা শয়তানের ছানা !'

তারপর মৃত্যুগামী অস্তাপ যখন চিৎকার করে ডেকে বলল তার বাবাকে, 'বাবা ! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা ? তখন সে আরো জোরে কেঁদে ফেললে !

'সব শেষ !' কান্নাভাঙা স্বরে বলল, 'সব, সব। তাহলে এই কি পরিণতি ? কি অভিশপ্ত ঘটনা ! নির্ভেজাল মানুষ ছিল ঐ তারাস, কি বলিস ? মানুষের মত মানুষ একটা, ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি !'

আমার কাছ থেকে বইটা নিয়ে একাগ্র মনে দেখতে লাগল ও। চোখের জল পড়ে মলাট ভিজে যাচ্ছিল।

'একটা ভাল বই পড়া মানে ছুটির দিন উপভোগ করা !'

তারপর আমরা 'আইভানহো' পড়লাম। স্মুরির খুব ভাল লাগল রিচার্ড প্লানটাজেনেটকে।

'রাজার মত রাজা বটে !' একটু জোর দিয়েই বলল স্মুরি। কিন্তু বইটা আমার সেরকম ভাল লাগল না। কেমন যেন রসহীন মনে হল।

আমাদের দুজনের রুচি ছিল ভিন্ন। আমার ভাল লাগল 'টমাস জোন্সের গল্প' 'টম জোন্সের ইতিহাসের' পুরানো অনুবাদ, 'পরিত্যক্ত শিশু'।

সে বলল, 'বাজে। কি হবে আমার টমাসকে দিয়ে ? অন্য আরো বই আছে··'

একদিন আমি ওকে জানালাম অন্য এক ধরণের বই আছে, আমি জানি—নিষিদ্ধ বই। কেবলমাত্র গোপনে ঘরে বসে রাতের বেলা পড়তে হয় সে বই।

স্মুরির চোখদুটো বড় বড় হল। গোঁফ জোড়া কদম ফুলের মত ফুলে উঠল, 'তা আবার কি? কি মিথ্যে কথাই যে বলতে পারিস!'

'মিথ্যে নয়। পাপ স্বীকারের সময় পুরুতও একবার জানিয়েছিল আমাকে। আগেও আমি লোককে এসব বই পড়ে কাঁদতে দেখেছি!'

সে বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকাল, 'কে কেঁদেছিল?'

'একটি মহিলা। সে বসে বসে শুনছিল। আর একজন তো ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।'

'তুই স্বপ্ন দেখছিস, গা ঝাড়া দে' ভ্রূ-কুঁচকে বলল স্মুরি। তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'ঠিকই, কোথাও না কোথাও গোপন কিছু আছেই। না থেকে পারেই না···কিন্তু বয়েসটা বড্ড বেড়ে গেছে আমার.. তাছাড়া আমি ওদের মতও নই··· তবুও এসব কথা মনে হয়···'

এমনি নিপুনভাবে এক নাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ও কথা বলতে পারত।

নিজের সম্পূর্ণ অজান্তেই আমি বই পড়ার পোকা হয়ে উঠলাম। খুবই আনন্দ পেতাম পড়তে। যা কিছুই পড়তাম বইয়ে তা আনন্দময়; জীবনের মত নয়। ফলে জীবনটা আমার কাছে আরো দুর্বিষহ হল।

বই সম্পর্কে স্মুরির উৎসাহও বেড়ে গেল। প্রায়ই আমাকে ফাঁকে ডেকে নিয়ে আসত, 'পেশকভ! চল পড়বি!'

'একগাদা বাসন জমে আছে, ধুতে হবে যে!'

'মাক্সিম ধোবে খন!'

তারপর রুক্ষভাবে জোর করেই বয়স্ক মাক্সিমকে পাঠাত আমার কাজ করতে। আর সেও গ্লাশ ভেঙে এর শোধ তুলত। আর স্টুয়ার্ড আমাকে শাসাত, 'জাহাজ থেকে দূর করব তোকে।'

একদিন মাক্সিম ইচ্ছে করেই কয়েকটা গ্লাশ ডুবিয়ে রাখল নোংরা জলের গামলায়। আমি যখন নোংরা জলটা ফেলে দিলাম তখন গ্লাশগুলোও পড়ে গেল।

কিন্তু স্টুয়ার্ডকে স্মুরি জানাল, 'ওটা আমার জন্যেই। পয়সাটা আমার থেকে কেটে নিও।'

প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি মেলে পরিচারকেরা আমাকে দেখত।

'ওরে বইয়ের পোকা, তোকে কেন মাইনে দেয়া হয় শুনি?' তারা বলত।

ওরা ইচ্ছে করে থালা বাসন এঁটো করে কাজ বাড়িয়ে রাখত। বুঝতে পেরে-ছিলাম যে এর জন্য একদিন একটা জঘন্য কাণ্ড ঘটবে। পরে দেখলাম আমার ধারণা ভুল হয়নি।

একদিন সন্ধ্যায় লালচে মুখের এক মহিলা হলদে রুমাল আর আনকোরা লাল ব্লাউজ পরা একটা মেয়েকে সঙ্গে করে জাহাজে উঠল। দুজনেই বেশ একটু টেনে এসেছিল। মহিলাটি কেবল হাসছিল আর সামনে যাকে পাচ্ছিল তাকেই নমস্কার ঠুকে গির্জের ছোট পুরুতের মত বলছিল, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা কর ভাই, সামান্য এক ফোঁটা ঠোঁটে ছুঁয়েছি মাত্র! ওরা আদালতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। খালাস দিয়েছে। খোশ-মানাবার জন্য একটু টেনেছি মাত্র।'

মেয়েটা হিস্‌হিস্ করে হাসতে হাসতে ঘোলাটে চোখে সবার দিকে চেয়ে সঙ্গি মহিলাটির পাঁজরায় ঠেলা মেরে বলল, 'বলে যাও, বেকুফ মাগী বলে যাও!'

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোর সামনে কেবিনের বিপরীত পাশে যেখানে ইয়াকভ ইভানভিচ থাকত তারই কাছে ওরা জায়গা নিল। কিছু পরেই মহিলাটি উধাও হল। আর সেরগেই এসে বসল মেয়েটার কাছে। ওর ব্যাঙের মত মুখটা হাঁ হল।

সে রাত্রে কাজকর্মের পর যখন আমার শোবার টেবিলটার ওপরে বসলাম, সেরগেই এসে তখন খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল, 'চল্, আজ তোকে আমরা ওর সঙ্গে শোয়াব...'

ও তখন মাতাল। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ওর মুঠো থেকে হাত ছাড়াতে। কিন্তু সেরগেই আমাকে ঘুসি মারল, 'আয় ব্যাটাচ্ছেলে!'

ছুটে এল মাক্সিম। সেও মাতাল। দুজনে মিলে ঘুমন্ত যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে আমাকে নিয়ে চলল তাদের কেবিনের দিকে। কিন্তু ঠিক দরজার সামনেই স্মুরি দাঁড়িয়ে। আর দরজার ঠিক ওপরেই মেয়েটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ ইভানভিচ। মেয়েটা ওর পিঠের ওপরে কিল চড় মারছে।

'ছেড়ে দাও আমাকে!' চিৎকার করে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলছে মেয়েটা।

সেরগেই আর মাক্সিমের কাছ থেকে স্মুরি আমাকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর দুজনার মাথায় মাথায় ঠুকে দিয়ে ছুঁড়ে উলটে ফেলল ডেকের ওপরে।

'মানুষখেকো!' ইয়াকভের মুখের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে স্মুরি গর্জে উঠল। তারপর আমাকে একটা ঠেলা মেরে বলল, 'ভাগ এখান থেকে!'

ছুটে পাছ-গলুইয়ের দিকে গেলাম। মেঘলা রাত। নদীর জল কালো। স্টিমারের গলিপথে দুটো ধূসর পথের রেখা ফুটে উঠেছে। অদৃশ্য তীরের দিকে ছুটে চলেছে। ঐ দুটো পথ-রেখার মাঝপথ দিয়ে এগিয়ে আসছে বজরাটা। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে জ্বলে উঠছে লাল আলো। সে আলোয় কোন কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না। আর জেগে উঠতে না উঠতেই তা হারিয়ে যাচ্ছে নদীর বাঁকে। তখন রাত যেন আরো কালো, আরো দুঃসহ হয়ে উঠছে।

বাবুর্চি এসে আমার পাশে বসল। সিগারেট ধরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'তোকে ওরা ঐ বেশ্যার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, না? শুয়োরের বাচ্চারা। ওরা যখন তোর দিকে আসছিল, আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'মেয়েটাকে রক্ষা করেছেন তো ওদের হাত থেকে?'

'ঐ মাগীটাকে?' মেয়েটাকে খিস্তি করল স্মুরি। তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'এখানে সব হচ্ছে শুয়োরের বাচ্চা। এই জাহাজটা গাঁয়ের থেকেও খারাপ। গাঁয়ে থেকেছিস কোন দিন?'

'না।'

'গাঁ হচ্ছে ভীষণ খারাপ। বিশেষ করে শীতকালটাতে।'

নদীর জলে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'এই সব শুয়োরের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিস তুই। তোর জন্য দুঃখ হয়—বুঝলি রে ক্ষুদে ইঁদুর। সবার জন্যই দুঃখ হয়। কি যে করব মাঝে মধ্যে ঠিক করে উঠতে পারি না। হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে বলব ওদের, 'ওরে কি করছিস তোরা বেজন্মার দল? তোরা কি অন্ধ? উটের দল!'

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল—একটানা। তারের দড়িটা ছলাং করে পড়ল

জলে। অন্ধকারের মধ্যে দুলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো—জাহাজের ঘাটের নিশানা। আরো অসংখ্য আলোর বিন্দু ফুটে উঠল অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতর।

'মাতলা বন', ধীরে ধীরে বলে বাবুর্চি, আর একটা নামও আছে—মাতাল নদী। রেশন অফিসার ছিল একজন—নাম ছিল মাতালভ। আর একজন কেরানী, তার নাম ছিল মাতাল। আমি পারের দিকে এগচ্ছি।'

কামা অঞ্চলের স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা লম্বা ঠেলা বোঝাই বয়ে আনছে কাঠ। বোঝার চাপে ঝুঁকে পড়ে জোড়ায় জোড়ায় জেটির ওপর দিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে আসছে আগরওলাদের অন্ধকার ঘুলঘুলির দিকে। চারফুট লম্বা কাঠগুলো ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে সুরেলা ভাবে হেঁকে উঠছে, 'হেঁইয়ো!'

কাঠ টেনে আনার সময় জাহাজীরা মেয়েগুলোর পায়ে বুকে হাত দিচ্ছে, চেপে ধরছে। মেয়েরা চিৎকার করে থুথু ফেলছে ওদের গায়ে। হাতঠেলা দিয়ে আঘাত করে আত্মরক্ষা করছে। অনেকবার দেখেছি এসব। প্রত্যেক বার প্রত্যেক জায়গায় যেখান থেকেই জ্বালানী কাঠ তোলাহয়েছে সেখানেই দেখেছি এসব ঘটতে।

মনে হত আমি পুরানো, প্রবীণ; অনেককাল আছি এই জাহাজে। আগামী কাল কি ঘটবে, কি ঘটবে আগামী সপ্তাহে, আগামী শরৎকালে, তা সবই যেন আমার নখদর্পণে।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। জাহাজঘাটার দিকে একটা বালুর ঢিবির ওদিকে দেখা যাচ্ছে পাইন বন। পাহাড় বেয়ে মেয়েরা হাঁটছে বনের দিকে। গান গাইছে, হৈ-চৈ করছে। লম্বা হাতিয়ার হাতে ওদের ঠিক সৈনিকের মত দেখাচ্ছে।

কাঁদতে ইচ্ছে করছিল! বুকের ভেতরে লুকনো চোখের জল ঠেলে হৃৎ-পিণ্ডটাকে চাপ দিচ্ছিল! ব্যথা করছিল। কিন্তু কাঁদতে লজ্জা হচ্ছিল। তাই এগিয়ে ডেক মোছার কাজে সাহায্য করতে লাগলাম ব্লাখিনকে।

ব্লাখিন থাকে সবার আড়ালে। রোগা, ফ্যাকাশে চেহারা। এককোণে চুপচাপ বসে ছোট ছোট চোখদুটো পিটপিট করত। ও আমাকে একদিন বলেছিল, 'সত্যি—আমার ডাক নাম ব্লাখিন নয়, খানকিন। কেন জানিস? আমার মা ছিল খানকী। বোনও আছে একটা। সেও বেশ্যা। এটা যেন ওদের কপালে লেখা। দুজনারই। নিয়তি, বুঝলি ভাই, ঘাড়ের ওপর সেটা পাথরের মত চেপে থাকে। যতই চেষ্টা কর উঠতে কিছুতেই পারবে না।'

এখন ডেক মুছতে মুছতে ধীর স্বরে সে বলে চলল, 'দেখছিস তো, কেমন করে মানুষ মেয়েদের পেছনে লাগে? ভেবে দেখ—প্রাণপণ চেষ্টা করলে ভিজে কাঠও জ্বালান যায়। বুঝলি ভাই, এসব আমার ভাল লাগে না। একদম সহ্য করতে পারি না। আমি যদি মেয়ে হতাম তবে কোন একটা ভগবানের নাম নিয়ে গভীর পুকুরের জলে ডুবে মরতাম। উচিত কাজ করা তো এমনিতেই কত শক্ত। তারপর ওরা যদি মনের মধ্যে এই রকম তোলপাড় জাগিয়ে দেয়। বিশ্বাস কর আমাকে, স্কোপেৎসরা বোকা নয়। স্কোপেৎসদের কথা শুনেছিস কোন দিন? ওরা হল নপুংসক। বেশ চালক, বেঁচে থাকার আসল পথটি ওরা ধরতে পেরেছে। জীবনের যা কিছু ছোটখাটো নোংরামী থেকে দূরে সরে গিয়ে শুধু পবিত্রভাবে ঈশ্বরের সেবা করে যাচ্ছে।'

স্কার্টটা উঁচু করে তুলে জল ভেঙে ভেঙে আমাদের পাশ দিয়ে চলে ক্যাপটেনের বৌ। খুব ভোরে ওঠে। রাণীর মত দেখতে, লম্বা। মুখখানা এমন সজীব সরলতায় ভরা যে ইচ্ছে হল ওর পেছন পেছন ছুটে গিয়ে সবটুকু মনপ্রাণ ঢেলে বলি, 'কিছু বলুন আমাকে—কিছু বলুন।'

জেটি ছেড়ে ধীরে ধীরে জাহাজটা দূরে সরে যেতে লাগল।

'জাহাজ ছেড়েছে।' ক্রুশ করে বলে উঠল ব্লাখিন।

ছয়

সারাপুলে পৌঁছে কাউকে কিছু না জানিয়ে নীরবে গম্ভীরভাবে চলে গেল মাক্সিম, পেছন পেছন গেল ফুর্তিবাজ সেই মহিলাটি। সে তখনও হাসছে, ধুলো কাদা মাখা সেই মেয়েটাও গেল। চোখদুটো ফুলে উঠেছে ওর। সেরগেই অনেকক্ষণ ক্যাপটেন-কেবিনের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে দরজার কপাটে কখনো চুমু দিল, কখনোবা কপাল ঠুকল।

'ক্ষমা করুন, আমার কোন দোষ নেই।' ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে সে বলছিল, 'সব কিছু দোষ ঐ মাক্সিমের···।'

জাহাজীরা, মদের দোকানের লোকটা, এমন কি যাত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ জানত ও মিথ্যে বলছে, তবু উস্‌কে দিচ্ছিল, 'চালা, চালিয়ে যা! নিশ্চয়ই তোকে উনি ক্ষমা করবেন, দেখিস্।'

ক্যাপটেন ওকে ক্ষমা করে দিল। কিন্তু এত জোরে একটা লাথি মারল যে ও ছিটকে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। আবার কিছু পরই দেখা গেল সেরগেই ডেকময় ছোটাছুটি করছে ট্রে হাতে। আর সোহাগে পিটপিট করে তাকাচ্ছে সবার দিকে মারখাওয়া কুকুর ছানার মত।

ভিয়াংকা থেকে এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে নিযুক্ত করা হল মাক্সিমের জায়গায়। লোকটা শীর্ণ, মাথাটা ছোট্ট আর চোখদুটো বাদামী রঙের। কাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'নম্বর বাবুর্চি ওকে কয়েকটা মুরগী মেরে আনতে বলল। ও দুটো মুরগী কাটল। কিন্তু বাকিগুলো ডানা ছড়িয়ে ডেকময় ছোটাছুটি করতে লাগল। যাত্রীরাও ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনটে উড়ে গেল জাহাজের বাইরে। দারুণ হতাশ হয়ে সৈনিকটা রান্নাঘরের কাঠের ওপরে বসে কান্না শুরু করল।

'কি হল হেঁদো?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্মুরি, 'কে শুনেছে কখন যে সৈনিকরা কাঁদে!'

'আমি বে-সামরিক দলে ছিলাম।' ধীরে ধীরে বলল লোকটা।

এতেই ওর কাজ হল। আধঘন্টার মধ্যে জাহাজ-শুদ্ধ লোক এসে ওর পেছনে লাগল। এক এক করে আসতে লাগল ওর দিকে, আর জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'ঐ নাকি?'

তারপর হো হো করে দমকা হাসিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সৈনিকটা প্রথমে ঐ লোকদের কিংবা তাদের হাসি লক্ষ্য করেনি। বসে বসে নিজের মনে তার সুতির ছেঁড়া জামার হাতায় চোখের জল মুছছিল। যেন চোখের জলের ফোঁটাগুলো জামার হাতায় লুকিয়ে রাখতে চায় সে। কিন্তু একটু পরেই ওর তামাটে বাদামী চোখদুটো জ্বলে উঠল রাগে। আর ওর আঞ্চলিক ভিয়াংকা

টানে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে আসা কেন? জাহান্নামে গিয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে দেখ না… !'

এতে লোকগুলো আরো মজা পায়। কেউ ওর কাঁখে আঙুলের খোঁচা মারতে থাকে, কেউ টানতে থাকে জামা ধরে, কেউ বা এ্যাপ্রন। দুপুরের খাওয়ার আগ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এমনি করে সবাই রাগাত ওকে। খাওয়ার পরে কে একজন একটা নেবুর খোসা কাঠের চামচে আটকে ওর পেছনে এ্যাপ্রনের ভিতের সঙ্গে জুড়ে দিল। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে যখন চামচটা দুলতে লাগল তখন সবাই মিলে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে; লোকটা জড়োসড়ো হয়ে পড়ল ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত। অথচ অত হাসি তামাসার কারণটা যে কী, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

গম্ভীর শক্ত মুখে স্মুরি তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। দেখতে দেখতে তার মুখখানা মেয়েদের মত নরম হয়ে উঠল। আমারও দুঃখ হল ওর জন্য।

'জানিয়ে দেব ওকে চামচটার কথা?' জিজ্ঞেস করলাম স্মুরিকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে।

সবার হাসাহাসির কারণটা ওকে জানাতে ও চামচটা টেনে খুলে মেঝের ওপরে ছিটকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর দুহাতে আমার চুলের মুঠো ধরল। আমরা মারামারি শুরু করলাম। মজা পেয়ে সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাদের।

ভিড় ঠেলে এসে স্মুরি প্রথমে আমার, পরে ওর কানটা মুচড়ে ধরে আমাদের দুজনকে হিচ্‌ড়ে ছাড়িয়ে দিল। কান ছাড়াবার জন্যে খুদে লোকটাকে লাফালাফি করতে দেখে লোকগুলো হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ শিস দিল, কেউ হাসির চোটে পা আছড়াতে শুরু করল।

'সাবাস সৈনিক! মার ধাক্কা বাবুর্চির পেটে!'

এক দঙ্গল মানুষের এই উচ্ছৃঙ্খল বিশ্রী আনন্দ দেখে ইচ্ছে হল একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে ওদের মাথাগুলো গুঁড়িয়ে দেই।

সৈনিককে ছেড়ে বুনো শুওরের মত সে ঘুরে দাঁড়াল লোকগুলোর দিকে। হাত দুটো পেছনে, দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। গোঁফজোড়া ফুলে উঠেছে কাঁটা দিয়ে।

'যে যার যায়গায় চলে যাও! যাও! মানুষখেকোর দল!'

সৈনিকটা আবার লাফিয়ে পড়ল আমার ওপরে। কিন্তু এক হাতেই স্মুরি ওকে শূন্যে তুলে উঁচু করে জলের কলের কাছে নিয়ে এল। তারপর ন্যাকড়ার পুতুলের মত ওর শীর্ণ দেহটা মুচড়ে মাথাটা জলের নিচে ঠেসে ধরল।

আবার জমে উঠল ভিড়। ছুটে এল জাহাজী, সারেঙ্গ, আর বড় মেট। আর সকলের মাথা থেকে উঁচু হয়ে দেখা দিল স্টুয়ার্ডের মাথা, স্বভাবমত ধীর, বাক্যহীন।

কাঠের স্তূপে বসে সৈনিকটা তার কাঁপা হাতে বুট খুলতে লাগল। পায়ে জড়ান ন্যাকড়াগুলো মোচড়াতে লাগল সে। কিন্তু সেগুলো ভেজেনি। জল ঝরে পড়তে লাগল তার উড়ো উড়ো চুল থেকে আর এসব দেখে লোকেরা আবার হাসতে শুরু করল!

'দাঁড়াও,' সরু চড়া স্বরে বলে উঠল সৈনিক, 'ছোঁড়াটাকে যদি না খুন করি তো কি বলেছি আমি!'

আমার কাঁধে হাত রেখে স্মুরি কি যেন বলল বড় মেটকে। ভিড় সরিয়ে দিল জাহাজীরা।

'তোকে নিয়ে কী করি বল দেখি?' সবাই সরে পড়তে সৈনিকটাকে বলল স্মুরি।

সৈনিক চুপ করে থাকল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বারবার তাকাতে লাগল আমার দিকে। ওর সমস্ত দেহটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে বেঁকে উঠছিল।

'দাঁড়াও। ছিঁচ্‌কাদুনে কোথাকার!' স্মুরি বলল।

'ঘোড়ার ডিম! এটা সেনাবাহিনী নয়!' উত্তরে বলল সৈনিক।

তাতে বাবুর্চি কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। ফুলো গাল দুটো চুপসে এল তার। তারপর থুঃ করে খানিকটা থুথু ফেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল। আহত মনে সৈনিকটার দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু স্মুরি বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ঝগড়াটে লোক, কি বলিস? চলে আয় এখন।'

সেরগেই ছুটে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'লোকটা নিজের গলায় ছুরি বসাতে চাইছে যে!'

'কোথায়?' চেচিয়ে উঠল স্মুরি, তারপর ছুটতে ছুটতে গেল!

পরিচারকদের কেবিনের দরজার কাছে সৈনিকটা দাঁড়িয়ে ছিল; তার হাতে একটা বড় ছুরি। মুরগী আর জ্বালানী কাঠ কাটা হয় এটা দিয়ে। ফালাটা ভোঁতা। ভেঙ্গে ভেঙ্গে করাতের মত হয়ে গেছে। এলোমেলো চুলের ঐ মজার লোকটাকে দেখতে আবার ভিড় জমে উঠল। চ্যাপটা নাক-শুদ্ধ গোটা মুখটা জেলি-মাছের মত কাঁপছে। মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট কাঁপছে। আর বিড়বিড় করছে, 'শয়তান। শ-য়-তা-ন!'

কিছু একটার ওপরে উঠে ভিড়ের ওপর দিয়ে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ওরা কেউ হাসছে, কেউ উস্‌কাচ্ছে। একজন আর একজনকে বলছে, 'দেখ দেখ!'

লোকটা বাচ্চা ছেলের মত তার শীর্ণ লিকৃলিকে হাত দুটো দিয়ে জামাটা ট্রাউজারের ভেতরে ঢোকাতে চেষ্টা করতেই আমার পাশে সুন্দরমত একটা লোক নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'আত্মহত্যাই করবে যদি তবে আর পাতলুন নিয়ে অত টানাটানি করছে কেন?'

এতে অট্টহাসির চোটে ফেটে পড়ল সবাই! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ও যে আত্মহত্যা করবে এটা কেউ বিশ্বাসই করছে না। আমিও না। কিন্তু স্মুরি কিছুক্ষণ ওর দিকে চোখ রেখে ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে ঠেলে লোক সরাতে সরাতে বলল, 'এখান থেকে চলে যা বেকুফ্‌।'

স্মুরি ওকে শুনিয়ে এক দঙ্গল লোকের সামনে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দূর হ মূর্খ কোথাকার!'

কথাটা মজার। কিন্তু আজ সকাল থেকে সমস্ত লোকগুলো সত্যি সত্যি যেন একটা বিরাট মূর্খে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে!

ভিড় কাটিয়ে সৈনিকের কাছে গিয়ে তার সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল স্মুরি।

'আমার হাতে দে ছুরিটা।'

'আচ্ছা, নিয়ে যাও।' বলে সে ছুরিটা দিয়ে দিল। বাবুর্চি ছুরিটা আমার

হাতে দিয়ে ধাক্কা মেরে ওকে কেবিনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, 'ঘুমোগে যা! কি হয়েছে তোর?'

আর একটুও শব্দ না করে সৈনিক বাঙ্কের ওপরে বসে পড়ল।

'খাবি কিছু? কিছু খাবার আর ভদ্‌কা দেব? ভদ্‌কা খাস?'

'অল্প অল্প খাই...।'

'দেখ, ওর গায়ে হাত্ তুলবি না, সাবধান! তোকে ও ঠাট্টা করেনি। আমি বলছি ও করেনি।'

'কেন ওরা আমাকে এমনি খাটিয়ে মারছে?' করুণসুরে প্রশ্ন করল সৈনিক।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে স্মুরি বলল, 'তা কি আমি জানি মনে করছিস?'

আমি আর স্মুরি রান্নাঘরে চলে এলাম।

'হু! আচ্ছা একটা অভাগার পেছনে ওরা সবাই লেগেছিল; দেখলি তো? মানুষ পাগল করে দিতে পারে তোকে, বুঝলি রে ভাই। তা পারে ওরা। ওরা ছারপোকার মত তোর গায়ে কামড়ে থাকবে। তারপর ঠেলা বোঝ! কি বলছি আমি—ছারপোকা? ওরা ছারপোকার থেকেও হাজারগুণ খারাপ···'

খানিকটা রুটি, মাংস আর ভদ্‌কা নিয়ে সৈনিকটাকে যখন দিতে গেলাম তখন দেখি বাঙ্কের ওপরে বসে মেয়েছেলেদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। থালাগুলো টেবিলের ওপরে রাখলাম। ওকে বললাম, 'খেয়ে নাও।'

'দরজাটা ভেজিয়ে দে।'

'অন্ধকার হয়ে যাবে যে।'

'বন্ধ কর, নইলে ওরা আবার আসবে।'

চলে এলাম। আমার ভাল লাগছিল না সৈনিকটাকে। ওর জন্য কোন দয়া বা সহানুভূতি হচ্ছিল না আমার। আর তাতে আরো যেন বেশি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। দিদিমা প্রায়ই বলতেন আমাকে, 'মানুষকে করুণা করতে হয়—ওরা বড় দীন, অভাগা। সারাজীবন লড়াই করে চলেছে।'

'খাবারগুলো দিয়েছিস?' ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল স্মুরি, কেমন আছে এখন?'

'কাঁদছে!'

'আরে ছিঃ! ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া কোথাকার! ও নাকি আবার সৈনিক!'

'ওর জন্য কোন দুঃখ হচ্ছে না আমার।'

'তার মানে?'

'মানুষের উচিত মানুষকে দয়া করা।'

আমাকে স্মুরি তার কোলের কাছে টেনে নিল।

'জোর করে কি আর দুঃখ পাওয়া যায়? মিথ্যে কথা বলেও লাভ নেই কিছু। বুঝেছিস?' গম্ভীরভাবে বলল সে, 'মনটাকে নরম করিস না। নিজের মনটাকে বুঝতে শেখ।'

তারপর আমাকে ঠেলে দিয়ে বিমর্ষভাবে বলল, 'এটা তোর জায়গা নয়। নে, একটা সিগারেট টান!'

যাত্রীদের ব্যবহারে মনটা বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। যেমন করে ওরা সৈনিকটার পেছনে লেগেছিল, তাতে কেমন যেন একটা অপমানবোধ জেগে উঠল আমার মনে।

ওরা আবার ডেকের ওপরে শুয়ে বসে সময় পার করতে লাগল। কেউ খাচ্ছে, কেউ পান করছে, কেউ বা তাস পিট্ছে। পরস্পর ধীর ভাবে গল্প গুজব করছে। কেউ বা নদীর দিকে চেয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক আগে যারা হৈ চৈ করেছে, শিস দিয়েছে বিশ্রীভাবে, তারা যেন আর সে মানুষই নয়। ঠিক আগেরই মত শান্ত, অলস ওরা। ঝল্‌মলে রোদের ভেতরে পোকা বা ধূলোকণার মত ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্থর গতিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মাত্র ডজনখানেক লোক এসে ভিড় করল সিঁড়ির সামনে, জেটির ওপরে নামার আগে ক্রুশ করল। আবার ঠিক ওদেরই মত ডজনখানেক লোক এল, পরনে ওদেরই মত জামাকাপড়। একই রকম থলে, পুলিন্দা ইত্যাদি বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে।

ক্রমাগত এই লোক ওঠানামায় ষ্টিমারের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আসে না। যে সব কথা আলোচনা করে গেছে অন্যেরা সেই একই কথা বলাবলি করে নতুন যাত্রীরা। সেই জমি, চাকুরী, ঈশ্বর আর মেয়েমানুষের কথা। এমন কি ভাষা ব্যবহারও এক।

'ভগবানের ইচ্ছেতেই আমরা দুঃখ কষ্ট পাই। এমনি করেই পেয়ে যাব। এর কি করব বল, সবই আমাদের নিয়তি!'

বিশ্রী লাগত এসব আলোচনা। অমি ন্যাকামো সহ্য করতে পারি না। আর অন্যায় ভাবে কেউ নির্মম ব্যবহার করবে আমার ওপরে তাও সহ্য করার ইচ্ছে নেই আমার! আমি ভালভাবেই জানি এমন কোন অন্যায় আমি করিনি যাতে এ ধরণের ব্যবহার আমাকে পেতে হবে। ঐ সৈনিকটিও পেতে পারে না। সেও অমন ভাবে হাস্যাস্পদ হতে চায়নি নিশ্চয়ই।

গম্ভীর প্রকৃতির সহৃদয় মাক্সিমকে ওরা তাড়িয়ে দিল, আর রেখে দিল কিনা ঐ ঘৃণ্য সেরগেইটাকে। ঐ সব লোক, যারা নিরীহ ভাল মানুষকে নির্যাতনে পাগল করে দিতে পারে, কেন তারাই আবার জাহাজীদের রুক্ষ ব্যবহার সহ্য করে মুখ বুজে? বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় তাদেব অভদ্র গালাগালি?

'রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে যা!' দুষ্টুমীভরা সুন্দর চোখদুটো কুঁচকে খেঁকিয়ে ওঠে সারেঙ, দেখছিস না ষ্টিমারটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে? সরে যা শয়তানের দল!'

শয়তানের দল একান্ত বাধ্যের মত ডেকের অন্য পাশে চলে যায়। সেখান থেকে তাড়া খায় আবার ভেড়ার পালের মত, 'ভাগ, ছুঁচোর দল!'

গ্রীষ্মের রাতে ধাতুর ছাদের নিচে অসহ্য গরম। সারাদিন রোদে পুড়ে তেতে থাকে ছাদটা। আরশুলার মত হামাগুড়ি দিয়ে যে যেখানে পারে ডেকের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রত্যেক ঘাটে জাহাজীরা ওদের লাথি, ঘুসি মেরে তুলে দেয়।

'এ-ই রাস্তা ছাড়! নিজের জায়গায় যা!'

ওরা উঠে ঘুম ঘুম চোখে যেদিকে পারে চলে যায়।

যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজীদের তফাৎ কেবল পোশাকে। তবুও পুলিসের মতই তারা হুকুম জারি করে ওদের ওপরে।

যাত্রীদেব মধ্যে সবচাইতে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল তাদের লজ্জা, ভীরুতা, আর বিষণ্ণ বৈরাগ্য। কিন্তু সব থেকে অবাক লাগে তখন যখন ওদের ঐ বৈরাগ্যের হালকা মুখোস ছেড়ে পাশবিক ফুর্তি জেগে ওঠে, যদিও সে ফুর্তি আনন্দদায়ক নয়।

আমার কেন জানি মনে হত ওরা নিজেরাই জানে না কোথায় ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদের কারুর যেন ঘর নেই, বাড়ি নেই, যাযাবরের দল। ওদের কাছে সব দেশই প্রবাস আর সবাই ওরা ভীরুর অধম।

একদিন দুপুর রাতের শেষে একটা মেশিন ভেঙে গেল। ঠিক কামানের মত শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফাটা পথে ইঞ্জিনঘরের সব বাষ্প ঘন হয়ে ছেয়ে ফেলল ডেক। কানে তালা লাগান আওয়াজে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'গাব্রিলো। এক টুকরো ফেল্ট আর লাল সাসে নিয়ে আয়!'

আমি ইঞ্জিনঘরের পাশের ঘরে ডিশ-ধোয়া টেবিলের ওপরে ঘুমোতাম। বিস্ফোরণের শব্দে আর ধাক্কায় যখন আমার ঘুম ভাঙল, ডেকের ওপরটা তখনো শান্ত। মেশিন থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে আর দ্রুত তালে চলছে হাতুড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই ডেকের যাত্রীরা এমন ভীষন চিৎকার শুরু করল যে সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

দ্রুত ছেয়ে ফেলা সেই কুয়াশার ভেতরে এলোচুলের মেয়েরা আর ড্যাবা ড্যাবা চোখে পুরুষেরা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। পরস্পর পরস্পরকে ফেলে দিচ্ছে ধাক্কা মেরে। সুটকেশ, বিছানা, মালপত্র টানাটানি করছে সবাই। হুমকি খেয়ে পড়ছে একজন আরেক জনের ওপরে, মারামারি করছে, ঈশ্বরের নাম জপ করছে—নাম করছে কেউ সেন্ট নিকোলাইয়ের। সে এক মহামারি। তবুও বেশ মজার। আমি ছুটে ওদের পেছন পেছন যাচ্ছি, আর দেখছি ওরা কী করে?

রাতের পাগলা ঘন্টি সম্পর্কে এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তবুও কেন জানি মনে হচ্ছিল এ সত্যি নয়—সব কিছু মিথ্যে। ডান তীর ঘেঁসে ষ্টিমার এগোচ্ছে স্বাভাবিক গতিতে। জ্যোৎস্না রাত; মাথার ওপরে পূর্ণচাঁদ আলোয় ঝলমল করছে।

কিন্তু লোকগুলো আরো দ্রুত পাগলের মত ছোটাছুটি করল। কেবিনের যাত্রীরা বেরিয়ে এল। কে একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তা দেখে আরো অনেকে লাফিয়ে পড়ল। দুজন চাষী আর এক সন্ন্যাসী কয়েকটা ডাণ্ডা বের করে ডেকের পাটাতনের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো একটা বেঞ্চ উপড়ে ফেলে দিল। ডেকের মাঝে ক্যাপটেনের কেবিনের সিঁড়ির কাছে এক চাষী হাঁটু মুড়ে বসে, পাশ দিয়ে যেই ছুটে যাচ্ছে তাকেই নমস্কার ঠুকে নেকড়ের মত চ্যাঁচাতে লাগল, 'পুণ্যবানেরা, আমি পাপী!'

'একটা নৌকো আন শয়তানের দল!' মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দুহাতে বুক চাপড়ে চ্যাঁচাতে শুরু করল। তার পরনে কেবল একটা পাৎলুন।

জাহাজীরা ছুটে এসে ওদের ঘাড়ে কিল ঘুসি চালাতে চালাতে এক কোণে ঠেলে দিতে লাগল। রাত্রিবাসের ওপরে একটা কোট জড়িয়ে স্মুরি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল আর বজ্রকণ্ঠে প্রত্যেকটা লোককে বলল, 'লজ্জা করে না! একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছিস সব? ষ্টিমারটা ঠিকই আছে; ডুবছে না। নদীর পাড় দুহাত দূরে। যে সব বেকুফ্ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ যে খড়-কাটোরা তুলে এনেছে তাদের। ঐ দেখ্—দেখেছিস দুনৌকো বোঝাই।'

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মাথায় সে ধাক্কা মারতে শুরু করতেই ওরা ডেকের ওপরে গড়িয়ে পড়তে লাগল বস্তার মত।

উত্তেজনা তখনো কমেনি। টুপি পরা একজন মহিলা একটা চামচ হাতে স্মুরির দিকে ক্ষেপে এসে চিৎকার করে উঠল, 'এত বড় সাহস তোর!'

এক ভদ্রলোক আটকালেন তাকে। তার সর্বশরীরে ঘাম, 'ছেড়ে দাও, ওটা একটা মূর্খ'...' গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে বললেন ভদ্রলোক।

হকচকিয়ে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল স্মুরি, 'কেমন মনে হচ্ছে এটা? কী চায় মেয়েটা আমার কাছে? জীবনে ওকে কোন দিন চোখেও দেখিনি।'

ছোট খাটো চেহারার এক চাষী নাক থেকে ঝরে পড়া রক্ত নিয়ে চিৎকার করল, 'আচ্ছা লোক বটে সবাই। ডাকাত।'

গ্রীষ্মকালের মধ্যেই দু-দুবার দেখলাম ষ্টিমারে এরকম আতঙ্কের দৃশ্য। দুবারই সত্যি সত্যি কোন বিপদ ঘটেনি, কেবল ভয়। তৃতীয় বার যাত্রীরা দুটো চোর ধরল। একটার পরনে তীর্থযাত্রীর পোষাক। জাহাজীদের চোখের আড়ালে ওরা ঘন্টাখানেক মারধোর করল দুটোকে। শেষে জাহাজীরা যখন যাত্রীদের হাত থেকে ওদের সামলাল তখন ওরা দল বেঁধে ক্ষেপে এল জাহাজীদের ওপর।

'চোরকে লুকিয়ে রাখছে সব চোর কোথাকার। তোদের আমরা চিনি!' যাত্রীরা চিৎকার শুরু করল, 'তোরাও ওদের দলের তাই ওদের বাঁচাতে চাইছিস।'

মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল চোর দুটো। পরের ষ্টেশনে যখন ওদের পুলিসের হাতে দেয়া হল, তখন ওরা হাঁটতে পারছিল না।

এমনি কত কী যে ঘটত—এত মন খারাপ হত যে আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম মানুষ স্বভাবত ভাল না মন্দ, শান্ত না ভয়ঙ্কর? কেন মানুষ এমন নির্মম, এমন হিংস্র আর সঙ্গে সঙ্গে এমন লজ্জাহীন পা চাটা হয়।

বাবুর্চিকে প্রশ্ন করেছিলাম এ নিয়ে। উত্তরে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখটা আড়াল করে একটু বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল, 'তোর কী তাতে? মানুষ, মানুষ। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। এ সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বই পড়, বইয়ের ভেতরেই সব কিছুর উত্তর পাবি। অবশ্য যদি তেমন বই পড়িস।'

ধর্মপুস্তক বা 'সাধুদের জীবনী' এসবের কোন কদর ছিল না ওর কাছে।

'ওসবের প্রয়োজন পুরুত আর তাদের ছেলেপুলেদের।'

ওর জন্য ভাল একটা কিছু করবার সাধে ঠিক করলাম ওকে একখানা বই উপহার দেব। কাজানের ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছে, 'একজন সৈনিক কি করে মহান পিটারকে উদ্ধার করেছিল,' তারই একটা উপাখ্যান কিনে আনলাম পাঁচ কোপেক দিয়ে। কিন্তু বাবুর্চি তখন মাতাল অবস্থায়—তার তখন ভয়াবহ মূর্তি। তাই ভাবলাম, ওকে দেবার আগে নিজেই একবার পড়ে নিই। খুব ভাল লাগল আমার বইটা। সব ঘটনা এত সরল, সংক্ষিপ্ত আর মজার যে আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হল, বইটা বেশ আনন্দ দেবে ওকে। কিন্তু বইটা ওকে দিতেই ও কোন কিছু না বলে বইটাকে দুমড়ে তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল জলে।

'মূর্খ তোর বইয়ের জায়গা হচ্ছে ওখানে!' মুখ ভারি করে বলল, 'দিন রাত তোকে আমি পাখিপড়া করে শেখাচ্ছি যাতে শিকারী কুকুর হয়ে উঠিস। আর তোর লক্ষ্য কিনা আরশুলা ধরার দিকে?' পা ছুঁড়ে চিৎকার করল সে, 'ওটাকে কোন জাতের বই বলিস তুই? সব বাজে। ওর সব পড়া আছে আমার। ওর মধ্যে সত্যি লেখা আছে বলতে চাস? আয় এদিকে, বল।'

'জানি না আমি।'

'আচ্ছা শোন তবে, আমি জানি। প্রথম যে লোকটা উঠে এসেছিল, যদি ওরা তার মাথাটা কেটে দিত তাহলে নিশ্চয়ই সে পড়ে যেত মই থেকে। বাকি কেউ নিশ্চয় খড়ের গাদায় উঠে আসত না। সৈনিকেরা বোকা নয়। ওরা তখন খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিত, আর সেখানেই সব শেষ হত। বুঝতে পারছিস?'

'হাঁ।'

'তবেই ভেবে দেখ! জার পিটার সম্পর্কে আমি সব জানি। ও রকম কিছুই তাঁর জীবনে ঘটেনি। যা সরে যা!'

বুঝলাম, বাবুর্চির কথাটা ঠিক। কিন্তু তবুও বইটা ভাল লেগেছে আমার। আবার আমি বইটা কিনে পড়লাম দ্বিতীয়বার। এবার অবাক হয়ে দেখলাম বইটা বাস্তবিকই খারাপ। নিজেই লজ্জা পেলাম। সেই থেকে বাবুর্চির ওপরে আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা গেল বেড়ে। এর পর থেকে কেন জানি প্রায়ই বলত সে, 'তোকে পড়তে হবে! এটা উপযুক্ত জায়গা নয় তোর।'

আমারও মনে হত কথাটা ঠিক। স্থানটা আমার উপযুক্ত নয়। সেরগেই আমার সঙ্গে দারুন বিশ্রী ব্যবহার করেছে! অনেকবার আমার টেবিল থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে স্টুয়ার্ডের অলক্ষ্যে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করার সময়ে ধরা পড়েছে আমার কাছে। জানতাম একে চুরি বলে। বহুবার স্মুরি সাবধান করেছিল আমাকে, 'সাবধান নজর রাখিস, ওয়েটাররা যেন টেবিল থেকে ছুরি কাঁটা না সরায়!'

এমনি আরো অনেক কিছুই ছিল যা আমার পক্ষে অশুভ। প্রায়ই ইচ্ছে হত পরের ষ্টেশন এলে ষ্টিমার ছেড়ে পালিয়ে যাব বনে। কিন্তু স্মুরি বাধা দিত। মনে হত ক্রমাগত আমার প্রতি ওর আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। আর আমাকেও আকৃষ্ট করে রাখত ষ্টিমারের অবিরাম গতি। ঘাটে ঘাটে থামাটা খারাপ লাগত আমার। নতুন কোন ঘটনার জন্য সব সময়েই মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। ভাবতাম কামা ছেড়ে জাহাজটা চলে যাক বেলায়া, বেলায়া থেকে দূরে বহু দূরে ভিয়াৎকা বা ভল্‌গায়। সেখানে দেখব কত নতুন তীর, নতুন শহর, নতুন মানুষ।

কিন্তু সে রকম কিছু ঘটল না। হঠাৎ একদিন আমার জাহাজী জীবনে নেমে এল আকস্মিক আর লজ্জাকর একটা পতন। কাজান থেকে নিঝ্‌নি-নভগোরদ যাবার পথে স্টুয়ার্ড আমাকে একদিন ডেকে পাঠাল। গম্ভীর বিষন্ন মুখে স্মুরি বসেছিল কার্পেট পাতা একটা টুলের ওপরে! স্টুয়ার্ডের কাছে হাজির হতেই দরজাটা বন্ধ করে সে স্মুরিকে বলল, 'এই যে এসে গেছে।'

'চামচ আর অন্য সব জিনিষ তুই দিয়েছিলি সেরগেইকে?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'আমার অলক্ষ্যে টেবিল থেকে ও নিয়ে যায়।'

'ওকে নিতে দেখিস না, কিন্তু জানিস সেয়।' শান্ত স্বরে বলল স্টুয়ার্ড।

'স্মুরি হাঁটুর ওপরে একটা চড় মেরে তারপর জায়গাটা চুলকোতে লাগল।

'তাড়াহুড়া করে লাভ নেই।' বলল সে। তারপর কী যেন ভাবতে লাগল।

আমি স্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম; আর স্টুয়ার্ড তাকাল আমার দিকে। আমার মনে হল চশমার আড়ালে যেন ওর চোখদুটো নেই। খুব চুপ্‌চাপ থাকে স্টুয়ার্ড। নিঃশব্দে চলা ফেরা করে। কথা বলে ধীরে—খুবই নিচু গলায়।

মাঝে মাঝে ওর ধূসর রঙের দাড়ি আর দুচোখের শূন্য দৃষ্টি কোন একটা কোণে আকস্মিক দেখা দিয়ে পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়। ঘুমোতে যাবার আগে অনেকক্ষণ মূর্তি আর মূর্তির সামনের অনির্বাণ প্রদীপের সামনে বসে থাকে হাঁটু মুড়ে। কিন্তু ডায়মণ্ড-কাটা জানলার ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ চোখ রেখেও কখনো দেখতে পাইনি তাকে প্রার্থনা করতে। শুধুমাত্র হাঁটু মুড়ে বসে মূর্তি আর প্রদীপের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। আর আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

'পয়সা দিয়েছে তোকে সেরগেই ?' একটু থেমে প্রশ্ন করল স্মুরি।

'না।'

'কখনো দেয়নি ?'

'কখনো না।'

'মিছে কথা বলবে না ও।' স্টুয়ার্ডকে বলল স্মুরি। কিন্তু ধীর শান্ত স্বরে বলল স্টুয়ার্ড, 'কিছুই আসে যায় না তাতে। বুঝলে ?'

'চলে আয়', আমার টেবিলের দিকে এসে মাথার পেছন দিকে একটা ঠেলা মেরে বলে উঠল স্মুরি, 'বোকা কোথাকার! আর আমিও আহাম্মক একটা। আমার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল তোর দিকে।'

নিঝনি-নভগোরদে পৌঁছে স্টুয়ার্ড আমার হিসেবপত্র মিটিয়ে দিল। প্রায় আট রুবলের মত পেলাম। জীবনে এই প্রথম এতটা অর্থ নিজের রোজগারে পাই।

বিদায় কালে বিষণ্ণ হয়ে স্মুরি বলল, 'হুঁ, ভবিষ্যতে চোখদুটো খোলা রাখিস, শুনেছিস ? উড়ো মাছির পেছনে ছুটিসনা।'

'আমার হাতে চকচকে একটা তামাকের বটুয়া গুঁজে দিল, 'নে ধর। চমৎকার কাজ করা! আমার ধর্ম ছেলে নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিল আমাকে। আচ্ছা চলি এবার। বই পড়িস। ঐ একটা মাত্র ভাল কাজ আছে যা করতে পারিস।'

দুহাতে আমাকে জাপটে ধরে উঁচু করে তুলে চুমু খেল। এরপর শক্ত হাতে জেটির ওপর নামিয়ে দিল। ওর জন্য দারুণ কষ্ট হচ্ছিল আমার। আর নিজের জন্যও। যখন ঐ বিশাল দেহ, নিঃসঙ্গ মানুষটা জাহাজী খালাসীদের ভেতর দিয়ে স্টিমারে ফিরে যাচ্ছিল তখন চোখের জল আর লুকোতে পারলাম না।

পরবর্তীকালে এই রকম কতই না সহৃদয়, নিঃসঙ্গ, নিঃসংসার মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার হিসেব নেই।

সাত

দিদিমা আর দাদু আবার চলে এসেছিলেন শহরে। একটা রুক্ষ মেজাজ নিয়ে ফিরে এলাম তাদের কাছে। মন ভারি হয়ে ছিল। কেন ওরা আমাকে চোর বানাল ?

পরম স্নেহে দিদিমা কোলে টেনে নিল আমাকে। তারপরেই চলে গেল সামোভার গরম করতে। কিন্তু দাদু তার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'অনেক সোনা দানা জমিয়েছিস বুঝি ?'

'যা জমিয়েছি তা আমার নিজের।' জানলার পাসে বসে বললাম। একটু পরে বেশ কায়দা করে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ধরালাম।

'ওহো!' আমার প্রতিটি ভাবসাব লক্ষ্য করতে করতে বলে উঠলেন দাদু. 'বটে। এরই মধ্যে ঐ শয়তানের চুরুট ধরেছিস, খুব তাড়াতাড়ি ধরা হল না কি ?'

'তামাকের বটুয়াও আছে আমার।' বললাম সগর্বে।

'তামাকের বটুয়া?' টেনে টেনে বললেন দাদু, 'ধাষ্টাটা কী, আমার পেছনে লাগতে চাস?'

কাঠির মত ক্ষীণ শক্ত হাতদুটো বাড়িয়ে তেড়ে এলেন আমাকে। সবুজ রঙের চোখদুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল। আমি লাফিয়ে তার পেটের মধ্যে এক গুঁতো মরতেই বুড়ো মেঝের ওপরে ধপ্ করে বসে পড়লেন। একই ভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে, ঝুলে পড়া কালো মুখটা হাঁ করে ধীর গলায় বললেন, 'বটে, শেষে আমার গায়ে হাত তুললি তুই—তোর নিজের দাদুর গায়ে? তোর নিজের মায়ের বাপের গায়ে?'

'আমিও অনেক মার খেয়েছি তোমার হাতে।' কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে বিড়বিড় করে বললাম।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাদু আমার পাশে এসে বসলেন। হাত থেকে সিগারেটটা ঝপ্ করে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন।

'ওরে বেকুব। জানিস না, যদ্দিন বেঁচে থাকবি এর জন্য আর কোনদিন ভগবান তোকে মার্জনা করবেন না?' ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন। তারপর দিদিমাকে বললেন, 'ভাবো দেখি একবার ভারুাশার মা! ও কি না আমাকে মারল। ও মারল। জিজ্ঞেস কর ওকে, 'সত্যি না মিথ্যে।'

আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ধার না ধেরে আমার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল দিদিমা, 'তার ফলটা দেখুক কেমন! কেমন!' বলল দিদিমা।

দিদিমার মারে আমার গায়ে কিছু ব্যথা লাগল না কিন্তু মনে দারুণ আঘাত পেলাম। বিশেষ করে যখন দাদু বিদ্রূপে হেসে উঠলেন। চেয়ারের ওপরে লাফা-লাফি শুরু করলেন তিনি, হাঁটুর ওপরে চাপড় মেরে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে বলতে লাগলেন, 'ঠিক হয়েছে! উচিত শিক্ষা।'

দিদিমার মুঠো থেকে চুল ছাড়িয়ে আমি ছুটে দোরের পথে গিয়ে হতাশায় আর দুঃখে এক কোণে শুয়ে পড়লাম। আর শুনতে লাগলাম সামোভারের শোঁ শোঁ শব্দ।

বেরিয়ে এল দিদিমা। নুয়ে কানের কাছে মুখ এনে অস্পষ্ট স্বরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'নে হয়েছে ওঠ। আমি তোকে সত্যি সত্যি মারিনি, মেরেছি? কেবল-মাত্র দেখাবার জন্যে করেছি ওটুকু। উপায় কি বল। আর যাই হোক না কেন তোর দাদু বুড়ো মানুষ। তাকে তোর মান্য করা উচিত। ওরও হাড়িড চুর হয়েছে—ভেঙে পড়েছে। দুঃখে কষ্টে ওকে কখনো তুই আর আঘাত দিস না। এখন আর ছোট্টটি নোস, বুঝতে পারিস সব। তোকে বুঝতে হবে আলিওশা। ও এখন একটা বুড়ো খোকা।'

দিদিমার কথাগুলো উষ্ণ জলের ধারার মত আমার সর্বশরীর স্নিগ্ধ করে দিল। অন্তরের সব ব্যথা বেদনা মুছে দিল। পরিবর্তে নিদারুণ লজ্জা জেগে উঠল আমার। দৃঢ় আলিঙ্গনে দিদিমাকে জড়িয়ে দুজন দুজনকে চুমু খেলাম।

'যা, ভেতরে যা ওর কাছে। দেখবি'খন সব ঠিক হয়ে গেছে। তবে দেখিস হঠাৎ যেন আবার ওর সামনে সিগারেট ধরাসনা আগের মত। সহ্য করার সময় দে একটু।'

ঘরে ঢুকে দাদুকে দেখে আর হাসি চাপতে পারছিলাম না। কচি শিশুর মত আহ্লাদে ডগমগ হয়ে আছেন। মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। পা দাপড়াচ্ছেন। বড় বড় লাল চুলে ভরা হাত দুটো দিয়ে টেবিল চাপড়াচ্ছেন।

'কি, ফের গুতোতে এসেছিস নাকি রে, খুদে ছাগল, অ্যাঁ? ব্যাটা খুদে ডাকাত! ঠিক বাপেরই মত। বাড়িতে ঢুকে ক্রুশ না করে আগেই সিগারেট ধরান হয়েছে, কেমন! আরে ছ্যা, ব্যাটা এক কোপেকের বোনাপার্ট!'

কোন উত্তর দিলাম না তার কথার। কথা ফুরোলে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন। কিন্তু চা খাবার সময় আবার আমাকে জ্ঞান দিতে লাগলেন, 'ঘোড়ার যেমন লাগাম প্রয়োজন, মানুষেরও তেমনি প্রয়োজন ভগবানের ভয়। ভগবান ছাড়া কেউ আর আমাদের বন্ধু হতে পারে না। মানুষ হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।'

মানুষ মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু—কথাটার সত্যতা আমার মনে লাগল। কিন্তু তার অন্য কোন কথায় কান দিলাম না।

'তোর মাত্রিওনা দিদিমার কাছে আবার তোকে কাজ করতে যেতে হবে। তারপর বসন্তকাল এলে ফের জাহাজের কাজে ফিরে যাস। শীতকালটা ওদের কাছে পার করে আয়। কিন্তু খবর্দার জানাসনি যে বসন্তকালে ছেড়ে আসবি।'

'কেন মানুষকে ঠকাবে?' বলল দিদিমা। কিন্তু, এইমাত্র কিছু আগেই দাদুকে ধোকা দিয়েছিল সে মিথ্যে মিথ্যে আমার চুল টেনে।

'মানুষকে ধোঁকা না দিয়ে বাঁচা যায় না,' জোর গলায় বললেন দাদু, 'কেউ পারে না।'

সেদিন সন্ধ্যায় দাদু যখন প্রার্থনা-সঙ্গীত পড়তে শুরু করলেন, তখন দিদিমা আর আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের ভেতরে চলে গেলাম। ছোট্ট দুটো মাত্র জানলাওলা যে কুঁড়ে ঘরটায় দাদু থাকেন আজকাল, সেটা হচ্ছে শহরের কোণে কানাৎনায়া স্ট্রীটের শেষে। এক সময় এখানে তার নিজের একটা বাড়ি ছিল।

'দেখ একবার, আমরা আবার কোথায় উঠে এসেছি!' হাসতে লাগল দিদিমা। 'কোথাও গিয়ে তোর দাদু মনের শান্তিতে টিকতে পারে না। তাই কেবলই আজ এখানে কাল ওখানে এই করে বেড়াচ্ছে। এটাও অবশ্য ওর পছন্দ নয়, তবে আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছে।'

সামনে ভার্স্ট দুই পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ। ঘাসে ছাওয়া। মাঝে মাঝে খাদ কাটা। শেষপ্রান্তে কাজান পথের সারি সারি বার্চ গাছ। খাদের ভেতর থেকে জেগে ওঠা কাঠির মত আগাগুলোর ওপরে অস্তাচলের উত্তাপহীন আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে রক্তমাখা চাবুকের মত দেখাচ্ছে। সন্ধ্যার হালকা বাতাসে ঘাসগুলো দুলছে। আর তারই সঙ্গে দুলছে সামনের খাদের ওপারে শহর থেকে আসা তরুণ-তরুণীর চলমান যুগল ছায়ামূর্তি। দূরে ডানদিকে বিরোধী-মতাবলম্বীদের লাল দেয়াল। ওটা বুগরভস্কি আশ্রম বলে পরিচিত। আর বাঁয়ের দিকে যেখানটায় কালো হয়ে গাছগুলো গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে আছে সেখানে ইহুদিদের কবরস্থান। সব কিছুই যেন জীর্ণ দীনহীন। ভাঙাচোরা মাটি আঁকড়ে সব কিছুই যেন নিঝুম হয়ে আছে। শহরের শেষ সীমানার এই কুঁড়ে ঘরের জানলাগুলো যেন ধুলো ভর্তি পথের দিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মারছে। কতকগুলো না খেতে পাওয়া রোগা মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তাটায়। দেভিচি কন্‌ভেন্টের সামনে দিয়ে

হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে গরুর পাল যাচ্ছে। কাছের কোন ছাউনি থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধের বাজনা—জয় ঢাকের উচ্চশব্দ, শিঙার ধ্বনি।

টালমাটাল পায়ে পায়ে পথ বেয়ে চলেছে একটা মাতাল। একর্ডিয়ানটা জোরে আঁকড়ে ধরে নিজের মনে বিড়বিড় করছে, 'দাঁড়া, পৌঁছব গিয়ে নির্ঘাত…

'কার কাছে যাচ্ছিস রে বেকুফ্? অস্তাচলের সূর্যের রক্তিম আলোর দিকে তির্যক তাকিয়ে বলল দিদিমা, 'এক্ষুণি তো রাস্তায় পড়ে ঘুমে অজ্ঞান হবি। আর ঘুমের মধ্যে তোকে ওরা উলঙ্গ করে সবকিছু নিয়ে যাবে…। এমন কি তোর ঐ এত সাধের একর্ডিয়নটা পর্যন্ত ··

দিদিমার কাছে জাহাজী জীবনের কাহিনী বলতে বলতে আমি এদিক সেদিক দেখছিলাম। যে সব দৃশ্য দেখে এসেছি তার চেয়ে বর্তমানের এই পরিবেশ কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছিল। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। একান্ত একাগ্র মনে দিদিমা আমার কথা শুনছিল, যেমন করে আমিও শুনি তার মুখের কাহিনী। তারপর যখন চুরির কথা বললাম, শুনে দারুণ খুশি হয়ে উঠে ক্রুশ করে বলল, 'আঃ চমৎকার, খুব ভাল মানুষ। মেরী মাতা ওকে আশীর্বাদ করুন! ওকে তুই যেন ভুলিস না কখনো! ভাল যা সবসময়েই তা মনের ভেতরে গেঁথে রাখবি। আর যা কিছু মন্দ দূর করে দিবি মন থেকে…'

কেন যে জাহাজের কাজ থেকে ছাড়া হয়েছে আমাকে সে কথাটা কিছুতেই বলতে পারছিলাম না। শেষে দাঁত মুখ চেপে কোনরকমে বলে ফেললাম কথাটা। শুনে দিদিমার মনে এতটুকুও ভাবান্তর হল না।

'এখনো ভারি ছোট আছিস, তাই সংসারে কেমন করে চলতে হয় তা শিখিসনি এখনো।' একান্ত নির্লিপ্তভাবে বলল দিদিমা।

'সবাইকে বলতে শুনি যে সংসারে কেমন করে চলতে হয় তা তারা শেখেনি। চাষীরা বলে, জাহাজীরা বলে, মাত্রিওনা দিদিমাও বলে তার ছেলেকে প্রায়ই। কিন্তু শেখার কী আছে এর ভেতরে?'

ঠোঁট চেপে দিদিমা মাথা নাড়তে লাগল।

'তা জানি না আমি।' বলল দিদিমা।

'কিন্তু তুমিও তো বলে থাকো প্রায়ই।'

'কেন বলব না বল?' ধীর স্বরে বলল দিদিমা, 'কিন্তু তার জন্য মনে দুঃখ করিস না। এখনো তুই নেহাৎ ছোট। কেমন করে সংসারে চলতে হয় এই বয়সেই তোর পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া কেইবা জানে? কেবল যারা চোর তারা জানে। যেমন ধর তোর দাদু—চালাক চতুর মানুষ, কিছু বিদ্যেও আছে, কিন্তু কোন উপকারেই তো তা এল না।'

'আচ্ছা, তুমি কখনো জীবনে সুখের মুখ দেখেছ?'

'আমি? হাঁা, নিশ্চয়ই। সুখেরও দেখেছি, দুঃখেরও দেখেছি। পালা করে চলে…'

পেছনে লম্বা ছায়া টেনে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। ধোঁয়ার মত ধুলো উড়ছে পায়ে পায়ে। যেন ঐ ছায়াগুলোকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। সন্ধ্যার বিষণ্ণতা আরো ঘন হয়ে এসেছে। জানলার পথে ভেসে আসছে দাদুর অনুযোগভরা গলার স্বর, 'সবখানি বিদ্বেষ আমার ওপর ঢেলে দিয়ো না, প্রভু। আমার যতটুকু শক্তি সেই মত আমাকে শাস্তি দাও…।'

দিদিমা একটু হাসল।

'ঈশ্বরের কান ঝালাপালা হল, তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছেন নিশ্চয়ই ওর ওপরে,' বলল দিদিমা, 'প্রতি সন্ধ্যায় এমনি করে বিড়বিড় করে। কিন্তু কিসের জন্যে শুনি? ওর মত বুড়োর পক্ষে চাইবার তো কিছুই নেই। তবুও এমনি সব সময় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্‌প্যান্ করেই চলেছে। সন্ধ্যায় যখনই ওর গলার আওয়াজ পান, হেসে ওঠেন নিশ্চয়ই ঈশ্বর: ঐ ফের শুরু করেছে ভাসিলি কাশিরিন!—হুঁ। চল, এখন আমরা শুয়ে পড়িগে।'

ঠিক করলাম গাইয়ে পাখি ধরব। মনে হল জীবিকা অর্জনের ওটা ভাল উপায় একটা। আমি পাখি ধরব, আর দিদিমা বিক্রি করবে। ভেবে একটা জাল, আংটা আর ফাঁদ কিনে আনলাম। খাঁচা তৈরি করলাম কয়েকটা। তারপর ভোরের সময় একটা খাদে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। থলে আর ঝুড়ি নিয়ে দিদিমা আশপাশে বনের ভেতরে শেষ ফলনের ব্যাঙের ছাতা, বেরি আর বাদাম খুঁজতে লাগল।

শরতের ক্লান্ত সূর্য সবেমাত্র উঠেছে। ম্লান আলোর রেখা কখনো মেঘের কোলে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনোবা রূপোলি পাখা মেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার লুকিয়ে থাকা ঝোপের ওপরে। খাঁদের ভেতরে এখনো ঘন অন্ধকার। জেগে উঠছে শাদা কুয়াশা। খাদের একটা পাড় ভিজে, কাদা পিছল। ঘাস লতাহীন, শূন্য, অন্ধকার। অন্য পাড় অল্প ঢালু, ঘাস ভর্তি। উজ্জ্বল লাল হলুদ আর বাদামী পাতায় ভরা ঝোপ। সে পাতা বাতাসে ঝরে ঝরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে খাদময়।

তলায় শেয়াকুলের ঝোপের ভেতরে কিচ্‌মিচ্ করছে মুনিয়া পাখি। শীর্ণ পাতার ফাঁকে তাদের গর্বোন্নত ছোট ছোট মাথার ওপরের লাল লাল ঝুঁটি দেখতে পাচ্ছি। ছুটির দিনে ফুনাভিনোর ছুঁড়িদের মত শাদা শাদা গাল ফুলিয়ে সন্ধানী কণ্ঠে আমাকে ঘিরে সোরগোল তুলেছে ছোট ছোট চটক পাখি। ওরা চঞ্চল, চতুর, —জানতে চায় সবকিছু; সব কিছুই চায় ছুঁয়ে ছেনে দেখতে। তাই একটার পর একটা আমার ফাঁদে ধরা পড়তে লাগল। ওদের ছট্‌ফটানী দেখে দুঃখ লাগে। কিন্তু না, আমাকে নির্বিকার হতেই হবে। রোজগারে নেমেছি আমি। ফাঁদ থেকে তুলে এনে পাখিগুলোকে একটা খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে থলে চাপা দিয়ে রাখলাম যাতে শান্ত হয়ে চুপটি করে থাকে। এরই জন্য খাঁচাটা এনেছিলাম।

রোদমাখা মেহেদি ঝোপে উড়ে এসে বসল এক ঝাঁক হরবোলা। সূর্যের আলোয় ভীষণ খুশি হয়ে পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেদের মত আনন্দে কিচির মিচির করছে। একটা হাঁড়িচাচা কাঁটা গোলাপের দোলান ডালের ওপরে এসে বসেছে। দক্ষিণ অঞ্চলে উড়ে যাওয়া হয়নি আর। ঠোঁট পরিষ্কার করতে করতে কালো চক্‌চকে দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে শিকারের সন্ধানে। হঠাৎ ভরত-পাখির মত উড়ে বড় গোছের একটা মৌমাছি ধরে আনল। তারপর মৌমাছিটাকে কাঁটায় গেঁথে ধূসর রঙের মাথাটা নেড়েচেড়ে চোরের মত উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল। নিঃশব্দে একটা খঞ্জন উড়ে গেল। ওর একটা যদি ধরতে পারতাম! মনে মনে দারুণ আশা। লাল সেনাপতির মত গর্বভরা ভঙ্গিতে দল ছেড়ে উড়ে বার্চ ঝোপে বসল একটা সদা-সোহাগী। লেজ নাচাতে নাচাতে মিষ্টি কণ্ঠে শুরু করল গাইতে।

বেলা হবার সাথে সাথে পাখির ঝাঁকও বাড়তে লাগল। আর ততই আনন্দ-

মুখর হল তাদের গান। সমস্ত খাদটা সঙ্গীতে ভরে উঠল। আর তারই সঙ্গে তাল রেখে চলেছে হাওয়ায় কাঁপা বনের অবিশ্রাম মর্মর ধ্বনি। পাখিদের অবিরাম কূজনের তলেও এই কোমল ব্যথা-মধুর বন-মর্মরকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এরই ভেতর দিয়ে যেন গ্রীষ্ম-ঋতুর বিদায় সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। সে সঙ্গীত যেন ফিস্‌ফিস্ করে মর্মগাথা কথা কইছে, কথাগুলো যেন নিজের থেকেই কবিতার স্তবকের মত ফুটে উঠছে। আর আমার মনে জাগিয়ে তুলছে অতীতের যত কথা, আর স্মৃতি।

ওপরের কোথা থেকে দিদিমা ডাক দিল, 'কই রে, কোথায় গেলি?'

খাদের পাড়ের সামনে রুমাল পেতে বসেছে দিদিমা। রুমালের ওপরে রুটি, আচার, কয়েকটা আপেল। এইসব খাবার-দাবারের ভেতরে ঝক্‌ঝক্ করছে নেপোলিয়ানের মাথার মত দেখতে একটা কাচের ছিপি আঁটা ছোট পলা-কাটা কাচের কুঁজো। তার ভেতরে রয়েছে কিছুটা ভদ্‌কা—সেন্ট জন লতার গন্ধ মেশানো।

'হে প্রভু, সব কিছুই কি চমৎকার!' কৃতজ্ঞতার সুরে দিদিমা বলে উঠল।

'আমি গান বেঁধেছি একটা।'

'তুই নিজে? সত্যি?'

এই রকম কয়েকটা লাইন আবৃত্তি করলাম:

'শীতের সময় আসে
ফুলেরা বিদায় চায়
স্তিমিত রবির রাগে
নিদাঘ মরিয়া যায়।...'

সবটা না শুনেই দিদিমা বলে উঠল, 'ঠিক এমনি আর একটা গান আছে। তবে সেটা আরো ভাল।' এই বলে, তার সুরেলা কণ্ঠে সে আবৃত্তি করতে লাগল:

'গোধূলি সূর্য ধীরে ঢলে পড়ে
বুলবুলি পাখা মেলে,
একাকিনী ঐ কুমারী আত্মা
ফাল্গুনী কান্না ভরে।
সকালের পথে সঙ্গীবিহীন
সেই বসন্ত স্মরণে,
ডেকেছিল প্রিয়, হিমেল আকাশে
বাতি নিভে যায় কপালে।
সন্ত কুমারী প্রিয় ভগিনীরা
উত্তুরে ঝড়ো মুখে,
দাবদাহ ভরা এ হৃদয় তলে
তুষার সমাধি জ্বলে।'

আমার কবি মন একটুকুও আহত হল না। খুব ভাল লাগল দিদিমার মুখের ঐ গানটা। মেয়েটির দুঃখে হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল।

'দুঃখের গান গাইতে হয় এমনি করেই!' বলল দিদিমা, 'গানটা গেয়েছিল ঐ মেয়েটি। গোটা বসন্তকাল ভালবাসার মানুষটার সঙ্গে ঘুরেছে ফিরেছে মাঠে ঘাটে। কিন্তু শীত এল যখন মেয়েটিকে একা ফেলে চলে গেল তার মনের মানুষ। হয়ত চলে গেল অন্য কোন প্রেমিকার খোঁজে। বুক ফাটা দুঃখে কাঁদতে লাগল

মেয়েটি। নিজে না সইলে কি গান গাওয়া যায়। দেখ দেখি, কী চমৎকার গান বেঁধেছে মেয়েটি!'

প্রথমবারেই কয়েকটা পাখি বিক্রি করে চল্লিশ কোপেক পেয়ে ভারি অবাক হল দিদিমা, 'কাণ্ডখানা দেখ! আমি তো মনে করেছিলাম কিচ্ছু হবে না এতে—নেহাৎ ছেলেমানুষী ঝোঁক। কিন্তু দেখ, কী রকম লাভ হল!'

'তবুতো তুমি খুব কমে বেচেছ।'

'তাই নাকি?'

হাটের দিনে দিদিমা একটা রুবল কিংবা তারও বেশি রোজগার করে আরো অবাক হয়ে যেত। তুচ্ছ জিনিসেও কত না টাকা আসে।

'মাত্র পঁচিশ কোপেকের জন্যে কেন এক একটা মেয়েছেলে সারাদিন কাঁথা কাপড় কাচে, ঘর নিকোয়! এর কোন মানে হয় না! অন্যায়! আর পাখি ধরে খাঁচায় আটকে রাখাও অন্যায়। এ কাজ ছেড়ে দে তুই আলিওশা!'

কিন্তু আমি পাখি ধরায় জমে উঠেছিলাম। খুব মজা লাগত আমার। এতে পাখিগুলোকে একটু অসুবিধায় ফেলা ছাড়া আর কারুর কোন ক্ষতি না করে নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখে চলা যেত। আরো ভাল সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে তৈরি হলাম। পাখি ধরায় অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনে নিলাম অনেক কিছু। একা একা তিরিশ ভার্স্ট পর্যন্ত চলে যেতাম। কখনো কস্তোভস্কি বনে, কখনোবা ভল্‌গার পাড় ধরে। সেখানে উঁচু উঁচু পাইন বনের ভেতরে ধরতাম মুনিয়া বা বিশেষ এক জাতের শুকপাখি—শাদা, লম্বা লেজ, ভারি সুন্দর। পাখি যারা ভালবাসে তারা খুব চড়া দাম দিয়ে কিনে নেয়।

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়তাম। তারপর সারা রাত ঘন ঘন শরতের বৃষ্টি বাদল আর এক হাঁটু কাদা-জমা কাজানের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। পিঠে অয়েলক্লথের থলেতে থাকত পাখি ধরা ফাঁদ, খাঁচা আর কিছু টোপ। হাতে বাদাম গাছের একটা মোটা লাঠি। শরতের অন্ধকার রাত—যেমন শিরশিরে শীত, তেমনি ভয়ঙ্কর। রাস্তার ধারে বাজে পোড়া বুড়ো বার্চ। ভিজে ডালগুলো ঝাঁপিয়ে নুয়ে পড়ত আমার মাথায়। বাঁয়ে ভলগার দিকে পাহাড়ের নিচ দিয়ে কখনো কখনো দেরিতে আসা ষ্টিমার বা গাধাবোটের মাস্তুলের আলো ভেসে যেত। মনে হত ওগুলো যেন এক সীমাহীন অন্ধ গভীরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ষ্টিমারের বাঁশী, জল কেটে চলা চাকার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শুনতে পেতাম।

পথের ধারে লোহার মত কঠিন মাটির ওপরে গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলো পার হবার সময় হিংস্র ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ত পায়ের কাছে। চৌকিদারেরা ঝুমঝুমি বাজিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠত, 'কে যায়? রাতবিরেতে নাম করতে নেই যার সেই শয়তান এত রাতে কাকে টেনে এনেছে রে বাবা?'

পাছে আমার ফাঁদ নিয়ে নেয়, তারজন্য সব সময়েই পাঁচ কোপেকী পয়সা রাখতাম হাতে চৌকিদারদের ঘুষ দিতে। ফকিনো গাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলাম। আমার কীর্তি কাণ্ড দেখে সে তো অবাক।

'তুই আবার এসেছিস? ভয়-ডর নেই! কী চঞ্চল নিশাচর ছেলে রে তুই!'

ওর নাম নিফন্ত। লোকটা দেখতে ছোটখাটো, বুড়ো সাধু-সন্ন্যাসীর মত। একটা শালগম বা আপেল, কখনোবা এক মুঠো মটরশুঁটি পকেট থেকে তুলে

আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলত, 'এই নে, ধর দোস্ত, তোর জন্যে রেখেছিলাম। খেয়ে খুশি হবি আশা করি।'

তারপর হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসত।

'আচ্ছা চলি এবার। ঈশ্বর তোর সঙ্গে থাকুন।'

ভোর ভোর বনে পৌঁছতাম। ফাঁদ পেতে টোপ ঝুলিয়ে দেবার পর দিনের আলো ফুটে ওঠার অপেক্ষায় বনের ধারে গিয়ে শুয়ে থাকতাম। নিঝুম নিস্তব্ধ। আমাকে ঘিরে সবকিছুই শরত রাতের গভীর ঘুমে যেন অচেতন। অন্ধকার কালো পাহাড়ের নিচে অস্পষ্টভাবে দেখা দিচ্ছে সুদূরপ্রসারী মাঠ। মাঝ থেকে দুভাগ করে বয়ে যাচ্ছে ভলগা নদী। ঘন কুয়াশায় মাঠের শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গেছে। বন থেকে দূরে, বহুদূরের মাঠের শেষে দিগন্তের কোল ঘেঁসে ধীরে সূর্য্য উঠছে বনের কালো কেশরে আগুন লাগিয়ে। পরক্ষণেই অন্তর মথিত এক আলোড়ন জেগে উঠত। সূর্যের আলোয় রূপোলি দীপ্তিতে ঝিল্‌মিল্‌ করে ঘন কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে যতই দ্রুত ওপরে উঠত ততই তার তলায় মাটির বুকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠত গাছপালা ঝোপঝাড় আর খড়ের গাদা। মনে হত সূর্যের তাপে যেন মাঠগুলো গলে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে সোনালী স্রোত। ইতিমধ্যে নদীর শান্ত জলের বুকে লেগেছে আলোর ছোঁয়া, মনে হত বুঝিবা সমস্ত নদীর জল ধেয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে, যেখানে পড়েছে ঐ সোনালী আঙুলের উষ্ণ স্পর্শ। সোনার থালাটা যতই উপরে উঠতে থাকত, ততই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত আনন্দঘন আশীর্বাদ। হাড় কাঁপানো হিম পৃথিবীকে কোমল উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলত, আর গভীর কৃতজ্ঞতায় পৃথিবী শরতের সুমধুর গন্ধভরা নিঃশ্বাসে আহ্লাদিত করে তুলত চারদিক। স্বচ্ছ বাতাসের ভেতর দিয়ে তাকালে মনে হত পৃথিবীটা বিশাল, সীমাহীন। সব কিছুর ভেতরই জেগে উঠত যেন সুদূরের পিপাসা—পৃথিবীর ঐ সীমাহীন নীল সীমান্তের দিকে আকৃষ্ট করত মনকে। অনেক অনেক বার এখান থেকে সূর্যোদয় দেখেছি আমি। কিন্তু প্রতিবারেই আমার চোখে জন্ম নিয়েছে এক নতুন পৃথিবী—এক অনন্যা অপূর্ব সুন্দরী পৃথিবী।

কেন জানি সূর্যের প্রতি আমার অন্তরে জেগে আছে এক অদ্ভুত ভালবাসা। নামটা পর্য্যন্ত আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে তার মিষ্টিমধুর অপূর্ব ঝঙ্কারময় উচ্চারণ। ভাঙা বেড়ার ফাটল দিয়ে কিংবা গাছের ঘন ডালপালার ফাঁক দিয়ে তলোয়ারের মত যখন বিঁধে এসে পড়ে সূর্যের আলোর রেখা চোখ বুজে সেই উষ্ণ রেখার দিকে মুখ তুলে থাকতে সাধ চাপে কিংবা দুহাতের মুঠোয় মুখটা চেপে ধরে অদ্ভুত আনন্দে ভরে নেই মন প্রাণ। 'প্রিন্স মিখাইল চেরিনোভস্কি' আর 'বয়ারিন ফিওদরের' ওপরে ভীষণ শ্রদ্ধা দাদুর। সূর্যকে নমস্কার করতে চায়নি ওরা। কিন্তু আমার চোখে ওদের দুর্বৃত্ত মনে হত। জিপসীদের মত কালো কর্কশ স্বভাব ওদের। আর মর্দোভীয় চাষীদের মত চোখ ভর্তি ঘা। মাঠের ওপর দিয়ে যখন সূর্য উঠত, নিজের অজান্তেই আমি হেসে উঠতাম আনন্দে।

মাথার ওপরে শুনতে পেতাম চিরসবুজ গাছগুলোর বনমর্মর। ফোঁটা ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ত। গাছের ছায়ায় ফার্ণ পাতার ঝালরে তুষার কণার রূপোলি কিংখাপ ঝলমলিয়ে উঠত আমার চোখে। বৃষ্টির ঝাপটায় শুকনো ঘাস-গুলো নিথর হয়ে লুটিয়ে পড়ত মাটির বুকে। তবুও সূর্যের আলোর রেখা যখন

এসে পড়ত ওদের গায়ে, মনে হত যেন একটা মৃদু কম্পন দেখা দিচ্ছে ; ওরা যেন শেষ চেষ্টা করছে ওঠার।

পাখিদের ঘুম ভাঙত। ধূসর রঙের ফুলো ফুলো বলের মত গাছের শাখায় শাখায় লাফালাফি করত দোয়েল। পাইনগাছের চিকন মগডালে এসে পড়ত আগুন রাঙা মুনিয়া পাখির ঝাঁক। একটা গাছের ডালের গোড়ার দিকে বসে দুলতে দুলতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আড়চোখে আমার পাতা ফাঁদের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় একটা সদা-সোহাগী। যে বনটা কিছু আগেও গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিল হঠাৎ উপলব্ধি করতাম সেটা যেন শত শত পাখির কলরবে ভরে উঠেছে। সরব হয়ে উঠেছে তাদের কলকাকলীতে যারা পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পবিত্র। তাই পার্থিব সৌন্দর্যের রূপস্রষ্টা মানুষ আপন আনন্দে এদের রূপেই সৃষ্টি করেছে অপ্সরা, পরী আর কিন্নর-কিন্নরীদের। সৃষ্টি করেছে যত দেবদূতদের।

পাখি ধরতে কষ্ট হত আমার ; খাঁচায় ঢুকিয়ে বন্দী করে রাখা আরো লজ্জাকর। কেবলমাত্র ওদের চোখে তাকালেই আনন্দে আমার প্রাণ মন ভরে উঠত। কিন্তু আমার করুণা চাপা পড়ত শিকারীর উৎসাহ আর পয়সা রোজগারের আশায়।

পাখিগুলোর চালাকি দেখে দারুণ মজা লাগত আমার। একটা নীল দোয়েল খুব মনোযোগ দিয়ে ফাঁদটাকে দেখল খানিকক্ষণ। বিপদ আছে টের পেয়ে সন্তর্পণে একপাশ দিয়ে এগিয়ে খুব চতুরতার সঙ্গে কাঠি দুটোর ভেতর থেকে দানা তুলে পালাল। ওরা খুব চালাক হলেও কৌতূহল-প্রবণ। আর তাতেই ওদের মরণ আসে। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির মুনিয়া পাখিগুলো বোকা। গোটা দলটাই এসে ঢুকে পড়ে হয়ত আমার জালের ভেতরে—যেমন ভাবে মোটা-সোটা ধনী লোকেরা গির্জেয় গিয়ে ঢোকে। ফাঁদের মুখ ঢেকে দিতেই ভারি অবাক হয়ে যায় ওরা। চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। আর পুরু পুরু ঠোঁট দিয়ে আমার আঙুল ঠোকরাতে আসে। খঞ্জনগুলো খুব ধীর গম্ভীর কায়দায় জালে এসে ঢোকে। নীলকণ্ঠগুলো আজব পাখি। ফাঁদের সামনে এসে চওড়া লেজের ওপরে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকবে। তারপর লম্বা লম্বা ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে একবার এদিক একবার সেদিক নাড়তে থাকবে। ওদের স্বভাব কাঠঠোকরার মত গাছের গুঁড়িতে ওপর নিচ করে লাফা-লাফি করা আর তাড়া করে দোয়েলগুলোকে বেড়ান। এই ছোট্ট ধূসর রঙের পাখিগুলো নিয়ে একটা ভীতিজনক ব্যাপার আছে। এরা নিঃসঙ্গ। কোন পাখিই ওদের পছন্দ করে না বা ওরাও কাউকে পছন্দ করে না। ছাতারের মত ওরা চকচকে খুদে কিছু দেখলেই ঠোঁটে তুলে পালিয়ে যায় চুপিচুপি।

দুপুরের দিকে কাজ শেষ করে বন আর মাঠের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। গাঁয়ের ভেতরের বড় রাস্তা দিয়ে ফিরলে অন্য ছেলেরা বা গুণ্ডা বদমাশেরা আমার খাঁচা কেড়ে নিত, ফাঁদ দিত ভেঙে। এ শিক্ষা তিক্ত অভিজ্ঞতায় হয়েছিল আমার।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতাম। তবু কিছু যে লাভ করছি আর শক্তিতে জ্ঞানে যে বড় হচ্ছি এই উপলব্ধিতে আমার অন্তর ভরে উঠত।

এই নতুন আনন্দময় চেতনাই আমাকে ধীরস্থিরভাবে দাদুর বিদ্রূপ সহ্য করতে শক্তি যোগাত। দেখে শুনে কঠোর সুরে উপদেশ দিতেন দাদু, 'ঢের হয়েছে, যত সব বাজে ব্যাপার। ঢের হয়েছে আমি তোকে বলে দিচ্ছি। পাখি বেচে কেউ কোন দিন সংসারে বড় হতে পারে না। কিছু একটা ঠিক করে লেগে পড়।

মাথা খাটিয়ে বড় হতে চেষ্টা কর। আজে-বাজে কাজ নিয়ে জমে থাকার জন্যে তো মানুষ গড়া হয়নি। মানুষ ঈশ্বরের বীজ, ভাল শস্য জন্মে যাতে তার জন্যেই সৃষ্টি। মানুষ হল টাকার মত—ভাল কাজে লাগলে তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে। ভাবছিস বেঁচে থাকাটা খুবই সহজ? ভীষণ শক্ত। সংসারটা একটা অন্ধকার রাত, এখানে প্রত্যেককেই তার নিজের আলো নিজেকে জ্বালিয়ে নিতে হয়। আমাদের সকলেরই আঙুল তো মোটে দশটা, কিন্তু সকলেই চাই যত পারি হাত বাড়াতে, যত পারি থাবা দিয়ে ধরতে। হয় বল থাকা চাই, নয় বুদ্ধি। যারা দুর্বল, ক্ষীণজীবী—তাদের কিছু হয় না। সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতই চলবি, কিন্তু মনে রাখবি তুই একা। কিন্তু বিশ্বাস করবি না কারুর কথা। নিজের চোখে দেখলেও জানবি লোকে ওজনে কম দিয়েছে। মুখ বুজে থাকবি। কথা দিয়ে তো আর শহর নগর গড়ে ওঠেনি। উঠেছে টাকা আর হাতুড়ির ঘায়ে। উকুন আর ভেড়া নিয়ে যারা জীবন কাটাত তাদের মত তুই তো আর বাশ্‌কিরীয় বা কালমীক নোস!'

সারা-সন্ধ্যা এমনি ভাবে বকবক করতেন। কথাগুলো আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো শুনতে বেশ লাগত আমার। কিন্তু তার অর্থ সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগত। তার সমস্ত কথার ভেতর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তেই গিয়ে পৌঁছেছিলাম যে সংসারে দুটো শক্তি আছে যা নাকি জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, তা হল ঈশ্বর আর মানুষ।

জানলার কাছে বসে লেস বোনার সুতো কাটত দিদিমা। তার নিপুণ আঙুলগুলোর ভেতরে বন্‌বন্‌ শব্দ করে ঘুরত তকলি। কিছুক্ষণ চুপ করে দাদুর কথা শোনা হলে বলে উঠত, 'মেরী মাতার ইচ্ছে তাই তো হবে।'

'তার মানে?' খেঁকিয়ে উঠতেন দাদু—'ঈশ্বর! ঈশ্বরের কথা আমি ভুলে যাইনি। আমি ঠিকই জানি ঈশ্বরকে। ভাবিস আমাদের এই জগৎটা ঈশ্বর কেবল হাবা লোক দিয়ে ভরে রেখেছেন,—যেমন তুই একটা বেকুব বুড়ি!'

ভাবতাম দুনিয়ায় সৈনিক আর কসাকদের মত সুখী আর কেউ নয়। ওদের সাদাসিধে ফূর্তির জীবন। রোদেভরা সুন্দর ভোরে ওরা জমা হত আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে পাহাড়ী খাদটার ওপারে। তারপর মাঠের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে দারুণ উত্তেজনাময় এক জটিল খেলায় মেতে উঠত। শাদা সার্ট গায়ে ঐ শক্ত সবল লোকগুলো রাইফেল হাতে করে আনন্দে মাঠ পার হয়ে খাদের ভেতরে গিয়ে অদৃশ্য হত। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিউগলের শব্দ জেগে উঠলেই 'হুর্‌রা' বলে চিৎকার করে উঠে ছুটত মাঠের ভেতরে। ভয়ঙ্কর শব্দে বেজে উঠত ব্যাণ্ডের বাজনা। আমাদের বাড়ির দিক লক্ষ্য করে সোজা ওরা এগিয়ে আসত। তীক্ষ্ণধার বেয়নেট-গুলো উঠত ঝন্‌ঝনিয়ে। মনে হত শুকনো খড়ের গাদার মত ওরা আমাদের বাড়িটাকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইত।

'হুররা' বলে চিৎকার করে আমিও ওদের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াতাম। ড্রামের সেই ভয়ঙ্কর বাজনার শব্দে কিছু একটা ধ্বংস করার, টান মেরে বেড়া ভেঙ্গে ফেলার বা কাউকে ধরে মারধোর করার এক অদম্য ইচ্ছে আমার মনে জেগে উঠত।

ছুটির সময়ে সৈনিকেরা আমাকে তামাক পাতার চুরুটটা টানতে দিত। তাদের ভারি রাইফেলগুলো খুলে দেখাত। কেউবা হাতের বেয়নেটটা আমার

পেটের দিকে তাক করে অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে উঠত, 'গেঁথে ফেল আরশুলাটাকে!'

রোদের ভেতর বেয়নেটটা চক্চক্ করত। মনে হত ছোবল দেয়ার আগে যেন জ্যান্ত একটা সাপ ফণা তুলে আছে। দারুন ভয় পেতাম, তবু আনন্দ হত।

একটা মর্দোভীয় ছেলে আমাকে ড্রামের কাঠি চালান শিখিয়ে দিল। প্রথমে সে আমার হাতটা মুচড়ে দিল। হাতটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে অবশ হয়ে আসা আঙ্গুলগুলোর ভেতরে গুঁজে দিল কাঠিটা!

'বাজা! একবার, তারপর আবার,—একবার, তারপর আবার। বাঁয়াটা আস্তে, ডাইনেটা জোরে!' পাখির মত চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠত ছেলেটা।

কুচকাওয়াজ না থামা পর্যন্ত আমি ওদের পেছন পেছন বেড়াতাম। ওদের সঙ্গে মার্চ করতে করতে সমস্ত শহরটা ঘুরে ছাউনিতে গিয়ে উঠতাম। শুনতাম ওদের ভরাট গলার গান। প্রসন্ন মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। এমন নতুন আর উজ্জ্বল লাগত যেন টাঁকশাল থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে আসা মুদ্রা।

এই লোকগুলো যখন দল বেঁধে ফুর্তি করে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে চলত, তখন আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যেত। নদীর জলে ডুব দেয়ার মত ওদের দলের ভেতর ডুবে যাওয়ার এক অদম্য ইচ্ছে আমার মনে জেগে উঠত। সাধ হত বনে ঢোকার মত ওদের ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়ি। কোন কিছুকে ওরা ভয় পায় না। সাহসের সঙ্গে সব কিছুর দিকেই তাকায় চোখ মেলে। সবকিছুই জয় করতে পারে। যা কিছু ওদের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছে করলেই পেতে পারে তা। আর সব থেকে বড় কথা ওরা সরল আর হৃদয়বান।

একদিন অবসরের সময় তরুণ এক ননকমিশন্‌ড অফিসার আমাকে মোটা সিগারেট খেতে দিল একটা, 'খাও। বিশেষ ধরণের সিগারেট এটা। তুমি বলেই দিচ্ছি, অন্য আর কেউ হলে দিতাম না। তুমি খুব ভাল ছেলে তাই।'

সিগারেটটা ধরাতেই সে দুপা পেছিয়ে গেল। একটা লাল আলো হঠাৎ ঝিলিক্ দিয়ে উঠে আমার চোখদুটো ধাঁধিয়ে দিল। হাতের আঙ্গুল, নাক, আর ভ্রূ ঝলসে গেল। ধূসর ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় দারুণভাবে হাঁচতে আর কাশতে লাগলাম। কানার মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাপাদাপি করলাম আমি আর সৈনিকরা ভিড় করে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। দারুণ মজায় হাসল হো হো করে। বাড়ি ফিরে এলাম। ফিরবার সময় পেছনে শুনতে পেলাম ওদের অট্টহাসি, শিস আর রাখালের চাবুক চালানর মত হিস্‌হিস্ শব্দ। আমার আঙ্গুলগুলো জ্বলছিল। জ্বালা করছিল মুখ! দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এই ব্যথার চাইতেও একটা বেদনাভরা হতবাক বিস্ময়ে আমার অন্তর জর্জরিত হয়ে উঠল। কেন ওরা এমন করল আমার সঙ্গে? এমন ভাল লোক সব কিন্তু কি ফুর্তি পেল ওরা এতে। বাড়িতে ফিরে ছাদের ওপরে উঠে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগলাম, আমার এই ছোট্ট জীবনটুকুর মধ্যে ঘটে যাওয়া যত সব অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার কথা।

বিশেষ করে সারাপুলের সেই ছোট্ট শীর্ণ সৈনিকের কথা স্পষ্ট ভেসে উঠল আমার মনে। জীবন্ত হয়ে সে যেন ফিরে এল আমার কাছে, যেন বলল, 'কি হে, এবার দেখলে তো?'

কিন্তু কদিন পরেই এর চাইতে নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক একটা ব্যাপার ঘটতে দেখলাম চোখের সমানে।

পেচেরস্কায়া পাড়ার কাছে কসাকদের যে ছাউনি সেখানে প্রায়ই যেতাম। সৈনিকদের থেকে কসাকরা একটু অন্য ধরণের মানুষ। অবশ্য তারা ভাল ঘোড়-সওয়ার বা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর—তফাৎটা এজন্যে নয়। তাদের কথা-বার্তার কায়দাকানুনই আলাদা। গান গায় অন্য ধরণের আর নাচেও চমৎকার। সন্ধ্যাবেলা ঘোড়াগুলোকে চড়িয়ে আনার পর কোন কোন দিন ওরা জড়ো হয়ে আস্তাবলের কাছে গোল হয়ে বসত। লালচুলওলা এক কসাক তার ঢেউ খেলান চুলগুলো ঝাঁকিন দিয়ে পেছন দিকে সরিয়ে ক্লারিওনেটের মত চড়া সুরে গান গাইত। স্থির ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে সে গাইত শান্ত দন বা নীল দানিউবের ব্যথা-বিধুর কোমল গান। যে সব পাখি গাইতে গাইতে এক সময়ে মাটির কোলে ঢলে পড়ে মরে যায়, সেই ভোরের পাখির মতই চোখ বুজে থাকত সে। গলার কাছে জামার বোতাম খোলা। একটুকরো ব্রোঞ্জের মত ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে কণ্ঠার হাড়। সমস্ত শরীরটাকে মনে হত যেন ব্রোঞ্জ দিয়ে ঢালাই করা। মনে হত চোখেও কিছুই দেখছে না অ.র। শুধু নড়ছে হাত দুটো আর লিক্‌লিকে পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে এমনভাবে দুলছে মনে হচ্ছে যেন ওর পায়ের তলার মাটি নড়ছে। ও যেন মানুষ থাকত না, আর রূপান্তরিত হত এক শিঙ্গাবাদকের শিঙ্গায়, রাখালের বাঁশিতে। কখনো কখনো আমার মনে হত এক্ষুনি বুঝি ও মাটির কোলে চিত হয়ে পড়ে সেই ভোরের পাখির মতই মরে যাবে। কারণ ওর সবটুকু প্রাণমন, সবটুকু শক্তি ঢেলে নিঃশেষে উজার করে দিয়েছে ঐ গানে।

ওর সঙ্গীরা কেউ পকেটে হাত রেখে, কেউ হাত দুটো পেছনে রেখে ওর ব্রোঞ্জের মত মুখ আর দোলান হাতের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে ঘিরে দাঁড়াত ওকে, নিজেরাও গাইত শান্ত সমাহিতভাবে, গির্জার স্তোত্রদলের মত। দাড়িওলা, দাড়ি কামান, সবগুলো মুখই দেখাত ঠিক মূর্তির মত তেমনি কঠোর, আর বৈরাগ্যেভরা। গানটা যেন এগিয়ে যেত এক রাজপথের মত, প্রশস্ত, সমতল আর কালস্রোতের পরিপূর্ণতায়। শুনতে শুনতে ভুলে যেতাম তখন রাত না দিন; আমি শিশু না বৃদ্ধ। সব ভুলে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যখন তার গলার সুর থেমে আসত তখন শুনতে পেতাম মাঠের ওপর দিয়ে শরত রাতের এগিয়ে চলার বিরামহীন মন্থর পদধ্বনি। ঘোড়াগুলোর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেতাম! ওরা যেন স্তেপভূমির স্বাধীন জীবনের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে রয়েছে। এই অপূর্ব অনুভূতি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় আর মাটি ও মানুষের প্রতি এক বিশাল মৌন ভালবাসায় বুক ভরে উঠত, ফেটে পড়তে চাইত।

ঐ ছোট্ট ব্রোঞ্জে গড়া কসাকটাকে শুধুই মানুষ মনে হত না, তার চাইতেও কিছু বেশি। ও যেন কিসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত—যেন সমস্ত পার্থিব জগতের অনেক উঁচুতে কল্পলোকের এক প্রাণী। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করলে আনন্দে শুধু নীরব হাসি ফুটে উঠত আমার মুখে। আর জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে থাকতাম। ওকে বার বার দেখার আর ওর গান শোনার জন্যে পোষা কুকুরের মত আমি ওর পিছে পিছে ঘুরে বেড়াতেও রাজী ছিলাম।

একদিন দেখলাম, আস্তাবলের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাদামাঠা একটা রূপোর আংটি খুব যত্ন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ও দেখছে। ওর সুন্দর ঠোঁটদুটো নড়ছে; লাল পাতলা গোঁফ কাঁপছে। আর মুখখানায় ভরে উঠেছে এক বিষণ্ণ আহত ভাব।

আর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পাখীর খাঁচা নিয়ে গেলাম স্তারায়া সেন্নায়া স্কোয়ারের কাছের শরাবখানায়। শরাবখানার মালিকের পাখি পোষার দারুণ শখ। সে প্রায়ই আমার কাছ থেকে পাখি কিনত।

একটা কোণে, উনুন আর দেওয়ালের মাঝখানে বসে সেই কসাকটা। ওর পাশে মোটা-সোটা একজন স্ত্রীলোক, চেহারায় ওর প্রায় দ্বিগুণ হবে। তার মুখখানা বার্নিশ কাগজের মত চিকচিক্ করছে। কেমন যেন মায়ের মত একটু উদ্বেগপূর্ণ স্নেহ-কোমল দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কসাকটা মাতাল হয়ে পড়েছিল। মেঝের ওপরে অনবরত পা আছড়াচ্ছিল। হয়তবা ঐ স্ত্রীলোকটিকেই লাথি মেরে থাকবে। কারণ সে যেন চমকে উঠে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর ধীরে নিচু স্বরে বলল, 'এমন করবেন না, থামুন ..'

অতি কষ্টে কসাক ভ্রূ তুলে তাকাল। পরক্ষণেই চোখ নামাল। গরম লাগছিল লোকটার। কোটটা খুলে দিল, সার্টের বোতাম খুলে দিল গলা পর্যন্ত। মাথার রুমালটা ঘাড়ের ওপরে ঠেলে দিয়ে স্ত্রীলোকটি তার সবল হাত দুটো রাখল টেবিলের ওপরে। হাতদুটো এত শক্ত করে চেপে রাখল যে আঙ্গুলের গাঁটগুলো শাদা হয়ে উঠল। ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হচ্ছিল ঐ কসাকটা যেন এক স্নেহময়ী মায়ের অবাধ্য সন্তান। স্ত্রীলোকটি স্নেহভরা কণ্ঠে বকছে আর ও চুপ করে শুনছে শান্ত হয়ে। তার ধমকানির প্রতিবাদ করার মত কোন কথাই যেন তার নেই।

হঠাৎ কোন কিছু কামড়ালে যেমন হয়, তেমনিভাবে কসাকটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। টুপিটা কপালের ওপরে টেনে হাত দিয়ে মাথায় ভাল মত বসিয়ে দিল। এরপর কোটের বোতাম না এঁটেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটিও দাঁড়াল। শরাবখানার মালিককে বলল, 'আমরা এক্ষুণি আসছি কুজমিচ।'

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খদ্দেরদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা টিটকারির ধুম পড়ে গেল।

'সারেঙ্গ ফিরুক, দেবে ওকে আচ্ছা মত!' গম্ভীর গলায় কে একজন বলে উঠল ওদের মধ্য থেকে।

আমিও বেরিয়ে পড়লাম তাদের পেছন পেছন। আমার থেকে দশ বার পা আগে চলেছে ওরা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। কাদাভরা বাগান পার হয়ে সোজা ভলগার উঁচু তীরের দিকে চলেছে। দেখছি কসাকটার ভারে স্ত্রীলোকটি একদিকে নুয়ে পড়ছে। শুনতে পাচ্ছি ওদের পায়ের তলায় কাদা ছিটকে ওঠার প্যাচ্ প্যাচ্ শব্দ।

'কোথায় যাচ্ছেন? কোন দিকে?' নিচু স্বরে বারবার জিজ্ঞেস করছে স্ত্রীলোকটি।

কাদা ভেঙে আমার নিজের পথের বিপরীত দিকে ওদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। বাঁধের কিনারায় এসে কসাকটা থমকে দাঁড়াল। এক পা পেছাল। তারপর স্ত্রীলোকটির গালে খুব জোরে একটা থাপ্পর মারল। ভয়ে-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি, "আঃ! মারলে কেন?'

কিন্তু তৎক্ষণে কসাক স্ত্রীলোকটির কোমর জড়িয়ে ধরে রেলিং'এর ওপারে উল্টে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। তারপর বাঁধের ঘাসে দুজনে জড়াজড়ি করে গড়াতে লাগল একটা অন্ধকার পিণ্ডের মত।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিচ থেকে ভেসে এল ধ্বস্তাধ্বস্তি আর কাপড় ছেঁড়ার শব্দ আর কসাকের ভারি নিশ্বাস-প্রশ্বাস। স্ত্রীলোকটি চাপা গলায় বলে চলেছে, 'চ্যাচাব কিন্তু আমি—।

তারপর জোরে একবার চিৎকার করে কেঁকিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি। পরক্ষণেই সব চুপ—নিস্তব্ধ। একটা পাথর তুলে বাঁধের ওপারে ছুঁড়ে মারলাম। শুধু কয়েকটা আগাছা নড়ে উঠল। শরাবখানার কাঁচের দরজাটা ঝনঝন্ করে উঠল; কে যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, যেন পড়ে গেছে আছাড় খেয়ে। পরমুহূর্তেই আবার নেমে এল সেই চাপা ভয়ে ভরা নিস্তব্ধতা।

তারপর বাঁধের মাঝামাঝি স্থানে শাদা বড় মত একটা কিছু টলতে টলতে ধীরে ধীরে উঠে আসছিল ওপরের দিকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর বিড়বিড় করছিল। চিনতে পারলাম, সেই স্ত্রীলোকটি। ভেড়ার মত চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে আসছে। দেখতে পেলাম ওর কোমর পর্যন্ত খোলা, আব্রুহীন। গোল বড় দুটো স্তন, শাদা ধবধব করছে। মনে হচ্ছে তিনটে মুখ যেন। শেষে রেলিং'এর কাছে এসে স্ত্রীলোকটি আমার পাশে বসল। ঘোড়ার মত হাঁপাচ্ছিল আর এলো-মেলো চুলগুলোকে পাট করার চেষ্টা করছিল। ওর ফর্সা গায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছিট ছিট কাদার দাগ। কাঁদছে, আর বেড়াল যেমন করে থাবা দিয়ে মুখ মোছে তেমনি করে চোখের জল মুছছে।

'মাগো! কে তুই? পালা এখান থেকে, বেহায়া ছোঁড়া কোথাকার!' আমাকে দেখতে পেয়ে চাপা গলায় কেঁদে ওঠে স্ত্রীলোকটি।

কিন্তু চলে যেতে পারছিলাম না। কী এক নিদারুণ বিস্ময়ে বেদনায় সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে পড়েছে। মনে পড়ল দিদিমার বোনের সেই কথা 'মেয়ে মানুষের শক্তি যেমন তেমন নয়। স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত ঠকিয়েছিল ইভ

স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়াল। পোশাকের বাকি অংশটা টেনে বুক ঢাকল। তাতে পায়ের কাপড় সরে পা দুটো বেরিয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত চলতে শুরু করল।

একটা শাদা জামা দোলাতে দোলাতে কসাক এসে উঠে দাঁড়াল বাঁধের ওপরে, তার হাতে একটা শাদামত পোশাক। আস্তে একটা শিস দিয়ে কী যেন শুনল কান পেতে। তারপর ফুর্তির সুরে বলে উঠল, 'দারিয়া! আরে শোন, তোমাকে বলেছিলাম না যে, কসাকরা যা চাইবে তা নেবেই নেবে? ভেবেছিলে, আমি মাতাল হয়ে পড়েছি, তাই না? না গো না, তোমাকে বোকা বানাবার জন্যেই কেবলমাত্র ভান করেছিলাম। দারিয়া!'

দুপায়ে ভর রেখে বেশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গলার আওয়াজও স্বাভাবিক, পরিহাসপূর্ণ। ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীলোকটির জামা দিয়ে বুটের কাদা মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'এই নাও, তোমার ব্লাউজটা নিয়ে যাও!…চলে এস দারিয়া, রাগ কোর না:!'

তারপর চিৎকার করে একটা অশ্লীল মুখখিস্তি করল।

আগাছার স্তূপে তেমনিভাবেই বসে রইলাম আমি। রাত্রির নিস্তব্ধতার গভীরে শুনলাম ওর একক কণ্ঠের স্বর—কুৎসিত আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

বাগানের ভেতরের লণ্ঠনের আলো নেচে উঠল আমার চোখে। ডান দিকে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে থাকা ঘন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মেয়েদের স্কুল বাড়ি। ক্লান্ত স্বরে নোংরা কুৎসিত গাল দিতে দিতে আর স্ত্রীলোকটির ব্লাউজটা দোলাতে দোলাতে কসাকটা বাগান পেরিয়ে মিলিয়ে গেল দুঃস্বপ্নের মত।

নিচে জলের ট্যাঙ্কের ওদিক থেকে উঠে আসছে পাইপের মুখে বাষ্পের হিস্ হিস্ শব্দ। নদীর দিকে ঢালু রাস্তা বেয়ে চাকার ঘর্ঘর শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। একটি প্রাণীও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ক্ষুব্ধ মনে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি। হাতে তখন ধরা রয়েছে একটা ঠাণ্ডা পাথরের নুড়ি। ভেবেছিলাম ছুঁড়ে মারব ওটা কসাকটাকে লক্ষ্য করে। দিগ্বিজয়ী সেন্ট জর্জ গির্জার ধারে আসতেই পাহারাদার আমার পথ আটকাল। ধমকে জিজ্ঞেস করল, আমি কে, কী আছে আমার ঐ পিঠের থলির মধ্যে?

কসাকটার সমস্ত ঘটনা যখন তাকে খুলে বললাম সে তখন হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'খুব একটা হয়ে গেল তাহলে! কসাকরা অতশত শালীনতার ধার ধারে না, বুঝলে ভায়া। আমরা ওদের সঙ্গে পারলে তো! আর ঐ মেয়েমানুষটা—ওটা তো আস্ত কুত্তি।' বলেই আবার দমকা হাসির চোটে ফেটে পড়ল। অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে আমিও চলতে শুরু করলাম আমার পথে। এর মধ্যে অমন হাসির খোরাক কী পেল সে? ভীষণ আতঙ্কের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা ঐ মেয়েমানুষটি যদি আমার মা হতেন কিংবা দিদিমাই হতেন, কী হত তা হলে?

আট

প্রথম বরফ পড়ার সাথে সাথে দাদু আমাকে আবার দিদিমার বোনের কাছে দিয়ে এলেন।

'তোর কিছু ক্ষতি হবে না—একটুও না।' বললেন তিনি।

উপলব্ধি করতাম সমস্ত গরমকালটা প্রচুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পার করে আমার বয়েস ও বুদ্ধি দুই-ই বেড়ে গেছে; কিন্তু মনিব বাড়ির জীবন আগের থেকে বেশি নিরানন্দ হয়ে পড়েছে। ঠিক আগের মত ওরা এক গাদা গিলে নিজেদের শরীর মাটি করছে। তেমনি একই ভাবে বিরক্তিকর সুরে তাদের দুঃখ কষ্টের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে প্যান্ প্যান্ করছে। তেমনি ভয়াবহ বিদ্বেষপূর্ণ সুরে বুড়ি তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। একটা সন্তান হওয়ায় ছোট গিন্নী রোগা হয়ে গেছে বেশ। কিন্তু এখনো সেই অন্তঃসত্ত্বা সময়কার মতই একটা গম্ভীর মেজাজী ভাব নিয়ে আছে!

সন্ধ্যাবেলা মনিব-গিন্নীরা খাবার ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে বলত, 'তোর ষ্টিমারের গল্প বল, শুনি।'

স্নানের ঘরের দরজার কাছে বসে ওদের আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলতাম।

আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে এখানে থাকছি আমি। আমার বর্তমান জীবনের এই পরিবেশে, আমার সেই জীবনের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেতাম। মেয়েরা ষ্টিমারে ওঠেনি কোন দিন তাই জিজ্ঞেস করত ওরা, 'ভয় লাগত না তোর?'

আমি ভেবেই পেতাম না এর মধ্যে ভয় পাবার কি আছে।

'গভীর জলে কোথাও ষ্টিমারটা উল্টে ডুবে যেত ?'

মনিব হেসে উঠত। আমি জানতাম যে ষ্টিমার কখনো গভীর জলে উল্টে গিয়ে ডুবে যায় না, কিন্তু সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারতাম না গিন্নীদের। বুড়ির তো নিশ্চিত বিশ্বাস যে ষ্টিমার কখনো জলে ভেসে চলে না। রাস্তা দিয়ে গাড়ির চাকা যেমন চলে ষ্টিমারের চাকাও সেরকম নদীর নিচের মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

'যদি লোহারই তৈরি তবে ভাসে কেমন করে ? কুড়ুল কখনো জলে ভাসে ?'

'কিন্তু লোহার বাটি তো ভাসে।'

'ভারি একটা বললি ! লোহার বাটি ছোট্ট, তাছাড়া খালি থাকে।'

যখন স্মুরি আর তার বইয়ের কথা বললাম, আশ্চর্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারা। বুড়ি বলল, 'মূর্খ আর নাস্তিক যারা তারাই বই লেখে।'

'তাহলে প্রার্থনা-সঙ্গীত বইয়ের বেলা কি ? আর রাজা ডেভিড ?'

প্রার্থনা-সঙ্গীত-এর বই হল ধর্মপুস্তক। তাছাড়া ঐ স্তোত্র লেখার সময়ও রাজা ডেভিড ঈশ্বরের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়েছেন।'

'কোথায় লেখা আছে সে কথা ?'

এই যে, আমার হাতে ! মাথায় চড় মেরে শিখিয়ে দেবে কোথায় লেখা।'

বুড়ি সবজান্তা। যা কিছু মন্তব্য করত, সবই একান্ত আত্মপ্রত্যয়-এ এবং তার সব মন্তব্যই অসম্ভব বিদ্‌ঘুটে হত।

'পেচোরকা স্ট্রী.টর তাতারটা মরল যখন, তখন ওর আত্মাটা কালো আল-কাতরার মত গড়িয়ে নেমে এসেছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আত্মা তো একটা অদৃশ্য চৈতন্য।'

'কিন্তু এযে তাতারের আত্মা, বেকুফ্ কোথাকার !' মুখ ভেংচে উঠল বুড়ি।

বই সম্পর্কে ছোট মনিব-গিন্নীরও ভীষণ ভয়।

'বই পড়া খুব খারাপ; বিশেষ করে অল্প বয়সে: আমাদের পাড়ায় গ্রেবেশক ষ্ট্রীটে একটা মেয়ে ছিল। খুব ভাল বংশের মেয়ে। বই পড়তে শুরু করল মেয়েটা। পড়তে পড়তে শেষকালে প্রেমে পড়ল কিনা পুরুতের সঙ্গে। পুরুতের বৌ তখন ওকে খুব আচ্ছা করে মার দিল! খোলা রাস্তায় সমস্ত লোক-জনের সামনে। উঃ কী সাংঘাতিক !'

মাঝে মধ্যে স্মুরির বইয়ে আমি যা পড়েছি তেমনি তেমনি সব কথা ব্যবহার করতাম। একটা বইতে পড়লাম, 'আসলে বলতে কি, বারুদ কেউই একা আবিষ্কার করেনি। দীর্ঘদিনের ছোটখাট অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ভেতর দিয়েই এর উৎপত্তি।'

কেন জানি এই কথাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল. বিশেষ করে, 'আসলে বলতে কি' কথাটা বেশ ভাল লেগেছিল আমার। মনে হত বেশ পোক্ত কথা। এটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমাকে দারুণ দুর্ভোগে পড়তে হয়েছিল একবার।

একদিন সন্ধ্যায় ওরা সবাই যখন আমাকে ডেকে নিয়ে আমার জাহাজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলল, 'আমি বললাম, 'আসলে বলতে কি, শোনা-বার মত কিছুই আর নেই।'

শুনে ওরা যেন দিশা হারিয়ে ফেলল। তারপর সবাই মিলে হৈ রৈ শুরু করে দিল, 'ওটা কী ? কী বললি তুই ?'

ওরা চারজনেই হো হো করে হেসে উঠল। বার বার বলতে লাগল, 'আসলে বলতে কি! হা রে কপাল!'

এমনকি মনিব পর্যন্ত বলল, 'কথাটা নেহাত বোকার মত!'

এরপর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত ওরা আমাকে 'আসলে বলতে কি' বলেই ডাকত।

'ওরে, 'আসলে বলতে কি!' একবার এসে মেঝে থেকে বাচ্চার পেচ্ছাবটা মুছে দিলে কেমন হয়, 'আসলে বলতে কি'?'

ওদের এই নির্বোধ কৌতুকে আঘাত না পেয়ে অবাকই হতাম বেশি।

অন্তর অসাড় করে দেয়া এক দুঃখের কুয়াশার ভেতর দিন কাটত আমার। ভুলে থাকার জন্য প্রাণপণ কাজ করতাম। কাজও ছিল অনেক। বাড়িতে দুটো বাচ্চা, সুযোগ সন্ধানী মনিব-গিন্নীরা প্রায়ই আমাকে ছুটি দিত বলে বাচ্চাদের দেখাশোনার বেশির ভাগ কাজ আমার ঘাড়ে পড়ত। প্রতিদিন আমাকে বাচ্চাদের কাঁথা আর সপ্তাহে একদিন করে কাপড়চোপড় কেচে আনতে হত কোতোয়ালি ঝর্ণায় গিয়ে। ধোপানীরা আমাকে দেখে হাসত। বলত, 'এ সব মেয়েমানুষের কাজ করিস কিসের জন্য?'

ঠাট্টা বিদ্রুপের জন্য এক এক দিন ওদের ভিজে কাপড় দিয়ে পিটোতাম। ওরাও পাল্টা দিতে ছাড়ত না। ওদের সঙ্গে গিয়ে ভারি মজা লাগত আমার। আনন্দ পেতাম।

কোতোয়ালি ঝর্ণাটা ছিল একটা গভীর খাদের ভেতরে, যা আবার গিয়ে পড়েছে ওকা নদীতে। পুরাকালে স্লাভ দেবতা ইয়ারিলোর নাম অনুসারে তার নামকরণ। ময়দানটা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে খাদটার জন্য। শহরের লোকেরা সেমিকের দিনে এই মাঠে একত্র হয়ে উৎসব করে। দিদিমার কাছে শুনেছি তার যৌবন বয়সেও লোকেরা ইয়ারিলো দেবতাকে খুব বিশ্বাস করত; পুজো দিত। একটা চাকায় আলকাতরা মাখিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। তারপর পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দিত সেটা। সঙ্গে হৈ-হল্লা, গান চালাত জোরে। যদি চাকাটা গড়িয়ে গিয়ে ওকা নদীতে পড়ত তবে ধরে নিত যে ইয়ারিলো পুজো গ্রহণ করেছেন। বিশ্বাস করত গ্রীষ্মকালটা চমৎকার হবে, লোকে সুখে শান্তিতে থাকবে।

অধিকাংশ ধোপানীই ইয়ারিলো ময়দানে থাকে। ওরা যেমন খাটতে পারে, তেমনি ওদের জিভের ধার। শহর জীবনের সবকিছু সম্পর্কে ওরা ওয়াকিবহাল। ব্যবসায়ী, কেরানী, অফিসার,—যাদের কাজ ওরা করে, তাদের সম্পর্কে ওদের গল্প শুনতে আমার খুব মজা লাগত। শীতকালে বরফ জমা ঝর্ণার জলে কাপড় কাচা খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার। কনকনে হিমে হাত জমে যেত ওদের, ফেটে ফেটে যেত হাতের চামড়া। কাঠের গামলার ভেতরে জল ঝরে পড়ত আর ওরা গামলার ওপরে নুয়ে পড়ে কাচত কাপড়। মাথার ওপরে কাঠের জীর্ণ ছাউনি! তাতে না আটকাত হাওয়া, না বরফ। মুখগুলো হয়ে উঠত লাল টকটকে। তীব্র তুষারে ক্ষতবিক্ষত হাতের আঙুলগুলো জমে এমন হত যে, বাঁকানো যেত না। দুচোখ গড়িয়ে ঝরে পড়ত জল। কিন্তু তবুও অনবরত বকবক্ করত ওরা। পরস্পরকে বলে যেত টাট্‌কাখবর। লোকজন আর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মন্তব্য করতো আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে।

ওদের মধ্যে সবার থেকে ভাল গল্প বলতে পারত নাতালিয়া কজলোভস্কায়া।

ত্রিশের মত বয়েস। মুখখানা বেশ চকচকে। শক্ত সমর্থ গঠন। চোখদুটো পরিহাসপূর্ণ। আর জিভখানা একই সঙ্গে ধারাল আর সবজান্তা। ও যখন বলত অন্য মেয়েরা সব মনোযোগ দিয়ে শুনত। তারা ওর কাছে পরামর্শ চাইত, ওকে শ্রদ্ধা করত ওর কাজে নৈপুণ্যের জন্যে, টিপ্‌টাপ্‌ পোষাক পরিচ্ছদ পরার ধরণও মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া শিখতে পাঠাত বলে। বড বড় দুটো ঝুড়ি ভরা ভিজে কাপড়ের ভারে নুয়ে পড়ে যখন পিছল পথ ধরে নেমে আসত সে, তখন সবাই একসঙ্গে হৈ চৈ করে উঠত, 'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'ঈশ্বরের কৃপায় ভালই আছে। পড়ছে!'

'দেখতে দেখতে একজন ভদ্রমহিলা হয়ে উঠবে দেখে নিও, তুমি তা জানতেও পারবে না।'

'তার জন্যই তো স্কুলে পড়াচ্ছি। সুন্দরীটি অমন সুন্দর সোনালী চুল পেল কোথা থেকে? পেয়েছে আমাদের কাছ থেকেই—দুনিয়ার এই নোংরা জঞ্জালের ভেতর থেকেই। তাছাড়া আবার কোত্থেকে? যতই জানবে, শুনবে, ততই সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। ঈশ্বর আমাদের পাঠিয়েছেন নির্বোধ শিশু করে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছে যখন এ পৃথিবী ছেড়ে যাব তখন যেন বুড়ো আর জ্ঞানী হয়ে ফিরি। সুতরাং লেখাপড়া করা, শেখা, জানাশোনা, সেটা তো আমাদেরই হাতে!'

যখন ও কথা বলত তখন সবাই চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শুনত ওর জোরাল গলার সাবলীল উচ্ছল পড়া কথার স্রোত। ওর তেজ, সহ্যশক্তি, আর চতুরতায় সকলে অবাক হত। কি সামনে, কি পেছনে সবাই ওর প্রশংসায় অধীর। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত একটা লম্বা দস্তানা তৈরি করেছিল নাতালিয়া, যাতে জামার হাতা জলে না ভিজে যায়। সবাই বাহবা দিল। বলল, খুব ভাল কাজ হয়েছে; কিন্তু কেউ সে রকম বানাল না। কারণ ওকে অনুকরণ করত না কেউ, কিন্তু যেদিন আমি ওরকম একটা দস্তানা পরে হাজির হলাম, মেয়েরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করল।

'ছিঃ! ছিঃ! মেয়েমানুষের কাছে শেখে!' ওরা সকলে একসাথে বলতে লাগল।

নাতালিয়ার মেয়েকে নিয়ে আলোচনা করত ওরা, 'কী জাঁদরেল মেয়ে বাবা! না হয় আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা বাড়বে, তাতে আর কি? এমনও তো হতে পারে যে, পড়াটাই হয়ত শেষ করতে পারল না—তার আগেই মরে গেল।'

'শিক্ষিতদের জীবনটাও খুব সহজে সাবলীলভাবে কাটে না। ঐ বাখিলভের মেয়েকেই দেখ না—কতদিন ধরে লেখাপড়া করল ভাব তো। কিন্তু শেষকালে কি হল তার? স্কুলের মাষ্টারনী। একবার মাষ্টারনী হয়েছে তো সারাজীবন সেই কুমারী হয়েই থাকা।'

'ঠিক কথা। পুরুষ মানুষেরা যা নেবে তা বইয়ের শিক্ষা না থাকলেও নেবে। অবশ্য দেবার মত ধন যতদিন আছে ততদিন!'

'মেয়েমানুষের মগজ তার মাথায় নয়, থাকে অন্য জায়গায়!'

নিজেদের নিয়ে এমন লজ্জাহীন কথাবার্তা বলতে দেখে আমার কেমন আশ্চর্য লাগত, বিশ্রী মনে হত। সৈনিক, নাবিক, মাটিখোঁড়ারা মেয়েদের নিয়ে কেমন আলোচনা করে জানতাম। শুনেছি তাদের নিজেদের শক্তি জাহির করতে কে কতজন মেয়েমানুষকে ধোঁকা দিয়েছে তার হিসেব দেখাত। ওদের আলোচনায় মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিজাতীয় মনোভাবের ইঙ্গিত পেতাম। কিন্তু যখনই কোন

লোক তার জন্মের কথা বলত, তখন তার সেই বড়াইয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকত যাতে মনে হত সত্যের চাইতে মিথ্যে ফলাও করার ভাবটাই যেন বেশি।

ধোপানীরা তাদের প্রেম-ভালবাসার কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কখনো আলোচনা করত না। কিন্তু যখনই পুরুষদের নিয়ে কথাবার্তা বলত বিদ্রূপ আর প্রতিহিংসার ভাব ফুটে উঠত ওদের মধ্যে। মেয়েমানুষের শক্তি কম নয় যেন ওরা এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইত।

'যতই এড়াবার চেষ্টা কর না কেন, ঘুরে ফিরে তোমাকে মেয়েমানুষের কাছে আসতেই হবে।' একদিন বলল নাতালিয়া।

'যা বলেছিস,' খনখনে স্বরে চেঁচিয়ে বলল কুৎসিত চেহারার বুড়িটা, 'মেয়েমানুষের জন্যে কত সাধু সন্ন্যাসী খোদ ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে।'

খাদের নিচের দিকে এই নোংরা গর্তে যেখানে ময়লা পরিষ্কার করা বরফ পর্যন্ত বেশিক্ষণ টিকতে পারত না, সেখানে সাবান জলের ছপ্‌ছপানি আর কাপড় কাচবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলত ঐ আলোচনা। সমগ্র মানুষের, সমগ্র মানবজাতির জন্মের সেই মহান রহস্যময় উৎস সম্পর্কে এই নির্লজ্জ বিশ্রী আলোচনা আমার অন্তরে এক নিদারুণ ক্লান্তিকর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলত। চারপাশে অনবরত ঘটতে দেখা ঐ সমস্ত 'প্রণয় ব্যাপারে' আমার সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে আসত। অনেকদিন পর্যন্ত আমার ভাবনায় প্রেম, ঐ নোংরা অশ্লীলতার সঙ্গে একাকার হয়ে ভেসে উঠত।

তবুও এখানে এই খাদের ধারে, ধোপানীদের মধ্যে, রান্নাঘরে, অফিসারদের আর্দালীদের মধ্যে কিংবা মাটি-খোঁড়াদের মধ্যে এমন একটা মোহময় জীবনের আভাস পেতাম যা বাড়িতে পাওয়া যায় না। বাড়ির এক ঘেয়ে কথাবার্তা, চিন্তাধারা আর ঘটনাপ্রবাহ কেবল গলা টিপে ধরা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতাই জাগিয়ে তোলে মাত্র। আমার মনিবদের জীবন একটা কুৎসিত ক্লেদাক্ত চক্রের ভিতরে ঘুরে মরছে—খাওয়া, ঘুমানো আর রোগে ভোগার মধ্যে।

কাজ যখন থাকত না, তখন চালাঘরের মধ্যে গিয়ে কাঠ ফালি করতাম, যাতে কিছুক্ষণ নিরালায় একা থাকতে পারি। কিন্তু একা থাকাটা আর আমার কপালে ঘটে উঠত না। অফিসারদের আর্দালীরা ঠিক চলে আসত। আর আশপাশের লোকজনদের কেচ্ছা বলতে শুরু করত।

প্রায়ই ইয়েরমোখিন কিংবা সিদরভ এসে জুটত। ইয়েরমোখিন লম্বাটে কুঁজো, কালুগা অঞ্চলের লোক। ওর মাথাটা ছোট, চোখদুটো ঘোলাটে আর সর্বাঙ্গ শক্ত শিরায় ছাওয়া। লোকটা অলস আর বোকার হদ্দ। হাঁটাচলা করে ধীরে, বিশ্রীভাবে। আর কোন মেয়েমানুষের দিকে তাকালেই ওর কথা জড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঝুঁকে এগিয়ে যায় তার দিকে যেন তক্ষুনি তার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমাদের এখানকার কেউই বুঝে উঠতে পারে না যে ও কী করে অত তাড়াতাড়ি রাঁধুনী আর ঝি-চাকরানীদের পটিয়ে ফেলে। ওকে হিংসে করে সবাই। ভাল্লুকের মত ওর গায়ের শক্তি দেখে প্রত্যেকে অবাক হয়ে যায়। সিদরভ রোগা, হাড় জিরজিরে। ওর বাড়ি তুলা অঞ্চলে। বিষণ্ণ মনমরা ধরণের। কথা খুব আস্তে বলে, কাশে ভয়ে ভয়ে। ওর চোখে চিক্‌মিক্ করত একটা আলোর কম্পন আর ও অনবরত অন্ধকার কোণের দিকে ঘনঘন দেখত।

'কি দেখছ ?'

'দেখছি ইঁদুর বেরিয়ে আসে কিনা। ইঁদুর আমার খুব ভাল লাগে। কত দ্রুত চলে। শান্ত খুদে জীব।'

আর্দালীদের চিঠি লিখে দিতাম। কোন কোন সময় তাদের প্রেমিকাদের জন্য, কখনোবা তাদের গাঁয়ের বাড়িতে। এতে আনন্দ পেতাম খুব। বিশেষত সিদরভের চিঠি লিখে। প্রতি শনিবার সে তুলায় তার বোনের কাছে চিঠি দিত।

আমাকে ডেকে রান্নাঘরে নিত। তারপর টেবিলে আমার কাছে বসে কামানো ন্যাড়া মাথাটায় হাত চালাতে চালাতে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'আচ্ছা, শুরু করা যাক এবার। প্রথমত জানই তো কেমন করে শুরু হয়, 'স্নেহের বোন আমার! কামনা করি তুমি যেন সারা বছর ধরে, এবং বছরের পর বছর শারীরিক কুশলে থাক।' ইত্যাদি। হল ? বেশ। এখন লেখ, 'তোমার প্রেরিত টাকা পেয়েছি। তার জন্যে ধন্যবাদ নিও। কিন্তু তুমি অমন আর কখনো কোর না। আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে বেশ ভাল আছি।' মোটেই ভালভাবে থাকি না। এখানে তো কুকুরের মত আছি। কিন্তু তা জানাবার দরকার নেই ওকে। আচ্ছা লেখ, 'খুবই সুখে আনন্দে আছি আমরা।' ওর বয়েস এখনো খুব কম,˚মাত্র চোদ্দ বছর। এসব জেনে কি লাভ। তারপর আর যা লিখতে হয় সব লিখে দাও।'

আমার বাঁ কাঁধের দিকে নুয়ে মুখের ওপরে গরম দুর্গন্ধভরা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে অনবরত ফিস্‌ফিস্ করত, 'ওকে লিখে দাও, যেন কখনো ছোঁড়াদের ঝাপটে ধরতে না দেয়। কাউকে যেন ওর বুকে হাত দিতে না দেয়। লেখ, 'কেউ যদি কখনো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, বিশ্বাস কোর না। তার আসল মতলব ভুলিয়ে ভুলিয়ে তোমার সর্বনাশ করা।'

আপ্রাণ কাশি চাপতে চেষ্টা করত। ধুসর মুখখানা লাল হয়ে উঠত। দুটো গাল উঠত ফুলে। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। চেয়ারে এমনভাবে নুয়ে পড়ত যে আমার গায়ে ধাক্কা লাগত, 'আমার হাতে ধাক্কা দিচ্ছ যে।'

'আচ্ছা, তুমি লিখে যাও, 'ফিট্‌ফাট্ লোকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সাবধানে থাকবে। তারা সুযোগ পেলেই মেয়েদের সর্বনাশ করে। কেমন করে কথা বলতে হয় তারা তা জানে। আর কথাও বলতে পারে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু একবার তাদের কথায় যদি বিশ্বাস কর, তবে গণিকালয় ছাড়া আর কোথাও তোমার স্থান হবে না। যদি কখনো দুএকটা রুবল জমাতে পার তবে পুরুতের কাছে তা জমা রাখবে। ভাল লোক হলে তোমার জন্যে রেখে দেবেন। কিন্তু তার থেকে মাটিতে কোথাও পুঁতে রাখাই ভাল। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন না দেখে ফেলে আর কোথায় রাখলে তা মনে থাকে যেন।'

মাথার ওপরের জানলার হাঁসকলের শব্দের জন্য ওর কথা শুনতে খুবই কষ্ট হত। কালি পড়া উনুন আর মাছিতে কালো হয়ে ওঠা কাবার্ডের দিকে চোখ রাখতাম। রান্নাঘরটা ভীষণ অপরিষ্কার। আরশোলায় ভর্তি। ধোঁয়া, কেরোসিন, আর পোড়া চর্বির বাষ্পে ছাওয়া। উনুন আর জ্বালানী কাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে আরশুলা। মনটা বেশ খারাপ লাগত। অভাগা সৈনিক আর তার বোনের জন্য কান্না উথলে উঠত আমার। এমনিভাবে বেঁচে থাকা কি করে সম্ভব ?

সিদরভের ফিস্‌ফিসানিতে কান না রেখে লিখে যেতাম, জীবন কেমন আনন্দহীন, রূঢ়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিদরভ বলত, 'অনেক লিখেছ। ধন্যবাদ। কাকে ভয় করতে হবে না হবে এবার ও বুঝতে পারবে।'

'কোন কিছুকেই ভয় করতে নেই!' প্রত্যুত্তরে বলতাম রেগে। যদিও নিজেই আমি অনেক জিনিসকেই ভয় করি।

সৈনিক হেসে ফেলত। তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে বলত, 'বোকা। ভয় না করে কোথায় যাবে? টিপ্‌টিপে ভদ্র মানুষের ভয় করবে না? ঈশ্বরকে? তাছাড়া এমনি আরও অনেক কিছুকে ভয় করবে না?'

বোনের কাছ থেকে চিঠি পেলেই ও অসম্ভব উৎকণ্ঠিত হয়ে বলত, 'পড়ে শোনাও তাড়াতাড়ি।'

তিন তিনবার করে সেই দুর্বোধ্য চিঠিটা ওকে পড়ে শোনাতে হত। চিঠিটা এমন ছোট আর ক্লান্তিকর যে মনটা দমে যেত।

সিদরভ লোকটা সদাশয়, মনটাও নরম। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে ওর ভাবধারা ঠিক অন্যদেরই মত—বর্বর, আর আদিম। অনেক সময়েই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় চোখের সামনে দেখেছি কেমন করে দ্রুত ঘটে যেত সে সব। দেখতাম সিদরভ তার সৈনিক জীবনের কঠোরতার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে কোন মেয়েমানুষের মনে করুণার উদ্রেক করত। তারপর ভালবাসার ভান করে মিষ্টি মধুর কথা বলে তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিত। কিন্তু পরে যখন ইয়েরমোখিনের কাছে তার এই জয়ের কথা বলত তখন থুথু ফেলে মুখ বাঁকিয়ে এমন একটা ভাব করত যেন কিছুক্ষণ আগে সে এক দাগ তেতো ওষুধ খেয়েছে। এতে দারুণ আঘাত পেতাম আমি। জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন ওরা মিছে কথায় পটিয়ে মেয়েদের নিয়ে অমনভাবে খেলা করে? কেন হাত বদল করে অনবরত? এমন কি মারধোর পর্যন্ত করে।

উত্তরে সে একটু হেসে বলেছিল, 'এসব দিকে নজর দিসনা। খুব খারাপ ব্যাপার—এটা পাপ। তোর বয়েস অল্প। এখনই এসব জানতে চাওয়া ঠিক নয়।'

কিন্তু একদিন কিছুটা কথা আদায় করতে পেরেছিলাম ওর কাছ থেকে। কথাটা কোন দিনই আমি ভুলিনি।

'তুই কি মনে করিস ওরা জানে না যে আমি ওদের ঠকাচ্ছি?' একটু কেশে চোখ কুঁচকে সে বলল, 'ঠিকই জানে তবুও চায় যে আমি ঠকাই। সবাই মিছে কথা বলে এসব ব্যাপারে। সত্যি বলতে লজ্জা পায়, কারণ কেউ কাউকে সত্যি ভালবাসে না—ফুর্তির জন্যে করে মাত্র। দারুণ লজ্জার ব্যাপার এটা। অপেক্ষা কর, নিজেই টের পাবি সব। এসব করতে হয় রাত্রে কিংবা দিনের বেলা গুদামঘরের মত কোন অন্ধকার ঘরের কোণা খামচিতে। এই জন্যই তো ঈশ্বর আদম আর ইভকে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করেছিলেন। আর এর ফলেই মানুষের যত দুঃখকষ্ট।'

এমন সুন্দরভাবে, এমন করুণ অনুতাপের সুরে কথাগুলো বলেছিল যে, তাতে যেন ওর ওধরণের কার্যকলাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হল। ইয়েরমোখিনের চেয়ে আমার বন্ধুত্ব ওর সঙ্গেই জমে উঠল বেশি। আমি ইয়েরমোখিনকে ঘৃণা করতাম। পদে পদেই তাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করতাম। আমার সে চেষ্টা প্রায়ই সফল হত। আর ইয়েরমোখিন ভীষণ রেগে উঠোনময় আমাকে তাড়া করত।

'ও কাজটা নিষিদ্ধ।' সিদরভ বলত।

আমিও জানতাম নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশ্বাস হত না যে ওটাই মানুষের জীবনের দুঃখ অশান্তির মূল। কারণ, লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রেমে পড়া মানুষের চোখে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। প্রেমিকদের ভেতরে দেখেছি অসাধারণ উদারতার আভাস। প্রেম থেকে যে হৃদয়ের উৎসব শুরু হয়, তা দেখতে পাওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার।

যতদূর মনে পড়ে জীবন তখন যেন আরো একঘেয়ে, নির্মম আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন যে ধরা বাঁধা কাঠামো ও সম্পর্ক দেখে আসছি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। মুক্তিরও কোন উপায় নেই। যে জীবনে আছি, দিনের পর দিন অচল অনড় অবস্থায় যে জীবন আমার সামনে তার থেকে ভাল কোন কিছুর কল্পনাও কোন দিন আমি করতে পারিনি।

কিন্তু একদিন ঐ সৈনিকেরা এমন একটা কথা বলল আমাকে যার ফলে আমার অন্তরের অতল পর্যন্ত আলোড়িত হল। বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে এক দর্জি থাকত। শহরের মধ্যে সব চাইতে নামী দর্জির দোকানে সে কাজ করত। শান্ত নিরীহ মানুষ। রুগ্ন নয়। ওর স্ত্রী দেখতে ছোটখাটো। ছেলেপুলে নেই। পড়াশুনা নিয়ে থাকত দিনরাত। উঠোনের হৈ-চৈ-এর ভেতরে, মাতালদের মধ্যে ওরা দুটি প্রাণী একান্ত নিরালায় থাকত—সামান্য সাড়া শব্দ পাওয়া যেত না ওদের। ওরা নিমন্ত্রণ জানাত না কাউকে, ছুটির দিনে থিয়েটার দেখতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোথাও যেত না।

খুব সকালে স্বামীটি বেরিয়ে পড়ত কাজে আর অনেক রাত করে ফিরত। বৌটিকে লাগত একটি কিশোরী মেয়ের মত। হপ্তায় দুদিন বিকেলের দিকে লাইব্রেরীতে যেত। অনেক দিন আমি তাকে দেখেছি গলির পথে। হালকা পায়ে একটুখানি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছে। তার ছোট ছোট হাত দুটো ভাল করে দস্তানায় ঢাকা। স্কুলের মেয়েদের মত চামড়ার ফিতেয় বাঁধা বইগুলো দোলাতে দোলাতে যেত পথ দিয়ে—তেমনি সরল, সজীব। পাখির মত ওর মুখখানা। দুটো ছোট ছোট চোখ চঞ্চল। অনেকটা তাকে সাজিয়ে রাখা চীনে পুতুলের মতই সুন্দরী। আর্দালিরা বলত ওর ডান পাঁজরের একটা হাড় নেই, তাই অমন খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটে। কিন্তু ওর ঐ চলাটাই আমার ভাল লাগত দেখতে। অন্যান্য অফিসার গিন্নীদের চাইতে ওকে স্বতন্ত্র মনে হত। তাদের তীক্ষ্ণ খিনখিনে গলা, দামী পোশাক পরিচ্ছদ আর প্রচণ্ড সোরগোল সত্ত্বেও ঐ সব মেয়েছেলেদের কেমন যেন ক্লান্ত, শীর্ণ লাগত। যেন দীর্ঘকাল ওরা কোন একটা অন্ধকার ঘরে অন্যান্য অব্যবহৃত ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের সঙ্গে পড়ে আছে।

দর্জির বৌটিকে তার পড়শীরা কেউ খুব সুস্থ স্বাভাবিক বলে ভাবত না। তারা বলত পড়াশুনা করে করে ওর মনটা এমন হয়ে উঠেছে যে সংসার দেখার মত শক্তি ওর আর নেই। ওর স্বামী নিজে বাজার করত। মোটা তাগড়া চেহারার বিদেশী রাঁধুনীটাকে কাজ করাত নিজেই। রাঁধুনীটার একটা চোখ। সেটাও আবার ফুলে লাল হয়ে থাকত। জল পড়ত সব সময়। অন্য চোখটার স্থানে ছোট একটুখানি একটা লালচে ফুটো দেখা যেত। লোকে বলত গিন্নী নিজে নাকি কোনটা গরুর মাংস আর কোনটা বাছুরের চিনতে পারে না। একদিন কি না বোকার মত গাজর ভেবে মূলো নিয়ে এসেছিল।

কী লজ্জার কথা ভাব তো একবার!

বাড়িটার ভেতর ওরা তিনজনই কেমন যেন আলাদা। যেন আচমকা এসে পড়েছে। শীতের ঝড়ো হাওয়ায় পাখিরা আশ্রয়ের আশায় যেমন করে মানুষের বিশ্রী গুমোট আস্তানায় জানলা গলে ঢুকে পড়ে ঠিক তেমনি।

তারপর আর্দালিরা আমাকে জানাল, অফিসারেরা মিলে নোংরা একটা অসভ্য খেলা খেলতে শুরু করেছে দর্জির বৌয়ের সঙ্গে। প্রায় প্রতিদিনই ওদের মধ্যে কেউ না কেউ ওর সৌন্দর্যের স্তুতি করে প্রাণের ব্যথা জানিয়ে প্রেম নিবেদন করে চিঠি দিত। আর বৌটি জবাব দিত, ওকে যেন শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়। এবং সে তাদের দুঃখের কারণ হয়েছে বলে দুঃখ জানিয়ে, ঈশ্বরের প্রতি ওদের মোহমুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি দিত। চিঠি পেয়ে অফিসারেরা সকলে একসঙ্গে পড়ত, আর হাসাহাসি করত প্রাণভরে। তারপর সবাই মিলে আবার আর একটা চিঠি লিখে কোন একজনার সই দিয়ে পাঠিয়ে দিত ওর কাছে।

এ সব বলতে বলতে আর্দালিরাও খুব হাসাহাসি করত আর গাল দিত দর্জির বৌকে।

'বোকা, খুদে লাংড়া কোথাকার।' খড়খড়ে গলায় বলে উঠত ইয়েরমোখিন।

'সব মেয়েমানুষই ঠকতে ভালবাসে,' জোর দিয়ে বলত সিদরভ, 'ঠিকই বোঝে ওরা!'

আমার বিশ্বাস হত না যে, ওরা তাকে নিয়ে যে এমনি ভাবে হাসি-ঠাট্টা করছে একথা দর্জির বৌ বুঝতে পারছে। মনে মনে ঠিক করলাম, ওকে জানাব সব কথা। একদিন ওদের রাঁধুনী নিচে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে দর্জির বৌয়ের ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম খালি, কেউ নেই। খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি এক হাতে একটা ভারি সোনালী কাপ নিয়ে দর্জির বৌ বসে রয়েছে, তার অন্য হাতে একখানা বই। আমাকে দেখতে পেয়ে বইটা বুকে চেপে ধরে ভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ও চিৎকার করে উঠল, 'কে? আগস্তা! কে তুই?'

এলোমেলো কি বললাম কতকগুলো। প্রতি মুহূর্তেই আতঙ্ক হচ্ছিল এই বুঝি হয় বইটা নয় হাতের কাপটা ছুঁড়ে মারবে। একটা বড় লাল রঙের আরাম-কেদারায় বসে ছিল দর্জির বৌ। গায়ে ঝালর দেয়া নীল ড্রেসিং গাউন একটা, তার গলায় আর কব্জিতে লেসের কাজ। ঢেউ খেলান ঘন বাদামী চুলগুলো ঘাড়ের চারপাশে নেমে এসেছে ঝর্ণার মত। গির্জার সিংহদ্বারের দেবদূতের মূর্তির মত লাগছিল ওকে। চেয়ারের পিঠে ঠেস রেখে সে প্রথমে তার ছোট ছোট দুটো চোখের স্থির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই তার সে দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। একটা বিস্ময়ভরা মৃদু হাসি দুটো চোখে জেগে উঠল এবার।

সব কিছু বলে ফিরে আসার সময় মহিলাটি বলে উঠল, 'দাঁড়া!'

ট্রের ওপরে কাপটা রেখে বইটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপরে। তারপর হাত দুটো একত্র করে গিন্নী-বান্নীর মত ভারিক্কি স্বরে বলল, 'কী অদ্ভুত ছেলেরে তুই! এদিকে আয়।'

ইতস্ততভাবে এগিয়ে গেলাম। আমার হাতটা ধরে নিয়ে তার ছোট ছোট ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল।

'তোকে কেউ পাঠায়নি তো আমার কাছে, ওদের কেউ?' জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোর কথা আমি বিশ্বাস করলাম—তুই নিজেই তাহলে এসেছিস?'

আমার হাতটা ছেড়ে চোখ ঢাকল। তারপর কোমল ব্যথার সুরে বলল, 'তাহলে ঐ নোংরা সৈনিকগুলো এই সব বলে আমার সম্পর্কে?

'আপনি বরং এখান থেকে চলে যান।' শান্ত গলায় বললাম।

'কেন?'

'ওরা সর্বনাশ করে ছাড়বে আপনার।'

স্নিগ্ধ হাসি হাসল সে।

'লেখাপড়া শিখেছিস কিছু?' জিজ্ঞেস করল, 'বই পড়তে ভাল লাগে?'

'পড়ার সময় নেই আমার।'

'পড়ার ইচ্ছে থাকলে সময়ও পাবি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ তোকে।'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে চেপে ধরা একটা রুপোর টাকাশুদ্ধ ছোট হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। দারুণ লজ্জা পেলাম তার ঐ শুকনো কৃতজ্ঞতার দান হাত পেতে নিতে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতেও সাহস হল না। ফিরে আসার সময়ে সিঁড়ির থামের মাথায় টাকাটা রেখে চলে এলাম।

সম্পূর্ণ নতুন গভীর এক অনুভূতি নিয়ে ফিরলাম। একটা নতুন প্রভাত যেন হঠাৎ ফুটে উঠল আমার সামনে। সেই থেকে কিছুদিন সেই খোলা-মেলা ঘরটার কথা, নীল পোশাক-পরা পরীর মত ঐ দর্জির বৌয়ের কথা মনে পড়লে মনটা আনন্দে ভরে উঠত। অচেনা সুন্দর ওখানকার সবকিছু। পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া সোনালী কম্বল আর রুপোলী জানালায় শীতের দিন ওর স্পর্শ উষ্ণ হবার আকাঙ্খায় তাকিয়ে আছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার দেখে আসি তাকে। গিয়ে একখানা বই যদি চাই ওর কাছে তো কেমন হয়।

গেলাম। গিয়ে দেখলাম একই স্থানে বসে আছে তেমনিভাবেই। হাতে একটা বই। কিন্তু এবার ওর মাথা মুখ ঘিরে বাঁধা রয়েছে বাদামী রঙের একটা রুমাল। ফুলে উঠেছে একটা চোখ। আমার হাতে কালো মলাটের একটা বই দিয়ে কী বলল যেন বুঝতে পারলাম না। বিষণ্ণ মনে ন্যাপথালিনের গন্ধ ভরা বইটা নিয়ে ফিরে এলাম। বাড়ি ঢুকে কাগজ আর একটা ফর্সা জামা দিয়ে মুড়ে বইটা লুকিয়ে রাখলাম চিলে ঘরে। লুকিয়ে রাখলাম যাতে মনিবেরা দেখতে পেয়ে বইটাকে নষ্ট না করে ফেলে। এ বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে পোশাকের বিভিন্ন নমুনা দেখবার জন্য 'নিভা' পত্রিকাটা রাখত—ওর সঙ্গে যে স্মৃতি-উপহার দিত তার লোভে। কিন্তু পড়ত না কখনো। ছবি দেখা হলে শোবার ঘরের কাপড়চোপড় রাখার আলমারির ওপরে তুলে রাখত। বছর শেষ হলে সবগুলো জুড়ে তিনখণ্ড সচিত্র মাসিক পত্রিকা'র সঙ্গে লুকিয়ে রাখত খাটের তলায়। যখনই শোবার ঘর ধুতাম আমি নোংরা জলে ভিজে যেত বইগুলো। আমার মনিব 'রুশ কুরিয়ের' কাগজটারও গ্রাহক ছিল।

'ওরা যে কেন এসব ছাই-ভস্ম লেখে তা শয়তানই জানে।' সন্ধ্যায় কাগজটা পড়তে পড়তে বলত মনিব, 'কি বিশ্রী একঘেয়ে!'

শনিবার চিলে ছাদে রোদে কাপড় দিতে গিয়ে মনে পড়ল বইটার কথা। বের করে খুললাম বইটা। প্রথম লাইন, 'মানুষেরই মত বাড়িগুলোরও আলাদা আলাদা চেহারা রয়েছে প্রত্যেকটার।' কথাটার সত্যতায় অবাক হয়ে পড়তে

লাগলাম। চিলেঘরের জানলার কাছে বসে শীতের কন্‌কনে জ্বালায় উঠে আসতে যতক্ষণ না বাধ্য হলাম, ততক্ষণ পড়লাম। তারপর সন্ধ্যায় মনিবেরা গির্জের সান্ধ্য উপাসনার আসরে গেলে বইটা নিয়ে আবার বসলাম রান্নাঘরে। শরতের বিবর্ণ গাছের হলদে পাতার মত বইটার জীর্ণ পাতার ভেতরে ডুবে গেলাম। যেন ওরা আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে এল। সেখানে নাম আলাদা, সম্পর্ক আলাদা। এমন সমস্ত মহৎ হৃদয় বীরপুরুষ, নরাধম দুর্বৃত্তের সাক্ষাৎ পেলাম, যারা আমার পরিচিত লোকজনের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বইটা দ্যে মঁতেপিয়েঁর লেখা বড় একটা উপন্যাস—বিভিন্ন ঘটনা আর চরিত্রে এক অদ্ভুত গতিশীল জীবনের চিত্র। সব কিছুই যেন আশ্চর্যভাবে সহজ সাবলীল। লাইনগুলোর ভেতরে ভেতরে যেন আলো লুকনো। তা ভাল খারাপ দুয়ের ওপরেই প্রতিফলিত হয়ে পাঠককে সাহায্য করছে ভালবাসতে, ঘৃণা করতে। আর সঙ্কটময় ঘটনার জটিলতা ভেদ করে চরিত্রগুলোকে বের করে নিয়ে আসছে। চরিত্রগুলোর কোনটাকে সাহায্য করবার কিংবা কোনটাকে প্রতিরোধ করবার অত্যুগ্র কামনা জাগিয়ে তুলছে। মুহূর্তের আনন্দ আর পরমুহূর্তের হতাশার ঘাত-প্রতিঘাতে চোখের সামনে যে জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব বইয়ের মধ্যেই একথা ভুলে যায় পাঠক।

পড়তে পড়তে এমন মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠায় প্রথমটায় কে বা কেন বাজাচ্ছে বুঝতে পারিনি তা।

মোমবাতিটা জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে এসেছে। আর দীপদানিটা—যেটাকে আমি সকালবেলায় ঘসে মেজে চকচকে করেছিলাম তার সর্বাঙ্গে জমে উঠেছে গলিত মোম। মূর্তির কাছে রাখা বাতিটা কখনো যাতে না নেভে তা দেখবার ভার ছিল আমার ওপরে। সেটা দেখি দীপদানি থেকে খসে পড়ে নিভে আছে। আমার অপরাধ ঢাকবার জন্য রান্নাঘরময় ছোটাছুটি করতে লাগলাম। বইটাকে আড়াল করলাম উনুনের নিচে। বাতিটা ঠিক করে রাখলাম।

'কালা হয়ে গেছিস না কি? ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?' শোবার ঘর থেকে ছুটে এসে চিৎকার শুরু করল নার্স।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম সামনের দরজায়।

'ঘুমোচ্ছিলি?' তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মনিব। আমার জন্য নাকি ওরা শীতে মরে গেল—অভিযোগ করল তার বৌ। আর ওর মা আমাকে একধার থেকে গালাগাল করতে লাগল। রান্নাঘরে ঢুকতেই পুড়ে যাওয়া মোমবাতিটা নজরে পড়ল তার। জিজ্ঞেস করল আমি এতক্ষণ কী করছিলাম?

বইটা পাছে দেখে ফেলে এই ভয়ে আমি পাথর হয়ে গেলাম। এইমাত্র যেন অনেক উঁচু থেকে পড়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বুড়ি চিৎকার জুড়ে বলতে লাগল যে ওরা যদি নজর না রাখত তবে আমি একদিন ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দিতাম। এরপর মনিব আর তার বৌ যখন খেতে এল, বুড়ি বলল, 'এই দেখ, গোটা মোমবাতিটা পুড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে। এখন বাকি শুধু ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দেয়া।'

রাতে খেতে বসে চারজনে মিলে আমার পূর্বের সমস্ত ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের উল্লেখে গাল দিতে লাগল। এর পরিণাম একদিন খুবই খারাপ হবে বলে শাসাল। কিন্তু আমি বুঝতাম যে ওদের এই ধরণের কথার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা

আমার ভাল করার সদিচ্ছা কিছুই নেই। যা আছে তা হল নিছক বিরক্তি, একঘেয়েমি। অবাক লাগছিল এই ভেবে যে, বইয়ের চরিত্রগুলোর তুলনায় ওরা কত নির্বোধ, কতই না তুচ্ছ।

খাওয়া হলে পেট বোঝাই করে ওরা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ঢুকল বিছানায়। বুড়ি প্রথমে ঈশ্বরের কাছে কিছু হিংস্র অভিযোগ জানিয়ে সুড়সুড় করে উনুনের ওপরে উঠে নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমিও তখন উনুনের নিচ থেকে বইটা বের করে এনে জানলায় গিয়ে বসলাম। জ্যোৎস্না রাত। পূর্ণ চাঁদের আলোয় ঝলমল্। কিন্তু ছাপার অক্ষরগুলো এত ছোট ছোট যে পড়া যায় না। অদম্য হয়ে উঠল পড়ার ইচ্ছে। তাক থেকে একটা তামার কড়া এনে তাতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত করে বইয়ের পাতায় ফেললাম। কিন্তু আরো খারাপ হল সেটা—আরো বেশি ঝাপ্সা হয়ে উঠল। শেষে কোণের দিকের বেঞ্চটায় দাঁড়িয়ে লেখাগুলো মূর্তির সামনের প্রদীপের আলোয় পড়তে লাগলাম। কখন যে ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চের ওপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানতেও পারিনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙল চেঁচামেচি আর কিল চড়ে। বুড়ি আমার সামনে দাঁড়িয়ে খালি পায়ে। পরনে কেবল রাত্রিবাস। রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা; মাথা নাড়ছে ঘন ঘন। আর বইটা হাতে নিয়ে আমার কাঁধের ওপরে মেরেই যাচ্ছে।

'আঃ! থাম মা. চিৎকার করবে না!' মাচার ওপর থেকে ভিক্তর গজ্‌গজ্ করে উঠল, 'নাঃ, তোমার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব!'

আমি ভাবলাম, বইটার আয়ু শেষ—নিশ্চয়ই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে।

পরের দিন প্রাতরাশের সময়ে আমারকাছে কৈফিয়ত চাওয়া হল, 'ও বইটা কোথায় পেয়েছিস?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করল মনিব।

মেয়েছেলে দুটি পাল্লা দিল কে বেশি গাল দিতে পারে আমাকে। ভিক্তর বইটা তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগল।

যখন বললাম যে বইটা পুরুতের, অবাক হয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল ওরা। পুরুত হয়ে উপন্যাস পড়ে জেনে একটু ক্ষুব্ধও হল। অবশ্য এতে ওরা খানিকটা শান্ত হল, তবুও মনিব আমাকে শাসিয়ে বলল পড়াশুনা করাটা ভীষণ বিপজ্জনক আর ক্ষতিকর।

'সেই যে যারা রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছিল, তারা এই বই-পড়ুয়ার দলই ছিল।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে ওকে বাধা দিয়ে ওর বৌ বলল, 'কি সব কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছ ওর মাথায়?'

দ্যে মঁতেপিয়োর বইটা নিয়ে আমি আর্দালির কাছে গেলাম। সব বললাম ওকে। কোন কথা না বলে সিদরভ বইটা টেনে নিল। তারপর ছোট একটা বাক্স খুলে পরিষ্কার একখানা তোয়ালে দিয়ে বইটা মুড়ে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

'আরে, কান দিসনে ওদের কথায়। এখানে পড়িস এসে।' বলল সিদরভ, 'আর কখনো যদি এসে দেখিস যে আমি বাড়ি নেই তবে মূর্তির পেছনে চাবিটা থাকবে, বাক্স খুলে যতক্ষণ ইচ্ছে, পড়িস।'

বই সম্পর্কে আমার মনিবদের ধারণাকে ধন্যবাদ। তার ফলেই বইয়ের ওপরে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ আর বিস্ময়ভরা রহস্যের ভাব আমার মধ্যে জেগে উঠল। কোন 'পড়ুয়ার দল' কোথাকার রেল লাইন উড়িয়ে দিয়ে কাকে খুন করতে গিয়ে-

ছিল তা নিয়ে এতটুকুও মাথা ব্যথা ছিল না আমার। কিন্তু তবুও আমি ভুলে যাইনি পাপ-স্বীকারের সময়ে পুরুতের সেই প্রশ্ন। ভুলিনি একতলার ঘরের সেই ছাত্রটির পড়ার কথা, 'ঠিক বই' সম্পর্কে স্মুরির মন্তব্য, কিংবা দাদুর কাছে শোনা সেই ফ্রীমেসনারদের কাহিনী—যারা গুহ্য বই পড়ত। আর গুহ্য তুক্‌তাক্ করে বেড়াত, 'তারপর একদিন জার আলেকজেণ্ডার পাভলভিচের সুখ-শান্তিভরা রাজত্বের সময় বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকেরা গুহ্য বই-পড়িয়ে আর ফ্রীমেসনারদের সঙ্গে চক্রান্ত করে ঠিক করল যে রুশবাসীদের রোমের জেসুইট সম্প্রদায়ের পোপের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু এগিয়ে এলেন তখন সেনাপতি আরাক্‌চেয়েভ। কত বড় কার খেতাব কিংবা কে কোন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে বিচার না করে ওদের সবাইকে ধরে ধরে সাইবেরিয়ায় পাঠালেন। সেখানে সাধারণ কয়েদীর মত খেটে খেটে নোংরা আবর্জনার মত পচে গলে তারা শেষ হল।

আরো মনে আছে 'নক্ষত্র খচিত প্রচ্ছায়া' আর 'গেরভাসি'র কথা। আর মনে আছে সেই গম্ভীর বিদ্রূপের বাণী, 'হায় রে! নির্বোধ জীব, রহস্য ভেদ করতে চাস আমাদের! কোন কালেই তোদের ক্ষুদ্র মন তার ধার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

মনে হত, আমি কি যেন এক বিরাট রহস্যের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আর এই অনুভূতি যেন ভূতে পাওয়া মানুষের মত করে তুলেছিল আমাকে। বইটা শেষ করার জন্য এক নিদারুণ ব্যাকুলতা আমার মধ্যে জেগে উঠল। ভয় হত আর্দালির রান্নাঘর থেকে পাছে বইটা হারিয়ে যায় কিংবা নষ্টই হয়ে যায় ছিঁড়েটিড়ে। তাহলে কি বলব দর্জির বৌয়ের কাছে আমি?

বুড়ি কড়া পাহারা দিতে লাগল আমাকে, যাতে আর্দালির ঘরে যেতে না পারি। চব্বিশ ঘণ্টা পেছনে লাগত আমার, 'এই বইয়ের পোকা, শোন, বই শুধু চরিত্র নষ্ট করতে শেখায়। ঐ বৌটাকে দেখ না, দিন রাত্তির বই নিয়ে পড়ে থাকে। বাজারে পর্যন্ত যেতে পারে না। আর সব সময়েই অফিসারদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাচ্ছে। বুঝি না, কেমন করে দিনের বেলায় ঘরে ঢোকায় তাদের?'

ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলি, 'মিছে কথা! তাদের সঙ্গে ওর কোন ফষ্টিনষ্টি নেই!'

কিন্তু দর্জির বৌয়ের পক্ষ টেনে কিছু বলতে সাহস হল না, পাছে অনুমানে বুঝে ফেলে বুড়ি যে বইটা তার।

বহুদিন দারুণ মনঃকষ্টে আমার দিন কাটতে লাগল। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। রাতে ঘুম আসত না। দ্যে ম'ভেপিয়ে'র ভাগ্যে যে কি আছে ভেবে ভেবে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। একদিন উঠোন দিয়ে যাবার সময় দর্জির রাঁধুনী আমাকে ডেকে বলল, 'বইটা ফেরত দিয়ে যেও!'

ঠিক করলাম দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মনিবেরা ঘুমোলে পর যাব। হতাশাভরা বিব্রতভাবে দর্জির বৌয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

যেমন দেখেছিলাম প্রথম দিন ঠিক তেমনিই দেখলাম। শুধু পোশাকটা অন্য। পরনে ধূসর রঙের স্কার্ট। গায়ে কালো মখমলের ব্লাউজ। গলায় ঝোলান নীল পাথরের একটা ক্রুশ। ওকে দেখে 'বৌ-কথা-কও' পাখির কথা আমার মনে পড়ল।

ওকে জানালাম যে বইটা শেষ করতে সময় পাইনি। বললাম, আমার বই

পড়তে বারণ। বলতে বলতে দুঃখের সঙ্গে আবার ওকে যে দেখতে পেয়েছি তার আনন্দ মিলে দুচোখ জলে ভরে উঠল।

'কি মূর্খের দল সব!' সুন্দর ভ্রূ-দুটো কুঁচকে বলল, 'আর আমি ভাবতাম তোমার মনিবের মুখখানা বেশ। যাকগে, মন খারাপ করো না। ভেবে চিন্তে ঠিক করব একটা উপায়। ওকে আমি চিঠি দেব!'

আতঙ্কিত হলাম। বললাম, 'মনিবের কাছে মিথ্যে বলেছি যে বইটা পুরুতের। দয়া করে লিখবেন না,' মিনতির সুরে বললাম, 'ওরা কেবল আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে আর আজে বাজে বলবে। আমাদের ঘরের কেউই দেখতে পারে না আপনাকে। ওরা আপনার সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করে, বলে, বোকা। আর বলে, আপনার পাঁজরার একটা হাড় নেই।'

কথাগুলো সব একই সঙ্গে স্রোতের মত ঠেলে এল। বলা শেষ হলে বুঝতে পারলাম, কথাগুলো অভদ্র। ওপরের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বৌটি হাঁটুর ওপরে একটা চড় মারল—যেন ঘোড়ার পিঠে উঠেছে সে। আমি নুয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দ্বিধা হও ধরণী আমি তোমার ভেতরে গিয়ে ঢুকি। কিন্তু সে হঠাৎ চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ে হাসির চোটে ফেটে পড়ল।

'ওঃ, কি বোকা, কি বোকা! কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?' আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন নিজের কাছেই প্রশ্ন করল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে উঠল, 'ভারি অদ্ভুত ছেলে তুমি—ভারি অদ্ভুত।'

ওর পাশের আয়নাটায় তাকিয়ে দেখলাম গালের হাড়দুটো উঁচু, থ্যাবড়া নাকওলা একখানা মুখ। কপালে লম্বা কাটা দাগ আর এক মাথা এলোমেলো চুল চারদিক দিয়ে ঝুলে আছে। এর জন্যই কি বলল 'ভারি অদ্ভুত ছেলে'? নিশ্চয়ই অদ্ভুত এই ছেলেটার সঙ্গে ঐ ফিট্‌ফাট্ চীনা পুতুলের কোন মিল নেই।

'তোমাকে সেদিন যে টাকাটা দিয়েছিলাম তা নাওনি। কেন নাওনি?'

'আমার প্রয়োজন ছিল না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল মহিলা, 'বেশ, তাহলে কি আর উপায় আছে। যদি কখনো ওরা পড়তে না দেয়, এস, আমি বই দেব।'

তাকের ওপরে তিনখানা বইয়ের মধ্যে আমি যেটা এইমাত্র ফিরিয়ে দিলাম সেটাই সব থেকে মোটা। কাতর চোখে বইটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একখানি ছোট গোলাপী রঙের হাত বাড়িয়ে দিল দর্জির বৌ আমার দিকে। বলল, 'আচ্ছা, তাহলে এস।'

একান্ত সন্তর্পণে তার হাতখানা একটু ছুঁয়েই তাড়াতাড়ি আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

হয়তো ওরা যা বলে তাই-ই ঠিক, কিছুই জানে না সে। এইত, বিশ কোপেককে সে বাচ্ছা ছেলেদের মত বলল টাকা!

কিন্তু তার ভেতরকার এই জিনিসটাই আমার ভাল লাগে।

নয়

আমার সেই হঠাৎ পড়ার নেশার জন্য কত না অপমান, কত না আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, কত না ভয়ে দিন যেত, সে কথা আজ ভাবতে মজাও লাগে, দুঃখও হয়।

মনে হয়েছিল দর্জির বৌয়ের বইগুলো বেশ দামী। বুড়ি গিন্নী যদি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে তাই সেগুলোর কথা মন থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তার বদলে ভোরবেলা রুটি আনতাম, রুটিওলার দোকান থেকে ছোট ছোট রঙচঙে বই আনতে আরম্ভ করলাম।

দোকানী লোকটা বিশ্রী চেহারার মানুষ। পুরু পুরু ঠোঁট, ঘাম চেটেচেটে, ময়দার তালের মত ফুলো ফুলো মুখ। সমস্ত মুখে ছোট ছোট আব আর কাটা দাগে ভরা। চোখদুটো ঘোলাটে। ফুলো ফুলো দুটো হাতে খাটো খাটো মোটা মোটা আঙুল। সন্ধ্যাবেলা ওর দোকানটা পাড়ার নষ্ট ছোকড়া-ছুকড়িদের আমোদ-কুঞ্জ হত। প্রায় প্রত্যেক দিন আমার মনিবের ভাই বিয়ার খেতে আর তাস খেলতে যেত ওখানে। প্রায়ই রাতের খাবার সময় আমাকে ডেকে আনতে হত তাকে সেখান থেকে। অনেক দিন দেখেছি দোকানের পেছনের ছোট ঘরটায় ভিড়ের ভেতরে দোকানীর নির্বোধ বৌটা হয় ভিক্তর বা অন্য কোন যুবকের কোলের ওপরে বসে আছে। বোধহয় দোকানী মোটেই রাগ করত না এতে। দোকানীর বোন খদ্দেরদের দেখাশুনায় সাহায্য করত দোকানীকে। সৈনিক গাইয়ে বা যে কেউই ওকে আলিঙ্গন করতে চাইলেও দোকানী মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না। দোকানে বিক্রির মালপত্র ছিল খুবই কম। কৈফিয়ত দিয়ে দোকানী বলত, নতুন দোকান—এখনো ঠিক ভাল মত গুছিয়ে উঠতে পারেনি; যদিও শরৎকালে দোকানটা খোলা হয়েছিল। খদ্দেরদের ও অশ্লীল ছবি দেখাত। যে চাইত তাকেই টুকে নিতে দিত কুৎসিত গান।

এক কোপেক দিয়ে আমি মিশা ইয়েভস্তিগ্নেয়েভের পানসে পানসে বইগুলো পড়তাম। এইটা খরচা পোষাত না। তাছাড়া পড়ে আনন্দ পেতাম না একদম। 'গিউয়াক বা অপরাজেয় সত্য', 'ফ্রানসিল ভেনেসিয়ান', 'রুশ কাবার্দীয় যুদ্ধ' বা 'প্রিয়তমের কফিনের ওপরে সুন্দরী মুসলমান তরুণীর মৃত্যু'—এই ধরণের সাহিত্য পড়ে কোন আনন্দ পেতাম না, বরং বিতৃষ্ণাই জেগে উঠত! এমন সব অসম্ভব ব্যাপার এত বিশ্রী ভাষায় লেখা থাকত, মনে হত বইগুলো যেন আমাকে বোকা বানাতে চায়।

তার চাইতে 'লক্ষ্যভেদী', 'ইউরি মিলোস্লাভস্কি', 'রহস্যময় পুরোহিত', 'তাতার অশ্বারোহী ইয়াপানচা' এই বইগুলো পড়ে বেশি খুশি হলাম। অন্তত মনে কিছুটা দাগ কেটে রেখে গেল। কিন্তু সব চাইতে বেশি লাগল 'সাধু সন্ন্যাসীর জীবন'। এর ভেতরে তবু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য কিছু ছিল। মাঝে মাঝে অন্তরেও নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। কেন জানি না পুরুষ শহীদদের কথা মনে হলেই মনে পড়ত সেই 'বাঃ বেশ' লোকটার কথা। নারী শহীদদের কথা এলে মনে পড়ত দিদিমাকে। আর ধর্মযাজকের কথায় মনে পড়ত আগের সেই সুদিনের দাদুকে।

চিলেকোঠায় কিংবা কাঠ ফালি করবার গুদাম ঘরে গিয়ে বসে বই পড়তাম। দুটো জায়গাই যেমনি ঠাণ্ডা তেমনি অস্বস্তিকর। যদি বইটা খুবই ভাল লাগত কিংবা তাড়া থাকত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফিরিয়ে দেবার জন্য, রাতে উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তাম। কিন্তু বুড়ির খেয়ালে এল মোমবাতিটা রাত্রে কমে যায়, তাই একটুকরো কঞ্চি দিয়ে মেপে কাঠটা লুকিয়ে রাখত। আমিও কাঠটা খুঁজে খুঁজে বের করতাম; তারপর মাপ মত ভেঙে ঠিক ঠাক রেখে দিতাম আবার। কিন্তু যেদিন

পারতাম না আর ভোরে উঠে বুড়ি যদি তার মাপের সঙ্গে মোমবাতিটাকে মিলিয়ে গরমিল দেখত তবেই সেদিন রান্নাঘরে এমন চিৎকার তুলত যে এক একদিন দারুণ ক্ষেপে মাচার ওপর থেকে চিৎকার করে উঠত ভিক্তর, 'তোমার ঘেউ ঘেউ থামাও মা। তোমার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব! ও নিশ্চয়ই বাতি জ্বেলে বই পড়ে। আমি দেখেছি ওকে দোকান থেকে বই আনতে। চিলেকোঠায় দেখ গিয়ে খুঁজে!'

বুড়ি ছুটে যায় চিলেকোঠায়। খুঁজে একটা ছোট বই পেয়েই সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে কুটিকুটি করে।

আঘাতটা যে কঠিন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে আমার পড়ার স্পৃহা আরো বেড়ে উঠল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যদি কেউ একজন সাধুও স্বর্গ থেকে নেমে আসত এ বাড়িতে, তাহলে আমার মনিব-গিন্নীরা তাকেও মনের মত করে গড়ে তোলার জন্যে চাল চলন শিক্ষা দিতে লাগত। আর এটা করত সে জন্যেই, কারণ তাদের হাতে করার মত আর কোন ভাল কাজ ছিল না। ওরা এইসব ঝগড়া চেঁচামেচি পরনিন্দা-পরচর্চা যদি না করত তবে ওরা বোবা হয়ে যেত—নিজেদের শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলত; ভুলে যেত নিজেদের। অন্যের সঙ্গে সচেতন সম্পর্কে আসতে পারলেই মানুষের নিজের সম্পর্কে সচেতনতা আসে। কিন্তু আমার মনিবেরা একটা মাত্র সম্পর্কের কথাই জানত দুনিয়ায়—তা হল গুরুমশাইগিরি আর বিচারকের সম্পর্ক। যদিও কেউ ঠিক ওদের চালচলনে, ওদেরই মত করে তার জীবনকে গড়ে তোলে তবুও ওরা তারই জন্যে তার সমালোচনা করবে। এমনিই স্বভাব ওদের।

পড়ার জন্য নানান ফন্দিফিকির বের করলাম। বুড়ি অনেকবার আমার বই ছিঁড়ে দিয়েছিল যার জন্য শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় এলাম যে দোকানীর কাছে সাত-চল্লিশ কোপেকের এক বিরাট ঋণে পড়ে গেলাম। দোকানী দাবি করল, এক্ষুণি দেনা শোধ করতে হবে। নইলে সকালে রুটি কিনতে গেলে মনিবের পয়সা থেকে কেটে রাখবে বলে শাসাল।

'কেমন মজাটা হবে তা হলে?' আমাকে খোঁচা মেরে বলল দোকানী।

অসহ্য বিরক্তিকর লাগে লোকটাকে আমার। সে তা টের পেত মনে হয়। কারণ নানান সুযোগে আমাকে শাসিয়ে, গালাগাল করে, সে খুশি হত। আমি যখনই দোকানে ঢুকতাম, ময়দার তালের মত তার মুখটা দাঁত বের করে থাকত।

'ধারের পয়সা এনেছিস?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করত।

'না।'

সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্ত হত। কপাল কোঁচকাত।

'না? তাহলে তোকে নিয়ে কী করব আমি? আদালতে নালিশ ঠুকব? ওরা জাহাজে পুরে তোকে দূর দেশের কোন কিশোর-জেলে চালান করে দিক?'

পয়সা যোগাড় করার কোন উপায় ছিল না আমার। কারণ দাদুর হাতে আমার মাইনে দেয়া হয়। কী যে করব জানি না। দোকানীকে যখন বললাম কয়েক দিন অপেক্ষা করতে, তখন ভাজা পিঠের মত তেলতেলে মোটা হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'চুমু খা। তাহলে অপেক্ষা করব।'

ওর কাউন্টার থেকে একটা বাটখারা তুলে ওর মাথাটার দিকে তাক করে উঁচিয়ে ধরলাম। মাথাটা নিচু করে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, আরে করিস কী? আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

বুঝতে পারলাম ও মোটেই তা করেনি। ঠিক করলাম ওর কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য চুরি করে মিটিয়ে দেব পয়সাটা। সকালে মনিবের পোশাক যখন ঝাড়তাম তখন প্রায়ই দেখতাম খুচরো পয়সা থাকত পকেটে। কোন কোন দিন মেঝের ওপরে ছড়িয়ে পড়ত। একবার একটা বিশ কোপেকের মুদ্রা গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির তলার কাঠের স্তূপের নিচে চলে গিয়েছিল, সেটা মনিবকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পর হঠাৎ যখন সেটা কাঠের ভেতরে কুড়িয়ে পেলাম তখন মনে পড়ল। পয়সাটা মনিবকে ফিরিয়ে দিতে বৌ বলল, 'দেখলে তো? পকেটে রাখার সময়ে পয়সাকড়ি গুণে রেখ।'

'আরে, ও চুরি করবে না!' আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিল মনিব।

কিন্তু এখন চুরি করব ভাবতেই তার কথাটা মনে পড়ে গেল। চোখের ওপর ভেসে উঠল তার একান্ত বিশ্বাসভরা মৃদু হাসি। চুরি করাটা শক্ত হয়ে উঠল আমার কাছে। বহুদিন তার পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করেছি। গুণেছি, আবার রেখে দিয়েছি পকেটে। তিনদিন লড়লাম নিজের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ খুব সহজেই সমস্যাটার সমাধান হল।

'কী হয়েছে তোর আজকাল, পেশকভ?' অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞেস করল মনিব, 'যেন তুই আর সেই তুই নোস। শরীর খারাপ করেছে না কি?'

অকপটে আমার দুশ্চিন্তার কারণটা খুলে বললাম তাকে।

'দেখ দেখি বই কোথায় এনে ফেলেছে তোকে,' ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'যেমন করেই হোক বই নিশ্চয়ই তোর অনিষ্ট ডেকে আনবে। এ কথা জেনে রাখিস।'

সে আমাকে পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে একটু শাসিয়ে দিল, 'খবর্দার, আমার বৌ বা মা যেন এটা জানতে না পারে। তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে।'

তারপর একটু মৃদু হেসে বলল, 'তুই একটা একরোখা ভূত, যাকগে। খুব খারাপ লক্ষণ নয়। কিন্তু ঐ বই পড়াটা ছেড়ে দে! নতুন বছর থেকে খুব ভাল খবরের কাগজ আনাব। তখন পড়তে পাবি অনেক কিছু।

করলও তাই। সন্ধ্যার চায়ের পর্ব থেকে রাতের খাবার সময় পর্যন্ত মনিবদের 'মস্কো ইস্তাহার' পড়ে শোনাতাম। ওতে বেরুত ভাশকভ, রকশানিন, রুদনিকভস্কি ও আরো অন্যান্য লেখকের উপন্যাস। কর্মহীন একঘেয়েমীতে ভুগছে যারা তাদের উদ্দেশ্যেই ঐ উপন্যাসগুলো লেখা।

জোরে জোরে পড়তে আমার খারাপ লাগত। তাতে মূল বক্তব্য বোঝার দিক থেকে অসুবিধা হত আমার। কিন্তু আমার শ্রোতারা খুব মনযোগ দিয়ে পরম উৎসাহ আর শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। নৃশংসতার ঘটনা শুনে মুখ হাঁ করে আঁৎকে উঠত। আর পরস্পর গর্বের সঙ্গে বলাবলি করত, 'ভগবান রক্ষা করেছেন। এখানে আমরা কেমন শান্তভাবে সুখেশান্তিতে সংসার করছি। কি ঘটছে না ঘটছে বাইরে তার ধার ধারি না।'

সব কিছুই ঘুলিয়ে ফেলত ওরা। বিখ্যাত দস্যু চুরকিনের কার্যকলাপ চাপিয়ে দিত কোচয়ান ফোমা কুচিনার ঘাড়ে। অনবরত নাম ওলট-পালট করে ফেলত। তারপর আমি যখন সেগুলো শুধরে দিতাম, তখন অবাক হয়ে বলাবলি করত, ছেলেটার কী মাথা!'.

'মস্কো ইস্তাহারে' প্রায়ই লিওনিদ গ্রাভের কবিতা ছাপা হত। আমার খুবই

ভাল লাগত সেগুলো। টুকে নিতাম নোট বইয়ে। কিন্তু আমার মনিব-গিন্নীরা কবির সম্পর্কে বলত, 'দেখ দেখি একবার—বুড়োমানুষ কিনা কবিতা লেখে!'

'সেটা ওর মত একটা মাতাল, দুর্বল চরিত্রের লোকের এমন কি বেশি কথা!'

স্ত্রুঝখিন আর কাউন্ট মেমেন্তো-মোরির কবিতা আমার ভাল লাগত, কিন্তু বুড়ি আর যুবতী দুই গিন্নীরই মত ছিল যে, 'কবিতা হচ্ছে নেহাৎ বাজে জিনিস, ভাঁড় আর নাটুকেরাই শুধু পদ্য আওড়ায়।'

কি ভীষণ বিরক্তিই না লাগত যখন শীতের সন্ধ্যায় সেই দম আটকে আসা ছোট ঘরটায় মনিবদের চোখের সামনে বসে থাকতে হত। জানালার বাইরে মৃত্যু-স্তব্ধ রাত। থেকে থেকে জেগে উঠছে তুষার পড়ার অস্পষ্ট শব্দ। কিন্তু এখানে বরফের মধ্যে জমে যাওয়া মাছের মত সবাই টেবিল ঘিরে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের গায়ে, জানলার কাছে ঝড়ো হাওয়া ঝাপটা মারত। তীব্র আর্তনাদ করে চিমনি বেয়ে নামত। ড্যাম্পার কোঁকিয়ে উঠত, আর বাচ্চাদের ঘর থেকে ভেসে আসত শিশুদের কান্না। ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে নিরালা অন্ধকারে বসে নেকড়ের মত গর্জন করি।

মেয়েছেলেরা টেবিলের একপাশে বসে সেলাই করত, নয়ত মোজা বুনত। আর অন্যপাশে বসে একান্ত অনিচ্ছায় ভিক্টর কোন নকসা নকল করত, আর থেকে থেকে খেঁকিয়ে উঠত, 'সাবধান, টেবিল নাড়িও না বলে দিচ্ছি। দেখছি তোমাদের সঙ্গে বাস করাই অসম্ভব! যতসব কাদাখোঁচার দল।

একপাশে কিছুটা দূরে বসে মনিব বড একটা ফ্রেমে টেবিল ক্লথে বুটি তোলে। তার দ্রুত সঞ্চালিত আঙ্গুলের তলায় ভেসে উঠেছিল লাল রঙের কাঁকড়া, নীল রঙের মাছ, হলদে প্রজাপতি, বাদামী রঙের শরতের পাতা। এসব নিজেই এঁকেছে। গত তিন শীত ধরেই এঁকে আসছে। এতে ওর বিরক্তি ধরে গেছে। তাই দিনের বেলা আমার হাতে যখন কোন কাজ থাকত না তখন বলত, 'টেবিল ক্লথটাতে একটু হাত লাগা তো পেশকভ।'

মোটা সূঁচটা নিয়ে আমিও শুরু করে দিতাম। সব সময়েই মনিবের জন্য আমার দুঃখ হত। যতটুকু পারি সাহায্য করতে চাইতাম আমি। আমি ভাবতাম ঐ নকসা আঁকা টেবিল ক্লথে এমব্রয়ডারি তোলা, তাস খেলা ইত্যাদি ছেড়ে সে খুব চিত্তাকর্ষক কিছু একটা করবে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত সেই লোকটা হঠাৎ হাতের যেন এই প্রথম সেটা তার চোখে পড়ল। তখন সে নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। চুলগুলো গালের ওপরে বেয়ে পড়ত। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত গির্জার শিক্ষার্থীদের মত।

'কী ভাবছ?' ওর বৌ জিজ্ঞেস করত।

'তেমন কিছু না।' আবার কাজ শুরু করে দিয়ে বলত।

'তেমন কিছু না।' আবার কাজ শুরু করে দিয়ে বলত।

অবাক হয়ে চুপ থাকতাম। মানুষ মানুষকে কি করে জিজ্ঞেস করে যে সে কি ভাবছে? কেমন করেই বা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব? মানুষ একই সঙ্গে ভাবে অনেক কিছুই—যা চোখের সামনে দেখছে এই মুহূর্তে, যা দেখেছে কাল বা গত বছর—এ সবের তালগোল পাকানো অস্পষ্ট ছায়া প্রতিমুহূর্তেই আবর্তিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে।

'মস্কো ইস্তাহার'এ যা লেখা থাকত তাতে গোটা সন্ধ্যাটা কাটত না। আমি প্রস্তাব করলাম একদিন শোবার ঘরের খাটের তলায় যে মাসিক পত্রিকাগুলো জড় করে রাখা হয়েছে সেগুলো এনে পড়া যাক।

'ওগুলোতে পড়ার কী আছে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল ছোটগিন্নী, কেবল তো ছবিতে ভর্তি।

কিন্তু শুধু 'সচিত্র পত্রিকাই' ছিল না খাটের তলায় সেখানে 'অগ্নি শিখা'ও ছিল। তার ভেতর থেকে আমরা সালিয়াসের 'কাউন্ট ভিয়াতিন-বালতিইস্কি' পড়তে শুরু করলাম। গল্পের বোকা নায়ক তরুণ ভদ্রলোকের ব্যর্থ অভিযানের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে হাসির চোটে মনিবের ভুগাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ল।

'ওঃ কী অদ্ভুত!' চিৎকার করে উঠল মনিব।'

'এসব গল্প তো বানান।' ওরও যে একটা স্বমত আছে তা প্রকাশ করার জন্য বলে উঠল ওর বৌ।

খাটের তলায় সেই পত্রিকাগুলো দারুণ উপকার করল আমার। মাসিক পত্রগুলো রান্নাঘরে নিয়ে রাত্রে পড়ার অধিকার অর্জন করলাম আমি।

কপাল ভাল যে নার্স একটা লাগাতার পানোৎসব উপলক্ষ্যে চলে যেত বলে বুড়ি শোবার ঘরে ঘুমোতে শুরু করেছিল। অবশ্য ভিক্টর কখনোই আমার পড়ায় বাধা দিত না। সবাই ঘুমোলে সে পোশাক-আশাক পরে রাত্রের মত বাইরে চলে যেত; ফিরত ভোরবেলা। গিন্নী বুড়ি প্রায়ই মোমবাতিটা অন্য ঘরে নিয়ে রাখত যাতে আমি অন্ধকারে থাকি। মোমবাতি কেনার মত পয়সা না থাকায় গোপনে দীপদানী থেকে মোম সংগ্রহ করতে লাগলাম। তারপর খালি মাছের একটা টিন যোগাড় করে মূর্তির সামনে প্রদীপ থেকে কিছুটা তেল ঢেলে সুতো পাকিয়ে পল্‌তে করে দিলাম। এমনি করে ধোঁয়াটে একটা আলো তৈরি করে নিয়ে রাখতাম উনুনের ওপরে

যখনই বিরাট আকারে সেই বইটার পাতা ওল্টাতাম, দীপশিখার সেই লাল ছোট জিভটা কেঁপে কেঁপে আমাকে ভয় দেখাত নিভে যাবে বলে। পল্‌তেটা ক্রমশই সেই নোংরা গন্ধভরা মোমের ভেতর ডুবে যেত আর ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বালা করে উঠত। কিন্তু ছবি দেখে আর তার নিচের ব্যাখ্যাগুলো পড়ে যে আনন্দ পেতাম তার তুলনায় ঐ সব ছিল অতি তুচ্ছ বাধা।

বিরাট বিরাট নগরী, আকাশ-চুম্বী পাহাড়-পর্বত আর সুন্দর সুন্দর সমুদ্রতীরে ভরা এই পৃথিবী সম্পর্কে আমার ধারণা ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে পড়তে লাগল। জন ও জনপদ, আর বিষয়বস্তুর যত বৈচিত্র আমার উপলব্ধির মধ্যে ধরা পড়তে লাগল ততই জীবন যেন এক অপূর্ব বিস্তৃতি নিয়ে ফুটে উঠল; আকর্ষণীয় হয়ে উঠল পৃথিবী। ভলগার ওপারের ঐ বিশাল সুদূরের দিকে চোখ রেখে অনুভব করলাম ওটা শুধুই একটা বিরাট শূন্যতা নয়—তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি। পাড়ের সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে থেকে আমার অন্তর এতকাল শুধু ভারাক্রান্তই হয়ে উঠত। মাঠের ওপারে বন-রেখা ঘিরে মেঘ-মেদুর হিমেল আকাশ। মাটি—নিঃসঙ্গ, শূন্য। আমার অন্তরও শূন্য তেমনি। কী এক কোমল বেদনায় ব্যাকুল। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে। ভাবনা-চিন্তার কিছুই নেই। শুধু ইচ্ছে হত চোখ বুজে পড়ে থাকতে। জনমানব শূন্য সেই মরুপ্রান্তরের বুকে কোন আশা নেই, সব কিছু কামনা-বাসনা মুছে নিয়ে গেছে যেন অন্তর নিংড়ে।

ছবিগুলোর নিচে সহজ সরল ভাষায় লেখা থাকত অন্য দেশ, অন্য মানুষের কথা। অতীত বর্তমানের বহু কাহিনী লেখা থাকত—যার অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। এতে আমার বিরক্তি লাগত মাঝে মাঝে ; 'অধিবিদ্যা' 'হিলিয়জাম' 'চার্টিস্ট' প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের শব্দের তোড়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করত। শব্দগুলো বড় হতে হতে মনের সবটুকু অংশ জুড়ে, আর সবকিছুই আবর্তিত করে ফেলে জ্বালিয়ে মারত। মনে হত এই শব্দগুলোর অর্থ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি কখনো আর কিছুই বুঝে উঠতে পারব না। যেন এরাই সমস্ত রহস্যের দুয়ার বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের মাংস কেটে খোঁচা বেঁধার মত প্রায়ই একটা গোটা বাক্য আমার স্মৃতিতে বিঁধে যেত। তখন আর ভাবতে পারতাম না কোন কিছুই।

মনে আছে কয়েকটা অদ্ভুত লাইন পড়েছিলাম :

'ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির ওপর আসছে আতিল্লা
বর্মে চর্মে সুসজ্জিত হয়ে আসছে হূন সর্দার
কবরের অন্ধকারের মত কাল আর নিস্তব্ধ।'

তার পেছনে পেছনে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে কালমেঘের মত যোদ্ধার দল থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে :

'কোথায় রোম, কোথায় সেই পরাক্রান্ত রোম ?'

রোম একটা নগরীর নাম জানতাম। কিন্তু 'হূন' কারা ? কথাটার অর্থ খুঁজে বের করতে হবে।

একদিন সুযোগ এলে, মনিবকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হূন ?' একটু অবাক হয়ে সে বলল, 'শয়তানই জানে কারা ওরা। সব বাজে কথা।' তারপর বিরক্তির সঙ্গে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'তোর মাথাটা সমস্ত বাজে জিনিসে ভরা, বুঝলি পেশকভ, খুবই খারাপ এ সব।'

ভালই হোক আর খারাপই হোক আমাকে জানতে হবেই।

ভাবলাম সেনাবাহিনীর পুরুত সলভিয়ভ জানেন নিশ্চয়ই হূন কারা! একদিন উঠোনে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা লোকটার। সব সময়েই অসুখে ভুগছে, খিট্‌খিটে মেজাজ তাই। চোখদুটো লাল। ভ্রূ নেই, সামান্য একটুখানি হলদে দাড়ি।

'দরকার কী তোর ?' হাতের কালো লাঠিটা দিয়ে কাদার ভেতরে খোঁচাতে খোঁচাতে জিজ্ঞেস করল।

লেফ্‌টেন্যান্ট নেস্তেরভকে জিজ্ঞেস করলাম যখন, উত্তরে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে গর্জে উঠল, 'কী ?'

ঠিক করলাম, ওষুধের দোকানের রাসায়নিককে জিজ্ঞেস করব। লোকটা সহৃদয়। মুখখানা বুদ্ধিদৃপ্ত। লম্বা নাকের ওপরে সোনার ফ্রেমের চশমা আঁটা।

'হূন ?' বলল রাসায়নিক পাভেল গোল্ড্‌বের্গ, 'কিরগিজ্‌দের মত ওরাও এক রকমের যাযাবর জাতি। ওদের বংশ এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে মরে।

শুনে মনটা দমে গেল। বিরক্ত হলাম। হূনরা শেষ হয়ে গেছে বলে নয়, মনটা দমে গেল, যে শব্দটা এতখানি ভোগাল আমাকে তার মানে কিনা এত সহজ, এত সামান্য !

তবু হুনদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতার পরে আমাকে কোন শব্দই আর তেমন তাড়া দিত না। এ ছাড়া ধন্যবাদ আতিল্লাকে, ওরই দৌলতে রাসায়নিক গোলড্‌বের্গের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। সাধু ভাষার সমস্ত শব্দের সহজ সরল মানে জানত ভদ্রলোক আর সমস্ত গোপন রহস্যের চাবিকাঠি ছিল তার দখলে। দু'আঙুলে চশমাটা সামলে নিয়ে পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে স্থির চোখে আমার দিকে তাকাত। আর এমনভাবে কথা বলত যাতে মনে হত গজাল ঠুকে ঠুকে কথাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার মাথার মধ্যে।

'শব্দ হল গাছের পাতার মত, বুঝলে হে খুদে বন্ধু! সুতরাং, পাতাগুলোর গঠন এমন কেন, সেটা জানতে হলে আগে জানতে হবে গাছ জন্মায় কেমন করে। তারজন্য তোমাকে বই পড়তে হবে। বুঝলে বন্ধু, বইগুলো ঠিক যেন একটা সুন্দর বাগান। ওর ভেতরে যা কিছু আনন্দের, যা কিছু উপকারী সব তুমি খুঁজে পাবে।'

বড়দের জন্য প্রায়ই সোডা আর ম্যাগনেসিয়া নিয়ে আসতে যেতাম ওর দোকানে। কারণ একটানা ওরা অম্লের ব্যথায় ভুগত। বাচ্চাদের জন্যে ক্যাস্টর অয়েল বা অন্য কোন জোলাপ আনতে যেতাম। রাসায়নিকের সুষ্ঠ উপদেশের ফলে বই সম্পর্কে আমার মনে আরো দায়িত্বশীল একটা মনোভাব জেগে উঠল। এরপর থেকে মাতালের কাছে মদের মতই নিজের অজান্তেই বইগুলো আমার জীবনে এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ল।

ওরা আমার চোখের ওপর তুলে ধরল এক অন্য জীবন। বিপুল কামনা, বিপুল আবেগে পূর্ণ সে জীবন মানুষকে নিয়ে যায়, কাউকে অপরাধের পথে, কাউকে বীরত্বের পথে। লক্ষ্য করে দেখেছি আমার ধারেকাছে যত সব মানুষ তারা অপরাধ কিংবা বীরোচিত কোন কিছুই করতে পারে না! বইয়ের মধ্যে যে জীবনের সন্ধান পাই, সে জীবন থেকে সম্পূর্ণ তফাতে থেকে ওরা জীবন কাটায়। তাই ওদের জীবনে চিত্তাকর্ষক কোন কিছুরই হদিস মিলত না। এইটুকুই বুঝলাম, শুধু ওরা যেভাবে বেঁচে থাকে তেমনিভাবে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

ছবির তলার লেখাগুলো পড়ে জানলাম যে প্রাগ্‌, লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি শহরে নোংরা আবর্জনাভরা কোন নালা ডোবা নেই। রাস্তাগুলো সোজা চওড়া। গির্জে আর বাড়িগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। শীতের ছ মাস মানুষকে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে কাটাতে হয় না। তাছাড়া এমন কোন লেণ্ট মাস সেখানে নেই যখন কিনা শুধু নোনা বাঁধাকপি, ব্যাঙের ছাতা কিংবা ওটের ময়দা আর তিসির তেলে ভাজা আলু খেয়ে কাটাতে হয়। লেণ্ট মাসে বই পড়া বারণ বলে আমার কাছ থেকে সচিত্র মাসিক পত্রিকাটা নিয়ে নেওয়া হল। অগত্যা শূন্য এক উপোসী জীবন কাটাতে লাগলাম। এর মধ্যে বইয়ে পড়া জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনটাকে তুলনা করে দেখতে শিখেছি বলে এই জীবন আরো বেশি নোংরা কুৎসিত লাগতে শুরু করল। পড়াশুনার জন্য নিজেকে আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিমান মনে হল। বেশি করে পড়াশুনার সময় পাবার জন্য একটা জিদ ধরে সমস্ত কাজে লাগলাম। বই না পেলে নিজেকে কেমন যেন অস্থির, অলস বোধ হত! এমন একটা অসুস্থ, অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম যা এর আগে কখনো হত না।

মনে পড়ে এই রকম অলস আনন্দহীন দিনগুলোর মাঝে একদিন দারুণ রহস্য-

জনক এক ঘটনা ঘটল। একদিন রাতে সবাই উঠে আলুথালুভাবে জানলার ধারে ছুটে এসে দাঁড়াল।

'পাগলা ঘন্টি? আগুন লেগেছে?' পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল।

পাশের ফ্ল্যাটের লোকজনদের চলাফেরার শব্দ শুনতে পেলাম, দরজা ধাক্কানর শব্দ। কে যেন ঘোড়ার একটা লাগাম ধরে টানতে টানতে উঠোনের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। গির্জেয় ডাকাতি হয়েছে বলে চেঁচিয়ে উঠল গিন্নী বুড়ি। কিন্তু মনিব তাকে থামিয়ে দিল, 'চুপ কর মা, ওটা যে পাগলা ঘন্টি নয় তা সবাই জানে।'

'বেশ, তাহলে নিশ্চয়ই বিশপ মারা গেছেন…'

মাচার ওপর থেকে ভিক্তর নেমে এল।

'আমি বলতে পারি; আমি জানি কি হয়েছে।' কাপড়চোপড় সামলাতে সামলাতে বিড়বিড় করে বলে উঠল সে।

আকাশের গায়ে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে কি না দেখবার জন্য মনিব আমাকে চিলেকোঠায় পাঠাল। ছুটে ওপরে উঠে এলাম। তারপর ছাদের কিনারার একটা ঘুলঘুলি দিয়ে তাকালাম। আগুনের আভা নেই কোথাও। শান্ত জমাট বাতাসের ভেতর দিয়ে কেবল ভেসে আসছে বিরাট একটা ঘন্টার শব্দ। ছুটে যাওয়া অদৃশ্য লোকজনের পায়ের তলাকার বরফ মরমরিয়ে উঠছে। জেগে উঠছে ধাবমান স্লেজের কিচির কিচির শব্দ। আর কেবল অশুভ সূচক ধ্বনি তুলে ঘন্টা বেজেই যাচ্ছে। আমি নিচে নেমে এলাম।

'কোথাও আগুন দেখা যাচ্ছে না।'

'দেখলে তো!' বলল মনিব। এর মধ্যেই সে টুপি আর কোট পরে তৈরি হয়ে নিয়েছিল। কলারটা তুলে অস্থিরভাবে গালোশের ভেতর পা ঢোকাবার চেষ্টা করল।

'যেও না, যেও না!' মিনতির সুরে বলল ওর বৌ।

'বাজে বোক না!'

ভিক্তরও কোট টুপি পরে তৈরি হয়ে নিয়েছে। একাধিকবার সে এ কথা বলে সবাইকে খেপিয়ে তুলল, 'এটা কি আমি জানি!'

দুভাই বেরিয়ে গেলে মেয়েরা আমাকে হুকুম করল সামোভার গরম করতে। ওরা জানলায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনিব ফিরে এসে দোরের ঘন্টায় শব্দ করল। তারপর ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে হলঘরের দরজা খুলে গম্ভীর গলায় বলল, 'জার খুন হয়েছেন!'

'খুন! কি বলছ!' অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি গিন্নী।

'হাঁ, খুন হয়েছেন। একজন অফিসার আমাকে বলল। কী হবে এখন?'

কিছুক্ষণ পর ভিক্তরও এসে ঘন্টা বাজাল। তারপর জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'আর আমি ভেবেছিলাম কিনা যুদ্ধ!'

তারপর সবাই মিলে চা খেতে খেতে চাপা স্বরে একান্ত সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। বাইরে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। ঘন্টার ধ্বনি গিয়েছিল থেমে। দুদিন যাবত লোকজন চাপা গলায় আলোচনা করল; এর বাড়ি তার বাড়ি গেল। অভ্যাগতদের ডেকে বসাল, যা ঘটেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার আলোচনা করল। ব্যাপারটা ধাতস্থ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কিন্তু খবরের কাগজটা মনিব সরিয়ে রাখল আমার কাছ থেকে। সিদরভকে যখন জিজ্ঞেস করলাম

জারকে কেন ওরা খুন করেছে, সে চুপি চুপি বলল, 'এসব কথা আলোচনা করা নিষিদ্ধ।'

ঘটনাটা দুদিনেই সবাই ভুলে গেল। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। এরপরেই এল আমার জীবনে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এক রবিবার বাড়ির সকলে সকালের উপাসনা আসরে চলে গেলে পরে প্রথমে সামোভার গরম করে আমি ঘর-দোর গোছাচ্ছিলাম। এই সময় বড় বাচ্চাছেলেটা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপর সামোভারের গা থেকে ট্যাপটা টেনে খুলে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলায় গিয়ে খেলতে থাকে। সামোভারের নলটা জ্বলন্ত কয়লায় ঠাসা ছিল। আর তাই সব জল পড়ে যেতেই গোটা নলটারই রাং-ঝালা গলে গেল। পাশের ঘর থেকে সামোভারটার অদ্ভুত ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢুকতেই ভয়ে চক্ষু ছানাবড়া হল। সামোভারটা কালো হয়ে কম্পজ্বরের মত থরথর করে কাঁপছে। ঝালা খুলে যাওয়া নলটা, যেটার সঙ্গে ট্যাপটা আটকানো ছিল সেটা অসহায়ের মত দুলছে। ঢাকনাটা কাত হয়ে পড়েছে। হাতল বেয়ে ঝরে পড়ছে গলিত সীসা। নীলচে কালো সামোভারটাকে একটা মাতালের মত মনে হচ্ছে। ওটার ওপরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতেই, হিস্‌হিস্ শব্দ করে সেটা মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দোরের ঘণ্টায় শব্দ হল। গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। বুড়ির প্রথম প্রশ্নই হল সামোভার ফুটছে কি না।

'হাঁ, ফুটছে।' ছোট্ট করে জবাব দিলাম।

জবাবটা উঠে এসেছিল ভয়ে আর লজ্জায়। কিন্তু সেটাকে পরিহাস করার একটা খারাপ প্রচেষ্টা ধরে নিয়ে সেই মত শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হল। দারুণ মার দিল আমাকে। বুড়িটা এক আঁটি পাইনের ডাণ্ডা শেষ করল। তেমন ব্যথা যে লেগেছিল তা নয়, কিন্তু অসংখ্য কাঁটা মাংস ফুড়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে পিঠটা ফুলে একটা বালিশের মত হল। আর পরের দিন মনিবকে দুপুরের দিকে আমাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হল।

ডাক্তারটার এমন অদ্ভুত লম্বা আর রোগা চেহারা যে দেখলেই হাসি পায়। আমাকে পরীক্ষা করে দেখে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আমি একটা সরকারী এজাহার লিখে দেব।'

মনিবের মুখচোখ লজ্জায় লাল হল। উস্‌খুস্ করতে লাগল সে। শেষে অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে ডাক্তারকে কী সব বলতে লাগল। কিন্তু ডাক্তার রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, এ চলতে পারে না। কোন অধিকার নেই।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'নালিশ করতে চাও তুমি?'

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল পিঠে, তাই বললাম, 'না, চাই না। বরং তাড়াতাড়ি আমার একটা ব্যবস্থা করুন।'

ওরা আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে টেবিলের উপরে শুইয়ে দিল। তারপর ডাক্তার অদ্ভুত একটা আরামদায়ক ঠাণ্ডা চিমটের সাহায্যে কাঠের কাঁটাগুলো তুলতে তুলতে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন, 'তোমার পিঠের চামড়া নিয়ে বেশ একখানা বালিস বানিয়েছ তো খোকা। বর্ষাতির কাপড়ের মত এখন থেকে তোমার গায়েও জল ঢুকবে না আর।'

অসহ্য সুড়সুড়ি দিয়ে কাজ শেষ করে বললেন, 'বিয়াল্লিশটা টুকরো তুলেছি, বুঝলে খোকা? সঙ্গীসাথীদেরকে গর্ব করে বলতে পারবে! কাল আবার এই সময়ে এসে ব্যাণ্ডেজ বদলে যেও। তোমাকে প্রায়ই মারে, না?'

'আগে আরো বেশি মারত।' সামান্য ইতস্তত করে বললাম।

গম্ভীর গলায় হেসে উঠলেন ডাক্তার, 'যা কিছু ঘটে ভালর জন্যেই, বুঝলে খোকা, ভালর জন্যেই ঘটে।'

আমাকে মনিবের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, ঠিক নতুনের মত ভাল করে দিয়েছি। কাল আবার পাঠিয়ে দেবেন, নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে দেব। আপনাদের কপাল ভাল যে ছেলেটার রাসকতা বোধ আছে।'

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বাড়ি ফেরার পথে মনিব আমাকে বলল, 'আমাকেও মার খেতে হয়েছে, বুঝলি পেশকভ। কী করা যাবে বল? আর কী মারটাই না মারত, ভাই! তোর জন্য দুঃখ করার মত তবু তো আমি রয়েছি, কিন্তু আমার জন্য কেউ ছিল না। একেবারেই কেউ না। চারিদিকে এত লোক কিন্তু কোন ব্যাটা বেজন্মাই দরদ দেখাত না। হায় রে, সব এমন কুঁদুলে মুরগীর ছানা!'

গোটা পথটাই মনিব এই রকমের কথা বলল। ওর জন্য দুঃখ হচ্ছিল, আমার জন্য এমন সমবেদনাভরা কথা শুনে কৃতজ্ঞতা বোধ হচ্ছিল।

বাড়ি এলে বিজয়ী বীরের মত সম্বর্ধনা পেলাম। ডাক্তার কি বললেন, কাঠের কাঁটাগুলো তুললেন কেমন করে, গিন্নীদের কাছে সব কিছু বলতে হল। শুনতে শুনতে বারবার 'আঃ!' 'উঃ!' করে ওরা ঠোঁটে শব্দ তুলছিল। উৎসুক চোখে আমার কাহিনী শুনছিল। অবাক হলাম ব্যথা, ব্যধি, ইত্যাদি অপ্রীতিকর যাবতীয় ব্যাপার সম্পর্কে ওদের বিকৃত কৌতুহল দেখে।

ওদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করতে না চাওয়ায় ওরা দারুণ খুশি হয়ে উঠল। আর এই সুযোগে দর্জির বৌয়ের কাছ থেকে বই এনে পড়ার অনুমতি চেয়ে বসলাম। অবস্থাচক্রে ওরা আর না করতে সাহস করল না। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে গিন্নীবুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'আচ্ছা খুদে শয়তান বটে বাপু।'

পরের দিনই দর্জির বৌয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে বলল, 'কিন্তু ওরা বলছিল যে তুমি অসুস্থ। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তোমাকে, দেখ তো মানুষ কী মিথ্যে গুজবই না ছড়ায়!'

প্রতিবাদ করলাম না। সত্যি ঘটনা জানাতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হচ্ছিল আমার! এমন একটা নিষ্ঠুর নোংরা ব্যাপার জানিয়ে কেন ওকে আর বিরক্ত করা? ও যে অন্য সবার মত নয়, তাতেই আমি আনন্দিত।

আবার পড়তে আরম্ভ করলাম মোটা মোটা বই—'ডুমা দি এলডার', 'পঁসঁ দ্যু তরাইল', 'মঁতেপেয়েঁ', 'জাকোনি', 'গাবরিয়ো', 'এমার' আর 'বোয়াগবে'র।

খুব দ্রুত একটার পর একটা বই শেষ করতে লাগলাম। আমার প্রাণ মন আনন্দে ভরে উঠল। অনুভব করলাম যেন আমিও এক অসাধারণ জীবন প্রবাহের অংশবিশেষ। যা এক সুমধুর আবেগে অন্তর ভরে তুলে জাগিয়ে দিল অদম্য উদ্দীপনা। আমার হাতে-তৈরি আলোটা আবার ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল। দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত রাত জেগে পড়তাম। চোখদুটো ফুলে উঠত, আর বুড়ি স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষভরা খুশির সুরে বলত, 'সবুর কর,

বইয়ের পোকা, তোর চোখের মণি-দুটো একদিন ফেটে বেরিয়ে আসবে; দেখিস, অন্ধ হয়ে যাবি তুই।'

কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এই সমস্ত চমৎকার বই, যতই তাদের বিষয় আলাদা, পরিবেশনের কায়দা আলাদা হোক না কেন একটা কথাই শুধু বলে যে, দুনিয়ার ভাল লোকেরা অসুখী হয়, লাঞ্ছিত হয় দুষ্ট লোকের হাতে। দুষ্ট লোকেরা ভাল মানুষদের তুলনায় বেশি চালাক চতুর, বেশি সৌভাগ্যবান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন অজ্ঞাত কোন একটা ঘটনা এসে হাজির হয় যাতে মন্দ পরাজিত হয়ে অনিবার্যভাবে ধর্ম জয়যুক্ত হয়ে ওঠে। 'প্রেম' সম্পর্কে দারুণ বিরক্ত হয়ে পড়লাম আমি। সমস্ত পুরুষ, সমস্ত নারীই একই ধরণের, একই ভাষায় তারা কথা বলে। একঘেয়েমী ছাড়াও এই সব নির্লজ্জ মুখরতায় কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া আমার মনে ঘনিয়ে আসত।

কখনো কখনো কয়েক পাতা পড়ার পরেই ভাবতে শুরু করতাম, শেষ পর্যন্ত কে জিতবে আর কে হারবে। যেই নাকি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হত অমনি জট্ ছাড়াবার চেষ্টায় লেগে যেতাম। বইটা সরিয়ে রেখে অঙ্কের সমস্যা সমাধানের মত করেই চিন্তা শুরু করে দিতাম। ক্রমেই দেখতাম যে ঠিক সমাধানে গিয়ে পৌঁছেছি। কোন চরিত্রটা স্বর্গে আর কোনটা যাবে প্রেতলোকে তা সঠিক ভাবেই অনুমান করতে পেরেছি।

কিন্তু এসব ছাড়াও আরো একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম, যার গুরুত্ব আমার কাছে অনেক। সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পর্ক, ভিন্ন সম্বন্ধভরা অন্য এক জীবনের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম, প্যারীর কোচোয়ান মজুর, সৈনিক, আর অন্যান্য সব 'ইতর ছোটলোক' যারা, তারা নিঝনি-নভগোরদ, কাজান, পেরম'এর 'ইতর ছোটলোক'দের মত নয়। তারা ভদ্রলোকদের সঙ্গে অনেক বেশি সাহসের সঙ্গে কথা বলে; তাদের সামনে অনেক বেশি সহজ সাবলীল স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে। বইয়ে একজন সৈনিককে পেলাম যার সঙ্গে আমার পরিচিত কোন সৈনিকের সামান্যও সাদৃশ্য নেই। না সিদরভের না জাহাজের সেই সৈনিকের, এমন কি ইয়েরমোখিনেরও না। এদের থেকে ঢের বেশি মানুষ বলে মনে হয় তাকে। খানিকটা মিল আছে স্মুরির সঙ্গে। কিন্তু আর একটু কম অমার্জিত, কম জান্তব। কিংবা বইয়ের মধ্যে এই একটা দোকানদারের চরিত্র, যা আমার পরিচিত যে কোন দোকানদারের চাইতে অনেক ভাল। বইয়ের পাদ্রী-পুরুতরাও আমার চেনাশোনা পুরুতদের মত নয়। মানুষের ওপরে তাদের অগাধ ভালবাসা, অগাধ সহানুভূতি। এক কথায় বইয়ের মধ্যে বিদেশের জীবনের যে ছবি পেতাম আমার জানা চেনা জীবনের চাইতে সে জীবন অনেক বেশি সুন্দর, সহজ, সাবলীল, —অনেক বেশি আকর্ষণীয়। বিদেশে লোকেরা কথায় কথায় এমন ঝগড়া করে না। মারপিট করে না এমন নির্মম পাশবিক হিংস্রতায়, অমন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে না কোন মানুষকে নিয়ে—জাহাজের যাত্রীরা যেমন করে লেগেছিল সেই সৈনিকটির পেছনে। কিংবা আমার বুড়ি মনিব-গিন্নীর মত অমন হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গেও কেউ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না।

আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি, ওরা যখন বইয়ের ভেতরে হীন, কুৎসিত দুর্বৃত্তের চরিত্র আঁকে, তখনো যে ব্যাখ্যাতীত নির্মমতা আর অন্যকে বিদ্রূপ

কথার যে উদ্দাম প্রবৃত্তি আমি নিজের চোখে দিনরাত দেখেছি ঠিক তেমনি করে আঁকতে পারে না। বইয়ের দুর্বৃত্তেরা কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক থেকে নিষ্ঠুর। তাদের নৃশংসতা বোধগম্য। কিন্তু আমি দেখেছি অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা—নিছক একটু ফুর্তির জন্য। আর কোন রকমের উদ্দেশ্য নেই তার ভেতরে।

প্রতিটা নতুন বইই যেন রুশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রার পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করতে শুরু করল। তাতে একটা আবছা অসন্তুষ্টি আমার মনে জেগে উঠল। কেমন যেন একটা সন্দেহ জাঁকিয়ে বসল যে ঐ হলদে পাতাগুলোয় যা লেখা আছে তা পুরো সত্য নয়।

এর পরে গাঁকুরের 'দি ব্রাদার্স জেমগান্নো' উপন্যাসখানা এল আমার হাতে। এক রাত্রের ভেতরেই পড়ে ফেললাম। বইটার নতুনত্বে এমন অবাক হলাম যে ঐ সহজ সরল মর্মস্পর্শী গল্পটা পড়ে ফেললাম আর একবার। গল্পের বর্ণনায় কোন জটিলতা নেই, নেই কৃত্রিম আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস। প্রথমে ধারণা হয়েছিল 'মহাত্মাদের জীবনী'র মতই বুঝি নীরস, গুরুগম্ভীর হবে। ভাষা এমন যথার্থ ও অলঙ্কারবর্জিত যে প্রথমটায় হতাশই হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বইটার কাটা কাটা জোড়াল কথা সোজাসুজি আমার অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করল। তাতে ঐ বাজিকর ভাইদের কাহিনী এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে আনন্দে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। তারপর ঐ হতভাগ্য বাজিকর যখন তার ভাঙ্গা পা নিয়ে চিলেঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাই যেখানে তাদের সেই প্রিয় খেলার চর্চা করছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল, তখন আমি কেঁদে ফেললাম। এমন কান্না কাঁদছিলাম, মনে হচ্ছিল আমার বুক যেন ভেঙ্গে যাবে।

দর্জির বৌকে এই চমৎকার বইখানা ফেরত দিতে গিয়ে ঠিক ঐ ধরণের আর একটা বই তার কাছে চাইলাম।

'ঠিক এইটের মত মানে কি?' একটু হেসে জিজ্ঞেস করল সে।

তার হাসিতে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লাম। আর কিছুতেই যখন আমি বোঝাতে পারছিলাম না যে আমি ঠিক কি চাই, তখন সে বলল, 'বইটা নীরস। দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য একটা খুব ভাল বই খুঁজে রাখব। খুব আনন্দ পাবে পড়ে।'

কয়েকদিন পরে গ্রিনউডের 'একজন ছোট গৃহহীন বালকের সত্য কাহিনী' বইটা পড়তে দিল। নামটা দেখেই মনটা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম পাতা পড়তেই মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল শেষ পাতা পর্যন্ত তা তেমনিই বজায় রইল। কতকগুলো জায়গা দুবার তিনবার পড়লাম।

তাহলে বিদেশেও ছোটছেলেদের জীবন বেশ দুঃখ কষ্টের মধ্যেই কাটে! তার থেকে আমার জীবন তো অনেক সহজ। অর্থাৎ, হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

অগাধ উৎসাহ পেলাম আমি গ্রিনউডের কাছ থেকে। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই সেই 'সাচ্চা' বইয়ের একটা আমার হাতে এসে পড়ল—'ইয়েভ্‌গেনি গ্রাঁদে'।

বুড়ো মানুষ গ্রাঁদের কথা পড়তে পড়তে হুবহু দাদুর ছবি ভেসে উঠল। আমার চোখে বইটা এত ছোট যে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে এত খাঁটি সত্যি কথা আছে যে পড়ে অবাক হলাম। জীবনে এইসব সত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু বইটা যেন সেগুলোকে একটা নতুন চোখে দেখাল, শান্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টির আলোকে। গাঁকুর ছাড়া আর যাদের বই পড়েছি, লক্ষ্য করেছি তাঁরা আমার মনিবদের মতই শুকনো ভাষায় সোরগোল তুলে মানুষের বিচার করেন। যার জন্য

দুর্বৃত্তদের ওপরে প্রায়ই পাঠকের সহানুভূতি বেড়ে যায়। আর বিরক্তি জেগে ওঠে সব সৎ চরিত্রের ওপরে। দেখে বিরক্ত লাগত যে একটা লোক যতই চিন্তা করুক, চেষ্টা করুক না কেন, ঐ সব সাধুলোক যারা বইয়ের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি অচল অনড় পাথরের দেয়ালের মত ঠায় দাঁড়িয়ে, তাদের কাছে তার সকল রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

একথা ঠিক যে পাপের যা কিছু খারাপ অভিসন্ধি তা এই দেয়ালে আছাড় খেয়ে চূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু পাথর এমন একটা কিছু নয় যার প্রতি কারো ভালবাসা জন্মাতে পারে। দেয়াল সে যতই পোক্ত, সুন্দর হোক না কেন, কেউ যদি সে দেয়ালের ওপারের আপেল পেড়ে আনতে চায় তবে কখনো সে দেয়ালের পাথর-গুলোকে কদর করবে না। কেবলই মনে হত আমার যে, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাই এই সব নীতিবান মানুষদের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

গাঁকুর, বালজাক, গ্রিনউড—এঁদের লেখায় কোন দুর্বৃত্তও যেমন নেই তেমনিই কোন বীরপুরুষও নেই। আছে মানুষ, অদ্ভুত রকমের জীবন্ত মানুষ। এঁদের লেখার চরিত্রগুলো যা বলেছে, যা কিছু করেছে, তা ঠিক তেমনিভাবেই না বলে বা না করে হয়ত অন্যভাবে বলা বা করা যেত, এ ধরণের সন্দেহ কারো মনেই আসত না।

এইভাবেই 'সৎ' সাহিত্য, 'সাচ্চা' সাহিত্য পড়ার অসীম আনন্দ গ্রহণ করতে শিখলাম। কিন্তু এ সব বই কোথায় পাব? দর্জির বৌ এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারল না আমাকে।

'এই নে কয়েকখানা ভাল বই,' বলে দর্জির বৌ আমাকে দিল আরসেন গুসের 'এক মুঠো গোলাপ, সোনা আর রক্ত'। আর সেই সঙ্গে বেইলি, পল দ্যে কক, আর পল ফিভাল'এর উপন্যাস। কিন্তু এসব বই এখন পড়তে গেলে বেশ চেষ্টা করে পড়তে হয়।

মারিয়েত আর ওয়ের্ণারের উপন্যাস দর্জির বৌয়ের খুব ভাল লাগে। কিন্তু সেগুলো আমার কাছে একঘেয়ে বিশ্রী লাগত। স্পিলহাগেনের লেখাও ভাল লাগে না আমার। কিন্তু অয়েরবাকের গল্প পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম। স্যু আর হুগোর চাইতে পছন্দ হল স্যার ওয়াল্টার স্কটকে। এমন বই চাইতাম যাতে আমার আবেগে নাড়া দিয়ে মন প্রাণ আনন্দে ভরে উঠবে। বালজাকের অপূর্ব বইয়ের মত বই। চীনে পুতুলও আজকাল তেমন আর মুগ্ধ করতে পারত না আমাকে।

দর্জির বৌয়ের কাছে যাবার সময় একটা ফর্সা জামা পরতাম, চুলগুলো আঁচড়ে নিতাম। সব রকমে নিজেকে একটু ফিট্‌ফাট্ করে তুলতে চেষ্টা করতাম। কতখানি সফল হতাম তা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মনে মনে আশা করতাম, আমার ঐ ভদ্রচেহারা দেখে হয়তবা একটু সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে সে কথা বলবে। তার ঝকঝকে পরিষ্কার মুখে ফুটে উঠবে না সেই হালকা হাসির রেখা যা আমার সব সময়েই মনে হত যে সে ঠিক এই কারণেই বিশেষ করে ফোটাচ্ছে। কিন্তু সে ঠিক তেমনি ভাবে হেসেই ক্লান্ত মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করত, 'বইটা পড়েছ? ভাল লেগেছে?'

'ভাল লাগেনি।'

শুনে তার সুন্দর ভ্রূদুটো একটু তুলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই পরিচিত নাকী স্বরে বলত, 'কেন ভাল লাগেনি?'

'এ বিষয়ে আগেই পড়েছি।'

'কি বিষয়ে?'

'এই ভালবাসার বিষয়ে।'

একটু ভ্রূ ভেঙ্গে তাকাত। তারপর একটু দমকা হাসি হেসে বলত, 'হা আমার কপাল! কিন্তু সব বই-ই তো ভালবাসা-বাসি নিয়ে লেখা।'

বড় একটা হাতলওলা কেদারার ভেতরে বসে ফারের চটি পরা পাদুটো দোলাত সে, হাই তুলত, নীল ড্রেসিং গাউনটা টেনে তুলে দুটো কাঁধ ঢেকে দিত আর খাটো খাটো গোলাপী আঙ্গুলের ডগা দিয়ে টোকা দিত কোলে রাখা বইটার মলাটের ওপরে।

ইচ্ছে হত ওকে বলি, 'কেন এখান থেকে উঠে যান না আপনি? অফিসাররা এখনো আপনাকে চিঠি লেখে, এখনো আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে।'

কিন্তু মনের কথা মুখে বলতে সাহস হত না। তাই আর একখানা মোটা প্রেমের উপন্যাস আর সঙ্গে বুকভরা হতাশা নিয়ে ফিরে আসতাম।

উঠোনে এই মহিলাটিকে নিয়ে গুজব ক্রমেই আরো বেশি বিদ্রূপ ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হতে লাগল। ঐ সব নোংরা কুৎসিত কথা শুনে মনে মনে দারুণ ব্যথা পেতাম। ওগুলো যে নেহাত মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। যখন ওর কাছে না থাকতাম, তখন ওর জন্য আমার করুণা আর আশঙ্কা হত। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তার সেই তীক্ষ্ণ চোখ, বেড়ালের মত কোমল নমনীয় ছোট্ট দেহটি, আর মুখের সেই চটুল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে, আমার ভয়, অনুকম্পা সবই কুয়াশার মত মুছে যেত।

বসন্তকালে একদিন হঠাৎ সে চলে গেল। আর তার কিছুদিন পর তার স্বামীও উঠে গেল বাড়ি ছেড়ে।

তখনো ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে। ওদের ঘরে গেলাম। শূন্য দেয়াল বাঁকান পেরেক আর পেরেকের গর্তে ভরা। যেখানে যেখানে ছবি টাঙ্গান ছিল সে জায়গাগুলো বিবর্ণ—রঙ-চটা দাগে ভর্তি। রঙিন মেঝেটায় ছড়ান রয়েছে টুকরো টুকরো ছেঁড়া কাগজ, ফাঁকা ওষুধের বাক্স, শূন্য আতরের শিশি। আর ঐ সব আবর্জনার মধ্যে পিতলের একটা বড় চুলের কাঁটা চিক্‌চিক্ করছে!

বিষণ্ণ লাগছিল। দর্জির ছোট বৌটিকে আর একটিবার দেখার জন্য, তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দশ

দর্জি আর তার বৌ উঠে যাবার আগেই আমাদের ফ্ল্যাটের নিচের তালায় এক মহিলা এসেছিলেন, তার চোখ দুটো কালো। সঙ্গে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে আর তার মা। মা বৃদ্ধা, তার চুলগুলো সব শাদা! তিনি প্রায় সময়েই একটা হলদে পাইপে করে সিগারেট টানতেন। কম বয়েসী মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু অহঙ্কারী ও দাম্ভিক। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সুন্দর। চোখ কুঁচ্‌কে মাথাটা পেছনের দিকে নুইয়ে লোকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন তারা অনেক দূরে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় দিনই ফ্ল্যাটের বারান্দার সামনে তার ফৌজী-চাকর তুফিয়ায়েভ সরু সরু পাওলা বাদামী রঙের একটা ঘোড়া নিয়ে আসত। ইস্পাত-ধূসর মখমলের

ঘোড়া-চড়ার পোশাক পরনে, হাতে সাদা দস্তানা আর পায়ে বাদামী রঙের বুট পরে মহিলা এসে দাঁড়াতেন। একহাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া ঘাগ্‌রার প্রান্ত ধরতেন আর বেগুনি রঙের হাতল-দেয়া চাবুকটা অন্য হাতে ধরে ঘোড়াটার নাকের ওপরে চাপড়াতেন। ঘোড়াটা দাঁত বের করে চোখ পাকিয়ে শক্ত মাটিতে পা ঠুকত আর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকত।

ঘোড়াটার বাঁকান সুন্দর গ্রীবার ওপরে পরম স্নেহে আস্তে আস্তে চাপড়িয়ে কোমল কণ্ঠে ডেকে উঠতেন, 'রবি, রবি!'

তারপর তুফিয়ায়েভের হাঁটুর ওপরে একটা পা দিয়ে আস্তে লাফিয়ে উঠে বসতেন জিনের ওপরে, ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে বাঁধের দিকে ছুটতে শুরু করত। মহিলা ঘোড়ার পিঠে এমনভাবে বসে থাকতেন যে দেখে মনে হত যেন আজন্মই তিনি ঘোড়ায় চড়ে আছেন।

মহিলা রূপসী। তার রূপ এমনই অসাধারণ যে দেখলেই মনে হয় অভিনব, অতুলনীয়। অপূর্ব এক আনন্দে মন মাতাল হয়ে ওঠে। ওকে দেখে আমার মনে হত পইতিয়েরের ডায়না, রাণী মার্গো, তরুণী লা ভোলয়ে প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মোহিনীরা হয়ত এমনিই ছিল দেখতে।

আমাদের শহরের সেনাবাহিনীর অফিসারেরা সর্বদাই তাকে ঘিরে থাকত। সন্ধ্যাবেলায় সকলে ভিড় করত তার ঘরে। পিয়ানো বাজাত, বেহালা, গিটার, নাচগান চলত। সবাইকে ছাড়িয়ে যেত মেজর ওলেসভ। বেঁটে বেঁটে পায়ে তার সামনে অনবরত ঘুরঘুর করত। লোকটা মোটামত, পাকা চুল। লাল মুখখানা এত তেলতেলে যেন মেশিনের তেল দেয়া মিস্ত্রি। মেজর চমৎকার গিটার বাজাত আর সেই সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে এমন অনুনয়ের ব্যবহার করত যেন সে তার একান্ত অনুগত ভৃত্য।

তার পাঁচ বছরের মেয়েটির চেহারা গোলগাল মোটাসোটা, একমাথা কোঁক্ড়া চুল, মায়ের মতই তার গায়ের রং উজ্জ্বল আর সুন্দরী। ডাগর নীল চোখ দুটোর দৃষ্টি শান্ত, গম্ভীর, প্রত্যাশাকুল। সে গাম্ভীর্যের ভেতরে এমন কিছু একটা ছিল যেটা ঠিক তার বয়সোচিত নয়।

ওর দিদিমা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। গোমড়া-মুখো অল্পভাষী তুফিয়ায়েভ আর টেরা মোটাসোটা ঝিটা তাকে সাহায্য করত। মেয়েটিকে দেখবার জন্য কোন আয়াও ছিল না। এককথায় প্রায় অযত্নে আপনা-আপনিই বড় হচ্ছিল সে। বারান্দায় অথবা কাঠের স্তূপের উল্টো দিকে সারাদিন বসে খেলা করত। আমি গিয়ে প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে ওর সঙ্গে খেলা করতাম। খুবই ভালবেসে ফেললাম তাকে। আর মেয়েটিও আমার বাহক হয়ে পড়ল। আমার কোলে রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমিয়ে পড়লে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসতাম। এইভাবে ব্যাপারটা এতদূর এগুলো যে আমি এসে ওকে শুভরাত্রি না জানান পর্যন্ত ও কিছুতেই ঘুমোতে যেত না। ওর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই গম্ভীরভাবে হৃষ্টপুষ্ট ছোট কোমল হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠত, 'বিদায়, কাল সকাল পর্যন্ত। আর কি বলতে হয় দিদা?'

'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।' দাঁত আর নাকের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার সরু রেখা ছাড়তে ছাড়তে বলতেন ওর দিদিমা।

'ঈশ্বর আগামীকাল পর্যন্ত তোমাকে রক্ষা করুন। আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি।' ঝালর দেয়া লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতে বলত মেয়েটি।

'আগামীকাল পর্যন্ত নয়, বল সব সময়ে।' দিদিমা শুধরে দিতেন।

'আগামীকাল মানেই তো সব সময়ে, তাই না?'

'আগামীকাল' কথাটা ওর খুব পছন্দ। ওর প্রিয় যা কিছু সবই ঐ আগামী কালে নিয়ে ফেলত। এক গুচ্ছ ফুল বা ডালপালা মাটিতে রোপন করে বলত, 'দেখ, আগামীকাল এটা একটা বাগান হবে। আগামীকাল আমি ঘোড়া কিনব একটা। তারপর মার মত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব।'

মেয়েটি খুব চালাক চতুর, কিন্তু তেমন ছট্‌ফটে নয়। খেলা করতে করতে মাঝপথে প্রায়ই গুম হয়ে বসে পড়ত। তারপর হঠাৎ এক সময়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবেই বল উঠত, 'পুরুতরা মেয়েদের মত চুল রাখে কেন?'

একদিন তার আঙ্গুলে কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। কাঁটাগুলোকে আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে সে শাসাল, 'দেখবে কেমন মজা হয়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব তিনি শাস্তি দেবেন তোমাদের। সবাইকে শাস্তি দিতে পারেন তিনি। এমন কি মাকেও…

মাঝে মাঝে কেমন এক প্রশান্ত বিষণ্ণতা এসে ওকে ভর করত; এগিয়ে এসে আমার দেহের সঙ্গে মিশে উৎসুকভরা নীল চোখদুটো আকাশের দিকে তুলে বলত, 'দিদা বকে কোন কোন দিন। কিন্তু মা কখনো বকে না, শুধু হাসে। মাকে সবাই ভালবাসেন। মা একটুকুও সময় পায় না কিনা, তাই সবাই তাকে দেখতে আসে। ওরা সবাই তো বলে মা চমৎকার!'

শিশুটির মুখে আমার অপরিচিত এক জগতের কথা শুনতে শুনতে দারুণ আনন্দ পেতাম আমি। একান্ত আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে ও বলে যেত তার মার কথা, খুলে দিত এক নতুন জগত। শুনতে শুনতে রাণী মার্গের কাহিনী মনে পড়ত আমার। ফলে বইয়ের ওপরে আমার বিশ্বাস যেমন বাড়ল তেমনি আমার চারপাশে যে সব ঘটনা ঘটছে সেই সব পারিপার্শ্বিক ঘটনার সম্পর্কে আরো বেশি কৌতুহল জেগে উঠল আমার মনে।

একদিন সন্ধ্যায় শিশুটিকে নিয়ে বসেছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম মনিবের ফিরে আসার জন্য। কোলের মধ্যে শিশুটি তখন ঘুমে ঝিমচ্ছিল। ওর মা ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলেন। খুব আলতোভাবে জিনের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এসেই মাথাটা পেছনের দিকে নুইয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে না কি?'

'হুঁ।'

'সত্যি?'

সৈনিক তুফিয়ায়েভ দৌড়ে এসে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিল। চাবুকটা কোমর-বন্ধের ভেতরে ঢুকিয়ে ভদ্রমহিলাটি হাত বাড়লেন, 'আমার কাছে দে!'

'আমিই দিয়ে আসছি।'

'না, তোকে যেতে হবে না।' মাটিতে পা ঠুকে চেঁচালেন মহিলা। যেন আমি তার ঘোড়া।

মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে মাকে দেখতে পেয়ে সেও হাত বাড়িয়ে দিল। চলে গেল দুজনে।

গালমন্দ শোনা অভ্যেস আছে আমার। কিন্তু এই মহিলাটিও যে চেঁচিয়ে উঠতে পারেন তা দেখে খুব খারাপ লাগল আমার। না চেঁচিয়ে যত আস্তেই উনি বলুন না কেন এমনিতেই তো প্রত্যেকে ওর হুকুম মানতে বাধ্য।

কয়েক মিনিট পরেই টেরা ঝিটা আমাকে এসে বলল যে, মেয়েটি জেদ ধরেছে আমাকে শুভরাত্রি না জানিয়ে কিছুতেই ঘুমোতে যাবে না। মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ নিয়েই গেলাম ড্রয়িংরুমে। মেয়েটিকে কোলে করে বসেছিলেন মহিলাটি আর খুব তাড়াতাড়ি ওর জামা কাপড় খুলে দিচ্ছিলেন।

'এই যে, এসে গেছে তোর সেই দত্যিটা।' বললেন মহিলাটি।

'ও দত্যি নয়, আমার বন্ধু।'

'বটে? ভাল কথা, তাহলে তোর বন্ধুকে কিছু একটা উপহার দেয়া যাক, কি বলিস?'

'হাঁ হাঁ দাও না!'

'বেশ, তুই ছুটে বিছানায় যা, আমি ওকে কিছু একটা দিচ্ছি।'

'আসছে কাল পর্যন্ত বিদায়!' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ছোট্ট মেয়েটি, 'আসছে কাল পর্যন্ত ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।'

'কে শিখিয়েছে তোকে এমন করে বলতে?' আশ্চর্য হয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন ওর মা, 'দিদিমা?'

'হাঁ।'

মেয়েটি চলে যেতেই মহিলা ইশারায় আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'তোকে কী দিই বলত?'

বললাম, 'কিচ্ছু দিতে হবে না। অবশ্যি আমাকে একখানা বই দিতে পারেন পড়তে।'

উষ্ণ গন্ধভরা আঙুল দিয়ে আমার থুতনীটা তুললেন, তারপর একটু মধুর হেসে বললেন, 'তাহলে বই পড়তে ভালবাসিস তুই, তাই তো? কি কি বই পড়েছিস?'

হাসলে আরো যেন সুন্দর লাগে তাকে। একটু হক্‌চকিয়ে যেমনি মনে এল কয়েকটা উপন্যাসের নাম বলে দিলাম।

'ওর মধ্যে কোন জিনিসটা তোর খুব ভাল লাগে?' টেবিলে টোকা দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন মহিলা।

ঘোড়ার ঘামের গন্ধের সঙ্গে ফুলের তীব্র মধুর গন্ধ মিশে কেমন যেন একটা ঘ্রাণ বেরিয়ে আসছে তার গা থেকে। ডাগর দুটো চোখের পাতা মেলে গম্ভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি আমাকে দেখছেন। এমনি ভাবে কেউ আর কখনো আমার দিকে তাকায়নি।

সুন্দর সুন্দর পর্দা দিয়ে ঢাকা আসবাবপত্র ঠাসাঠাসি হয়ে ঘরটা যেন পাখির বাসার মত ছোট লাগছিল। কচিগাছের পুরু পুরু পাতার আড়ালে জানলা ঢাকা উনুনের টালিগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারে তুষারের মত সাদা দেখাচ্ছে। পাশেই চক্‌চকে কালো রঙের পিয়ানো একটা, অনুজ্জ্বল সোনালী রঙের ফ্রেমে বাঁধান পুরাকালের স্লাভ অক্ষরের লেখা ময়লা ছবি ঝুলছে দেয়ালে। প্রত্যেকটা ফ্রেমের সঙ্গে একটা করে ফিতে ঝুলছে। ফিতের আগায় বড় সিলমোহর। সব কিছুই যেন আমার মত বিনীত শ্রদ্ধায় চেয়ে আছে ঐ মহিলাটির দিকে।

আমার সবটুকু শক্তি ক্ষমতা দিয়ে বুঝিয়ে বললাম যে জীবন নিছক একঘেয়ে, দুঃখ কষ্টে ভরা। কিন্তু বই পড়তে বসলেই মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।

'সত্যি ?' বিস্মিত সুরে বললেন, সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'তা অবশ্যি বেশ বলেছিস কথাটা। ঠিকই বলেছিস্ মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন তো নেই একটাও। আচ্ছা এই যে, এটা নিয়ে যেতে পারিস।'

সোফার ওপর থেকে হলদে মলাটের একটা ছেঁড়া বই হাতে তুলে নিলেন।

'এটা শেষ হলে পরে দ্বিতীয় খণ্ড দেব। বইটার মোট চারটে খণ্ড আছে···'

প্রিন্স মেশ্চেরস্কির লেখা 'সেন্ট পিটার্সবার্গের গুপ্ত কথা' বইটা নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর একান্ত চেষ্টার সঙ্গে পড়তে শুরু করলাম। কিছু দূর পড়েই মনে হল মাদ্রিদ, লণ্ডন, প্যারীর তুলনায় 'সেন্ট পিটার্সবার্গের গুপ্ত কথা' অনেক বেশি একঘেয়ে। শুধুমাত্র 'মুক্তি' আর 'মুগুরের' কাহিনী ভাল লাগল।

'আমি তোমার চাইতে ভাল,' মুক্তি বলল, 'কারণ আমি বেশ বুদ্ধিমতী।'

উত্তরে মুগুর বলল, 'না, তা নয়, তোমার চাইতে আমি ভাল। কারণ আমার গায়ে জোর বেশি।'

তর্ক করতে করতে হাতাহাতি শুরু করল দুজনে। যতদূর মনে পড়ে মুগুর দারুণভাবে মুক্তিকে পিটল। পরে সেই আঘাতে হাসপাতালে গিয়ে মরে গেল মুক্তি।

বইটার ভেতরে একটা চরিত্র ছিল একজন নিহিলিস্টের। মনে পড়ে, প্রিন্স মেশ্চেরস্কির মতে নিহিলিস্টরা এমন ভয়ঙ্কর যে তারা যদি কেউ একবার একটা মুরগীর দিকেও তাকায় তা হলে তক্ষুণি সেটা পথের মধ্যে মুখ থুবড়ে মরবে। নিহিলিস্টের মতটা একটা নোংরা অসম্মানজনক মত বলেই ধরে নিলাম। কিন্তু এর বেশি আর কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। মনটা এতে দমে গেল। বোঝাই যায় যে সাধারণত ভাল বই বোঝার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু এটা ভাল বই নয় এমন কথা আমার মনে হয়নি একদম। এমন সুন্দরী কেউকেটা গোছের একজন মহিলা নিশ্চয়ই তেমন খারাপ বই পড়বেন না।

'কী রকম লাগল বইটা ?' মেশ্চেরস্কির উপন্যাসটা ফিরিয়ে দিতে গেলে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

বইটা ভাল লাগেনি বলতে দ্বিধা হচ্ছিল। ভয় হল পাছে রুষ্ট হন।

কিন্তু তিনি একটু হাসলেন শুধু। তারপর শোবার ঘরের পর্দা ঠেলে ভেতরে গিয়ে নীল রঙের মলাট ছোট একটা বই নিয়ে ফিরলেন।

'এটা খুব ভাল লাগবে তোর। কিন্তু সাবধান, যেন নোংরা না হয়।'

এটা পুশকিনের একটা কবিতার বই। আচমকা অপূর্ব সুন্দর একটা স্থানে এসে পড়লে মানুষের মধ্যে যেমন একই সঙ্গে সমস্ত দিকের সমস্ত কিছু দেখার এক আকুল আগ্রহ জেগে ওঠে, তেমনি এক পরম আগ্রহ আমার অন্তরে জেগে উঠল। এক নিঃশ্বাসে বইটা পড়ে ফেললাম। এ যেন জলাভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রোদ ঝলসান ফুল বিছান পথে এসে পড়লাম, যেমন মানুষ পায়ে পায়ে নরম ঘাসের স্পর্শে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছোটাছুটি শুরু করার আগে কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি।

পুশকিনের কবিতার সহজ সাবলীল সঙ্গীতময়তায় এমন বিস্মিত আর মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে অনেকদিন পর্যন্ত আমার কাছে গদ্য কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে

হত ; পড়তে কষ্ট লাগল। 'রুস্‌লান ও ল্যুদমিলা'র ভূমিকা ঠিক যেন দিদিমার মুখে শোনা সবচাইতে সুন্দর রূপকথার মত। কতকগুলো লাইন এমন অপূর্ব আর নিখুঁত যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম :

'সেখানে অজানা সে এক পথের বুকে
পশুরা গিয়েছে পায়ের চিহ্ন এঁকে।'

এই পঙক্তিগুলো আওড়াতে আওড়াতে আমার চোখের ওপরে ভেসে উঠত আমার কাছে অতি পরিচয় সেই সব ক্ষীণ অস্পষ্ট পথরেখা, সেই সব রহস্যময় পায়ের চিহ্ন আঁকা দলিত ঘাসের বুকে ঝল্‌মলে কম্পিত শিশিরবিন্দুর রূপোলি আভা। ঐ অলঙ্কারবহুল ঝঙ্কারময় কবিতাগুলো যে কোন ভাবই প্রকাশ করুক না কেন মনে রাখা এত সহজ যে অবাক লাগে। আনন্দে মনপ্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠল। সরল আনন্দে দিনগুলি ভরে উঠল। কবিতাগুলো সত্যিই যেন নতুন এক জীবনের সূত্রপাত ঘোষণা করল। সত্যি, পড়তে পারাটা কতই না আনন্দের।

পুশকিনের অন্যান্য লেখার তুলনায় তাঁর ঐ মনোরম কাব্য-কথা অনেক বেশি সাড়া তুলত আমার মনে। বারবার পড়তে পড়তেই ওগুলো আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। তারপর যখন বিছানায় যেতাম চোখ বুজে শুয়ে সেগুলো আওড়াতে আওড়াতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কোন কোন সময়ে অফিসারদের আর্দালীদের আবৃত্তি করে শোনাতাম। অবাক বিস্ময়ে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। তারিফ করে আমার মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় মেরে সিদরভ মৃদুকণ্ঠে বলত, 'উঃ কী চমৎকার। কি বলিস ?'

আমার সেই উন্মনা অবস্থা মানবরা লক্ষ্য করল। বুড়ি-গিন্নী শুরু করল গাল দিতে, 'ও পড়া পড়া করে এমনই মত্ত হয়ে গেছে যে আজ চার-চারদিন সামোভার-টার-গায়ে একটু ঘষা দেয়নি পর্যন্ত। বদমাইশ বেকুফ্ কোথাকার, বেলুনী দিয়ে একদিন এমন পেটান পেট্টাব না !'

কিন্তু বেলুনী কি করবে আমাকে ? আমি আত্মরক্ষা করলাম কবিতা দিয়ে :

'ডাইনী বুড়ির মনটা ভরা শয়তানীতে
আত্মাও তাই—ভুল হয় না চিনে নিতে।

ঐ সুন্দরী মহিলাটি আমার ধারণায় আরো উঁচু হয়ে উঠলেন। তাহলে ঐ ধরণের বই-ও উনি পড়েন। উনি তাহলে সেই দর্জির চীনে পুতুলের মত নন···

এই বইটা নিয়ে এসে যখন একান্ত দুঃখিত মনে ফেরত দিলাম, একটু জোর দিয়েই বলে উঠলেন মহিলা, 'বইটা নিশ্চয়ই তোর ভাল লেগেছে, তাই না ? পুশকিনের নাম কখনো শুনেছিস ?'

বললাম, 'না।' তবে কোন একটা মাসিক পত্রিকায় ঐ কবির সম্পর্কে কিছু পড়েছিলাম। তবু উনি কি বলবেন তা শুনতে চাইছিলাম।

পুশকিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর মৃত্যুর কথা বলে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনের মত একটুখানি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন বুঝতে পেরেছিস তো মেয়েমানুষকে ভাল বাসা কী সাংঘাতিক ?'

যত বই পড়েছি, সবটাতেই দেখেছি, ভালবাসাটা সাংঘাতিক, তবু ভাল। বললাম, 'হতে পারে সাংঘাতিক কিন্তু প্রেমে তো সকলেই পড়ে, মেয়েরাও তো কষ্ট পায়।'

যেমন করে সব কিছুর দিকেই উনি তাকান তেমনিভাবে চোখের পাতার নিচ

দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সত্যি? তুই এর মানে বুঝিস? যদি বুঝিস, আশা করি কোন দিন ভুলবি না।

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কোন্ কোন্ কবিতা বিশেষ ভাবে আমার ভাল লাগে।

কথা বলতে বলতে আমি হাত মুখ নেড়ে দারুণ আবৃত্তি শুরু করে দিলাম। শান্ত গম্ভীর মুখে শুনতে শুনতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মেঝেতে পায়চারি করতে করতে চিন্তিত মুখে বললেন, 'স্কুলে ভর্তি হওয়া উচিত, বুঝলি খুদে বাঁদর! এ ব্যাপারে আমি ভেবে দেখব। যাদের বাড়ি কাজ করিস তারা কি তোর আত্মীয়?'

যখন জানালাম যে হ্যাঁ, আত্মীয়, তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ওঃ!' যেন সেটা আমারই একটা অপরাধ।

লাল মলাটের চামড়ায় বাঁধান খোদাই করা সোনালী ধারওলা 'বেরাঞ্জের গান' বইখানার একটা শোভন সংস্করণ দিলেন আমাকে। গানগুলোর তীব্র তিক্ততা আর অগাধ আনন্দের মিশ্রণ আমার অন্তরকে অভিভূত করে দিল।

'বৃদ্ধ ভিখারী'র সেই তীব্র তিক্ত উক্তিতে আমার শিরায় শিরায় রক্ত জমে যেন হিম হয়ে এল:

'ঘৃণ্য কীটের মত তোমরা আমাকে
পায়ের তলায় চেপে মারলে না কেন
ভাল মানুষরা?
আহ্! মানুষের ভালর জন্য
শেখালে না কেন খাটতে দারুণ।
বরফ ঝড়ের থেকে শীতের মার এড়িয়ে
এই তুচ্ছতম কীটও তাহলে হয়ে উঠতে পারত
পরিশ্রমী কোন পিপীলিকা!
ভাইয়ের মতই তোমাদের ভালবাসতে পারতাম তবে
কিন্তু আজ বুড়ো ভবঘুরে—তোমাদের পরম শত্রু হয়ে
দিন গুনছি।'

পরক্ষণেই 'ক'নের স্বামীর' কবিতা পড়তে পড়তে এমন হাসতে আরম্ভ করলাম যে চোখে জল এসে গেল। বিশেষ করে বেরাঞ্জের সেই মন্তব্য আজো আমার মনে আছে:

'খোলা মেলা দিল যার
খুশি হওয়া সোজা তার।'

বেরাঞ্জে পড়ে আমার মধ্যে জেগে উঠল কেমন একটা অদম্য উগ্রতা। দুষ্টুমি করার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার এক উত্তাল বাসনা আমার মনে চেপে বসল। এবং খুব বিলম্ব না করে আমি সে ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিয়ে বসলাম। বেরাঞ্জের কবিতাও কণ্ঠস্থ করে ফেললাম। আর্দালীদের রান্না ঘরে যাবার সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে পরম উৎসাহে কবিতা আবৃত্তি করতাম।

কিন্তু এই কয়েকটা পঙক্তির জন্য আমার ঐ আবৃত্তি করা ছাড়তে হল:

'হোক না টুপি যেই
সপ্তদশীর যোগ্য কি আর সেই।'

পঙক্তিদুটো শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের সম্পর্কে জঘন্য আলোচনা আরম্ভ হল। তাতে কেমন একটা অপমানবোধ জেগে উঠে পাগল করে তুলল আমাকে। ইয়েরমোখিনের মাথার ওপরে একটা প্যান দিয়ে কষে এক ঘা দিলাম। সিদরভ আর অন্যান্য আর্দালীরা ওর ভালুকের মত থাবার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এল। এরপর থেকে আর্দালীদের রান্নাঘরে যেতে ভরসা হত না আর।

আমার বেড়াতে যাবার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া বেড়াতে যাবার সময়ও ছিল না। আমার কাজ বেড়ে গিয়েছিল আরো—কারণ, ঝিয়ের কাজ, উঠোন ঝাড়ুদারের কাজ, ফাইফরমাস-খাটার ছোকরা-চাকরের কাজ—ইত্যাদির পরেও আমার দৈনন্দিন কাজের তালিকায় এখন থেকে যোগ হল পেরেক ঠুকে একটা বড় ফ্রেমে কাপড় এঁটে তাতে মনিবের আঁকা নক্‌সা আঠা দিয়ে সেটে দেয়া, তার বাড়ি তৈরির এস্টিমেটের নকল করা, ঠিকাদারদের হিসেব দেখা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যন্ত্রের মত খেটে যেত মনিব।

এই সময় মেলার মাঠের সরকারী বাড়িগুলো ব্যবসায়ীদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি দোকানের সারিগুলোকে একেবারে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হল। মনিবের সঙ্গে অস্থায়ী চালাঘরগুলো মেরামত করার আর নতুন বাড়ি তৈরি করার চুক্তি হল। খাড়া তোরণ তৈরি করার, শোবার ঘরের জানলা ইত্যাদি নতুন করে বানাবার পরিকল্পনা করল মনিব। সেই পরিকল্পনা আর খামে করে পঁচিশ রুবলের নোট নিয়ে যেতাম বৃদ্ধ স্থপতির কাছে। টাকা পেয়ে সে পরিকল্পনার কাগজটার ওপরে লিখে দিত, 'পরিকল্পনা পরীক্ষা করে তৈরি বাড়ির সঙ্গে মেলান হয়েছে। সমস্ত কাজ নিম্ন স্বাক্ষরদাতার ব্যক্তিগত দেখাশুনায় সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য তৈরি বাড়ির সঙ্গে মেলান হত না কিছুই। তাছাড়া বাড়ি তৈরির কাজের দেখাশুনা করতে পারতও না। কারণ তার স্বাস্থ্যের কারণে ঘরের বার হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ঘুষ দিয়ে আসতাম মেলার ইনস্পেকটার আর অন্যান্য লোকেদের এবং মনিবের ভাষায়, 'আইনবিরুদ্ধ অনেক রকমের কাজের হুকুম-নামা' নিয়ে আসতাম।

এসব কাজের পুরস্কার স্বরূপ, মনিবরা যখন কোথাও নিমন্ত্রণে যেত, তখন আমাকে উঠোনে বসে থাকার অধিকার দেয়া হত, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত। এ অবশ্য কদাচিৎ কখনো ঘটত। কিন্তু যেদিনই ঘটত, ওরা মধ্য রাতের আগে ফিরে আসত না। তাতে অনেকক্ষণ ধরে আমি বারান্দায় বা ওপাশের কাঠের স্তূপের ওপরে বসে তাকিয়ে থাকতে পারতাম, আমার সেই মহিলার ফ্ল্যাটের জানলার পথে। আর সেখান থেকে ভেসে আসা আনন্দমুখর গান আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেতাম।

জানলাটা খোলাই থাকত। জানলার পর্দা আর আঙ্গুর-লতার আড়াল থেকে দেখতে পেতাম সুন্দর চেহারার অফিসাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতরে, সহজ অথচ সুন্দর করে সাজা আমার পরিচিত মহিলাটির পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে সেই গোলগাল মেজর।

আমি মনে মনে তার নাম দিয়েছিলাম রাণী মার্গো।

'তাহলে ফরাসী উপন্যাসে এই রকমের আনন্দময় জীবনের কথাই লেখা থাকে!' জানলা-পথে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতাম। কেমন একটা ব্যথা অনুভব

করতাম। ফুলের আশপাশে গুনগুন করে ফেরা মৌমাছির মত রাণী মার্গোকে ঘিরে ঐসব লোকদের ঘুরঘুর করা দেখে আমার মনে এক শিশুসুলভ হিংসা জেগে উঠত।

ওদের মধ্যে একজন গম্ভীর লম্বা চেহারার অফিসার ছিল। কপালে কাটা দাগ আর চোখদুটো গর্তে ঢোকা। অন্যদের তুলনায় সে খুব কম আসত। যখনই আসত সঙ্গে নিয়ে আসত বেহালা। বাজাতও চমৎকার। এমনই চমৎকার সে বাজনা যে, পথের লোক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনত। মহল্লার লোক এসে ভিড় করে কাঠের স্তূপের ওপরে বসে বসে ওর বাজনা শুনত। আমার মনিবরা বাড়ি থাকলে তারাও জানলা খুলে শুনত আর প্রশংসা করত বেহালাবাদকের। একমাত্র গির্জের ছোট পুরুত ছাড়া আর কারো প্রশংসা কোনদিন ওদের মুখে শুনিনি। গান বাজনার চেয়ে মাছের ঝাল, পিঠে ইত্যাদিই ওদের বেশি পছন্দ।

অফিসারটি কখনো কখনো গানও গাইত, অথবা জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, হাত দিয়ে কপাল চেপে ভাঙা গলায় কবিতা আবৃত্তি করত।

একদিন যখন ছোট মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করছিলাম জানলার নিচে বসে তখন শুনতে পেলাম রাণী মার্গো ওকে অনুরোধ করছেন গান গাইতে। কিছুক্ষণ আপত্তি করার পর খুব স্পষ্ট করে আবৃত্তি করল :

'সুন্দরীকে ফোটাতে গানে, সৌন্দর্য চাই।
সুন্দরী সে পরমা,
গান জানা যে নেই তার তুলনা।'

পংক্তি কটা আমার খুবই ভাল লাগল। জানি না কেন অফিসারটির জন্যে আমার মনে মনে দুঃখ হল।

মহিলাটিকে দেখতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত যখন ঘরে আর কেউ থাকত না, শুধু তিনি পিয়ানোর সামনে একা বসে থাকতেন। সেই সময় সুর আমার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে বাসা বাঁধত মস্তিষ্কে। চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে যেত সবকিছু। কেবলমাত্র জানলাটাই আমার দৃষ্টি-পথে জেগে থাক'•। আর জানলার ওপারে বাতির হলদে আলোয় দেখা যেত মহিলাটির সুন্দর দেহভঙ্গিমা, অহংকারী মুখের একটা পাশ, আর উড়ন্ত পাখির ডানার মত সঞ্চরমান পিয়ানোর পর্দার ওপরে তার হাত দুখানা।

তার দিকে তাকিয়ে সেই ব্যথাভরা গান শুনতে শুনতে মনে অনেক আকাশ-কুসুম স্বপ্নের জাল বুনতাম। কোন দিন আমি নিশ্চয় পারব এক গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে। আর সমস্ত ধনরত্ন উজাড় করে ঢেলে দেব তার হাতে—যাতে মহিলাটি ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে ওঠেন! আমি স্কোবেলেভ হলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করতাম। তারপর বন্দীদের মুক্তি-মূল্য দিয়ে শহরের সুন্দর শ্রেষ্ঠ জায়গা ওৎকসে ওর জন্যে একটা প্রাসাদ তৈরি করতাম। এই বাড়ি, এই পাড়া, যেখানে সবাই ওঁর সম্পর্কে জঘন্য কথা বলে, নোংরা গুজব ছড়ায়, সেটা ছেড়ে যাতে উনি সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন।

বাড়ির সব চাকররা, বাসিন্দারা—বিশেষ করে আমার মনিবরা যেমন বলত দর্জির বৌ সম্পর্কে, তেমনি বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলত রাণী মার্গোর কথা। তফাৎ কেবল এটুকুই যে এর সম্পর্কে বলত খুব সাবধানে, ফিস্‌ফিস্ করে আর বুঝে শুনে।

সম্ভবত এর জন্যই তারা ভয় পেত যে উনি হচ্ছেন এক অভিজাত ভদ্রলোকের বিধবা। তুফিয়ায়েভ একবার বলেছিল আমাকে ওর ঘরের বাঁধান প্রমাণ-পত্রগুলো হচ্ছে ওর স্বামীর পূর্বপুরুষদের, বিভিন্ন জারের কাজ থেকে পাওয়া সম্মান-পত্রে নির্দেশনামা। ওর ভেতরে জার গদুনভ, আলেক্সেই আর মহান পিটারের দেওয়া সম্মানপত্র আছে। তুফিয়ায়েভ পড়াশুনা জানে—সে নিয়মিত রূপকথা পড়ত। ওরা ভয় করত মহিলা যদি তার পদ্মরাগমণি বসান চাবুক দিয়ে খুব করে পিটে দেন। লোকে বলে, একবার নাকি উনি এক পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে চাবুক দিয়ে মেরেছিলেন।

কিন্তু অস্পষ্ট মৃদু আলোচনার চাইতে অন্য কিছুই তেমন ভাল নয়। এমন একটা বিদ্বেষে ঘনীভূত মেঘের ভেতরে মহিলা বাস করতেন বলে আমি মনে দারুণ আঘাত পেতাম। বিহ্বল হয়ে পড়তাম। একদিন ভিক্তর বলল, এক মধ্য রাতে বাড়ি ফেরার সময় সে রাণী মার্গোর শোয়ার ঘরের জানলা-পথে উঁকি দিয়েছিল। সে নাকি দেখেছে যে মহিলাটি অন্তর্বাস পরে একটা সোফায় বসে রয়েছেন; আর মেজর মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে তার পায়ের নখ কেটে দিয়ে স্পঞ্জ ভিজিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনে গিন্নী বুড়ি ঘৃণায় থুথু ফেলে গাল দিতে লাগল। আর ছোট গিন্নী লাল হয়ে উঠল।

'ছি! ভিক্তর,' ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'তোমার লজ্জা করে না? ঐ সব ভদ্রলোক কী জঘন্য লম্পট রে বাবা!'

মনিব কেবল একটু হাসল, একটাও কথা বলল না। কিছু না বলার জন্য আমি তার প্রতি মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করতাম। কিন্তু ভয় করতে লাগল পাছে সেও ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিছু বলে। অনেক বার 'ছিঃ ছিঃ' করার পরে মেয়েছেলেরা ভিক্তরকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল সবকিছু। কেমন ভঙ্গিতে মহিলাটি বসেছিলেন, কেমন করে বসেছিল মেজর; আর ভিক্তরও মুখরোচক গল্প বলতে লাগল ওদের, 'তার মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল আর জিভটা বেরিয়ে পড়েছিল।'

মেজর মহিলার পায়ের নখ কাটছিল এতে লজ্জাকর কিছু নেই। কিন্তু মেজরের জিভটা বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল একথা আমি বিশ্বাস করিনি। এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা বলে আমার মনে হল। বললাম, 'ব্যাপারটা যদি অশ্লীলই জান তাহলে উঁকি মারতে গিয়েছিলে কেন? তুমি তো আর ছোটটি নও।'

স্বভাবতই ওরা আমাকে গাল পাড়ল। কিন্তু ওদের গালাগাল আমি গ্রাহ্য করিনি। তখন একটামাত্র ইচ্ছেই আমার মনে জেগে উঠেছিল—ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে নিচে চলে গিয়ে মেজরের মতই মহিলার পায়ের নীচে হাঁটু মুড়ে বসে তাকে বলি, 'চলে যান, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান দয়া করে!'

এখন আমার চোখের ওপর ধরা দিয়েছে অন্য ধরণের এক জীবন—অন্য ধরণের মানুষ, অন্য ধরণের অনুভূতি আর ভাবধারা। ফলে এই বাড়ি, বাড়ির লোকজন—সবার ওপরে আরো বেশি বিরক্তি জাগত। সব কিছু যেন একটা জঘণ্য নোংরা গুজবের জালে জড়িয়ে আছে, তার হাত থেকে একটি লোকেরও বাঁচার উপায় নেই। সৈন্যবাহিনীর বড়োরা পুরুত দরিদ্র রোগা মানুষ। লম্পট নেশাখোর বলে তার

বদনাম। আমার মনিবদের মতে সমস্ত অফিসার আর তাদের বৌয়েরাই চরিত্র-হীন। মেয়েদের সম্পর্কে আর্দালীদের বিরক্তিকর আলোচনা শুনতে ঘেন্না হত। কিন্তু সব চাইতে বেশি ঘেন্না করতাম মনিবদের। অন্যের সম্পর্কে ওরা যে সব কথা বলত তার সত্যিকার মূল্য যে কতখানি তা খুবই ভাল করে জানা ছিল আমার। অন্যের বদনাম করাটাই হল ওদের একমাত্র স্বভাব যাতে পয়সা লাগে না। আর এটাই হল ওদের একমাত্র ফুর্তি। যেন এই সব করে ওরা ওদের নিজেদের জীবনের একঘেয়েমি, ধর্মান্ধতা ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করত।

রাণী মার্গোকে নিয়ে ওরা যখন নোংরা গল্প করত তখন এমন এক তীব্র আবেগে আমার অন্তর ভেঙ্গে যেত যা আমার বয়সের তুলনায় ছিল অস্বাভাবিক। ঐ নিন্দুক পরচর্চাকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইত। ওদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা, ওদের আক্রমণ করার এক উত্তাল ইচ্ছে জেগে উঠত। আবার কখনোবা নিজের ওপরে, সমস্ত মানুষের ওপরে এক অনুকম্পার বন্যা নেমে এসে অভিভূত করে ফেলত। ঘৃণার চাইতেও কঠিন এই অব্যক্ত অনুকম্পা বহন করা।

রাণী মার্গো সম্পর্কে ওদের চাইতে অনেক বেশি জানতাম আমি। ভয় হত আমি যা জানি, পাছে সে সব কথা ওরা জেনে যায়।

রবিবার সকালে যখন গোটা পরিবার উপাসনা আসরে যেত সেই সময়ে আমি ঐ মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে বসাতেন। সোনালী রঙের সিল্কের কাপড়ে মোড়া একটা চেয়ারে গিয়ে বসতাম আমি। ছোট মেয়েটি এসে বসত আমার কোলে। আর আমি তার মার কাছে বলে যেতাম যে বইটা পড়েছি তারই কথা। শোবার ঘরের অন্যান্য কিছুর মতই সোনালী রঙের একটা চাদরে গা ঢেকে ছোট ছোট হাত দুটো গালের তলায় রেখে চওড়া বিছানায় আমার রাণী শুয়ে থাকতেন: ঘন কালো চুলের বেণীটা এলিয়ে থাকত তার হলদে কাঁধের ওপরে। কখনোবা বিছানার কিনারা বেয়ে ঝুলে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ত চুলগুলো।

শুনতে শুনতে তার কোমল দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আর একটুখানি মৃদু হেসে বলতেন, 'সত্যি?'

তার হাসিটা পর্যন্ত রাণীর মুখের হাসির মতই মনে হত আমার। তিনি কথা বলতেন গভীর কোমল কণ্ঠে। কিন্তু, আমার মনে হত তিনি যেন বারে বারে কেবল একটা কথাই বলে চলেছেন, 'আমি জানি, অন্যের তুলনায় আমি অনেক বেশি ভাল, অনেক বেশি মার্জিত। তাই ওদের কাউকেও তোয়াক্কা করি না আমি।'

কোন কোন দিন গিয়ে দেখতাম আয়নার সামনে নিচু একটা আরাম কেদারায় বসে চুল বাঁধছেন। দিদিমার মতই লম্বা আর ঘন তার চুল। চেয়ারের হাতল বেয়ে নেমে সে চুল ছড়িয়ে পড়ত তার হাঁটুর ওপরে। আর পেছন দিক থেকে ঝুলে প্রায় মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ত। আয়নায় দেখতে পেতাম তার সুডোল সুদৃঢ় স্তন দুটো। আমার সামনেই তিনি কাঁচুলি আর মোজা পরতেন। কিন্তু তার ঐ নগ্নতা এতটুকুও লজ্জার ভাব আমার ভেতরে জাগিয়ে তুলত না। তার সৌন্দর্য, তার দেহসৌষ্ঠব এক আনন্দময় গর্বে আমার প্রাণ মন ভরে তুলত। সব সময়েই তার গা থেকে পাওয়া যেত ফুলের সুগন্ধ। তাকে নিয়ে কোনরকমের কামভাব জেগে ওঠার বিরুদ্ধে এটাই ছিল এক দুর্ভেদ্য বর্ম।

শক্তি আর স্বাস্থ্যে আমি ভরপুর ছিলাম। যৌন-সম্পর্কের গোপন রহস্য আমার জানা ছিল। আর কী স্থূল কুৎসিতভাবে, কী উৎকট ফুর্তি নিয়ে ওরা যৌন-সম্পর্কের কথা বলে তাও শুনেছি। তাই কোন পুরুষ এই মহিলাকে আলিঙ্গন করে একথা কল্পনা করাও ছিল আমার পক্ষে কষ্টকর। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না ওর দেহ উপভোগের জন্য কোন লোকের দুঃসাহসী নির্লজ্জ হাতে ওকে জড়িয়ে ধরার অধিকার আছে। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে রান্না-বাড়ি আর চালাঘরের যা কিছু প্রেম তা রাণী মার্গোর পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উন্নততর কোন আনন্দের খবর, ভিন্নতর কোন প্রেমের খোঁজ তিনি পেয়েছেন।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পরে একটু রাতে তার ড্রইংরুমে ঢুকতেই শোবার ঘরের পর্দার ওপাশ থেকে ঝিন্‌ঝিনে হাসির ঝংকারের সঙ্গে পুরুষের গলার স্বর শুনেই থমকে দাঁড়ালাম। পুরুষটি অনুনয় করে বলছিল, 'শীগ্‌গীর কর না!' এ কী! এ যে অবিশ্বাস্য একেবারে!

আমার উচিত ছিল চলে আসা। কিন্তু অনুভব করলাম নড়ার ক্ষমতাটুকুও যেন আর আমার নেই।

'কে ওখানে?' ডাকলেন মহিলা, 'ও, তুই? আয়, ভেতরে আয়!'

ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন; জানলা-গুলোয় পর্দা টানা। গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে শুয়ে আছেন মহিলা। আর তার পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সেই বেহালাবাদক অফিসার। গায়ে শুধু একটা সার্ট। বোতাম খোলা। ডান কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত টানা একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে। কাটা দাগটা এত চক্‌চকে লাল যে সেই আবছা আলোর ভেতরেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অফিসারের চুলগুলো অদ্ভুতভাবে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। আর ওর চিরবিষণ্ণ কাটা দাগেভরা মুখে এই প্রথম আমি হাসির রেখা দেখতে পেলাম। লোকটা অদ্ভুতভাবে হাসছিল। আর বড় বড় মেয়েলী চোখ দুটো মেলে এমনভাবে আমার রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল যেন এই প্রথম সে তার রূপ দেখল। রাণী মার্গো বললেন, 'এটি হল আমার বন্ধু।'

ঠিক বুঝতে পারলাম না কথাটা আমাকে না অফিসারটিকে লক্ষ্য করে বলা হল।

'এত ভয় পেয়ে গেলি কেন?' মনে হল তার গলার স্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে! 'এদিকে আয়।'

এগিয়ে যেতেই তার তপ্ত নগ্ন হাতখানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বললেন, 'যখন বড় হবি, তোর জীবনেও আনন্দ আসবে। এখন যা!'

বইটা তাকের ওপরে রেখে আর একখানা বই নিয়ে আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চলে এলাম।

বুকের ভেতরটায় কি যেন কড়কড় করে উঠল। সত্যি বলতে কি, এক মুহূর্তের জন্যও আমি ভাবতে পারিনি যে আমার রাণী কখনো সাধারণ মানুষের মত প্রেমে পড়তে পারেন। কিংবা সেই অফিসারটির সম্পর্কেও একথা ভাবতে পারিনি। অফিসাটির সেই হাসিটাও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে যাওয়া শিশুর মুখে যেমন অনাবিল আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে তেমনি হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে. আর ওর বিষণ্ণ মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে

গিয়েছিল। নিশ্চয়ই সে ওকে ভালবাসে। ওকে ভাল না বেসে পারে এমন আবার আছে না কি কেউ? আর তিনি যে ঐ অফিসারটির ওপরে তার ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তারও ন্যায্য কারণ আছে। লোকটি খুব চমৎকার বাজায় আর খুব গভীর আবেগের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করে!

কিন্তু এই যে আমি মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছিলাম, এতেই বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা ঠিক আছে, এমন নয়। যা দেখলাম তার মধ্যে আর রাণী মার্গোর সম্পর্কে আমার মনোভাবে কোথায় যেন খানিকটা গলদ লেগে রইল। অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলাম, কী যেন একটা হারিয়ে ফেলেছি। বহুদিন ক্ষোভে দুঃখে বুক ভারি হয়ে ছিল।

একদিন খুব কর্কশ ব্যবহার করলাম তার সঙ্গে। পরে যখন আর একখানা বই-এর জন্য এলাম, কঠিন স্বরে তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে তুই একটা খুদে বর্বর বিশেষ। মেরামতের বাইরে। তোর কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি!'

আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, লোকে যখন তার সম্পর্কে কুৎসা করে তখন আমার কি রকম কষ্ট হয়, জীবনের ওপরে কি ঘেন্না ধরে যায়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপরে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা উনি শুনছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠে আমাকে ঠেলে একটু দূরে সরিয়ে দিলেন।

'থাক্, হয়েছে, থাম! ওসবই আমি জানি, বুঝলি? সব কিছুই জানি আমি, সব সব!'

তারপর আমার হাত দুটো তার মুঠোয় তুলে নিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'এসব নোংরা ব্যাপারে যত কম কান দিবি ততই তোর মঙ্গল। তোর হাতদুটোও দেখছি ভাল করে ধোয়া নেই।'

একথাটা উনি না বললেও পারতেন। আমার মত ওকে যদি পেতলের জিনিষপত্র মাজতে হত, ঘসে ঘসে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে হত, বাসন মাজতে হত তবে ওর হাতদুটোও দেখতেন আমার চাইতে বেশি ভাল হত না।

'একটা লোক যদি বাঁচার মত বাঁচতে জানে তবে সবাই তাকে ঘৃণা করে, হিংসা করে। যদি না জানে তবে তাকেই আবার হেয় জ্ঞান করে।' গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে বললেন। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললেন, 'তুই আমায় ভালবাসিস্?'

'বাসি।'

'খুউব?'

'হাঁ।'

'কিন্তু, কেন ভালবাসিস্?'

'তাতো জানি না।'

'ধন্যবাদ। তুই খুব লক্ষ্মীছেলে। আমাকে লোক বালবাসুক এতে আমি খুবই আনন্দ পাই।'

একটু হেসে উঠলেন। মনে হল কিছু একটা বলতে চাইছেন। কিন্তু শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। আমার হাতদুটো তখনো তিনি তার মুঠোর ভেতরে ধরে আছেন।

'আরো ঘন ঘন আমার কাছে আসিস, কেমন ? যখনই সময় পাবি তখনই।'

এই আমন্ত্রণ নিলাম আর ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে প্রচুর লাভবানও হলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে যখন আমার মনিবেরা ঘুমোত, আমি ছুটে নিচে চলে আসতাম। আর তিনি ঘরে থাকলে তার কাছে বসে ঘণ্টাখানে, এমন কি তারও বেশি সময় কাটিয়ে দিতাম।

'তোকে রুশিয়ার বই পড়তে হবে। জানতে হবে ওদের জীবন।' দ্রুত সঞ্চরমান গোলাপী রঙের আঙুলগুলো দিয়ে সুগন্ধি চুলে কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে উনি শেখাতেন আমাকে।

তারপর এক এক করে বলে যেতেন রুশ লেখকদের নাম। বলতেন, 'মনে রাখতে পারবি তো নামগুলো ?'

মাঝে মাঝে কখনো চিন্তিত সুরে বলে উঠতেন, হয়ত একটু বিরক্তিও থাকত তার কথার সুরে, 'সত্যি ! তোকে যে পড়তে হবে ! সে কথা একেবারেই ভুলে যাই আমি।'

খানিকক্ষণ তার পাশে কাটিয়ে একটা নতুন বই নিয়ে ছুটে চলে আসতাম ওপরে। মনে হত যেন স্নান করে পবিত্র হয়ে এলাম।

এরমধ্যেই আক্সাকভের 'পারিবারিক ইতিহাস', সুন্দর রুশ কবিতা 'বনে বনে', অদ্ভুত কাহিনী 'এক শিকারীর কথা', গ্রিবেঙ্কো আর সল্লোগুবের কয়েক খণ্ড উপন্যাস এবং ভেনিভিতিনভ, ওদোয়েভস্কি আর ত্যুৎচেভের কবিতা পড়া হয়ে গিয়েছিল। এই সব বই আমার মন থেকে দীনহীন তিক্ত বাস্তবতার খোলস খসিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম এতদিনে ভাল বই বলতে কি বুঝোয়, আমার পক্ষে সেগুলো কতখানি প্রয়োজন। ওরা আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলল এই শান্ত সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় যে, দুনিয়ায় একা নই আমি ; আর অবশ্যই আমি একদিন আমার জীবনে পথ খুঁজে নিতে পারব।

দিদিমা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। উল্লসিত হয়ে তাকে জানালাম রাণী মার্গোর কথা।

বড় করে একটিপ নস্যি নিয়ে বলল সে, 'খুব আনন্দের কথা ! দুনিয়ায় ঢের ভাল মানুষ আছে রে। কেবল একটু খুঁজে দেখলেই তাদের দেখা পাবি।'

একদিন সে বলল, 'তোকে এমন ভালবাসেন, একদিন তার সঙ্গে দেখা করে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আসা উচিত, কি বলিস ?'

'না, যেও না।'

'আচ্ছা, তাহলে যাব না। ভগবান, ভগবান, সবকিছু কতই না সুন্দর। যদি চিরকাল বেঁচে থাকতে পারতাম তাহলে আমার কী আনন্দই না হত।'

আমাকে স্কুলে ভর্তি হতে দেখার সুযোগ কিন্তু রাণী মার্গোর হল না। একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটল 'হুইট সানডে' পর্বের দিনে। আর সেটা ঘটল আমারই একটা কর্মের বিপর্যয়ে।

ছুটির কদিন আগে আমার চোখের পাতা দুটো ফুলে উঠে চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ বুঝে গেল। মনিবরা ভয় পেল বুঝিবা আমি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাব। আমারও সে রকম ভয় হল। আমাকে ওরা হেনরী রোদজেভিচ নামে ওদের পরিচিত এক চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমার চোখের পাতার ভেতরের

দিকে অপারেশন করলেন। যারজন্য দীর্ঘদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখের ব্যথায় আর অন্ধকারে বিছানায় পড়ে থাকলাম। 'হুইট সানডে'র আগের দিন সন্ধ্যায় আমার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল যেন কবর থেকে উঠে এলাম, যেন সেখানে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে রাখা হয়েছিল। অন্ধ হওয়ার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। সেটা এমন একটা দুর্ভাগ্য যে তা আর বলার নয়। তাতে দুনিয়ার দশ ভাগের মধ্যে ন'ভাগ থেকেই বঞ্চিত থাকতে হয়।

'হুইট সানডে'র আনন্দমুখর দিনে অসুস্থতার ফলে দুপুরে সব কাজ থেকে ছুটি পেয়ে রান্নাঘরে আর্দালীদের সঙ্গে দেখা করতে বেরলাম। দেখি ভারভার্তিক তুফিয়ায়েভ বাদে আর সকলেই মাতাল হয়ে আছে। সন্ধ্যার দিকে ইয়েরমোখিন একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে সিদরভের মাথায় বসাল এক বাড়ি। রাস্তার ওপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সিদরভ। আর ইয়েরমোখিন ভয় পেয়ে গিয়ে লুকোল খাদের ভেতরে।

দেখতে দেখতে পাড়াময় গুজব রটে গেল যে সিদরভ খুন হয়েছে। রান্নাঘর আর বাড়িতে ঢোকার পথের মাঝখানে অনড় হয়ে পড়ে থাকা আর্দালীর লাসটা। দেখবার জন্য বারান্দার সিঁড়ির ওপরে ভিড় জমে উঠল। লোকে ফিস্‌ফিস্ করল, পুলিস ডাকা উচিত। কিন্তু কেউ পুলিস ডাকল না, সিদরভকে ছোঁবার সাহসও হল না কারো। ধোপানী নাতালিয়া কজলোভ্‌স্কায়া এল। ওর গায়ে ফিকে নীল রঙের নতুন পোশাক, কাঁধের ওপরে একটা শাদা রুমাল জড়ান। তীব্র রাগে ধাক্কা দিয়ে ভিড় ঠেলে দোরের পথে এগিয়ে গিয়ে ওর দেহটার পাশে ঝুকে পড়ে বসে পড়ল সে।

'যত সব মূর্খের দল', চিৎকার করে বলে উঠল নাতালিয়া, 'ও তো বেঁচে আছে! একটু জল আন!'

লোকে সাবধান করে দিল ওকে, 'পরের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না হে!'

'জল আন বলছি!' যেন আগুন লেগেছে এমনিভাবে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া। তারপর দ্রুত হাতে তার ফ্রকটা হাঁটুর ওপরে তুলে ঝাঁকি দিয়ে টেনে পেটিকোটটা নামিয়ে দিল। তারপর রক্তাক্ত মাথাটা নিজের কোলের ওপরে তুলে নিল।

কাজটা যাদের তেমন ভাল লাগছিল না সেই সব ভীরু দর্শকের দল সরে পড়ল। দরজার আধো আলো-ছায়ার মধ্যে দেখতে পেলাম নাতালিয়ার গোল ফর্সা মুখের মাঝে টলটলে উজ্জ্বল চোখ দুটো। এক কলসী জল নিয়ে এলাম আমি। নাতালিয়া সিদরভের মাথায়, বুকে জল ঢালতে বলল। আমাকে সাবধান করে দিল, 'কিন্তু আমাকে ভিজিয়ে দিসনা যেন। আমি যাচ্ছি নিমন্ত্রণে।'

আর্দালী জ্ঞান ফিরে পেল। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে কাতরে উঠল।

'ওকে তুলে ধর।' যাতে নিজের পোষাক না নষ্ট হয় এমনিভাবে দূর থেকে ওর বগলের নিচে হাত দিয়ে আলগা করে ধরে বলল নাতালিয়া। আমরা দুজনে ওকে ধরে রান্নাঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। নাতালিয়া ভিজে কাপড় দিয়ে ওর মুখ মুছে দিল। তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাপড়টা ভিজিয়ে ভিজিয়ে মাথার ওপরে চেপে ধরিস। দেখি, ততক্ষণে আমি বেকুফ্‌টাকে ধরে আনতে পারি কি না। মাথা খারাপ শয়তানগুলোর; মাতলামী করে জেলে যাবে তবে হবে।' রক্তমাখা পেটিকোটটা খুলে পা দিয়ে এক কোণে ছুঁড়ে দিল। তারপর নতুন ফ্রকটা ঠিক্‌ঠাক্ করে বেরিয়ে গেল।

সিদরভ টানটান হয়ে হিক্কা তুলল, কাতরাল ; ওর মাথা থেকে তখনো কালো রক্ত ঝরে আমার পায়ের ওপর পড়ছিল। সেটা সহ্য হচ্ছিল না আমার, কিন্তু ভয়ে পা-টা সরাতেও পারছিলাম না।

নিদারুণ বিষাদে মনটা দমে গেল। বাইরের সবকিছু ঘিরেই আনন্দের উৎসবের মেলা। কচি বার্চ পাতা দিয়ে গেট, জানলা সাজান হয়েছে। প্রত্যেক থামে দেবদারু পাতার রূপসজ্জা। রাস্তা জুড়ে আনন্দ উৎসবের সমারোহ চলেছে। সবকিছু নবীন যৌবনময়। ভোরবেলা মনে হচ্ছিল আমার এই বসন্তোৎসব চিরন্তন হয়ে থাকবে। এরপর জীবন পবিত্র উজ্জ্বল, আনন্দময় হয়ে উঠবে।

আর্দালী বমি করল। গরম ভদ্‌কা আর কাঁচা রসুনের বিশ্রী গন্ধে রান্নাঘরের বাতাস ভরে উঠল। জানলার কাঁচে চেপে ধরা চওড়া মুখ আর ভোঁতা নাকের অস্পষ্ট ছায়া উঁকি মারছিল থেকে থেকে। দুদিকে মেলা হাতগুলো দেখাচ্ছিল বিরাট বিরাট কানের মত।

মাথা পরিষ্কার হতেই আর্দালী বিড়বিড় করে উঠল, 'কি হয়েছিল? আমি পড়ে গিয়েছিলাম না কি? ইয়েরমোখিন? সত্যিকারের বন্ধু বটে!'

আর্দালী কাশতে শুরু করল। তারপর কাঁদতে লাগল মাতালের কান্না। শেষে কাতরাতে আরম্ভ করল, 'আমার ছোট বোনটি···বেচারা ছোট বোনটি আমার।'

সমস্ত শরীর ভেজা, ধুলো কাদা মাখা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে তা থেকে; টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে ধপ্‌ করে ঢলে পড়ল বিছানার ওপরে।

'আমাকে একেবারে খুন করে ফেলেছে?'

খুব মজা লাগল এতে আমার।

'হাসছিস কেন, ব্যাটা শয়তান?' বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'হাসি আসে কোথা থেকে—এমনভাবে খুন হলাম আমি—শেষ হয়ে গেলাম একেবারে জন্মের মত।'

দুহাত দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বড়বিড় করতে লাগল, 'প্রথম রাতে রাণী রূপসী বিলাসিনী, শেষ রাতে হাড় মড় মড় ডাইনী। আমার সামনে থেকে ভাগ শয়তান!'

'চুপ কর, বাজে বোকো না!' বললাম আমি।

রাগে আর্দালী খেঁকিয়ে উঠে, পা ঠুকে চিৎকার করে বলল, 'আমাকে খুন করে ফেলল আর তুই কি না···'

ওর ভারি নোংরা অবশ হাতটা দিয়ে আমার চোখে ঘুসি মারল। চিৎকার করে অন্ধের মত বাইরে ছুটে আসতেই দেখি ইয়েরমোখিনকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে নাতালিয়া আর গাল দিচ্ছে, 'চল, ব্যাটা ঘোড়া!' তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

'মারামারি আরম্ভ করেছে।'

'মারামারি আরম্ভ করেছে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল নাতালিয়া। তারপর ইয়েরমোখিনকে জোরে একটা টান দিয়ে বলল, 'এবারের মত বেঁচে গেলি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে!'

ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়ে এসে দোরের দিকে রান্নাঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি দুজন দুজনকে জড়িয়ে কাঁদছে মাতালের পুনর্মিলনের কান্না। তারপর ওরা দুজনে নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতেই নাতালিয়া ওদের এক চড় মেরে বলল, 'সাবধান বলছি, আমার গায়ে হাত দিসনা, কুত্তা কোথাকার! কি ভেবেছিস তোরা আমাকে, আমি ঐ নষ্টা মাগীদের কেউ? মনিবের ফিরে আসার আগে শুয়ে পড়ে ঘুমো; নাহলে কপালে অনেক দুঃখ আছে বলে দিলাম।'

বাচ্চাছেলেদের মত ওদের শুইয়ে দিল নাতালিয়া—একটাকে খাটে আর একটাকে মেঝের ওপর। ওরা নাক ডাকতে শুরু করলে পর বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

'দেখ আমার ফ্রকটার অবস্থা—যাচ্ছিলাম নেমন্তন্ন খেতে, এদিকে যেতে সব নষ্ট হয়ে একশা হয়ে গেছে। ও মেরেছে না কি তোকে? ব্যাটা অপদার্থ গোঁয়ার। ভদ্‌কা জিনিসটা এবার বুঝে দেখ! কোনদিন মদ খাবি না, বুঝলি ছেলে? ঐ অভ্যেসটা করবি না কোন দিন।'

গেটের সামনে বেঞ্চের ওপরে ওর পাশে বসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ও যে মাতালকে ভয় পায় না এটা কেমন করে সম্ভব হল।

'সুস্থ মানুষকেই ভয় করি না, তা মাতাল। এটা দিয়ে ওদের ঠিক রাখি!' লাল শক্ত মুঠোর একটা ঘুসি দেখাল আমাকে। 'আমার স্বামীও এমন করত। মরে গেছে। ভীষণ মাতাল ছিল। ওর হাত-পা বেঁধে রাখতে হত। তারপর ঘুম ভেঙে সুস্থ হয়ে উঠলে প্যান্ট খুলে একটা শক্ত লাঠি দিয়ে খুব পিটতাম। বলতাম, 'মদ খাওয়া, মাতলামো ছাড়। ফূর্তি কর, ঘরে বৌ আছে মজা কর, কিন্তু মদের গ্লাস নয়! ঠিক এমনি করে এমন পিটতাম যে আর পেটার শক্তি থাকত না। তারপর থেকে আমার হাতে কাদামাটিটি হয়ে থাকত।'

সেই মেয়ে ইভের কথা আমার মনে পড়ল যে ঈশ্বরকেও নাকি প্রতারণা করেছিল। বললাম, 'আপনার শরীরে খুব জোর তো।'

উত্তরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল নাতালিয়া, 'পুরুষের চাইতে মেয়েদের জোর বেশি থাকা উচিত। দুটো পুরুষের শক্তি থাকা দরকার। কিন্তু প্রভু সেদিক দিয়ে মেয়েদের ঠকিয়েছেন। কিন্তু চাষা-মরদ কি যে করবে কিছু বলা যায় না কখনো!

ঠাণ্ডা স্বরে বলল নাতালিয়া। এতটুকু বিরক্তি নেই ওর কথায়। বড় বড় স্তন দুটোর ওপরে হাতদুটো জোড়া করে বেড়ার গায়ে বসে রয়েছে হেলান দিয়ে। বিষণ্ণ চোখ দুটোর দৃষ্টি স্থির, নোংরা জঞ্জালভরা বাঁধের ওপর নিবদ্ধ। ওর মূল্যবান কথা শুনতে শুনতে আমার সময়ের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাঁধের ওপাশ থেকে মনিব আর তার বাহুলগ্না হয়ে আসছে মনিব-গিন্নী। মোরগ দম্পতির মত ধীরে ধীরে মুরুব্বি চালে ওরা হাঁটছে। আমাদের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর কি যেন আলোচনা করছে।

ছুটে দোর খুলে দিতে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তিক্ত কড়া স্বরে বলল মনিব-গিন্নী, 'শেষ অবধি ধোপানীর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিস, না? নিচের তলার মহিলার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছিস বুঝি?'

এমন বোকার মত কথায় রাগ না হয়ে যায় না। কিন্তু যখন মনিব একটু হেসে সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি কাটল তখন ভীষণ আঘাত পেলাম।

'বেশতো, এটাই তো সময়, কি বলিস ?'

পরদিন সকালে চালাঘরে কাঠ আনতে গিয়ে দেখি দোরের পাশে ছিটকিনির গর্তটার কাছে একটা শূন্য মানিব্যাগ পড়ে আছে। অনেকদিন ব্যাগটা দেখেছি সিদরভের কাছে। ওটা কুড়িয়ে তখনই ওর কাছে চলে গেলাম।

'টাকাকড়ি কোথায় ?' ভেতরে আঙুল দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জিজ্ঞেস করল, 'এক রুবল আর ত্রিশ কোপেক ছিল ; দে শীগ্‌গির !'

ওর মাথায় একটা তোয়ালে জড়ানো। মুখটা হলদে, শুকনো। ফুলো চোখটা পিট্‌পিট্ করতে করতে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যেন বিশ্বাসই করতে চায় না যে ব্যাগটা যখন আমি পেয়েছি তখন ওটা শূন্য ছিল।

ইয়েরমোখিন ছুটে এল। ও তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমিই চোর।

'ওই নিয়েছে,' আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে নিয়ে চল ওর মনিবের কাছে। এক সৈনিক কখনো আরেক সৈনিক ভাইয়ের কিছু চুরি করে না!'

ওর কথায় আমার মনে হল যে ওই টাকাপয়সা নিয়ে ব্যাগটা আমাদের চালাঘরের সামনে ফেলে রেখেছে। তাই তখনই আমি ওর মুখের ওপরে বলে উঠলাম, 'মিথ্যে কথা! তুই চুরি করেছিস!'

ভয়ে রাগে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠায় আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে আমার অনুমান ঠিকই।

'প্রমাণ কর!' খেঁকিয়ে উঠল ইয়েরমোখিন।

কিন্তু তা প্রমাণ করব কেমন করে? চিৎকার করে উঠে আমাকে টেনে হিঁচড়ে উঠোনে এনে ফেল্‌ল ইয়েরমোখিন। পেছন পেছন সিদরভ এল গাল পাড়তে পাড়তে। আর জানলায় জানলায় মুখগুলো উঁকি দিতে লাগল। রাণী মার্গোর মা তেমনি সিগারেট টানতে টানতে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদেরকে দেখছিলেন। 'আমার মহিলাটির' চোখে আমার মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে উপলব্ধি করে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

মনে পড়ে দুই সৈনিক আমার হাত ধরে টানতে টানতে মনিবের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আর মনিব আমার বিরুদ্ধে ওদের নালিশ শুনতে শুনতে ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল, 'নিশ্চয় ওরই কাজ,' বলে উঠল মনিবের বৌ, 'কাল রাতে গেটের কাছে বসে ধোপানীর সঙ্গে পিরীত করতে দেখেছি ওকে নিজের চোখে। নিশ্চয়ই ওর কাছে টাকা ছিল—টাকাকড়ি ছাড়া এমনি কিছু পাবার উপায় নেই ধোপানীর কাছ থেকে।'

'ঠিক!' চিৎকার করে বলে উঠল ইয়েরমোখিন।

আমার মাথাটা ঘুরছিল। এক তীব্র আক্রোশ পেয়ে বসেছিল আমাকে। চেঁচিয়ে গাল দিতে আরম্ভ করলাম মনিব-গিন্নীকে। ফলে হাড়ভাঙা মার খেলাম।

কিন্তু মারের চাইতেও বেশি কষ্ট পেলাম এই ভেবে যে এরপর আমার সম্পর্কে কী ভাববেন রাণী মার্গো? আমি নির্দোষী, কী করে তার কাছে সেটা প্রমাণ করব?

আমার পক্ষে সে এক অসহ্য সময়।

কপাল ভাল যে সৈনিকরা, কি ঘটেছিল সমস্ত ব্যাপারটা জানতে না জানতে

বাড়িময়, পাড়াময় রটিয়ে দিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি চিলেকোঠায় শুয়েছিলাম, শুনলাম নিচে নাতালিয়া কজলোভস্কায়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'কেন, মুখ বুজে থাকব কেন? এদিকে আয়, আমার সাধু পুরুষ, আয় দেখি একবার। আয় বলছি! নয়তো এক্ষুনি তোর মনিবের কাছে যাব, দেখব তখন আসিস্ কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল ব্যাপারটা যেন আমাকে নিয়েই। আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে নাতালিয়া। ক্রমেই তার গলা চড়ে যাচ্ছিল। ক্রমেই যেন একটা বিজয় উল্লাস জেগে উঠেছিল ওর স্বরে।

'কত টাকা আমাকে তুই দেখিয়েছিলি কাল? কোথায় পেয়েছিলি সে টাকা বল? সবাই শুনি।'

আনন্দে গলা বন্ধ হয়ে এল! শুনতে পেলাম সিদরভ করুণ গলায় কঁকিয়ে উঠল, 'আরে, ইয়েরমোখিন···'

'আর দোষ দিলি ঐ ছেলেটার ঘাড়ে? ওকে মার খাওয়ালি!'

ইচ্ছে হল আনন্দে নৃত্য করতে করতে নিচে ছুটে গিয়ে নাতালিয়ার হাতটা ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে দি। কিন্তু ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম মনিব-গিন্নীর গলা। সম্ভবত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছিল, 'ছেলেটাকে মারা হয়েছে মুখ খারাপ করে গাল দেবার জন্যে আর তুই-ই শুধু ধরে নিয়েছিস ও টাকা চুরি করেছে! খান্‌কী কোথাকার!'

'খান্‌কী তুমি নিজে, বুঝলে ঠাকরুণ! আর কিছু যদি মনে না কর তো বলি, তুমি একটা ঢেমনী গাই!'

ওদের ঝগড়া সঙ্গীতের মত আমার কানে এসে বাজতে লাগল। ব্যথার উত্তপ্ত অশ্রু আর নাতালিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনে বন্যা ডেকে গেল। সে বন্যাকে চাপতে গিয়ে বন্ধ হয়ে এল গলা।

মনিব ধীরে ধীরে চিলেকোঠায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে বেরিয়ে থাকা কড়িটার ওপরে আমার পাশে বসল।

'দেখা যাচ্ছে তোর ভাগ্যটা খুব খারাপ, পেশকভ!' হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলল।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসলাম।

মনিব বলতে লাগল, 'কিন্তু তুই যে ভীষণ জঘন্য ভাষায় গাল পাড়ছিলি তাতো আর মিথ্যে নয়।'

'একটু সেরে উঠলেই চলে যাব আমি।' বললাম ধীরভাবেই।

'চুপ করে কিছুক্ষণ ধরে সিগারেট টানতে লাগল মনিব। তারপর একান্ত নিবিষ্ট মনে সিগারেটের শেষটুকুর দিকে তাকিয়ে কী একটা দেখতে দেখতে বলল, 'বেশ, সেটা তোর নিজের ব্যাপার। এখন তো আর ছোটটি নোস, কী করবি নিজেই ভাল বুঝবি।'

মনিব উঠে দাঁড়িয়ে নিচে চলে গেল। প্রতিবারের মত এবারও কষ্ট হল ওর জন্যে।

আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম চারদিন পরে। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল যাবার আগে রাণী মার্গোর কাছে গিয়ে বিদায় নিই, কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সব সত্যি

ঘটনা খুলে বলার মত সাহস পাচ্ছিলাম না। মনে মনে আশা করছিলাম নিজে থেকেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

ছোট মেয়েটির কাছে বিদায় নেবার সময়ে তাকে বললাম, 'মাকে বোল, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ! মনে থাকবে তো?'

'থাকবে,' একটু স্নিগ্ধ মিষ্টি হেসে কথা দিল মেয়েটি, 'বিদায়, আসছে কাল পর্যন্ত!'

প্রায় বিশ বছর পরে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল আমার, তখন সে এক পুলিশ অফিসারের বৌ।

এগারো

আবার বাসন মাজার কাজ নিলাম। এবার 'পেরম' এ। রাজহাঁসের মত শাদা ধবধবে একটা বড় দ্রুতগামী স্টিমার, এবারে বাসন মাজার বা রান্নাঘরের বয়' এর কাজ। মাইনে মাসে সাত রুবল। বাবুর্চিকে সাহায্য করা ছিল আমার কাজ।

স্টুয়ার্ড লোকটা যেমন মোটা, তেমনি উগ্র। রবারের বলের মত মাথা-জোড়া টাক। গরমের দিনে শুয়োরের ছায়া খুঁজে বেড়াবার মত হাতদুটো পেছনে করে দিনভর সে ডেকের ওপরে পায়চারী করত। বুফেটাতে ওর বৌ শোভা পেত। মহিলার বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বয়েসের কালে সুন্দরী ছিল। কিন্তু এখন বয়েস পেরিয়ে একেবারে হতকুচ্ছিত হয়ে গেছে। ভীষণ পুরু করে পাউডার মাখাতে গাল থেকে আঁশের মত চটা উঠে গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ত তার জমকালো উগ্র পোষাকের ওপরে।

বাবুর্চি ইভান ইভানভিচ রান্নাঘরের কর্তা। সবাই ওকে ডাকত টেডি ভাল্লুক বলে। বেঁটেখাটো গোলগাল্ চেহারা। নাকটা বড়শির মত, চোখ দুটো কৌতুকভরা। ওর হাবভাবটা বাবু-বাবু গোছের। সব সময়েই কড়া ইস্ত্রি করা কলার ব্যবহার করত। রোজ দাড়ি কামানোর ফলে গালে একটা নীলচে আভা ফুটে থাকত। কোঁকড়ানো কালো গোঁফটা মুচড়ে ওপর দিকে বাঁকিয়ে তুলে রাখত। অবসর সময়ে ছোট একটা গোল আয়না মুখের সামনে ধরে ঝলসানো লাল লাল আঙুল দিয়ে সগর্বে তাতে তা দিত।

স্টিমারের সব চাইতে মজার লোক ছিল আগওলা ইয়াকভ শুমভ। চওড়া কাঁধওলা শক্তসমর্থ এক চাষী। ওর থ্যাবড়া নাকযুক্ত মুখখানা কোদালের মত চ্যাপ্টা। রোমশ মোটা ভ্রূর তলায় শুয়োরের মত দুটো কুত্‌কুতে চোখ। বিলের শেওলার মত দুগালে কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ি। আর মাথাটা কোঁকড়া চুলে এমন ঘন ভরা যে তার ভেতর দিয়ে ওর গেঁটেল আঙুলগুলো চালানও কষ্টকর।

জুয়াড়ী হিসেবে লোকটার যেমন ভাগ্য খোলতাই, তেমনি ও ছিল অদ্ভুত পেটুক। এক টুকরো মাংস বা হাড়ের জন্যে দিনরাত রান্নাঘরের আশেপাশে উপোসী কুকুরের মত ঘুরঘুর করে ফিরত। সন্ধ্যায় টেডি ভাল্লুকের সঙ্গে চা খেতে বসে নিজের সম্পর্কে সব অদ্ভুত গল্প করে শোনাত।

ছেলেবেলায় রিয়াজানের শহর-মেষ-পালকের সহকর্মী হিসেবে কাজ করত সে। এই সময়েও এক পথ চলতি সন্ন্যাসীর নজরে পড়ে। লোভ দেখিয়ে সে ওকে নিয়ে আসে মঠে, সেখানে সে চার বছর শিক্ষার্থী হিসেবে ছিল।

'সাধু হয়ে ঈশ্বরের আকাশে একটা কালো তারা হয়ে থাকতাম,' তার সেই চির অভ্যস্ত বড়াই করার সুরে বলত, 'যদি পেন্‌জা থেকে আমাদের মঠে এক ধার্মিক মহিলা না আসত। মহিলাটি ছিল একটি ছোটখাট মোহিনী। মুণ্ডুটা আমার ঘুরিয়ে দিল। 'বলতে শুরু করল, 'বাঃ, কী সুন্দর ছেলে, কি বলিষ্ঠ চেহারা, আর এই দেখ না এক সতী সাধ্বী বিধবা আমি, কেউ নেই আমার—একেবারে একা। আমার ঘরোয়ালা মরদ হিসেবে চল না?' আর বলল, 'নিজের বাড়ি আছে আমার; মুরগী পালনের ব্যবসাও আছে।' আমার আপত্তি ছিল না। তাই আমাকে সে তার ঘরোয়ালা মরদ করে রাখল। আর আমিও তাকে আমার মেয়েমানুষ করে তার সঙ্গে প্রায় তিন বছর আরামে কাটিয়ে দিলাম…'

'তুই একটা দারুণ মিথ্যুক,' তার নাকের ওপরের ব্রণটার দিকে চিন্তিত চোখে দেখতে দেখতে ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠত টেডি ভাল্লুক, 'মিথ্যে কথা বলে যদি লোকে টাকা রোজগার করতে পারত তুই তবে একটা মস্ত বড় ধনী হতে পারতিস।'

ইয়াকভ চিবুতে লাগল। ওর আংটির মত পাকানো কালো দাড়ির থোকা গুলো ওঠানামা করতে লাগল। রোমশ কান দুটো একটু নড়ল। বাবুর্চি বলার পর আবার তেমনি সহজ গলায়ই বলে চলল ইয়াকভ, 'সে আমার চাইতে বয়সে ঢের বড় ছিল। বিশ্রী লাগত আমার, একেবারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তাই ওর বোনঝিটার সঙ্গেই লটকে পড়লাম। জানতে পেরে, আমার ঘাড়টা ধরে দূর করে দিল।'

'তাহলে উচিত মজুরিই দিয়েছে।' বাবুর্চি ইয়াকভের মত স্বচ্ছন্দ গলায় বলে উঠল।

গালের ভেতরে এক ঢেলা চিনি ফেলে দিয়ে ইয়াকভ বলে চলল, 'তারপর কিছুদিন হাওয়ায় ভেসে বেড়ালাম। শেষ পর্যন্ত ভ্‌লাদিমিরের বুড়ো এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। সে আর আমি, দুজনে মিলে আধখানা পৃথিবী পায়ে হেঁটে চক্কর দিয়ে এলাম। গেলাম সেই পাহাড় পর্বতের দেশে, যাকে বলে বল্‌কান দেশপুঞ্জ। তুর্কী, রুমানীয়, গ্রীক, আর নানা অস্ট্রীয় জাতের কাছে—সব রকমের মানুষের কাছে—এর কাছে কিনি, আর ওর কাছে বেচি।'

'চুরি করতিস?' গম্ভীরভাবে বাবুর্চি জিজ্ঞেস করল।

'ওই বুড়োটার কিছুই চুরি করিনি—একটা কুটোও না। তাই সে আমাকে বলত, 'বিদেশের মাটিতে সৎভাবে চলবি। এতটুকু কিছু চুরি করলেই ওরা মাথা কেটে নেয়।' তবে হ্যাঁ, চেষ্টা অবশ্য করেছিলাম চুরি করতে। ধোপে কিন্তু টিকল না। একবার এক সওদাগরের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া সরাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হল না। ধরে ফেলল। তারপর যেমন হয়, বেদম প্রহার। যখন মারতে মারতে হয়রান হয়ে গেল, তখন টেনে নিয়ে গেল থানায়। সেখানে আমরা দুজন ছিলাম। একজন আসল ঘোড়া চোর, আর আমি—দেখিই না কি হয় ভেবেই ওই কাজে হাত দিয়েছিলাম। সেই সময়ে কাজ করতাম ঐ সওদাগরের কাছে। সওদাগর অসুখে পড়ল আর ঘুমের মধ্যে আমাকে স্বপ্ন দেখতে লাগল—দুঃস্বপ্ন। সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল লোকটা। ওপরওলাদের কাছে গিয়ে বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন' মানে আমাকে 'ছেড়ে দিন।' 'কেন না ও আমাকে স্বপ্নে দেখা দিতে শুরু করেছে। ওকে আমি যদি

মাফ না করি, তবে হয়ত আমি নিজেই মরে যাব। কেননা লোকটা যে একটা যাদুকর তাতে আর এতটুকুও সন্দেহ নেই।' মানে আমি যাদুকর। সওদাগর খুব নামী-দামী লোক ছিল। তাই আমাকে ওরা ছেড়ে দিল!'

বাবুর্চি বলল, 'তোকে ছোড় দেওয়া উচিত হয়নি। উচিত ছিল তোর গলায় পাথর বেঁধে তিন দিন তোকে নদীর জলে ডুবিয়ে রাখা যাতে তোর ভেতরকার সবটুকু বেকুফি পরিষ্কার হয়ে যায়।'

ইয়াকভ কথাটা লুফে নিল চট করে, 'ঠিকই বলেছ ভাই, ঢের বেকুফি আছে আমার মধ্যে—এত বেকুফি যে সত্যি বলতে কি একটা গোটা গাঁয়ের সবখানি বেকুফির সমান ·'

বাবুর্চি রেগে গিয়ে ওর জামার কলারের ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটা হাঁচকা টান দিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল। তারপর বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আরে এমন সব জেলের আসামী বাইরে ঘুরে ঘুরে ফিরছে, গিলছে গাদা গাদা, জালা জালা টানছে আর পড়ে পড়ে ঢুলছে কিসের জন্যে শুনি? বল, তুই বেঁচে আছিস কেন?'

ঠোঁটে চুমকুড়ি দিয়ে আগওলা বলল, 'আমি তো জানি না। অন্য পাঁচজনা যেভাবে বেঁচে আছে তেমনি আমিও আছি। কেউ থাকে শুয়ে কেউ বেড়ায় ঘুরে; কেরাণীরা ঠেসে চেয়ারে বসে থাকে সারাদিন, কিন্তু সবাইকেই তো খেতে হয়।'

বাবুর্চি এতে আরো বিরক্ত হয়ে উঠল।

'তুই এমনই একটা শূয়োর যে তা আর বলার নয়। তুই হলি গিয়ে শূয়োরের খাদ্য। ঠিক তাই!'

'খেপে গেলে কেন ভাই?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ইয়াকভ। 'আমরা চাষীরা হলাম একই ওক গাছের বীজ। মাথা খারাপ করে লাভ নেই; আমাকে কিছুতেই শোধরাতে পারবে না।'

এই লোকটার সঙ্গে দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। অসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম ওকে। হাঁ করে ওর কথা শুনতাম। আমার মনে হত ও তার নিজের ভেতরে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার এক শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। সে সবাইকেই ডাকত 'তুমি' বলে। মোটা ভ্রূর তলা দিয়ে মুক্ত অকপট দৃষ্টিতে তাকাত সবার দিকে। ক্যাপ্টেন, স্টুয়ার্ড, এমন কি প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট যাত্রী, খালাসী, ডাইনিং রুমের পরিচারক, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী সবাইকেই নিজের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলত।

কোন কোন সময়ে ক্যাপ্টেন কিংবা প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের সামনে তার বন-মানুষের মত লম্বা হাতদুটো পেছন করে গিয়ে দাঁড়াত। ওরা তার আলসেমি কিংবা একান্ত নির্বিকার চিত্তে তাস খেলে কাউকে সর্বস্বান্ত করার জন্য যা গাল পাড়ত, তা নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো। বেশ ভালই বোঝা যেত তাদের গালাগাল বা তিরস্কার ওর মনে এতটুকুও রেখাপাত করত না। এমন কি সামনের স্টেশনে ওকে ষ্টিমার থেকে নামিয়ে দেবার শাসানিতেও এতটুকু ভয় পেত না।

ইয়াকভ আর সেই 'বাঃ বেশ'—এই দুজনার ভেতর তফাত ছিল ঢের। বেশ বোঝা যেত ইয়াকভেরও নিশ্চিয় ধারণা ছিল যে সে অন্যের চাইতে আলাদা, তাকে বুঝবে না কেউ।

আমার মনে পড়ে না লোকটাকে কখনো চিন্তিত বা বিষণ্ণ দেখেছি। অনেকক্ষণ

একটানা কথা না বলে আছে, এমনও দেখিনি। প্রায় ওর অনিচ্ছাতেই ওর মুখ থেকে অফুরন্ত কথার স্রোত উঠে আসত। যখনই কেউ তাকে গাল দিত বা শোনাত কোন মজার গল্প সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট দুটো নড়তে থাকত। যেন যা শুনছে তাই আবার মনে মনে আউড়ে নিচ্ছে, কিংবা হয়ত সে নিজে যা চিন্তা করছে তাই-ই নীরবে বলে চলেছে। প্রতিদিন তার কাজকর্ম সারা হলে সে গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত। সর্বাঙ্গে ঘাম, জামায় ভরা তেল-কালির দাগ, খালি পা। বেল্ট-বিহীন জামাটা বুক পর্যন্ত খোলা। বুকে কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন চুল। ডেকের ওপর কিছুক্ষণের ভেতরই আরম্ভ হয়ে যেত বৃষ্টির ফোঁটার মত তার গম্ভীর একঘেয়ে কথার ধারাস্রোত।

'নমস্কার মা, যাচ্ছেন কোথায়? চিস্তোপোল? আমি জায়গাটা চিনি। সেখানে ধনী এক তাতার চাষীর কাছে কাজ করতাম। তার নাম ছিল উসান গুবাইদুলিন। বুড়োর তিন-তিনটে বৌ ছিল। লোকটা ছিল লালচে আর ভারি বদমেজাজী। ওর তিনটে জোয়ান বৌয়ের ভেতর একটি ছিল ছোটখাটো চেহারার এক মোহিনী তাতার মেয়েমানুষ। মেয়েটার সঙ্গে ব্যাভিচার করেছিলাম মা।'

ও ছিল না এমন জায়গা নেই। আর যত মেয়েমানুষ ওর কাছে ঘেঁসেছে প্রায় সকলের সঙ্গেই ওর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। শান্ত দরদভরা সুরে সবকিছুই এমনভাবে বলত সে যেন কেউ ওকে কোন দিন এতটুকুও আঘাত দেয়নি, বা একটি বারের জন্যও গালমন্দ দেয়নি। একটু পরেই মনে হত ওর কথার আওয়াজ যেন ভেসে আসছে পাছ গলুইয়ের ওপর থেকে।

'কে তাস খেলবে? পেটোপিটি, তে-তাস, বা বিন্তি? তাস খেলা মজার। বসে যাও শুধু আর সওদাগরের মত দুহাতে টাকা পয়সা খিঁচে নাও।'

লক্ষ্য করে দেখেছি ও কথার ভেতরে 'ভাল' 'খারাপ' বা 'দুষ্ট'—এ রকম কথা ব্যবহার করত খুব কম। বলতে হলে প্রায় সব সময়েই বলত 'মোহিনী', নয় 'দরদী,' নয়তোবা 'অদ্ভুত'। সুন্দরী মেয়েদের বলত 'ছোটখাটো একটি মোহিনী', চমৎকার রোদভরা দিনকে বলত 'দরদী দিন'। ওর সবচাইতে প্রিয় অভ্যস্ত শব্দ ছিল, 'থুঃ! থুঃ!'

ওকে সবাই ভাবত কুঁড়ে। আমার কিন্তু মনে হত নিচের ঐ দম্ আটকে আসা নোংরা ভ্যাপসা খোলের ভেতর অন্য সব লোকের মতই দায়িত্বশীলভাবে ও কাজ করে যায় বটে, অন্যান্য আগওলাদের মত একটি দিনের জন্যও ওর মুখে কোন প্রতিবাদ শুনতে পাইনি।

একদিন যাত্রীদের মধ্যে এক বুড়ির মানিব্যাগ চুরি গেল। সে দিনের সন্ধ্যাটা ছিল বেশ শান্ত, পরিচ্ছন্ন। সবাই বেশ হাসি খুশি। ক্যাপ্টেন নিজে বুড়িকে দিল পাঁচ রুবল, আর যাত্রীরাও সবাই চাঁদা তুলে কিছু দিল। বুড়ির হাতে টাকাটা দিতেই ক্রুশ করে বুড়ি আভূমি নত হয়ে বলল 'আহা গো, ব্যাগে আমার যা ছিল তার চাইতেও যে তিন রুবল দশ কোপেক বেশি দিলে।'

খুশির সুরে কে যেন বলে উঠল, 'আরে দিদিমা, নিয়ে নাও, ধন্যবাদ দিয়ে নিয়ে নাও। বাড়তি রুবল তিনটে অনেক কাজ দেবে।'

আর একজন একটু কায়দা করে বলে উঠল, 'রুবল তো আর মানুষ নয় যে সবাই দূর দূর করবে...'

ইয়াকভ কিন্তু বুড়ির সামনে তার নিজের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে গেল।

'বাড়তি টাকাটা আমায় দাও,' বলল ইয়াকভ, 'ওটা দিয়ে তাস খেলব।'

কথাটা ঠাট্টা ভেবে সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ও সত্যিই পিড়াপীড়ি করতে লাগল।

'দিয়ে দাও দিদিমা! কিইবা করবে তুমি টাকা দিয়ে? আজ বাদে কাল তো কবরের তলায় ঢুকবে!'

ওকে সবাই তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিল। ও পরে অবাক হয়ে আমার কাছে বলল, 'কী অদ্ভুত সব লোক! অন্যের ব্যাপারে কেন নাক গলাতে আসা বাপু? বুড়ি তো নিজেই বলল যে, বাড়তি টাকাটার দরকার নেই তার। আর তিন তিনটে রুবল পেলে কত সুবিধে হত আমার।'

মনে হত টাকাপয়সা চোখে দেখেও ওর দারুণ ফূর্তি। কথা বলতে বলতে একটা তামার বা রূপোর পয়সা প্যান্টের কাপড়ে ঘসে প্রায় চকচকে করে তুলত। তারপর ওর ভোতা নাকের সামনে তুলে ধরে ওটার চাকৃচিক্য যাচাই করে দেখত। কিন্তু তা বলে লোভী ছিল না মোটেই। ইয়াকভ একদিন আমাকে তাস খেলতে ডাকল। পেটোপিটি খেলা। এটা কি করে খেলতে হয় তা আমি জানতাম না।

'কেমন করে খেলতে হয় জানিস না?' অবাক হয়ে বলল ইয়াকভ, 'সে কি কথা, তুই কি না পড়তে পারিস! শিখিয়ে দিতে হবে তোকে। আয়, চিনির দলা বাজি রেখে মিছামিছি করে খেলব।'

আমার কাছ থেকে আধসেরের মত রুটির চিনি জিতে নিল ইয়াকভ। আর টপাটপ্ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গালে ফেলে দিতে লাগল। যখন বুঝতে পারল যে খেলাটা আমি শিখে গেছি, তখন বলল, 'এবার আয় সত্যিসত্যি খেলি—পয়সা দিয়ে। কিছু আছে?'

'পাঁচ রুবল।'

'আমার কাছে প্রায় দু রুবলের মত আছে।'

স্বভাবতই আমার সব টাকাকড়িই ও জিতে নিল। শোধ তোলার জন্যে আমার শীতের কোটটাও পাঁচ রুবলের বদলে দিয়ে দিলাম। হেরে গেলাম। নতুন বুটজোড়াও রাখলাম তিন রুবলে—আবার হারলাম। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে প্রায় রেগে উঠেই বলল ইয়াকভ, 'তোর বড্ড মাথা গরম, তুই খেলোয়াড় নোস। নিয়ে নে তোর কোট আর বুট। আমি ওগুলো চাইনা। এই যে নে। আর তোর চার রুবলও ফেরৎ নে। শুধু একটা রুবল কেটে নিলাম খেলা শেখাবার মজুরি হিসেবে। অবশ্য কিছু যদি মনে না করিস!'

কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল।

আমার কৃতজ্ঞতার উত্তরে ও বলল, 'থুঃ থুঃ! খেলা হল খেলাই—মানে মজা করার জন্য। তুই কিন্তু ধরে নিলি এটা যেন একটা যুদ্ধ। যুদ্ধের সময়েও খবর্দার মাথা গরম করবিনা—ঠাণ্ডা মাথায় জব্দ করে দিবি! কি লাভ আছে গরম করে? বয়েসও তোর অল্প, নিজেকে শক্ত করে পাঁজার ভেতরে রাখতে হবে। একবার পারলি না, পাঁচবারেও পারলি না, হারলি সাতবারই—থুঃ থুঃ! ফিরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। তারপর ফের লেগে যা! এমনি করেই তো খেলতে হয়!'

ওকে ক্রমেই আমার আরো বেশি ভাল লাগতে শুরু করল এবং মাঝে মাঝে খারাপও। ও যখন মাঝে মাঝে কথা বলত, তখন আমার দিদিমার কথা মনে পড়ে যেত। ওর ভেতর এমন কিছু ছিল যা আমাকে আকর্ষণ করত। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে ওর মধ্যে স্থূল বৈরাগ্য আমার খুবই বিশ্রী লাগত। মনে হত যেন ওর সমস্ত জীবন-ধারার ভেতর দিয়ে এমনি একটা উদাসীনতার ভাব গড়ে উঠেছে।

একদিন তখন প্রায় সন্ধ্যা। এক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, পেরমের ব্যবসায়ী, মাতাল হয়ে ষ্টিমার থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উন্মাদের মত লোকটা হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে স্রোতের টানে ষ্টিমারের পেছনকার সোনালী লাল ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল। ইঞ্জিন বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমারকে দাঁড় করান হল। অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় চাকার গা থেকে রক্ত-রাঙ্গা ফেনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, টগ্‌বগে ঐ রক্তের ভেতরে কালো একটা দেহ হাবুডুবু খাচ্ছে। এতক্ষণে ষ্টিমার সেটা ছাড়িয়ে অনেক পেছনে চলে গেছে। জলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ। যাত্রীরাও সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, হুড়োহুড়ি করে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গলুইয়ের দিকে। ডুবন্ত মানুষটার বন্ধু, তার মাথাভরা টাক, গায়ের রং লাল, সেও দুহাতে ভিড় ঠেলে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল, 'পথ ছাড়! আমি ওর কাছে যাব!'

ইতিমধ্যেই দুজন জাহাজী জলে নেমে পড়েছে। ডুবন্ত লোকটার দিকে ওরা সাঁতরে চলেছিল। লাইফবোটও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। জাহাজীদের চেঁচামেচি, মেয়েদের আর্তনাদ সব ছাপিয়ে জেগে উঠল ইয়াকভের শান্ত কর্কশ আওয়াজ, 'কোট গায়ে রয়েছে, ও ডুবেই যাবে। লম্বা ঝুলের জামাকাপড় গায়ে থাকলে লোক ডুবে মরতে বাধ্য। মেয়েদের দেখ না, ওরা পুরুষের চাইতেও আগে ডুবে যায় কেন? কারণ ওদের স্কার্ট। মেয়েমানুষ জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজনে বাটখারার মত একেবারে সোজা তলিয়ে যাবে। ঐ দেখ—ডুবে গেছে লোকটা। কি, বলেছিলাম না আমি?'

সত্যি সত্যিই কিন্তু লোকটা ডুবে গেল। মিছেই ওরা ঘণ্টা দুই ধরে দেহটার জন্য খোঁজাখুঁজি করল। এতক্ষণে ওর বন্ধুও নেশা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। সান্ত্বনাহীন বিষণ্ণ লোকটা পাছ-গলুইয়ের ওপরে বসে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখত কি হল! এখন কি করি? ওর আপনার জনের কাছে কি কৈফিয়ত দেব আমি? যদি ওর পরিজনের জন্য না হত ...।'

হাতটা পেছনে আড়াআড়ি করে রেখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'আর কি উপায় সদাগর! কে যে কিভাবে মরবে তা তো আর কেউ বলতে পারে না। একটা লোক হয়ত ব্যাঙের ছাতা খেল, আর বিষ-ক্রিয়ার ফলে চলে গেল একেবারে কবরের তলায়! অথচ কত হাজার হাজার মানুষ ব্যাঙের ছাতা খেয়ে সুস্থ সবল থাকে। মরল শুধু একটা লোক। আর ব্যাঙের ছাতাই বা কি?'

সওদাগরের সামনে একটা নিশ্চল পাথরের যাঁতার মত দাঁড়িয়ে ইয়াকভ তার কথা বলে চলল। সওদাগরের দুঃখ প্রথমটায় একটু নরম হল। তার চওড়া হাতের পাতা দিয়ে দাড়ির ওপরে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছে ফেলল সে। কিন্তু ইয়াকভের কথার অর্থ মাথায় ঢোকামাত্র সে চিৎকার করে উঠল, 'দূর হ শয়তান!

চাস কি তুই ? আমার কল্‌জেটা টেনে ছিঁড়ে নিতে চাস ? ভগবানের দোহাই, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। নইলে যদি কিছু ঘটে যায় তো আমি তার জন্য দায়ী নই !'

ইয়াকভ ধীরে ধীরে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'মানুষ সত্যিই অদ্ভুত ! যদি তাদের মঙ্গল করতে চাও, তবে কিছুতেই তা বুঝবে না...'

মাঝে মাঝে মনে হত ইয়াকভ বুঝি খুবই সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু অনেকবার লক্ষ্য করে বুঝেছি ওটা ওর খোলসমাত্র। কোন কোন দেশে ও ঘুরেছে, কি কি দেখেছে, তা আমার ভীষণ শোনার ইচ্ছে হত। ও যা বলেছে তাতে আমার বিশেষ সাধ মেটেনি। মাথাটা পেছনের দিকে কাত করে কালো ভাল্লুকের মত চোখদুটো আধখানা বুজে টেবা টেবা গালের ওপরে মসৃণভাবে হাত বুলোতে বুলোতে ও টেনে টেনে বলত ওর অতীতের স্মৃতি কথা, 'মানুষ সাবধানে পিঁপড়ের মত কিলবিল করছে, বুঝলে ভাই। এখানে মানুষ, ওখানে মানুষ—মানুষের ঝাঁক। অবশ্য তার বেশির ভাগই চাষী। শরৎকালের ঝরে পড়া পাতার মত বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। বুলগারীয়রা? হাঁ হাঁ, বুলগারীয়দের দেখেছি, গ্রীকদেরও দেখেছি। তারপর আরো আছে—সার্বীয়,রুমানীয় আর হরেক রকমের ভবঘুরে—সব জাতের। ওরা দেখতে কেমন ? কেমন আবার শহরে শহুরে মানুষ, গাঁয়ে গেঁয়ো লোক। আমাদের দেশের মতই। একেবারেই অবিকল। কেউ কেউ আবার আমাদের মতই কথা বলে। অবশ্য একেবারে অবিকল নয়, যেমন তাতার আর মর্দোভীয়রা বলে। গ্রীকরা আবার আমাদের মত কথা বলতে পারে না—যা কিছুই বলার ইচ্ছে হোক না কেন হড়হড় করে বলবে। শুনতে কথার মতই শোনায় বটে কিন্তু কি বলছে তার অর্থ বোঝার সাধ্যি হবে না। ওদের সঙ্গে কথা হবে হাত নাড়িয়ে। আমার সেই বুড়োটা মনে করত, সে বুঝি গ্রীকদের কথাও বুঝবে—'কারামারা' 'কালিমেরা' করে কাজ চালাত। দারুণ বুদ্ধিমান ছিল লোকটা। আবার খেপিয়ে দিতে পারত ওদেরকে। কি বলছিস ? জিজ্ঞেস করছিস ওরা দেখতে কেমন ? বোকা ! হবে আবার কেমন ? হাঁ হাঁ, ওরা ঘোর রঙের তো বটেই আর রুমানীয়রাও ঘোর রঙের দেখতে—কিন্তু ধর্ম ওদের একই। বুলগারীয়রাও ঘোর রঙের। কিন্তু ওরা প্রার্থনা করে আমাদের মত। গ্রীকরা কিন্তু তুর্কীদের মত...'

বুঝতে পারতাম ও আমাকে সবকিছু বলছে না, কি যেন চেপে যাচ্ছে।

সেই ছবির পত্রিকাটা থেকে জেনেছিলাম যে গ্রীসের রাজধানীর নাম এথেন্‌স্‌—অতীতের এক সুন্দরী নগরী ; কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়ে ইয়াকভ এথেন্‌স্‌' এর অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসল।

'ওরা মিথ্যে কথা বলেছে তোমাকে। এথেনস্‌ বলে কিছু নেই। আছে আথোন। সেটা কোন শহর নয়, একটা পর্বত। সেই পর্বতের ওপরে আছে একটা মঠ। ব্যস্‌, আর কিছু নয়। ওটাকে বলে আথোনের পবিত্র পর্বত। ওর অনেক ছবি আছে। বুড়োটা সেই ছবি বিক্রি করত। দানুবি নদীর পারে একটা শহর আছে, তার নাম বেলগরোদ—অনেকটা ইয়েরস্লভ্‌ল বা নিঝনি-নভগরোদের মত দেখতে। ওদের শহরগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই বটে, কিন্তু গাঁগুলোর আর ওদের মেয়েমানুষগুলোর কথা আলাদা—এমন মোহিনী যে কি বলব। একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে তো আমি ঠিক করেছিলাম থেকেই যাব ওখানে। আরে, কি যেন নামটা—তার ?'

দ্রুত গালের ওপরে হাত বুলিয়ে চলেছে ইয়াকভ। দাড়িগুলোয় ঘসা লেগে মৃদু শব্দ আসছে। আর ওর গলার অনেক গভীর থেকে যেন ভাঙা কাঁসির মত একটা ঝন্‌ঝনে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

'দেখত, কি রকম ভুলে গেছি একেবারে! অথচ ওতে আমাতে যে···যখন চলে এলাম তখন ও কেঁদেই ফেলল, আর কথাটা হয়ত বিশ্বাস করবে না,—আমিও কেঁদে ফেললাম।'

তেমনি নির্লজ্জের মত শান্ত ধীরভাবে আমাকে শেখাতে লাগল কি করে মেয়ে মানুষ ভোলাতে হয়।

• পাছ-গলুইয়ের ওপরে আমরা দুজনে বসে রইলাম। তপ্ত জ্যোৎস্নাময় রাত আমাদের দিকে ভেসে ভেসে আসছে। বাঁয়ে রুপোলি জলের শেষ প্রান্তে আবছা তৃণভূমি দেখা যায়, ডাইনে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বন্দী তারার মত ঝিক্-মিকিয়ে হলদে আলো উঁকিঝুঁকি মারছে। সব কিছুই সজাগ, নড়ছে, কম্পমান। সবকিছু ঘিরে এক শান্ত অথচ তীব্র জীবনের স্পন্দন জেগে উঠেছে। সেই সুমধুর নীরবতার মধ্যে ওর রুক্ষ কণ্ঠের কথাগুলো ঝরে পড়ছে, 'এমন হল যে যখনই মেয়েটা জেগে উঠত তখনই দুহাত বাড়িয়ে দিত···'

ইয়াকভের কাহিনী নির্লজ্জ বটে কিন্তু তা ঘৃণা জাগাত না, তার ভেতরে কোন বড়াই বা নিষ্ঠুরতার কথা থাকত না। বর্ণনার চাতুরী ওতে নেই, কেমন যেন একটু স্মৃতিচারণার বেদনায় ভরা। আকাশের বুকে উলঙ্গ চাঁদের মধ্যেও তেমনি নির্লজ্জতা, তেমনি-ই ব্যথিতভাব ঘনিয়ে উঠছিল আমার অন্তরে। ভাল ভাল জিনিসের কথা শুধু মনে পড়ছিল আমার, মনে পড়ছিল সেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কথাটা—রাণী মার্গো আর সেই কয়েকছত্র কবিতা, যার সত্য ভুলে যাবার নয়ঃ

> 'সুন্দরীকে সৌন্দর্য চাই ফোটাতে গানে,
> সুন্দরী সে পরমা
> গান জানা যে নেই তার তুলনা।'

তন্দ্রার মত কুণ্ডলাকৃত অন্যমনস্ক চিন্তার আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার আগওলাকে অনুরোধ করতে লাগলাম তার জীবন কাহিনী শোনাবার জন্য।

'তুই একটা উদ্ভট চিজ্,' বলল ইয়াকভ, 'তোকে কি বলব বলত? আমি সবকিছু দেখেছি। মঠ? হাঁ মঠও দেখেছি। পানশালা—তাও দেখেছি। দেখেছি ভদ্দর-লোকদের জীবন, চাষাদের জীবন; কুবের হয়েছি, ভিখিরীও হয়েছি, সব···'

যেন সুগভীর জলস্রোতের ওপরের একটা টলায়মান সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এমনি ধীরে ধীরে ইয়াকভ তার অতীতের কথা বলে যেত।

'যেমন ধর, ঘোড়া চুরির অপরাধে যখন হাজতে বন্ধ হয়ে রয়েছি। ধরে রেখেছি এবার নির্ঘাত সাইবেরিয়ার পাঠাবে! সেখানে একজন পুলিশ অফিসার ছিল, তার নতুন বাড়ির চুল্লী থেকে ধোঁয়া ছাড়ত বলে সে ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, 'আমি সারিয়ে দিতে পারি হুজুর।' সে একেবারে তেড়ে এল। মুখ নাড়িস্‌না, চুপ করে থাক! শহরের নাম-করা চুল্লীর মিস্ত্রিরা সারাতে পারল না!' আমি কিন্তু বলে ফেললাম, 'কখনো কখনো একটা বোকাও মনিবের চাইতে বেশি বুদ্ধি দেখাতে পারে হুজুর।' চোখের সামনে সাইবেরিয়া ঝুলছে, তাই সাহস করে বলেই দিলাম। বলল, 'বেশ, দেখ চেষ্টা করে। কিন্তু

তোর মেরামতের পরে যদি আগের থেকে আরো বেশি ধোঁয়া ছাড়ে তবে তোকে পিটিয়ে গুড়ো করে দেব কিন্তু!' চুল্লীটা দুদিনেই মেরামত হয়ে গেল। ঐ পুলিস অফিসারটি মোটেই ভাবতে পারেনি যে এটা সম্ভব হবে। সে আবার তেড়ে এল আমাকে, 'বেটা আল্‌সে, গবেট! তুই এমন একটা চৌকশ মিস্ত্রি হয়ে কিনা ঘোড়া চুরি করতে গেছিস্! এর কি জবাব দিবি বল?' বললাম, 'নেহাৎ কুমতি হয়েছিল, হুজুর।' 'ঠিক কথা,' বলল পুলিশ অফিসার, 'নিছক বোকামি। কী ভীষণ অনুতাপের কথা, তোর জন্য দুঃখই হয় আমার!' বুঝছিস্ তো? একটা পুলিশ অফিসার। এ পেশায় যার এতটুকু নরম হবার জো নেই সেই কিনা শেষে দুঃখ করছে আমার জন্যে।'

'হুঁ, তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আর কি, কিছুই না। শুধু তার করুণাই হল আমার জন্যে, ব্যস্। আর কিইবা চাস তুই বল?'

'কেন, সে তোমাকে করুণা করবে? এমন পাথরের মত শক্ত মানুষ তুমি।'

খুশির হাসি হেসে উঠল ইয়াকভ।

'একটা আজব চিড়িয়াই বটে তুই। কি বললি, পাথর? পাথরকেও দেখে চলতে হয়। পাথরও তার নিজের কাজ করে। পাথর গেথেই লোকে রাস্তা বাঁধায়। সম্মান করতে হয় সব কিছুকেই। সমস্ত কিছুরই দরকার আছে। যেমন বালুর কথাই ধর, বালু আর এমন কি? তবুও তার ভেতর থেকে ঘাস জন্ম নেয়।'

আগওলা এই সমস্ত কথা যখন বলত, তখন আমার বিশেষ করে মনে হত ওর নিশ্চই আমার অজানা অনেক কিছুই জানা আছে।

'বাবুর্চির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে।

'কে, টেডি ভাল্লুক?' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইয়াকভ, 'আবার কী ভাবব ওর সম্পর্কে? কিছুই তো নেই ভাববার।'

কথাটি সত্যি। ইভান ইভানভিচ এমনই খাঁটি মানুষ যে ওকে নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ওর মধ্যে একটা জিনিস আমার ভারি মজার বলে মনে হত। আগওলাকে সে একেবারেই দেখতে পারত না। সব সময়েই গালমন্দ করত। তবুও কিন্তু রোজ চা খাবার সময়ে ওকে ডেকে নিত।

একদিন সে ইয়াকভকে বলল, 'আগের কালের মত যদি গোলাম থাকত আর আমি যদি তোর মনিব হতাম তাহলে সপ্তায় সাত দিনই আমি তোর পিঠের খাল খিঁচে দিতাম। বুঝলি ব্যাটা হাঁদারাম?'

'সপ্তায় সাত দিনটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হল না?' গম্ভীর মুখে বলল ইয়াকভ।

সারাদিন গালমন্দ করলেও বাবুর্চি কেন জানি খাওয়াতও ওকে। একটা কিছু খাবার ওর হাতে দিয়ে বলত, 'নে রাক্ষস, খা!'

খাবারটা ধীরে ধীরে চিবোতে চিবোতে ইয়াকভ বলত, 'তোমার দয়ায় প্রচুর শক্তি জমাচ্ছি বটে; ধন্যবাদ, ইভানভিচ!'

'গায়ের জোর দিয়ে করবিটা কি রে ব্যাটা, আল্‌সের বাদশা?'

'তার মানে? সামনে এখনো জীবনের অনেকখানি পড়ে আছে।'

'তোর বেঁচে থাকার দরকার কি, ব্যাট-বুড়ো শয়তান কোথাকার।'

'শয়তানরা বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার মধ্যে তুমি কোন আনন্দ পাও না নাকি? জীবনটা বড়ই মোহিনী জিনিস, ইভান ইভানভিচ।

'তুই একটা মূর্খ।'

'কি বললে?'

'একটা মূ-উ-র্খ!'

'কে কবে এমন কথা শুনেছে?' অবাক হয়ে ইয়াকভ জিজ্ঞেস করত।'

'কথা শোন,' আমাকে লক্ষ্য করে বলল টেডি ভাল্লুক, 'তুই আর আমি ঐ হতচ্ছাড়া উনুনটার পাশে দাঁড়িয়ে ঘেমে সিদ্ধ হচ্ছি, আর ও কিনা শুধু বসে বসে শুয়োরের মত চিবোচ্ছে!'

'যার যেমন ভাগ্য।' চিবোতে চিবোতে ধীরেসুস্থে জবাব দিত ইয়াকভ।

আমি জানতাম, শুধু উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে, চুল্লী খোঁচানো ঢের বেশি শক্ত কাজ, ঢের বেশি তাত লাগে ওতে। ইয়াকভের পাশে দাঁড়িয়ে আমি দু-একবার চেষ্টা করেও দেখেছি। ওর কাজটা যে অনেক বেশি শক্ত, কেন ও ওকথা বলে না, তা কিছুতেই আমি বুঝতে পারতাম না। ওর চালচলন দেখে আমার আরো বেশি নিশ্চিত ধারণা হল যে ওর নিশ্চয় একটা বিশেষ ধরণের জ্ঞান আছে।

সবাই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত—ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ার, সারেঙ্গ, যারা ওর সংস্পর্শে আসত—তারা সবাই। তবুও অবাক হয়ে যেতাম কেন তারা ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না! অন্যান্য আগওলারা অবশ্য একটু দয়াশীল ছিল ওর ওপরে। কিন্তু এমন কি তারাও ওর প্রগলভতা ও তাস খেলার জন্য ওকে বিদ্রূপ করত। একদিন ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়াকভ লোকটা কি ভাল?'

'ইয়াকভ? চমৎকার লোক। কখনো রেগে যায় না। ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। এমন কি ওর বুকে জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিলেও ও কিছু বলবে না।

জ্বলন্ত উনুনের সামনে ওর সেই প্রচণ্ড পরিশ্রম আর ক্ষুধা সত্ত্বেও, ও ঘুমোত খুবই কম। ওর পালা শেষ হলেই ঘাম-ঝরা নোংরা দেহটা নিয়ে ও ডেকের ওপরে এসে হাজির হত। অনেক সময়ে জামাকাপড়ও পাল্টাত না। তারপর সারা রাত ধরে যাত্রীদের সঙ্গে হয় বসে গল্প করত নয় তো তাস খেলতে লেগে যেত।

ও ছিল আমার কাছে একটা তালা-বন্ধ-সিন্দুকের মত। মনে হত একান্ত প্রয়োজনীয় কী যেন লুকোন আছে ওর ভেতরে। তাই সেটা খোলার জন্য আমি মরিয়া হয়ে চাবি খুঁজে ফিরতাম।

'তুই যে কি চাস্, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, ভাই!' রোমশ ভ্রূর তলায় তলিয়ে যাওয়া দুটো চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ইয়াকভ বলত, 'এই পৃথিবী সম্পর্কে শুনতে চাস্? সত্যি, গোটা পৃথিবীটাই আমি ঘুরে এসেছি। কিন্তু কি হয়েছে তাতে? সত্যি, একটা আজব চিড়িয়াই বটে তুই। আচ্ছা, শোন তবে, আমার একদিনের এক ঘটনার কথা বলছি তোকে।'

তারপর সে গল্পটা শোনাল। কোন এক সময়ে এক প্রাদেশিক শহরে ক্ষয়রোগগ্রস্ত অল্পবয়সী এক জজ-সাহেব তার জার্মান বৌকে নিয়ে থাকত। বৌটি স্বাস্থ্যবতী, নিঃসন্তান। সে এক সওদাগরের প্রেমে পড়ে গেল। সওদাগরের সুন্দরী স্ত্রীর তিনটি সন্তান জন্মেছিল। জার্মান মহিলাটি ওর প্রেমে পড়েছে বুঝতে পেরে

সওদাগর ঠিক করল ওকে নিয়ে একটু কৌতুক করবে। একদিন রাত্রে বাগানে দেখা করার জন্য মহিলাটিকে ডেকে পাঠাল! আর দুজন বন্ধুকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখল।

তারপর যা হল! ঘেমে নেয়ে একেবারে পড়িমরি করে ছুটে এল জার্মান মহিলা। ও যে তারই সে কথাও জানিয়ে দিল। কিন্তু সওদাগর বলল, 'আমি তো তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না, কারণ আমি বিবাহিত। কিন্তু আমার দুজন বন্ধুকে তোমার জন্যে এনেছি—তাদের একজন অবিবাহিত, আর একজন বিপত্নীক।' মেয়েছেলেটি প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠে তাকে এমন জোরে এক ঘুসি মারল যে, সে বেঞ্চের ওপর থেকে উল্টেই পড়ে গেল। আর তারপর তার মুখের ওপরে মনের সুখে লাথি মারতে লাগল। আমিই বাগানে ওর সঙ্গে এসেছিলাম। তখন আমি জজ সাহেবের খাস নোকর ছিলাম! ভাঙ্গা একটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে সব কাণ্ড-কারখানা দেখছিলাম। ওর বন্ধুরা ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওর চুল ধরে টেনে নিয়ে চলল। তাই আমিও বেড়া টপকে দৌড়ে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'এ কাজ করা মশায়দের উচিত হয়নি। মহিলা সরল বিশ্বাসে ওর কাছে এসেছেন আর উনি কিনা তাকে এমনি করে অপমান করলেন?' আমি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু ওরাও আমার মাথায় ইট ছুঁড়ে মারল। মহিলাটির মনও খারাপ হয়ে গিয়েছিল! কি করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে উঠোনময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। তারপর আমায় বলল, 'আমি চলে যাব, ফিরে যাব আমার নিজের লোকজনের কাছে, ইয়াকভ আমার স্বামীর মৃত্যু হলেই আমি চলে যাব।' আমি বললাম, 'সেই ভাল! নিশ্চয়ই চলে যাওয়া উচিত আপনার!' তারপর হাঁ, জজ সাহেব মরে যেতেই সে চলে গেল। মেয়েছেলেটি খুবই শিষ্ট আর বুদ্ধিমতী ছিল। জজ সাহেবও ছিলেন খুবই ভদ্র। তার আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুক।'

গল্পটার কোন তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম, কোন কথাই বললাম না। বেশ অনুভব করলাম কেমন যেন একটা পরিচিত নিষ্ঠুরতা, নির্বুদ্ধিতা রয়ে গেছে ওর ভেতরে। কিন্তু তাতে বলার কি আছে?

'গল্পটা ভাল লাগল?' জিজ্ঞেস করল ইয়াকভ।

বিড়বিড় করে অস্পষ্ট গলায় কী যেন বললাম। ও কিন্তু শান্তভাবে সব বুঝিয়ে বলল, 'ওদের মত লোক, যারা ভালমন্দ খায়, আরামে থাকে, কোন কোন সময়ে তাদের কিছু একটা আমোদ ফুর্তি করার খেয়াল জাগে। কিন্তু সব সময়েই সেটা ঠিকমত হয়ে ওঠে না—জানেই না কী করে করতে হয়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ওরা খুব বড় বড় ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসায় করতে হলে মগজ চাই। সব সময়ে মাথা খাটিয়ে একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তাই একটু আমোদ ফুর্তি খুঁজে বেড়ায়।'

জাহাজের গলুইয়ের আলোড়নে নদীর বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মেঘ ভেসে উঠেছে। ধাবমান স্রোতের কলকলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি নদীর কালো তটরেখা ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। ডেকের ওপর থেকে ঘুমন্ত যাত্রীদের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি লম্বা চেহারার মেয়েছেলে বেঞ্চ আর ঘুমন্ত দেহগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে করে

এগিয়ে চলেছে। তার ধূসর মাথাটা খোলা, আচ্ছাদনহীন। ইয়াকভ আমার গা টিপে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, 'দেখ, মেয়েটার কষ্ট দেখ।'

আমার মনে হল যেন অন্যের ব্যথা-বেদনায় ও মনে মনে আনন্দ পায়। ইয়াকভ সবসময়েই গল্প করত আমার কাছে। আর আমিও শুনতাম পরম আগ্রহের সঙ্গে। ওর সমস্ত গল্পই মনে আছে আমার। কিন্তু কখনো ওর মুখে কোন আনন্দের গল্প শুনেছি বলে মনে হয় না। বইয়ের চাইতেও নির্বিকারচিত্তে ও গল্প বলে যেত। বইয়ের ভেতরে পেতাম লেখকের অনুভূতির হদিস্—পেতাম লেখকের আনন্দ, ব্যথা, রাগ অথবা বিদ্রূপ। কিন্তু আগওলা কখনো বিদ্রূপ করত না, কোন রকম রায়ও দিত না। কোন কিছুতেই ও তেমন খুশিও হত না, দুঃখও পেত না। আদালতের একজন নিস্পৃহ সাক্ষীর মত বলে যেত। আসামী, ফরিয়াদী বা বিচারক—সবাই ওর কাছে সমান। ওর এই উদাসীনতায় অস্বস্তি বোধ করতাম, বিরক্ত ধরে যেত—ওর প্রতি বিরুদ্ধতাও জেগে উঠত। মনে হত যেন বয়লালের তলায় উনুনের লক্‌লকে আগুনের শিখার মত ওর কাছে জীবন নেচে চলেছে আর সে তার ভাল্লুকের মত পাঞ্জার ভেতরে মুগুরটা আঁকড়ে ধরে জ্বালানী বাড়ানো কমানোর হাতলটার ওপরে আস্তে আস্তে ঘা মেরে চলেছে।

'কখনো কারো কাছ থেকে আঘাত পেয়েছ তুমি ?'

'আমাকে আঘাত দিতে পারে কার এমন সাধ্য ? যে কোন লোককে কাবু করার মত তাকত আমার আছে।'

'আমি তা বলিনি। বলেছি ভেতরে ঘা দেয়ার কথা—তোমার অন্তরে।'

'কেউ কারুর অন্তরে ঘা দিতে পারে না। মানুষের আত্মা কখনোই আহত হয় না,' বলল ইয়াকভ, 'এমন কি কেউ ওকে স্পর্শই করতে পারবে না—কোন কিছু দিয়েই না।'

যাত্রীরা, জাহাজীরা এবং আরো অন্য সবাই প্রায়ই ঘন ঘন আত্মার কথা বলত যেমন করে ওরা জমি, কাজ, রুটি বা মেয়েমানুষের কথা বলে থাকে। আত্মা শব্দটা সাধারণ মানুষের কথায় একটা মামুলী শব্দ। খুচরো পয়সার মতই তার প্রচলন। ব্যাপক দুঃখ লাগত তখনই যখন দেখতাম কোন নোংরা কুৎসিত মুখ থেকে অশ্লীল গালাগালির সঙ্গে দ্রুত ঝরে পড়ছে এই শব্দটা। যখনই কোন চাষী বিশ্রী গালাগালি দিতে শুরু করে, হাসি-ঠাট্টা করেই হোক, আর সত্যি সত্যিই হোক আত্মাকে অভি-সম্পাত করত তখন আমার অন্তরে দারুণ ব্যথা লাগত।

মনে পড়ত কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দিদিমা আত্মার কথা উচ্চারণ করত। আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্যের এই রহস্যময় ভাণ্ডারের কথা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল যে, কোন সৎ লোকের মৃত্যু হলেই শাদা পোশাক পরা দেবদূতেরা তার আত্মা নীল আকাশে, দিদিমার দয়ালু ঈশ্বরের কাছে বয়ে নিয়ে যান। তিনি পরম স্নেহে তাকে ডেকে নেন, 'আয়রে, আমার পরম স্নেহের ধন, আমার পবিত্র ধন, পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিস, না ? অনেক আঘাত পেয়ে এসেছিস ?'

তারপর তিনি সেই আত্মাকে দেবদূতের ছ'খানা সাদা পাখা উপহার দেবেন। ইয়াকভ শুমভও অনিচ্ছার সঙ্গে কচিৎ-কদাচিত আত্মার কথা বলত ঠিক দিদিমারই মত তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে। যখন গালমন্দ করত তখনও আত্মাকে অভিসম্পাত করত না। অন্যকে করতে শুনলেও চুপ করে যেত। ষাঁড়ের মত গর্দানের ওপরে মাথাটা

নিচু হয়ে নুয়ে পড়ত। ওকে যখন জিজ্ঞেস করতাম যে আত্মাটা কি ? ও বলত, 'আত্মা হচ্ছে চেতনা, ঈশ্বরেরর নিঃশ্বাস।'

এতে আমার মন শান্ত হত না। যখন আমি আরো সব প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য ওকে পীড়াপীড়ি করতাম, তখন ও চোখ নিচু করে বলত, 'আসলে কি আত্মা সম্পর্কে পুরুতরাও তেমনি বেশি কিছু জানেন না। ওতে এমন একটা কিছু অজানা আছে...'

আমি সব সময়েই ওর কথা ভাবতাম ; সর্ব শক্তি দিয়ে ওকে বুঝতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু সবই বৃথা। ইয়াকভকে ছাড়া অন্য কিছুই আমার চোখে পড়ত না। ঐ বিরাট দেহখানা ওর সবকিছুই লুকিয়ে রাখে, গোপন করে।

স্টুয়ার্ডের বৌ খুব সন্দেহজনকভাবে আমার দিকে নজর দিতে শুরু করল। রোজ ভোরবেলায় আমাকে ওর হাতমুখ ধোয়ার জল নিয়ে আসতে হত। যদিও ন্যায়ত সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই ছিমছাম হাসিখুশি ছোট পরিচারিকা লুশার কাজ ছিল। যখন সেই ছোট কেবিনের মধ্যে ওর কোমর পর্যন্ত খোলা পচা ময়দার তালের মত থলথলে হলদে দেহটার পাশে দাঁড়াতাম, তখন আমার সমস্ত দেহ-মন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠত। আমি কিছুতেই মনে মনে তার সঙ্গে রাণী মার্গোর সেই সুগঠিত ব্রোঞ্জের মত দেহটার তুলনা না করে পারতাম না। স্টুয়ার্ডের বৌ এটা সেটা বলে বকবক করে যেত। কখনো অভিযোগের সুরে, আবার কখনো কপট রাগের সুরে।

কী যে সে বলতে চাইত সেটা আমার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হয়ে উঠত না। যদিও সে সব কথার মানে আমি আন্দাজ করতে পারতাম। সে সবের মানে অশ্লীল, লজ্জাকর। কিন্তু তা আমাকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারত না। মানসিক দিক দিয়ে স্টুয়ার্ডের বৌয়ের থেকে আমি অনেক দূরে ছিলাম, বহুদূরে ছিলাম জাহাজের ওপরের যাবতীয় ঘটনা থেকে। একটা বিশেষ শেওলা-ধরা পাহাড় যেন আমাকে চারদিকের জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছিল। দিনের পর দিন সেটা ভেসে চলেছে দূরে, বহুদূরে।

'স্টুয়ার্ড গিন্নী একেবারে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।' অনেকটা স্বপ্নের ঘোরের মত লুশার পরিহাস-ভরা কথা শুনতাম, 'সুযোগ যখন পেয়েছ ফুর্তি লুটে নাও না...'

ঠাট্টা যে শুধু লুশাই করত তা নয়। খাবার ঘরের সমস্ত ভৃত্যরাই মেয়েছেলে-টার নেকনজরের কথা জেনে গিয়েছিল। বাবুর্চি একটু মুখ টিপে মন্তব্য করল, 'ভদ্রমহিলা সব কিছুই খেয়ে দেখেছেন, এবার ইচ্ছে হয়েছে কিছু ফ্রেঞ্চের পেস্ট্রি চেখে দেখতে। আরে দূর! চোখদুটো খোলা রাখিস, বুঝলি পেশকভ। নইলে বিপদে পড়ে যাবি।'

ইয়াকভও খানিকটা পিতৃসুলভ উপদেশ শোনাল, 'এ কথাটা ঠিক যে যদি তোর বয়েস আর দু তিন বছর বেশি হত তাহলে আমি অন্য কথা বলতাম। কিন্তু তোর এরকম বয়সে ফেঁসে না যাওয়াই ভাল। তবুও, যেটা তোর ভাল মনে হয় তাই করিস...।'

'আরে ওসব কথা ছেড়ে দাও।' বললাম আমি, 'যত সব নোংরামি।'

'ঠিক কথা।'

কিন্তু খানিক পরেই তার সেই কোঁকড়া চুলের ভেতরে আঙুল চালাতে

চালাতে ছোট ছোট গোল গোল কথার বীজ ছড়িয়ে চলল, 'ওর দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। কিইবা আছে ওর, শুধু একঘেয়ে শীতের দিন ছাড়া। এমন কি কুকুরও একটু আদর চায়—আর ওতো মানুষ। বৃষ্টির জল না হলে ব্যাঙের ছাতা যেমন বাঁচে না, তেমনি মেয়েমানুষও বাঁচে না আদর না পেলে। দেখা যাচ্ছে এতে ওর কোন লাজলজ্জার বালাই নেই। কিন্তু করবেই বা কি? গা-গতরের নাম কি? গতরের নাম খানকি।'

তার ঐ দুটো রহস্যময় চোখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর জন্যে তোমার দুঃখ হয় না?'

'আমার? ও তো আর আমার মা নয়; তাই কিনা বল? তাছাড়া এমন লোকও আছে যাদের মায়ের জন্যেও দুঃখ হয় না। সত্যি তুই একটা আজব চিজ।' সেই ভাঙ্গা কাঁসির মত সুরে একটু হেসে উঠল ইয়াকভ।

কোন কোন সময় ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত আমি যেন একটা নিঃশব্দ শূন্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, এক অন্ধকারময় অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি।

'সবাই বিয়ে করে ইয়াকভ। তুমি বিয়ে কর না কেন?'

'প্রয়োজন কি? ইচ্ছে করলেই তো মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওটা খুবই সহজ ব্যাপার। বিয়ে করলেই লোককে বসে থাকতে হয় বাড়িতে আর খাটতে হয় জমিতে। আমার যে জমিটা আছে সেটা ভাল নয়। আর নেইও বেশি। যেটুকুও ছিল আমার খুড়োমশাই তাও নিয়ে নিয়েছেন। আমার ভাই তো সেনাবাহিনী থেকে ফিরে খুড়োর সঙ্গে বিবাদই শুরু করে দিল। আইন আদালতের ভয়ও দেখাল। শেষ পর্যন্ত ডাণ্ডাই হাঁকাল তার মাথায়; একেবারে রক্তারক্তি করল। ফলে, দেড় বছরের জন্য তাকে জেলে যেতে হল। আর একবার জেলে গেলে তার একটাই রাস্তা খোলা থাকে—সেটা হচ্ছে পুনরায় জেলে ফিরে যাবার রাস্তা। ওর বৌটাও ছিল ছোটখাটো মোহিনী। কিন্তু বলার আর কি আছে। বিয়ে যদি একবার কেউ করল তো শুধু দাঁড়ে বসে লেজ নাড়ানো ছাড়া তার আর কোন কিছুই করার থাকে না। কিন্তু একবার যে সৈনিক হয়, নিজের জীবন তখন আর তার হাতে থাকে না।'

'তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কর?'

'কী আজব চিজই বটে তুই। নিশ্চয় করিই তো।'

'কেমন করে?'

'বিভিন্নভাবে।'

'কোন প্রার্থনাটা তোমার জানা আছে?'

'কোন প্রার্থনাই জানি না আমি। শুধু বলি, হে প্রভু যীশু, যারা বেঁচে আছে তুমি তাদের দয়া কর। আর যারা মরে গেছে তাদের দাও শান্তি। আমাদের অসুখের হাত থেকে রক্ষা কর—এমনি আরো দু-চারটে কথা।'

'আর কি কথা?'

'আমি তা জানি না। যা কিছুই বল না কেন তা গিয়ে ঠিক পৌঁছোয় ঈশ্বরের কাছে।'

আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল খুব নম্র, একটু কৌতুকভরা। আমি যেন একটা চটপটে কুকুর ছানা, মজাদার খেলা দেখাতে ওস্তাদ। কোন কোন দিন গোটা

সন্ধ্যাটাই ওর পাশে কাটিয়ে দিতাম। ওর গা থেকে তেল, আগুন, আর রসুনের গন্ধ বেরিয়ে আসত। ইঃাকভ রসুন খুব ভালবাসত; কাঁচা কাঁচাই আপেলের মত কামড়ে খেত। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠত, 'নে আলিওশা, কিছু কবিতা শোনা!'

অনেক কবিতাই আমার মুখস্থ ছিল। তাছাড়া মোটা একটা নোট বইয়ে আমার পছন্দমত কবিতাগুলো তুলে রেখেছিলাম। 'রুসলান ও ল্যুদমিলা' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম। আর ও স্তব্ধ হয়ে শুনত। তখন কিছুই দেখত না, কিছু বলত না, ওর সেই প্রবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসত। তারপর শান্তভাবে বলত, 'এক মোহিনী কাহিনী বটে। সবটা তুই নিজে নিজেই তৈরি করেছিস? কি বললি, পুশকিন? মুখিন-পুশকিন নামে একজন ভদ্রলোক ছিল। আমি তাকে দেখেছি একবার।'

'সে নয়! সে বহুদিন আগেই খুন হয়েছে।'

'কেন?'

রাণী মার্গোর কাছে শোনা গল্প সংক্ষেপে বললাম ওকে। শেষ হতেই শান্ত গলায় ও বলে উঠল, 'বহুলোক এমনি করে মেয়েমানুষের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়।'

প্রায়ই আমি ওকে বইয়ে পড়া গল্প শোনাতাম। সব গল্পগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা লম্বা কাহিনী তৈরি করতাম, তা যেমন উদ্দাম, তেমনি সুন্দর হত। তাতে থাকত রঙ্গীন ভাবাবেগ, বেপরোয়া দুঃসাহসিকতা, মহান বীর, অবিশ্বাস্য সুখ-সম্পদ, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-মৃত্যু, কত মধুর কথা, কত কুৎসিত কাজ। রোকাম্বোলের সঙ্গে ল্যা মলিয়া হানিবল আর কলোনের বীরত্ব মিলিয়ে দিতাম। একাদশ লুইয়ের সঙ্গে গ্রাঁদের বাবার গুণপণা। কর্ণেল ওতলেতায়েভের আর চতুর্থ হেনরীর ভেতরে কোন তফাৎ থাকত না। ভাবাবেগের নির্দেশে লোক-চরিত্রই বদলে দিতাম। ঘটনার পুনর্বিন্যাস করতাম। এমন এক জগত সৃষ্টি করতাম যেখানে দাদুর ঈশ্বরের মত আমার একছত্র অধিকার। দাদুর ঈশ্বরও ঠিক এমনি, মানুষকে নিয়ে যথেচ্ছভাবে খেলা করেন। জীবনের বাস্তব দিগদর্শনে বাধা সৃষ্টি না করে, জীবন্ত মানুষকে বোঝাবার জন্য আমার উৎসাহকে সামান্য দমিয়ে না দিয়েও বইয়ের জগতের ঐ কুহেলিকা আমাকে ঘিরে এমন এক স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করেছিল, যা আমার জীবনের চারপাশের বিষাক্ত নোংরামি ও অসংখ্য সংক্রামক জীবানুর হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছিল।

অনেক ব্যাপার থেকে বই আমাকে রক্ষা করেছিল। মানুষ কেমন করে প্রেম করে আর দুঃখ পায় তা জানা থাকায় আমার পক্ষে গণিকালয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। এই স্থূল লাম্পট্য দেখে আমার মনে তীব্র অশ্রদ্ধা জেগে উঠত। আর এতে যারা আনন্দ পেত তাদের প্রতি জেগে উঠত অপরিসীম ঘৃণা। রোকাম্বোল পড়ে শিখেছিলাম বৈরাগ্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রকে প্রতিরোধ করে। ডুমার নায়কদের দেখে কোন এক মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার কামনা জেগে উঠেছিল। হাসিখুশি ফুর্তিবাজ চতুর্থ হেনরী ছিল আমার আদর্শ চরিত্র। তাঁর কথা ভেবেই বোধ হয় বেরাঞ্জে লিখেছিলেন:

> 'সরল মানুষ সকলের ডাকে
> সুরা পাত্র যে তুলে নিত ঠোঁটে।

রাজ্যের সবাই যদি হয় সুখী
তবে রাজাসনে কেন থাকবে না সুখ?'

উপন্যাসে চতুর্থ হেনরীকে আঁকা হত একটি জনপ্রিয় হৃদয়বান মানুষ হিসেবে। তাঁর চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য দেখে আমার মনে এমন গাঢ় এক ধারণা হল যে ফরাসী দেশটাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর দেশ। বীরের দেশ। সে-দেশের চাষীর পরিচ্ছদ পরা মানুষও রাজবেশ-পরা মানুষের মত মহৎ। অাঁজে পিতো দে আরতাগাঁনার মতই বীর। হেনরী যখন মারা গেল তখন মর্মান্তিক শোকে আমি কাঁদতে লাগলাম। রেভাইলাকের ওপরে ঘৃণায় আমার দাঁতে দাঁত কড়মড়িয়ে উঠেছিল। আগওলার কাছে আমি যখনই কোন গল্প বলতাম প্রায় সময়েই আমার গল্পের নায়ক হত হেনরী। আমার মনে হল ইয়াকভও যেন 'হেনরী' আর ফ্রান্সকে ভালবাসতে শুরু করেছে।

'চমৎকার মানুষ ঐ রাজা হেনরী। ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে মাছ ধরতে পার, যা খুশি তাই করতে পার।' বলত ইয়াকভ।

গল্প শুনে ইয়াকভ উল্লাস প্রকাশ করে কিংবা প্রশ্ন করে গল্পের মাঝপথে বাধা দিত না। ভ্রূ দুটো কুঁচকে নীরবে চুপ করে বসে শুনত। মুখের ভাব একটুকুও বিকৃত হত না। যেন একটা প্রাচীন পাথর, শেওলায় সর্বাঙ্গ ছাওয়া। কিন্তু কোন কারণে যদি আমি হঠাৎ একটু থামতাম তাহলে ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠত, 'শেষ হয়ে গেল?'

'না, হয়নি এখনো।'

'তাহলে থামিসনা।'

একদিন ফরাসী দেশ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইয়াকভ বলে উঠল, 'ওদের জীবন খুব ঠাণ্ডা।'

'তার মানে, কী বলতে চাও?'

'আমি আর তুই বাস করি আগুনের মধ্যে; সব সময়ই কাজ করি। কিন্তু ওরা কী সুন্দর স্নিগ্ধ জীবন কাটায়। কোন কাজ করতে হয় না! শুধু ঘুরে বেড়ায়, আর মদ খায়। জীবনটা বেশ মোহিনী।'

'ওরাও কাজ করে!'

'কিন্তু তোর গল্প শুনে তো তা মনে হয় না।' যোগ্য মন্তব্য করল আগওলা। হঠাৎ ভোরের আলোর মতই একটা কথা আমার মনে জেগে উঠল যে যত বই-ই পড়েছি তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকগুলো কি করে কাজ করে, অভিজাত বংশের মানুষেরা কার শ্রমে প্রতিপালিত—সে সম্পর্কে লেখক প্রায়ই নীরব।

'আচ্ছা, আমি একটু ঘুমিয়ে নি।' বলেই ইয়াকভ শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। পরক্ষণেই পরম সুখে নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

শরৎকালে 'কামা'র তীর যখন গাঢ় বাদামী হয়ে উঠেছে, গাছে গাছে সোনালী রং আর সূর্যের বাঁকা আলোর রেখা ম্লান হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ ইয়াকভ জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় আমায় বলল, 'পরশু তুই আর আমি গিয়ে উঠব পেরমে, বুঝলি আলিওশা। তারপর যাব স্নানের ঘরে। প্রাণভরে গরম জল দিয়ে স্নান করব। সেখান থেকে সোজা গান বাজনা হয় এমন এক সরাইখানায় চলে যাব। ভারি মজার ব্যাপার হবে সেটা। হাত অর্গান বাজান দেখতে কী মজাই না লাগে আমার।'

কিন্তু সারাপুল'এ পৌঁছতেই দাড়ি গোঁফ কামান গোলগাল নাদুস-নুদুস মেয়েলিমুখো একটা লোক এসে জাহাজে উঠল। গায়ে একটা লম্বা কোট আর মাথায় শেয়ালের কানওলা টুপি পরায় লোকটাকে আরো বেশি মেয়েদের মত দেখাচ্ছিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরের পাশে একটা গরম কোণ বেছে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ল। তারপর চায়ের হুকুম দিল। কোট টুপি না খুলেই ফুটন্ত পানীয়ে চুমুক দিয়ে সে দারুণ ঘামতে শুরু করল।

শরতের মেঘ-ঝরা মৃদু মৃদু বৃষ্টি পড়ছিল। মনে হচ্ছিল লোকটা যখনই তার ডোরা-কাটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছবে তখনই সেই ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টির রেশ কমে আসবে। আর যত বেশি ঘামবে ততই বাড়বে।

একটু পরেই ইয়াকভ এসে লোকটার পাশে বসল। তারপর দুজনে একটা ক্যালেণ্ডার খুলে ওতে ম্যাপ দেখতে লাগল। লোকটা আঙুলের ডগা দিয়ে কি যেন দেখিয়ে দিল ওকে। আর শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল আগওলা, 'ও আর কী? আমার মত লোকের পক্ষে ও তো সোজা। আরে থুঃ থুঃ।'

'বেশ।' ক্যালেণ্ডারটা পায়ের কাছে রাখা খোলা ব্যাগটার মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল যাত্রীটি। তারপর ওরা চা খেতে খেতে ধীরে ধীরে আলোচনা করতে লাগল।

কাজ শুরু হবার একটু আগেই ইয়াকভকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা কে?' জবাবে একটু হেসে ইয়াকভ বলল, 'দেখতে একটু বুনো বুনো, তাই না? তার মানে ও হচ্ছে গিয়ে একটা খোজা। সাইবেরিয়ার বহু দূর দেশ থেকে এসেছে। আজব চিজ! মনে হয় যেন শুধু ফন্দি এঁটেই বেঁচে আছে।

বলেই ঘোড়ার ক্ষুরের মত শক্ত কালো গোড়ালি দিয়ে ডেকের ওপরে দুম দাম শব্দ তুলে আমার সামনে থেকে চলে গেল। কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁজরা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'ওর কাছে কাজ নিয়েছি। পেরমে পৌঁছেই জাহাজ থেকে চলে যাব। একেবারে চির বিদায়, বুঝলি আলিওশা। সেখান থেকে ট্রেনে করে যাব। তারপর আবার নদী পথে, আবার ঘোড়ায়—এমনি করে পাঁচ হপ্তায় গিয়ে পৌঁছব সেখানে। দেখতো মানুষকে কত দূর দূর দেশের কোণা ঘুপচিতে গিয়ে হাজির হতে হয়!'

'তুমি ওকে চেন?' ইয়াকভের সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কেমন করে চিনব? জীবনে কোন দিন ওকে দেখিনি; ও যেখানে থাকে সেখানেও যাইনি কোন দিন।'

পরদিন সকালে একটা চর্বি মাখা ভেড়ার চামড়ার খাটো জামা গায়ে, মথায় বনাত-শূন্য একটা টুপি—যা এককালে ছিল টেডি ভল্লুকের সম্পত্তি—আর গায়ে ছেঁড়াফেঁাটা একজোড়া পুরোন স্যাণ্ডাল পরে ইয়াকভ এসে হাজির হল। ওর লোহার মত কঠিন আঙুল দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'আমার সঙ্গে চলে আয়, কি বলিস? আমি যদি ওকে একবার বলি তবে বুনোটা তোকেও সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে যাবে। কি বলিস, বলব? তোর কোন কাজে আসে না এমন একটা জিনিস ওরা কেটে ফেলে দেবে। অবশ্য তার জন্যে তোকে কিছু টাকাকড়িও দেবে। ওরা যে দিন কাউকে খোজা করে সেদিনটা ওদের কাছে এক উৎসবের দিন। এমনকি সে লোকটাকেও ওরা তার বদলে টাকাকড়ি দেয়!'

রেলিং-এর পাশে বগলে একটা বোচকা নিয়ে খোজাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিষ্প্রাণ চোখে ইয়াকভের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ওর শরীরটা একটা জলে ডোবা মরা মানুষের মত ভারি আর ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। দাঁতে দাঁতে চেপে ওকে শাপ দিতে লাগলাম। আগওলা আবার আমার হাতটা ওর শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

'থুঃ থুঃ ওর মুখে! যে যেভাবে পারে ঈশ্বরকে ডাকে—তোর তাতে কি এল আর গেল। আচ্ছা বিদায়! আশা করি তুই সুখী হতে পারবি।'

একটা বিরাট ভল্লুকের মত থপথপিয়ে চলে গেল ইয়াকভ শুমভ। পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগে আমার অন্তর জর্জরিত হয়ে যেতে লাগল। সাংঘাতিক কষ্ট হল আগওলার জন্য। আবার রাগও হল খুব। মনে পড়ে, একটু ঈর্ষা আর ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ে মনে মনে ভাবছিলাম কেন সে অমন করে অত দূর অজানা দেশে চলে গেল?

সত্যি কী রকমের মানুষ ও—ঐ ইয়াকভ শুমভ।

বারো

শরতের শেষ দিকে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, তখন এক মূর্তি-চিত্র-শালায় শিক্ষানবীশের কাজ নিলাম। কিন্তু শিক্ষানবীশী আরম্ভ করার দ্বিতীয় দিনে দোকানের মালিক—ছোট খাটো নরম চেহারার এক বৃদ্ধা, মদ খান প্রচুর,—বললেন এসে, 'এখন দিন ছোট, রাত বড়, তাই বেচা-কেনায় সাহায্য করতে সকালে উঠে তুমি দোকানে যাবে; আর রাত্রে এসে কাজ শিখবে।'

তারপর তিনি আমাকে দোকানের তরুণ চটপটে বড়বাবুর জিম্মা করে দিলেন। লোকটার মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। সে আর আমি কনকনে শীতের ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুমন্ত ইলিঙ্কা স্ট্রীট ধরে শহর পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছতাম 'নিচের বাজারে'। দোকান ঘরটা তেতলায় চকের ওপরে ছিল। এককালে ওটা ছিল একটা গুদামঘর। ছোট, অন্ধকার। একটা মাত্র লোহার দরজা দালানের সামনের দিকে আর একটা ছোট জানলা আড়াআড়ি টিনের ছাদওয়ালা ঝুল বারান্দার দিকে। ঘরটা বড় ছোট, নানান আকারের মূর্তি-ফ্রেম দিয়ে ঠাসা। কতকগুলো সাদামাটা, কতকগুলো আবার ফুল পাতার নকস-কাটা, চিত্র-বিচিত্র। আর আছে ধর্মগ্রন্থ—হলদে মলাটে বাঁধাই। পুরাকালের স্লাভ লিপিতে ছাপা। পাশের ঘরটা একটা মূর্তির আর বইয়ের দোকান। দোকানের মালিক কালো দাড়িওলা এক ব্যবসায়ী। ভলগা পেরিয়ে কেরঝেনেৎস নদী অঞ্চলে সুপরিচিত এক প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবাগীশের সে জ্ঞাতি। দোকানীর একটা রোগা-পটকা ছেলে ছিল আমারই সমবয়সী। মুখখানা চিমসে বুড়োটে। চোখদুটো ইঁদুরের মত পিটপিটে।

দোকান খোলার পরে আমার কাজ ছিল কাছের সরাইখানা থেকে গরম জল নিয়ে আসা। চা খাওয়া হলে দোকান সাজাতাম, জিনিসপত্রের নোংরা ঝাড়তাম। সাজান গোছান হলে আমি গিয়ে দাঁড়াতাম বারান্দায়, যাতে খদ্দেররা পাশের দোকানে না ঢুকে আমাদের দোকানে আসে।

'খদ্দেররা হচ্ছে বোকা,' বড়োবাবু আমাকে বলত, 'কোথা থেকে কিনবে

সেটা কোন কথাই নয় তাদের কাছে, শস্তা হলেই হল। কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ তাও জানে না!'

দ্রুত হাতে মূর্তি'র-পটগুলোতে সশব্দে চাপড় মেরে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার জ্ঞান জাহির করতে করতে আমাকে শিক্ষা দিত, 'এটা একটা চমৎকার কাজ—খুব শস্তা; লম্বা চওড়ায় তিন চার। আর এটা ছয় আর সাত—যেমন দাম; তেমনি জিনিস। সাধুদের চিনিস তো? মনে রাখিস: এ হল ভনিফাতি—মাতালদের জন্য। শহীদ ভারভার—ইনি হলেন দাঁতের ব্যথা আর অকাল মৃত্যুর সাধু। ভাগ্যবান ভাসিলি—জ্বর আর বিকারের। কুমারীদের চিনিস? দেখ, ইনি হলেন দুঃখী মাতা। ইনি ত্রি-বাহু কুমারী। ইনি ক্রন্দিতা কুমারী; -আমার দুঃখ-হরণ কুমারী, কাজান, পোকরভ, সেমিস্ত্রেলনায়া…'

শিল্পকর্ম ও আকারের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন দাম আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কুমারীদের বিভিন্ন মূর্তি'ও চিনে ফেললাম। কিন্তু কোন সাধু কী উপকার করেন সেটা আমার কিছুতেই মনে থাকত না।

যখনই লক্ষ্য করত দোকানের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আমি দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে পড়েছি তখনই বড়-বাবু আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিত, 'বল দেখি কে প্রসব বেদনা উপশম করায়?'

যদি ভুল হত তাহলে অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে বলত, 'তোর মাথাটা কিসের জন্য বল দেখি?'

কিন্তু খদ্দেরদের মাল গছান ব্যাপারটা ছিল আরো কঠিন। মূর্তি'র কুৎসিত মুখগুলো খুব বিশ্রী লাগত আমার আর বুঝতে পারতামনা কী করে ওগুলো বিক্রি করতে হয়। দিদিমার গল্প শুনে ধারণা হয়েছিল মেরী মাতা হচ্ছেন সুন্দরী, যুবতী, আর খুবই দয়ালু। মাসিক পত্রিকাতেও এমনি ছবিই দেখেছি। কিন্তু মূর্তি'তে তাঁর চেহারা হল বৃদ্ধা আর কুটিলা। বাঁকা নাক, হাতদুটো কাঠের মত।

হাটের দিনে খুব ভাল বেচাকেনা হত—বুধবার আর শুক্রবার। ক্রমাগতই চাষী আর বুড়ি মেয়েছেলেরা আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করত। কখনো কখনো গোটা এক একটা পরিবার আসত। ওরা সকলেই সনাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী—গোমড়া মুখ, ভলগার ওপারের বনাঞ্চলের সেয়ানা লোক সব। দেখতাম বিশ্রী থপথপে মোটা কোন লোক—ভেড়ার চামড়ার জামা পরনে, ধীরে ধীরে বারান্দা দিয়ে যেন আতঙ্কিত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে। এরকম একজনকে ডাকাডাকি করতে আমি লজ্জা আর বিব্রত বোধ করতাম। অনেক চেষ্টায় সে ভাব চেপে দাঁড়াতাম গিয়ে পথ আটকে। তারপর মশার মত ভনভন আরম্ভ করতাম তার বিশাল বুটপরা পায়ের আশেপাশে!

'কী চাই বুড়ো কর্তা? কর্মপদ্ধতি, প্রার্থনার বই, সটীক প্রার্থনা সঙ্গীত। ইয়েফ্রেম সিরিন আর কিরিলের বই। একবার ঢুকে দেখুন না। মূর্তি' চাই? বিভিন্ন দামের আছে। চমৎকার কাজ, গাঢ় রঙের যে কোন সাধু বা কুমারী মাতার মূর্তি' চান, আমরা ফরমাস নিয়ে এঁকে দেব। আপনি কুলগুরু কোন সাধুর বা পারিবারিক সাধুর মূর্তি' আঁকবেন কি? সমস্ত রুশিয়ায় আমাদের দোকানটাই হচ্ছে সেরা দোকান। শহরের সবচাইতে ভাল।'

অনমনীয় খদ্দের নীরবে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত, যেন

আমি একটা কুকুর। তারপর আচমকা শক্ত হাতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে পাশের দোকানে ঢুকে যেত আর আমার বড়বাবু তার বড় বড় কানদুটো চুলকোতে চুলকোতে ক্রুদ্ধকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠত, 'দিলি তো ছেড়ে? ভাল দোকানদারি বটে তোকে দিয়ে।'

ওদিকে পাশের দোকানে জেগে উঠত কোমল সুরের মধুর কথা, 'বুঝলেন মশাই, এটা ভেড়ার চামড়ার ব্যবসা নয়। চামড়ার জুতোর দোকানও নয়। আমাদের ব্যবসা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিতরণ। সোনা রূপোর থেকেও, সংসারের যে কোন মূল্যের থেকেও এর দাম ঢের বেশি।'

'ধ্যাত্তি, যত সব!' সপ্রশংস ঈর্ষাকাতর সুরে বড়বাবু বলে উঠত, 'কান দিয়ে শোন, চাষাটার কানে কেমন করে তেল দিচ্ছে। শেখ ওর কাছ থেকে।'

আমি মনপ্রাণ দিয়ে শিখতে চেষ্টা করতাম। কারণ একবার যখন কাজটা নিয়েছি তখন আমার নিশ্চয়ই উচিত ভাল মত করা। কিন্তু খদ্দেরদের পটিয়ে-পটিয়ে জিনিস গছাবার ব্যাপারে দেখা গেল আমার বুদ্ধিটা নিতান্তই কম। মুখ-চোরা গোমড়ামুখো চাষী আর ইঁদুরের মত দেখতে ভ্যাবাচাকা খাওয়া বুড়িগুলোকে দেখে আমার কেবলি করুণা হত। মনে হত ওদের চুপি চুপি বলে দিই মূর্তির ঠিক দামটা কত, যাতে ওদের পকেট থেকে বিশ কোপেক বেশি না খসে যায়। ওদের দেখে আমার এত গরীব, এত ক্ষুধার্ত মনে হত যে অবাক হয়ে পড়তাম যখন দেখতাম সাড়ে তিন রুবল দিয়ে ওরা ঐ নিতান্ত বাজারচলতি প্রার্থনা-সঙ্গীত কিনছে।

বই সম্পর্কে ওদের জ্ঞান আর মূর্তির কারুকার্য নিয়ে ওদের কদর করা দেখে অবাক হতাম। একদিন পাকাচুলের এক বুড়োকে আমাদের দোকানে ওঠার জন্য লোভ দেখাবার চেষ্টা করতেই বুড়ো বলল, 'কথাটা তুমি সত্যি বলছ না খোকা, যে তোমাদের দোকানটাই সারা রুশিয়ার মধ্যে সেরা দোকান। মস্কোর রগোঝিন কারখানাটা হল সবার থেকে সেরা!'

লজ্জায় আর অপমানে এক ধারে সরে দাঁড়াতেই বুড়ো পাশের দোকানেও না গিয়ে সোজা ধীর পায়ে চলে যেতে লাগল।

'মুখের ওপর দিল তো বলে!' ঘৃণাভরা স্বরে বলে উঠল বড়বাবু।

'কিন্তু রগোঝিন কারখানার কথা তো আমাকে কোন দিন আপনি বলেননি!'

বড়বাবু গাল দিতে আরম্ভ করল, 'ব্যাটা সবজান্তা, দেখতে গোবেচারা হলে হবে কি, পিছলে পিছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার বক্তৃতা ঝাড়ছে। সাপের জাত।'

এই ফিটফাট রাঙামুলো গোছের সুন্দর চেহারার অহঙ্কারী লোকটার ছিল চাষীদের সম্পর্কে ভীষণ বিতৃষ্ণা। আমাকে একদিন বলল, 'আমি বুদ্ধিমান লোক। আমি ফিটফাট থাকতে ভালবাসি। সুন্দর গন্ধ—সুগন্ধি জল, ধূপ-ধূনোর গন্ধ ইত্যাদি পছন্দ করে থাকি, আর ভেবে দেখ, আমার মত রুচি-সম্পন্ন একটা মানুষকে কিনা চাষাভুষোর কাছে মাথা নুইয়ে 'আজ্ঞে মশাই' করতে হচ্ছে, কেননা তাতে মালিক পাঁচ কোপেক পাবে। সহ্য করতে পারি না একদম। চাষাগুলো কী? নোংরা দুর্গন্ধ। দুনিয়ার বুকে উকুনের মতই থুকথুক করে বেড়াচ্ছে। আর আমি···'

নিদারুণ বিরক্তিতে থেমে গিয়েছিল সে।

চাষীদের খুব ভাল লাগত আমার। ওদের প্রত্যেকের ভেতরে কেমন যেন একটা রহস্যময়তার আভাস পেতাম। যেমন পেতাম ইয়াকভের মধ্যে।

হয়ত দেখা গেল একটি লোক বেকুফের মত ভেড়ার চামড়ার জামার ওপরে আলখাল্লা চাপিয়ে এসেছে দোকানে। ছিন্ন পশমের টুপিটা খুলে দু আঙ্গুলে ক্রুশ করে কোণের দিকে মূর্তির কাছে যেখানে মিটমিট করে আলো জ্বলছে সে দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। যে মূর্তিগুলো শুদ্ধ করা হয়নি তার দৃষ্টি এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। অবশেষে বাকশূন্য দৃষ্টিতে বড়বাবুর মুখের দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বলল, 'সঠিক প্রার্থনা-সঙ্গীত দেখি একখানা!'

আলখাল্লার হাতা গুটিয়ে বইটার নামের অক্ষরগুলো পড়বার জন্য নাজেহাল হল বহুক্ষণ ধরে। আর ফাটা-ফাটা ঠোঁট দুটো সরবে নেড়ে চলল।

'এর থেকেও পুরনো কোন বই আছে কি?'

'এর চেয়েও পুরনো দিনের পুঁথি হলে দাম পড়বে একশ রুবল, জানেন?'

'জানি।'

আঙ্গুল ভিজিয়ে চাষীটি পাতা ওলটাল। বইটার ধারে ওর আঙ্গুলের কালো ছাপ লাগল; ওর মাথার ওপর দিয়ে তীব্র হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বড়বাবু বলল, 'সমস্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থেরই এক বয়স। প্রভু তাঁর বাণী কখনো পরিবর্তন করেন না।'

'সে জানি। প্রভু তাঁর বাণী পরিবর্তন করেন না, কিন্তু নিকন করেছিল।'

তারপর বইটা বন্ধ করে রেখে খদ্দেরটি নিঃশব্দে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মাঝে মধ্যে পাড়া-গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে তর্কাতর্কি লেগে যেত বড়বাবুর। দেখতাম পবিত্র-ধর্ম-সংক্রান্ত লেখার বিষয়ে ওরা বড়বাবুর চেয়ে অনেক বেশি জানে।

'যত সব জলের ভূত।' বিড়বিড় করে বলত বড়বাবু।

দেখতাম, আধুনিক বই চাষীরা তেমন পছন্দ না করলেও সেগুলো তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এত ভয়ে ভয়ে, এত সতর্কতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করত যে মনে হত হয়তবা ভয় হচ্ছে যে এক্ষুণি ওদের হাত থেকে পাখির মত ডানা মেলে উড়ে চলে যাবে সেগুলো। এতে খুব খুশি হয়ে উঠত আমার মনটা। কারণ আমার কাছে বই অপূর্ব এক বস্তু, যার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে লেখকের প্রাণ-মন-আত্মা। যখনই কোন বই পড়তাম আমি, তখনই মুক্ত করে দিতাম ঐ আত্মাকে। আমাকে সেই আত্মা এক রহস্যময় সঙ্গ দিত।

প্রায়ই ঐ সব বুড়ো-বুড়িরা ধর্ম সংস্কারক নিকনেরও বহু পূর্বের লেখা বইপত্র বিক্রি করতে আসত আমাদের কাছে। কিংবা নিয়ে আসত ইরগিজ বা কেরঝেনেৎসের সন্ন্যাসীদের চমৎকার সুন্দর করে লেখা এসব বইয়ের অনুলিপি। জীবনী আনত—যেগুলো দিমিত্রি রস্তোভস্কির দ্বারা সংশোধিত হয়নি। এ ছাড়া আনত অনেক পুরনো দিনের মূর্তি, ক্রুশ, এনামেল করা পেতলের তিন-পলা মূর্তি, সমুদ্র-পথের অচীন দেশ থেকে আনা ধাতুর মালপত্র; পানশালার মালিকদের মস্কোর রাজামহারাজারা খুশি হয়ে যে সব রূপোলী চামচ উপহার দিয়েছিল, সেইগুলো। চারপাশে চোরের মত তাকাতে তাকাতে ওরা ঐসব জিনিস বেচতে আসত গোপনে।

আমাদের বড়বাবু আর পাশের দোকানী দুজনেই তীক্ষ্ণ নজর রাখত ঐসব জিনিসের দিকে। চতুরতায় পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে চাইত কেনার ব্যাপারে। পয়সাওলা ধনী সনাতন-পন্থীদের কাছে যে সব প্রাচীন সম্পদ ওরা একশ' রুবলে বিক্রী করত তা কেনার জন্য দশ রুবলের বেশি খরচ করত না।

'ঐসব বুড়ি ডাইনী আর ভূতগুলোর ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখিস,' বড়বাবু খেয়াল করিয়ে দিতে আমাকে, 'ওদের ঐ প্যাকেটের ভেতর খাস্তা মাল আছে কিন্তু।'

এ ধরণের কোন ভাল মাল এলেই বড়বাবু আমাকে পাঠিয়ে দিত শাস্ত্রবাগিশ পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কাছে। পুরাতন পুঁথি, মূর্তি ইত্যাদি জিনিস সম্পর্কে তার ছিল অসাধারণ জ্ঞান!

লম্বা চেহারার বুড়ো মানুষ। চোখদুটো বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিখুশি মুখ। আর সৌভাগ্যবান ভাসিলির মতই তার লম্বা দাড়ি ছিল। একটা পায়ের আঙ্গুলগুলো কাটা পড়ায় সে হাঁটত লাঠি ভর দিয়ে। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে পুরুতদের মত পাতলা একটা আলখাল্লা পরত। আর হাঁড়ির মত দেখতে একটা মখমলের টুপি পরত মাথায়। সাধারণত যদিও সে সোজা হয়ে বুক টান করে হাঁটত, কিন্তু যে-মুহূর্তে দোকানে এসে ঢুকত তখন ইচ্ছে করেই কেমন যেন একটু কুঁজো হয়ে পড়ত। ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত একটা। তারপর সনাতন-ধর্মাবলম্বীদের মত দু'আঙ্গুলে ক্রুশ করে স্তোত্র আর প্রার্থনা আওড়াত। বার্ধক্য ও ভগবদ্‌ভক্তির এই রকম-সকম দেখে ঐ সব দুষ্প্রাপ্য পণ্যের বিক্রেতাদের মনে জেগে উঠত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব।

বুড়ো জিজ্ঞেস করত, 'পার্থিব কোন ব্যাপারে ডেকেছ হে?'

'এই লোকটি একটা মূর্তি এনেছে: বলছে যে এটা স্তোগানভ।'

'কি বলছে?'

স্তোগানভ মূর্তি।'

'আমি কানে একটু কম শুনি। নিকনের চেলাদের প্রচার করা নোংরা কথা শোনার হাত থেকে প্রভু আমার কানদুটোকে রক্ষা করেছেন।'

টুপি খুলে মূর্তি সোজা করে পটের ওপরটা ভাল মত পরীক্ষা করত বুড়ো। দেখত ধারগুলো আর কাঠের খিল। তারপর চোখ কুঁচকে বিড়বিড় করে বলত, 'নাস্তিক নিকনের চেলারা পুরাকালের কাজগুলো সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখে, শয়তানের কাছ থেকে খুব জাল করা শিখছে। কেমন পাকা হাতে পবিত্র-মূর্তি সব নকল করছে আজকাল—দক্ষতা আজ বটে। প্রথমটা দেখেই মনে হবে সত্যিই যেন খাঁটি স্তোগানভ বা উস্তুজ। সুজদালও হতে পারে। কিন্তু ভেতরের চোখ থাকলে তক্ষুণি জানিয়ে দেবে যে ওটা নকল।'

ও একবার 'নকল' বললেই বুঝতে হবে মূর্তি দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান। আগে থেকে কতকগুলো জানিয়ে রাখা শব্দ আছে যা থেকে বড়বাবু বুঝতে পারে কত দাম বলতে হবে। কথাগুলো আমি জানতাম। 'দুঃখ আর বিষণ্ণতা' অর্থাৎ দশ রুবল; 'নিকন-বাঘ' মানে পঁচিশ রুবল। বিক্রেতাদের ওরা কি ভাবে যে ঠকাত তা দেখে সত্যিই লজ্জা হত। কিন্তু বুড়োর সেই চাতুরী দেখে আমিও আকৃষ্ট হতাম।

'নিকন-পন্থীরা হল নিকন-বাঘের কালো বাচ্চা, খোদ শয়তানের কাছ থেকে ওদের এই সব কাজের শিক্ষা। যেমন দেখ, ভাবছ যে এই ভিতটা খাঁটি আর গোটা কাপড়টা একই হাতের আঁকা। কিন্তু মুখটার দিকে লক্ষ্য করে দেখ—ভিন্ন হাতের তুলিতে মুখটা আঁকা। সেকালের সিমন উশাকভের মত ওস্তাদ কারিগররা, হোক না কেন সে নিজে ধর্মত্যাগী, গোটা ছবিটাই সে নিজের হাতে আঁকত—কি কাপড়চোপড়, কি মুখ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব। কিন্তু আজকের, একালের

হতভাগাদের সে ক্ষমতা নেই। মূর্তি-আঁকাটা সে সময় একটা ঈশ্বরপ্রদত্ত ব্যাপার ছিল হে, কিন্তু আজকাল ওটা একটা কৌশল হয়ে গেছে মাত্র, বুঝলে হে পুণ্যবানেরা।'

শেষে মূর্তিটা কাউন্টারের ওপরে রেখে টুপিটা পরতে পরতে বলত, 'পাপ, ওদের আত্মায় পাপ!'

তার মানে, ঠিক আছে—কিনে ফেল।

শাস্ত্রবাগীশের বক্তৃতা আর জ্ঞানের বহর দেখে ভীত হয়ে বিক্রেতা শ্রদ্ধাভরা স্বরে জিজ্ঞেস করত, 'তা হলে মূর্তি সম্পর্কে কি বলেন?'

'মূর্তিটা নিকন পন্থীদের তৈরি।'

'কিন্তু কেমন করে হবে তা? আমাদের ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা, তাঁরা এই মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করে গেছেন।'

'তোমার ঠাকুর্দার বাবার জন্মের আগেই যে নিকন জন্মেছিল হে।'

বুড়ো তখন মূর্তিটা লোকটার মুখের ওপরে তুলে ধরে গম্ভীরভাবে বলতে আরম্ভ করত, 'কি রকম হাসিখুশি ভাবটা দেখ, একে কি মূর্তি বলতে চাও? নিছক ছবি একটা। অন্ধ শিল্পকর্ম। নিকন-পন্থীদের এক খামখেয়ালী উদ্ভট কল্পনা। প্রাণ নেই এর ভেতরে। আমি মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? আমি বুড়ো মানুষ, অনেক অত্যাচার সয়েছি ধর্মবিশ্বাসের জন্য। শীগ্‌গিরই আমি আমার ঈশ্বরের সাথে মিলতে যাচ্ছি। আত্মাকে বিকিয়ে কি লাভ আমার?'

বলতে বলতে দোকান ছেড়ে বুড়ো বারান্দায় বেরিয়ে আসত। বোঝাত যেন বার্ধক্যের ভারে ক্ষীণ, তার বক্তব্য সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করায় অন্তর আহত। মূর্তিটার জন্য বড়বাবু কয়েকটা রুবল দিত। তারপর পিওতর ভাসিলিয়েভিচকে আভূমি নমস্কার জানিয়ে বিক্রেতা চলে যেত। তখন আমাকে যেতে হত সরাইখানায় গরম জল আনতে। ফিরে এসে দেখতাম, বুড়ো আবার তেমনি উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঝলমল্ করে উঠেছে। মমতাভরা চোখে সদ্য কেনা মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বড়বাবুকে বলছে, 'দেখ দেখ, কী সুন্দর সহজভাবে আঁকা—প্রতি টানে টানে ভগবদ্‌ভীতির চিহ্ন। মরজগতের মরমানুষের কিছুই নেই এতে।'

'কার হাতের আঁকা এটা?' তীব্র উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে চক্‌চকে চোখে জিজ্ঞেস করত বড়বাবু।

'এত শীগ্‌গিরিই কি আর তা জানতে পারা যায়।'

'জহুরী লোক হলে এটার জন্যে কত দাম দিতে পারে?'

'জানি না। দেখিয়ে নেওয়া যাক।'

'আঃ পিওতর ভাসিলিয়েভিচ।'

'যদি আমি বিক্রি করি তবে তুমি পঞ্চাশ রুবল পাবে। বাকীটা হবে আমার।'

'আজ্ঞে!'

'ওসব আজ্ঞে টাজ্ঞে চলবে না।'

চা খেতে খেতে ওরা নির্লজ্জের মত দর কষাকষি করা শুরু করত। পরস্পর পরস্পরকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত চোরের মত। বোঝা যেত যে বড়বাবুটি সম্পূর্ণভাবে বুড়োর দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। বুড়ো বেরিয়ে যেতেই ও আমাকে বলত, 'দেখিস, মালিক ঠাকরুণ যেন এই কেনাবেচার কথা কিছু জানতে না পারে।'

মূর্তিটা বিক্রির ব্যবস্থা সমাধা হয়ে গেলে বড়বাবু বলত, 'তারপর শহরের টাট্‌কা খবর আর কি আছে, পিওতর ভাসিলিয়েভিচ?'

হলদে হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে তেল চকচকে ঠোঁট বের করে বুড়ো গল্প বলে যেত ধনা-ব্যবসায়ীদের জীবন সম্পর্কে; ব্যবসায়ে কার কেমন লাভ হল, কার কি রোগ, কার বিয়ে হল, পানোৎসব হয়েছে কোথায়, কোন স্বামী কোন স্ত্রী প্রতারণা করছে কাকে তার কথা। ঐ সমস্ত মূল্যবান গল্প যেন অভিজ্ঞ হাতে তপ্ত তাওয়া থেকে নামিয়ে, তাতে তার হিস্‌হিসে হাসির মিষ্টি রসের ফোড়ন দিয়ে বুড়ো পরিবেশন করত ঠিক নিপুণ রাঁধুনীর মত। বড়বাবুর গোলগাল মুখখানা ঈর্ষাপূর্ণ আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠত। এক গভীর স্বপ্নময়তায় চোখদুটো জড়িয়ে আসত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলত, 'কেউ কেউ কী সুখেই না জীবন কাটায়, আর আমি...।'

'যার যেমন কপাল,' গম্‌গম্‌ করে উঠত বুড়োর গলার স্বর, 'কাউকে দেবদূত গড়েছে ছোট রূপোর হাতুড়ি দিয়ে আর কাউকে শয়তান কুড়ুলের উল্টোপিঠ দিয়ে।'

শক্ত পেশীবহুল চেহারার বুড়োটা ছিল সবজান্তা—সারা শহরের সবকিছু তার করায়ত্ত। ব্যবসায়ী, কেরাণী, পুরুত, কারিগর সবার গোপন রহস্যই তার জানা। ঈগলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার। নেকড়ে কিংবা খেঁকশিয়াল জাতীয় কিছু একটা ওর ভেতরে আছে। আমি সব সময়েই ওকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু ওর তাকানর ভঙ্গির মুখোমুখি আমি সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন হয়ে পড়তাম। যেন কোন এক অস্পষ্ট সুদূর থেকে সে আমার দিকে তাকাত। মনে হত যেন ওর চারপাশ ঘিরে এক অতল গহ্বর। সাহস করে ওর দিকে এগুতে গেলে ঐ অতল গহ্বর গ্রাস করে ফেলবে। আমি টের পেতাম, এই বুড়ো আর আগওলা ইয়াকভ সুমভের মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে।

বুড়োর বুদ্ধি আর চতুরতায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বড়বাবু। তার সামনে পেছনে সব সময়েই একথা স্বীকার করত সে। কিন্তু কোন কোন সময়ে সেও তাকে রাগিয়ে দিত, আঘাত করতে চাইত।

বুড়োর মুখের দিকে একদিন বেপরোয়াভাবে তাকিয়ে বড়বাবু বলল, 'মানুষের চোখে কি ধূলোই না দাও তুমি।'

'ঈশ্বরই কেবল মানুষকে ঠকান না,' অলস জড়িত কণ্ঠে মৃদু হেসে বলল বুড়ো, 'বাকি আমরা সকলেই বোকা ঠকিয়েই বেঁচে থাকি। বোকাকে বোকা না বানালে তবে তাকে দিয়ে হবেটা বা কী

রেগে উঠল বড়বাবু, 'সব চাষীরাই তো আর বোকা নয়। চাষীদের ভেতর থেকেই তো আসে ব্যবসায়ীরা।'

'যারা ব্যবসায়ী হতে পারছে তাদের কথা তো বলছি না। বলদরা জোচ্চোর হতে পারে না কখনো। ওরা হচ্ছে সাধু, শুধু মগজটা নেই।'

টেনে টেনে দারুণ দারুণ কথা বলে চলেছে বুড়ো, দেখে বিরক্তি লেগে যায়। ও যেন চতুর্দিকে জলাভূমির মাঝখানে একটা মাটির ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে একক একজন। ওকে রাগানো অসম্ভব ছিল। হয় রাগ ঢুকতেই পারে না ওর শরীরে নয়তো ও জানে রাগ কি করে চেপে রাখতে হয়।

কিন্তু বুড়ো প্রায়ই নিজে এসে আমার পেছনে লাগত। দাড়ির আড়ালে

মুচকি হাসি হেসে মুখটা আমার মুখের কাছে এনে বলত, 'কি যেন বলিস সেই ফরাসী লেখকের নাম, শুনি তো, পঁতোস ?'

ওর বিকৃত করে নাম উচ্চারণের ধরণে ভীষণ ক্ষেপে যেতাম আমি। কিন্তু নিজেকে সামলে বলতাম, 'প'সঁ দ্যু তরাইল।'

'কার চোখ ?'

'মূর্খের মত কথা বলবেন না—আপনি তো আর ছেলেমানুষটি নন।'

'ঠিক বলেছিস, আমি ছেলেমানুষ নই। কী পড়ছিস ওটা ?

'ইয়েফ্রেম সিরিন।'

'কে ভাল লেখে: গল্প লেখকরা, না ও ?'

কোন জবাব দিলাম না।

'বেশির ভাগ গল্প ওরা কি নিয়ে লেখে ?' বুড়ো চেপে ধরল।

'যা ঘটে, যা হয়, সবকিছু নিয়ে।'

'কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে ? ওগুলোও তো হয়।'

বড়বাবু দমকা হেসে উঠত আর আমি জ্বলতাম। ছুটে পালাবার ইচ্ছে হত। কিন্তু পালাতে গেলেই বড়বাবু ধমকে উঠত, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

বুড়ো আমার ধৈর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত খেপিয়ে চলত, 'তাহলে এবার এই ধাঁধাটার উত্তর দে তো দেখি সবজান্তা। তোর সামনে এক হাজার নগ্ন মানুষ আছে। পাঁচশ' পুরুষ, পাঁচশ' মেয়েমানুষ। ওদের মধ্যে আদম আর ইভও আছেন। কী করে বলবি কে আদম কে ইভ ?'

জবাবের জন্য কিছুক্ষণ আমাকে পীড়াপীড়ি করার পরে বিজয়গর্বে নিজেই বলে উঠত, 'ওরে মূর্খ ! ওরা ঈশ্বরের তৈরি। মায়ের পেট থেকে ওদের জন্ম হয়নি। তার মানে তাদের নাভি নেই।'

এধরণের বহু ধাঁধাঁ জানত বুড়ো। আর তা দিয়ে আমাকে বিরক্ত করত। দোকানে আসার প্রথম দিকে আমি বড়বাবুর কছে আমার পড়া বইয়ের গল্প কিছু বলেছিলাম। কিন্তু সেটাই আমার কাছে পরিতাপের বিষয় হয়ে ফিরে এল। বড়বাবু ইচ্ছে করে সেগুলোকে বিকৃত করে নোংরামী যোগ করে বলেছিল পিওত্র ভাসিলিয়েভিচের কাছে। বুড়ো আরো সব নোংরা নোংরা প্রশ্ন করে ওকে সাহায্য করতে বলত। আমার প্রিয় ইয়েভগেনি গ্রাঁদে, ল্যুদমিলা আর চতুর্থ হেনরীকে ওরা ওদের নোংরা ভাষার কদর্যতা ছিটিয়ে বিকৃত করে তুলেছিল।

জানতাম, এসব করার পেছনে ওদের বিদ্বেষবুদ্ধি নেই, আছে একঘেয়েমি এড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও ওগুলো সহ্য করা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। ওদের নিজেদের সৃষ্ট পাঁকে নিজেরাই শুয়োরের মত গড়াগড়ি দিত। আর যা কিছু সুন্দর, অথচ ওদের কাছে নতুন, দুর্বোধ্য, তাই মনে করত মজার। সে সব কিছুকেই নোংরা কদর্য করে তুলে ওরা মজা করত।

খিলানের দুদিকে সারি সারি দোকানের মালিক, দোকানের কর্মচারী, সবাই এক অদ্ভুত জীবন কাটাত। মানুষকে ঠকিয়ে, ধোঁকা দিয়েই ওরা আনন্দ পেত। আর সে আনন্দ ছিল বুদ্ধিহীন বালকোচিত, আর তেমনি হিংস্র। আমাদের শহরে প্রথম এসে কোন চাষী যদি কাউকে একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করে ওরা তাহলে তাকে ঠিক উলটো পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এ ব্যাপারটা খুব সাধারণ, আর মামুলি

হয়ে পড়াতে ওরা আর তেমন মজা পেত না তাতে। দুটো ইঁদুরকে তাই ধরে ওরা লেজেলেজে বেঁধে দিত। তারপর ইঁদুর দুটো কেমন করে কামড়াকামড়ি করছে, আঁচড়ে দিচ্ছে, আর দুদিকে যাওয়ার জন্যে দুটোতে টানাটানি করছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। অনেক সময় ওরা নিরীহ জীবদুটোর ওপরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত। কখনো একটা কুকুরের লেজে ভাঙ্গা একটা লোহার বালতি বেঁধে ছেড়ে দিত। জন্তুটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে ছোটাছুটি করত। বালতিটা বাজত ঝন্‌ঝন্ করে, আর ওরা গড়িয়ে পড়ত হাসতে হাসতে।

ওরা এমনি আরো অনেক রকমের কৌতুক করত। যেন সবাই—বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসা লোকগুলোর বিশেষত্বই হল বাজারের লোকদের আনন্দের খোরাক যোগাড করা। ব্যবসায়ীরা, তাদের কর্মচারীরা, কোন লোকের পেছনে লেগে কিংবা কাউকে কষ্ট দিয়ে, বিড়ম্বনায় ফেলে সব সময় মজা করার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। আমার পড়া বইয়ে এ ধরণের মনোবিকৃতির কোন কথা খুঁজে পাইনি বলে আমার অবাক লাগত।

বিশেষ করে আমাকে সব চেয়ে বেশি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল খিলানের একটা ব্যাপার।

একটা পশম আর ফেল্‌টের দোকানে এক কর্মচারী ছিল আমাদের দোকানের নিচেই। সমস্ত নিচের বাজারে 'পেটুক' বলে ওর নাম ছিল। কুকুরেব হিংস্রতা বা ঘোড়ার গায়ের জোব নিয়ে মানুষ যেমন বড়াই করে তেমনি ঐ কর্মচারীটির খাওয়া নিয়ে বড়াই করত দোকানের মালিক। আশেপাশের দোকানীদের সঙ্গে প্রায়ই সে বাজি ধরত।

'কে দশ রুবল বাজি ধবরে? মিশ্‌কা দু'ঘন্টায় দশ পাউণ্ড শুয়োরের মাংস খেতে পারে আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

কারুরই সন্দেহ ছিল না মিশ্‌কার এ ক্ষমতায়। সুতরাং ওরা বলত, 'না, বাজি ধরব না আমরা। মাংসটা বরং কিনে দিচ্ছি। ও খাক, আমরা মজা দেখি।'

'শুধু মাংস দশ পাউণ্ড, হাড নয় কিন্তু।'

যতক্ষণ না অন্ধকার গুদামঘর থেকে শীর্ণ দাড়ি গোঁফহীন একটা লোক বেরিয়ে আসত ততক্ষণ ওরা একটু বাদানুবাদ করত। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু; গায়ের লম্বা সুতীর কোটটা দলা দলা পশমে ভর্তি, আব লাল রঙের একটা কাপড় শক্ত করে কোমরে বাঁধা। সে সসম্মানে টুপি খুলে ছোট মাথাটা বের করে ঘোলাটে চোখে তাকাত মনিবের গো-মাংসের মত লাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখটার দিকে।

'এই শুয়োরের মাংসটা খেতে পারবে?' মনিব জিজ্ঞেস করল।

'কতক্ষণের মধ্যে?' মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল দুর্বল, উদাসীন গলায়।

'দু' ঘন্টায়।'

'সেটা একটু কষ্ট হবে।'

'তোমার পক্ষে এটা কিছুই নয়।'

'সঙ্গে দুই মগ বিয়ার থাকবে না?' মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'লেগে পড়!' ওর মনিব বলল। তারপর গর্বের সঙ্গে পাশের লোকদের বলল, 'মনে কোর না খালি পেটে খাচ্ছে ও। দু-পাউণ্ড রুটি খেয়েছে সকালে; দুপুরেও খেয়েছে পেট ভরে।'

শুয়োরের মাংস আনা হল। একদল লোক এসে জমা হয়ে দাঁড়াল দেখার জন্য। সবার গায়ে শীতের ভারি কোট। তাতে ওদেরকে বিরাট বিরাট বাটখারার মত দেখাচ্ছে। পেটমোটা ভুঁড়িওলা সবগুলো, চর্বিতে ঢাকা খুদে খুদে চোখ ক্লান্তি আর বিরক্তিতে চক্‌চক্ করছে।

হাতার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পেটুকটাকে ঘিরে ওরা ঘন হয়ে দাঁড়াল। পেটুক একটা ছুরি আর বড় একখানা রাইয়ের রুটি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। কয়েকবার খুব তাড়াতাড়ি ক্রুশ করে বসল পশমের স্তূপের ওপর। শুয়োরের মাংসটা একটা প্যাকিং বাকসের ওপর রাখল। তারপর ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে প্রশংসা করতে লাগল।

এরপর এক টুকরো রুটি আর পুরু এক টুকরো মাংস কেটে একটা আর একটার ওপরে নিখুঁত করে রেখে দুহাতে তুলে মুখের সামনে ধরল। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুটো কুকুরের মত লম্বা জিভ দিয়ে চাটল একবার। কুকুরের মতই খুদে খুদে তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর কুকুরের মতই মাংসে দাঁত বসাল।

'আরম্ভ করেছে।'

'সময় দেখ।'

পেটুকের মুখের দিকে সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর চর্বণরত চোয়াল, কানের দুপাশে মাংসপেশী, তালে তালে ওঠা-নামা করা সরু থুতনীটার দিকে তাকিয়ে রইল। আর নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করল, 'ভাল্লুকের মত চিবুচ্ছে!'

'চিবুতে দেখেছিস কখনো কোন ভাল্লুককে?'

'আমি কি বনে বাস করি? ওটা হল গিয়ে কথার কথা, ভাল্লুকের মত চিবোয়।'

'কথাটা হল, শুয়োরের মত চিবোয়।'

'শুয়োরে কি আর শুয়োর খায়?'

নিরানন্দ শুষ্ক হাসি হাসল সবাই। আর একজন পণ্ডিতলোক মন্তব্য করল, 'শুয়োরে সবকিছুই খায়—এমন কি নিজের বাচ্চা বা বোনকে পর্যন্ত।'

পেটুকের মুখখানা ক্রমশঃই লাল হয়ে উঠছে। দুটো কান নীল হয়ে উঠছে। ওর বসা চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। শ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু চোয়ালদুটো ঠিক একই তালে নড়ে চলেছে।

'তাড়াতাড়ি কর মিশ্‌কা—সময় কিন্তু তোর ফুরিয়ে আসছে। সবাই ওকে তাড়া দিতে লাগল। মাংস কতটা আছে একবার দেখে নিয়ে একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে এক ঢোক বিয়ার খেয়ে নিল সে। তারপর আবার চিবিয়ে চলল। দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল আরো। মিশ্‌কার মনিবের হাতের ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। আর একজন অন্যজনকে সাবধান করে দিচ্ছে, 'খেয়াল রাখিস কাঁটা না ঘুরোয় যেন, বরং ওর হাত থেকে ঘড়িটা নিয়ে নে!'

'মিশ্‌কার দিকেও দৃষ্টি রাখিস। হাতার ভেতরে খানিকটা লুকিয়ে ফেলতে পারে।'

'ঠিক সময়ের ভেতরে শেষ করতে পারবে না।'

এরই ওপর আমি পঁচিশ রুবল বাজি ধরেছি,' বেহিসেবীর মত চেঁচিয়ে উঠল মিশ্‌কার মনিব, 'আমার ইজ্জত নষ্ট করিসনা মিশ্‌কা!'

সবাই চেঁচিয়ে মনিবের পেছনে লাগল। কিন্তু কেউই বাজি ধরতে এগিয়ে এল না।

মিশ্‌কা চিবিয়েই চলছে। শুয়োরের মাংসের মতই হয়ে উঠেছে ওর মুখ-খানা। বাঁশির মত আওয়াজ বেরোচ্ছে সরু নরম হাড়ের মত নাকটার ভেতর থেকে। ওর দিকে তাকাতেই ভয় করছে। মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে যেন ও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলবে, 'দয়া কর…।'

কিংবা শুয়োরের মাংস যখন ওর গলা অবধি উঠবে তখন দর্শকদের পায়ের কাছে পুড়ে মরে যাবে ও।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু শেষ করে ফেলল শেষ মাংসটাও। ভিড়ের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দারুণ ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জল দাও একটু!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ওর মনিব গর্জে বলে উঠল, 'চার মিনিট দেরি হয়েছে, বেজন্মা কোথাকার!'

'খুব খারাপই হল দেখছি তোমার সঙ্গে বাজিটা না ধরে!' বিদ্রূপ করতে লাগল ভিড়ের ভেতর থেকে, 'তুমি তাহলে হেরে যেতে।'

'কিন্তু একথা সত্য যে লোকটা আস্ত ঘোড়া একটা!'

'সার্কাসের দল হচ্ছে ওর উপযুক্ত স্থান।'

'ঈশ্বর কোন কোন মানুষকে এমন অদ্ভুত করে সৃষ্টি করেন যে তা আর বলার নয়।'

'এবার চল একটু চা খাই গিয়ে, কি বল?'

ওরা দল বেঁধে চায়ের দোকানের দিকে চলল সারবন্দী গাধাবোটের মত।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ঐ ভাগ্যহীন বেচারার পেছনে অমন করে ভিড় করে কেন ঐ গম্ভীর প্রকৃতির মোটা-সোটা লোকগুলো? এরকম ক্ষতিকর পেটুকপনার ভেতরে এমন কি আনন্দ পায় ওরা?

চকের সারবন্দী সরু গ্যালারি অন্ধকার, আনন্দহীন। পশমের পেটি, ভেড়ার চামড়া, শণ, দড়ি, ফেল্‌ট বুট, ঘোড়ার জিন ইত্যাদিতে ঠাসা। পুরু ইটের থাম দিয়ে রাস্তা থেকে আলাদা করা। থামগুলো স্থূল, পুরনো ঝরঝরে আর রাস্তার ধূলোময়লায় কালো হয়ে উঠছে। আমি বোধহয় হাজার বার ঐ ইটগুলো গুনেছি। গুনেছি ওদের ভেতরের ফাটলও। ফলে ওগুলোর বাজে গড়ন গভীরভাবে আমার স্মৃতিতে বসে গেছে।

পায়ে-চলা পথে মন্থর গতিতে আসছে পথিক। রাস্তা ধরে পণ্য বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়ি আর স্লেজ চলেছে। রাস্তার শেষে দূরে দোতালা লাল পাকা দোকান-বাড়িগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা স্কোয়ার। সেখানে নিচে মাটির ওপরে ছড়ান রয়েছে প্যাকিং বাক্স, খড়, মুড়বার কাগজ— সব নোংরা বরফের সঙ্গে মিশে গেছে পায়ে পায়ে।

নিরবচ্ছিন্ন গতি থাকা সত্ত্বেও সবকিছুকে মনে হয়, এমন কি ঐ মানুষ, ঘোড়াও সব স্থির, নিশ্চল। যেন অদৃশ্য এক বাঁধনে বাঁধা পড়ে একই স্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। আবিষ্কার করলাম এখানকার জীবনে ঘটেছে শব্দের অভাব! ফলে সব কেমন যেন বোবা হয়ে যাচ্ছে। বরফের ওপরে ধাবিত স্লেজচালকের চিৎকার, খট্‌খট্‌ শব্দ, দোকানের দরজার, পিঠেওলাদের বড গলায় হেঁকে চলা সত্ত্বেও মানুষের কণ্ঠ এত নির্জীব, এত নিষ্প্রাণ যে কিছুদিন পর তাদের গলার স্বর আর কানে এসে লাগবে না।

গির্জের ঘণ্টা শুনে মনে হত যেন কারো অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে। এমন করুণ সুর যে তা

আমি কোন দিনও ভুলতে পারব না। সকাল থেকে রাত অবধি ঐ শব্দ যেন মানুষের সমস্ত ধারণা, কল্পনাকে পেতলের গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো দিয়ে ঢেকে ভেসে থাকাত বাজারের ওপরে।

সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসছে যেন হিমশীতল ক্ষয়িষ্ণু অবসাদ। নোংরা বরফের কালো চাদরের আবরণে ঢাকা মাটির ভেতর থেকে, ছাদে জমে-ওঠা ধূসর বরফের আস্তরণের ভেতর থেকে, আর মাংসের রঙের মত ইঁটের বাড়ির গা থেকে। চিমনির ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে পাক খেয়ে উঠছে ঐ অবসাদ। তারপর পেচিয়ে পেচিয়ে ধূসর শূন্য আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘোড়ার শরীর আর মানুষের নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অবসাদের ঢেউ। নিজস্ব একটা বিশেষ গন্ধ আছে ঐ অবসাদের—ঘাম, চর্বি, ধোঁয়া, শণের বিচির তেল, চর্বি মাখা মটর শুঁটির মিলিত গন্ধের মত সোঁদা আর ভারি। সে গন্ধ আঁটোসাটো গরম টুপির মতই মাথাটাকে আকড়ে ধরে ছিদ্র পথে অনুপ্রবেশ করে এমন এক ধরণের মত্ততায় মাতাল করে তুলত যে, ইচ্ছে হত চোখ বুজে সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে সামনের পাথুরে দেয়ালে মাথা কুটে মরি।

আমি প্রায়ই ব্যবসায়ীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতাম—সে মুখ পরিতৃপ্ত, গাঢ় রক্তের মত টকটকে লাল, তুষার-আহত, আর এমন নিশ্চল অনড় যে মনে হত ঘুমিয়ে আছে। তীরের বালুতে আটকে-যাওয়া মাছের মত ওরা শুধু হাঁ করে হাই তুলত।

শীতের দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা। গরমকালে যে সাবধানী হিসেবী দৃষ্টিতে ওদের চোখগুলো চক্‌চক্ করে উঠত, যে সজীবতা ফুটে ওঠাতে ওদের সুন্দরও দেখাত, তা আর এখন নেই। ভারি ভারি কোটগুলো যেন ওদের চলা-ফেরায় বাধা দিয়ে ওদের মাটির সঙ্গে আটকে রাখত। ওরা ধীর অলসভাবে কথা বলত, আর যখনই রেগে যেত তখনই সুদীর্ঘ তর্ক জুড়ে দিত! মনে হত যেন ওরা ইচ্ছে করে তর্কটা করছে—ওরা যে বেঁচে আছে শুধু সেটা প্রমাণ করার জন্যেই।

স্পষ্টই বুঝতে পারতাম ওরা অবসাদের ঐ সর্বাত্মক সর্বগ্রাসী আক্রমণে ঝিমিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারতাম ওদের ঐ নিষ্ঠুর অর্থহীন আমোদ শুধু ঐ ক্লান্তিকর অবসাদ কাটিয়ে ওঠার প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে পিওতর ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে আলোচনা হত আমার। যদিও সাধারণত আমার প্রতি ওর ছিল বিদ্রূপাত্মক ক্ষেপিয়ে দেওয়ার মনোভাব, তবুও বইয়ের ওপরে আমার টান দেখে ও মনে মনে খুশি ছিল। কখনো কখনো সে সত্যিই গভীরভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করত, উপদেশ দিত।

'ব্যবসায়ীদের জীবনযাপনের ধারা আমার ভাল লাগে না।' আমি বলতাম।

আঙুলে খানিকটা দাড়ি জড়াতে জড়াতে সে প্রশ্ন করল, 'তুই জানলি কি করে, ওরা কেমন করে জীবন কাটায়? তুই কি প্রায়ই যাস নাকি ওদের বাড়ি? এটা হচ্ছে রাস্তা! বুঝলে, মানুষ রাস্তায় বাস করে না। রাস্তায় কারবার করে, কিংবা তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায় বাড়ির দিকে। রাস্তায় সবাই চলে কাপড়চোপড়ের বোচকা হয়ে, কিন্তু কার ভেতরে কি কেউই তা বলতে পারে না। ওরা যখন বাড়িতে থাকে চার দেয়ালের ভেতরে, শুধু তখনই ওরা খোলামেলা হয়ে বাস করে। কিন্তু কেমন করে থাকে তা তুই কি করে জানবি?'

'কিন্তু বাড়িতেই হোক আর এখানেই হোক ওদের ভাবনা-চিন্তা তো একই ধরণের।'

'কে বলতে পারে তার পাশের লোকটা কি চিন্তা করছে?' আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর ভারিক্কী গলায় বলত বৃদ্ধ, 'চিন্তা হল গিয়ে উকুনের মত। বুড়োরা বলে না? ও গুনে বার করা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে বাড়ি গিয়ে কেউ হয়ত হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, তোমার পবিত্র দিনটিকে কলঙ্কিত করার জন্যে ক্ষমা কর।' কিংবা তার বাড়িঘরই হয়ত তার পক্ষে মঠের মত, সে সেখানে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে একলা বাস করে। প্রতিটি মাকড়শাই তার নিজের কোণটাতে থাকে—নিজের ওজন বুঝে ভার সইবার উপযুক্ত জাল বোনে।'

ও যখন গম্ভীরভাবে কথা বলত তখন ওর গলার স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠত। যেন কোন গোপন মূল্যবান কথা শিখিয়ে দিচ্ছে, 'এখনই তুই সব কিছুর কার্যকারণ খুঁজতে শুরু করেছিস! এসব বোঝার সময় হয়নি তোর। তোর মত বয়সে চলতে হয় চোখ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। মানে, চোখ দিয়ে দেখ, আর মনে রাখ. আর মুখটা বুজে থাক। মস্তিষ্কের প্রয়োজন ব্যবসার জন্য. আর আত্মার প্রয়োজন বিশ্বাসে। বই পড়াটা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই. কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। কোন কোন লোক এত বেশি পড়ে যে, পড়ে পড়ে তাদের মাথাই খারাপ হয়ে যায়। ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত ভুলে যায় তারা।'

আমার মনে হত বুড়োটা যেন অমর। আমি কিছুতেই ভাবতে পারতাম না যে ও বদলাচ্ছে, আরো বুড়ো হয়ে পড়ছে। যে সব ব্যবসায়ী, ডাকাত কিংবা শঠ বিখ্যাত হয়েছে, বুড়ো তাদের গল্প শোনাতে ভালবাসত। এমনি অনেক গল্পই আমি শুনেছি দাদুর মুখে। দাদু ওর চাইতে ঢের সুন্দর করে বলতেন। কিন্তু গল্পের বক্তব্য ছিল একই, মানুষ আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ পাকা করেই ধন-সম্পদ অর্জন করা যায়। মানুষ সম্পর্কে পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কোন সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু চোখ বুজে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে একান্ত আবেগের সঙ্গেই বলত ঈশ্বরের কথা।

'দেখছিস, মানুষ কেমন করে তাদের ঈশ্বরকে বোকা বানিয়ে চলে। কিন্তু প্রভু যীশু এ সবকিছুই দেখেন আর কাঁদেন ওদের জন্য, 'হায় আমার মানুষ, আমার মানুষ, হায়রে আমার দুর্ভাগা মানুষ, তোদের কপালে যে নরক জুটবে'!'

একদিন বেপরোয়া হয়ে বলে ফেললাম ওকে, 'আপনিও তো ঠকান চাষীদের।'

রাগ করল না। বলল, 'হুঁ, আমি যা করি সে ক্ষতি অতি সামান্য! আমি ধোকা দিয়ে চারটে কি পাঁচটা রুবল নি নিজের জন্যে। কেবলমাত্র ঐটুকুই, তার বেশি নয়।'

আমাকে পড়তে দেখলেই বইটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করত। তারপর উৎসুক বিস্ময়ে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলত, 'দেখ না, ও পড়ে বোঝেও আবার, খুদে বাঁদর!'

তারপর সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশের মত যা বলত তা ভোলার নয়,'শোন. আমার কথা শুনলে তোর উপকার হবে। এককালে দুজন কিরিল ছিল। দুজনেই বিশপ। একজন আলেক্জান্দ্রিয়ার, আর একজন জেরুজালেমের। আলেক্জান্দ্রিয়ার কিরিল নাস্তিক নেস্তোরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কারণ নেস্তোর রটিয়ে বেড়াত যে মেরী মাতা ছিলেন পার্থিব জগতের মানুষ। সুতরাং তাঁর গর্ভে কখনো ঈশ্বর জন্মগ্রহণ

করতে পারেন না। তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন একজন মানুষ। তাঁর নাম খৃষ্ট—দুনিয়ার পরিত্রাতা। সুতরাং তাঁকে ঈশ্বরের মাতা বলা উচিত নয় আমাদের। বলা উচিত খৃষ্টের মাতা, বুঝেছ? একেই বলে ধর্মদ্রোহিতা। তারপর জেরুজালেমের কিরিল যুদ্ধ করেছিল ধর্মদ্রোহী নাস্তিক আরিয়ার সঙ্গে…।'

গির্জের ইতিহাস সম্পর্কে ওর জ্ঞান দেখে আমি গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়তাম।

পুরুতের মত নরম হাতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সগর্বে বক্ত, 'এ ব্যাপারে আমি একজন সেনাপতি। 'হুইট সানডে' পরবের সময়ে নিকন-পন্থী পুরুত আর সাধারণ নির্বোধ লোকদের বিষাক্ত প্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে মস্কো গিয়েছিলাম। বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করলাম। এক পুরুতকে তো এমন ধাতানি দিলাম যে তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ব্যাপারটা ভাব।'

বলতে বলতে ওর গালদুটো রাঙা হয়ে উঠত। চিকচিক্ করে উঠত চোখ দুটো।

পরিষ্কারই বোঝা যেত প্রতিপক্ষের নাক নিয়ে রক্ত বের করাটা ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা; ওর গরিমার সুবর্ণ মুকুটের দীপ্তমান রত্ন বলে মনে করত। তাই জাঁক করে বলত, 'লোকটা সুন্দর ছিল। দৈত্যের মত বলিষ্ঠ। দাঁড়িয়ে আছে আর নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। লোকটার কিন্তু এই লজ্জাকর অবস্থা সম্পর্কে মোটেই খেয়াল ছিল না। সিংহের ন্যায় ভয়াবহ আর গমগমে ঘণ্টার শব্দের মত ছিল ওর গলার আওয়াজ। কিন্তু সারাক্ষণ ধীরভাবে আমি ওর হৃৎপিণ্ডের ওপর আমার কথার চাকু চালাতে লাগলাম—একেবারে পাঁজরার হাড়ের ভেতর দিয়ে। আর সেও তার ঐ দুষ্টু কপটধার্মিকতার আগুনে গরম হতে হতে উনুনের মুখের মত গনগনে হয়ে উঠল। উঃ, কী দিনই না গেছে সব।'

অন্যসব শাস্ত্র বিশারদরাও আমাদের দোকানে প্রায়ই আসত। একজন পাখোমি ছিল! লোকটা মোটা বেঁটে আর ছিল বিরাট ভুঁড়ি। একটা চোখ ছিল কানা। ও ঘোঁৎঘোঁৎ করে কথা বলত আর সব সময়েই গায়ে রাখত একটা তেলচিটে কোট। বুড়ো লুকিয়ানও আসত। তার চেহারাটা ঠিক ইঁদুরের মত ছোট আর তেলতেলে। ব্যবহারটা ভদ্র; খুব হাসিখুশি আনন্দমুখর লোক। ওর সঙ্গে সব সময় একটা লম্বা স্বাস্থ্যবান গম্ভীর মুখ, লম্বা দাড়ি, কোচমানের মত দেখতে লোক আসত। সুন্দর অথচ লাবণ্যহীন মুখের ওপরে দুটো ড্যাব ড্যাবে নির্লিপ্ত চোখ।

ওরা আমাদের কাছে প্রায়ই পুরোনো পুঁথি, ধুনোচি, আর গির্জের বাসনপত্র বিক্রী করতে চেষ্টা করত। অনেক সময়ে সঙ্গে অন্য কাউকেও আনত, ভলগার ওপার থেকে আসা কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে। তারাও বিক্রি করার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে আসত। বেচা কেনা শেষ হলে ওরা বেড়ার ওপরে বসা কাকের মত কাউন্টারের ওপরে বসে মিষ্টি রুটি আর ফলের গন্ধযুক্ত চিনি দিয়ে চা খেত, আর আলোচনা করত, নিকন-পন্থী গির্জের জবরদস্তির কথা, কোথায় খোঁজ খবর করে নষ্ট করেছে পবিত্র বইপত্র, কোথায় পুলিস গির্জে বন্ধ করে গির্জের সকলকে টেনে আদালতে হাজির করেছে ১০৩ ধারা অমান্য করার জন্যে ইত্যাদি। ওদের সব থেকে মুখরোচক আলোচনার বিষয় ছিল ১০৩ ধারা। কিন্তু ওরা তা নিয়ে খুব নির্লিপ্ত-ভাবে কথা বলত। ওটা যেন শীতকালের বরফের মতই একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার

পুলিস, তল্লাসী, আদালত, জেলখানা, সাইবেরিয়া ইত্যাদি যে সকল কথাগুলো ওরা বেশির ভাগ ব্যবহার করত তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য যন্ত্রণা ভোগের

কথা বলতে, ওগুলো যেন উত্তপ্ত কয়লার মত এসে আমার বুকে পড়ত, আর এই সব বৃদ্ধ লোকদের জন্যে জাগত সৎ-ইচ্ছা আর সহানুভূতি। আমার পড়া বইগুলো থেকে নীতি সম্বন্ধীয় সাহসকে প্রশংসা করতে শিখেছিলাম। আর যাঁরা তাঁদের লক্ষ্যপথে স্থির থাকতেন—তাঁদের ভক্তি করতে।

প্রাচীন ধর্মমতের এই প্রচারকদের নিজস্ব ভুল ত্রুটির কথা ভুলে যেতাম। শুধু তাঁদের শান্ত অধ্যবসায়ের কথা মনে থাকত। যার ভেতরে আমার মনে হত—রয়েছে তাঁদের লক্ষ্যের প্রতি এক নিশ্চল বিশ্বাস আর তারই জন্য সব রকমের দুর্ভোগ যন্ত্রণাকে সহ্য করার ইচ্ছে।

পরে এ ধরণের অনেক বিদ্বান বা সাধারণ লোকের সংস্রবে থেকে দেখেছি যে তাদের ঐ মনোবল, প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয় ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে গিয়ে একবার পৌঁছেছে সেখান থেকে কোথাও যাবার স্থান যেন তাদের আর নেই; যাবার ইচ্ছে অবধি নেই। অপ্রচলিত শব্দ আর অকর্মণ্য ভাবধারার ভেতরে ওরা বন্দী হয়ে রয়েছে। ওদের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি অকেজো হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের দিকে এগোবার সামর্থও নেই ওদের। যদি হঠাৎ ওদের মুক্তি দেয়া হয়, তাহলে পাহাড়ের ঢালু পথে পাথরের মতই ওরা নিজে থেকেই নিচে গড়িয়ে পরে যাবে। অতীতের প্রতি প্রাণহীন টান আর যন্ত্রণা ভোগ করার এক জীর্ণ বিকৃত আকর্ষণে ওরা এক মৃত ভাবধারার কবরস্থানে বন্দী হয়ে আছে। যন্ত্রণা পাবার সুযোগ থেকে ওরা একবার যদি বঞ্চিত হয় তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ওদের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হয়ে, বাতাসময় স্পষ্ট পরিষ্কার সুন্দর দিনের আকাশে মেঘের মমই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

যে ধর্মবিশ্বাসের জন্য ওরা ব্যাকুল আগ্রহে, এমন মিথ্যে গর্বে নিজকে বলি দিয়ে চলেছে, সে বিশ্বাসের ভিত যে দৃঢ় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যেন একটা জীর্ণ পোশাকের ওপর ধুলো-ময়লার পুরু আবরণের মত—যা এমন বোঝাই যে আর নষ্ট হবার নয়। ওরা ওদের চিন্তা, ওদের সহানুভূতি, একগুঁয়েমি, মিথ্যা সংস্কারের কঠিন খাঁচার ভেতরে দৃঢ়ভাবে বন্দী থেকে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তাতে করে ওরা যে অকেজো, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে, অচল, অনড় হয়ে পড়েছে তার জন্যে এতটুকুও বিচলিত নয়।

এই অভ্যাসে পাওয়া বিশ্বাস আমাদের জীবনে ভীষণ একটা দুরন্ত ক্ষত; একটা দারুণ পরিতাপের ব্যাপার। পাথুরে দেয়ালে ঘেরা ছায়ার মত এই বিশ্বাসের গণ্ডির ভেতরে নতুন যা কিছু জন্মায়, তা খুব ধীরে ধীরে বিকৃত, রক্তশূন্য হয়ে বেড়ে ওঠে। ঐ অন্ধ বিশ্বাসের আঁধার ভেদ করে ভালবাসার আলোকরেখা অতি অল্পই আসে কিন্তু অনেক বেশি করে আসে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা। এই বিশ্বাসের অগ্নিশিখা শুধু ধ্বংসেরই নিরুত্তাপ দীপ্তিমাত্র।

কিন্তু অনেক বছরের সংযত জীবন যাপনের ভেতর দিয়ে অনেক দেবতার মূর্তি ভেঙে আর অনেক রকমের ধারণা একেবারে উপড়ে ফেলে তবে এ সম্পর্কে আমি স্থির হতে পেরেছিলাম। সত্যি, আমাকে ঘিরে চারিদিকের সেই আনন্দহীন নীতি-জ্ঞানহীনতার ভেতরে যখন প্রথম ওসব প্রচারকদের দেখছিলাম, তখন মনে হয়েছিল ওরা ভীষণ শক্তিমান লোক, দুনিয়ায় ওরাই বুঝি সেরা মানুষ। ওদের অনেককেই যেতে হয়েছে আদালতে, বন্দী হতে হয়েছে জেলের ভেতরে, তাড়ানো হয়েছে শহর

থেকে, সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে নির্বাসনের দুর্গম পথে চলতে হয়েছে। ওরা সকলেই জীবন কাটাচ্ছে ভয় নিয়ে আত্মগোপনের মধ্যে।

অবশ্য আমি লক্ষ্য করেছি যে ওরা নিজেরা নিকন-পন্থীদের আত্মার পেছনে শিকারী কুকুরের মত তাড়া করার কথা বলে গালমন্দ করত, কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষগুলো আনন্দের সঙ্গে একজন আরেকজনকে তাড়া করত শিকারী কুকুরের মতই।

মদের পাত্র হাতে এলেই কানা পাখোমি তার সত্যিকারের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির গর্ব করতে ভালবাসত। হিব্রু লিপিকারদের যেমন 'তালমুদ' কণ্ঠস্থ, ওরও তেমনি কতকগুলো ধর্মগ্রন্থ ছিল একেবারে 'নখদর্পণে'। ইচ্ছামত বইয়ের যে কোন একটা শব্দের ওপরে আঙুল রেখে সেখান থেকে তার মধুর অনুনাসিক সুরে মুখস্থ বলে যেত। ওর দৃষ্টি থাকত মেঝের ওপরে। আর শুধু একটা চোখ যেন ব্যাকুল ঔৎসুক্যে কি একটা মূল্যবান জিনিষ খুঁজে খুঁজে ফিরত। প্রায় সময়েই ও প্রিনস মীশেৎস্কির 'রুশীয় দ্রাক্ষা' থেকে আবৃত্তি করে ওর প্রতিভার পরিচয় দিত। সাহসী, নির্ভীক শহীদদের চূড়ান্ত ধৈর্য ও অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ নির্যাতন ভোগ'এর কথাটা ওর জানা ছিল সব থেকে বেশি॥ পিওতর ভাসিলিয়েভিচ সব সময়েই ওর ভুল ধরার চেষ্টা করত।

'ভুল! ওটা হয়েছিল পবিত্র আত্মা দেনিসের কালে, পবিত্র কিপরিয়ানের নয়।'

'দেনিস? কে কবে দেনিসের নাম শুনেছে? নামটা হল দিওনিসি।'

'নাম নিয়ে তামাসা করবে না বলে দিলাম!'

'তুমিও আমাকে শেখাতে এসো না!'

একটু বাদেই রেগেমেগে লাল হয়ে রক্তচক্ষু মেলে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলত, 'তুই একটা পেটুক, নির্লজ্জ শুয়োরের নাক। দেখ তাকিয়ে তোর ভুঁড়িটার দিকে!'

যেন অঙ্ক করছে এমনি একটা নির্লিপ্ততায় পাখোমি জবাব দিত, 'আর তুই একটা ছাগল, দুশ্চরিত্র, মাগীর ভেঁড়ুয়া।'

আমার হাতে ভেঙে বড়বাবু শয়তানি হাসি হাসত আর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের এই দুই পণ্ডিতকে তালিম দিত, যেন ওরা স্কুলের ছেলে।

'লেগে যাও! ঠিক আছে।'

একদিন সত্যি সত্যিই মারপিট লেগে গেল বুড়োদের মধ্যে। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ জোরে এক চড় বসিয়ে দিল পাখোমির গালে, আর তাকে বাধ্য করল লড়াই থেকে পালিয়ে যেতে। তারপর ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'দাঁড়া, মজা দেখবিখন—এই পাপ ঠেকবে গিয়ে তোর আত্মায়! আমার হাতটাকে তুই পাপ কাজ করতে বাধ্য করেছিস! ধিক্ তোকে!'

সঙ্গী-সাথীদের তেমন ধর্মবিশ্বাস নেই, ওরা 'নেতিবাদ'এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে বলে তাদের দোষারোপ করে পিওতর ভাসিলিয়েভিচ আনন্দ পেত।

'আলেকজান্দার তোদের মাথা নষ্ট করে দিয়েছে। এসব তারই ফল। ঐ গলাবাজ মোরগটা!'

নেতিবাদের প্রসঙ্গে ও চটে যেত, ভীত হয়ে পড়ত। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হত এতে কোন্ মত প্রচার করা হয় তখন সে তা খুব পষ্ট করে বুঝিয়ে উঠতে পারত না।

'নেতিবাদ হচ্ছে সব থেকে নিচু ধর্মদ্রোহিতা। ওরা ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। একমাত্র মনের অস্তিত্ব বাদে অন্য কিছুই স্বীকার করে না। যেমন কসাক—ওরা মানে শুধু বাইবেল। আর বাইবেল এসেছিল সারাতভের জার্মানদের কাছ থেকে। লুথারের কাছ থেকে। লুথার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যোগ্য নামই হয়েছে লুথার। লুথার কথাটা এসেছে লুসিফার থেকে। লম্পট-লুথার। কামুক-লুথার।' গোটা জার্মান জাতিটাকেই হতভাগ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এসব আসছে ঐ ধর্মদ্রোহীদের কাছ থেকে।'

মাটিতে খোঁড়া পাটা ঠুকে গম্ভীর নির্দয় গলায় বলে যেত, ওদেরই খুঁজে খুঁজে বের করে দেয়া উচিত, উচিত নির্যাতন করা। খোটার সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা। আমাদের নয়। আবহমান কাল থেকে আমরা হচ্ছি রুশ। মজ্জায় মজ্জায় রুশ। আমাদের ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে সাচ্চা, পূর্বী ধর্মবিশ্বাস। আর পশ্চিমের ওরা—ওদের জটিল স্বাধীনচিন্তা যত জার্মানদের আর ফরাসীদের কাছ থেকে—ভাল কি আসতে পারে। একবার অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখ সেই আঠারো শ' বারো সালে…।'

উদ্দীপনার চোটে ভুলেই যেত যে সে এগুলো বলছে নেহাৎ একটা বাচ্চা ছেলের কাছে: শক্ত হাতে আমার কোমরের বেলট্ ধরে কখনো কাছে টেনে, কখনো ঠেলে দিয়ে আকর্ষণীয় যৌবনোচিত উদ্যমে বলে যেত, 'মানুষের জ্ঞান তার নিজেরই তৈরি অলীক কল্পনার জঙ্গলে ঘুরে মরে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে মানব-আত্মা। সেই আত্মাকে অপার নরক যন্ত্রণায় ডোবানর জন্য শয়তানের উস্কানীতে ভুলে ভয়ঙ্কর নেকড়েব মত সে জ্ঞান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবে চিন্তে ওরা কি বের করছে? ঐ শয়তানের দাসেরা? নেতিবাদের কর্তাদের শিক্ষা হল এই: শয়তানও ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খৃষ্টের বড়ভাই। দ্যাখ কাণ্ডখানা! মানুষকে ওরা শেখায় শাসন অমান্য করতে, কাজ বন্ধ করে দিতে, বৌ, ছেলেপুলেদেব ছেড়ে দিতে। মানুষের কাছ থেকে নাকি কিছুই দাবি করার নেই, কোন নিয়মকানুন চলবে না, যার যেমন খুশি তেমনি চলবে বা শয়তান যেমন চালায় তেমনি। কেন ঐ আলেক্‌জান্দারকেই ধর, হতচ্ছাড়া কৃমি কীট…।'

সময়ে সময়ে বড়বাবু আমাকে কাজে ডেকে পাঠাত। বুড়ো তখন শূন্য বারান্দায় একা-একাই ওর চারপাশের শূন্যতাকে লক্ষ্য করে বলে চলত, 'ডানা ছোঁড়া আত্মা। হায়রে অন্ধ কুকুরছানারা, কার কাছে পালিয়ে গিয়ে জায়গা নেব আমি?'

তারপর মাথাটা পেছন দিকে কাত করে হাতদুটো হাঁটুর ওপরে রেখে কঠিন দৃষ্টিতে শীতের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকত।

ক্রমে আমার ওপরে পর মনটা কোমল হয়ে এসেছিল, ও আমার দিকে লক্ষ্য করতে শুরু করল। যখনই আমাকে কোন বই পড়তে দেখত, পিঠ থাবরে বলত, 'পড পড়, পড়ে যা ছেলে, শেষবেলা কাজে লাগবে। মনে হচ্ছে তোর মগজ আছে। কিন্তু তুই যে বড়দের কথা মানিস না সেটাই হচ্ছে সব চাইতে খারাপ। তুই কেন সবার সঙ্গে অমন লাগতে যাস? কিন্তু তার ফলাফল কি দাঁড়াবে জানিস? শেষ পর্যন্ত জেলের বন্দীদের দলে ছাড়া আর কোথাও ভিড়বার স্থান থাকবে না। বুঝলি ছেলে, পড়, বই পড়ে যা, কিন্তু ভুলবিনা—বই শুধু বই-ই। তোকে তোর নিজের মগজ খাটাতে হবে। এক সময় খিলিস্তিদের এক গুরু ছিল। সে

বলত কী পুরনো, কী নতুন কোন বই-ই ভাল নয়। তাই সে সমস্ত বই নিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। এর কোন অর্থ হয় না। তারপর দেখ ঐ আলেক্‌জান্দারকে। সে মানুষের মাথা গুলিয়ে দিয়ে চলেছে…'

বুড়ো ক্রমে ঘন ঘন আলেক্‌জান্দারের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করেছিল। একদিন সে চিন্তিতভাবে দোকানে এসে ঢুকল। কর্কশ কণ্ঠে বড়বাবুকে বলল, 'আলেক্‌জান্দার এই শহরে এসেছে—কালই পৌঁছেছে। সব জায়গায় খুঁজে বেরালাম, কিন্তু এখনো পেলাম না। লুকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ এখানে বসব। হয়ত এখানে আসতেও পারে।'

'আমি ও সবের মধ্যে নেই।' বিদ্বেষমাখা কণ্ঠে বলল বড়বাবু।

বুড়ো মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছিস। তুই চিনিস শুধু খদ্দের আর ব্যবসায়ীদের; তাছাড়া আর কেউই নেই সংসারে। তার চেয়ে এক গ্লাস চা খাওয়া দেখি।'

পেতলের তৈরি চায়ের বড় কেটলিটার গরম জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি ও ছাড়াও দোকানে আরো কিছু অভ্যাগত এসে জুটেছে। একজন হল প্রবীন লুকিয়ান—সে মনের খুশিতে দাঁত বের করে হাসছে। আর দরজার ওপাশে অন্ধকার কোণে বসে রয়েছে একজন অপরিচিত লোক। পায়ে উঁচু-ফেল্‌টের জুতো, গায়ে সবুজ কোমরবন্ধ দেওয়া গরম কোট আর টুপিটা চোখ পর্যন্ত টানা। ওর মুখটা ভাবলেশহীন। মনে হল লোকটি নম্র, বিনয়ী; ওকে দেখাচ্ছিল একটা সদ্যছাটাই হওয়া কর্মচারীর মত, আর সেই বরখাস্ত হওয়ার জন্যেই যেন সে দারুণ বিষন্ন হয়ে রয়েছে।

ওর দিকে না তাকিয়েই দৃঢ় গম্ভীর সুরে কী যেন বলে চলেছে পিওতর ভাসিলিয়েভিচ। আর অপরিচিত লোকটি চঞ্চল আক্ষেপে ডান হাত দিয়ে টুপিটা নাড়াচাড়া করছে। ক্রুশ করার ভঙ্গিতে হাত তুলে ওর টুপিটায় আস্তে একটা ধাক্কা দিল। তারপর আরো একটা। তারপর আবার একটা। ওটা বিশ্রীভাবে মাথার পেছনে দিকে হেলে পড়ল। তারপর আবার ওটাকে উচিয়ে এনে চোখ ঢেকে ভাল করে পরিয়ে দিল। ওর ঐ চঞ্চলতা দেখে আমার সেই বেকুফ ইগোশার কথা, 'পকেটের ভেতরে মৃত্যু'র কথা মনে পড়ে গেল।

'অনেক মাছই আমাদের ঘোলা জলকে আরো নোংরা করেছে।' বলল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ।

কর্মচারীর মত লোকটা ধীরকণ্ঠে বলল, 'আমাকে বলছ?'

'বলেই যদি থাকি তো কি হয়েছে?'

লোকটা তখন আবার তেমনি শান্ত অথচ দৃপ্তকণ্ঠে বলল, 'তাহলে তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে চাও ভাই?'

'আমার নিজের সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য তা শুধু আমি ভগবানের কাছে বলি। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'না হে না, ভাই. ব্যাপারটা আমারও।' বেশ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বিজয়গর্বে বলে উঠল আগন্তুক: 'সত্য হতে মুখ ফিরিয়ো না। কিংবা আত্মভাবে চোখ নষ্ট করে ফেল না। ঈশ্বর আর মানুষের কাজে অনেক পাপ করেছ।'

ও পিওতর ভাসিলিয়েভিচকে যেমন করে ভাই বলে সম্বোধন করল তাতে

আমার খুব ভাল লাগল। ওর শান্ত আত্মপ্রত্যয়ের সুর আমার অন্তরকে বিচলিত করে তুলল। সৎ পুরোহিত যেমন করে বলে 'প্রভু এই মর-মানবের সৃষ্টিকর্তা' তেমনি করেই ও কথা বলছিল। আর বলতে বলতে হাতটা নিজের মুখের কাছে তুলে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছিল চেয়ারের পাশে।

'আমার বিচার করবার তুমি কে? তোমার চাইতে আমি বেশি পাপ করিনি।'

'সামোভারটা কেমন করে হিস্‌হিস্‌ করছে দেখ না!' তীক্ষ্ণ ঠাট্টা করা সুরে বলল বুড়ো শাস্ত্রবাগীশ। কিন্তু আগন্তুক ওর কথায় একটুও মনযোগ না দিয়ে বলতে লাগল, 'শুধু ঈশ্বরই বলতে পারেন কে পবিত্র আত্মার বিশুদ্ধ ঝর্ণাধারার জল কলুষিত করছে। হয়ত সেটা তোমাদেরই অপরাধে—বই-পড়া পণ্ডিতদের পাপে। বই কি বস্তু আমি জানি না, শিক্ষা কাকে বলা হয় তাও না। আমি সহজ সরল জীবন্ত মানুষ।'

'তোমার সরলতার কথা আমার জানা আছে ; এসব কথা অনেক শুনেছি।'

'তোমরাই বই-পড়িয়ে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসীর দল, তোমরাই মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ। সরল চিন্তাকে বিকৃত করে দিচ্ছ। আর আমি, বলতে পার আমি কি প্রচার করি?'

'ধর্মবিরুদ্ধতা!' বলে উঠল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ। কিন্তু আগন্তুক তেমনি মুখের কাছে হাতের চেটোটা খুলে ধরে যেন ওখানে কিছু লেখা আছে এমনভাবে আবেগের সঙ্গে বলে চলল, 'মানুষকে এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচায় সরিয়ে নিয়ে ভাবছ তোমরা তাদের ভাগ্যের উন্নতি করলে? আমি তোমাদের বলছি কখনই তা নয়। আমি তোমাদের বলছি—নিজেকে মুক্ত কর হে মানুষ! বাড়িঘর, স্ত্রী, সম্পত্তি—ঈশ্বরের কাছে তার কতটুকু মূল্য? নিজেকে মুক্ত কর, হে মানুষ—যা কিছুই ডেকে আনে হিংস্রতা, নরহত্যা সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত কর. মুক্ত কর নিজেকে সোনা, রূপো, ঐশ্বর্যের মায়া থেকে। কারণ এগুলো ধুলো মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ মুক্তি পাবে না ; পাবে শুধু স্বর্গের এলাকায়। আমি বলছি, সব কিছুই অস্বীকার কর, যা কিছু তোমাকে এই সংসারে আটকে রেখেছে সে সমস্ত মায়া বন্ধন ভেঙ্গে টুকরো করে ফেল। কারণ, এগুলো হচ্ছে খৃষ্ট-দ্রোহীর সৃষ্টি। এই তিমিরাচ্ছন্ন সংসারকে অস্বীকার করে সুদৃঢ় প্রেরণায় সোজা সংকীর্ণ পথে আমার যাত্রা।'

'অন্ন, জল, গায়ে পরার জামা কাপড়, এগুলোও কি অস্বীকার কর? এগুলোও তো এই পৃথিবীর।' বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলল।

আলেক্‌সান্দার এ কথায় একটুও হতাশ হল না। তেমনি আবেগভরা সুরে বলে চলে। ওর গলার স্বর যখন খাদে নামছে মনে হচ্ছে যেন একটা পেতলের জয়ঢাক গম্‌গম্‌ করছে, 'হে মানুষ! কোথায় তোমার ধন-সম্পদ? একমাত্র ঈশ্বরের মাঝে নিষ্কলুষ হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও। আত্মার চারপাশ থেকে এই সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তোমার ঈশ্বরের দিকে তাকাও। তুমি একা। তিনিও একা। এমনি করেই তোমার ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাও। এই একটিই মাত্র পথ আছে তাঁর কাছে যাবার। জ্ঞানীরা বলেন, বাপ-মা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, যে চোখ তোমাকে প্রলুব্ধ করে সে চোখ উপড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তির অন্বেষণ কর। প্রভুকে পাবার জন্য তোমার সমস্ত হীন সত্তা ধ্বংস করে ফেল। শুধু আত্মাকে জাগিয়ে রাখ। যাতে স্বর্গীয় প্রেম ভালবাসায় অনন্তকালের জন্য তোমার আত্মা চির উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

'দূর দূর, নরকে যা,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ, 'ভেবেছিলাম গত বছরের চাইতেও এবারে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি অন্তত কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু দেখছি আগের চাইতেও অবস্থা খারাপ।'

বুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আলেক্জান্দার কেমন যেন একটু চিন্তিত হয়ে উঠল। কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চলে যাচ্ছ? সে কী?'

কিন্তু বিনয়ী লুকিয়ান চোখ টিপে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

কিন্তু আলেক্জান্দার একেবারে তেড়ে উঠল ওর ওপরে, 'তুমিও তাই এই সংসারের বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ, আগাছার বাঁধ গেথে চলেছে। এর মানেটা কি? দুবার গাওয়া হেল্লিলুঝা—তিনবার গাওয়া।'

ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করে নীরবে একটু হেসে লুকিয়ানও বাইরে বারান্দার দিকে চলে গেল। আর সে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসভরা সুরে বলল, 'আমার আত্মার জোর ওরা সহ্য করতে পারল না, সহ্য করতে পারল না। আগুন থেকে যেমন ধোঁয়া সরে সরে যায় তেমনি করে ওরা পালিয়ে গেল।'

বড়বাবু চোখ উচিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তারপর শুষ্ক সুরে বলল, 'ওসব ব্যাপারে আমি মাথা গলাই না।'

আগন্তুক যেন চমকে উঠল ওর কথা শুনে। টুপি খুলে রেখে বিড়বিড় করে বলল, 'মাথা না লাগিয়ে পারবে কি করে? এসব নিয়ে যে তোমাকে ভাবতেই হবে। সেটাই ওদের নিজস্ব দাবি।'

লোকটি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ মাথা হেট করে বসে রইল। তারপর বুড়োরা ডাক দিতেই বিদায় সম্ভাষণটুকু পর্যন্ত না জানিয়েই তিনজনে বেরিয়ে গেল।

এই লোকটিকে আমার মনে হল যেন অন্ধকার রাত্রিতে হু হু করে জ্বলে ওঠা একটা আগুনের মত এসে হঠাৎ আমার চোখের সামনে দাঁড়াল। একবার জ্বলছে, আবার নিভছে; আর পার্থিব সবকিছু সম্পর্কে তার এই অস্বীকৃতির মধ্যে যেন একটা সত্য আছে। সে সত্য আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

এক সন্ধ্যাবেলা সুযোগ পেয়ে আমাদের কারখানার বড় ওস্তাদ ইভান লারিওনোভিচের কাছে খুব উৎসাহের সঙ্গেই ও কথা বললাম। অত্যন্ত শান্ত বিষয়ী ধরণের মানুষ ইভান লারিওনোভিচ। আমার সব কথা শুনে সে বলল, 'নিশ্চয়ই 'পলাতক'দের কেউ—ওটা একটা সম্প্রদায়। ওরা কোন কিছুই মেনে নেয় না।'

'বাঁচে কী করে ওরা?'

'ঘুরে ঘুরে—বিশ্বময় ঘুরে বেড়ায়। তাই ওদের বলা হয় 'পলাতক'। ওরা বলে পৃথিবী আর পৃথিবীর সব কিছুর মায়াই ত্যাগ করতে হবে। সেই জন্যই পুলিশ ওদের বিপদজনক বলে খুঁজে বেড়ায়।

আমার জীবনটাই বেশ ভাল রকমের তেতো। তবুও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলামনা কিভাবে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ত্যাগ করা সম্ভব। সে সময়ে আমার আশে-পাশের জীবনের ভেতরে এমন অনেককিছুই দেখতে পেতাম যা প্রিয়, যা আকর্ষণীয়। কদিনের মধ্যেই আলেক্জান্দারের কথা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেল।

কিন্তু কোন কোন দুঃখের মুহূর্তে বনের দিকের সংকীর্ণ ধোঁয়াটে কাটা পথ ধরে পায়ে হেঁটে তার মূর্তি এসে হাজির হত আমার মানসপটে। কাজ করে যে হাত নোংরা হয়নি এমন ধবধবে পরিষ্কার হাতে সে মূর্তি অস্থিরভাবে লাঠিতে ভর দিত। আর বিড়বিড় করে বলত, 'সরল সংকীর্ণ পথে আমার যাত্রা, সবকিছুই আমি পরিত্যাগ করেছি। সমস্ত বাধা চূর্ণ করে ফেল, সব বাধা।'

ওরই পাশে দেখতে পেতাম আমার বাবাকেও, যে-মূর্তিতে এসে তিনি আমার দিদিমাকে স্বপ্নে দেখা দিতেন। হাতে একটা বীচ গাছের লাঠি, ডোরা কাটা একটা কুকুর তার লকলকে জিভ বের করে চলেছে তাঁর পেছনে পেছন।

তেরো

অর্ধেক পাথরে গড়া একটা বাড়ির দুখানা ঘর নিয়ে ছিল মূর্তির কারখানা। একটা ঘরের তিনটে জানলা বারান্দার দিকে, আর দুটো বাগানের দিকে। অন্য ঘরটার একটা জানলা বাগানের দিকে, অন্যটা রাস্তার দিকে। জানলাগুলো ছিল ছোট ছোট চৌকোনা ধরনের, জানলার কাঁচ অত্যন্ত পুরনো হয়ে সাত-রঙা রামধনুর মত হয়ে উঠেছিল। শীতের ক্ষীয়মান অনুজ্জ্বল আলোর রেখা তাতে প্রায় ঢুকতেই পেত না।

দুটো ঘরই টেবিল দিয়ে ঠাসা। প্রত্যেক টেবিলে একজন কি দুজন মূর্তি-পটুয়া মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ছাদ থেকে দড়ির সঙ্গে বেঁধে জলভরা কাঁচের বল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে করে বাতির আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠাণ্ডা শাদা আলো এসে মূর্তির চৌকো বোর্ডের ওপরে পড়ে।

কারখানার ভেতরটায় গরম ও গুমোট ভাব। পালেখ, খোলুই, মস্তেরা থেকে প্রায় কুড়িজন 'ঈশ্বর পটুয়া' এসে এখানে মিলেছে। সবার গায়েই সুতোর সার্ট। গলা নগ্ন। পরনে মোটা কাপড়ের পায়জামা। হয় পায়ে জুতো নেই, থাকলেও তা অত্যন্ত মলিন। পটুয়াদের মাথাগুলো কড়া তামাকের ধূসর ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন। তিসির তেল, বার্ণিশ আর পচা ডিমের গন্ধে বাতাস ভরাট। তার সঙ্গে দগদগে আলকাতরার মত ঘন স্রোতে বইত একটা ভ্লাদিমির সঙ্গীত:

'হায় হায় হায়—লজ্জা তোদের নাই।
ছেলেটাকে দিলি ছেড়ে মেয়ে ভোলাতে।'

অন্যসব গানও ওরা গাইত। সেগুলোও এমনি বিরক্তিকর কিন্তু ওটাই ছিল ওদের সবার চাইতে প্রিয়। গানটার একটানা সুর কারোর ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করত না, কোন অসুবিধাই হত না উদ্‌বেড়ালের লোমের তৈরি তুলির টানে রেখা আঁকতে, সাধুদের পোশাকের ভাঁজে রঙ লাগাতে কিংবা সাধুদের হাড়-বের-করা মুখে দুঃখ ভোগের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়ে তুলতে। জানলা দিয়ে খোদাইকরা গোগলেভের হাতুড়ি চালানোর ঠক্‌ঠক্ শব্দ ভেসে আসত। গোগলেভ বুড়ো, মাতাল। ওর নাকটা বিরাট আর টক্‌টকে লাল। হাতুড়ির তীক্ষ্ণ শব্দ সেই অলস ধীর সঙ্গীতের স্রোতকে ছিন্নভিন্ন করত। মনে হত একটা পোকা যেন গাছের গুঁড়ির ভেতর খুঁটে খুঁটে গর্ত করে চলেছে।

মূর্তি-চিত্রণের ব্যাপারে কারুরই কিছু উৎসাহ ছিল না। কবে কোন এক দুষ্ট সরস্বতী বাঁধা ধরা প্রক্রিয়ায় ভাগ করে রেখেছে সমস্ত কাজটাকে। তার কোনটার ভেতরে কোন সৌন্দর্য ছিল না। তাই ঐ কাজের প্রতি ভালবাসা বা উৎসাহ

জন্মে ওঠা ছিল অসম্ভব। টেরা-চোখের ছুতোর মিস্ত্রি পানফিল ছিল ছোট মনের হিংসুটে ধরণের একটা লোক। সাইপ্রাস্ আর লিণ্ডেন কাঠের তক্তা শিরীশ দিয়ে সে সমান করে নিয়ে আসত। ক্ষয়-রোগী ছোকরা দাভিদভ তার ভিত তৈরি করত। তার বন্ধু সোরোকিন তক্তাগুলোকে সোনালী রঙ লাগাবার জন্য তৈরি করে তুলত। কোন একটা আসল ছবি দেখে মিলিয়াশিন তার ওপরে পেনসিল দিয়ে নকল করত দেবীর মূর্তি। বুড়ো গোগলেভ তাতে সোনালী কাজ করে কারুকার্য ফুটিয়ে তুলত। পটভূমি আঁকিয়েরা ছবি আর সাধুদের কাপড়-চোপড় আঁকত। এরপর মূর্তিটাকে খাঁড়া করে রাখা হত দেয়ালে—মুণ্ডুহীন, হাতহীন অবস্থায়; সেটা আঁকার দায়িত্ব মুখ-আঁকিয়েদের।

একটা বড় মূর্তি, যেটা নাকি বেদী বা দরজার চৌকাঠের সামনে বসাবার জন্য তৈরি হচ্ছে সেটাকে হাত, পা আর মাথাহীন কেবল দেবদূতের পোশাক বা কোর্তায় দারুন বিশ্রী লাগত দেখতে। ঐ উজ্জ্বল রঙে আঁকা বোর্ডগুলোর ভেতর থেকে মৃত্যুর আভাস ফুটে উঠত। যে জীবন ওদের প্রাণময় করে তুলবে তা এখনো আসেনি ঠিক, কিন্তু দেখে মনে হত যেন সে জীবন এক সময়ে ছিল, তারপর কাপড়চোপড়ের ভার ফেলে রেখে রহস্যজনকভাবে পালিয়ে গেছে তা।

মুখ-আঁকিয়েদের কাজ সমাধা হলে পরে সেটা যেত একজন কারিগরের কাছে। সে চার পাশের সোনালী কারুকার্যের ওপরে এনামেল করত। বাণীগুলোও লেখান হত একজন বিশেষ অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে। তারপর সেই মূর্তির ওপরে ইভান লারিওনিচ নিজের হাতে লাক্ষার বার্ণিশ লাগাত। শান্ত শিষ্ট লোক ইভান লারিওনিচ, কারখানার ম্যানেজার।

ধূসর মুখ, চোখ, রেশমী সূক্ষ্ম দাড়ি। মনে হত যেন বিশেষভাবে গভীর ব্যথাতুর। অমায়িকভাবে হাসত। কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হত ওর হাসির উত্তরে হেসে ওঠা অন্যায়। ওকে দেখতে লাগত ঠিক যেন মূর্তির পিলারের সিমেওন স্তোল্পনিকের মত—তেমনি রুগ্ন দেহ, শীর্ণ। দুটো চোখের স্থির শান্ত দৃষ্টি তেমনি ভাব-গম্ভীর, মানুষ, দেয়াল সব পেরিয়ে তেমনি সুদূরের দিকে নিবদ্ধ।

আমার কারখানায় ভর্তি হবার কদিন পরে কারখানার ধ্বজাপটুয়া, সুন্দর চেহারার শক্ত-সমর্থ এক দন-কসাক কাপেনদ্যুখিন মাতাল অবস্থায় কাজে এল। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নারীসুলভ সুন্দর চোখদুটো কুঁচকে নীরবে প্রত্যেককে তার লোহার মত শক্ত মুঠো দিয়ে ঘুষি মারতে আরম্ভ করল। ওর নমনীয় ক্ষিপ্র দেহটা যা তেমন বড় নয়, ইঁদুরভরা গুদামঘরে বেড়াল যেমন ঝাঁপিয়ে বেড়ায় তেমনি কারখানাময় ছোটাছুটি করতে লাগল। লোকগুলো হতবাক হয়ে কোণের দিকে ছুটে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মার বেটাকে মার!'

মুখ-আঁকিয়ে ইয়েভগেনি সিতানভ একটা টুল নিয়ে ওর মাথায় এক ঘা বসিয়ে ওর তর্জন গর্জন থামিয়ে দিল। মেঝের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কসাক। মুহূর্তের মধ্যে সকলে মিলে ওকে তোয়ালে দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল। তখন ও বাঘের মত দাঁত দিয়ে সে বাঁধন কামড়ে ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। এতে ইয়েভগেনি গেল আরো খেপে। সে লাফিয়ে একটা টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুটো কনুই দুপাশে চেপে ধরে কসাকের গায়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত

হল। ওর দেহের প্রবল ভারে নিশ্চয়ই কাপেনদ্যুখিনের বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে যেত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোট আর টুপি পরা লারিওনিচ এসে পড়ল। সিতানভের দিকে আঙ্গুল তুলে হুমকি দিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে ধীর গলায় বলল, 'ওকে বাইরে নিয়ে যা। নেশা কাটতে দে।'

ওরা কসাককে টেনে হিঁচড়ে কারখানা থেকে বের করে গেটের সামনে নিয়ে গেল। তারপর টেবিল চেয়ার গোছগাছ করে যে যার কাজে লেগে গেল। আর সেই সঙ্গে ওরা আলোচনা করতে লাগল কাপেনদ্যুখিনের গায়ের জোর নিয়ে, আর ভবিষ্যৎবাণী করল যে এমনি মারপিট করেই একদিন ও শেষ হয়ে যাবে।

'ওকে খতম করা খুবই শক্ত।' কোন ব্যাপারে ধারণা থাকলে লোকে যেমন ভাবে বলে তেমন শান্ত কণ্ঠে বলল সিতানভ।

আমি লারিওনোভিচের মুখের দিকে তাকালাম। ভাবছিলাম কী ভাবে এই জোয়ান যথেচ্ছাচারী লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ওর কথার অমন অনুগত হয়ে পড়ে। ও সবাইকে শিখিয়ে দিত কেমন করে কাজ করতে হয়। এমন কি সব থেকে সুদক্ষ শিল্পী যারা তারাও স্বেচ্ছায় ওর পরামর্শ চাইত। কিন্তু ওর সবথেকে বেশি সময় ও কথা ব্যয় হত কাপেনদ্যুখিনকে শেখাতে।

'শিল্পী, বুঝলে কাপেনদ্যুখিন, তুমি হলে শিল্পী! শিল্পী তার কাজকে করে তুলবে প্রাণময়—ইতালিয়ান ধরণের। চড়া টোনের সামঞ্জস্য আসা চাই তৈল চিত্রে। কিন্তু দেখ দেখি কতখানি শাদা রঙ দিয়েছ এখানে, তাই কুমারী মাতার চোখদুটো ভাবলেশহীন হয়ে গেছে। গাল দুটো গোল আর লাল, কিন্তু চোখদুটো ঠিক ঘামায়নি। বসানও হয়নি ঠিক স্থানে। একটা নাকের খুব কাছে আর একটা উঠে গেছে কপালের দিকে। মুখটা ঈশ্বরীয় ভাবসম্পন্ন হয়নি, হয়েছে ধূর্ত, পার্থিব মুখ। তুমি তোমার কাজে ভাল করে মন দাও না কাপেনদ্যুখিন।

চোখ মুখ কুঁচকে কসাক শুনত ওর কথা। পরমুহূর্তে ওর নারীসুলভ দুটো-চোখে নির্লজ্জ হাসিতে ফুটে উঠত। মাত্রাধিক পানের ফলে একটু ভাঙাভাঙা স্বরে বলত, 'বুঝলে ইভান লারিওনোভিচ, আমার দ্বারা এসব হবার নয়! আমি গান বাঁধার জন্যে জন্মেছিলাম আর এসে উঠেছি কি না একটা মঠে!'

'খুব ভাল করে চেষ্টা করলে যে কোন ব্যাপারেই দক্ষতা অর্জন করা যায়।'

'এ সব কাজ কি আমাকে মানায়? তেজী তিন ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান হওয়া উচিত ছিল আমার।'

তারপর মুখটা যতখানি সম্ভব হাঁ করে খুলে অদম্য সুরে গেয়ে উঠত:

'এ এ এ—বাদামী দুই ঘোড়া আর তামাটে একখানা
ট্রইকাসে জুতে
ঝকমকে বরফ বায়ুতে চলব ছুটে প্রিয়ার কাছে—দূরে।
রয়েছে সে বহুদূরে।'

ইভান লারিওনোভিচ হার মেনে হেসে ফেলত। তারপর চশমাটা ম্লান ধূসর নাকের ওপরে ঠিকমত বসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। সাথে সাথে ডজনখানেক গলা গেয়ে উঠত এক সঙ্গে। মিলিত কণ্ঠের সুরে এমন এক শক্তিশালী সুরধারার উদ্ভব হত যে মনে হত যেন গোটা কারখানাটাকেই শূন্যে তুলে আলতোভাবে দোলা দিয়ে চলেছে।

'ভালোই জানে ঘোড়াগুলো পথের নিশানা
প্রিয়তমা থাকে যেথায়।'

শিক্ষানবীশ পাশকা ওদিনৎসভ ডিমের কুসুম ছাড়াবার কাজ থামিয়ে দুহাতে দুটো ডিমের খোলা নিয়েই সুন্দর চড়া সুরে ওদের সঙ্গে গলা মেলাত।

সুরের ঘোরে মত্ত হয়ে ওরা সব ভুলে যেত। একই তালে ওদের নিঃশ্বাস বইত, একটা আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠত সবগুলো বুক। কসাকের মুখের ওপরে গিয়ে পড়ত সবার দৃষ্টি। সে সময় সেই কারখানার মালিক হয়ে উঠত সর্বেসর্বা। ওর হাতের প্রত্যেকটা ভঙ্গির অনুসরণে ওরাও হাত নাড়ত। কসাকের হাত নাড়া দেখে মনে হত যেন সে এক্ষুণি উড়ে চলে যাবে। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যদি হঠাৎ গান বন্ধ করে কসাক সে সময়ে চিৎকার করে বলে উঠত, 'এস ভাই, এস, আমরা সবকিছু ভেঙে দুমড়ে ফেলে দিই!' তবে তৎক্ষণাৎ সবাই, মায় সব থেকে দক্ষ সম্মানিত ওস্তাদরা পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোটা কারখানাটাকে একটা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করে ফেলত।

কাপেনদ্যুখিন খুবই কম গান করত। কিন্তু যখনই গাইত ওর উত্তাল সঙ্গীত থেকে যেন এক সর্বজয়ী অদম্য শক্তি ঝরে পড়ত। কারো অন্তর যতই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, ও এমনভাবে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করত যে তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে, সবার শক্তি এক করে মিলিয়ে একটিমাত্র অব্যর্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

এই সব গান শুনে গায়কের ওপর আমার হিংসে হত, লোকের ওপর ও যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারত, তারজন্য ঈর্ষা বোধ করতাম আমি। বিস্ময়ে, কল্পনায় আমার অন্তর ভরে উঠত। ফুলে ফেঁপে উঠত প্রায় যন্ত্রণার সীমা পর্যন্ত। কান্না আসত। যারা গাইছে সাধ হত তাদেরকে ডেকে চিৎকার করে বলি, 'কত ভালবাসি আমি তোমাদের সকলকে!'

হলদে ধূসর, সর্বশরীরে লোমভরা ক্ষয়-রোগী দাভিদভ পর্যন্ত সদ্য ডিম-ফোটা দাঁড়কাকের ছানার মত মুখ ফাঁক করে থাকত।

কিন্তু এরকম উত্তাল ফূর্তির গান গাইত কেবল কসাকটা। সাধারণত পটুয়ারা ব্যথার গান গাইত—একটানা করুণ। যেমন 'কঠিন মানব হৃদয়' 'হায় বনের ভেতর দিয়ে, ছোট বন' অথবা প্রথম আলেক্‌জান্দারের মৃত্যুর গান 'কেমন করে এসেছিলেন মোদের আলেক্‌জান্দার, দেখতে তার বীর সেনানীর দল।'

আমাদের কারখানার সেরা মুখ-আঁকিয়ে ঝিখারেভের কথা মত কখনো কখনো ওরা গির্জের গান গাইবার চেষ্টা করত। কদাচিৎ সে চেষ্টা সার্থক হত। ঝিখারেভ এমন ঐক্যতান শুনতে চাইত যেটা কেবলমাত্র সে নিজে ছাড়া আর কেউই বুঝে উঠতে পারত না। সে অনবরত অন্যের গানের সমালোচনা করত।

রোগা পটকা লোক ঝিখারেভ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। টাক পড়া মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে কোঁকড়া চুল জিপসিদের মত। গোঁফের মত চওড়া কালো ভ্রূ। ওর ঘন রঙের অরুশীয় সুন্দর মুখের চেহারার সঙ্গে ঘন সুঁচলো দাড়ি সত্যিই একটা অলঙ্কার বিশেষ ছিল। কিন্তু অমন চওড়া ভুরুর জন্য তার বাঁকান নাকের নিচে ঝুলন্ত গোঁফজোড়া নিতান্তই অবান্তর লাগত। ওর নীল চোখদুটোর ভেতরে সমতা ছিল না—বাঁ চোখটা ডানটার তুলনায় খানিকটা বড় ছিল।

'পাশ্‌কা!' আমারই সঙ্গি শিক্ষানবীশকে ও গলা ছেড়ে ডাকত, 'শুরু কর, 'তোমার নাম গাই।' শোন সকলে।'

এপ্রোনে হাত মুছে পাশ্‌কা শুরু করত, 'তোমার নাম ।'

'প্রভুর নামে,' বহু কণ্ঠে গান উঠত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে খেকিয়ে উঠত ঝিখারেভ, 'ও জায়গাটা খাদে ধর ইয়েভগেনি! স্বরটাকে অন্তরের অতলে নামিয়ে দে।'

এমন সুর বের করত সিতানভ যে মনে হত যেন ও পিপের তলায় পিটছে, 'প্রভুর ক্রীতদাস...।'

'আরে ছোঃ, ওভাবে নয়। এমনভাবে গলা ছাড়তে হবে যাতে মাটি কেঁপে উঠবে, দরজা জানলা নিজের থেকেই খুলে যাবে।'

কী এক দুর্বোধ্য উত্তেজনায় বেঁকে বেঁকে উঠত ঝিখারেভের সমস্ত শরীর। অদ্ভুত ভ্রূ জোড়া একবার উঠত, একবার নামত। গলার স্বর ভেঙ্গে যেত। যেন এক অদৃশ্য তারের ওপর হাতের আঙ্গুলগুলো খেলা করত।

'প্রভুর দাসানুদাসেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?' অর্থপূর্ণভাবে প্রশ্ন রাখত ঝিখারেভ, 'খোলোস ছাড়িয়ে সোজা মর্ম কথাটা অনুভব করতে হবে। ওরে অধম দাসেরা, প্রভুর গুণ গাও। তোমরা অনুভব করতে পারছ না, ভাল মানুষেরা?'

'জানেনই তো, ঠিক ওখানটায় আমরা পেঁছিতে পারি না।' চতুরতার সঙ্গে বলত সিতানভ।

'ঠিক আছে, তাহলে ছেড়ে দাও!'

কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে গিয়ে ঝিখারেভ কাজ করতে লাগত। ও হল এখানকার সেরা ওস্তাদ। কি বাইজান্টাইন, কি ফ্রইয়াঝস্কি, কি ইতালিয়ান রীতি অনুযায়ী সে মুখ আঁকতে পারত। বেদীর ওপরে বসাবার জন্য লারিওনিচ যখনই কোন মূর্তির বায়না নিত তখনই সে আলোচনা করত ঝিখারেভের সঙ্গে। মূল চিত্রের শিল্পকলার সূক্ষ্ম বিচারে ঝিখারেভ ছিল সুনিপুণ অঘটনঘটন-পটিয়সী মূর্তির, যেমন ফিওদোরভ, স্মোলেনস্ক, কাজানের কুমারীমাতার মূল্যবান সব নকল তৈরী হত ওর হাতেই। কিন্তু মূল চিত্রগুলো ভাল করে দেখতে দেখতে সরবে অভিযোগ করত ঝিখারেভ, 'মূল ছবিগুলোর সঙ্গে আমাদের হাত পা বাঁধা, হাত পা বাঁধা একেবারে!'

পদমর্যাদায় কারখানার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও ঝিখারেভ ছিল সব চাইতে বেশি বিনয়ী। সবচাইতে বেশি আন্তরিক ব্যবহার করত ও শিক্ষানবীশদের সঙ্গে, পাভেল আর আমার সঙ্গে। শিল্পকলা শেখাবার ব্যাপারে যেটুকু সদিচ্ছা লক্ষ্য করেছি তা কেবল ওর মধ্যেই।

ওকে বুঝে ওঠা ছিল খুবই দুষ্কর। তেমন হাসি-খুশি মানুষ ছিল না ও। কখনো কখনো একটানা সপ্তাহখানেক বোবা কালার মত মুখ বুজে কাজ করে যেত। বিস্ময়ভরা অপরিচিতভাবে সবার দিকে তাকাত। যেন এই প্রথম সে আমাদের দেখল। গান খুব ভালবাসলেও এই সময়টা কিন্তু সে চুপচাপ থাকত। মনে হত অন্যের গানও যেন তার কানে ঢুকছে না। সবাই ওকে দেখত তাকিয়ে তাকিয়ে আর আড়ালে চোখ টেপাটিপি করত। মূর্তির বোর্ডটার একদিক হাঁটুর ওপরে রেখে আর অন্যদিক টেবিলের কিনারে লাগিয়ে সে পরম যত্নে তার সরু তুলির

আঁচড়ে কাজ করত। আর এঁকে চলত এমন একখানা মুখ যা ওর নিজের মুখেরই মত কালো আর অপরিচিত।

মাঝে মাঝে আচমকা আহত কণ্ঠে ছোট্ট করে বলে উঠত, 'প্রেদ্‌তেচা' তার মানে কি ? প্রাচীন স্লাভনিক ভাষায় 'তেচ্‌' অর্থাৎ যাওয়া আর 'প্রেদ' হচ্ছে আগে। সুতরাং 'প্রেদ্‌তেচা' মানে 'যে আগে যায়।' অর্থাৎ অগ্রদূত, এর বেশি কিছু নয়।'

সকলেই নীরবে হাসত আর আড়চোখে তাকাত ওর দিকে। আর ওর আশ্চর্য কথাগুলো ঝঙ্কৃত হতে থাকত সেই নীরবতার মধ্যেই, 'ভেড়ার চামড়ার পোশাক থাকা উচিত নয়, ওঁর গায়ে থাকা উচিত ডানা।'

'এই, কার সঙ্গে কথা বলছ ?' হয়ত কেউ জিজ্ঞেস করত।

কিন্তু সে কোন উত্তর দিত না। প্রশ্নটা হয়ত শুনতেই পেত না, কিংবা ইচ্ছে করেই উত্তর দিত না। তারপর অপেক্ষমান নীরবতার মধ্য দিয়ে ফের শোনা যেত ওর কথা, 'তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত জানা উচিত, কিন্তু কেইবা তা জানে, কে জানে ঐ সকল পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থের কথা ? আমরা কি জানি ? বেঁচে আছি—ডানা খসে গেছে···আত্মা কোথায় ? কোথায় আত্মা ? সেই কথাই আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। আমাদের কাছে মূল ছবি আছে সত্যি কথা, কিন্তু প্রাণ নেই।'

ওর ঐ সব সরব চিন্তায় সবার ঠোঁটেই হাসি জেগে উঠত। হাসত না কেবল সিতানভ। প্রতিবারই প্রায় কেউ না কেউ বিদ্রূপ করে বলত, 'দেখিস শনিবারে ও ঠিক মদের আড্ডায় যাবে।'

লম্বা পেশীবহুল দেহ, বাইশ বছরের তরুণ সিতানভ। দাড়িগোঁফহীন গোল মুখ, এমন কি ভ্রূ পর্যন্ত নেই! গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে কোণের দিকে তাকিয়ে থাকত।

মনে আছে ঝিখারেভ একদিন ফিওদোরভ-কুমারীর ছবিটা শেষ করে টেবিলের ওপরে রেখে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'শেষ হল, পুণ্যবতী জননী, অতল পানপাত্র, যার ভেতরে মানুষের হৃদয় নিংড়ান অশ্রুধারা এসে ঝরে পড়বে।'

তারপর কার একটা কোট কাঁধের ওপরে ফেলে বেরিয়ে গেল—সরাইখানার উদ্দেশ্যে। তরুণেরা হেসে উঠে শিস দিতে লাগল। বৃদ্ধরা ঈর্ষাকাতর বুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু সিতানভ মূর্তিটার সামনে গিয়ে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে বলল, 'মদ খাবেই তো। ছবিটা অন্য কেউ নিয়ে যাবে এই দুঃখে খাবেই তো মদ। এ জিনিস সকলে বুঝে উঠতে পারে না।'

ঝিখারেভের মদের তোড সাধারণত শনিবার শুরু হত। এটা সাধারণ মদখোর শ্রমিকদের একটু বেশি মদ খাওয়ার ব্যাপার নয়। ঝিখারেভের মদ শুরু হত এই রকম : সকাল বেলা একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিত পাভেলের হাত দিয়ে। তারপর দুপুরের খাওয়ার একটু আগে লারিওনিচকে গিয়ে বলত, 'আমি আজ স্নানের ঘরে যাব।'

'অনেক দিনের জন্যে ?'

'মানে, এখন।'

'মঙ্গলবারের বেশি দেরি কোর না যেন!'

ভ্রূ নাচিয়ে আর টেকো মাথা দুলিয়ে রাজি হত ঝিখারেভ।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পোশাক পরে ফুলবাবুর মত সেজেগুজে নিত ঝিখারেভ। সার্ট-ফ্রন্ট আর গলাবন্ধ কোট পরত। একটা লম্বা রূপোর চেন ঝোলাত

সিল্কের ওয়েস্ট কোটের পকেটে। তারপর পাভেলকে আর আমাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে যেত, 'আজ সন্ধ্যায় কারখানাটা একটু যত্ন নিয়ে ভাল মত সাফ করে রাখিস। লম্বা টেবিলগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করিস।'

সবার মধ্যে হঠাৎ ছুটির দিনের মেজাজ দেখা দিত। আঁকিয়েরা তাড়াতাড়ি তাদের টেবিল গুছিয়ে স্নানের ঘরের দিকে ছুটত। ফিরে নাকে মুখে গুজে সেরে নিত. সন্ধ্যার খাওয়া। ঝিখারেভ ফিরে আসত বিয়ার, মদ, আর খাবার নিয়ে। ওর পেছনে পেছনে আসত একটি স্ত্রীলোক! এমন বিশাল চেহারা যে দেখলে দানবী বলে মনে হয়। ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বায়। ফলে আমাদের সমস্ত চেয়ার-টুলগুলোকে ওর কাছে খেলনার মত দেখাত। এমন কি লম্বা সিতানভকে পর্যন্ত ওর তুলনায় দেখাত যেন নেহাৎ একটা বাচ্চা। স্ত্রীলোকটির দেহ সুগঠিত, কিন্তু স্তনদুটো উঁচু করে থুতনীর কাছ পর্যন্ত ঠেলে তুলে দেয়া। হাঁটা চলার ভঙ্গি ধীর, স্থূল। যদিও স্ত্রীলোকটির বয়েস চল্লিশের ওপরে তবু ওর ঘোড়ার মত বড়বড় দুটো চোখ সমেত ভাবলেশহীন গোল মুখখানা তখনো তাজা আর মসৃণ! ছোট মুখখানা যেন কম দামের পুতুলের মত রঙ করা। হেসে হেসে সকলের দিকে তার চওড়া উষ্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অনাবশ্যক মন্তব্য করে যেত স্ত্রীলোকটি, 'কেমন আছ? বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। তোমাদের ঘরটায় কি গন্ধ। বোধহয় রঙের গন্ধ। কেমন আছ?'

বেশ দেখতে লাগত ওকে। এমন সবল প্রশান্ত চেহারা—ঠিক যেন একটা চওড়া বেগবতী নদী। কিন্তু যখন কথা বলত তখনই বিরক্তিকর বোধ হত। কেবল বোকা বোকা অবান্তর কথা বলত। কোন কিছু বলার আগে লাল গাল দুটো ফুলিয়ে মুখখানা আরো গোল মত করে তুলত।

তরুণেরা খিলখিল করে হাসত আর একজন আরেকজনকে কানাকানি করত, 'লাল বটে এখানা!'

'গোটা একখানা গির্জের চূড়া!'

ঠোঁটদুটো ফাঁক করে আর বুকের নিচে হাত দুখানা রেখে গিয়ে বসত সামোভারের পেছনের টেবিলে। আর সেখান থেকে তার নিরীহ গোছের ঘোড়ার মত চোখ মেলে এক এক করে সবার দিকে তাকাত।

সবাই ওর সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করত। ছোকরারা তো ওর সম্মানে ভয়ে ভয়ে উঠেই দাঁড়াত। হয়ত কোন ছোকরা ওর বিশাল দেহটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর সর্বগ্রাসী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হত তখনি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথা নোয়াত। ঝিখারেভও ওকে সমাদর করত খুব। ওকে আপনি আপনি করে সম্বোধন করত। ডাকত 'পড়শী' বলে। আর যখনি টেবিল থেকে কোন জিনিস দিত ওকে তখনই সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নোয়াত।

'না, না, অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই আমার জন্য,' মিষ্টি সুরে টেনে টেনে বলত মেয়েটা, 'সত্যি, কি কষ্টটাই না দিচ্ছি!'

কোন কিছুতেই যেন ওর কোন ব্যস্ততা ছিল না। ওর হাতদুটো কনুইয়ের কাছ থেকে নিচু পর্যন্ত নড়ত শুধু। আর পাজরার সঙ্গে কনুই দুটো চেপে ধরে রাখত। টাটকা সেঁকা রুটির গন্ধ উঠে আসত ওর বিশাল দেহটা থেকে।

বুড়ো গোগলেভ আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে ওর অগাধ স্তুতি করে যেত। আর গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে শুনে যেত তার প্রশস্তি। যেন এক গির্জের পুরুত

উপাসনার বাণী পড়ে চলেছে। বলতে বলতে গোগলেভ যখন কথার খেই হারাত তখন শুরু করত তার নিজের কথা বলতে, 'বয়েসকালে আমি খুব একটা সুন্দরী ছিলাম না। রূপ খুলতে আরম্ভ করল মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ত্রিশ বছর বয়সে এমন সুন্দরী হয়ে উঠলাম যে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত দেখতে শুরু করল, নজর দিল। সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক একবার তো একটা গাড়ি আর ঘোড়া দিতে চেয়েছিলেন…।'

কাপেনস্থ্যখিন এরমধ্যেই মাতাল হয়ে পড়েছে। উডোউডো চেহারা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, 'কিসের বদলে?'

'নিশ্চয় আমার ভালবাসার বদলেই।' অভ্যাগতা ব্যাখ্যা করল।

'ভালবাসা,' কেমন যেন একটু বিপন্নভাবেই বিড়বিড় করে উঠল কাপেনস্থ্যখিন, 'ভালবাসার মানেটা কি?'

'আপনার মত সুপুরুষের কাছে ভালবাসার ব্যাপারটার সবকিছুই নিশ্চয় জানা।' সাবলীলভাবেই জবাব দিল স্ত্রীলোকটি।

দমকা হাসির চোটে গোটা কারখানাটাই কেঁপে উঠল। আর সিতানভ কাপেনস্থ্যখিনের কানের কাছে হিস্‌হিস্ করে বলে উঠল, 'নিরেট বোকা মেয়েছেলেটা, বোকারও অধম। ওর মত একটা মেয়েমানুষের প্রেমে পড়া নিতান্তই একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, সন্দেহ নেই।'

মদের ঘোরে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চতুর চোখে হুশিয়ারি আলো দেখা যাচ্ছে। বিশ্রী নাকটা নেড়ে হাতের আঙ্গুলে ফুলো ফুলো চোখ দুটো মুছে জিজ্ঞেস করল বুড়ো গোগলেভ, 'কটা সন্তান হয়েছিল তোমার?'

'মাত্র একটা।'

টেবিলের ওপরে একটা বাতি জ্বলছে, আর কোণের দিকে উনুনের ওপাশে একটা। এই স্বল্প আলোয় কারখানার কোণে কোণে জমে উঠেছে ঘন কালো ছায়া। তার ভেতর থেকে কতকগুলো মুণ্ডহীন কালো ছায়া উঁকি মারছে। তাদের হাত এবং মুখের জায়গার শূন্য ধূসর দাগগুলো অলৌকিক কল্পনা জাগিয়ে তুলছে। আগের চাইতেও বেশি মনে হচ্ছে, যেন কি এক রহস্যজনকভাবে এই ঘরের আবছা আলোতে সাধুরা তাদের রঙ্গিন কাপড়জামাগুলো ফেলে সবে পড়েছেন। কাঁচের বলগুলো সিলিংয়ের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ধোঁয়ার ঘন মেঘের ভেতরে সেগুলো মিটমিট করে নীলাভ আলো ছড়াচ্ছে।

অতিথির মত সকলকে আপ্যায়ন জানিয়ে টেবিলের চারপাশে ঝিখারেভ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর টাক পড়া মাথাটা একবার এবদিকে, একবার ওরদিকে নুয়ে পড়ছে। আর হাড় জিরজিরে আঙ্গুলগুলো অবিরাম নড়ে চলেছে। ও যেন আরো ক্ষীণ, আরো রোগা হয়ে উঠেছে। নাকটা ঈগলের মত আরো সূঁচাল হয়ে উঠেছে। ও যখন আলোর সামনে দাঁড়াচ্ছে তখন গালের ওপরে পড়ছে ঐ বাঁকা নাকটার লম্বা কালো ছায়া।

'প্রাণভরে খাও ভাই সব।' রিনরিনে স্বরে ঝিখারেভ বলে উঠল।

মেয়েছেলেটিও সাথে সাথে মিষ্টি স্বরে বলল যেন সেই এ ভোজসভার কর্ত্রী, 'আহা পড়শী, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? সবারই নিজের নিজের হাত মুখ আছে। পেটে যা ধরবে তার চাইতে বেশি কেউ তো আর খেতে পারে না।'

'ফুর্তি কর ভাই সব,' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল ঝিখারেভ, 'আমরা সকলে একত্রে 'তোমার নাম গাই' গানটা শুরু করি।'

গানটা জমল না। এর মধ্যে সবাই খাবারের সঙ্গে মদ খেয়ে আধমাতাল হয়ে পড়েছে। কাপেনদ্যুখিন একটা একর্ডিয়ান তুলে নিয়েছে, আর দাঁড়কাকের মত কালো, গম্ভীর মুখের তরুণ ভিক্তর সালাউতিন তাম্বুরিনে টোকা দিচ্ছে। গম্‌গমে আওয়াজের সঙ্গে ধারের খঞ্জনীগুলোর ঝন্‌ঝনে আওয়াজ জেগে উঠল।

'রুশ নাচ হোক।' আবেদন তুলল ঝিখারেভ, 'আসুন পড়শী!'

'হা আমার ভাগ্য!' বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি, 'কী কষ্টটাই না আপনি করছেন!'

স্ত্রীলোকটি ঘরের মেঝের মাঝখানে এসে বড় গম্বুজের মত অচল অনড় হয়ে দাঁড়াল। ওর পরনে বাদামী রঙের প্রশস্ত একটা স্কার্ট, গায়ে হলদে ব্লাউজ আর মাথায় লাল রুমাল। উত্তাল সুরে একর্ডিয়ান বেজে উঠল। ছোট ছোট খঞ্জনীগুলোর গভীর ভারি আওয়াজে বেজে উঠল তাম্বুরিন। খুব খারাপ লাগছে শুনতে। মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো উন্মাদ কাঁদছে, দীর্ঘশ্বাস ছড়াচ্ছে আর মাথা কুটছে দেয়ালে।

ঝিখারেভ নাচতে জানত না। সে কেবল তার চক্‌চকে বুটের গোড়ালি সমেত ঠক্‌ঠক্ করে পা বদলাচ্ছিল আর ছাগলের মত লাফাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওর পা-দুটো বুঝি ওর নিজের নয়। আর সমস্ত শরীরটাকে এমন বিশ্রী বাঁকাচ্ছিল যেন জালে পড়া একটা মাছি বা জালে পড়া একটা মাছ। সে এক করুণ দৃশ্য। কিন্তু সকলেই, এমন কি মাতালরা পর্যন্ত একান্ত মনযোগের সঙ্গে ওর সেই অঙ্গ-ভঙ্গির অনুকরণ করে যাচ্ছিল। তাদের চোখগুলো ওর হাত আর মুখের দিকে নিবদ্ধ। ঝিখারেভের ভাবসাব একটু বাদে বাদে অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে। একবার লাজুক নম্র, পরক্ষণেই আবার গর্বিত তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি। আচমকা কিসের জন্য যেন বিমূঢ়ভাবে চিৎকার করে উঠে চোখ বুজছে। আবার চোখ মেলতে মনে হচ্ছে যেন দারুণ ব্যথার ভারে অভিভূত হয়ে পড়েছে সে। কখনোবা হাত মুঠো করে চুপি চুপি এগিয়ে যাচ্ছে স্ত্রীলোকটির কাছে। হঠাৎ পা আছড়িয়ে ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত বাড়িয়ে চোখ তুলে আবেগপূর্ণ উষ্ণ হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর মুখের দিকে। স্ত্রীলোকটিও তাকাচ্ছে চোখ নামিয়ে। চোখে মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বভাব-সুলভ ধীর কণ্ঠে সাবধান করে দিল, 'আপনি নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলবেন দেখছি, পড়শী!'

করুণাভরা মধুভঙ্গিতে চোখ বুজতে চেষ্টা করল। কিন্তু তিন কোপেকী মুদ্রার মত ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো বুজতে চাইল না, ফলে কোঁচকান বলি-রেখায় কেমন যেন কুশ্রী লাগল তাকে।

নাচের ব্যাপারে মেয়েটিও কিছু নয়। ও কেবল তার বিশাল দেহটা ধীরে ধীরে দোলাতে পারত আর নিঃশব্দে স্থান বদল করত। ওর বাঁ হাতে থাকত একটা রুমাল। ধীরে ধীরে সেটাকে দোলাত। আর ডান হাতটা থাকত কোমরের ওপরে। এতে ওকে একটা বিরাট কুঁজোর মত দেখতে লাগত।

ঐ পাথুরে মূর্তিটার চারপাশে নেচে নেচে ঘুরবার সময়ে পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগের সংঘাত ফুটে উঠত ঝিখারেভের মুখে। মনে হত ও একজন নয়। যেনভিন্ন ধরণের দশটি লোক নাচছে। একজন লাজুক, বিনম্র; আর একজন রুক্ষ, উগ্র।

তৃতীয়জন আবার নিজেই ভীত ; ঐ বিশাল কুশ্রী নারীর কাছ থেকে পিছলে পিছলে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করে মৃদুভাবে চিৎকার করছে। তারপর আহত কুকুরের মত দাঁত খিঁচিয়ে গোটা শরীরটাকে বাঁকিয়ে আচমকা এসে হাজির হচ্ছে আর একজন। এই বিশ্রী নাচ ব্যাথা দিত আমাকে। সেই সৈনিক, রাঁধুনী, ধোপানী আর কুকুর কুকুরীর মৈথুনের বিশ্রী স্মৃতি জাগিয়ে তুলত আমার মনে।

মনে পড়ত সিদরভের সেই কথা, 'এসব ব্যাপারে সকলেই মিথ্যে বলে। 'লজ্জা পায়, কারণ কেউ কাউকে সত্যিকারের ভালবাসেনা। এটা করে কেবল ফুর্তির জন্য।'

'এসব ব্যাপারে সকলেই মিথ্যা বলে' একথা আমি বিশ্বাস করতে চাইতাম না। রাণী মার্গোর সম্পর্কে কী বলব তাহলে ? এছাড়া ঝিখারেভ নিশ্চয়ই মিছে কথা বলত না। জানতাম সিতানভ ভালবাসে একটি বেশ্যা মেয়েকে, যার কাছ থেকে এক লজ্জাকর, নোংরা ব্যাধি ধরেছিল সিতানভকে। কিন্তু এর জন্যে বন্ধুদের পরামর্শ মত সিতানভ তাকে মারধোর করেনি। বরং একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করেছিল। এক অদ্ভুত অনুরাগ আর দরদের সঙ্গে আলোচনা করত তার কথা।

বিশাল দেহের স্ত্রীলোকটি তেমনি দুলে চলেছে। তেমনি ধরা-বাঁধা হাসি ফুটে রয়েছে তার মুখে, তেমনিভাবে হাতে ধরা রুমাল। ঝিখারেভ তেমনি অঙ্গভঙ্গি করে ওকে ঘিরে লাফালাফি করছে। আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, যে ইভ খোদ ঈশ্বরকে পর্যন্ত ঠকিয়েছে তারও কি এইরকম ঘোড়ার মত চেহারা ছিল ? আমি মনে মনে স্ত্রীলোকটিকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

কালো দেয়ালের গা থেকে তাকিয়ে রয়েছে। মুণ্ডুহীন মূর্তিগুলো। জানলার কাঁচে অন্ধকার রাত লেপটে রয়েছে। গুমোট কারখানায় মিট্‌মিট্ করে আলো জ্বলছে। পায়ের দাপাদাপি, মানুষের কণ্ঠের মিলিত আওয়াজ, সব ছাপিয়ে জেগে উঠছে হাতমুখ ধোওয়ার তাঁমার বেসিন থেকে নোংরা জলের বালতিতে ঝরে পড়া জলের দ্রুত শব্দ।

বইয়ের জীবন আর এ-জীবনে কতই না তফাত। কী ভীষণ পার্থক্য ! সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কাপেনদ্যুখিন একর্ডিয়ানটা সালাউভিনের হাতে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'চলে এস ! মেঝের ধুলো উড়িয়ে দিই !'

ও নাচতে লাগল। যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে। এরপর পাভেল ওদিন্‌ৎসভ আর সরোখিন দ্রুত পা চালিয়ে নাচল খানিকক্ষণ। এমন কি ক্ষয়-রোগী দাভিদভও মেঝের ওপর নেতিয়ে পড়ে গড়াতে লাগল, আর ধুলো, ধোঁয়া, ভদ্‌কা আর ধোঁয়ানো সসেজের গন্ধে ধ্রুকতে লাগল খক্‌খক্ করে।

নেচে গেয়ে হৈ চৈ করে চলেছে ওরা। মনে হয় যেন সময়টাকে আনন্দে উৎসবে মাতোয়ারা করবার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। আর প্রত্যেকেই দিয়ে চলেছে উদ্দীপনা আর ধৈর্যের পরীক্ষা।

এতক্ষণে পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়েছে সিতানভ। সে একে একে সকলের কাছে কান্নার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে ও ঐ রকম একটা মেয়েমানুষকে ভালবাসতে পারে, অ্যাঁ ?

তার হাড়-বের করা শীর্ণ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রত্যুত্তরে লারিওনিচ বলে উঠল, 'অন্যের তুলনায় ও তেমন কিছু খারাপ নয়। কিন্তু তোর কি তাতে ?'

কিন্তু যে দুজনকে নিয়ে কথা হচ্ছিল তারা ততক্ষণে সরে পড়েছে। দু-তিন দিনের মধ্যে ঝিখারেভ আর কারখানামুখো হবে না। তারপর স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে এক টানা দু-সপ্তাহ যাবত তার নিজের কোনটাতে বসে কাজ করে যাবে চুপ্‌চাপ্‌, নির্লিপ্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মত।

'ওরা চলে গেছে?' ধূসর নীল দুটো চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে গোটা ঘরময় একবার দেখে নিয়ে সিতানভ জিজ্ঞেস করল। সিতানভের মুখটা বুড়োটে। দেখতে ভাল না। কিন্তু ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল, মমতাপূর্ণ।

আমার প্রতি ওর ভালবাসা ছিল। আর সে জন্য আমার কবিতা-লেখা নোট-বইটাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বরের প্রতি ওর বিশ্বাস ছিল না। অবশ্য একমাত্র লারিওনিচ ছাড়া এখানকার কে যে তাকে বিশ্বাস করত, ভালবাসত তা বলা দুষ্কর। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে সকলের গলায়ই ফুটে উঠত বিদ্রূপের সুর—যে সুরে মজুরেরা কথা বলে মালিকের সম্পর্কে। তবুও ওরা যখনই দুপুরে বা রাতে খেতে বসত তখনি ক্রুশ করত। বিছানায় যাবার আগে করত প্রার্থনা। রবিবার যেত গির্জেয়।

কিন্তু সিতানভ এসব কিছুই করত না। ওকে ধরে নেয়া হয়েছিল নাস্তিক বলে।

'ঈশ্বর বলে কিছু নেই।' জোরের সঙ্গে বলত সিতানভ।

'তাহলে এ সব কোত্থেকে এল?'

'আমি তা জানি না।'

একবার আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ঈশ্বর নেই, তা কেমন করে হয়?' সে প্রত্যুত্তরে বলল, 'দেখতে পাস না—ঈশ্বর ঐ উঁচুতে থাকেন!'

লম্বা হাতটা মাথার ওপরে তুলে অবার মেঝের দিকে নামিয়ে আনল। বলল, 'আর মানুষ থাকে নিচে। তাই না? কিন্তু কথায় বলে, 'ঈশ্বর তাঁর নিজের মূর্তির মত করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। গোগলেভের চেহারাটা কার মূর্তির মত?'

এতে বিব্রত হলাম আমি। বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিশ্রী স্বভাব মাতাল গোগলেভের হস্তমৈথুনের দোষ আছে। দিদিমার বোনের কথা আর ভিয়াতকার সেই সৈনিক, ইয়েরমোখিনের কথাও আমার মনে পড়ল। এই সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কোন লক্ষণটা মেলান সম্ভব?

'মানুষ হল শুয়োরের বাচ্চা,' বলল সিতানভ। কিন্তু বলে ফেলেই পরে আবার আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বলল, 'তবে ভাবনা নেই, মাক্সিমিচ্‌, ভাল মানুষও আছে—বাস্তবিকই আছে!'

ওর কাছে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম। ও যে বিষয়টা জানত না, সেটা সহজভাবেই স্বীকার করত।

'জানি না,' বলত সিতানভ, 'ও নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি!'

এটা অস্বাভাবিক। যত মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি, তারা সবাই মনে করত যে সব কিছুই তাদের জানা। যে কোন বিষয়েই মন্তব্য করতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

অবাক লাগত আমার যখন দেখতাম ওর নোটবইয়ে অন্তর ব্যাকুল করে-তোলা ভাল কবিতার পাশে এমন সব কবিতা, যা পড়লে লোকের গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে। ওর কাছে পুশকিনের কথা বলতে, ও আমাকে দেখাল 'গাভ্রিলিয়াদা'কে। তার কবিতা টোকা ছিল ওর নোটবইয়ে।

'পুশকিন ? ওকে পড়ে তেমন লাভ নেই। কিন্তু বেনেদিকৃতভ—একটা লোক বটে ! পড়তে হলে ওকেই পড়া উচিত মাক্সিমিচ্।'

চোখ বুঝে নরম সুরে ও আবৃত্তি করত :

'সুন্দরী এই যুবতীর বুকে
দেখ কি রকম স্তনভার দুটি...।'

কেন জানি তিনটি পঙ্‌ক্তি ও একটু বিশেষভাবে জোর দিয়ে আনন্দে আর গর্বে আবৃত্তি করত ঃ

'ঋজু বর্শায় ঈগলের চোখ,
দেখতে পারে না এ দুয়ার খুলে
কী আছে যে তার বুকের তলায় অন্তর্দেশে।'

'বুঝলি ?'

বুঝতে পারছিনা কিসে ও এত আনন্দ পাচ্ছে ! লজ্জায় একথাটা ওকে বলতে পারলাম না।

চোদ্দ

কারখানায় আমাকে তেমন একটা শক্ত কাজ করতে হত না। ভোরে সবার আগে উঠে চিত্রকরদের জন্য সামোভার গরম করতে হত। রান্নাঘরে যতক্ষণে ওরা চা খেত ততক্ষণে পাভেল আর আমি ঘর ঝাড়ু দিতাম। ডিম ভেঙে কুসুম আলাদা করতাম রঙে মেশাবার জন্যে। এরপর যেতাম দোকানে। সন্ধ্যায় ফিরে রঙ মেশাতাম আর পটুয়াদের কাজ লক্ষ্য করে করে দেখতাম। প্রথম দিকে বেশ উৎসাহ নিয়েই দেখতাম। কিন্তু দুদিন পার হতে না হতেই টের পেলাম যে অধিকাংশ পটুয়াই তাদের ঐ টুকরো টুকরো কাজ পছন্দ করেনা আদৌ। তাদের দিনগুলো অসহ্য বিরক্তি আর একঘেয়েমিতে পার হয়।

খুবই কম কাজ করতে হত বলে, সন্ধ্যাটা ওদের কাছে জাহাজী জীবনের কথা বা পড়া-বইয়ের গল্প করে কাটিয়ে দিতাম। ফলে নিজের অজান্তেই পড়ুয়া ও গল্প-বলিয়ে হিসেবে কারখানায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিলাম।

দ্রুত টের পেলাম আমি যতোটা জানি বা দেখেছি, এরা কেউই ততটা জানে না বা দেখেনি। একদম ছোটকাল থেকেই এদের অধিকাংশই কারিগরির ছোট খাঁচার ভেতরে বন্দী হয়ে রয়েছে। কারখানায় যারা কাজ করে তাদের মধ্যে একমাত্র ঝিখারেভই মস্কো গিয়েছিল। ভ্রূ কুঁচকে সে প্রায়ই একটু ভারিক্কি সুরে বলত, 'চোখের জল ফেলবার জায়গা নয় মস্কো। তোমাকে চোখদুটো খোলা রেখে চলতে হবে সেখানে।'

অন্যেরা কেউই শুয়া বা ভলাদিমিরের থেকে দূরে যায়নি। কাজানের কথা উঠলেই ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'অনেক রুশিয়ান আর অনেক গির্জে আছে ওখানে, না ?'

ওদের ধারণায় পেরম ছিল সাইবেরিয়ায়। কিছুতেই ওরা বিশ্বাস করতে পারত না যে সাইবেরিয়া উরাল পর্বতমালার ওপারে।

'কেন, উরালের পার্চ আর স্টার্জিয়ন মাছ ওখান থেকে আসে না ? ঐ কাস্পীয় সাগর থেকে ? তার মানে উরাল পাহাড় নিশ্চয়ই কাস্পীয় সাগরের পারে !'

ওরা যখন বলত সমুদ্রের ওপারে ইংল্যাণ্ড আর কালুগার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে

বোনাপার্ট জন্মেছিলেন তখন মাঝে মাঝে মনে হত আমার সঙ্গে ওরা ঠাট্টা করছে না তো ? যখন আমি আমার নিজের চক্ষে যা যা দেখেছি সব কথা বলতাম, ওরা বিশ্বাস করে উঠতে পারত না, অথচ পছন্দ করত জটিল বিষয়ের রোমাঞ্চকর গল্প, কাহিনী ইত্যাদি। বয়স্করা পর্যন্ত সত্য ঘটনার চাইতে কাল্পনিক কাহিনী শুনতে চাইত বেশি। বেশ লক্ষ্য করতাম গল্প যতই অস্বাভাবিক আর যতই অবিশ্বাস্য হত তার বিষয় বিন্যাস ওরা ততই মনোযোগের সঙ্গে শুনত। সাধারণত বাস্তব সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ ছিল না ওদের। সবাই আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ভবিষ্যতের দিকে—চাইত বর্তমানের এই জঘন্যতা, দৈন্য-দারিদ্র মন থেকে মুছে ফেলতে।

এতে আরো অদ্ভুত লাগত আমার, কেন না বাস্তব ও কল্পনার বিরোধ সম্পর্কে এক তীক্ষ্ম বোধ আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল। এখানে আমার সামনে আছে একজন সত্যিকারের মানুষ। কিন্তু বইয়ের চরিত্রের মধ্যে এদের কাউকে আমি পাইনি, না স্মুরিকে, না আগওলা ইয়াকভকে, কিংবা আলেক্‌জান্দার ভাসিলিয়েভ, ঝিখারেভ, অথবা ধোপানী নাতালিয়াকে।

দাভিদভের বাক্সে গলিৎসিনস্কির জীর্ণ ছেঁড়া একটা গল্প-সংকলন ছিল, বুলগারিনের 'ইভান ভীঝিগিন' আর ব্যারন ব্রামবেউসের একটা খণ্ড। সবকটা বই-ই আমি পটুয়াদের পড়ে শোনালাম। ওরা খুব খুশি হল।

'বেশ ভাল! পড়াশুনা করলে ঝগড়াঝাটি গোলমাল সব দূর হয়!' বলল লারিওনিচ।

বইয়ের সন্ধান করতে শুরু করলাম। পেলেই পড়ে শোনাতাম সকলকে। সে সব সন্ধ্যাগুলো মনে রাখার মত। কারখানার ঘরে নেমে আসত নিঝুম রাতের মত নিস্তব্ধতা। শাদা তারার মত কাঁচের বলগুলো মাথার ওপরে ঝুলত। টেবিলের ওপরে নুয়ে পড়া ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুলেভরা আর টাকপড়া মাথাগুলোতে পড়ত তাদের কিরণ-রেখা। চোখের সামনে দেখতে পেতাম সকলের শান্ত সমাহিত মুখ। মাঝে মাঝে হয়ত কেউ লেখক বা নায়কের তারিফ করে বলে উঠছে দু-একটা কথা। এই সময়টাতে ভীষণ ভাল লাগত আমার ওদেরকে। আর ওরাও উপলব্ধি করত যে আমি ওদের একান্ত কাছের জন। আমার মনে হত আমি যেন আমার নিজের স্থানটি খুঁজে পেয়েছি।

'বসন্তকালে প্রথম জানলা খুললে যেমন সজীব সতেজ বাতাস ঘরে এসে ঢোকে এইসব বই পড়াও ঠিক তেমনি।' একদিন সিতানভ বলল।

কোন একটা লাইব্রেরীতে ভর্তি না হয়ে আমার পক্ষে বই যোগাড় করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ল। কিন্তু লাইব্রেরীর ব্যাপারটা আমাদের কল্পনার বাইরে। লোকের কাছ থেকে ভিক্ষুকের মত চেয়ে কোন রকমে যোগাড় করতাম। একদিন ফায়ার ব্রিগেডের অফিসারের কাছ থেকে লের্মন্তভের একটা বই যোগাড় করলাম। কবিতার কি শক্তি তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম এই বইখানা পড়ে। উপলব্ধি করলাম মানুষের ওপরে কবিতার প্রভাব কী অপরিসীম।

মনে পড়ে সবেমাত্র 'দানব' কবিতাটা পড়তে শুরু করেছি বইটা খুলে। সিতানভ প্রথমে বইটার দিকে তাকিয়ে তারপর তাকাল আমার মুখের দিকে, পরে হাতের তুলিটা রেখে লম্বা হাতদুটো হাঁটুর নিচে গুঁজে দুলতে শুরু করল। নীরব হাসি দেখা দিল ওর মুখে। চেয়ারটায় শব্দ হচ্ছিল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে।

'চুপ।' বলে উঠল লারিওনিচ। হাতের কাজ ফেলে রেখে সেও এগিয়ে এল সিতানভের টেবিলে, যেখানে বসে আমি বইটা পড়ছিলাম। কবিতাটা পড়তে পড়তে এক পরম আনন্দে আমার অন্তর ভরে উঠল। রুদ্ধ হয়ে এল গলার স্বর। চোখের জলে ঝাপসা হল অক্ষরগুলো। এর ওপর ঘরের সেই নিঃশব্দ চুপি চুপি ভাব আর খুব সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরায় আমি আরো বেশি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমাকে ঘিরে সব কিছুই যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যেন একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক সমস্ত লোকগুলোকে আমার কাছে টেনে এনেছে। প্রথম অধ্যায় শেষ করে দেখি প্রায় সমস্ত পটুয়ারা এসে ঘন হয়ে টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কারুর মুখে হাসি, কারুর মুখে ঔৎসুক্য। পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে।

'পড়ে যা, পড়ে যা।' আমার মাথাটা বইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল ঝিখারেভ।

পড়া শেষ হলে সে বইটা হাতে নিয়ে নামটা পড়ল, তারপর সেটা বুকের কাছে রেখে বলল, 'এটা ফের পড়তে হবে তোকে কাল। আমার কাছে রইল।'

চলে গেল ঝিখারেভ। তার ড্রয়ারে বইটা চাবি বন্ধ করে রেখে নিজের কাজে ফিরে গেল। স্তব্ধ নীরবতা সমস্ত কারখানাটা জুড়ে। নিঃশব্দে যে যার কাজের জায়গায় ফিরে গেছে। জানলার কাছে গিয়ে জানলার কাঁচে মাথাটা চেপে ধরে অনড় নিস্পন্দ হয়ে সিতানভ দাঁড়িয়ে রইল। আর ঝিখারেভ আবার তুলিটা রেখে জোরে বলে উঠল, 'একেই বলি জীবন, ঈশ্বরের দাস···সত্যিই!'

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নুইয়ে সে বলে চলল, 'এ দানবকেও আমি আঁকতে পারি। কালো, শরীরময় লম্বা চুল, আগুন-রঙা পাখা, সিঁদুর বর্ণ হাত পা আর ফিকে নীল মুখ, জ্যোৎস্না রাতে ঝরে পড়া বরফের মত।'

রাতের খাবারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত টুলের ওপরে বসে কী এক নিদারুণ যন্ত্রণায় অদ্ভুত অস্থিরভাবে সে মোড়ামুড়ি করতে লাগল। আঙুল দিয়ে টেবিলে শব্দ তুলে অস্পষ্ট বিড়বিড় করে বলতে লাগল দানবের কথা, ইভের কথা, মেয়েমানুষ আর স্বর্গের কথা। আর কেমন করে সাধুরা পাপ করেছিল সে কথাও বলল।

'বটেই তো! সাধুরা যদি নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে, তবে দানবও পবিত্র হৃদয় একজনকে আকৃষ্ট করে বড়াই করবে না তো কি!'

কেউ ওর কথায় কোন উত্তর করল না। হয়ত আমার মতই কোন কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না কারো। ঘড়ির দিকে নজর রেখে চূড়ান্ত অনিচ্ছায় ওরা কাজ করে যাচ্ছিল। নটার ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাজ বন্ধ করল।

সিতানভ আর ঝিখারেভ উঠোনে বেরিয়ে গেল। আমিও যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে সিতানভ বলে উঠল :

* 'চলে যাত্রীদল
ছায়াপথের অসীম শূন্যতা বেয়ে।

'এমন সমস্ত কথা ভেবে ভেবে খুঁজে বের করেছে!'

'একটা কথাও আমার মনে নেই।' তীব্র শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঝিখারেভ, 'কিছুই আমার মনে নেই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সবই। আশ্চর্য ব্যাপার একটা মানুষ কিনা দানবের প্রতি তোমার করুণা জাগিয়ে তুলছে! যেমন তুমি, তোমার মনে ওর জন্য দুঃখ হচ্ছে, তাই না?

'হাঁ।' স্বীকার করল সিতানভ।

'মানুষ কাকে বলে দেখ!' উচ্ছল সুরে ঝিখারেভ এমনভাবে বলে উঠল যে তা ভুলবার নয়।

দরজার কাছে ফিরে ও আমাকে সাবধান করল, 'বইটার কথা কারখানার কাউকে জানাসনা মাক্সিমিচ্। নিশ্চয়ই এটা নিষিদ্ধ বই।'

আমার দারুণ আনন্দ হল, পাপ স্বীকারের সময়ে এই ধরণের বইয়ের কথাই তবে আমাকে বলেছিল পুরুত।

সকলে একান্ত নির্লিপ্তভাবে খেতে লাগল রাত্রের খাওয়া। স্বাভাবিক গোলমাল, কথাবার্তা নেই। দারুণ অপূর্ব একটা কী জানি ঘটেছে যা নিয়ে সকলেই মনে মনে ভাবছে। খাওয়া শেষ হলে সবাই যখন যে যার মত ঘুমোতে গেল, ঝিখারেভ বইটা বের করে বলল, 'এই যে, বইটা আর একবার পড়। আস্তে আস্তে পড়িস, তাড়া হুড়ো করিস না।'

অনেকেই নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে উঠে এল; পোশাক খোলা, পা ভেঙে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল। বইটা যখন আর একবার পড়ে শেষ করলাম তখন টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলে উঠল ঝিখারেভ. 'একেই বলে বাঁচা! মানে. দানব···। এমন অবস্থা তোমার কেমন করে হল ভাই?'

'সিতানভ আমার কাঁধে ঝুঁকে কি যেন পড়ছিল, তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'ওগুলো আমার নোটবইয়ে তুলে নেব।'

ঝিখারেভ উঠে দাঁড়াল, বইটা হাতে করে এগিয়ে গেল তার টেবিলের দিকে। আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আহত উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল, 'অন্ধ কুকুরের মত আমরা জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু কিসের জন্য? কেউ জানে না। ঈশ্বর কিংবা দানব কেউই আমাদের চায় না। আমরা ঈশ্বরের দাস? দাস ছিল জব, কিন্তু ঈশ্বর নিজে তার সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন মেজোসের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের মালিক কে?'

বইটা তালা বন্ধ করে পোশাক পরতে লাগল ঝিখারেভ সিতানভকে ডেকে বলল, 'যাবে নাকি সরাইখানায়?'

'না, আমি আমার মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি না।' শান্ত গলায় বলল সিতানভ।

ওরা চলে যেতে আমি দরজার সামনে মেঝের ওপরে পাভেল ওদিনৎসভের পাশে শুয়ে পড়লাম। কিছুটা সময় হাস-ফাঁস করতে করতে ও বিছানার মধ্যে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কী হল?'

'ওদের জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়,' বলল ওদিনৎসভ, 'প্রায় চার বছর আছি ওদের সঙ্গে। ওদের সবাইকেই আমি চিনি।'

ওদের জন্য আমারও দুঃখ হত। অনেক রাত অবধি ওদের নিয়ে দুজনে ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করলাম, ওদের প্রত্যেকের যে সব সততা, দয়া আছে তার কথা স্মরণ করলাম। প্রত্যেকের ভেতরে খুঁজে বের করতে লাগলাম এমন সব গুণ যাতে আমাদের শিশু-হৃদয় করুণায় ভরে উঠল।

পাভেল ওদিনৎসভ আর আমার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। পরে পাভেল

প্রথম শ্রেণীর একজন শিল্পী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশিদিন সে তার ঐ কাজে টিকে থাকল না। ত্রিশ বছর বয়সেই সে হয়ে উঠল একটা পাঁড় মাতাল। আরো কিছুদিন বাদে মস্কোর খিত্রভ বাজারে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও তখন ভবঘুরে। তার কিছুকাল পরেই শুনলাম টাইফাসে সে মারা গেছে। আমার চোখের ওপর কত যে সুন্দর জীবন এমনি ভাবে অকারণে নিঃশেষ হয়ে ঝরে গেছে, তা ভাবতেও ভয় হয়। সর্বত্রই দেখেছি মানুষ ক্ষয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রুশিয়ার মত অন্য আর কোন দেশেরই মানুষ এত দ্রুত, এমন অর্থহীনতায় ক্ষয় হয়ে যায় না…।

সে সময়ে পাভেল গোল-মাথাওয়ালা একটা ছেলে। বয়সে আমার থেকে দু-বছরের বড়। চতুর, চটপটে, সৎ হওয়া ছাড়াও ওর ছিল শিল্পী প্রতিভা। বেড়াল, কুকুর, পাখি ইত্যাদি আঁকারও দারুণ দক্ষতা ছিল। এছাড়া মজার মজার ব্যঙ্গচিত্র আঁকত পটুয়াদের নিয়ে। আর সব সময়েই তাদেরকে আঁকত কোন না কোন পাখির অবয়বে। সিতানভকে আঁকত এক পায়ে দাঁড়ান বিষণ্ণ মুখের এক বন মোরগ। ঝিখারেভকে আঁকত শীর্ণ ঝুঁটিওয়ালা চাঁদকপালে পোষা মোরগ। রুগ্ন দাভিদভকে করত করুণ-মুখো পিটউইট পাখি। ওর ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে সবচাইতে উৎকৃষ্ট হল গোগলেভের ছবি। তাকে আঁকত লম্বা কানওলা একটা বাদুড় করে। নাকটা বিরাট, আর ছোট ছোট দুটো পায়ের প্রত্যেকটায় ছ-টা করে তীক্ষ্ণ নখ। ওর গোল গোল কালো মুখে গোলাকার শাদা দুটো চোখ। চোখে মটর ডালের মত মণিদুটো চোখের দু-দিকে দু-কোণে সরান। ফলে গোটা মুখখানায় একটা সচকিত শয়তানীভাব ফুটে উঠত।

ব্যঙ্গচিত্র দেখে পটুয়ারা কেউই রাগত না! কিন্তু সবার কাছেই খুব খারাপ লাগল গোগলেভের ছবিটা। ওরা বিনীতভাবে শিল্পীকে বলল, ‘ওটা ছিঁড়ে ফেল! বুড়োটা দেখলে তোর পক্ষে খুব খারাপ হবে!’

বুড়োটা বিশ্রী, অশালীন। সবসময় পাঁড় মাতাল হয়ে থাকত। ও যেমন এক-রোখা রকমের ভক্ত, তেমনি দারুন কুমতলবী। আর দোকানের বড়বাবুর পেছন-ধরা। তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বড়বাবুর বিয়ে দেবার ঠিক করেছিল। ফলে সে নিজেকে কারখানার লোকজনদের কর্তা হিসেবে মনে করতে শুরু করেছিল। বড়বাবুকে সবাই ঘৃণা করলেও ভয় করত। ফলে গোগলেভকেও ভয় করত সকলে।

পাভেল সর্বদাই ওর পেছনে লাগত, জ্বালাতন করত। গোগলেভকে এক মুহূর্তও শান্তিতে না থাকতে দেওয়াটাই যেন ছিল ওর উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সে আমাকে তার যোগ্য দোস্ত হিসেবে পেয়েছিল। আর আমাদের এ ব্যাপারটাতে সবাই মজা পেত খুব। যদিও ব্যাপারটা প্রায়ই একটু নির্মম, একটু স্থূল ধরণেই হত। কিন্তু পটুয়ারা বলত, ‘সাবধান, কুজমা পোকাটা মজা দেখাবে তোদের’!

কারখানার লোকদের কাছে বড়বাবুর নাম ছিল ‘কুজমা পোকা।’

কিন্তু ওদের এ সাবধানতাকে আমরা গুরুত্ব দিতাম না। ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আমরা প্রায়ই গোগলেভের মুখে রঙ লেপে দিতাম। একদিন যখন ও মাতাল অবস্থায় বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, তখন ওর স্পঞ্জের মত নাকটায় আমরা সোনালী রঙ লাগিয়ে দিলাম। তিনদিন পর্যন্ত সে তার রোমকূপ থেকে সোনালী রঙতুলে ফেলতে পারেনি।

যখনই আমরা বুড়োকে চটিয়ে তুলতাম তখনই আমার মনে পড়ত জাহাজের সেই ভিয়েৎকাবাসী সৈনিকটির কথা। বিবেকের তাড়নায় তখন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যেত। বেশ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও গোগলেভ কিন্তু আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। আচমকা এসে মাঝে মধ্যে আচ্ছা করে ধরে ঠুকে দিত। প্রতিবার এই রকম করবার পর আবার গিয়ে নালিশ করত কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে।

কর্ত্রীঠাকরুণও সর্বদাই মদের নেশায় বেহুঁস থাকত। ফলে সর্বদাই ছিল বেশ হাসি-খুশি, ভালমানুষ গোছের। মোটা-সোটা হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ে, চেঁচিয়ে আমাদের ভয় দেখাত, 'ফের বদমাশি করেছিস, শয়তানগুলো? ও বয়স্ক মানুষ, ওকে তোদের মান্য করা উচিত! ওর মদের গ্লাসে কে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছিলি?'

'আমরা…।'

চোখ পিট্‌পিট্ করে উঠল কর্ত্রীঠাকরুণ।

'হা ঈশ্বর, আবার স্বীকার করছে! খুদে বদমাশের দল, বুড়োমানুষকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হয়—জানিস না?'

আমাদের তাড়িয়ে দিল। আর সেদিনই সন্ধ্যায় নালিশ করল বড়বাবুর কাছে।

'এ কেমন কথা?' তীব্রকণ্ঠে আমাকে বড়বাবু ধমকে বলল, 'পড়াশুনো করিস, বাইবেল পর্যন্ত পড়িস, তবু সবসময়েই তুই একটা কিছু ঘটিয়ে বসবি। হুঁশিয়ার থাকিস এখন থেকে!'

কর্ত্রীঠাকরুণ খুব নিঃসঙ্গ ছিল। ওকে দেখে বেদনা জাগত মনে। মাঝে মাঝে মাত্রাধিক মদ খেয়ে জানলার কাছে বসে গান গাইত:

'কেউ বোঝে না তো আমার দুঃখ
কেউ জানে না তো বুকে ব্যথা কত
ভালবাসে না দেয় না সোহাগ
বলে না তো কেউ দুটো কথা ভালবেসে আর।'

তারপর বার্ধক্যের ভাঙা কান্নাভরা কাঁপা স্বরে ডাক দিত, 'উ-ও-ও-ও…।'

একদিন দেখি এক কলসী দুধ নিয়ে নিচে নেমে আসছে। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গেল, তারপর ধাপে ধাপে গড়িয়ে নেমে আসতে লাগল। হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে কলসীটা। উপচে পড়ছে দুধ তার পোশাকে। তখন কলসীটাকে গাল দিয়ে বলছে, 'কেমন করে দুধ পড়ে যাচ্ছে দেখ তো, শয়তান কোথাকার।'

সে মোটা নয়, কিন্তু নরম থল্‌থলে। যেন বুড়ো বেড়াল একটা, যার কাছে এখন ইঁদুর শিকারের ব্যাপারটা অতীত ইতিহাস মাত্র। ঢের তৃপ্তির পর এখন যে শুধু এক স্থানে জমিয়ে বসে সেদিনের জয়লাভ ও ভোজের সুখ-স্মৃতির জাবর কেটে যাচ্ছে।'

'হুঁ-হুঁ' ভ্রু কুঁচকে গুণগুণ করত সিতানভ, 'এককালে এটা বেশ বড় কারবার ছিল। কারখানাটাও ছিল চমৎকার। আর পরিচালনায় ছিল খুবই চতুর বুদ্ধিমান একজন লোক। কিন্তু সে সব কিছু এখন গোল্লায় গেছে। মুনাফার সমস্তটাই গিয়ে ঢুকছে ঐ ব্যাটা কুজমাটার ট্যাঁকে। কী কাজটাই না আমরা করেছি, আর সব গিয়ে ঢুকেছে ওই লোকটার উদর ভরাতে। ভাবতেই ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে ছাদে গিয়ে পুরো গরমকালটা আকাশের দিকে মুখ করে চিত হয়ে পড়ে থাকি।'

সিতানভের মনোভাব পাভেল ওদিনৎসভকে স্পর্শ করল। বয়স্কদের মত সিগারেট ফুকতে ফুকতে ঈশ্বর, মাতাল, মেয়েমানুষ, আর কাজের অসারত্ব সম্পর্কে দার্শনিকতা প্রকাশ করত সেঃ কেউ সমস্ত জীবনভরে কিছু একটা জিনিস গড়ে তোলে, আর কেউ এসে সেটা ভেঙ্গে চুরে নষ্ট করে দেয়। তার মূল্য দেয় না একটুকুও।

এই সময় ওর চোখা আকর্ষণীয় মুখখানা বুড়োদের মত কুঞ্চিত হয়ে উঠত। মেঝের ওপরে বিছানায় এসে যখন বসত, তখনই এই সব চিন্তা প্রায়ই ওর মনে জেগে উঠত। দুহাতে পাদুটোকে জড়িয়ে ধরে জানলার আড়াল দিয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত অনুজ্জ্বল তারায় ভরা শীতের আকাশ আর ঝরা বরফের ভারে ঝুঁকে-পড়া ছাউনি চালার দিকে।

পটুয়ার নাক ডাকত, বিড়বিড় করত ঘুমের ভেতরে। কাউকে বোবায় ধরত। দাভিদভ ওপরের মাচার বিছানায় শুয়ে জীবনের বাকি শক্তিটুকু কাশতে কাশতে ক্ষয় করে চলত। ওপরে এক কোণে 'ঈশ্বরের দাস' কাপেনড্যুখিন, সরোকিন, আর পেরসিন পাশাপাশি শুয়ে ঘুম আর মদের নেশায় হাত পা ছুঁড়ত। হাত-পা-মুণ্ডুহীন মূর্তিগুলো দেওয়ালের গা থেকে তাকিয়ে থাকত। মেঝের ফাটলে আটকে থাকা তেল, পচা ডিম আর নোংরা আবর্জনার বিশ্রী দুর্গন্ধে শ্বাস নেওয়া প্রায় দুষ্কর হয়ে উঠত।

'এদের জন্য এত করুণা হয় আমার! হায় ভগবান!' ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠত পাভেল।

এই করুণায় আমার অন্তরও ভারী হয় উঠতে লাগল। আগেই বলেছি আমাদের দুজনার চোখে ওরা ছিল ভাল লোক। কিন্তু যেভাবে ওরা জীবন কাটাত সেটা ছিল বীভৎস, একঘেয়ের চূড়ান্ত—যা ছিল ওদের পক্ষে অনুপযুক্ত। যখন লেন্টের ঘণ্টা বিশ্রী সুরে বেজে উঠত, বাড়ি ঘর গাছপালা, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কাঁপিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে বইত তুষার-ঝড়, তখন সীসের পর্দার মত বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসত কারখানা জুড়ে, তাতে পটুয়াদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, গলা টিপে যেন তা নিঃশেষ করে বের করে নিত জীবন। ওরা ছুটে যেত সরাইখানায় কিংবা মেয়েমানুষের আলিঙ্গনে খুজে ফিরত আশ্রয়। কড়া মদের মতই তারা ওদের ভুলিয়ে রাখত।

এই সব সন্ধ্যায় পড়াশুনো করে কোন কাজ হত না। পাভেল আর আমি তখন আনন্দ করার অন্য পথ ধরতাম। মুখে রঙ আর ঝুল-কালি মেখে শণের পরচুলা আর গোঁফ পরতাম। তারপর নিজেরাই যখন যে রকম হত প্রহসন রচনা করে শুরু করে দিতাম অভিনয়। বিষাদময়তার বিরুদ্ধে আপ্রাণ বীরের মত লড়াই করে ওদের বাধ্য করতাম হাসতে। কি করে এক সৈন্য মহান পিটারকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল সে গল্পটা আমার মনে ছিল। সমস্ত গল্পটাকে নাটকের মত পরিবর্তিত করে নিলাম। তারপর দাভিদভের মাচার ওপরে উঠে আনন্দের সঙ্গে কল্পিত সুইডদের শিরচ্ছেদ করে অভিনয় সমাপ্ত করতাম। দর্শকরা ফেটে পড়ত উচ্চ হাসিতে।

পটুয়ারা সব চেয়ে বেশি উপভোগ করত চীনা দৈত্য—সিঙ্গিইউ-তঙ্গুর গল্প। ঐ ভাগ্যহীন দৈত্যের অভিনয় করত পাশ্‌কা, যার সুকাজ করার ইচ্ছে হয়েছিল। আর মেয়ে পুরুষ, মঞ্চের সব জিনিস, উপকারী অপদেবতা, সমস্ত সাধুকাজের

চেষ্টায় অসফল হয়ে ভাঙ্গা মনে চীনে দৈত্যটা এসে যে প্রস্তরের ওপর বিশ্রাম করত সেই প্রস্তর অবধি বাকি সব কিছুর অভিনয় আমি একাই করতাম।

হেসে লুটিয়ে পড়ত দর্শকরা আর দুঃখিত বিস্ময়ে আমি বুঝতে পারতাম যে কত সহজেই না মানুষ আনন্দ পেতে পারে। 'ওহো ভাঁড় বটে! নাচনেওলা বটে!' ওরা চীৎকার করে বলত আমাদের লক্ষ্য করে।

যতই অভিনয় করতে লাগলাম ততই ঘুরে ফিরে এই উপলব্ধিটাই মনে এল যে আনন্দের তুলনায় দুঃখটাই এদের স্পর্শ করে বেশি।

আনন্দ আমাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী নয়। আর নেহাৎ আনন্দ হিসেবেও তার কোন মূল্যই দিই না আমরা। রুশীয় জীবনের ভারাক্রান্ত চিত্তে প্রতিরোধক হিসেবেই কেবলমাত্র বহু আয়াসে একে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে আনন্দের নিজস্ব কোন প্রাণ নেই, বেঁচে থাকার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, যা কেবল আসে মুহূর্তের জন্য একঘেয়ে বিষাদময় জীবনের ভার একটু হালকা করে দিতে, সে আনন্দের ওপর কোন আস্থা নেই।

সে কারণে প্রায়ই রুশীয়দের ফুর্তি হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত, অভাবনীয়ভাবে নির্মম নাটকের রূপ নেয়। নর্তক যখন নাচের মধ্যখানে এক এক করে তার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে তখন আচমকা তার ভেতরের পশুটাও বেরিয়ে পড়ে দরজা ভেঙ্গে। পাশবিক জ্বালায় সকলের ওপরে, সমস্ত কিছুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জন করে, আক্রমণে চুরমার করতে থাকে।

বাহ্যিক প্রেরণায় আয়াস করে জাগিয়ে তোলা এই ফুর্তি আমাকে আনন্দে এমন ক্ষেপিয়ে তুলত যে আত্মহারা হয়ে পাগলের মত সেই মুহূর্তের উদ্দীপনায় যা কিছু মনে আসত তাই-ই আবৃত্তি করে অভিনয় করে যেতাম। কী আপ্রাণ ভাবেই না আমি চেষ্টা করতাম প্রাঞ্জল মুক্ত আনন্দে ঐ লোকগুলোকে জাগিয়ে তুলতে, আর আমার প্রচেষ্টা যে অসফল হত, তা নয়। পটুয়ারা তারিফ করত, অবাক হত। কিন্তু যে বিষাদময়তাকে মনে হত দূর করতে পেরেছি তা শুধু আবার আরো ঘন, আরো গভীর হয়ে ফিরে এসে ঠিক আগের মতই ভারাক্রান্ত হয়ে নিষ্পেষিত করে তুলত।

ধূসর চেহারার লারিওনিচ ধীরকণ্ঠে বলত, 'একটা আস্ত খুদে শয়তান তুই। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন!'

'বাস্তবিক আরামদায়ক!' ঝিখারেভ সায় দিত, 'এখান থেকে গিয়ে কোন একটা সার্কাসে বা থিয়েটারে যোগ দিলেই পারিস। ভাঁড়ের অভিনয় খুব চমৎকার করতে পারবি!'

গোটা কারখানার ভেতর কেবল কাপেনডুখিন আর সিতানভ থিয়েটারে যেত বড়দিনে আর পাপ-স্বীকার পর্বের সময়ে। বয়স্ক পটুয়ারা ওদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জর্ডনের তুষারের বাপ্তাইজ-করা গর্তে ডুব দিয়ে পবিত্র হওয়ার পরামর্শ দিত।

সিতানভ সর্বদাই আমাকে বলত, 'এ সব ছেড়ে অভিনেতা হগিয়ে যা!'

সে আমাকে অভিনেতা ইয়াকভলেভের জীবন সম্পর্কে করুণ আকর্ষণীয় কাহিনী শোনাত।

'তুইও ঠিক, তেমনিভাবে জীবন চালাতে পারিস!'

সিতানভ ভালবাসত মেরী স্টুয়ার্টের গল্প বলতে। তাঁকে বলত 'খেঁক-শিয়ালী'। এছাড়া 'স্পেনের অভিজাত'এর কাহিনী শোনাতে খুব আগ্রহ ছিল তার।

'সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দন সিজার দ্য বাজান ছিলেন শ্রেষ্ঠ, বুঝলি মাক্সিমিচ। বাস্তবিক অসাধারণ!'

'স্পেনের অভিজাত'দের মত ভাব খানিকটা ওর নিজের মধ্যেও ছিল। একদিন বুরুজ-ঘরের কাছের পার্কে ফায়ার ব্রিগেডের তিনজন কর্মচারী একসঙ্গে একজন চাষীকে ধরে পেটাচ্ছিল। প্রায় চল্লিশজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা লুটছিল আর ফায়ার ব্রিগেডের কর্মচারীদের উস্কানী দিচ্ছিল। সিতানভ ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে ঐ মারামারির ভেতরে। লম্বা দুটো হাত চালিয়ে কর্মচারীদের পিটিয়ে তাড়াল। আর চাষীটাকে মাটি থেকে তুলে ভিড়ের মধ্যে ঠেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও!'

ও একা দাঁড়িয়ে রইল তিনজনের সঙ্গে লড়তে। ফায়ারমেনদের ঘাটি ছিল মাত্র কয়েক পা দূরে। সহজেই ওরা ওদের লোকজন ডাকতে পারত সাহায্যের জন্য, আর আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিতে পারত সিতানভকে। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, ওরা বারান্দার দিকে পালিয়ে গেল।

আর পেছন থেকে তীক্ষ্ণস্বরে গাল পাড়ল সিতানভ, 'কুকুরের বাচ্চা কোথাকার!'

প্রত্যেক রবিবার পেত্রোপাভ্‌লভস্ক গোরখানার পেছনের কাঠগোলার সামনে তরুণ বয়সী ছেলেরা এসে জড়ো হত সেনিটারী ব্রিগেডের লোকদের সঙ্গে আর আশপাশ গাঁয়ের চাষীদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি করতে। ব্রিগেডের লোকেরা বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা দৈত্যের মত দেখতে এক মর্দোভীয়কে দাঁড করিয়ে দিত। লোকটার মাথাটা ছিল একেবারে লাট্টুর মত, আর চোখ দুটো ঘায়ে ভরা। পা ফাঁক করে ওর দলের লোকদের সামনে এসে দাঁড়াত। তারপর সার্টের ময়লা হাতা দিয়ে জল ভরা চোখ মুছতে মুছতে শহরবাসীদের লক্ষ্য করে ভাল মানুষের মত বলত, 'কেউ আসবে তো এস, নয়ত শেষে শীতে জমে যাব!'

আমাদের হয়ে লড়ত কাপেনড্যুখিন। কিন্তু মর্দোভীয় সবসময়ই ওকে হারিয়ে দিত।

'ওকে যদি হারাতে না পারি তবে আমার জীবনের মূল্য কি?' রক্তাক্ত শরীরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলত কাপেনড্যুখিন।

শেষ পর্যন্ত ওটাই হয়ে উঠল ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেহ-চর্চা শুরু করে দিল কাপেনড্যুখিন। মদ্য পান ছেড়ে দিল। খাওয়ার মধ্যে মাংসই খেত বেশি। রোজ শোয়ার আগে বরফ দিয়ে গা মাজত। মাংসপেশী শক্ত করে তোলার জন্য একটা দু'মণী বাটখারা নিয়ে ব্যায়াম করত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত দস্তানার ভেতরে সীসের টুকরো পুরে সেলাই করে আটকে দিয়ে বেশ কায়দা করে শেষ পর্যন্ত সিতানভের কাছে বলল, 'এবার মর্দোভীয় ব্যাটা খতম।'

'ওগুলো খুলে রেখে দে, নইলে আমি লড়াইয়ের আগে বলে দেব।' কঠিন স্বরে শাসাল সিতানভ।

কাপেনড্যুখিন ভাবতেই পারেনি যে সে এমন কাজ করতে পারে। কিন্তু

লড়াইয়ের আগে হঠাৎ মর্দোভীয়কে ডেকে সিতানভ বলল, 'একটু অপেক্ষা কর ভাসিলি ইভানভিচ ! আগে আমি লড়ব কাপেনদ্যুখিনের সঙ্গে !'

রাগে রাঙ্গা হয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল কসাক, 'আমি তোর সঙ্গে লড়ব না। সরে যা এখান থেকে !'

'হাঁ, লড়তে তোকে হবেই।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেত যেতে বলল সিতানভ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল কাপেনদ্যুখিন, তারপর হাত থেকে দস্তানাটা খুলে কোটের ওপরের পকেটে রেখে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

দুই দলই এতে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে উঠল। অভিজাত চেহারার এক ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল সিতানভকে, 'সাধারণ লড়াইয়ের মাঠে এসে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের ফয়সলা করাটা বে-আইনী ভাই !'

চারপাশ থেকে সবাই সিতানফকে গালমন্দ দিতে শুরু করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর অভিজাত চেহারার ভদ্র লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি যদি একটা হত্যা বন্ধ করে থাকি তো সে ক্ষেত্রে কী বলবেন ?'

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। এমন কি সে টুপি খুলে ফেলে বলল, 'সে ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'এইটুকুই শুধু আমার আবেদন, দয়া করে এ নিয়ে আর কথাবার্তা বলবেন না।

'বলতে যাবই বা কেন ? কাপেনদ্যুখিনের মত লড়ুয়ে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। তাছাড়া বার বার মার খেলে কারু পক্ষে রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটা আমরা বুঝি। কিন্তু এখন থেকে লড়াই শুরু হওয়ার সময় আমরা ওর দস্তানাটা একবার দেখে নেব ভাল করে।'

'ওটা আপনাদের ব্যাপার !'

ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পর আমাদের দলের লোকজনই সিতানভকে গাল দিতে শুরু করল, 'কেন ওসব করতে গেলে, বেকুফ কোথাকার ? কসাক ওকে হারিয়ে দিত ; তা না এখন আমরাই গেলাম হেরে।'

তারা মনের ইচ্ছেয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে গাল দিতে লাগল। এর উত্তরে সিতানভ শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যত সব..।'

তারপর সমস্ত দর্শকদের বিস্মিত করে দিয়ে হঠাৎ সিতানভ মর্দোভীয়কে আহ্বান করে বসল। মর্দোভীয় এসে জায়গায় দাঁড়াল। তারপর মুঠি পাকান হাতটা পাকাতে পাকাতে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'তবে একটু হাতাহাতি করাই যাক ! নেহাৎ একটু গা গরম করা আর কি !'

কয়েকজন দর্শক হাত ধরাধরি করে পেছনের লোকদের সরিয়ে জায়গা বড় করে দিল।

পাক খেয়ে খেয়ে পাঁয়তারা কষতে লাগল লড়ুয়েরা। দুজনার জ্বলন্ত চোখ দুজনার মুখের ওপরে স্থির। ডান হাত এগিয়ে দেওয়া আর বাঁ হাত বুকের সঙ্গে আঁটা। অভিজ্ঞ দর্শকেরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিল যে মর্দোভীয় লোকটার চাইতে সিতানভের হাতদুটো লম্বা। সব শান্ত, শুধু ওদের পায়ের তলায় বরফ গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই উত্তেজক অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অভিযোগ-ভরা ধৈর্যহীন সুরে কে যেন বলে উঠল, 'অনেক হয়েছে, এবার লেগে যাও ভাইরা।'

সিতানভ ডান হাতে ঘুষি মারল, বাঁ হাত তুলে সে ঘুষি ঠেকাতে গেল

মর্দোভীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সিতানভের বাঁ হাতের জোর ঘুষি এসে পড়ল ওর পেটে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তারিফ করতে করতে মর্দোভীয় পেছিয়ে গেল।

'বয়েস কম হলেও বেকুফ নয় দেখছি।'

তারপর আরম্ভ হয়ে গেল দারুণ লড়াই। দুজনেই পরস্পরের বুক লক্ষ্য করে খুব জোরে ঘুষি চালাতে লাগল। একটু পরেই উভয় পক্ষই দারুণ উত্তেজনায় চেঁচাতে শুরু করে দিল, জোরসে মার, দেবতার পট-আঁকিয়ে—ওর মুখটা ভোতা করে দাও!'

মর্দোভীয় সিতানভের তুলনায় অনেক বেশি শক্তসমর্থ কিন্তু কম চটপটে। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ঘুষি চালাতে না পারায় ও একটা মারে তো সিতানভ মারে তিনটে। কিন্তু মনে হল ও সব ঘুষিতে ওর কিছুই লাগছে না। কারণ ও ক্রমাগতই সিতানভকে হাসি-বিদ্রুপ করে চলল আর গর্জাল। তারপর হঠাৎ জোর একটা ঘুষি মেরে সিতানভের ডান হাতটা কাঁধের কোটর থেকে আলগা করে দিল।

'ছাড়িয়ে নাও ওদের, সমান সমান!' একসঙ্গে বহু কণ্ঠের আওয়াজ জেগে উঠল। দর্শকরা দৌড়ে এসে ওদের ছাড়িয়ে নিল।

'ওর গায়ে তেমন তাকত নেই—ঐ দেবতার পট আঁকিয়ের, কিন্তু লোকটা চটপটে খুব!' ভাল মনেই বলল মর্দোভীয়। 'একসময় ও যে একজন ভাল লড়ুয়ে হয়ে উঠবে, একথা বলতে এতটুকুও সঙ্কোচ নেই আমার।'

অল্পবয়েসী বাচ্চারা, যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা এবার ইচ্ছেমত লড়াই আরম্ভ করে দিল! আর আমি সিতানভকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম হাড়-বসান ডাক্তারের কাছে। ওর এই কাজে ও আমার মনে আরো উচ্চ স্থান অধিকার করে বসল। ওর জন্য আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা বেড়ে গেল অনেকখানি।

সিতানভ ছিল সৎ, ন্যায়পরায়ণ। যা করেছে সেটা কর্তব্যের খাতিরেই করেছে মনে হয়। কিন্তু লড়ুইয়ে কাপেনড্যুখিন ওকে পরিহাস করত, 'ছ্যাঃ, সবসময়ে গর্বে ফেপে আছিস, ইয়েভগেনি! সামোভারের মত তোর মনটাকে ঘষে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুলেছিস আর তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়াস। তাকিয়ে দেখ, আমি কেমন চক্‌চকে! কিন্তু তোর মনটা হল পেতলের তৈরী। আচ্ছা রামগড়ুরের ছানা হয়েছিস তো তুই।'

সিতানভ তার কর্তব্য করে যেত, নয়ত লেরমন্তভের কবিতা টুকত তার নোটবইয়ে। অবসর সময়টা সে কবিতা টুকেই কাটাত। আমি একদিন বলেছিলাম, 'কিন্তু আপনার তো পয়সা আছে। গিয়ে বইটা কিনে নিয়ে এলেই তো পারেন!' জবাবে ও বলেছিল, 'না, নিজের হাতে টুকে নেয়াটা অনেক ভাল!'

সুন্দর হাতের লেখায় এক পৃষ্ঠা লিখে নিয়ে কালি শুকোবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বিড় বিড় করে পড়ে চলত ঃ

> 'তুমি ছেড়ে যাও পৃথ্বীতল
> মনে রাখ নাকো শোক বা ক্ষোভ
> সব মাধুর্য ক্ষণস্থায়ী, সব সুখ দেখি কোথা উধাও।'

'এটাই হল আসল সত্য, 'চোখ কুঁচকে বলত সিতানভ, 'ওঃ কী সুন্দরভাবেই না কবি এই সত্যি কথাটাকে মেলে ধরেছেন!'

কাপেনড্যুখিনের সঙ্গে সিতানভের আচরণ দেখে বিস্মিত হয়ে যেতাম আমি।

কাপেনদ্যুখিন মত্ত হয়ে পড়লেই লড়াই শুরু করে দিত সিতানভের সঙ্গে। সিতানভ ধীর-স্থিরভাবে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করত, 'সরে যাও। সাবধান, গায়ে হাত দিয়ো না!'

শেষ পর্যন্ত সে মত্ত কাপেনদ্যুখিনকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে দিত। এমন নিষ্করুণভাবে মারত যে অন্যান্য পটুয়ারা, লড়াই দেখতেই যারা সবচাইতে বেশি আনন্দ পেত, তারা পর্যন্ত এগিয়ে এসে আলাদা করে দিত দুই বন্ধুকে। বলাবলি করত, 'ঠিক সময়ে ইয়েভগেনিকে না ছাড়ালে পিটতে পিটতে ওকে মেরেই ফেলত। নিজের কী হবে না হবে তা ভাবত না একটু।'

এমন কি ভাল অবস্থায়ও কাপেনদ্যুখিন লেগে থাকত সিতানভের পেছনে। কবিতা পড়ার প্রতি ওর প্রবল অনুরাগ আর মর্মান্তিক প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে পরিহাস করত সব সময়ে। কদর্যভাবে ওর ঈর্ষা জাগিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করত। এর প্রতিবাদে একটাও কথা না বলে বা চটে না গিয়ে চুপ করে সিতানভ শুনে যেত ওর ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কোন কোন সময়ে কাপেনদ্যুখিনের সঙ্গে তাল দিয়ে হাসত নিজেও।

ওরা দুজনে ঘুমাত পাশাপাশি। তারপর গভীর রাত অবধি দুজনে মিলে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলত।

ওদের ঐ রাত্রিকালীন কথাবার্তা আমাকে কৌতূহলী করে তুলত। এই ভেবে বিস্মিত হতাম যে এমন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া দুটো লোক কী কথা নিয়ে এমন শান্ত নির্বিকারভাবে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু যখনই আমি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম অমনি কসাক বলে উঠত, 'কী চাস এখানে তুই?'

সিতানভ কিন্তু আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করত না।

কিন্তু একদিন ওরা আমাকে ডেকে প্রশ্ন করল, 'মাক্সিমিচ,' বলল কসাক, 'যদি তোর অনেক পয়সাকড়ি থাকত, তাহলে ও দিয়ে তুই কি করতিস?

'বই কিনতাম।'

'আর কি করতিস?'

'জানি না।'

'হুঁ,' একটা নৈরাশ্যভরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল কাপেনদ্যুখিন।

'দেখলি?' কোমল সুরে বলল সিতানভ, 'কেউ বলতে পারে না। না প্রবীনরা, না তরুণেরা, কেউ না। এমনিতে তো টাকাকড়ির কোন মূল্য নেই, তা দিয়ে কি করছ সেটাই হল আসল...'

'কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তোমাদের?' প্রশ্ন করলাম।

'তেমন কিছু না। ঘুম আসছে না তাই সময় গড়াচ্ছি।' বলল কসাক।

কিন্তু এর পরে ওরা আমাকে ওদের কথাবার্তা শুনতে আর বাধা দিত না। বুঝতে পারলাম যে, যে সমস্ত কথা নিয়ে লোকে দিনের আলোতে আলোচনা করে সেই সব কথাই আলোচনা করে ওরা রাত কাটায়: ঈশ্বর, ন্যায়বিচার, সুখশান্তি মেয়েদের বোকামী আর বিশ্বাসঘাতকতা, ধনীদের লোভ আর সাধারণভাবে জীবনটাই যে একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা—সে সম্পর্কে।

আমি ছিলাম ওদের একজন কৌতূহলী শ্রোতা। ওদের কথাবার্তা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিত। আনন্দিত হয়ে উঠতাম তখন যখন দেখতাম ওরা একথা

স্বীকার করছে যে জীবনটা খুবই কদর্য দুঃখের, কিন্তু তাকেই সুন্দর সুখময় করে তুলতে হবে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করতাম যে শুধুমাত্র জীবনটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সদিচ্ছাতে কেউ কিছু করবে, তা নয়। এতে না এল কারখানার জীবনে কোন পরিবর্তন না এল পটুয়াদের পারস্পরিক সম্পর্কে। এসব আলোচনার জীবন সম্পর্কে আমার ভাবদৃষ্টি কিছুটা খুলে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফুটে উঠত এক ক্লিষ্ট শূন্যতা যার ভেতরে মানুষ উন্মাদ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পুকুরের বুকে শুষ্ক পাতার মত লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর সেই উদ্দেশ্যহীন ভেসে বেড়ানর প্রতিবাদ নিজেরাও অসন্তোষ বোধ করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে।

পটুয়ারা সব সময়েই হয় গর্ব করত, নয় পরিতাপ করত, নয় পরস্পর একজন আর একজনকে দোষারোপ করত, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দারুণ বিবাদ করত বা পরস্পর পরস্পরকে ভীষণভাবে আঘাত করত। পরলোকে ওদের কি হবে না হবে সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করেই ওরা সময় কাটাত। আর অন্যদিকে ইস্কোলক দরজার পাশে যেখানে নোংরা জলের বালতি রাখা হত সেখানকার মেঝের একটা তক্তা পচে গিয়ে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তার ভেতর দিয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটির ভাঁপসা গন্ধভরা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আমাদের পাগুলো জমিয়ে দিত। খড় আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পাভেল আর আমি সে গর্তটা আটকে দিয়েছিলাম। ওরা প্রায়ই বলা বলি করত যে, মেঝের জন্য একটা ভাল তক্তা লাগাতে হবে, কিন্তু গর্তটা ক্রমে বড় হয়ে চলল। ঝড়ের দিনে তার মধ্য দিয়ে শিঙের মত শব্দ তুলে বাতাস বইত আর তারই ফলে সর্দি কাশি লেগে যেত। ঘুলঘুলির ধাতুর চাকাটা এমন বিশ্রী আওয়াজ করত যে সবাই অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করত। কিন্তু যখন আমি তেল লাগিয়ে সেটাকে মেরামত করে দিলাম, তখন ঝিখারেভ কান খাড়া করে বলল, 'ঐ ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরো খারাপ লাগছে!'

স্নানের ঘর থেকে ফিরে ওরা ওদের ময়লা বিছানাতেই গড়াগড়ি করত। এখানে নোংরা পচা দুর্গন্ধ কেউ তেমন গ্রাহ্য করত না। ছোটখাটো যে-সব জিনিসে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে অথচ খুব সহজেই যার প্রতিকার করা সম্ভব তা করার জন্য কেউই কিন্তু কোন চেষ্টা করত না।

প্রায়ই ওরা বলাবলি করত, 'মানুষের ওপরে কার স্নেহমমতা আছে? কারুর না। এমন কি ভগবানেরও নেই...।'

নোংরা আর পোকামাকড়ের কামড়ে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছিল মৃত্যু পথযাত্রী দাভিদভ। কিন্তু যখন পাভেল আর আমি ওকে স্নান করিয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম, তখন ওরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করল। বলল, স্নানের ঘরের চাকর। নিজেদের জামা এগিয়ে দিল উকুন তুলে দিতে। আর এমনভাবে পরিহাস করতে লাগল যেন আমরা খুব একটা চমকপ্রদ লজ্জার কাজ করে ফেলেছি।

বড়দিন থেকে লেণ্ট পর্ব পর্যন্ত দাভিদভ তার মাচার ওপরের বিছানায় পড়ে রইল। বড় বড় রক্তের ডেলা তুলে অনবরত কাশল আর গয়ের তুলল। কিন্তু সেগুলো ময়লার বালতিতে না পড়ে পড়ত গিয়ে মেঝের ওপরে। রাত্রিতে ওর প্রলাপের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় প্রতি দিনই ওরা বলাবলি করত, 'ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে আসতে হবে!'

কিন্তু প্রথমে দেখা গেল যে দাভিদভের পাসপোর্ট নতুন করে করিয়ে নেওয়া দরকার, নয়ত ওকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেবে না। তারপরে মনে হল ও খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সবাই বলতে লাগল, 'এমন কী আর হবে? ও তো মরবেই কয়েকদিনের মধ্যে।'

'হাঁ, শীগ্‌গিরই মরব।' রোগী নিজেও জানিয়ে দিল।

দাভিদভও ছিল খুব কোমল ধরণের হাস্যরসিক। সে আপ্রাণ চেষ্টা করত কারখানার জমাট আবহাওয়া হালকা করে তুলতে। ময়লা রঙের মুখটা মাচার পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে 'ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'হে আত্মীয়রা! যে লোক মাচার ওপরে উঠে আছে তার বাণী শোন…।'

তারপর শান্ত মুখে তাৎপর্যহীন এক বিভীষিকার ছবি আবৃত্তি করে চলত:

'চুপমেরে পড়ে থাকি মাচায়
করি না কোনই গোল,
আরশুলা যদিও ঘিরে ধরে
গায়ের মাংস ছিঁড়ে খায়
ঘুমোই যখন কিংবা থাকি জেগে।'

শ্রোতারা প্রশংসা করে বলত, 'ও আদৌ মুষড়ে পড়েনি!'

মাঝে মধ্যে পাভেল আর আমি চলে যেতাম ওর মাচার ওপর। কৃত্রিম খুশির ভাব এনে ও আমাদের অভ্যর্থনা করত, 'কী খেতে দি তোমাদের বলত বন্ধুরা? বেশ চমৎকার তুলতুলে একটা মাকড়শা খাবে?'

মৃত্যু এগিয়ে আসছিল খুব ধীরে ধীরে আর তাতে ও ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছিল।

'মনে হচ্ছে আমার আর মরা হবে না!' বিরক্তি চাপার কোন চেষ্টা না করেই দাভিদভ বলত।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ওর এই সাহসিকতায় খুব ভয় পেত পাভেল। রাত্রে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'মাক্সিমিচ্! ও বোধহয় মরেই গেছে; এমনি কোন রাত্রে আমরা নিচে ঘুমিয়ে থাকব আর ও মরে যাবে! হা ঈশ্বর! কী সাংঘাতিক ভয় করে আমার মৃত মানুষকে…।'

নতুবা বলত, 'বিশ বছরের আগেই যদি মরে যেতে হলে তো ও এত দিন বেঁচে থাকল কেন?'

এক জ্যোৎস্না রাতে পাভেল আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ভয়ে ওর চোখদুটো গোল গোল হয়ে উঠেছে। বলল, 'শোন!'

মাচা থেকে শোনা যাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে দাভিদভ আর বিড়বিড় করে অথচ স্পষ্টভাবে বকছে, 'এখানে, এখানেই নিয়ে আসা যাক, এখানে।'

এরপর হেঁচ্‌কি তুলতে শুরু করল।

'ও মরে যাচ্ছে, হা ঈশ্বর, সত্যি সত্যিই মরে যাচ্ছে দেখে নিস্!' অপ্রকৃতিস্থের মত ফিস্‌ফিস্ করে বলল পাভেল।

গোটা দিনটা সেদিন আমাকে উঠোন থেকে গাড়ি গাড়ি বরফ তুলে জমিতে ফেলতে হয়েছিল। খুব ক্লান্ত লাগছিল। ঘুম বাদে অন্য কোন কিছুর প্রতিই আমার তখন আর কোন লক্ষ্য ছিল না।

'খৃষ্টের দোহাই, ঘুমোসনে!' একান্ত অনুনয়ের সুরে বলল পাভেল, 'ঘুমোসনে

লক্ষ্মীটি।' তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে উন্মাদের মত চিৎকার করতে লাগল, 'ওঠ, দাভিদভ মারা গেছে!'

কেউ কেউ উঠল জেগে। কেউ কেউ আবার শয্যা থেকে উঠে এসেও বিরক্তি-পূর্ণ ভাবে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?'

মাচার ওপরে উঠে গেল কাপেনদ্যুখিন। তারপর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠল, 'বটেই তো, মনে হচ্ছে মরেই গেছে···যদিও শরীরটা একটু একটু গরম আছে···'

সবাই চুপ হয়ে গেল। ঝিখারেভ ক্রুশ করে কম্বলটা আরো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তাহলে ওর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম নিক।'

'ওকে বরং দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়া হোক।' কে একজন বলে উঠল।

কাপেনদ্যুখিন নিচে নেমে জানালার পথ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভোর অবধি থাক ওখানেই—বেঁচে থাকাকালীন ওতো কোনদিন কারো পথে বাধা দেয়নি।'

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পাভেল। এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু সিতানভের ঘুম ভাঙল না।

পনেরো

মাঠের বুকে বরফ গলছে, আকাশের বুকে গলছে মেঘ। ভিজে তুষার আর বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছে মাটির বুকে। সূর্যের প্রাত্যহিক পরিক্রমণ হয়ে উঠেছে দীর্ঘস্থায়ী। তপ্ত বাতাস। মনে হচ্ছে এর মধ্যেই বসন্ত যেন চলে এসেছে। কেবলমাত্র আবেগে উত্তাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যেন শহরের বাইরে কোথায় কোন মাঠে লুকিয়ে রয়েছে দুষ্টুমি করে। লালচে ধূসর রঙের কাদায় ভরে উঠেছে পথ। বাঁধান পথের ধারে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে জলের স্রোত। আরিস্তান্‌স্কায়া স্কোয়ারে থেকে থেকে জমে ওঠা গলিত তুষারের চারদিকে আনন্দে চড়ুইগুলো লাফালাফি করছে। মানুষগুলোও তাদের মতই চঞ্চল হয়ে উঠছে। বসন্তের এই মর্মরধ্বনি ছাপিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবিরাম বেজে চলেছে লেন্টের ঘণ্টাধ্বনি। মৃদু কোমল দোলানীতে দুলিয়ে চলেছে মানুষের হৃদয়। বয়স্কদের বক্তৃতার মত ঐ ধ্বনির মধ্যে কেমন যেন একটু অভিমান লুকিয়ে রয়েছে। নির্লিপ্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে যেন ঐ ঘণ্টাগুলো বলে চলেছে, 'অ-নে-ক, অনেকদিন আগে, অ-নে-ক···।'

জন্মদিনে ঈশ্বরের মানুষ আলেক্সির চমৎকার আঁকা ছোট একটা মূর্তি কারখানা থেকে উপহার দিল আমাকে। গাম্ভীর্যভরা কণ্ঠে ঝিখারেভ একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিল যা কোনদিনও আমি বিস্মৃত হব না।

'তাছাড়া কে তুই?' ভ্রূ তুলে হাতের আঙ্গুল দিয়ে টেবিলের ওপরে টোকা মারতে মারতে সে বলে চলল, 'বাপ-মা-হারা তেরো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। আর আমার বয়স তোর চারগুণ। তথাপি সেই আমি তোকে বলছি, তোর তারিফ করছি এই কারণে যে জীবন-যুদ্ধে তুই হার মানিসনি। বরং ঋজুভাবে তার মোকাবিলা করে যাচ্ছিস। এই, এই হচ্ছে পথ, সর্বদাই সবকিছুর সঙ্গে এমনি করেই সরাসরি মোকাবিলা করবি!'

এরপর সে ঈশ্বরের দাস আর ভৃত্যদের নিয়ে কি সব বলল। কিন্তু দাস আর ভৃত্যদের মধ্যে তফাতটা যে কি তা আমি বুঝে উঠলাম না। সেও যে এর তফাত

কিছু জানে তাও মনে হল না। ওর বক্তৃতাটা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল; সবাই টিট্‌কারি দিচ্ছিল। আমি মূর্তিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভীষণ বিচলিত হয়ে বিব্রত বোধ করছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কি করব! অবশেষে কাপেনত্যুখিন চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে উঠে বক্তার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'যেন আদ্যশ্রাদ্ধের মন্তর পড়ান হচ্ছে! থাম এবার, ওর কান দুটো যে নীল হয়ে উঠেছে।'

কিন্তু পরে সে নিজেই আমার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল, 'তোর মধ্যে সব থেকে সেরা গুণ হচ্ছে, সকলের দিকেই তোর নজর আছে। তোর এই গুণটা আমি খুবই পছন্দ করি। যার ফলে যখন অন্যায় কিছু করিস তখনও তোকে বকতে বা মারতে পারি না।'

সকলের চক্‌চকে দৃষ্টি আমার মুখের দিকে। আমার বিচলিত অবস্থা দেখে স্নেহভরা ঠাট্টা করছে সবাই। অনুষ্ঠানটা যদি আর কিছুক্ষণ চলত তবে সম্ভবত নিছক এই আনন্দের চোটেই কেঁদে ফেলতাম। এই মানুষগুলোর কাছে আমার মূল্য অন্তত কিছুটা আছে তাহলে। অথচ সেদিন সকালেই বড়বাবু আমাকে লক্ষ্য করে পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কাছে বলেছে, 'অপদার্থ, একটা কাজও করতে পারে না ছোকরা।'

রোজকার মত সেদিন সকালেও বাজারে গিয়েছিলাম। কিন্তু বড়বাবু আমাকে বেলা পড়তেই বলল, 'বাড়ি যা, গোলার ছাদের বরফ চেঁছে তুলে হিম গুদামে ভরে রাখ।'

আজ আমার জন্মদিন ও তা জানত না। ভেবেছিলাম কেউই জানে না।

কারখানার অনুষ্ঠানের পর্ব সমাপ্ত হতে পোষাক ছেড়ে ছুটে উঠোনে গিয়ে গোলার ছাদে উঠলাম বরফ চেঁছে তুলতে। সেবার শীতে তুষারও পড়েছিল খুব। কিন্তু উত্তেজনার ফলে গুদাম ঘরের দুয়োরটা আগে খুলে নিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এতে আমার চেঁছে ফেলা বরফের নিচে ঢাকা পড়ে গেল ওটা। নিজের ভুল বুঝতে পারলাম যখন, তখুনি দুয়োরটা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। বাড়িতে লোহার বেলচা ছিল না, আর বরফ ভিজে শক্ত চাপচাপ ছিল বলে কাঠের যে বেলচাটা দিয়ে কাজ করছিলাম সেটা গেল ভেঙ্গে। 'সুখের পরই আসে দুঃখ' রুশীয় এই প্রবাদ বাক্যটিকে সত্য করে বড়বাবু আমার সামনে এসে দাঁড়াল, 'হুঁ,' আমার দিকে এগিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বেশ কাজ জানিস বটে, জাহান্নামের ভূত! তোর ঐ পাগলা মাথাটা আমি আজ ফাটিয়েই ছাড়ব!'

ভাঙ্গা বেলচার হাতলটা ও উঁচু করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তফাতে সরে কর্কশভাবে বললাম, 'আপনাদের উঠোন সাফ করবার জন্য আমাকে রাখা হয়নি!'

ও হাতলটা আমার পায়ে ছুঁড়ে মারল। আর আমিও সরাসরি এক তাল বরফ নিয়ে ওর মুখের ওপরে ছুঁড়ে মারলাম। বিড়বিড় করতে করতে ও ছুটে পালাল; আর কাজ ফেলে রেখে আমিও সোজা চলে এলাম কারখানায়। কিছুক্ষণ বাদে বড়বাবুর বাগদত্তা মেয়েটি ছুটে নিচে নেমে এল। তরুণীটি চঞ্চল, ফ্যাকাশে মুখ ভরা ব্রণ। বলল, 'মাক্সিমিচ, তোকে ওপরে ডাকছে!'

'আমি যাব না।' বললাম আমি।

'তার মানে, যাবি না কি?' বিস্ময়ে অবাক হয়ে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লারিওনিচ।

সমস্ত ব্যাপারটা ওকে বললাম। চিন্তিতভাবে জ্র কুঁচকে সে নিজেই ওপরে গেল! যাওয়ার আগে আস্তে আস্তে বলল, 'বাড়াবাড়িটা একটু বেশি হয়ে গেছে হে।'

বড়বাবুকে লক্ষ্য করে গালমন্দে মুখর হয়ে উঠল কারখানাটা।

'নিশ্চয়ই ওরা এবার তোকে ভাগিয়ে দেবে!' বলল কাপেনদ্যাখিন।

আমি ভয় পাই না এজন্য। বেশ কিছুদিন যাবত বড়বাবুর সঙ্গে আমার অসহ্য ধরণের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে পড়েছিল। ও আমাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করত। ওর সেই ঘৃণা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল, আমিও এর জবাব দিতাম সমানভাবে। কিন্তু ও আমার সঙ্গে যা সব অদ্ভুত ব্যবহার করত তাতে আমি প্রায় হতবাক্ হয়ে পড়তাম।

স্বেচ্ছায় পয়সা ফেলে রাখত মেঝের ওপরে যাতে ঝাঁট দেবার সময়ে আমি সেগুলো কুড়িয়ে পাই। আমি অবশ্য সেগুলো তুলে কাউন্টারের ওপরে একটা বাটিতে রাখতাম যেখানে ভিখিরীদের দেবার জন্যে পয়সা থাকে। শেষে যখন ওর মতলব বুঝতে পারলাম তখন একদিন ওকে বললাম, 'এভাবে পয়সা ফেলে রেখে কোন লাভ হবে না!'

সতর্কতার সুযোগ না পেয়ে লাল হয়ে রাগে চিৎকার করে ধমকে উঠল সে, 'আমাকে শেখাতে আসিস, এতখানি সাহস তোর! আমি কি করছি না করছি সেটা ভাল মতই জানি আমি!' তারপর আবার বলল, 'আমি ইচ্ছে করে ফেলে রাখি এ কথা ওঠে কি কারণে? ওগুলো এমনিই মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছিল...।'

দোকানে বসে আমার বই পড়াও নিষেধ করে বলল, 'তোর মত লোকের জন্য ওসব নয়। কি মনে করছিস তুই, ধর্মশাস্ত্রের ওপর পণ্ডিত হয়ে উঠবি একটা? ব্যাটা পরগাছা কোথাকার!'

পয়সা চুরির বদনামে আমি যাতে ধরা পড়ি তার জন্য ও উঠে পড়ে লাগল। বুঝতে পারছিলাম ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে একটা সিকিও যদি মেঝের ফাটলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তাহলেই ও আমাকে ঠিক চুরির অপবাদ দিয়ে বসবে। ফের ওকে ওর এই খেলা বন্ধ করতে বললাম। কিন্তু সেই দিনই সরাইখানা থেকে এক কেটলি গরম জল নিয়ে ফিরবার সময় আড়াল থেকে শুনতে পাই ও পাশের দোকানের কর্মচারীটাকে বলছে, 'ওকে দিয়ে একখানা প্রার্থনা-সঙ্গীতের বই চুরি করা, কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা তিন বাক্স ভর্তি নতুন বই আনছি।'

বুঝলাম আমার সম্পর্কেই আলোচনা চলছে। কারণ আমি এসে ঢুকতেই দুজনে বিব্রত হয়ে পড়ল। তাছাড়া পূর্বের এক অভিজ্ঞতা থেকে এমন সন্দেহ করার অতিরিক্ত যুক্তি ছিল যে ও বড়বাবুর সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

কর্মচারীটা দুর্বল রোগাপটকা একটা জীব। চোখদুটো ধূর্ত, মাঝে মধ্যে ওকে চাকরীতে নিযুক্ত করা হত। কারণ একদিকে ভাল কর্মচারী হিসাবে ওর যেমন নাম, অন্যদিকে তেমনি ও ছিল পাড় মাতাল। মদের আড্ডায় গিয়ে বেহুঁস হওয়া মাত্রই মালিক ওকে বরখাস্ত করে দিত; যদিও আবার পরে বহাল করত নতুন করে। বাইরে নম্র, বিনয়ীর ভাব করত, মনিবের সামান্য ইচ্ছেও পালন করত প্রাণপণে। কিন্তু ওর ঠোঁটের কোণে সর্বদাই ফুটে থাকত একটা ধূর্ত হাসি। কটকটে মন্তব্য করতে ভালবাসত। ওর দাঁতগুলো যদিও শাদা ঝকঝকে তবুও ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসত।

হঠাৎ একদিন বেশ হাসি হাসি মুখ করে ও এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর আচমকা আমার টুপিটা ফেলে চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরল। দুজনে মারপিট শুরু হয়ে গেল। গ্যালারীর মধ্য থেকে ও আমাকে দোকানের দিকে টেনে আনল। আর মেঝের ওপরে দাঁড়-করানো বড় একটা মূর্তির ওপরে ঠেলে ফেলতে চেষ্টা করল। যদিও তা পারত তবে কাঁচটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হত, ওপরের কারুকায আর দামা মূর্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ওর গাঁয়ে শক্তি কম থাকার ফলে খুব সহজেই আমি ওকে কাবু করে ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম ঐ দাড়িওলা লোকটা মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে আহত নাকটায় বুলোতে বুলোতে ভীষণভাবে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

পরদিন সকালে দুই দোকানের মনিবরা চলে যেতে আমরা যখন একা হলাম, ফুলে-ওঠা নাক আর একটা চোখের নিচে হাত বুলোতে বুলোতে ও এসে আপোষের সুরে বলল, 'তুই কি ভাবিস আমি স্বেচ্ছায় মারতে গিয়েছিলাম তোকে? আমি অত বোকা নই। জানতাম, তুই আমার সঙ্গে পারবি। কারণ আমি দুর্বল, এর ওপর আবার মাতাল। ওসব আমি মনিবের হুকুমে করেছিলাম। আমাকে বলেছিল, ওকে আচ্ছা করে খুঁচিয়ে দে, আর দেখবি মারপিট করতে গিয়ে যেন ওদের দোকানের দারুণ ক্ষতি হয়ে যায় একটা। তাহলে একটা বড় লোকসান হবে দোকানের।' বিশ্বাস কর, আমি নিজে থেকে এমন কাজ করতাম না কখনো; দেখ তো আমার মুখখানার কি হাল করে দিয়েছিস···।'

ওর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছিল; আর করুণা হয়েছিল ওর জন্য। আধ-পেটা খেয়ে ওর দিন কাটে। এছাড়া একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে, সেও পেটায় ওকে। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা যদি তোমাকে কাউকে বিষ দিতে বলে, তাহলে দেবে?'

'ও যে আমাকে বাধ্য করবে!' একটু করুণ হাসি দিয়ে নরম সুরে বলল, 'ও তাও করতে পারে।'

অন্য একদিন আমার কাছে এসে বলেছিল, 'আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। ঘরে কিছুই খাবার নেই। বুড়িটা সবসময়েই মারছে। তুই যদি তোদের দোকান থেকে আমাকে একটা মূর্তি চুরি করে দিস তবে আমি সেটা নিয়ে বেচে আসতে পারি। এইটুকু করবি আমার জন্যে? নইলে একটা প্রার্থনা-সঙ্গীত?'

জুতোর দোকানে কাজ করবার সময় সেই গির্জের চৌকিদারের কথা মনে পড়তেই ভাবলাম, এ লোকটা নিশ্চয়ই আমার নাম বলে দেবে। কিন্তু তবুও ওকে ফেরাতে মন চায়নি। একটা মূর্তি বের করে দিলাম। কেন জানি মনে হয়েছিল প্রচুর টাকার একটা প্রার্থনা-সঙ্গীত চুরি করার অপরাধ ঢের বেশি। হাঁ, কথাটা অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু বেচাকেনার সঙ্গেই আমাদের নৈতিকতার পরিমাপটা জড়িত। আমাদের অপরাধ-আইনে যা কিছু সহজ সরল পবিত্রতা আছে তার মধ্যে এই গোপন ছোট্ট কথাটাই ধরা দিচ্ছে, এবং এর পেছনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরাট অন্যায় নিহিত।

যখন শুনতে পেলাম আমাদের বড়বাবু আমাকে দিয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত চুরি করাবার জন্য এই হতভাগ্য লোকটাকে তালিম দিচ্ছে, তখন সভয়ে মনে পড়ল স্পষ্ট সে দিনের সেই লুকিয়ে মূর্তি দেবার কথা। বুঝতে পারলাম যে তার লোকসান

করে আমার এই দয়া দেখাবার ব্যাপারটা বড়বাবু জেনে ফেলেছে। অর্থাৎ কিনা পাশের দোকানের লোকটা আমার নামে বলে দিয়েছে।

একজনের ক্ষতি করে আরেকজনকে দয়া দেখাবার এই হালকা ব্যাপারে আর ওদের ষড়যন্ত্রের এই নোংরামোতে নিজের ওপরে এবং সবার ওপরে মনটা বিরক্ত হল। নতুন বই না আসা অবধি দারুণ একটা মানসিক অস্বস্তিতে দিন কাটতে লাগল। অবশেষে বইগুলো এল। গুদামঘরে আমি যখন প্যাক খুলছিলাম পাশের দোকানের লোকটাও তখন এসে জুটল আমার সঙ্গে। পরে একটা প্রার্থনা-সঙ্গীত চাইল।

মূর্তিটার কথা জানিয়ে দিয়েছ মনিবকে?' ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হাঁ,' খোলাখুলি স্বীকার করল লোকটা, 'আমি ভাই কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারি না।'

হতভম্ব হয়ে পড়লাম। মেঝের ওপরে বসে পড়ে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর ও তেমনি ম্লান বিব্রত ভাবে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, তোর মনিব আন্দাজ করেছিল। কিংবা আমার মনিব বুঝতে পেরে ওকে বলে দিয়েছিল।'

বুঝলাম, আমার দফা শেষ। ওরা আমাকে জালে ফেলেছে। এখন হয়ত কোন শিশু-সংশোধনাগারে পাঠাবে। তাই যদি হয় তাহলে আর চিন্তা করে লাভ কি? ডুবতে হলে অতল জলে ডোবাই শ্রেয়। একখানা প্রার্থনা-সঙ্গীত ওর হাতে তুলে দিলাম, ও সেটা পকেটে ঢুকিয়ে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এল আবার; বইটি আমার পায়ের কাছে এসে ছিটকে পড়ল।

'না আমি এটা নিতে পারব না! আমার সর্বনাশ করে ছাড়বি তুই।' বলতে বলতে ও চলে গেল।

ওর কথার কোন অর্থই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি কেন ওর সর্বনাশ করব? কিন্তু ও যে বইটা নিল না, এতে ভেতরে ভেতরে দারুণ খুশি হলাম। এরপর থেকে আমাদের খুদে বড়বাবু আমাকে আরো বেশি বিদ্বেষ ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিল।

লারিওনিচ ওপরে যেতেই এসব কথা আমার মনে ভেসে উঠল। একটু বাদেই আরো গম্ভীর, থমথমে মুখে লারিওনিচ ফিরে এল। রাতে খেতে যাবার আগে দুজনে একা হতেই সে বলল, 'অনেক চেষ্টা করলাম ওরা যাতে তোকে দোকানের কাজ থেকে বরখাস্ত করে শুধু কারখানায়ই রাখে। কিন্তু পারলাম না, কোন কথাই শুনল না কুজমা। ও তোর ওপরে সাংঘাতিক খ্যাপা।'

এ বাড়িতে আমার আরো একজন শত্রু ছিল—বড়বাবুর বাগদত্তা। খেলুড়ে মেয়ে। কারখানার সব তরুণ বয়সীরা ফষ্টি-নষ্টি করত ওর সঙ্গে। ওরা সদর দরজার সামনে অপেক্ষায় থাকত ওর জন্য। আর চটকাত ওকে। এতেও রাগ করত না একটুও, কুকুর-ছানার মত কেবল আস্তে আস্তে কুঁই কুঁই করত। সারাদিন চকো আর ট্রফি চিবোত। এই সব জিনিসে ওর দু-পকেট ভর্তি থাকত সর্বদা। ফ্যাকাশে মুখে ঘূর্ণমান ধূসর চোখ দুটো ভারি বিশ্রী লাগত। পাভেল আর আমাকে প্রায়ই এমন কতকগুলো ধাঁধা জিজ্ঞেস করত যার উত্তর ইঙ্গিতপূর্ণ। নয়ত এমন কতগুলো ছড়া আওড়াত যেগুলো দ্রুত বলতে গেলে অশ্লীলকথা হয়ে ওঠে।

এক বুড়ো পটুয়া একদিন বলেছিল ওকে, 'ভারি বেহায়া তুই!'

এতে হেসে উঠে অশ্লীল গানের একটা লাইন উচ্চারণ করে সে জবাব দিয়েছিল :

'লজ্জাবতী যে মেয়ে
পুরুষে সে যায় না ধেয়ে…।'

এমন ধরণের মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি। ওকে দেখে গা ঘিন্‌ঘিন্ করত আমার, ভয় লাগত ওর অশ্লীল ঢলাঢলিতে। আর ওসবে আমার নির্লিপ্ততা দেখে ও আরো বেশি করে আমার পেছনে লাগত।

নিচের ভাঁড়ারঘরে একদিন পাভেল আর আমি ওকে সাহায্য করছিলাম ক্ভাস ও নোনা শশার পিপাগুলো ধুতে। আমাদেরকে ও বলল, 'চুমু খেতে হয় কেমন করে তা তোদের শিখিয়ে দেব?'

'কেমন করে খেতে হয় তা তোমার থেকে অনেক ভাল করে জানা আছে আমার।' একটু হেসে পাভেল জবাব দিল আর আমি একটু কর্কশ ভাবেই ওকে বললাম বরকে গিয়ে চুমু খেতে। এতে ও চটে গেল।

'ওরে ছোটলোক! এই বুঝি একজন মহিলার আচরণের প্রতিদান! তুই তাকে নাক ভেংচাবি!'

তারপর আঙ্গুল তুলে শাসাল, 'দাঁড়া! তোর এ কথা আমার মনে থাকবে!'

আমাকে সায় দিয়ে বলল পাভেল, 'তোমার এসব নষ্টামির কথা টের পেলে তোমার বরটি আচ্ছা করে টাইট দেবেখন।'

ব্রণভর্তি মুখটা উদ্ধত ভঙ্গিতে কুঁচকে বলল, 'খুব ভয় দেখাচ্ছে! যা যৌতুক আছে তাতে ওর চেয়ে হাজারগুণ ভাল ঢের ঢের বর মিলবে আমার! মেয়েদের ফুর্তি লোটার যা কিছু তা তো বিয়ের আগে পর্যন্তই।'

তারপর সে পাভেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে আরম্ভ করল। আর সেই থেকে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে বেড়াতে লাগল অন্যদের কাছে।

দোকানের কাজে আরো বেশি বিরক্তি লাগতে শুরু করল। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। আর শাস্ত্রবাগীশদের যুক্তিতর্ক শুনে শুনে বিরক্তিতে ধৈর্য হারিয়ে ছিলাম। সর্বদাই ওরা একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করত। একমাত্র পিওত্‌র ভাসিলিয়েভের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। মানুষের জীবনের তমসাময় জীবন স্রোত সম্পর্কে ওর গভীর জ্ঞান আর তার চমৎকার প্রকাশ ভঙ্গির অপূর্ব ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত সাধু ইয়েলিসেই নিশ্চয়ই গোটা পৃথিবীটাকে এমনিভাবে প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে একাকী ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু যখনই মানুষ সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি, যা লক্ষ্য করেছি, তা বুড়োর কাছে বলতাম, ও মন দিয়ে শুনত; পরে সমস্ত কিছুই বলে ফেলত বড়বাবুর কাছে। হয় সে গালমন্দ করত আমাকে, নয়ত ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।

একদিন বুড়োকে জানালাম কবিতা বা যে সব বই পড়ি তা থেকে অংশবিশেষ আমি আমার যে নোট বইটায় টুকে রাখি তাতে বুড়োর কথাও টোকা থাকে। শুনে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তখনি আমার মুখের কাছে নুয়ে পড়ে ভয়ে ভয়ে বলতে লাগল, 'এসব কেন করিস? এটা ঠিক নয়। মনে থাকার জন্য? ওরে না, এমন কাজ কখনো করিস না! কি দুষ্টু রে তুই! আমাকে দিয়ে দে তোর ঐ নোটবইটা, দিবি না?

একগুয়েভাবে বেশ খানিক্ষণ সে নোটবইটা নেবার চেষ্টা করতে লাগল। বলল 'নইলে যেন পুড়িয়ে ফেলে দি।' পরে উত্তেজিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল বডবাবুকে।

বাড়ি ফেরার সময়ে বডবাবু আমাকে বলল, 'কিছু লিখেটিকে রাখিস নাকি। ওসব ছাড়, বুঝলি ? গোয়েন্দারাই কেবল ঐ সমস্ত কাজ করে।

'সিতানভের বেলায় তা হলে কি ?' অসতর্কভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'সেও তো টুকে রাখে।'

'সেও রাখে ? বেকুফ কোথাকার।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অপ্রত্যাশিত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'শোন, তোর নোটবইটা আমাকে দেখা। সিতানভেরটাও। তোকে আমি আধ রুবল দেব। কিন্তু কাজটা লুকিয়ে করতে হবে। সিতানভ যেন টের না পায়।'

যেন ও ধারনা করেই নিয়েছে যে আমি ওর কথা মত কাজ করব। কারণ, আর কিছু না বলে ছোট ছোট পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে বড়বাবু যা বলেছে সিতানভকে তা বললাম। ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল

'ওকে বলতে গেলি কেন ? এখন ও কাউকে আমাদের নোটবই চুরি করবার জন্য লাগাবে। শোন, তোর নোটবইটা আমাকে দে, আমি লুকিয়ে রাখব'খন। ও শিগ্‌গিরই তোকে ভাগিয়ে দেবে, দেখিস।

তাতে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম দিদিমা শহরে এলেই আমিও চলে যাব। ভর্ত্রবরের মেয়েকে লেস বুনতে শেখাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি পুরো শীতকালটাই ছিলেন বালাখনায়। দাদু আবার কুনাভিনোয় গিয়ে বাস করেছেন। একদিনও তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাইনি। তিনিও কোন সময় এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন না। রাস্তায় একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভালুকের চামড়ার বিশাল কোট গায়ে পুরুতের মত গম্ভীর মেজাজে তিনি পথ বেয়ে চলেছেন। নমস্কার জানিয়ে দাঁড়াতেই চোখ ঢাকার জন্য হাত তুলে অন্যমনস্কভাবে বললেন,'আরে তুই। হুঁ হুঁ এখন তুই দেব-পটুয়া হয়েছিস। বেশ, করে যা, করে যা।'

তারপর আমাকে সরিয়ে আগের মত ভারি মেজাজে চলতে শুরু করলেন।

এ সময়ে দিদিমার সঙ্গে অল্পই দেখা হত। দাদুকে জিইয়ে রাখতে আর তার ছেলের ছেলেপুলেদের সাহায্য করার জন্য দিনরাত খাটতে হত তাকে। বয়স বাড়ার জন্য দাদুর মনটাও নরম হয়ে উঠেছিল। দিদিমার বড চিন্তা ছিল মিখাইলের ছেলে সাশাকে নিয়ে। সুন্দর দেখতে, কল্পনাবিহারী যুবক ; দারুণ বই পড়ত, আর কাজ করত রঙের কারখানায়। প্রায়ই এদিক ওদিক জায়গা বদল করত। মাঝে দিদিমার কাঁধে চড়ে একটা কাজ খুঁজে দেবার জন্য ঠায় বসে থাকত। সাশার বোনও কিছু কম দায় ছিল না। একটা পাঁড় মাতাল মজুরকে বিয়ে করেছিল সে। সে মাঝে মাঝে ওকে ঠেঙ্গিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিত।

দিদিমার সঙ্গে যতবার দেখা হত ততবারই তার প্রাণের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হতাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছিলাম যে এই আশ্চর্য জীবনক্ষেত্র হচ্ছে রূপকথার দেশে যা তাকে চারপাশের কঠোর বাস্তব সম্পর্কে অন্ধ করে রেখেছিল। আমি যে সব ভয় আর আতঙ্কে শিটিয়ে যেতাম তা তাকে ছুঁত না।

'সহ্য করতে হবে আলিওশা।'

জীবনের বীভৎস কঠোরতা, মানুষের অসহ্য যন্ত্রণা আর সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমি জোর প্রতিবাদ করতাম দেখে সে সব সম্পর্কে ঐ ছিল তার বক্তব্য।

সহ্য করতে আমি জন্মাইনি। যদি কখনো গরু বা গাছ-পাথরের মত এই গুণটা প্রকাশ করে থাকি তবে তা শুধু নিজের শক্তি আর জোর যাচাই করার জন্য। শক্ত পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়েছি যার জোরে তা বুঝে নিতে। কখনো কখনো অল্প-বয়েসীরা অনভিজ্ঞতার ফলে বোকামি করে কিংবা বড়দের শক্তিকে হিংসা করে তাদের হাড়-মাংস পেশীর বেশি বোঝা তুলতে চায়। হয়ত সফলও হয়। পাকাপোক্ত ব্যায়াম-বীরদের মত এক মণের ভার ওঠাতেই বড়াই করে।

আমিও তাই করতাম— আক্ষরিক ও আলঙ্কারিক দু অর্থে, দেহ-মনের উভয় দিক দিয়ে। এখনো যে মারাত্মক জখম হইনি কিংবা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হইনি, সে আমার বরাতজোর। কারণ সহিষ্ণুতা বা পারিপার্শ্বিক শক্তির কাছে সবিনয়ে মাথা নোয়াবার মত আর কিছু মানুষকে অমন ভয়ানকভাবে পঙ্গু করে দেয় না।

শেষমেষ একদিন যদি পঙ্গু হয়ে ফিরে আসতে হয় মাটি মায়ের কাছে, তবে অন্তত এটুকু গর্বের সঙ্গে বলতে পারব যে আমাকে দাবিয়ে রাখার জন্য সাধুদের অবিচল চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি বহাল থেকেছি।

মানুষকে খুশি করার, মজা দেবার, মুখে হাসি ফোটানর ভীষণ ইচ্ছে আমাকে বেশি বেশি করে পেয়ে বসতে লাগল। সফলও হতাম। নিচের বাজারের ব্যবসায়ী-দের বর্ণনা দেয়া, তাদের নকল অনুকরণ করার একটা পটুত্ব ছিল আমার মধ্যে। অভিনয় করে দেখতাম কি করে চাষীরা আর তাদের স্ত্রীরা মূর্তি কেনে বেচে; বড়বাবু চালাকি করে কেমন ঠকায়; শাস্ত্রবাগীশরা কেমন খালি তর্ক করে চলে।

কারখানার লোকেরা হেসে উঠত। প্রায়ই হাতের তুলি ছেড়ে অভিনয় দেখত। কিন্তু শেষ হলে পর লারিওনিচ বলত, 'তুই বরং সব ঠাট্টা-তামাসা রাতের খাবার পর করিস, তাতে কাজের ক্ষতি হবে না।'

এই সব 'অভিনয়ের' পর খানিকটা হাল্কা বোধ করতাম। মনে হত যেন একটা মোট খালাস করেছি। ঘন্টাখানেক ফুর ফুরে থাকত মগজটা; কিন্তু তারপর ফের ছুঁচলো ছোট ছোট কাঁটায় ভরে উঠত। সে ছিল ভয়ঙ্কর খোঁচা।

আমার চারপাশে যেন একটা অখাদ্য জাউ—যার ভেতর আমি ক্রমশ সিদ্ধ হচ্ছি।

সারা জীবন কি এভাবেই কাটবে? মনে মনে ভাবতাম, এদের মত ভাল কিছু না জেনে, না-দেখেই কি আমাকে বাঁচতে হবে?

'তুই বড় খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিস মাক্সিমিচ।' আমার হাবভাব লক্ষ্য করে একদিন ঝিখারেভ সোজা বলল।

'কি হয়েছে বল তো?' প্রায়ই জিজ্ঞেস করত সিতানভ।

আমার ওপর জীবনের যা কিছু সুন্দরের ছায়া পড়েছিল, আমি নিজেই আবার তা মুছে দিয়ে চলেছি একটানা কঠোরতায়, আর তার পরিবর্তে কতকগুলো অর্থহীন হিজিবিজি দাগ কেটে গর্বে রোষে জীবনের আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছি। সবার মত একই নদীর জলে বয়ে চলেছি। কিন্তু আমার কাছে টানটা যেন আরো ঠাণ্ডা, তাতে ভেসে থাকা আরো দুঃসহ। থেকে থেকে মনে হত যেন অতল গভীরে ডুবে যাচ্ছি।

অথচ লোকে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল। পাভেলের

মত কেউ গাল দিত না। হুকুমও না। আমাকে যে সবাই শ্রদ্ধা করত সেটা দেখাতে সবাই আমাকে পৈত্রিক পদবী ধরে ডাকত। এ সব ভাল লাগার কথা। কিন্তু যখন দেখি সবাই প্রায় মদ খায়, মাতাল হয়ে বেলেল্লাপনা করে, আর মেয়েদের সঙ্গে নোংরামো, তখন কষ্ট হত। যদিও মানতাম যে এমন জীবনে মদ আর মেয়েমানুষই হচ্ছে সব আনন্দ।

দুঃখের সঙ্গে মনে হত, এমন বুদ্ধিমতী সাহসী মেয়ে নাতালিয়া কজ্‌লোভ্‌স্কয়াও ভাবত যে মেয়েছেলে শুধু স্ফূর্তি করার জিনিষ।

তাহলে দিদিমাকে কি বলা যায়? রাণী মার্গোকে?

রাণী মার্গোর কথা মনে আসতেই ভক্তিতে, বিস্ময়ে, হৃদয় ভরে উঠত। সব কিছু থেকেই তিনি এমন পৃথক, এমন স্বতন্ত্র ছিলেন যে মনে হত যেন তাকে শুধু স্বপ্নে দেখেছিলাম, শুধু স্বপ্নেই।

মেয়েদের কথা ভাবতে লাগলাম। ইতিমধ্যেই মনে আসতে লাগল যে, যেখানে সবাই ফূর্তি করে আসে, ছুটিটায় সেখানে গেলে কেমন হয়? এটা যৌন কামনার থেকে নয়। আমি ছিলাম সুস্থ সবল, অথচ খুঁতখুঁতে। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ইচ্ছে করত এমন কাউকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরি, যে খুব নরম, যে আমাকে বুঝতে পারবে, যার কাছে আমার মনপ্রাণের যা কিছু ক্ষোভ লুটিয়ে দিতে পারব, ঠিক যেমন মায়ের কাছে পারতাম।

পাভেলকে হিংসে হত। একদিন পাশাপাশি শুয়ে ও বলল রাস্তার ওপারে একজন পরিচারিকার সঙ্গে ওর গোপন ভালবাসার কথা।

'দ্যাখ ভাই, মাত্র একমাস আগেও ওকে বরফের চাঁই ছুঁড়ে মেরেছি। কোন প্রয়োজন ছিল না, ওকে দিয়ে। আর এখন ঐ বেঞ্চের ওপর গা ঘেঁষে যখন ভাবি, মনে হয়—ওর মত আর কেউ নেই!'

'কি বলিস তুই ওকে?'

'সব কিছু। ও আমাকে বলে আমি ওর সব কিছু আর আমিও তাই বলি। তারপর দুজন দুজনকে চুমু খাই। সত্যি খুব খাঁটি মেয়ে; এত ভাল যে ভাবতেই পারবি না! ও বলে, তুই বুড়ো সেপাইদের মত সিগারেট খাস!'

প্রচুর সিগারেট খেতাম আমি। তামাকের ধোঁয়া মাথায় গিয়ে চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ভোঁতা করে দিত। ভাগ্যের কথা ভদ্‌কার স্বাদ-গন্ধ বরদাস্ত হত না। কিন্তু পাভেল দারুণ মদ টানত। মাতাল হলে করুণ সুরে বিলাপ করত, 'বাড়ি যেতে চাই! আমাকে বাড়ি যেতে দাও...'

ওর বাপ-মা ছিল না। বহুদিন আগেই তারা মারা গেছেন। কোন ভাই-বোনও ছিল না। আটবছর থেকেই ও পরের ঘরে মানুষ।

এই খিটমিটে উড়ুক্কু ভাব, বসন্তের ছোঁয়ায় আরো বেড়ে গেল! ঠিক করলাম জাহাজে ফের কাজ নেব, যাতে আস্ত্রাখানে পৌঁছে পারস্য দেশে পালাতে পারি।

কেন যে পারস্যে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল তা মনে নেই। হয়ত নিঝ্‌নি-নভগোরদের মেলায় পার্শি দোকানদারদের দেখে মন টেনেছিল। মেলায় রোদ পোহাতে পোহাতে ওরা হুঁকো খেত—যেন পাথরের মূর্তি, রং-করা দাড়ি আর বড় বড় কালো দিগ্‌গজ চোখ।

হয়ত সত্যিই চলে যেতাম, যদি না ইস্টারের সপ্তাহে, পটুয়াদের অনেকেই

যখন গাঁয়ের বাড়ি বা খোঁয়াড়তে গেছে, তখন দেখা হয়ে যেত পুরনো মনিব, দিদিমার বোনপোর সঙ্গে।

সে তখন ওকার পারের রোদেভরা মাঠে ঘুরছিল। গায়ে একটা হাল্‌কা ধূসর কোট, প্যান্টের পকেটে দুহাত ঢোকান, দাঁতে চাপা সিগারেট, আর কায়দা মাফিক মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে সরিয়ে হাঁটছিল। এগিয়ে যেতেই বন্ধুত্বের হাসি হেসে সে আমার দিকে তাকাল। হাবভাবে হাসিখুশি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের আকর্ষণ। মাঠের ভেতর সে আর আমি তখন একা।

'পেশকভ নাকি! কবর থেকে খৃস্ট উঠে দাঁড়াচ্ছেন!'

ইস্টার চুম্বন দেওয়া-নেওয়ার পর জিজ্ঞেস করল কেমন কাটছে আমার। খুলে বললাম যে কারখানা আর শহর-জীবন—এক কথায় সবকিছুর ওপর বিরক্তি ধরে গেছে, ঠিক করেছি পারস্যে চলে যাব।

'ওসব চিন্তা বাদ দাও,' গম্ভীরভাবে বলল মনিব, 'গোল্লায় যাক পারস্য! জানা আছে ভায়া, তোমার বয়সে আমারও ইচ্ছে হত কোথাও উড়ে যাই। কোথায় তা দুশমনই জানে!'

'সবকিছু ফুঁকে জাহান্নামে পাঠাব' কথাটা ভারি ভাল লাগল আমার। ওর হাবভাবে কেমন একটা চমৎকার বসন্তের পরিবেশ। সব কিছুই কেমন সপ্রতিভ।

'সিগারেট খাবে?' মোটা সিগারেটে ভর্তি একটা রুপোর কেস ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

এতেই সম্পূর্ণভাবে আমাকে হাত করে ফেলল!

'শোন পেশকভ, আমার কাছে ফিরে এসে যদি কাজ নাও, কেমন হয়? এবার মেলায় চল্লিশ হাজার রুবলের মত কনট্রাক্ট পেয়েছি। সেখানেই তোমাকে রেখে দেব। ওভারসিয়ার ধরণের কাজ। বাড়ির জিনিষ বুঝে নেবে, সর্বত্র ঠিকঠাক পৌঁছোয় কিনা তার দেখাশুনো করবে। মজুররা চুরি করে কিনা চোখ রাখবে। পোষাবে তোমার পক্ষে? মাইনে মাসে পাঁচ রুবল আর রোজ দুপুরের খাওয়া পাঁচ কোপেক। আমার ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না তোমার। ভোরে বেরোবে, সন্ধ্যায় ফিরবে। এর ভেতরে মেয়েদের ছোঁয়া থাকবে না। শুধু ওদের বোল না যে আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা হয়েছিল। 'সেন্ট-টমাস-রবিবারে' সোজা চলে এলেই হবে!'

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যাওয়ার আগে সে আমার করমর্দন করল। এমন কি দূরে গিয়েও টুপি নেড়ে সে বিদায় জানাল।

কারখানায় যখন জানালাম যে চলে যাচ্ছি, তখন ওরা দুঃখ করল। এতে নিজেকে বেশ বড় লাগল। কিন্তু একেবারে মুষড়ে পড়ল পাভেল।

'আমাদের ছেড়ে ঐ চাষাদের মধ্যে থাকতে যাচ্ছিস!' বকুনির সুরে ও বলল, 'যতসব ছুতোর, কাগজ সাঁটিয়ে—ছিঃ! হাকিম থেকে দারোগায় প্রমোশন!'

'মাছ যেমন গভীর জল খোঁজে, মন্দরা তেমন বিপদের খোঁজে থাকে।' ঝিখারেভ বিড়বিড় করল।

পটুয়ারা বিদায় জানাল আমাকে নির্জীব, ভাবহীনভাবে।

'এটা ঠিক যে তোকে এটা সেটা যাচাই করতে হবে।' ঝিখারেভ বলল। প্রচুর মদ খেয়ে মুখখানা সবুজ করে ফেলেছে, 'কিন্তু গোড়া থেকেই একটা জিনিস ধরাই ভাল।'

'সারা জীবন এঁটে থাকা।' ধীরভাবে বলল লারিওনিচ।

বুঝলাম ওরা এসব বলছে জোর করে, নিছক কর্তব্যের খাতিরে। আমরা যে টানে বাঁধা ছিলাম তা হঠাৎ পচে ছিঁড়ে গেছে।

মাচার ওপর মাতাল গোগলেভ নড়েচড়ে উঠে ওর খস্‌খসে রুক্ষ গলায় বলল, 'ইচ্ছে করলে আমি তোদের সবাইকে জেলে দিতে পারি! একটা গোপন কথা জানি। তোরা কেউ ভগবান মানিস না, হো হো হো।'

দেয়ালের গায়ে মুণ্ডহীন মূর্তিগুলো তেমনি রয়েছে। ছাদে কাঁচের বল ঝুলছে। কিছুদিন ধরে আমরা ঐ কৃত্রিম আলো ছাড়াই কাজ করছিলাম। তাই বলগুলো আর কাজে লাগছিল না বলে, ঝুলকালি আর ধুলোতে ঢেকে গিয়েছিল। স্মৃতিতে এ সব এমন দাগ কেটে বসে গিয়েছিল যে চোখ বুজলেই সেই অন্ধকার ঘর, তার ভেতরের টেবিল, জানলার তাকে রঙের টিন, তুলোর বাণ্ডিল, মূর্তি, দেওয়ালের কোণের নোংরা ফেলার বালতি, জেলেটুপির মত হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন, আর মাচার গা থেকে ঝুলে-পড়া গোগলেভের মড়ার মত নীল পা'টা এখনো দেখতে পাই।

চলে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো ছিল মনে। কিন্তু রুশরা ব্যথার মুহূর্ত বাড়াতেই ভালবাসে। বিদায় পর্ব অনেক সময় অন্ত্যেষ্টিতে পরিণত হয়।

ভ্রূ কুঁচ্‌কে ঝিখারেভ বলল, 'দানব' বইটা কিন্তু ফিরিয়ে দিচ্ছি না। চাস তো ওর জন্য কুড়ি কোপেক নে।'

লেরমন্তভের বইটা দিয়ে দিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষত ওটা ফায়ার-ব্রিগেডের বুড়ো শিক্ষকের উপহার। যখন একটু ক্ষুব্ধ হয়েই ওর পয়সাটা ফিরিয়ে দিলাম তখন ঝিখারেভ পয়সাগুলো তার ব্যাগে রাখতে রাখতে অবিচলিত স্বরে বলল, 'তোর খুশি। কিন্তু বইটা ফেরত দিচ্ছি না। ওটা তোর জন্য নয়। ও রকমের একটা বইয়ের জন্যে হঠাৎ ফ্যাসাদে পড়তে পারিস।'

'কিন্তু ও বইতো দোকানে বিক্রি হয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'তাতে কি? পিস্তলও তো দোকানে বিক্রি হয়।' স্থিরভাবে সে জবাব দিল।

সে আর ওটা ফেরত দেয়নি।

যখন মালিকের বিধবা স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে ওপরে গেলাম, তখন দরজার কাছে তার বোনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রশ্ন করল, 'সবাই বলছে, তুই নাকি আমাদের এখনি ছেড়ে যাবি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই হল, নইলে ওরা তোকে ছাঁটাই করত।' তেমন ভদ্রভাবে না বললেও কথাটা দরদ দিয়ে বলল।

আমার মাতাল মনিব-গিন্নী বলল, 'বিদায়, ঈশ্বর তোকে দেখুন! তুই একটা খারাপ ছেলে—ভীষণ রগচটা। আমার সঙ্গে অবশ্য কখনো খারাপ ব্যবহার করিসনি, কিন্তু সবাই বলে তুই বদ!'

হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'হা, আজ যদি আমার স্বামী বেচারা পয়মন্ত থাকত তবে সে তোকে আচ্ছা করে কান মলে দিত, গাঁট্টা মারত কিন্তু ভাগিয়ে না দিয়ে রেখে দিত। দিন দিন সব বদলে গেছে। কিছু একটু গোলমাল হলেই অমনি চলল। হা কপাল! এখন কী হবে তোর, খোকা?'

ষোল

মেলার মাঠের পথ দিয়ে মনিব আর আমি নৌকো করে চলেছি। বসন্তের ফেঁপে-ফুলে-ওঠা নদীর জলে বন্যা জেগে উঠেছে। দুপাশের পাথুরে গাথ্‌নির মাঝখানে দোতলা সমান উঁচু জল। আমি দাঁড় চালাচ্ছিলাম আর মনিব বসেছিল হালে। একটা বৈঠা দিয়ে হাল তৈরি করে এলোমেলোভাবে নাচিয়ে নৌকোটাকে চালাচ্ছিল। নৌকোর মুখটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে গুঁতো মেরে মেরে ঘোলাটে জলের শান্ত ঝিমিয়ে আসা বুকের ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছিল।

'এবার বসন্তে জল কী উঁচুতেই না উঠেছে! গোল্লায় যাক্! আমাদের কাজকর্ম বন্ধ করবে দেখছি!' একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নালিশের সুরে বলে উঠল মনিব। সিগারেটের ধোঁয়া থেকে কেমন একটা কাপড় পোড়ার গন্ধ আসছিল।

'খবর্দার!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মনিব, 'একটা লাইট পোষ্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু!'

তারপর নৌকোটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'খুব চমৎকার একটা নৌকো দিয়েছে দেখছি, আহাম্মক ব্যাটারা!'

জল সরে গেলে যেখান থেকে দোকান মেরামতের কাজ শুরু হবে সে জায়গাটা দেখিয়ে দিল আমাকে। ওকে এখন ঠিকাদারের মত লাগছিল না। পরিষ্কার চাঁছা মুখ, ছাঁটা গোঁফ্, দাঁতের ফাঁকে চুরুট ধরা। গায়ে দিয়েছে একটা চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে উঁচু জুতো, কাঁধে শিকারের ব্যাগ ঝুলছে আর পায়ের সামনে পড়ে রয়েছে একটা দোনলা মূল্যবান শিকারী বন্দুক। অস্বস্তিতে সে কেবল চামড়ার টুপির ভেতরে মাথাটায় ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। কখনোবা ঠোঁট ফাঁক করে টুপিটা চোখের ওপরে টেনে এনে চিন্তাচ্ছন্নভাবে নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। পরমুহূর্তেই আবার টুপিটাকে ঠেলে উঠিয়ে দিচ্ছিল মাথার পেছনে। হঠাৎ যেন ওর বয়েস অনেকখানি কমে গেছে। কী এক মধুর চিন্তায় মোচের আড়ালে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি। ব্যবসায় বাণিজ্যের চিন্তা থেকে ছাড়া পেয়ে এমনি এক ভাবনার স্রোতে ও ভেসে চলেছে যে মনে হয় কাজের কর্কশতা আর শান্ত শ্লথ গতিতে জল নেমে যাওয়ার ভাবনার এতটুকু ছায়াও নেই ওর চোখে মুখে।

আর আমি, এক মূক বিস্ময়ানুভূতির চাপে আমার ভেতরটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। বন্যাপ্লাবিত মৃত নগরী আর নৌকোর পাশ দিয়ে তার শূন্য খিড়কিভরা সারি সারি বাড়িগুলোর নীরবে ভেসে যাওয়া দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল।

ধোঁয়াটে আকাশ। সূর্য মেঘের আড়ালে বন্দী। মাঝে মধ্যে সেই মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে রূপোর একটা বিরাট কন্‌কনে ঠাণ্ডা থালার মত।

জলটাও ধূসর আর ঠাণ্ডা। স্রোত এত শান্ত যে প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। যেন সারি সারি বাড়ি আর হলদে রঙের নোংরা দোকানঘরগুলোর সঙ্গে জমে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফ্যাকাশে সূর্য যখন মেঘের আড়ালে চোখ খুলে দেয় তখন সব কিছু একটু চক্‌চকে হয়ে ওঠে। জলের ওপর ভেসে ওঠে ধূসর আকাশের ছায়া। আর মনে হয় আমাদের নৌকোটা বুঝি দুই আকাশের মাঝে শূন্যে ঝুলে রয়েছে। পাথুরে বাড়িগুলোও যেন জেগে উঠে সবার অজান্তে ধীরমন্থর গতিতে ভলগা আর ওকা নদীর দিকে গোপনে ভেসে চলেছে। ভাঙা পিঁপে, বাক্স, ঝুড়ি, ভাঙা লাঠি আর খড় দুলছে জলের বুকে। কাঠ আর লাঠিগুলো সাপের মত পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে।

এখানে সেখানে এক একটা খোলা জানলা। বেচা-কেনার লম্বা গ্যালারীর ওপর কাপড় শুকোচ্ছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ফেল্টের জুতো। জানলার কাছে একটা স্ত্রীলোক ময়লা জলের দিকে তাকিয়ে আছে। রেলিংয়ের লোহার খুঁটির সঙ্গে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে। লাল রং করা নৌকোটার একপাশের ছায়া পড়েছে জলের বুকে, দেখাচ্ছে তেলমাখানো মাংসের মত।

জীবনের এইসব লক্ষণের দিকে মাথা নেড়ে মনিব বলল, 'ওখানে চৌকিদার থাকে। জানলা দিয়ে ও ছাদে নামে, তারপর নৌকোয় ওঠে। ঘুরে ফিরে দেখে কোথাও চোর চামার আছে কিনা ধারে কাছে। যদি ধারে কাছে কাউকে না দেখে তবে নিজেই চুরি করে।'

নির্লিপ্ত অলস গলায় বলে চলেছে ও। মনটা যেন তার দূরে অন্য কোথাও আবদ্ধ। সবকিছুই নীরব, শূন্য, যেন স্বপ্নের মতই অলীক। ভলগা আর ওকা একাকার হয়ে গিয়ে বিশাল এক হ্রদে পরিণত হয়েছে। দূরে একটা পাহাড়ের বাগানের উঁচুতে গাছের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে শহরের অস্পষ্ট আভাস। গাছ-গুলো এখনো শূন্য, কালো। কিন্তু ফুলে উঠে কুঁড়ির আভাস দিচ্ছে। ফলে সমস্ত বাড়ি ঘর গির্জা সব কিছুই ঢাকা পড়ে আছে সবুজের ছায়ায়। জলের ওপর দিয়ে শোনা যাচ্ছে ইস্টারের দ্রুত ঘন্টাধ্বনি। শহরের আবছায়া কোলাহলও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিরাজ করছে এক পোড়ো গির্জের নিশ্চল নিস্তব্ধতা।

কালো দুই সারি গাছের মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা ধরে পুরনো ক্যাথিড্রেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের নৌকো। মনিবের চুরুটের ধোঁয়া ক্রমাগত তার চোখে গিয়ে লাগছে। আর নৌকোটাও ধাক্কা খাচ্ছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মনিব, 'ভাল নৌকোই বটে বাপু!'

'হাল চালান থামান।'

'তা কি করে হয়?' ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল মনিব, 'নৌকোয় যখন শুধু দুজন থাকে তখন একজন বসে হালে, একজন দাঁড় টানে। ঐ চেয়ে দেখ চীনাদের আস্তানা।'

মেলার মাঠটার খুটিনাটি জানা ছিল আমার। খুব ভাল করেই চিনতাম অদ্ভুত ছাউনী ঢাকা ঐ মজার পাড়াটাকে। তার এক কোণে ছিল বসান অবস্থায় কতকগুলো প্লাস্টারের মূর্তি। অনেক দিন আমি আর আমার সঙ্গিরা মিলে ওগুলোর দিকে ঢিল ছুঁড়েছি। বিশেষ করে আমি ঐ সব চীনাম্যানের প্লাস্টারের প্রতি-মূর্তির কয়েকটা হাত-মুখ খসিয়েই ফেলেছিলাম ঢিল ছুঁড়ে। অবশ্য তার জন্য এখন আর আমার এতটুকুও গর্ব বোধ নেই।

'কুঁড়েঘর।' বাড়িগুলো দেখিয়ে মনিব বলল, 'আমাকে যদি ওগুলো তৈরি করতে দিত ওরা।'

একটা শিস্ দিয়ে টুপিটা মাথার পেছন দিকে উঠিয়ে দিল সে।

কিন্তু কেন জানি আমার মনে হল, একেও যদি তৈরি করতে দেওয়া হত তবে এ-ও ঠিক অমনি বিশ্রীভাবে তৈরি করত, ঠিক একই জায়গায় অমনি অনুচ্চ ছাদওলা। প্রত্যেক বসন্তে এমনি করেই দুটো নদীর জল এসে ভাসিয়ে দিয়ে যেত। ঐ চীনে পাড়ার মত ঠিক অমনি কুৎসিত একটা কিছু বার করত ভেবে ভেবে।

গলুইয়ের ওপর দিয়ে চুরুটটা আছড়ে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে থুথু ফেলল মনিব। তারপর বলে উঠল, 'জীবনটা যে কী অসহনীয় বুঝলে পেশকভ, কি সাংঘাতির বিরক্তিকর! একটাও শিক্ষিত লোক নেই। এমন কেউই নেই যার সঙ্গে দুটো কথা আলোচনা করা যায়। মাঝে মাঝে একটু অহঙ্কার করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু করব কার কাছে? কেউ নেই। শুধু রাজমিস্ত্রি, চাষী, চোর, এই সব।'

ডানপাশে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যেখানে একটা শাদা মসজিদের চূড়া প্রশান্ত ভাবে মাথা তুলে আছে সেদিক তাকিয়ে ও এমনভাবে বলে চলল, যেন কী একটা ভুলে যাওয়া কথা ওর মনে পড়েছে, 'জার্মানদের মত বিয়ার আর চুরুট টানতে শুরু করেছি। জার্মানরা ভাল ব্যাপারী—এমন কুঁদুলে মুরগীর বাচ্চা ওরা, বুঝলে ভাই। বিয়ার খাওয়া—ওটা হচ্ছে একটা অবসর বিনোদনের আনন্দ। কিন্তু মনে হয় চুরুটটা আমার ধাতে তেমন সইবে না। চুরুট খেলেই বৌ গজ্‌গজ্‌ শুরু করবে। বলবে, 'জিন তৈরি করা মুচির মত কিসের গন্ধ বেরচ্ছে তোমার শরীর থেকে? সত্যি, জীবনটাকে একটু আকর্ষনীয় করার জন্য কত কাণ্ডই না আমরা করি! এই যে, ভাঙ্গ করে হাল ধর।'

নৌকোর পাশে বৈঠাটা ফেলে ও বন্দুকটা তুলে নিল হাতে। তারপর ছাদের ওপরে একটা মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি চালাল। চীনাম্যানের মূর্তিটার শরীরে কোন চোট লাগল না, কেবল গুলিটা ভেঙে গিয়ে দেয়াল আর ছাদের ওপর ছড়িয়ে পরে ধুলোর মেঘ জাগিয়ে তুলল।

ফের বন্দুকে গুলি ঢোকাতে ঢোকাতে নির্লিপ্ত সুরে ও বলল, 'লাগল না।'

'মেয়েমানুষের সঙ্গ কেমন লাগে তোমার? ব্রহ্মচর্য শেষ করেছ? করনি? আমি তো তেরো বছর বয়স থেকেই প্রেম করতে শুরু করেছিলাম।'

যেন স্বপ্নের কথা বলছে, এমনি করেই সে তার প্রথম প্রেমিকার কথা বলতে লাগল। যে স্থপতির কাছে ও ছাত্র হিসেবে কাজ করত এবং থাকত, তারই বাড়ির পরিচারিকা ছিল মেয়েটি। ইমারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া জলের মৃদু শব্দের সঙ্গত চলেছে তার প্রণয়-কাহিনীর সঙ্গে। ক্যাথিড্রালের ওপাশে বিস্তীর্ণ জলের মাঝে জেগে উঠছে ঝিকিমিকি। এখানে ওখানে কালো উইলো গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্তির কারখানার পটুয়ারা প্রায় সময়ই সেমিনারির ছাত্রদের গানটা গাইত:

'নীল, নীল সাগর
ঝড়ের সমুদ্দুর...'

নীল রঙের সেই সাগরখানা কি বিরক্তিকর!

মনিব বলছিল, 'রাতের পর রাত ঘুম আসত না। বিছানা ছেড়ে উঠে কুকুর ছানার মত কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়াতাম ওর বন্ধ দোরের পাশে। বাড়িটায় বাতাস আসত প্রচুর। তাছাড়া ওর মনিবও রাত্রে ওর কাছে আসত। সহজেই সে আমাকে ওখানে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাতে ভয় পেতাম না এতটুকুও।'

খুব ভেবে চিন্তে বলছিল, যেন কোন পুরনো কাপড় পরীক্ষা করে দেখছে আবার গায়ে দেওয়া যেতে পারে কিনা।

'লক্ষ্য পড়ল আমার দিকে, মায়া হল আমার ওপরে। এমন কি দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ডেকে নিল, 'চলে আয় বোকা ছেলে'!'

এধরণের গল্প এত শুনেছি যে শুনে শুনে বিতৃষ্ণা লেগে গেছে। তবুও সব গল্পের মধ্যেই ভাল জিনিস একটা থাকত। লোকেরা যখন তাদের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলত, তার ভেতরে অহঙ্কার থাকত না, থাকত না অশালীনতা। আর এমন ভাবভরা আক্ষেপের সঙ্গে তাদের কাহিনী বলে যেত যে আমি অনুভব করতাম সে দিনটাই ছিল তাদের জীবনের সুন্দরতম দিন। সত্যিই অনেকের পক্ষে জীবনের ঐ দিনগুলোই হচ্ছে একমাত্র সুখের দিন।

হাসতে হাসতে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল মনিব, 'কিন্তু এ গল্প কোনি দিনই আমার বৌকে বলতে পারব না! না! এর ভেতর যে কিছু অন্যায় আছে তা নয়, কিন্তু তবু তাকে কিছুতেই বলতে সাহস হবে না। আচ্ছা…'

সে যে আমার কাছেই গল্প করত তা নয়, সে নিজেকেও শোনাত। ও চুপ করলেই আমি কথা বলতাম। ঐ শূন্য নীরবতার ভেতরে কথা বলা, গান গাওয়া, একর্ডিয়ান বাজান খুবই প্রয়োজন ছিল। নইলে মানুষ ঐ হিম ধূসর জলে ডোবা মরা শহরের মধ্যে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ত।

'প্রথমত, অল্প বয়সে বিয়ে কোর না।' আমাকে সাবধান করে দিয়ে সে বলল, 'বুঝলে ভাই, বিয়েটা হল একটা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যখন যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন, পারস্যের মুসলমান কিংবা মস্কোর পুলিসের মতই হোক, তাঁতই বোনো, আর চুরিই কর, ভাল না লাগলে সবই পাল্টান যায়, কিন্তু বৌ আর পাল্টান যায়-না! স্ত্রী হচ্ছে ঋতুর মত, বুঝলে, এর আর অন্য কোন' পন্থা নেই! বৌ তো আর জুতো নয় যে ইচ্ছে মত খুলে একপাশে ফেলে রাখবে!'

ওর মুখের ওপরে একটা ছায়া দেখা দিয়েই পুনরায় মিশে গেল। ভ্রূ কুঁচকে ধূসর জলের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। কথা বলতে বলতে ফোলা ফোলা নাকটা ঘষে নিচ্ছে বার বার, 'হাঁ ভাই, হুঁশিয়ার হতে হবে! হয়ত এমনও হতে পারে যে ঝড়ো হাওয়ায় নুয়ে পড়েছ তবুও পাদুটো গোড়া-গাঁথা হয়ে আটকে আছে। কিন্তু তবুও সবার কপালে ফাঁদ আছেই আছে।'

মেশ্চেরস্কয়ে হ্রদের ধারে ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হ্রদটা এখন ভলগার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'ধীরে ধীরে দাঁড় টান।' ঝোপ লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল মনিব।

কয়েকটা রোগা বন-মুরগী লক্ষ্য করে গুলি চালানর পর বলল, 'কুনাভিনোর দিকে চল! সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব। বাড়ি গিয়ে ওদের বল যে ঠিকাদারের সঙ্গে আমার কাজ আছে।'

কুনাভিনোর একটা বস্তিতে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। ওদিকটাও প্লাবিত হয়ে গেছে বানের জলে। তারপর মেলার মাঠের পথ দিয়ে ফিরে এলাম স্ত্রেল্‌কায়। সেখানে নৌকো রেখে নদীর মোহনা, শহর, জাহাজ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। আকাশে শাদা মেঘ পালকের মত সাজান; যেন একটা বিশাল পাখি ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে। নীল ফাটলের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে সোনালী সূর্য। ওর একটা আলো-রেখাই সমস্ত পৃথিবীটাকে রূপান্তরিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আমার চারপাশের সমস্ত কিছুই এখন দ্রুত গতিশীল। স্রোতের মুখে সর্‌সর্ করে ভেসে যাচ্ছে এক সীমাহীন ভেলার সারি। ভেলার ওপর থেকে

লম্বা দাঁড়ে টান দিয়ে চলেছে শক্ত সমর্থ চাষীরা আর পরস্পর পরস্পরকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে। একটা চলন্ত জাহাজের উদ্দেশ্যে চেঁচামেচি করছে। ছোট জাহাজ একটা শূন্য বজরাকে টেনে নিয়ে চলেছে উজান বেয়ে। চারপাশের ঢেউয়ের ধাক্কায় সরু ডগাটা পাইক মাছের মত এপাশ এপাশ করছে, আর ক্লান্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে চাকার ওপরে নির্মমভাবে আছড়ে পড়া জল ঠেলে ঠেলে চলেছে একগুঁয়ের মত। চারজন চাষী গাদাগাদি করে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বজরাটার ওপরে। একজনার গায়ে লাল জামা। সবাই মিলে গান করছে। গানের ভাষা অস্পষ্ট, কিন্তু গানটা আমার জানা।

মনে হল যেন নদীর বুকের সমস্ত কিছুই আমার পরিচিত। সব কিছুর সঙ্গেই রয়েছে নিবিড় পরিচয়, সব কিছুই আমার বোধ্য। কিন্তু পেছনের ঐ বন্যাপ্লাবিত নগরী যেন একটা দুঃস্বপ্ন, আমার মনিবই যেন সেটাকে তৈরি করেছে আর আমার মনিবের মতই সে স্বপ্ন অত্যন্ত দুজ্ঞেয়।

নদীর দৃশ্যে মন ভরপুর করে বাড়ি ফিরে এলাম। ভেতরে ভেতরে বেশ অনুভব করতে লাগলাম যেন আমি একজন পূর্ণবয়স্ক লোক—যে কোন প্রকার কাজ করার যোগ্যতাই আমার আছে। বাড়ি যাওয়ার পথে ক্রেমলিন পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত তাকালাম ভলগার দিকে। এই চূড়া থেকে পৃথিবীকে মনে হয় যেন অসীম, অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসতাম। রাণী মার্গোর ফ্ল্যাটে এখন একটা বড় পরিবার রয়েছে। তাদের জাঁক করার বস্তু হচ্ছে পাঁচটি মেয়ে—রূপে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। আর আছে দুটো স্কুলে-পড়ুয়া ছেলে। এই তরুণ-তরুণীরা আমাকে বই দিয়ে যেত। লোলুপের মত আমি পড়ে ফেললাম তুর্গেনেভ। শরতকালের হাওয়ার মত স্বচ্ছ তার রচনাভঙ্গির প্রাঞ্জল সাবলীলতায় আর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর বিশুদ্ধতায়, আর যা কিছুই তিনি সবিনয়ে নিবেদন করেছেন তার মাধুর্যে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

পড়লাম পামিয়ালভ্স্কির 'চতুষ্পাঠি'। বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে কী আশ্চর্যভাবে এতে ফুটে আছে মূর্তি কারখানার জীবনের অনুরূপ এক প্রতিচ্ছবি। খুব স্পষ্টভাবেই জানা আছে আমার সেই অসীম শ্রান্তির কথা যার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নির্মম আনন্দে মেতে ওঠে।

রুশ সাহিত্য পড়ে ভাল লাগত। তার মধ্যে পেতাম একটা করুণ বিষাদময় পরিচিত সুর। যেন পাতায় পাতায় বন্দী হয়ে আছে লেন্টেনের বেদনাময় আর্তি। মলাট ওঠালেই যেন সেই মৃদু সঙ্গীত-ধারা ছাড়া পেয়ে জেগে উঠবে।

উদাসীনতার সঙ্গে পড়লাম 'মৃত আত্মা'; তেমনি বিরক্তির সঙ্গেই পড়লাম 'মৃতপুরীর কথা'। 'মৃত আত্মা', 'মৃত্যু পুরী', 'মৃত্যু', 'তিনটে মৃত্যু', 'জীবন্ত মমী'—এগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা। এইসব বইয়ের নামকরণের একঘেয়েমি চোখে না পড়ে পারে না। তাতে বইগুলো সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিরক্তিকর ধারণাই জাগিয়ে তোলে। 'সময়ের পদচিহ্ন', 'ধাপে ধাপে', 'কি কর্তব্য', 'স্মুরিনের হ্যামলেটের ইতিবৃত্ত' বা এ শ্রেণীর বইগুলোও আমার আদৌ পছন্দ হত না।

কিন্তু ডিকেন্স আর ওয়াল্টার স্কটের রচনা পড়তে খুবই ভাল লাগত। অসীম উৎসাহে এক-একখানা বই তিনবার করে পড়েছি। ওয়াল্টার স্কটের বই পড়ে মনে

হত যেন ছুটির দিনের এক অতি সুন্দর গির্জের প্রার্থনা—একটু দীর্ঘ, একটু একঘেয়ে, তবুও আনন্দমুখর। ডিকেন্স আজও আমার কাছে এমন একজন লেখক হিসেবে রয়েছেন যাকে আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি—শিল্প-কলার কঠিনতম যে ক্ষেত্র, মানুষকে ভালবাসার সেই কারু-কলায় অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি।

সন্ধ্যাবেলায় বড় একটা দল এসে হাজির হত বার বারান্দায়। রাণী মার্গোর ফ্ল্যাটের ভাইবোনেরা, ভিয়াচেস্লাভ সেমাশ্‌কো নামে এক ভোঁতা নাক ছাত্র এবং অন্য কয়েকজন। মাঝে মধ্যে আমাদের সঙ্গে প্‌তিৎসিন নামে বড়দরের এক সরকারী কর্মচারীর মেয়ে এসে জুটত। আমরা বই, কবিতা নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালাতাম। এ আলোচনা আমার ভারি প্রিয় আর বোধ্য ছিল। ওদের সবার চাইতে আমি বেশি পড়েছি। কিন্তু প্রায়ই আমার বন্ধু-বান্ধবেরা তাদের স্কুলের কথা আলোচনা করত। শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করত। শুনে শুনে আমার মনে হত ওদের চাইতে অনেক বেশি স্বাধীনতা আমার আছে। বিস্মিত হয়ে যেতাম ওদের সহনশীলতা দেখে। কিন্তু তবুও ওদের দেখে হিংসে হত আমার—ওরা পড়াশুনা করছে।

আমার সঙ্গিসাথীরা বয়েসে ছিল আমার চাইতে বড়। কিন্তু আমার মনে হত ওদের চাইতে আমি অনেক বেশি তৈরি। ঢের বেশি আমার অভিজ্ঞতা। ওদের সঙ্গে আরো বেশি নিবিড় হয়ে উঠতে ইচ্ছে করত। ধুলো বালি মেখে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতাম, ওদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা, ভিন্ন জগতের ভাবনায় ভরপুর হয়ে। ওদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মূলত একই ধরণের ছিল। ওরা মেয়েছেলে সম্পর্কে আলোচনা করত বেশি। একের পর একের সঙ্গে প্রেম করত। চেষ্টা করে কবিতা লিখত। এক্ষেত্রে ওরা প্রায়ই আমার সাহায্য চাইত। সানন্দে কবিতা লেখার ব্যাপারে হাত লাগাতাম। অনায়াসেই ছন্দ আসত, কিন্তু কেন জানি আমার মাথায় সব কবিতাই ব্যঙ্গ কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসত। প্‌তিৎসিনের মেয়েকে আমি নিশ্চিন্তভাবে কোন একটা শব্জীর সঙ্গে তুলনা করে বসতাম—সাধারণত রসুনের সঙ্গে। বেশির ভাগ কবিতাই লেখা হত ওই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে।

সেমাশ্‌কো বলে উঠল, 'ওগুলোকে তুই কবিতা বলিস? ওগুলো হচ্ছে নেহাত চামারের খিলি!'

সবার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে আমিও প্‌তিৎসিনের মেয়ের প্রেমে পড়লাম। কেমন করে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলাম তা আমি আজ ভুলে গেছি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ব্যথার মধ্যে সমাপ্ত হয়ে গেল। একদিন জ্‌ভেজদিন পুকুরের আবদ্ধ জলে ওকে ভেলায় চড়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। ও আমার প্রস্তাবে মত দিল। ভেলাটা পাড়ে এনে আমি উঠে পড়লাম। আমার ভার বইবার মত যথেষ্ট শক্ত ছিল ওটা। কিন্তু লেস-ফিতেয় সজ্জিত মেয়েটি যখন সুষম ভঙ্গিতে আমার উল্টো পাশে উঠে দাঁড়াল, তখন অভিশপ্ত ভেলাটা তার ভারে তলিয়ে গেল। আর ও পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে। পরম বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে দ্রুত পারে তুলে নিয়ে এলাম। কিন্তু ভয়ে আর সবুজ কাদায় তখন মেয়েটার সৌন্দর্যের এমন এক বিদ্‌ঘুটে পরিণতি ঘটল যে তা আর বলার নয়।

সিক্ত পাণ্ডা তুলে চিৎকার করে সে আমাকে শাসাল, 'তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে ফেলে দিয়েছ!'

কিছুতেই ও আমার মার্জনা প্রার্থনায় কান দিল না। এবং সারাজীবনের জন্য আমার চরম শত্রু হয়ে রইল।

শহরের জীবন তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। বুড়ি কর্ত্রী যেমন দেখতে পারত না আমাকে, তেমনি সন্দিহান দৃষ্টিতে দেখত মনিবের স্ত্রী। ভিক্তর আগের চাইতেও বেশি অসামাজিক। কী এক তীব্র বিরক্তি নিয়ে সে সবার ওপরেই রাগে গজগজ্ করত।

মনিব যতটা নকশা আকার কাজ নিত সে আর তার ভাই দুজনে মিলে তা শেষ করতে পারত না। তাই সাহায্য করার জন্য আমার সংবাবাকে ডেকে আনা হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরে খাবার ঘরে ঢুকতেই বহুদিনের ভুলে যাওয়া সেই ভদ্রলোককে দেখলাম চায়ের টেবিলে আমার মনিবের পাশে বসে রয়েছে। আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন ?'

এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অতীত যেন আগুনের শিখার মত ঝল্‌সে উঠে আমার অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

'ওকে তুমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছ।' বলল মনিব।

মলিন মুখে মৃদুহাসি হেসে সংবাবা আমার দিকে তাকাল একদৃষ্টিতে। তার কালো চোখ দুটো আগের চাইতেও বড় হয়ে গেছে। ভীষণ শীর্ণ দেখাচ্ছিল তাকে, স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে। ওর শুষ্ক উষ্ণ আঙুলগুলোর ভেতরে আমার হাতখানা ঢুকিয়ে দিলাম।

'ভাল, আবার সাক্ষাৎ হল আমাদের।' একটু কেশে নিয়ে সে বলল।

যেন এইমাত্র মার খেয়ে এসেছি এমনি দুর্বলের মত বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমরা আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। সে ভদ্রভাবে আমাকে আমার পৈত্রিক নাম ধরে ডাকত, আর তার সমকক্ষের মতই সম্বোধন করত।

'আপনি যখন দোকানে যাবেন, দয়া করে আমার জন্য এক পোয়া লাফেরম তামাক, একশ ভিক্তর্‌সন সিগারেটের মোড়ক আর আধ সের সেদ্ধ সসেজ এনে দেবেন।'

সে আমার হাতে যে পয়সা দিত সেগুলো সর্বদাই কেমন যেন বিশ্রী রকমের গরম বোধ হত। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম, সে ক্ষয়রোগে ভুগছে ; আর বেশি দিন বাঁচবেও না। সেও জানত একথা। তাই কালো দাড়ির সরু আগা মোচরাতে মোচরাতে গম্ভীর শান্ত সুরে বলত, 'আমার এ রোগের প্রকৃতপক্ষে কোন ওষুধই নেই। অবশ্য যদি কেউ অনেক মাংস খায় তবে হয়ত সারতে পারে। কে বলতে পারে—হয়ত আমিও সেরে উঠতে পারি।'

সে প্রচুর পরিমাণে খেত। শুধু খেত আর সিগারেট টানত। মুখ থেকে সিগারেট সরাত শুধু মুখে খাবার ঢোকানর জন্য। প্রতিদিনই আমি তার জন্য সসেজ, শূয়োরের মাংস আর সার্ডিন মাছ কিনে আনতাম। কিন্তু দিদিমার বোন অশেষ পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার চূড়ান্ত মন্তব্য ব্যক্ত করত, 'ছোটখাটো জিনিষ দিয়ে কি আর মরণের চিকিৎসা করা যায়! মৃত্যুর সঙ্গে কারচুপি চলে না গো, কিছুতেই চলে না!'

মনিব গিন্নীরা সবসময় সংবাবার দিকে এমন মনোযোগ দিত যে বিরক্তি ধরে

যেত। সবসময় নতুন কোন ওষুধ খাবার জন্যে জিদ ধরত, আর পেছনে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত।

'সৎ লোকই বটে!' বলত মনিব গিন্নী, 'বলে কিনা, টেবিল থেকে রুটির টুকরো, এঁটো-কাঁটা সবসময় ঝেড়ে রাখা উচিত। নইলে মাছি ধরে!'

'বাস্তবিক বনেদী লোকই বটে!' ঘৃণাভরা অবহেলার সুরে বলত বুড়ি-গিন্নী, 'দেখ না কোটটা সুতো খুলে খুলে কেমন চক্‌চকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওটাকে ঠিক ব্রাশ করা চাই। কি খুঁতখুঁতে, একটা ধূলোর দাগও সহ্য হয় না!'

'একটু অপেক্ষাই কর কিলবিলে মুরগীর ছানারা, শীগ্‌গিরই ও মারা যাবে।' সান্ত্বনার সুরে মনিব বলত।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি নিরক্ষর শহরবাসীদের একটা অর্থহীন বিরূপ মনোভাব আমাকে আমার সৎবাবার পক্ষভুক্ত করল। ধুতরোর ফুল বিষাক্ত হলেও দেখতে তারা সুন্দর!

দম আটকান পরিবেশে এই লোকগুলোর মধ্যে আমার সৎবাবাকে মনে হত যেন মুরগীর খাঁচার ভেতরে একটা মাছের মত। যদিও উদাহরণটা আমাদের জীবনের মতই খাপছাড়া।

সেই 'বাঃ বেশ' লোকটার মতই কতকগুলো গুণ এর ভেতরেও আবিষ্কার করতে শুরু করলাম। কোন দিনই ভুলতে পারব না আমি তাকে। বইয়ের থেকে পাওয়া যা কিছু সুন্দর তার সব কিছু দিয়েই 'বাঃ বেশ' আর রাণী মার্গোর স্মৃতিকে সাজিয়ে তুলেছিলাম। আমার অন্তরে যা ছিল সবচেয়ে সুন্দর, যে সমস্ত সুখপ্রদ রঙ্গীন কল্পনা আমি বই পড়ে পেয়েছিলাম, সবই তাদের ওপর উজার করে ঢেলে দিতাম। 'বাঃ বেশ'এর মতই আমার সৎবাবাও উদাসীন ছিল। তেমনি সকলের কাছে অনাহূত, বাড়ির সবার সঙ্গে তার আচরণ ছিল একই ধরণের। আগে ভাগে কথা বলত না। আর সব কথারই উত্তর দিত সংক্ষেপে, নম্রতার সঙ্গে। সে মনিবকে কিছু শেখাচ্ছে দেখে আমার খুবই আনন্দ হত। টেবিলের পাশে নুয়ে পড়ে আঙ্গুলের লম্বা নখ দিয়ে মোটা কাগজটায় ধীরে ধীরে দাগ কেটে বুঝিয়ে বলত, 'এখানে একটা জোড়া মেরে বরগাটাকে আটকে দেয়া প্রয়োজন যাতে চাপটা ছড়িয়ে পড়ে। নয়ত বরগাটা দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকে যাবে।'

'সত্যি কথা, বিদায় হোক সব।' বিড়বিড় করে বলত মনিব। তারপর আমার সৎবাবা চলে গেলে পরে ওর বৌ বলে উঠত, 'ওকে তোমার ওপরে অমনভাবে শাসন করার অনুমতি দাও কী করে?'

রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর আমার সৎবাবা প্রতিদিন দাঁত ঘষে মুখ ধুত। সে সময়ে সে মাথাটা পেছনে এমনভাবে ঝুঁকিয়ে জল-কুচো করত যে কণ্ঠনালিটা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ত আর তাতে মনিব-গিন্নী বিশেষ রকম ধৈর্যচ্যুত হত।

'আমার মনে হয় ওভাবে পেছন দিকে হেলে পড়া আপনার পক্ষে ক্ষতিকর ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ!' একদিন অসন্তুষ্ট সুরেই বলে ফেলল মনিবের বৌ।

উত্তরে একটু হেসে বিনম্র ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?'

'এমনিই

একটা ছোট হাড়ের তৈরি শলাকা দিয়ে সে আঙ্গুলের নীলচে নখগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল।

'দেখ দেখ! আবার নখও পরিস্কার করে!' সে চলে যেতেই মন্তব্য করল মনিব-গিন্নী, 'এক পা তো কবরের ওপর, আর এখনো··'

'ছ্যাঃ!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মনিব। 'কী বেকুফ তোমরা সব, কিলবিলে মুরগীর ছানারা।'

'তুমি কেন এরকম কথা বলবে?' প্রতিবাদ করল ওর বৌ।

রাত্তে বিদ্বেষের সুরে বুড়ি-গিন্নী ঈশ্বরের কাছে নালিশ করত, 'একসঙ্গে সকলে ঐ পচা লোকটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। ভিক্তরকে আবার ঠেলে ফেলেছে পেছনে।'

ভিক্তর আমার সৎবাবার ভাবসাব অনুকরণ আরম্ভ করেছিল। তার ধীরে হাঁটার ধরণ, সম্ভ্রান্ত সুলভ হাত চালনার নিশ্চিত ভঙ্গি, তার টাই বাঁধার কৌশল আর ঠোঁটে শব্দ না করে খাওয়ার অভ্যাস। প্রায়ই সে অশালীনভাবে জিজ্ঞেস করত তাকে, 'মাক্সিমভ, হাঁটুকে কি বলে ফরাসী ভাষায়?'

'আমার নাম ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ।' মনে করিয়ে দিত সৎবাবা।

'ওহো, ঠিক। আর স্তনকে?'

রাতে খাবার টেবিলে মাকে হুকুম করত ভিক্তর, 'মা মোর দনে মুয়োজাকব দ্যু কন'ড্‌বিফ!'

'আরে ফরাসী হয়ে গেছিস যে।' বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলত বুড়ি-গিন্নী।

উদাসীনভাবে মাংস চিবিয়ে চলত সৎবাবা। যেন কালা বোবা। চোখ তুলেও কারুর দিকে তাকাত না।

মনিব একদিন ভাইকে বলল, 'এখন তো ফরাসী ভাষা বলতে শিখেছিস তুই। এবার তাহলে একটা রক্ষিতাও খুঁজে নে।'

এতে প্রথম আমি আমার সৎবাবার মুখে নীরব একটু হাসি জেগে উঠতে দেখলাম।

কিন্তু রাগের মাথায় মনিব-গিন্নী হাতের চামচটা ছুঁড়ে ফেলে স্বামীকে ধমকে উঠল, 'তুমি কোন সাহসে এমন সব বিশ্রী কথা মুখে আনলে আমার সামনে?'

কোন কোন দিন আমার সৎবাবা পেছনের দরজার দিকে চিলেকোঠার সিঁড়ির নিচে আমি যেখানে ঘুমোতাম, সেখানে এসে আমার কাছে বসত। ওখান-টাতেই সিঁড়ির জানলার কাছে বসে বই পড়তাম আমি।

'পড়ছেন?' একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল। সাথে সাথে এতটা ধোঁয়া টেনে নিল যে মনে হল তার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত কাঠের মত যেন কী নড়েচড়ে উঠল। 'কি বই?'

আমি তাকে বইটা দেখালাম।

'ও,' বইয়ের নামটা দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে বইটা পড়েছি! সিগারেট খাবেন?'

জানলার পথে অপরিষ্কার উঠোনটার দিকে চোখ রেখে দুজনে সিগারেট টানতে লাগলাম। বলল, 'লেখা পড়া হচ্ছে না আপনার, খুব খারাপ, মনে হচ্ছে আপনার যোগ্যতা আছে।'

'কিন্তু আমি তো পড়াশুনো করে যাচ্ছি, প্রচুর পড়েছি।'

'ওতেই হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রয়োজন। প্রয়োজন একটা নিয়ম অনুসারে পড়া।'

সাধ হল বলি, 'আপনি তো বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছেন, শিখেছেন নিয়ম অনুসারেই, কিন্তু মশাই আপনার তাতে হয়েছে কী শুনি?'

যেন আমার ভেতরের কথা জানতে পেরেই সে ফের বলল, 'কারো যদি দৃঢ় লক্ষ্য থাকে, তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাকে ভাল করেই গড়ে তোলে। শিক্ষাই এই জীবনের রূপান্তর আনতে পারে।'

একাধিকবার সে আমাকে বলেছে, 'এখান থেকে চলে গেলেই আপনার পক্ষে ভাল হত। আপনার এখানে পড়ে থাকায় আমি কোন সুবিধাই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু মজুরদের আমার ভাল লাগে।'

'ওদের মধ্যে ভাল লাগার মত কী দেখলেন বলুন তো?'

'ওরা মূর্খ নয় কিন্তু।'

'হয়ত।'

একদিন বলল, 'যদি তাই বলেন, তবে স্বীকার করতেই হবে আমাদের মনিবরা একেবারে পশু—কী ভয়ঙ্কর পশু ওরা!'

মনে পড়ল কবে কোন অবস্থায় মা ঠিক ঐ কথাটাই বলেছিল, সাথে সাথে আমি নিঃশ্চুপ হলাম।

'আপনি স্বীকার করেন না একথা?' সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ করি।'

'তা দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু তবুও আমার মনিবকে আমার ভাল লাগে।'

'এটা ঠিক, ভালমানুষ গোছের চাষী বলে মনে হয় লোকটাকে; তবুও কেমন যেন হাস্যকর।'

মনে করেছিলাম বই নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু দেখছি ও বই নিয়ে তেমন ভাবে না।

'বইটই নিয়ে অত বেশি সময় নষ্ট করবেন না।' সর্বদাই বলত, 'বইয়ে সমস্ত কিছুই বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখে, কোন না কোন দিক বিকৃত করে দেখায়। অধিকাংশ লেখকই আমাদের মনিবের মত তুচ্ছ লোক।'

এরকম মন্তব্য প্রকাশ করা বেশ দুঃসাহসের বলে মনে হত আমার, তাই ভেতরে ভেতরে ওকে তারিফ করতাম আমি।

'গন্চারোভ পড়েছেন?' আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করল।

'রণপোত পাল্লাদা।' বললাম।

'পাল্লাদা' বইটা একটু একঘেয়ে। কিন্তু মোট কথা গন্চারোভ হলেন রুশিয়ার মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান লেখক। ওঁনার 'অবলোমভ' বইটা আপনাকে পড়তে বলছি। ওঁর লেখা বইয়ের মধ্যে সব থেকে বেশি দুঃসাহসী, সত্যবাদী। রুশ সাহিত্যে এটাই হল শ্রেষ্ঠ বই।'

ডিকেন্স সম্পর্কে বলল, 'বাজে, বলছি যা শুনুন। কিন্তু ইদানিং একটা ভারি চমৎকার ভাল লেখা বের হচ্ছে 'নিউ টাইমস সাপ্লিমেন্টে'—'সেন্ট এন্টনির

প্রলোভন'। আপনার পড়া উচিত। মনে হয় গির্জে আর আধিদৈবিক ব্যাপার সম্পর্কে আপনার দারুন কৌতুহল আছে। 'প্রলোভন' বইটা পড়লে আপনার উপকার হবে।'

নিজেই সে বেশকিছু 'সাপ্লিমেন্ট' আনল। আর আমিও ফ্লবেয়ারের চাতুর্যপূর্ণ লেখাটা পড়লাম। পড়তে পড়তে মনে এল যে সব অসংখ্য সাধু-সন্তদের জীবনী পড়েছি, তাদের কথা, আর সনাতনপন্থীদের কাছে কিছু কিছু শোনা গল্পের কথা। কিন্তু লেখাটা আমার অন্তরে সে রকম কোন গভীর দাগ কাটল না। এর থেকে অনেক বেশি আনন্দ পেলাম 'উপিলিও ফেইমালির স্মৃতি', 'পশু-শিক্ষক' পড়ে। সাপ্লিমেন্টেই প্রকাশিত হয়েছিল ওগুলো।

এ কথা আমি যখন আমার সংবাবাকে বললাম সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'তার মানে এ বই বোঝার মত বয়স এখনো আপনার হয়নি। কিন্তু এ বইটার কথা যেন ভুলবেন না।'

মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশ্চুপ হয়ে বসে থাকত আমার পাশে। একটা কথাও বলত না। শুধু কাশত আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াত। তার আকর্ষনীয় চোখ দুটোয় কেমন ভয়ঙ্কর একটা আভা জ্বলত। তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে বিস্মৃত হয়ে যেতাম, এই যে-লোকটা বিনা অভিযোগে মৃত্যুর দিকে বয়ে যাচ্ছে, এককালে সে আমার মায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, আর নিদারুণ নির্মম আচরণ করেছিল তার সঙ্গে। জানতাম, আজকাল ও একটি মেয়ে-দর্জির সঙ্গে বাস করছে। মেয়েটির কথা ভাবতে অবাক লাগত, করুণা হত। কী ভাবে সে ঐ কঙ্কালের আলিঙ্গনে ধরা দেয়, চুমু খায় বিশ্রী পূতি-গন্ধ ছড়ান ঐ মুখে? 'বাঃ বেশ' এর মত আমার সংবাবাও মাঝে মাঝে হঠাৎ খুব উঁচুদরের সব মৌলিক মন্তব্য করে বসত, 'শিকারী কুকুর বেশ পছন্দসই আমার। ওগুলো নির্বোধ, তবুও ভালবাসি। কারণ দেখতে সুন্দর ওরা। সুন্দরী মেয়েরাও তো হামেশাই বোকা হয়।'

একটু গর্বসহকারেই ভাবলাম, 'রাণী মার্গোর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে বেশ হত!

'যারা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটায় ধীরে ধীরে তাদের সকলকে দেখতে একই রকম হয়ে যায়!' একদিন বলল সে। কথাটা আমি আমার নোটবইয়ে তুলে রাখলাম।

চূড়ান্ত আনন্দ অনুভব করার মত তার ঐ সব কথা শোনার জন্য আমি আগ্রহান্বিত হয়ে থাকতাম। যে বাড়িতে সকলেই নিছক সাধারণ রূপরসহীন একঘেয়ে কথাবার্তা বলে সেখানে এই সব মৌলিক কথার জন্য বেশ আনন্দ পেতাম।

সংবাবা কখনো আমার কাছে আমার মায়ের কথা বলত না। কোন দিন তার নামও উচ্চারণ করেনি। এতে খুবই খুশি হতাম আমি। ওর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব বোধ করতাম।

ঈশ্বর সম্পর্কে একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কী কারণে করেছিলাম মনে নেই। আমার মুখের দিকে চোখ রেখে অতি শান্ত গলায় জবাব দিল, 'আমি জানি না। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই।'

সিতানভের কথা মনে পড়ল। তার কথা জানালাম আমি সংবাবাকে। আমার বলা শেষ হলে সে তেমনি অতি শান্তভাবে বলল, 'ও অস্বীকার করে যুক্তি

দিয়ে। যারা যুক্তির সাহায্যে বিচার করে তারা একটা না একটা কিছুতে বিশ্বাস করে। আমার বিশ্বাসই নেই একদম।'

'কিন্তু তা তো অসম্ভব!'

'কেন? নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন—কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই আমার।'

আমি কেবলমাত্র একটা জিনিষই দেখতে পাচ্ছিলাম যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ও। ওর জন্য যে আমার কোন করুণা হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমার এক প্রতিবেশী একজনের মৃত্যু, যার রহস্য গভীরভাবে আমার হৃদয় ছুঁয়েছিল।

এইতো আমার কাছের একটি লোক যার হাঁটুর স্পর্শ লাগছে আমার হাঁটুতে। সচেতন, বুদ্ধিসম্পন্ন নানান লোকের সঙ্গে নানান রকম সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সে মানুষকে দেখছে। বিচার ও সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তার আছে এবং সে ক্ষমতা দিয়েই কথা বলে চলেছে সমস্ত কিছু সম্পর্কে। তার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্তত যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলোকে আঙুল তুলে দেখাতে পারে সে। এমন একটি প্রাণী যে নাকি আশ্চর্য রকমের জটিল, ভাবনার আগ্নেয়গিরিতুল্য। ওর প্রতি ধারণা আমার যাই হোক না কেন, ও যেন আমারই একটা অংশ। আমার মধ্যেই কোথাও যেন ওর বাস। কেননা, যে মুহূর্তে আমি ওর কথা মনে আনলাম তক্ষুনি ওর অন্তরের ছায়া পড়ল আমার অন্তরে। কাল সে নিঃশেষ হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে মুছে যাবে। ওর মস্তিষ্কের, ওর হৃদয়ের যা কিছু কম্পিত হয়ে উঠেছিল, ওর দুটি আকর্ষণীয় চোখের দৃষ্টির মধ্যে আমি যা কিছু দেখেছি বলে ভাবছি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব কিছুই। সে চলে যাবে আর সংসারের সঙ্গে আমার অসংখ্য বন্ধনের একটা সূত্র কেটে যাবে। পড়ে থাকবে কেবল একটা স্মৃতি। আর স্মৃতির সমস্তটাই থাকবে কেবলমাত্র আমার অভ্যন্তরে, সে স্মৃতি পরিসমাপ্ত, অপরিবর্তনীয় অথচ প্রাণময় পরিবর্তনশীল মানুষটি যাবে চলে।

কিন্তু এ হচ্ছে নিছক ভাবনা। এর পশ্চাতে আছে অব্যক্ত ব্যাখ্যাতীত এমন একটা কিছু যা এই ভাবনাকে ধারণ করে, লালন করে; চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যে যা আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসায় বাধ্য করে আর দাবি করে এই প্রশ্নের উত্তর—কেন?

'ভয় হচ্ছে হয়তবা কিছুদিনের মধ্যেই বিছানা নিতে হবে আমাকে।' এক বর্ষার দিনে জানাল সংবাবা। 'এমন একটা জঘন্য দুর্বলতা বোধ হচ্ছে যে কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না।'

পরের দিন বিকেলের দিকে চায়ের সময়ে যেন আরো অসন্তোষের ভাব নিয়ে টেবিল আর হাঁটুর ওপর থেকে রুটির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলল। তারপর হাত নাড়িয়ে যেন অদৃশ্য কিছু একটা দূরে ঠেলে দিল। ভ্রূ ভেঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ি গিন্নী বৌয়ের কাছে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখ, ও নিজেকে ঝেড়ে মুছে তৈরি করে নিচ্ছে।'

দুদিন পর আর কাজে এল না সে। পরে গিন্নী-বুড়ি একটা বড় শাদা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে কাল দুপুরে একটা মেয়ে দিয়ে গেছে এটা। তোকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। মেয়েটা খারাপ নয় দেখতে—কিন্তু বুঝে উঠতে পারলাম না তার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কি!'

খামের মধ্যে হাসপাতালের একটুকরো কাগজে সংবাদটি বড় বড় করে লেখা।

'ঘন্টাখানেকের জন্য যদি ছুটি পান, আমাকে দেখে যাবেন। মার্তিনভ্স্কায়া হাসপাতালে আছি। ইয়ে. ম.।'

পরের দিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে শয্যার ধারে পায়ের দিকে বসলাম। বিছানার তুলনায় তার শরীরটা দীর্ঘ। ধূসর মোজা-পরা দুটো পা খাট থেকে বেরিয়ে আছে। আকর্ষণীয় চোখদুটো দেয়াল ঘুরে একবার আমার মুখে, তারপর মাথার ধারের টুলে বসা একটি মেয়ের হাতের ওপরে গিয়ে পড়ছে। মেয়েটি বালিশে হাত রাখতেই সংবাবা তার হাতে গাল ঘষছে আর তার মুখটা হাঁ হয়ে উঠছে! মেয়েটিকে দেখতে গোলগাল সাদামাটা, কালো পোশাক পরণে। সুগঠিত মুখের ওপর গড়িয়ে নেমে আসছে অল্প অল্প চোখের জল। নীল চোখ দুটো সংবাবার মুখের ওপরে নিবদ্ধ—সে মুখে গালের দুটো হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে নাক আর বিবর্ণ মুখ।

'একজন পুরুতকে যদি ডাকতে দিত এখন', আস্তে আস্তে মেয়েটি বলল, 'কিন্তু ও ডাকতে দেবে না, ও বোঝে না এখন···' বালিশ থেকে হাত দুটো তুলে বুকের কাছে চেপে ধরল মেয়েটি, যেন প্রার্থনা করছে।

ক্ষণিকের জন্য সংবাবার ঘোর কাটল। ভ্রূ ভেঙ্গে সিলিংয়ের দিকে চোখ রেখে কী একটা কথা মনে আনবার চেষ্টা করল। শীর্ণ হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'আপনি? ধন্যবাদ। শুনুন—আমার মনে হয়—কোন মানে হয় না···'

এটুকুতেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করল। তার নীলাভ নখ সমেত সরু সরু লম্বা আঙুলগুলোতে ধীরে ধীরে আমি হাত বুলোতে লাগলাম। মেয়েটি মৃদু অনুনয়ের সুরে বলল, 'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, রাজী হয়ে যান!'

'আপনাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' চোখের ইশারায় আমাকে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল সে, 'চমৎকার মেয়ে···'

বলতে বলতে চুপ করে গেল। মুখখানা হাঁ হয়ে রইল। আচমকা কাকের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা চিৎকার দিয়ে উঠল। তারপরই বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে করতে কম্বল ফেলে তোষকটা আঁকড়ে ধরল। মেয়েটিও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে মুখটা বালিশের মধ্যে চেপে ধরল। খুব দ্রুত সংবাবা মারা গেল। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার সম্পূর্ণ চেহারাটা যেন শান্ত সৌন্দর্যে ছেয়ে গেল।

হাত দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এলাম। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে টালমাটাল ভাবে চলেছে রোগীর মত। একটা রুমাল গোল করে পাকান একহাতে। একবার এ চোখে আর একবার ও চোখে রুমালটা চেপে ধরছে আর আরো শক্ত করে পাকিয়ে চলেছে তাকে। এমনভাবে, এমন করে রুমালটার দিকে তাকাচ্ছে যেন ওটাই ওর একমাত্র শেষ সম্বল!

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে আমার শরীরের কাছাকাছি এসে অভিযোগ ভরা সুরে বলে উঠল, 'শীতকালটা অবধি তো বাঁচল না···হায় ভগবান, এমন করলে কেন?'

পরে চোখের জল ফেলতে ফেলতেই আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'বিদায়। ও সর্বদাই আপনার সুখ্যাতি করত। কাল সৎকার।'

'বাড়ি দিয়ে আসব আপনাকে?'

চারপাশটা তাকিয়ে দেখল, 'কেন? দিনের আলো তো এখনো আছে।'

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তার চলার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। যেন তার জীবনে সকল রকম আকর্ষণ হারিয়ে গেছে।

আগষ্ট মাস। পাতা ঝরছে। সংবাবার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার সময় পাইনি। মেয়েটিকেও দেখিনি আর কোন দিন।

সতেরো

প্রতিদিন ভোর ছ'টায় উঠে মেলার মাঠে কাজে চলে যেতাম। সেখানে দেখা হত অনেক লোকের সঙ্গে। ছুতোর মিস্ত্রি অসিপ—পাকা চুল, ধারাল জিভ সুদক্ষ কারিগর। ঠিক সেন্ট্ নিকোলাইয়ের মত দেখতে। ছাদ-পিটুনি মিস্ত্রি কুঁজো ইয়েফিমুশ্কা। পাথর-মিস্ত্রি পিওতর—ভাবুক ধর্মভীরু গোছের। ওকেও সাধুর মত দেখতে। আকর্ষণীয় চেহারার রাজমিস্ত্রি গ্রিগোরি শিশ্লিন—লালচে দাড়ি, নীল চোখ, শান্ত প্রীতি ঝরে পড়ছে সর্বদা।

দ্বিতীয়বার নকসা-নবীশের কাছে কাজ করতে এসেই এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রতি রবিবার শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে ওরা রান্নাঘরে এসে ঢুকত। ওদের কথাবার্তার ধরণ ভাল। তার মধ্যে এমন অনেক আকর্ষণীয় কথা থাকত যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন লাগত আমার কাছে! ভারিক্কী চেহারার এইসব চাষীরা সকলেই খুব ভাল মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই তার নিজস্ব বিশেষ একটা আকর্ষণ বর্তমান। কুনাভিনোর মদমত্ত ছ্যাঁচড়া দোকানীদের চাইতে এরা ঢের ভাল।

সে সময় রাজমিস্ত্রি শিশ্লিনকে ভেতরে ভেতরে আমি আমার প্রিয়পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। এমন কি ওকে বলেছিলাম একদিন আমাকে ওর সাগরেদ করে নিতে। কিন্তু সাদা আঙুল দিয়ে সোনালী ভ্রূ কচলাতে কচলাতে ভদ্রভাবেই ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। বলল, 'এখনো তুমি খুবই ছোট! আমাদের কাজ তেমন সোজা নয়—আরো দু-এক বছর যাক।' পরে মাথাটাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে বলল, 'জীবনটাকে খুব কঠিন মনে হচ্ছে, না? তাতে কি, সইতে চেষ্টা কর দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে ঠিক রাখ, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জানি না ওর সেই আন্তরিক উপদেশে আমার কোন উপকার হয়েছিল কি না, কিন্তু একান্ত কৃতজ্ঞতায় কথাটা আমি মনে রেখেছিলাম।

ওরা প্রতি রবিবারে আমার মনিবের বাড়িতে আসত। রান্না ঘরের টেবিলের সামনের বেঞ্চে বসত। আর মনিবের অপেক্ষায় থেকে থেকে আলাপ-আলোচনা চালাত মজার মজার। মনিব চোস্ত মেজাজে এসে ওদের সম্ভাষণ জানাত, ওদের শক্ত হাতের সঙ্গে করমর্দন করত। বসত গিয়ে কোণের দিকে. তারপর টাকা আর রসিদপত্র দেখার পালা শুরু হত। চাষীরা তাদের বিল আর জীর্ণ হিসেবপত্রের খাতা বের করে টেবিলে রাখত। সপ্তাহের হিসেবপত্র মিটিয়ে ফেলা হত।

প্রচুর হাসি ঠাট্টা আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মনিব ওদের ঠকাবার চেষ্টা করত; আর ওরাও চেষ্টা করত মনিবকে ফাঁকি দিতে। কোন কোন সময়ে বিরূপ তর্কাতর্কি লেগে যেত। কিন্তু সাধারণত হাসাহাসির মধ্যে পরস্পর আপোস করে নিত।

চাষীরা মনিবকে বলত, 'তুমি একটা আস্ত নচ্ছার হয়ে জন্মেছ, দোস্ত।'

বোকার মত হেসে মনিব জবাব দিত, 'তা চুরি করতে তোমরাও তো কিছু কম ওস্তাদ নও, কুঁড়লে মুরগীর ছানার দল।'

'বটেই তো।' স্বীকার করত ইয়েফিমুশকা। সঙ্গে সঙ্গে পিওতর গম্ভীর স্বরে বলে উঠত, 'মানুষ তো চুরির ওপরেই বেঁচে থাকে। তার সৎ উপার্জনের পুরো-পুরিটাইতো যায় ঈশ্বরের কাছে, জারের হাতে।'

'তাহলে তোমাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু তুলে নিলে আমার তেমন দোষ নেই বল!' হেসে উঠত মনিব।

ওরা সহজভাবেই ধরত তার কথা, 'অর্থাৎ তুমি আমাদের গায়ের ছাল তুলে নিতে চাও? ধোকা দিচ্ছ আমাদের?'

এক মুখ ঘন দাড়ির মধ্যে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে সুরেলা কণ্ঠে বলত গ্রিগোরি শিশ্‌লিন, 'কাউকে না ঠকিয়ে আমরা যদি যার যার কাজ করে যাই তাহলে কেমন হয় ভাইরা? যদি আমরা ঠিক পথে চলি? তাহলে সবকিছু কি সুন্দর সহজ হয়ে যেত? কী বল, ভাল মানুষের দল?'

ওর নীল চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে কালো হয়ে আসত। তখন ভারি সুন্দর লাগত ওকে। ওর কথায় সবাই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করত। বিচলিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিত সকলে।

'চাষীরা ঠকাতে পারে না কাউকে।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শান্ত অসিপ বলত। যেন চাষাদেরও অনুকম্পার চোখে দেখছে।

কালো চেহারার চওড়া কাঁধের পাথর-মিস্ত্রি টেবিলের ওপরে ঝুঁকে বলত, 'পাপ হল চোরাবালি—যত এগুবে ততই ডুববে।'

গলার স্বর নামিয়ে মনিব বলত, 'আমিও সায় দিচ্ছি তোমাদের কথায়।'

এই ধরণের কিছু দার্শনিকতা করার পর ওরা দর কষাকষি আরম্ভ করত, কে কার থেকে দু'পয়সা বেশি জিতবে তার জন্য। হিসেব নিকেশ মিটে গেলে ওরা ঘেমে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। তখন মনিবকে ডেকে সরাইখানার দিকে যেত চা খেতে।

যাতে কেউ ইট, কাঠ, পেরেক ইত্যাদি চুরি না করে মেলার মাঠে, তার তদারকি করতাম আমি। মনিবের কাজ ছাড়াও প্রত্যেকেরই নিজেদের কিছু ঠিকে কাজ ছিল; সবাই চেষ্টা করত তার জন্য মালপত্তর সরাতে।

আমাকে ওরা বন্ধুর মতই নিল। কিন্তু শিশ্‌লিন বলল, 'মনে পড়ে, একদিন আমার সাগরেদ হবার জন্য তুমি আমাকে বলেছিলে? এখন দেখ কত উন্নতি হয়েছে তোমার! তুমি এসেছ আমার কাজে ওভারসিয়ারি করতে, কি বল?'

'তা ঠিক আছে,' ঠাট্টা করে অসিপ বলল, 'গোয়েন্দাগিরি কর, প্রাণে চায় যত খুশি উঁকি মার।'

বিদ্বেষের সুরে বলল পিওতর, 'কি করে তারা একটা বাচ্চা বেড়ালকে ধাড়ী ইঁদুরের পেছনে লাগাল?'

কঠিন বোঝার মত ভারি লাগত কাজ। লজ্জা পেতাম এই লোকগুলোর কাছে। প্রত্যেকেরই যে-কোন একটা কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সে জ্ঞান একমাত্র ওদেরই নিজস্ব। আর আমাকে কিনা ওদেরকে এইভাবে দেখতে হচ্ছে, যেন ওরা চোর জোচ্চোর। প্রথমে খুব খারাপ লাগত। অসিপ তা লক্ষ্য করে সরাসরি একদিন আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'শোন ছেলে, ওভাবে মুখ গোমড়া করে থেক না। লাভ নেই কিছু, বুঝলে?'

বাস্তবিক আমি কিছু বুঝলাম না? কিন্তু মনে হল যেন বুড়ো আমার পদাধিকারের অসঙ্গতিটা বুঝতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই দুজন দুজনার কাছে সহজ হলাম। একটু দূরে একটা কোণে আমাকে ডেকে অসিপ উপদেশ দিত, 'যদি জানতে চাও তবে বলি, আমাদের মধ্যে আসল চোর হল ঐ পাথর-মিস্ত্রি পিওতর। সে একটা লোভী। ওর পরিবারও বড়। খুব তীক্ষ্ণ নজর রেখ ওর প্রতি; সবকিছুই সে নিতে পারে। এক পাউণ্ড পেরেক, বা ডজনখানেক ইট কিংবা খানিকটা

মশল্লাই হোক—পেলেই সরাবে। অবশ্য লোকটা ভাল, ধার্মিক, ভাবনা চিন্তার দিক থেকেও দৃঢ়। পড়তে পারে, লিখতে পারে, কিন্তু ঐ একটা দুর্বলতা—চুরি করা! আর ঐ ইয়েফিমুশকা—ওর ঝোঁক কেবল মেয়ের দিকে। ও শান্ত, নিরীহ, সামান্য অনিষ্টও করবে না তোমাদের। ঘাড়ের ওপরকার মাথাটা খুব ভাল। সব কুঁজো মাত্রেই দেখবে চটপটে। আর গ্রিগোরি শিশ্লিন—ও লোকটা একটু বেকুফ্ ধরণের। অন্যেরটা তো দূরে থাক নিজেরটাও বুঝে নিতে পারে না। যে কেউ ওকে ঠকাতে পারে, কিন্তু ও পারে না। মাথা খাটিয়ে কোন কিছুই করতে পারে না ও।'

'সে কি ভাল লোক ?'

একদৃষ্টে অসিপ দেখে নিল আমাকে, তারপর একটা অবিস্মরণীয় কথা বলল, 'হাঁ লোক ভাল, অলস লোকের কাছে ভাল হওয়ার মত সোজা আর কিছুই নেই। ভাল হতে হলে মগজের তো আর প্রয়োজন হয় না, বুঝলে হে ছোকরা।'

'ঠিক আছে, তুমি কেমন ?' জিজ্ঞেস করলাম অসিপকে।

সামান্য হেসে জবাব দিল অসিপ, 'আমি একটা ছুঁড়ির মত। যখন ঠাকুর্দা হব তখন তোমাকে বলব আমি কেমন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। তা না হলে মাথা খাটিয়ে দেখ আমি কেমন। যাও, চেষ্টা করে দেখ !'

ও আর ওর বন্ধুদের সম্পর্কিত আমার সমস্ত ধারণা অসিপ বদলে দিল। ও যা বলেছে তার সত্যতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আমি লক্ষ্য করতাম ইয়েফিমুশকা, পিওতর আর গ্রিগোরি তাদের পরস্পরের তুলনায় এই শান্ত বুড়োটাকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আর কাজের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মনে করত।

সমস্ত কিছুতে তারা ওর পরামর্শ নিত, মনোযোগ সহকারে উপদেশ শুনত আর জানাত ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা, 'দয়া করে তুমি একটু পরামর্শ দাও।' ওরা এসে বলত অসিপকে। কিন্তু একদিন এমনি এক অনুরোধের পর অসিপ যখন বেরিয়ে গেল, শুনতে পেলাম পাথরমিস্ত্রি গলা নামিয়ে গ্রিগোরিকে বলছে, 'ধর্মবিরোধী ?'

'ভাঁড় !' নাক কুঁচকে গ্রিগোরি বলল।

রাজমিস্ত্রি আমাকে বন্ধুর মতই সাবধান করে দিল, 'এই বুড়োটার দিকে লক্ষ্য রেখ মাক্সিমিচ, ওর সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে তোমাকে। চক্ষের নিমেষে ও তোমাকে কড়ে আঙ্গুলের মাথায় ঘুরিয়ে আনবে। ঐ বুড়োগুলো, সব সময় চোয়াল নড়ছে ওদের। ওরা কতটুকু ক্ষতি করতে পারে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন !'

আমি এ কথার কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না।

আমার মনে হল ওদের মধ্যে সব চাইতে সৎ ও ধর্মপ্রবণ হচ্ছে পাথর-মিস্ত্রি পিওতর। ওর মন্তব্যগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত, চিত্তাকর্ষক। ওর সমস্ত কিছু ভাবনাই ছিল ঈশ্বর, মৃত্যু আর পরকালের শাস্তি সম্পর্কিত।

'আহাঃ রে ভাই, মানুষ যতই সাধ্যসাধনা করুক, যতই আশা করুক, গোরস্থান আর কফিনের কাছে আসতে তাকে হবেই !'

কি একটা পেটের অসুখে ভুগত পিওতর। এমনও দিন যেত যে সে কিছুই খেতে পারত না। এ সময় ছোট্ট এক টুকরো রুটি ওর পেটে পড়লেও ওর দারুণ ব্যথা উঠত, বমি করে ফেলত।

নুয়ে পড়া ইয়েফিমুশকাকেও মনে হত মহৎ হৃদয়বান। যদিও ও কেমন একটু হাস্যকর ধরণের ছিল। মাঝে মধ্যে ও এমন একটা খুশি খুশি ভান করত যে ওকে

নেহাৎ একটা বোকা মনে হত। প্রায়ই প্রেমে পড়ে যেত ইয়েফিমুশকা। আর সব মেয়েমানুষের বর্ণনাই ও একই ভাবে দিত, 'বলছি ভাই—ও মেয়ে মানুষ নয়। ও হচ্ছে একেবারে মাখনের পাত্রে ফুলের মত। ঠিক তাই!'

কুনাভিনোর বাচাল মেয়েগুলো যখন দোকান-ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে আসত, তখন ইয়েফিমুশকা ছাদ থেকে নেমে এসে এক কোণে জায়গা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে ঘড়্ ঘড়্ করত। ওর ধোঁয়াটে চোখদুটো শক্ত হয়ে কুঁচ্‌কে আসত। মুখটা হাঁ করে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে দিত, 'ওঃ, কী রসাল গ্রাসই না ভগবান আজ জুটিয়ে দিয়েছেন। কী সুখই না আজ আমার হাতে এসে পড়েছে! ঐ মেয়েটাকেই দেখ, যেন একটা সুন্দর ফুল! এমন একটা উপহারের জন্যে অদৃষ্টকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব? অমন রূপে আবার পুড়ে ছাই হয়ে যাব না তো?'

প্রথম প্রথম মেয়েগুলো শুধু পরস্পরকে ডেকে নিয়ে হাসাহাসি করত ওকে দেখিয়ে, 'দেখ দেখ, কুঁজোটা গলছে কেমন। হা অন্তর্যামী!'

ছাদ-পিটুনে ওদের হাসি-ঠাট্টা গ্রাহ্যই করত না। ধীরে ধীরে ওর চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠা মুখখানা তন্দ্রালু হয়ে আসত। প্রলাপের মত মধুর সুরে মাদক স্রোত ঢেলে এমনভাবে ও কথা বলতে শুরু করে দিত যে মেয়েগুলোও স্পষ্টতই মোহে পড়ে যেত! অবশেষে ওদের মধ্যে বয়স্কা একজন কেউ অবাক হয়ে বলে উঠত, 'চাষীটা এমন করছে, মনে হচ্ছে ও যেন একটা ছোকরা!'

'আবার পাখির মত গান গাইছে।'

'বা গির্জের দুয়োরে ভিখিরীর মত।' কর্কশ গলায় বলে উঠত বয়স্কা মহিলাটি।

কিন্তু ইয়েফিমুশকার সঙ্গে ভিক্ষুকের চেহারার কোন মিল ছিল না। মাটিতে বসান খুঁটির মতই দৃঢ় পায়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। গলার-স্বর ক্রমেই আবেগময় হয়ে উঠে, ওর ভাষা এমনই মন-কেড়ে নেয়া হয়ে উঠল যে, কথা থামিয়ে মেয়েরা ওর কথা শুনত চুপ করে। মনে হত ও যেন মধুমাখা কথার জাল বুনে চলেছে।

তারপর, রাত্রে খাবার সময় তার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এর সমাপ্তি ঘটত। নয়ত সোমবার সকালে বড় চৌকো মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অবাক দৃষ্টিতে বন্ধুদের বলত, 'আঃ, কী মিষ্টি মেয়েটা, কী সুন্দর! জীবনে এই প্রথম এমন একটি মেয়ে দেখলাম।'

তার মন জয়ের কাহিনী বলার সময় ইয়েফিমুশকা কখনো গর্ব করত না, বা অন্যদের মত মেয়েটিকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করত না। শুধু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বড় বড় চোখে কৌতুকের হাসি হাসত।

মাথা নেড়ে বলে উঠত অসিপ, 'অশান্ত ষাঁড় কোথাকার! কত বয়স রে তোর?'

'এইতো চৌচল্লিশ বছর। কিন্তু ওটাতো কিছুই না। আজই আমার বয়স পাঁচ বছর কমে গেছে। প্রাণের জলে ডুব দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে বেরিয়ে এলাম। মন ভরে গেছে রে। আঃ, কী সব মজার মজার মেয়েমানুষই না আছে!'

পাথর-মিস্ত্রি কড়া সুরে বলেছিল, 'দেখিস—পঞ্চাশের ঘরে পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে তোর এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন বিস্বাদ ঠেকবে তোর নিজের কাছেই।'

'তুই একটা নির্লজ্জ জীব, ইয়েফিমুশকা।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গ্রিগোরি শিশ্‌লিন বলেছিল। কিন্তু আমার মনে হল যে এই কুঁজোটা রমণীর মন জয় করতে পারায় এই সুপুরুষ যুবকটি ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছে।

পেঁচানো রূপোলী ভ্রূর তলা দিয়ে ওসিপ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে পরিহাসের সুরে ঝাঁঝিয়ে উঠত, 'তোর সব মেয়েমানুষগুলোই গেঁয়ো মজুরের কাছে সরে যায়—কেউ মিষ্টি পেয়ে, কেউ বা মুক্তো পেয়ে ; কিন্তু তোর সব ছুঁড়িগুলোই যে শীগ্‌গিরই দিদিমা হবে।'

শিশ্‌লিন বিবাহিত। কিন্তু ওর বৌ রয়ে গেছে গাঁয়ের বাড়িতে। সেও তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মাঝা-ঘষা ঐ মজুরানীদের দিকে। ওরা সবাই রাজী। সবাই-ই দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করতে উৎসাহী ছিল। এদের দারিদ্র-পীড়িত সমাজে অন্য যে-কোন রকম উপার্জনের মতই এপথে রোজগার করাটাও ভাল বলেই ধরে নেয়া হত। কিন্তু সুন্দর এই চাষীটা কখনো মেয়েমানুষ স্পর্শ করত না। কি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দূর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত। দেখে মনে হত, হয় ওদের জন্যে, নয় তো ওর নিজের জন্য নিজেরই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু যখন ওরা নিজের থেকেই ওর সঙ্গে নষ্টামি করতে শুরু করে দিত, লোভে ফেলার চেষ্টা করত, তখন ও বিব্রত মুখে হাসতে হাসতে পালিয়ে যেত আর বলত, 'হয়েছে হয়েছে, এখন এস।'

'তুই কি পাগল ?' বিশ্বাস না করে বলে উঠত ইয়েফিমুশকা, 'কি করে অমন একটা সুযোগ ছেড়ে দিলি তুই ?'

'আমি বিবাহিত।' ওকে মনে করিয়ে দিত গ্রিগোরি।

'বৌ তা বুঝবে কেমন করে ?'

'স্বামী অসৎ কাজ করলে বৌ সে কথা জানতে পারবেই। বৌয়ের সঙ্গে চালাকি খাটালে চলে না ভায়া, বুঝলে ?'

'জানতে পারবে কেমন করে ?'

'সে আমি জানি না। তবে সে স্বয়ং যদি সতী হয় তাহলে ঠিকই বুঝে উঠতে পারবে। আর আমিও যদি সৎভাবে থাকি এবং ও যদি পাপ কাজ করে তবে আমিও ঠিক বুঝতে পারব।'

'কেমন করে ?' ইয়েফিমুশকা চেঁচিয়ে উঠল।

শান্ত কণ্ঠে গ্রিগোরি পুনরাবৃত্তি করল, 'আমি জানি না।'

রেগে গিয়ে হাত নাড়া দিয়ে উঠল ইয়েফিমুশকা, 'কাণ্ডখানা দেখ! 'সৎভাবে থাকা', 'জানি না'—কী যে আছে তোর মাথায় !'

শিশ্‌লিনের মজুরেরা ওর সঙ্গে এমন আরামে কাজ করত যে মনে হত শিশ্‌লিন ওদের মনিব নয়। সব মিলিয়ে ওরা ছিল সাতজন। কিন্তু পেছন থেকে শিশ্‌লিনকে বাছুর বলে ডাকত। যদি কোনদিন এসে দেখত যে ওরা আলসেমি করে মিথ্যে সময় নষ্ট করছে তবে নিজেই সে ওদের হাঁক দিয়ে কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেত। বন্ধুর মত ডেকে বলত, 'আয়! সব চলে আয় !'

একদিন আমার ধৈর্যচ্যুত মনিবের কথা মত গ্রিগোরিকে ডেকে বললাম, 'তোমার ঐ মজুরের দল একেবারেই কাজের নয় !'

'সত্যি ?' কথাটা এমনভাবে বলল যেন এর আগে কখনো মনে হয়নি।

'এটা কাল দুপুরেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজও হবে না।'

'সেটা ঠিক। ওদের দিয়ে কোন কিছু হবে না।' কথাটায় সম্মতি দিল গ্রিগোরি। কিন্তু একটু বাদেই আবার আমতা আমতা করে বলল, 'কি হচ্ছে সেটা আমি অবশ্য জানি। কিন্তু ওদের তাড়িয়ে দিতে লজ্জা করে। সবাই আমার নিজের

গ্রামের ছেলে। ঈশ্বর বলে দিয়েছেন যে মানুষকে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খেতে হবে। আমাদের সবার জন্যই ওই এক কথাই নয় কি? তোমার, আমার, সবার জন্যেই? কিন্তু তুমি আমি অন্যদের থেকে কম কাজ করি। তাই ওদের তাড়িয়ে দিতে লজ্জা করে।'

ওর মধ্যে ভাবপ্রবণতার ঝোঁক ছিল। মাঝে মাঝে মেলার মাঠের শূন্য রাস্তা ধরে যেতে যেতে অবডোদনি খালের ওপরের পুলটায় এসে দাঁড়াত সে। তারপর রেলিংয়ের ওপরে নুয়ে পড়ে কখনো জলের দিকে, কখনো আকাশের দিকে, আবার কখনোবা ওকা নদী ছাড়িয়ে দূরে তাকিয়ে থাকত। কেউ যদি হঠাৎ ওকে দেখে প্রশ্ন করত, 'এখানে কি করছ?' তাহলে ও চমকে উঠে বিরক্তিভরা স্বরে বলত, 'তেমন কিছু নয়। এই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে করতে চারিদিক দেখছি।'

প্রায়ই গ্রিগোরি বলত, 'যেথায় যেমনটি প্রয়োজন ভগবান সেথায় ঠিক তেমন করেই গড়েছেন সব কিছু। ঐ আকাশ ঐ মাটি—ওর বুকে বইছে নদী। নদীর বুকে নৌকো। তুমি নৌকোয় করে যেখানে ইচ্ছে যেতে পার—রিয়াজান কিংবা রীবিন্‌স্ক, পেরম অথবা আস্ত্রাখান। আমি এবার রিয়াজানে গিয়েছিলাম—শহরটা খারাপ নয়, তবে কেমন নির্জীব। নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরদের চাইতেও বেশি। আমাদের নিঝ্‌নি কিন্তু বেশ মজার জায়গা। আস্ত্রাখানও নিরস। আসল কথা হল কালমীকেরা এসে ছেয়ে ফেলেছে আস্ত্রাখান। ওদের মোটেই পছন্দ করি না আমি। মর্দোভীয়ই হোক, কালমীকই হোক কিংবা পার্শী, জার্মান—যেই হোক, এসব কোন বিদেশী জাতই আমার পছন্দ নয়।'

ধীরে ধীরে খুব সতর্কার সঙ্গে ভেবে-চিন্তে কথা বলত, এমন একজনকে খুঁজত যে কিনা ওর সব কথা সমর্থন করবে। আর সে সায় পাথর-মিস্ত্রি পিওতরের কাছ থেকেই আসত বেশির ভাগ।

'বিদেশের জাত যে, ওরা হল বে-জাত। সমাজের বাইরে ওদের জন্ম। খৃষ্টের বাইরে, বাঁচে খৃষ্ট ছাড়াই।' সায় দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠত পিওতর।

গ্রিগোরির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠত, 'তা যাই বল, আমি কিন্তু ভাই সরল দৃষ্টিসম্পন্ন সত্যিকারের রুশ। ইহুদীদেরও সহ্য করতে পারি না। কেন যে ঈশ্বর বিদেশীদের সৃষ্টি করেছেন, জীবনে তার কোন মানেই আমি ভেবে পাই না। এটা একটা গভীর প্রজ্ঞার কথা।'

থমথমে মুখে পাথর-মিস্ত্রি বলত, 'হতে পারে গভীর, কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস রয়ে গেছে যা না থাকলেও আমাদের কিছু এসে যেত না!'

ওদের আলোচনা শুনে অসিপ বিদ্রূপভরা তীক্ষ্ণ সুরে বলত, 'হু, কথাটা ঠিক, অনেক কিছু আছে যা না হলেও আমাদের কিছু অসুবিধা হত না—যেমন তোদের ঐসব মন্তব্য। সবসময় খিটিমিটি লেগেই আছে। তোদের ধরে মার দেওয়া উচিত।'

একটু দূরে সরে যেত অসিপ। কার সঙ্গে ওর মতের মিল, কার সঙ্গে অমিল কিছুই বোঝা যেত না। সময়ে সময়ে মনে হত সবার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গেই ওর মতের ঐক্য আছে। কিন্তু প্রায় সময়েই দেখা যেত সব কিছুর ওপরেই ও অসন্তুষ্ট। সবাইকেই মূর্খ বলে ভাবছে। পিওতর, গ্রিগোরি আর ইয়েফিমুশকাকে লক্ষ্য করে অসিপ বলত, 'ও, যত সব শুয়োরের বাচ্চাগুলো—'

ওরা মৃদু হাসত। যদিও তা খুব আনন্দ কিংবা উল্লাসপূর্ণ নয় তবুও হাসত।

মনিব প্রতিদিন আমাকে পাঁচ কোপেক্ করে দিত খাবার জন্যে। ওতে আমার পেট ভরত না, ক্ষিদে থাকত পেটে। এদেখে মজুররা আমাকে তাদের সঙ্গে দুপুর কিংবা রাত্রের খাবার খেতে নিমন্ত্রণ জানাত। ঠিকেদারেরাও মাঝে মাঝে রেস্তোরায় নিয়ে যেত চা খাওয়াতে। আনন্দের সঙ্গেই ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। ওদের সঙ্গে বসে ওদের মন্থর আলোচনা, অদ্ভুত সব গল্প শুনতে ভালই লাগত আমার। ধর্ম-পুস্তক সম্পর্কে জ্ঞান আছে দেখে ওরাও খুশি হয়ে উঠত।

'অনেক বই গিলেছ দেখছি। এমন গিলেছ যে পেট ফাটে ফাটে।' নীল চোখের নিস্পন্দ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল অসিপ। কিন্তু সে দৃষ্টির তাৎপর্য বোঝা শক্ত। মনে হত ওর চোখের মণিটা গলে সাদা হয়ে গেছে।

'তোমার জ্ঞান সঞ্চিত রেখে দাও, একদিন কাজে দেবে, দেখো। বড হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পার। দয়ালু ভাষায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। নইলে বিরাট ধনীও হতে পারবে।'

'ধনী নয়, যাজক!' শুধরে দিল পাথর-মিস্ত্রি। কেন যেন ওর গলার স্বর একটু ব্যথিত মনে হল।

'য়্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল অসিপ।

'তুমি তো জানই ওদের ধর্মযাজক বলে। বধির তো নও আর।'

'আচ্ছা, নয় তাই হল—ধর্মযাজক, ধর্মবিরোধীদের বোঝবার জন্যে। নয়ত নাস্তিকদের দলেই ভিড়ে যেতে পার। ওতে রোজগার মন্দ নয়। মগজ খাটাতে পারলে নাস্তিকতার ভেতর দিয়েও বেশ দুপয়সা রোজগার করে নিতে পাববে।'

গ্রিগোরি একটু অস্বস্তির হাসি হাসল আর দাড়ির ভেতর দিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল পিওতর, 'ডাইনী কিংবা অবিশ্বাসীরাও তেমন খারাপ হয় না।'

'ডাইনীরা শিক্ষিত নয়,' বাধা দিয়ে বলে উঠল অসিপ, 'বইপড়া জ্ঞানের কোন দরকার হয় না ওদের।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন তাহলে, আমাদের ওখানে একটা লোক ছিল। তার কোন কুলে কেউ ছিল না। তার নাম ছিল তুশ্‌নিকভ। একটা নেহাৎ বেকুফ্ গোছের লোক। পাখির পালকের মত হাওয়া যখন যেদিকে উড়িয়ে নিত সেদিকেই যেত। মজুরও না, ভবঘুরেও না। তারপর আর কিছু করতে না পেরে একদিন চলে গেল তীর্থযাত্রায়। বছর দুই কোন খোঁজ নেই। আচমকা একদিন এসে হাজির। গায়ে ভিন্ন ধরণের পোশাক। কাঁধ অবধি লম্বা লম্বা চুল। মাথায় পুরুতে গোল টুপি; পরণে সূতির একটা মলিন আলখাল্লা। সবার চোখের দিকে আগুনে দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠত, 'অনুশোচনা কর, ঘৃণ্য পাপী। অনুশোচনা না করলে তোদের ঠেকাবে এমন সাধ্যি কার—বিশেষ করে মেয়েদের? সুন্দর ব্যবসা ফেঁদে বসল। তুশ্‌নিকভ খাবার পেল, পেল মদ আর মেয়েমানুষ যত চাও।'

'খাবার আর মদ দিয়ে হবেটা কি?' ওকে থামিয়ে রেগে বলল পাথর-মিস্ত্রি।

'তাহলে হবেটা কিসে?'

'ভাল কথায় এই হল কাজের কথা!'

'ভাল কথায় আমার কাজ নেই। আমার নিজেরই এত ভাল কথা জানা আছে যে তা দিয়ে কি করব তা ই ভেবে পাই না।'

'আমরা ওই দ্মিত্রি ভাসিলিয়েভিশ তুশ্‌নিকভকে চিনি।' আহত সুরে বলল পিওতর। গ্রিগোরি নীরবে চোখ নামিয়ে তার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এখানে যুক্তি দেখানর জন্য আসিনি আমি,' রফার সুরে বলল অসিপ, 'ম্যাক্সিমিচকে শুধু দেখাচ্ছিলাম যে উপার্জনের অনেক রাস্তা আছে।'

'কোনো কোনো পথ আবার জেলের দরজায় পাঠিয়ে দেয়।'

'সংখ্যায় ওগুলোই বেশি,' সমর্থন করল অসিপ, 'খুব কম পথই পুরুতগিরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তোমায় জানতে হবে ঠিক কোথায় সরে পড়তে হবে।'

রাজমিস্ত্রি, পাথর-মিস্ত্রির মত ধার্মিকদের প্রতিও ওর ব্যবহার ছিল বিদ্রূপাত্মক। হয়ত ওদের ও পছন্দ করত না। যদিও সে অনুভূতি ও লুকিয়ে চলত সযত্নে। এক কথায় মানুষ সম্পর্কে ওর মনোভাবটা বোঝা কষ্টকর।

ইয়েফিমুশকার ওপর ও ছিল একটু বেশি সদয়। ব্যবহারটাও কিছু ভদ্র ছিল ওর সঙ্গে। ঈশ্বর, ন্যায়-বিচার, ধর্ম-সম্প্রদায়, জৈবিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে সব বিষয় ওর সহকর্মীদের ছিল একান্তই প্রিয় সে সব আলোচনায় ছাদ-পিটুনে কখনই মনোযোগ দিত না। চেয়ারটা একটু কোণাকোণি করে পেতে নিত যাতে চেয়ারের পেছনটায় ওর কুঁজের ঘসা না লাগে। তারপর নীরবে বসে গ্লাসের পর গ্লাস চা খেয়ে যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ ও সতর্কিত হয়ে উঠত। ধোঁয়াভরা ঘরের মধ্যে চারপাশে তাকাতে শুরু করত, কথার ফোয়ারার ভেতরেও কি যেন শুনত কান পেতে, তারপর সহসা লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেত। অর্থাৎ ইয়েফিমুশকার ডজনকয়েক পাওনাদারের একজন কেউ এসে ঢুকেছে সরাইখানায়। যেহেতু পাওনাদারদের মধ্যে কয়েকজনের ঝোঁক হয়েছিল ওকে পিটুনি দিয়ে ধার শোধ নেয়া, ফলে ছাদ-পিটুনেকে পালিয়ে পালিয়েই থাকতে হত।

'আশ্চর্য লাগে, ওরা লাঠি হাঁকায় কেমন করে,' বিস্ময়ের সঙ্গে বলত ইয়েফিমুশকা, 'টাকা থাকলে শোধ দিতে পারলেই সবচেয়ে খুশি হতাম!'

'ফুঃ, মাটির ডেলা কোথাকার!' পেছন থেকে নাক কুঁচকে বলত অসিপ।

মাঝে মাঝে ভাবনার মধ্যে ডুবে যেত ইয়েফিমুশকা। ও তখন কোন কিছুই দেখত না, কোন কিছুই শুনত না। ওর হাড্ডিসার মুখখানা কোমল হয়ে আসত। চোখের করুণ দৃষ্টি আরো করুণ হয়ে উঠত। ওরা জিজ্ঞেস করত, 'কি ভাবছ বন্ধু?'

'ভাবছি যদি ধনী হতাম তবে একজন প্রকৃত সৎ ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করতাম—যে আমার মতই খাঁটি। যেমন মনে কর একজন কর্ণেলের মেয়ে। আর তাকে কি ভালই না বাসতাম? ওর সামনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেতাম। ব্যাপারটা শোন তবে, একবার এক কর্ণেলের বাগান বাড়িতে নতুন ছাদ বসিয়েছিলাম।'

'ওর এক বিধবা মেয়ে ছিল। আমরা তাই তো শুনেছি!' থামিয়ে দিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল পিওতর।

কিন্তু তাতে মুষড়ে না পড়ে হাত দিয়ে হাঁটু ঘষতে ঘষতে হাওয়া কাটার মত পিঠটা আগু পিছু দুলিয়ে দুলিয়ে বলে চলল ইয়েফিমুশকা, 'সে ধবধবে সাদা উড়ু-উড়ু পোশাক পরে বাগানে আসত। ছাদের ওপর থেকে তাকে দেখতাম তাকিয়ে তাকিয়ে, আর ভাবতাম, ওকে ছাড়া এই সূর্য, এই পৃথিবী, এসবের কি মূল্য? যদি ঘুঘুর মত উড়ে ওর পায়ের পাতায় বসে থাকতে পেতাম! একটা ফুটন্ত ফুলের মত ছিল মেয়েটি—মাখনের বাটিতে ফোটা একটি সুন্দর নীল ফুলের মত। ওঃ

ভাই, অমন একটি মেয়ে পেলে গোটা জীবনটাই যেন এক অফুরন্ত বাসর-রাত হয়ে যেত।'

'কিন্তু খাবার জোগাড়ের কি করতে?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল পিওতর। কিন্তু এতেও এতটুকু বিরক্ত হল না ইয়েফিমুশকা। বলল, 'হা ভগবান! আমাদের কি আর একহাঁড়ি খাবারের প্রয়োজন হত! তা ছাড়া মেয়েটিও কত ধনী!'

হেসে ফেলল অসিপ, 'ওরে হতভাগা ইয়েফিমুশকা! এই ফিকির করে দুদিনেই শেষ হয়ে যাবি তুই, দেখে নিস।'

মেয়েছেলে ছাড়া ইয়েফিমুশকার মুখে আর কোন কথা শোনা যেত না। তা ছাড়া মজুর হিসেবেও তেমন কাজের ছিল না ও। মাঝে মাঝে খুব তাড়াতাড়ি ভাল কাজ করে দিত অবশ্য। কিন্তু এক এক সময়ে আবার ওর কাজে কোন বাঁধুনি থাকত না। অন্যান্য সময় মধ্যে মধ্যে ফাঁক রেখে ইচ্ছে মত ওর কাঠের মুগুর চালিয়ে যেত। ওর গা থেকে সব সময়েই সুগন্ধি তেলের গন্ধ বেরোত। তাছাড়া ওর নিজস্ব একটা গন্ধ ছিল—সতেজ একটা কাটা গাছের গন্ধের মতই সে গন্ধ স্নিগ্ধ সুন্দর।

ছুতোরের সঙ্গে যে কোন প্রসঙ্গে আলোচনাই বেশ মজাদার হত, মজাদার তবে তেমন আকর্ষণীয় নয়। ওর কথাবার্তা ছিল কেমন যেন বিচ্ছিন্ন ধরণের। তাছাড়া কোনটা পরিহাস করছে আর কোনটা সত্যি সত্যিই বলছে সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর ছিল।

গ্রিগোরির আলোচনার সব চাইতে পছন্দসই বিষয় ছিল ঈশ্বর। ভগবানকে ও খুবই বিশ্বাস করত এবং ভালবাসত।

আমি ওকে একদিন বললাম, 'গ্রিগোরি, জান, এমন লোকও আছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না?'

একটু হেসে গ্রিগোরি বলল, 'সেটা আবার কি?'

'তারা বলে যে ভগবান বলে কেউ নেই।'

'হাঁ, আমি তা জানি।'

একটা অদৃশ্য মাছিকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে একবার হাত নেড়ে তারপর বলে চলল, 'মনে আছে রাজা ডেভিড বলতেন, 'বোকারা বলে তাদের অন্তরে ঈশ্বর নেই।' দেখলে তো কতদিন আগে এইসব বোকাদের ওপর রায় দেয়া হয়ে গেছে। ঈশ্বর ছাড়া চলতে পারবে না তুমিও...'

যেন ওর কথা সমর্থন করছে এমনি ভঙ্গিতে অসিপ বলে উঠল, 'ঈশ্বরের প্রতি পিওতরের আস্থা ভাঙ্গবার চেষ্টা করে দেখ, তোমাকে মজাটা দেখিয়ে দেবেখন।'

শিশ্‌লিনের সুন্দর মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। গাঁথুনির মশলা ভরা আঙ্গুল-গুলো ঘন দাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে রহস্যভরা কণ্ঠে সে বলল, 'সমস্ত শরীরেই ঈশ্বর আছেন, বিচার বুদ্ধি, আর অন্তরের ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈশ্বরের দান!'

'আর পাপ?'

'পাপের সৃষ্টি শরীর থেকে, শয়তান থেকে। পাপ হচ্ছে বাহ্যিক জিনিস বসন্তের দাগের মত। ওর চেয়ে কিছু বেশি নয়। যে বেশি পাপের কথা ভাবে সেই বেশি করে পাপ করে। তোমার অন্তর যদি পাপ ভাবনা পরিত্যাগ করে, তবে তুমি আর পাপ করবে না। দেহের মালিক শয়তানই হল পাপ-ভাবনার সৃষ্টিকর্তা।'

'উঁহু, কেন জানি আমার মনে হয় কথাটা সত্যিই তা নয়।' সন্দিহান সুরে বলল পাথর-মিস্ত্রি।

'কথাটা তাই বটে। ঈশ্বর নিষ্পাপ। আর মানুষ হল ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া, তাঁরই সত্তা। পাপ করে প্রতিমূর্তিটা—সেটা হল দেহ। সত্তাটা কিন্তু পাপ করতে পারে না। সত্তাই হল আত্মা।'

বিজয়ের হাসিতে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পিওতর বিড়বিড়িয়ে বলে উঠল, 'আমার ধারণা কথাটা ঠিক তা নয়।'

পাথর-মিস্ত্রিকে বলল, 'অসিপ, তাহলে তোমার ধারণায় যদি পাপ বলে কিছু না থাকে তবে অনুতাপ বলেও কিছু নেই? আর অনুতাপ না হলে নির্বাণ বলেও কোন কথা নেই?'

'তাই বটে। সেই যে বুড়োরা বলে, 'দৃষ্টির আড়ালে শয়তান, আর মনের আড়ালে ভগবান'।'

মদ বেশি পরিমাণে না খেলেও দু-গ্লাসেই মাতাল হয়ে যেত শিশ্‌লিন। ওর মুখটা হয়ে উঠত গোলাপী, চোখদুটো হত নির্বোধ শিশুর মত আর গলার স্বর সুরেলা।

'ওঃ ভাইসব, জীবনটা কি চমৎকার আমাদের—এক চিলতে কাজ, ক্ষুধায় কাটাতে হয় না, প্রভুকে প্রশংসা করি! কী সুন্দর আমাদের জীবনটা!' শিশ্‌লিন কেঁদে ফেলত। ওর চোখের জল গাল বেয়ে ওর রেশমী দাড়িতে মুক্তোর দানার মত ঝল্‌মল করত।

এই ঝল্‌মলে চোখের জল দেখে, ওর এমনিধারা জীবনের স্তুতি শুনে বিরক্তি ধরে যেত আমার। এর চাইতে দিদিমার স্তুতি ছিল অনেক বেশি বোধগম্য, সহজ, আর অনেক কম ভাবালুতাপূর্ণ।

এই আলোচনাগুলো আমার মধ্যে কেমন যেন একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করত। জাগিয়ে তুলত এক প্রচ্ছন্ন ভয়। চাষীদের সম্পর্কে অনেক কাহিনীই পড়েছি আমি। কিন্তু আমি জানি, বইয়ের চাষী আর বাস্তব চাষীর মধ্যে এক বড় রকমের ফারাক রয়েছে। বইয়ের সব চাষীরাই দুর্ভাগা। ভাল আর মন্দ—বইয়ের সমস্ত চাষীর চিন্তাধারা আর ভাষা বাস্তব চাষীদের চেয়ে অনুন্নত। বইয়ের চাষীরা ঈশ্বর, ধর্ম-সম্প্রদায়, গির্জা সম্পর্কে কম আলোচনা করে। বরং তার চাইতে তাদের মনিব, জমি-জমা, জীবনের অন্যায়-অবিচার আর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে। মেয়েমানুষ নিয়েও তারা কম কথা বলে, তাদের চিন্তাধারা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, আরো বেশি সংবেদনশীল। কিন্তু সত্যিকারের চাষীর জন্য মেয়েমানুষ হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির জিনিষ। অবশ্য খুবই মারাত্মক ধরণের চিত্তশুদ্ধির বস্তু। চালাকির আশ্রয় নিতে হয় তাদের সঙ্গে। নইলে মেয়েমানুষেরা ওদের হারিয়ে দিয়ে তাদের জীবন নষ্ট করে দেবে। বইয়ের চাষীরা খারাপ ভাল যাই হোক এক্ষেত্রে তারা সকলেই খুব খাঁটি। তাদের সব কিছুই সোজা সরল। কিন্তু প্রকৃত একজন চাষী ভালও নয়, মন্দও নয়, সাংঘাতিক জটিলতাপূর্ণ। প্রকৃত চাষী যতই বাচাল হোক না কেন, মনে হবে যে নিজের সম্পর্কে কী যেন একটা কথা সবসময় অব্যক্ত রয়ে গেল যা শুধু ওই জানে। আর হয়ত যে কথাটা অব্যক্ত রয়ে গেল সেটাই ওর জীবন সত্তার মূল কথা।

বইয়ের চাষীদের মধ্যে 'ছুতোর সমাজ' নামের বইয়ের পিওতরকে ভাল লাগত সব থেকে বেশি। বইটা আমার বন্ধুদেরও পড়বার ইচ্ছে হল। তাই নিয়ে মেলার মাঠে চলে এলাম। অনেক সময় আমি কোন মজুরের ডেরায় রাত কাটাতাম। এরকম প্রায়ই হত। বৃষ্টি হলে শহরে আর ফিরতে ইচ্ছে করত না, আর

প্রায় দিনই কাজের পরে এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে এতটা পথ হেঁটে আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হত না।

যখন ওদের জানালাম যে ছুতোরদের নিয়ে লেখা একটা বই আছে আমার কাছে, তখন সবাই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল। বিশেষ করে অসিপ। বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে ওর সন্ন্যাসী-সুলভ মাথাটা দোলাতে দোলাতে পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল সন্দিগ্ধভাবে, 'বোধ হয় আমাদের কথাই লিখেছে! ভাবত একবার! কে লিখেছে, কোন ভদ্রলোক? হুঁ, যা ভেবেছিলাম! ভদ্রলোক আর রাজকর্মচারী—কোন কিছুতেই এরা পিছিয়ে যাবার নয়। ঈশ্বর স্বয়ং যেটা এড়িয়ে গেছেন রাজকর্মচারীরা সেটাও এনে ঢুকিয়ে ছাড়বে। এসব করার জন্যেই তো ওরা আছে।'

'ঈশ্বরকে কিন্তু খুব একটা সম্মান দিয়ে কথা বলছ না।' পিওতর বলল।

'এতে কি হয়েছে? আমার টাকের ওপর বরফ ঝরে পড়া আর ঈশ্বরের কাছে আমার কথা, সব সমান! চিন্তা নেই, তুমি আমি, কেউই আর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছি না।' হঠাৎ রেগে গিয়ে ও যা কিছু ঘৃণা করে তারই বিরুদ্ধে চকমকি পাথরের গা থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের ফুল্‌কির মত তীক্ষ্ণ কথার তুব্‌ড়ি ছোটাতে শুরু করে দিল। দিনের মধ্যে বারবার আমার কাছে এসে এসে প্রশ্ন করল, 'আমাদের কিছু পড়ে শোনাবে মাক্সিমিচ? ভাল, খুব ভাল কোন কিছু। মগজ খাটিয়ে ওটা মন্দ করেনি।'

রাত্রিবেলা কাজের শেষে ডেরায় ফিরে এলাম খাবার খেতে। খাওয়া শেষ হলে পিওতর ওর একজন মজুর আর্দালিয়নকে নিয়ে উপস্থিত হল। আর শিশ্‌লিন নিয়ে এল কচি-বয়সের একটি ছেলেকে। তার নাম ফোমা। ছাউনির মধ্যে মজুরদের ঘুমনোর জায়গায় একটা আলো জ্বলছিল। আমি পড়তে শুরু করলাম। ওরাও শুনতে লাগল। কারুর মুখে কোন কথা নেই, কেউ একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করছে না। আর্দালিয়ন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল, 'অনেক হয়েছে যাক!'

ও চলে গেল। প্রথমেই মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগোরি, অনেকটা বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গিতে। ছুতোররাও দেরি না করে তার পথ অনুসরণ করল। কিন্তু পিওতর, অসিপ আর ফোমা আমাকে ঘিরে আরো ঘন হয়ে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

আমার পড়া সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিভিয়ে দিল অসিপ। আকাশের তারা লক্ষ্য করে বোঝা গেল রাত তখন প্রায় দুপুর। অন্ধকারের মধ্যে পিওতর জিজ্ঞেস করল, 'এসব বইয়ের তাৎপর্য কি? কার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে?'

'ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে।' জুতাটা খুলে রাখতে রাখতে অসিপ বলল। ফোমা চুপচাপ একপাশে সরে গেল।

'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, কার বিরুদ্ধে এটা লেখা হয়েছে?' মরিয়া হয়ে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল পিওতর।

'ওরাই জানে।' মাচার ওপরে বিছানা করতে করতে উত্তর দিল অসিপ।

'যদি বিমাতাদের বিরুদ্ধে লেখা হয়ে থাকে তবে তার কোন অর্থ নেই। এসব বই পড়ে বিমাতাদের স্বভাব কিছু পরিশুদ্ধ হবে না।' বলল পাথর-মিস্ত্রি, 'আর এটা যদিও পিওতরের বিরুদ্ধেই লেখা হয়ে থাকে তবে তারও মানে হয় না কোন। অদৃষ্টে যাই থাক মাথা পেতে তা নিতেই হবে। হত্যা একবার করলে সাইবেরিয়ায় যেতেই

হবে। সত্যি কথাই বটে। এ ধরণের ব্যাপারে কি সাহায্য হবে এ বই দিয়ে? কোন সাহায্য হতে পারে না। হতে পারে কি?'

অসিপ কোন উত্তর দিল না কথাটার। সুতরাং এইটুকু বলেই থামল পাথর মিস্ত্রি, 'সাহিত্যিকদের কোন কাজকর্ম নেই বলে, ওরা অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসে। একদল মেয়েছেলে এক জায়গায় জড়ো হলে যেমন হয়, তেমনি। আচ্ছা ঘুমতে চললাম।' একমুহূর্তে চাঁদের নীল জ্যোৎস্নায় দোরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল অসিপকে, 'তুমি কি বল অসিপ, তোমার কি ধারণা।'

'অ্যাঁ?' ঘুমাচ্ছন্ন চোখে অসিপ উত্তর দিল।

'ও, ঠিক আছে, ঘুমোও।'

শিশ্‌লিন বসেছিল যে জায়গায় সেখানেই সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোমা এলোমেলো খড়ের ওপরে আমার পাশে এসে শুল। সমস্ত এলাকা ঘুমাচ্ছন্ন। দূর থেকে রেলের বাঁশী শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে ভারি লোহার চাকার ঘর্ঘর শব্দ আর বাফারের ঝমঝমানি। বিভিন্ন সুরে নাক ডাকার আওয়াজে ভরে গেছে ছাউনিটা। মনটা ঝিমিয়ে গেল, ভেবেছিলাম কিছু আলোচনা হবে, কিন্তু হল না।

ধীর কিন্তু পরিষ্কারভাবে হঠাৎ বলে উঠল অসিপ, 'বিশ্বাস কোর না ওসব কথায়, বুঝলে! তোমাদের বয়েস এখন কম, অনেক সময় পড়ে আছে সামনে। ভাবনাগুলো জমিয়ে রাখ। একটা নিজস্ব ভাবনা অন্যের কাছ থেকে নেওয়া দুটো ভাবনার চেয়ে বেশি মূল্যবান। ফোমা ঘুমিয়েছ?'

'না।' উদ্দীপ্ত সুরে উত্তর দিল ফোমা।

'তোমরা দুজনেই পড়তে জান, পড়তে থাক। কিন্তু খুব বেশি একটা পাত্তা দিও না। ওরা যা ইচ্ছে তাই ছেপে দেয়, ছাপার ক্ষমতা রয়েছে কিনা!'

মাচার বাইরে পা ঝুলিয়ে হাত দিয়ে কিনারা আঁকড়ে রেখে আমাদের দিকে নুয়ে পড়ে বলতে লাগল, 'বই—বইটা আসলে কি? বই একটা সাংবাদিক মাত্র। যেন বলছে, 'দেখ, এ হল একটা সাধারণ লোক; এ হল ছুতোর কিংবা এমনি ধরণের কেউ।' তারপর ভদ্রলোকেরা কেমন দেখ, যেন অন্য সবার থেকে ওরা ভিন্ন। স্বার্থ বিনা বই লেখা হয় না। লেখা হয় কাউকে না কাউকে রক্ষা করার জন্য।'

'ঠিকাদারটাকে হত্যা করে পিওতর ঠিকই করেছিল!' ভারিক্কি সুরে ফোমা বলল।

'তা কেন? একটা মানুষকে হত্যা করা ভাল কাজ নয় কখনোই। আমি জানি, গ্রিগোরিকে তুমি সহ্য করতে পার না। কিন্তু ওসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আমরা কেউই ধনী নই। আজকে মনিব, কালই হয়ত সস্তা মজুর।'

'তোমার কথা বলছি না আমি, অসিপ কাকু...'

'ও একই কথা।'

'তুমি ন্যায়পরায়ণ লোক।'

'দাঁড়াও, আমি বলছি বইটা কি বিষয়ে লেখা।' ফোমার অসম্মতিপূর্ণ কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল অসিপ, 'বইটা খুব বুদ্ধি করে লেখা। এই দ্যাখো জমিদার একজন আছে ঠিকই কিন্তু তার চাষী নেই একটিও, আবার চাষী আছে তাদের কোন জমিদার নেই। এতে দেখ না, জমিদারের অবস্থা হয়েছে টলমলে আর চাষী হালও অনুকূল নয়। জমিদার হয়ে গেছে নিবীর্য বোকা আর চাষী হয়ে উঠছে বেহুঁস আত্মঅহঙ্কারী—ভেতরে তার সাংঘাতিক রোষ আর বিক্ষোভ। এটাই হল

গল্পটার সারমর্ম। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছে এর চাইতে চাকর হয়ে থাকা অনেক ভাল। জমিদার আত্মগোপন করছে চাষীর আড়ালে, চাষী করছে জমিদারের আড়ালে —দুজনই দুজনকে ঘিরে চরকি খাচ্ছে—খাওয়া পরার কোন চিন্তা নেই। না, না, আমি বলছি না যে ভৃত্য অবস্থায় জীবন অনেক বেশি সহজ ছিল। দীন চাষীতে তেমন কোন সুবিধে নেই জমিদারের। তাদের ইচ্ছে চাষীরা ভাল জিনিষ খাক দাক, কিন্তু মাথায় যেন বুদ্ধি না থাকে একটুও। আমার নিজের যা জানা আছে তাই-ই বলছি। চল্লিশ বছর আমি জমিদারের দাসত্ব করে এসেছি। চামড়া ফুটো করে ঢেনে ঢের জ্ঞান ঢুকেছে আমার শরীরে।

গাড়োয়ান পিওতরের কথা মনে পড়ল আমার, যে নাকি তার গলা কেটে ফেলেছিল। সেও ভদ্রলোকদের সম্পর্কে এ ধরণের কথাই বলেছিল। কিন্তু সেই হিংস্র বুড়োটার ভাবনার সঙ্গে অসিপের ভাবনা চিন্তা মিলে যাবে, এটা আমার আদৌ ভাল লাগল না।

আমার হাঁটুতে হাত রেখে অসিপ বলে চলল, 'তোমরা এই বইটার বা অন্যান্য সব লেখার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। উদ্দেশ্য বিনা কেউ কিছু করে না। তা সে যতই গোপন করার চেষ্টা করুক। বই লেখারও একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। তা হল, তোমার মুণ্ডটা ঘুরিয়ে দেওয়া। কাঠ চেড়া, জুতো-সেলাই সবটাতেই বুদ্ধি চাই।'

অসিপ বলেই চলেছে। কখনো চিত হয়ে শুয়ে, কখনো লাফিয়ে উঠে বসে নীরব তমিস্রার মধ্যে ধীরে ধীরে তার জড়তাবিহীন কণ্ঠের কথাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলে চলল, 'কথায় বলে, চাষী আর জমিদারের মধ্যে প্রচুর ফারাক রয়ে গেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমরা উভয়ই এক। সে শুধু একটু উঠেছে, এই যা। এটা ঠিক যে, জমিদার শেখে বই পড়ে আর আমি শিখি আঘাত পেয়েই। ওর পেছন দিকটা শুধু একটু বেশি ফর্সা, তাছাড়া বেশি ঝক্‌ঝকে নয় মোটেই। না হে ছোকরারা, তা নয়, বুঝলে। বিশ্বে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা চালু করার সময় হয়েছে, ওসব বইপত্তর ফেলে দাও ছুঁড়ে, বিদায় করে দাও সব। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ দেখি আমি কে? মানুষ। আর জমিদার কে? সেও মানুষ। তবে তফাৎটা কোথায়? ঈশ্বর কি পাঁচ কোপেক বেশি চাইবেন ওর কাছে? না হে না, যখন শোধ দেওয়ার সময় হবে তখন আমরা সবাই ঈশ্বরের চক্ষে সমান।'

ভোরের দিকে অবশেষে যখন দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিভে গেল আকাশের তারা, তখন অসিপ আমাকে বলল, 'কি, কথা বলতে জানি না? ঢের কথা বললাম আজ রাত্রে। জীবনে ভাবিনি কোন দিনও। আমার কথা কিন্তু ঠিক ঠিক সত্যি বলে ধরে নিও না, বুঝলে? ওসব যে বলব বলেই বলেছি সে নয়, ঘুম আসছিল না তাই বললাম। মানুষ যখন ঘুমতে পারে না, চোখ খুলে পড়ে থাকে, তখন কৌতুক করার জন্যই অনেক কিছু এমনি বানিয়ে বলে, যেমন একটা কাক ছিল। সেটা মাঠ থেকে পাহাড়ে, এক গোলাবাড়ি থেকে অন্য গোলাবাড়ি উড়ে উড়ে জীবন শেষ করে দিল। তারপর একদিন অসুখে পড়ে মারা গেল। পচে শুকিয়ে গেল। এ গল্পের অর্থ কি? কোন অর্থ নেই। আচ্ছা এস, এবার ঘুমনো যাক। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।'

আঠারো

অতীতের আগওলা ইয়াকভের মত অসিপ মহান হয়ে উঠতে লাগল আমার চোখে। ধীরে ধীরে অন্য সবার মূর্তি আড়াল করে আমার চোখের সামনে

দাঁড়াল। বেশ সাদৃশ্য আছে ওর সঙ্গে হয়াকভের। সেই সঙ্গে দাদুর, সনাতন পন্থী পিওতর ভাসিলিয়েভিচ আর বাবুর্চি স্মুরির কথাও স্মরণে আসে ওকে দেখে। এদের কথা সুস্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে আমার স্মৃতিপটে। তাদের সবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অসিপ সেই সঙ্গে তারই পাশে ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে যে ছাপ ফেলত সেটা পেতলের ওপর এসিডের মতই সুগভীর। একথা পরিষ্কার যে ওর চিন্তাধারা ছিল দু-ধরণের। দিনের বেলা কাজ কর্মের সময়ে তার সহজ, দ্রুত চিন্তাধারা আর রাতের বেলা যখন তার ঘুম আসত না, কিংবা সন্ধ্যাবেলা যখন হাঁটতে হাঁটতে শহরে যেত তার রক্ষিতা পিঠে বিক্রেতা মেয়েমানুষটির কাছে, তখনকার ভাবনা। এর মধ্যে প্রথমটা ছিল ঢের বেশি বাস্তব, ঢের বেশি সহজবোধ্য। ওর রাত্রিবেলাকার চিন্তা-ধারা ছিল এক বিশেষ ধরণের। হ্যারিকেনের আলোর মত চারপাশ থেকেই তা উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করত। কিন্তু কোনটা যে সঠিক বা কোনটা ও পছন্দ করে বেশি সেটা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারতাম না।

মনে হত এপর্যন্ত যত লোকের সংসর্গে এসেছি তাদের সবার চাইতে ও অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তাই আগেকার ইয়াকভের পেছনে যে রকম ঘুরে বেড়াতাম,— লোকটাকে ভাল করে জানবার জন্য, তাকে বোঝবার জন্য—তেমনি আকুল আগ্রহে ওর পেছনে পেছনে লেগে থাকতাম। কিন্তু ও কায়দা করে পিছলে বেরিয়ে যেত আমার হাত ছাড়িয়ে। ওর ভেতরের প্রকৃত সত্য দিক যেটা, সেটা কোথায়? ওর কোন দিকটাকে প্রকৃত সত্য বলে বুঝব?

মনে পড়ে গেল কি ভাবে একদিন অসিপ বলেছিল আমাকে, 'মগজ খাটিয়ে বুঝে নাও আমি কি। এস, চেষ্টা করে দেখ।'

সেদিন আমার মর্যাদায় ঘা লেগেছিল। ঘা লেগেছিল আরো একটা জিনিসে, যেটা আত্মমর্যাদার চাইতেও বড়। ঐ প্রবীণ মানুষটিকে বুঝে নেওয়া আমার কাছে একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

কারণ সকল প্রকার দুর্বোধ্যময়তা সত্ত্বেও সে ছিল একটা অচঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। মনে হত, যদি সে আরো একশ বছর বেঁচে থাকে তবুও সে অবিকৃতই থেকে যাবে—এই অদ্ভুত পরিবর্তনশীল মানুষগুলোর মধ্যে অপরিবর্তিত হয়ে বেঁচে থাকবে। সনাতনপন্থাও ঠিক এমনি ধরণের এক অপরিবর্তনশীল স্থিতিশীলতার কথা জাগিয়ে তুলত আমার মনে। কিন্তু ওর মধ্যে সেটা একান্তই যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হত আমার। কিন্তু অসিপের স্থিতিশীলতার রকমই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, অনেক বেশী কাম্য।

প্রতি মুহূর্তেই এই অস্থির মানসিক ভাবটা আমাকে অনুভব করতে হয়েছে। এক স্থান থেকে মানুষ হঠাৎ কি ভাবে অন্যত্র চলে যায় সেটা বুঝে উঠতে পারতাম না। তাদের এই জটিল পরিবর্তনশীলতার কথা চিন্তা করে করে ইতিমধ্যে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাতে মানুষের প্রতি আমার সজীব কৌতূহল ধীরে ধীরে কেমন আবছা হয়ে আসছিল, তাদের প্রতি আমার ভালবাসা কমে যাচ্ছিল।

একদিন জুলাই মাসের গোড়ার দিকে আমরা যে জায়গায় কাজ করছিলাম সেখানে এসে দাঁড়াল কারখানার নড়বড়ে ছ্যাকরা গাড়ি। চালকের জায়গায় বসে একজন মাতাল কোচোয়ান, মাথায় টুপি নেই। ঠোঁটের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। মৃতবৎ বসে ঘন দাড়ির ফাঁকে হিক্কা তুলছে। পেছনের আসনে একটি নাদুশ নুদুশ

মেয়ে ঢুলে পড়া মত্ত শিশ্‌লিনকে জাপটে ধরে অ‍্যছে। মেয়েটার গালদুটো লালচে, মাথায় কাঁচের চেরি আর লাল ফিতের ঝালর দেয়া খড়ের টুপি। খালি পায়েই গালোশ পরা। গাড়ির দোলানিতে দুলছে মেয়েটি। একহাতে দুলছে একটা ছোট ছাতা। হাসছে আর চেঁচিয়ে বলছে, 'এই বদমায়েশেরা! হাট তো ভেঙ্গে গেছে, মেলা আর নেই ; অথচ ওরা কিনা আমাকে নিয়ে এসেছে হাট দেখাতে!'

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা গ্রিগোরি হাঁপুড় কেটে বেরিয়ে এল গাড়ির ভেতর থেকে। বসে পড়ল মাটির ওপরে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে আমাদের জানাল, 'এই আমি হাঁটু ভেঙ্গে বসছি—অনেক অপরাধ করেছি আমি! সবকিছু ভেবে চিন্তে তারপর পাপ করলাম। দেখ একবার!' ইয়েফিমুশকা বলে, 'গ্রিগোরি, গ্রিগোরি, ও যা বলে—' সে কথা সত্যি, কিন্তু ক্ষমা কর আমাকে। আমি তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেব! ও যা বলে সত্য, আমরা শুধু একবারই বাঁচি···এর বেশি আমরা বাঁচতে পারি না···'

মেয়েটা হেসে হেসে ঢুলে পড়ছিল, আর গালোশটা খুলে নিয়ে লাফাচ্ছিল থপ্‌থপ্‌ করে। এবার কোচোয়ান চিৎকার করতে শুরু করল, 'চল, আমরা যাই! এস, ঘোড়া আটকে রাখতে পারছি না কিন্তু!'

ঘোড়াটা হচ্ছে একটা বয়স্ক বেতো ঘোড়া। মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে। মনে হয় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই ওর অঙ্কুর গজিয়েছে। সমস্ত দৃশ্যটাই এমন অদ্ভুত হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল যে সে কথা আর বর্ণনা করে বোঝান যায় না।

গ্রিগোরির শ্রমিকেরা তাদের প্রভুর অবস্থা, তার অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েমানুষ আর চালককে দেখে হেসে খুন। হাসছিল না শুধু ফোমা। দোকানের দরজায় আমার এক পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলছিল, 'বাঁধন ছিঁড়েছে শূয়োর! দেশের বাড়িতে ওর স্ত্রী রয়ে গেছে ; এমন সুন্দরী স্ত্রী!'

চালকটা ওদের জন্য বার বার তাড়া দিতে লাগল। অবশেষে মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে ওকে টেনে তুলে নিল ভেতরে। গ্রিগোরি সটান শুয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ের ওপর। ছাতাটা নাড়াতে নাড়াতে মেয়েটি চিৎকার করল, 'আমরা যাচ্ছি।'

ফোমার এক হুঙ্কারে সবাই যে যার কাজ করতে লেগে গেল। গ্রিগোরি নিজেকে এমনি সস্তা করে দেওয়াতে বুঝিবা মনে মনে দারুণ ব্যথা পেয়েছিল ফোমা। শ্রমিকেরা তাদের মনিবকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা রসাল আলোচনা করে নিল বটে, কিন্তু মনে হল ওরা যেন একটু বিদ্বেষও বোধ করছিল।

'নিজেকে আবার মনিব বলে প্রচার! একটা মাসও আর নেই, কাজের শেষে সবাই গাঁয়ে ফিরে যাব, একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারব না।' রাগে গরগর করে বলতে লাগল ফোমা।

আমিও খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম গ্রিগোরির ওপরে। মেয়েটাকে ওর পাশে এমনই বেখাপ্পা লাগছিল যে সেটা আর বলার নয়। প্রায়ই অবাক হয়ে চিন্তা করতাম, গ্রিগোরি শিশ্‌লিন একন মনিব হল আর ফোমা হল শুধু একজন সাধারণ শ্রমিক?

ফোমার দেহ মজবুত সুগঠিত, সুন্দর চেহারা, কোঁকড়ান চুল, সরু টিকলো নাসিকা, বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর দুটো চোখ, ভরাট মুখ। মোটকথা ওকে চাষীর ঘরের ছেলে বলে মনে হত না। যদি ভাল পোশাক গায়ে দিতে পেত, তবে ওকে যে-কোন সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যবসায়ীর ছেলে বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। ও ছিল কেমন একটু উদাসীন স্বল্পবাক। সাধারণ লিখতে জানত বলে ও ঠিকেদারের হিসেব নিকেশ রাখত, আনু-

মানিক মোট খরচের খসড়া তৈরি করত। ও পারত সঙ্গিদের থেকে কাজ আদায় করতে, যদিও কাজ সম্পর্কে ওর নিজের খুব একটা উৎসাহ চোখে পড়ত না।

'এক জীবনে কেউই সব কিছু সামলে উঠতে পারে না।' নম্র কণ্ঠে বলত ফোমা। বই সম্পর্কে তার মত ছিল বিরূপ, 'ছাপা তো হতে পারে সবই। দেখতে চাও তো এখানে বসেই আমি একটা গল্প লিখে দিচ্ছি, ও সব এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।'

কিন্তু যা কিছু কথাবার্তা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনত আর যদি কোন কিছু মতের সঙ্গে মিলে যেত তবে তার সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি জেনে নেবার জন্যে জিদ করত। তারপর নিজেই তার নিজের ওজন বুঝে সিদ্ধান্ত করে নিত।

ফোমাকে একদিন বলেছিলাম যে ওর ঠিকাদার হওয়া উচিত! তাতে কুঁড়েমির সঙ্গে বলেছিল, 'শুরু থেকেই যদি হাজার হাজার টাকা পাওয়া যেত তবে সেটা মন্দ হত না, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষে যোগাবার জন্য একপাল মজুরের পেছনে লেগে থাকার ঝক্কি পোহানর কোন মানে আছে? নাঃ, কিছুদিন দেখব, তারপর চলে যাব ওরাঙ্কার মঠে। আমার শক্ত সমর্থ দীর্ঘ চেহারা, দেখতে ভাল, হয়তো কোন ধনী ব্যবসায়ীর বিধবা প্রেমে পড়ে যেতে পারে। এমন সচরাচরই ঘটে। সেরগাচির একটা লোক দু-বছর ওখানে থেকে একটা ভাল বিয়ে করে ফেলল এক শহুরে মেয়েকে। যখন বাড়ি বাড়ি মূর্তি নিয়ে ফিরত তখন মেয়েটার নজরে পড়ে গিয়েছিল।'

এই ছিল ওর পরিকল্পনা। কেমন করে প্রথমে মঠের শিক্ষানবীশ হয়ে কত লোক পরে ঐশ্বর্যময় জীবন যাপন করছে এ সম্পর্কে অনেক গল্প ওর জানা ছিল। এসব গল্পের ওপর আমার বিরক্তি ছিল, ছিল ফোমার পরিকল্পনা সম্পর্কেও। কিন্তু ঠিকই বুঝে নিলাম যে ও একদিন নিশ্চয় মঠে গিয়ে ভিড়বে।

তবুও যখন হাট বসল সবাই তখন আশ্চর্যের সঙ্গে দেখল ফোমা এক চায়ের দোকানে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে। সঙ্গিরা ওতে সত্যি সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু ওরা সবাই মিলে ওকে পরিহাস করতে লাগল। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে যখন সবাই মিলে চা খেতে যেত তখন হাসাহাসি করে বলত, 'চল যাই, ফোমার ব্যবসা ফাঁপিয়ে দিয়ে আসি কিছুটা।'

দোকানে গিয়ে কিন্তু খুব কায়দা করে ডাকত ওরা, 'ওহে পরিবেশক—ওহে কোঁকড়া চুলো। এদিকে শোন!'

মুখ তুলে ফোমা এসে দাঁড়াত; তারপর জিজ্ঞেস করত, 'কি চাই?'

'পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের চিনতে পার না নাকি?'

'আমার অনেক কাজ…'

ও বুঝতে পারত ওর সঙ্গিরা ওকে অবহেলা করছে, ওকে রাগাতে চাইছে। ধীর সহিষ্ণু দৃষ্টিতে ফোমা তাকিয়ে থাকত ওদের দিকে। ওর চোখ-মুখের সমস্ত ভাব কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়ে এমন একটা ভাব ফুটে উঠত যেন ও বলতে চায়, 'যা বলবার শাগগির বলে ফেল।'

'মনে হচ্ছে কিছু বকশিস চাই তোর' বলত ওরা। তারপর খুব কায়দা করে পয়সার থলে খোঁজাখুঁজি করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত এক কোপেকও না দিয়ে চলে যেত

ফোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ওর যখন সাধু হবার ইচ্ছে হয়েছিল তখন তা না হয়ে চায়ের পরিবেশক হল কেন?

'সাধু হবার ইচ্ছে কোনদিনই ছিলনা আমার,' উত্তরে বলল ফোমা, 'তাছাড়া বেশি দিন পরিবেশকের কাজ করারও ইচ্ছে নেই।'

কিন্তু বছর চারেক পরে ওর সঙ্গে ৎসারিৎসিনে আমার দেখা হয়েছিল। তখনো সে চায়ের দোকানের পরিবেশক। তারপর একদিন সংবাদপত্রে পড়লাম ফোমা তুচকভ ঘরের সিঁদ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

বিশেষ করে পাথর-মিস্ত্রি আর্দালিয়নের কাহিনী সুস্পষ্টভাবে আমার মনে রেখা কেটেছিল। পিওতরের লোকদের মধ্যে সব চাইতে পুরনো ওস্তাদ মিস্ত্রি ছিল আর্দালিয়ন। চল্লিশ বছর বয়স্ক কালো দাড়িওলা এই চাষীটিকে দেখেও আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম ও মনিব না হয়ে পিওতর কেন মনিব হল। খুব কম মদ খেত আর্দালিয়ন এবং কখনই মত্ত হয়ে পড়ত না! কাজকর্মে খুব ভাল দখল ছিল, আর কাজও করত খুব উৎসাহ নিয়ে। ওর হাতে ইটগুলো যেন রক্তিম পায়রার মত উড়ে উড়ে পড়ত। ওর পাশে হাড়-জিরজিরে চিররুগ্ন পিওতরকে কেউ গ্রাহ্য করত না। পিওতর প্রায়ই বলত, 'অন্যের জন্য পাকা দালান করছি, কেন না নিজের জন্য একটা কাঠের কফিন তৈরি করতে হবে।'

ইট সাজাতে সাজাতে ফুর্তিতে উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠত আর্দালিয়ন, 'চলে এস ভাই, ঈশ্বরের নাম নিয়ে হাত লাগাও!' তারপর সে ওদের সঙ্গে গল্প করত যে ওর ইচ্ছে আগামী বসন্তকালে তমস্ক যাবে। সেখানে ওর ভগ্নিপতি একটা গির্জে তৈরির ভার পেয়েছে, তাই ওকে ফোরম্যানের দায়িত্ব দিয়েছে।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। গির্জে তৈরি ভারি মনের মত কাজ আমার!' বলল আর্দালিয়ন। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'চল আমার সঙ্গে। যারা লেখাপড়া জানে সাইবেরিয়ায় তাদের রোজগারের খুব সুবিধে। লেখাপড়া জানা লোকের মূল্য ওখানে খুব বেশি!'

আমি মেনে নিলাম। অত্যন্ত খুশি হয়ে আর্দালিয়ন বলে উঠল, 'ভাল ভাল! সত্যি করে বল কিন্তু, ঠাট্টা নয়।'

গ্রিগোরি আর পিওতরের সঙ্গে ওর আচরণ ছিল সৌহার্দ্যভরা স্নেহসিক্ত, শিশুদের প্রতি প্রবীণদের মত। অসিপকে বলত, 'কেবল অহঙ্কার!' তাসের খেলোয়াড়দের মতই ওরা একে অপরের কাছে নিজের বুদ্ধি জাহির করত। এ বলে, 'দেখ কী হাতটাই পেয়েছি এবার!' তো ও বলে, 'কেমন রংটাই না পেয়েছি দেখ!'

'কেন করবে না?' ধরা না দিয়ে উত্তর দিল অসিপ, 'মানুষ মাত্রেই গর্ব করে। মেয়েরা সকলেই সামনের দিকে তাদের বুক উঁচু করে চলে।'

'ভগবান, ভগবান এই, ভগবান সেই—চব্বিশ ঘণ্টা এধরণের কথা লেগেই আছে ওদের মুখে। ওদিকে টাকার থলেটা কিন্তু ঠিক সামলে চলেছে!' আর্দালিয়ন বলল।

'গ্রিগোরি টাকার থলে বাঁধছে এমন কথা কিন্তু বলতে পার না তুমি।'

'অন্যটির কথাই বলছি আমি। কেন অরণ্যে চলে যাক না, যেখানে জনমানব নেই, ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে শুধু একা একা থাকুক। ঈশ্বর, এখানকার সব কিছুর ওপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। বসন্তকাল আসুক, আমি ঠিক চলে যাচ্ছি সাইবেরিয়ায়।'

অন্যান্য মজুরেরা আর্দালিয়নকে হিংসে করে বলত, 'তোমার মত আমাদের যদি কেউ থাকত উঠিয়ে দেওয়ার লোক, তাহলে তোমার ঐ বোনাইয়ের মত আমরাও সাইবেরিয়ায় যেতে ভয় পেতাম না।'

তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল আর্দালিয়ন কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। এক রবিবার সে চলে গেল আর তিন দিনের মধ্যে তার কোন ঠিকানাই পাওয়া গেল না। কেউ জানত না তার কি হল না হল। বিস্মিত হয়ে সবাই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল, 'কেউ হয়ত মেরে ফেলেছে ওকে।'

'হয়তবা সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে।'

অবশেষে ইয়েফিমুশকা একদিন এসে খানিকটা সঙ্কোচিতভাবেই বলল, 'আর্দালিয়ন মদ খেয়ে পড়ে আছে।'

'মিথ্যে কথা!' অবিশ্বাসের সুরে চেঁচিয়ে উঠল পিওতর।

'মদে বেহুঁস হয়ে আছে, এমন শুরু করল যেন একেবারে হু হু করে খড়ের গাদার ঠিক মাঝখানে আগুন ধরেছে। মনে হচ্ছে যেন ওর বৌ মারা গেছে।'

'অনেক আগেই মরে গেছে ওর বৌ। কোথায় সে?' পিওতর চটে গিয়ে বেরিয়ে এল আর্দালিয়নকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু মার খেয়ে ফিরে এল।

অবশেষে দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে থমথমে মুখে বলে উঠল অসিপ, 'যাই, নিজের চোখেই দেখে আসি—ব্যাপারটা কি! লোকটা ভাল।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

'দেখ একবার,' পথ চলতে চলতে অসিপ বলল, 'লোকটা এতদিন সসম্মানে জীবন কাটিয়ে এল, তারপর আকস্মিক একদিন লেজ নাচিয়ে ময়লা আবর্জনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।' চোখদুটো খুলে রেখ, মাক্সিমিচ, আর এসব দেখে শিখে নাও।'

'আনন্দ ফূর্তির শহর' কুনাভিনোর একটা খেলো বেশ্যাপাড়ায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে চতুর চেহারার একটা বুড়ির সঙ্গে দেখা। অসিপ ওর কানে কানে কি যেন বলতেই ও আমাদের রাস্তা দেখিয়ে একটা ছোট ঘরের ভেতরে নিয়ে এল। ঘরটা যেমন নোংরা, তেমনি অন্ধকার। ঠিক একটা আস্তাবলের মত। একটা মেয়েমানুষ খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যেই এপাশ-ওপাশ করছে। বুড়ি ওর পাঁজরায় একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠল, 'বেরিয়ে যা, শুনছিস? বেরো এখান থেকে, কোলাব্যাং কোথাকার!'

ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে চোখ মুখ ডলতে ডলতে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, 'হা ঈশ্বর, কী এসব, এরা কারা?'

'গোয়েন্দা' শান্ত কণ্ঠে অসিপ বলল। মুখটা হাঁ করে মেয়েমানুষটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর গন্তব্য পথ লক্ষ্য করে থুথু ফেলল অসিপ।

'শয়তানের থেকে গোয়েন্দাকে ওরা বেশি ভয় পায়।' বলল অসিপ।

বুড়ি দেয়াল থেকে একটা ছোট আয়না পেড়ে ওয়াল পেপারের একটা পর্দা উঠিয়ে দেখাল, 'দেখ তো, ঐ সেই লোক কিনা?'

ফোঁকড় দিয়ে উঁকি মেরে দেখল অসিপ, 'ওই বটে! ছুঁড়িটাকে তাড়াও।'

আমিও তাকালাম। আমাদের ঘরটার মতই নোংরা একটা ঘরের বন্ধ জানলার ওপরে একটা আলো জ্বলছে। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে টেরা চোখ উলঙ্গ তাতার মেয়ে একটা ছোট জামা সেলাই করছে। ওর পেছনে জোড়া বালিশের ওপর আর্দালিয়নের ফুলো ফুলো মুখটা চোখে পড়ল। কর্কশ কালোদাড়িগুলো ইতস্তত চারদিক বেয়ে ছড়িয়ে আছে। তাতার মেয়েটা অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে জামা পরে নিল। তারপর বিছানার এক পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। হঠাৎ দেখি সে এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের ঘরে।

ওকে লক্ষ্য করে আবার থুথু ফেলল অসিপ। 'ছোঃ, বেহায়া মেয়েছেলে কোথাকার!'

'তুই তো একটা বুড়ো বলদ।' হাসতে হাসতে পাল্টা জবাব দিল মেয়েটা।

ওর দিকে আঙুল তুলে অসিপও হেসে ফেলল।

আমরা ঢুকলাম তাতার মেয়েটার ঘরে। বুড়ো বসল আর্দালিয়ানের পায়ের কাছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করল ওকে জাগাতে। কিন্তু আর্দালিয়ন কেবল বিড়বিড় করে বকতে লাগল, 'ও ঠিক আছে···একটু অপেক্ষা কর···চলে যাচ্ছি···'

শেষ পর্যন্ত সে উঠে বসে অসিপ আর আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল। পরক্ষণেই আবার ড্যাবা ড্যাবা চোখদুটো বন্ধ করে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'কি খবর?'

'কি হয়েছে?' ধীর গম্ভীর সুরে বলল অসিপ। ওর সুরে কোন ভর্ৎসনার ছোঁয়া ছিল না।

'মাথা গিয়েছিল।' কেশে উত্তর দিল আর্দালিয়ন।

'কি করে?'

'এই এমনিই।'

'খুবই খারাপ।'

'তা জানি।'

আর্দালিয়ন টেবিলের ওপর থেকে একটা ছিপি খোলা মদের বোতল উঠিয়ে গলায় ঢালতে শুরু করল। তারপর বোতলটা অসিপের দিকে এগিয়ে দিল।

'চলবে না কি একটু? কিছু খাবারও থাকার কথা।'

বুড়ো এক ঢোক খেয়ে মুখ বিকৃত করল, তারপর এক টুকরো রুটি উঠিয়ে নিয়ে একমনে চিবোতে শুরু করে দিল। আর আর্দালিয়ন জড়ান গলায় বলে চলল, 'দেখলে? এই তাতার মেয়েমানুষটার কাছে এসে ভিড়েছি। এসব হচ্ছে ইয়েফিমুশকার কর্ম। ওই বললে ছুঁড়িটার বয়স কম—কাসিমভ থেকে এসেছে। বাপ মা নেই—মেলায় যাবার ইচ্ছে ছিল।'

দেয়ালের অন্যপাশ থেকে রাগত কণ্ঠের ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ আওয়াজ ভেসে আসছিল। 'তাতার সব থেকে চমৎকার! একেবারে! বাচ্চা মুরগীর মত। বুড়োটাকে তাড়িয়ে দাও। ওতো আর তোমার বাপ নয়।'

'ঐ ঐটি।' ধোঁয়াটে দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল আর্দালিয়ন।

'ওকে দেখেছি।' বলল অসিপ।

আমার দিকে ঘুরে তাকাল আর্দালিয়ন, 'দেখ দেখি ভাই, কি করেছি আমি।'

ভেবেছিলাম অসিপ ওকে তিরস্কার করতে শুরু করবে, নয়ত উপদেশ দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাপীটা লজ্জা পেয়ে পরিতাপ করতে থাকবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। ওরা পাশাপাশি বসে নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। ঐ অন্ধকার নোংরা গুমটির ভেতরে ওদের ওভাবে বসে থাকতে দেখে খুবই খারাপ লাগছিল আমার। আধো আধো রুশভাষায় তাতার মেয়েটা তেমনি বক্‌বক্‌ করে চলেছে দেয়ালের সেই গর্ত দিয়ে, কিন্তু ওর কথা কেউ গ্রাহ্যে আনছিল না। টেবিলের ওপর থেকে অসিপ একটা শুঁটকী মাছ তুলে নিল। তারপর জুতোর ওপরে আছড়ে নিয়ে ছাল ছাড়াতে শুরু করল:

'টাকাকড়ি সব ফুরিয়েছে ?' জিজ্ঞেস করল অসিপ।

'পিওতরের কাছে পাওনা আছে কিছু।'

'তুমি তো কদিনের মধ্যেই তম্‌স্ক যাচ্ছ। খরচা সামলাতে পারবে তো ?'

'তম্‌স্কে যাওয়া হবে কি না এখনো তার ঠিক নেই।'

'কেন, সিদ্ধান্ত বদলে গেছে না কি ?'

'যদি ওরা আমার আপনজন না হত...'

'কী ?'

'আমার বোন, বোনাই...'

'তার মানে ?'

'আত্মীয়ের কাছে কাজ করাটা খুব মজার নয়, ভাই !'

'মনিব মনিবই, তা আত্মীয় হোক চাই না-ই হোক।'

'তবুও।'

ওরা পরম বন্ধুরমত পাশাপাশি বসে এমন গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল যে তাতার মেয়েটা পর্যন্ত ওদের বিরক্ত না করে চুপ করে রইল। শেষে ঘরে এসে পেরেকের ওপর থেকে ওর পোশাকটা নিয়ে চলে গেল।

'ছুঁড়িটার বয়স কম।' বলল অসিপ।

আর্দালিয়ন শান্ত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল, 'এসব হচ্ছে ইয়েফিমুশকার কর্ম। ওর মাথায় ঘুরছে শুধু মেয়েমানুষের কথা—তাতার মেয়েমানুষটা হাসিখুশি আছে, সব সময়েই বাজে বকে, বকবক্ করে।'

'খবর্দার, নইলে সারাজীবনের মতই ফাঁদে পড়বে।' হুঁশিয়ার করে দিল অসিপ। শেষবারের মত একটা শুঁটকী মাছ খেয়ে উঠে পড়ল সে।

পথে আসতে আসতে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এসেছিলে কেন ?'

'কী হচ্ছে না হচ্ছে শুধু সেইটুকু দেখার জন্য। ও আমার বন্ধু। এমন অনেক ঘটনা জানা আছে আমার—একটা লোক আছে তো ভালই আছে; তারপর হঠাৎ যেন একদিন জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার মত হল।' বলল অসিপ। তারপর নিজের কথার সূত্র ধরে বলে চলল, 'ভদ্‌কা থেকে সরে থাকিস্ !' কিছুক্ষণ পরে আবার নিজের মনেই বলল, 'কিন্তু ওটা না হলে বড়ই একঘেয়ে লাগে !'

'ভদ্‌কা না হলে ?'

'হ্যাঁ, একবার এক ঢোক খেলেই মনে হবে যেন অন্য এক জগৎ-এ চলে এসেছি।'

সারাজীবনের মত আর্দালিয়ন আটকা পড়ে গেল ওখানে। কিছুদিন বাদে কাজে ফিরে এল আবার। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সরে পড়ল সে। এরপর ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার বসন্তকালে। দেখি যাযাবরের সঙ্গে নদীর একটা বজরার চারপাশ থেকে বরফ ভাঙছে। দুজনকে দেখে দুজনারই বেজায় ফুর্তি হল। একসঙ্গে চা খেতে গেলাম একটা চায়ের দোকানে।

'মনে আছে, কেমন একটা সত্যিকারের মজুর ছিলাম আমি ?' চা খেতে খেতে কায়দা করে বলতে লাগল, 'না মেনে পারবে না যে কাজে আমি ছিলাম একটা বিশ্বকর্মা। শয়ে শয়ে টাকা রোজগার করতে পারতাম ইচ্ছে করলে।'

'কিন্তু রোজগার তো করলে না আর।'

'রোজগার করিনি ঠিকই,' গর্বের সুরে বলল, 'কাজের তোয়াক্কা করি না।'

ও এমন একটা বেপরোয়া ডাড়য়ে-দেয়া ভাবে কথা বলতে শুরু করল যে চা খাবার সময় সবার চোখ এসে পড়ল ওর দিকে।

'মনে আছে, সেই মিটমিটে চোর পিওতর কাজের বেলায় কী বলত? 'দালান বাড়ী অন্যের জন্যে, আর কাঠের কফিন নিজের। তবেই দেখ, কাজের দাম তো এই।'

'পিওতর চিররুগ্ন,' বললাম আমি, 'মরতে ও ভয় পেত?'

'রোগী আমিও,' চেঁচিয়ে উঠল আর্দালিয়ন, 'আমার আত্মা অসুখে ভুগছে।'

প্রায় প্রতি রবিবারই আমি মধ্য শহর ছেড়ে চলে আসতাম 'লক্ষপতি' পাড়ায়। এখানে যাযাবরদের আবাস। দেখলাম কত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আর্দালিয়ন এই সমাজচ্যুতদের একজন হয়ে উঠেছে। মাত্র একবছর আগেও ও ছিল হাসি ঝলমলে স্থির মস্তিষ্কের শ্রমিক। কিন্তু এর মধ্যে ওদের মত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ওদেরই মত হাঁটার কায়দা, ওদেরই মত দম্ভভরা দৃষ্টি আয়ত্তে এনে ফেলেছে। যেন সবার বিপক্ষে লড়াই বিবাদ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে সারাক্ষণ।

'দেখেছ তো, সবাই আমার কথা কেমন মানে। আমি এখানকার দলপতি!' অহঙ্কার করে বলত।

ওর রোজগারের জমান টাকা থেকে যাযাবরদের খাইয়ে দিত। মারামারিতে যে দল হেরে যাচ্ছে সে দলের হয়ে লড়তে শুরু করে দিত। প্রায়ই শোনা যেত, ও চেঁচিয়ে বলছে, 'এটা কিন্তু তোমাদের অনুচিত, আইনমাফিক কাজ করা উচিত তোমাদের!' ফলে সবাই ওর নাম দিয়েছে, 'আইনমাফিক'। এতে ও খুব খুশি।

এই যে লোকগুলো ঐ জীর্ণ নোংরা মহল্লার পাথুরে খুপরির মধ্যে ঠেসাঠেসি করে রয়েছে, চেষ্টা করতাম এদের বুঝতে। এদের সবাই জীবনের প্রকৃত পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু মনে হত যেন আবার নিজস্ব ধারায় ওরা গড়ে তুলেছে এক অন্য জীবন। সে জীবন আনন্দের জীবন, মুক্ত জীবন। ওরা সাহসী, কিছুই গ্রাহ্য করত না। ওদের দেখে আমার মনে পড়ে যেত দাদুর গল্পে বলা, সেই ভলগার মাঝিমাল্লাদের কথা, যারা এক মুহূর্তের মধ্যেই ডাকাত বা সাধুতে রূপান্তরিত হতে পারত। অবসর সময়ে ওরা বড় নৌকো বা ষ্টিমার থেকে ছোটখাটো চুরি-চামারি করতে একটুও দ্বিধা করত না। কিন্তু এতে আমার এতটুকুও অস্বস্তি লাগত না। কারণ আমি জানি, কালো সুতো দিয়ে ছেঁড়া কোট রিপু করার মত জীবনটাও চুরি করা সুতো দিয়ে জোড়াতালি দিতে হয়। কিন্তু এটাও দেখেছি যে কোথাও কখনো আগুন ধরে গেলে বা নদীর বুকে জমে যাওয়া বরফ ভাঙতে হলে কিংবা কোন প্রয়োজনীয় মাল বোঝাই করতে হলে এই লোকগুলোই আবার অসীম উৎসাহে আত্মত্যাগ করে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়েই কাজ করে চলত। সর্বোপরি ওরা ছিল অন্য সবার চাইতে অনেক বেশি ফুর্তিতে।

কিন্তু আর্দালিয়নের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা শুনে পিতৃসুলভ সুরে অসিপ বলল, 'শোন বাপু, নিচের ঐ "লক্ষপতি" লোকদের সঙ্গে তোমার মেলামেশা একটু বেশি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যে? দেখ, ওরা যেন তোমার সর্বনাশ করে না ছাড়ে।'

আমি আমার সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ওরা কাজ না করেও কেমন বেপরোয়াভাবে চলে, তাই ওদেরকে আমার ভারি পছন্দ।

'পাখির মতই স্বাধীন।' একটু হেসে বাধা দিয়ে বলে উঠল অসিপ, 'তার কারণ ওরা বেকুফ, আলসে। ওদের কাছে কাজ হল গিয়ে শাস্তির সমান।'

'কেইবা মজা পায় কাজ করে? কথায় বলে, 'সৎপথে হেঁটে কারুর দালান বাড়ী হয় না।'

আমি বলেই ফেললাম সেই কথাটা। কথাটা অনেকবার শুনেছি আর বোধ হত যে ওটা সত্যিই খাঁটি কথা। কিন্তু দারুণ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অসিপ, 'কে বলে এমন কথা? বেকুফ্ কুঁড়ে যারা, তারাই। তুই বাচ্চা ছেলে, এসব কথায় তোর কান দেয়া ঠিক নয়। যারা হিংসুটে বা অসমর্থ তারাই এসব আজেবাজে কথা বলে থাকে। ওড়্যা শুরু করার আগে কিছু পাখনা গজান দরকার। তোর ঐ বন্ধু,—আমি বলে দেব তোর মনিবকে। তখন নিজেই নিজের কপাল চাপড়ে মরবি!'

অসিপ নালিশ করল মনিবকে। অসিপের সামনেই মনিব আমাকে বলল, "লক্ষপতি" পাড়ায় যাওয়া আসা ছেড়ে দাও পেশকভ। ও পাড়ার সবাই গণিকা আর চোর। শেষ পর্যন্ত হয় জেলখানায় নয়ত হাসপাতালে গিয়ে ভিড়তে হবে। ওদের সংসর্গ ছেড়ে দাও।'

'লক্ষপতি' পাড়ায় যাতায়াতের কথা চেপে রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু শীগ্‌গিরই বাধ্য হলাম ও পাড়ায় যাতায়াত ছেড়ে দিতে।

একদিন আর্দালিয়ন, ওর বন্ধু 'খোকা' আর আমি, একটা বাড়ির উঠোনের একটা চালাঘরে ছাদের ওপর বসেছিলাম। খোকা তার রেস্তভ-অন-দন থেকে পদব্রজে মস্কো যাওয়ার এক চমকপ্রদ গল্প বলছিল আমাদের কাছে। ও আগে যোদ্ধা ছিল। কারিগর বিভাগে কাজ করত। 'সেন্ট জর্জ' ক্রশও পেয়েছিল। আর তুর্কী যুদ্ধের সময় হাঁটুর ওপর পেয়েছিল একটা আঘাত। তাতে সারা জীবনের মত ল্যাংড়া হয়ে যায়। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা। হাত দুটোতে ছিল অসম্ভব জোর। কিন্তু হাতের সে শক্তি কাজে প্রয়োগ করার কোন পথ ছিল না। কি একটা রোগে ওর চুল দাড়ি সব উঠে গিয়ে মাথাটা শিশুর মত টেকো হয়ে গিয়েছিল।

বাদামী রংয়ের দুটো চোখে ঝিলিক তুলে ও বলছিল, 'এমনি করে সেরপুখভে এসে পড়লাম। দেখলাম এক পুরোহিত তার বাড়ীর পেছনের বারান্দায় বসে আছে। আমি তো তার কাছে গিয়ে বলে ফেললাম, 'তুর্কী যুদ্ধের এক বীরের জন্য যৎকিঞ্চিত দান করতে পারেন কি?'

আর্দালিয়ন মাথা হেলিয়ে বলল, 'ওঃ, কি মিথ্যেবাদী রে তুই! কি মিথ্যেবাদী।'

'মিথ্যেবাদী কেন?' একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে প্রশ্ন করল খোকা। তিরস্কার ভরা অলস কণ্ঠে আর্দালিয়ন কিন্তু বলেই চলল, 'সৎভাবে বাস করা উচিত তোর। অন্য সব ল্যাংড়াদের মত তোরও উচিত একটা রাত-পাহারাদারের কাজ যোগাড় করে নেয়া। কিন্তু তা না করে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস আর মিথ্যে কথা বলছিস।'

'মজা করার জন্যই করি; লোক হাসাবার জন্য।'

'নিজেকে নিয়ে হাসতে হবে তোকে।'

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন; তবুও উঠোন যেমন ছায়াচ্ছন্ন, তেমনি ময়লা। একটি মেয়েছেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে কি যেন নাড়াতে নাড়াতে বলছিল, 'কে আছ গো মেয়েরা, স্কার্ট কিনবে তো এস।'

মেয়েরা খুপরি থেকে সদলবলে এসে বিক্রেতার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম নাতালিয়াকে। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসার আগেই দেখি প্রথম ক্রেতার কাছে স্কার্টটা বেচে নাতালিয়া উঠোন থেকে চলে যাচ্ছে।

'কি খবর ?' গেটের ওপাশে ওকে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

'ব্যস, আর কিছু বলবে ?' কটাক্ষ করে বলে উঠল নাতালিয়া। হঠাৎ থেমে গিয়ে রাগত সুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় রে কপাল! এখানে তুই কি করছিস ?'

ওর সেই সচকিত আর্তনাদে কেমন যেন একটু বিষণ্ণ, একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। ভয় আর বিস্ময়ের প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টভাবে ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখের ওপরে ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারলাম ওর ভয়টা আমারই জন্য। তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বললাম যে আমি এখানে থাকি না, মাঝে মধ্যে আসি একটু দেখাশুনা করতে।

'একটু দেখাশুনা করতে!' কড়া বিদ্রূপের সুরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল নাতালিয়া, 'কোন জায়গাটা দেখতে ? চলন্ত মানুষগুলোর পকেটের ভেতরটা না মেয়েদের জামার ভেতরটা, এঁ্যা ?'

ওর মুখখানা মলিন দেখাচ্ছিল। ঠোঁটদুটো নিস্পন্দ হয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখের কোলগুলো কালো।

সরাইখানার সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল; তারপর বলল, 'আয়, একটু চা খাওয়া যাক। জামাকাপড় তো বেশ পরিষ্কার, ওদের মত নয়। কিন্তু যাই বলিস তুই, তোর কথা বিশ্বাস করার মত নয়।'

কিন্তু সরাইখানার ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন আমার ওপরে ওর বিশ্বাস ফিরে এসেছে। চা ঢেলে নেয়ার পরে শুষ্ক গলায় বলতে শুরু করল কেমন করে ও মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে ঘুম থেকে উঠেছে। এখন পর্যন্ত কিছুই পড়েনি পেটে। একবিন্দু জলও না, 'কাল রাতে কোচোয়ানের মত মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কার সঙ্গে কোথায় মদ খেয়েছি সব ভুলে গেছি।'

ওর জন্য খারাপ লাগল আমার। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম ওর সামনে। ওর মেয়ের সংবাদ জানতে খুব ইচ্ছে করছিল। চা আর ভদ্‌কা খাবার পরে ও নিজেই ওর স্বভাবসুলভ চপল ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল, এ পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের মত কিছুটা অমার্জিত ভাষার প্রয়োগ করে। কিন্তু যেই আমি ওর মেয়ের কথা জানতে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'কেন জানতে চাইছিস ? না বাবা, কোন কালেও তুই ওর নাগাল পাবি না; এ জীবনেও না।'

তারপর খানিকটা মদ খেয়ে আবার বলতে লাগল, 'আমাকে আর প্রয়োজন নেই আমার মেয়ের। কে আমি ? একটা ধোপানী। ওর মত মেয়ের মা হওয়ার যোগ্য? ও হল শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা। সামান্য নয় ভাই! তাই সে আমাকে ছেড়ে তার এক বন্ধুর বাড়ী চলে গেছে। সে ধনীর মেয়ে। মনে হয় গভর্নেস হতে গেছে।'

তারপর একটু বিরতি দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'ধোপানী তো আর কারুর কোন কাজে আসে না। হয়ত বাজারের মেয়েরা তবু কিছু কাজে দেয়, কি বলিস ?'

আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ও এখন পথের বেশ্যা। এ পাড়ার অন্যান্য মেয়েরাও তাই। কিন্তু ও নিজেই নিজের সম্পর্কে কথাটা ব্যবহার করল দেখে এমন মর্মান্তিক আঘাত পেলাম যে লজ্জায় শোকে আমার চোখে জল এসে পড়ল। বিশেষ করে নাতালিয়ার মত একজনের মুখে এই স্বীকৃতি শুনে এক আকস্মিক শঙ্কায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম, এই কদিন আগেও ও ছিল এক সাহসী, বুদ্ধিমতী, স্বাধীন মেয়ে!

'বোকা ছেলে কোথাকার,' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এখান থেকে সরে যা! আমি তোর ভালর জন্য বলছি, অনুরোধ করছি এ পাড়ায়

আর আসিস না। তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে!' তারপর টেবিলের ওপরে ঝুঁকে ট্রের ওপরে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে গলা নামিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে বলতে লাগল, যেন ও নিজের মনেই বলে যাচ্ছে নিজের কাছে, 'কিন্তু আমার কথা মানবি কেন তুই? যখন আমার নিজের পেটের মেয়েই মানল না। ওকে বলতাম, "তুই তোর নিজের মাকে ছেড়ে চলে যাবি—কিছুতেই না।" কিন্তু ও তাতে বলত, "তা না হলে আমি আত্মহত্যা করব।" তারপর চলে গেল কাজানে—ইচ্ছে ছিল নার্সিং শিখবে। রেণু, ভাল। কিন্তু আমার কি হবে?...আমার...মন্দ কি, এখানেই পড়ে আছি। *কার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? রাস্তার মানুষগুলোর সামনে?'

কী এক গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেল নাতালিয়া। ঠোঁটদুটো নীরবে নড়ছে। বাহ্যত আমার উপস্থিতিই ওর মনে নেই। ঠোঁটের কোন দুটো নুয়ে পড়ায় আধখানা বাঁকা চাঁদের মত দেখাচ্ছে মুখটা। ঠোঁটের সেই ভাঁজ আর স্পন্দিত বলিরেখা কী যেন এক মূক নীরব ভাষায় কথা বলে চলেছে। দেখে ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। ওর মুখখানা কেমন শিশুর মত অভিমানী। মাথায় শালের ভেতর থেকে এক গোছা চুল গালের ওপরে ঝুলে পড়ে বেঁকে ছোট নাকটাকে ঘিরে চলে গেছে পেছনের দিকে। ঠাণ্ডা চায়ের গ্লাসটায় এক ফোঁটা চোখের জল বেয়ে পড়ল। দেখতে পেয়ে গ্লাসটা দূরে সরিয়ে রেখে দিল। তারপর শক্ত করে চোখটা বন্ধ করে আরো দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে শালের পাড় দিয়ে মুখ-চোখ মুছে ফেলল।

ওর পাশে আর বসে থাকতে পারছিলাম না। উঠে বললাম, 'চললাম!'

'অ্যাঁ? বিদেয় হ, নরকে যা!' আমার দিকে না ফিরেই হাত নেড়ে আমাকে তাড়াল। হয়ত মনেই নেই আমি কে।"

আর্দালিয়নকে খুঁজতে আবার ফিরে এলাম উঠোনে। কথা হয়েছিল, একদিন ওর সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে যাব। ভেবেছিলাম এই স্ত্রীলোকটির কথা ওকে জানাব। কিন্তু না, আর্দালিয়ন বা খোকা কেউই ছাদের ওপরে নেই। ঐ এলোমেলো উঠোনটার মধ্যে যখন ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তখন একটা সোরগোল শুনতে পেলাম। এ ধরণের হল্লা এ পাড়ায় খুবই স্বাভাবিক।

গেটের বাইরে আসতেই প্রায় নাতালিয়ার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। অন্ধের মত কাঁপতে কাঁপতে ও আসছিল পাকা রাস্তা ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে। এক হাতে শাল দিয়ে জখম মুখটা মুছছে, অন্য হাতে বিশৃঙ্খল চুলগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে পেছনের দিকে। ওর পেছনে আসছে আর্দালিয়ন আর খোকা।

'আবার কয়েক ঘা দেয়া যাক হতচ্ছাড়ীকে, চল!' চেঁচিয়ে বলে উঠল খোকা।

আর্দালিয়ন ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল ওর সামনে; নাতালিয়া ফিরে দাঁড়াল। বিকৃত মুখ। দুচোখ ভরা তীব্র ঘৃণা।

'মার, যত ইচ্ছে মার!' চেঁচিয়ে বলে উঠল নাতালিয়া।

আর্দালিয়নের হাত চেপে ধরলাম। বিস্ময়ে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'তোর কি হল?'

'ওর গায়ে হাত ছুঁইয়ো না।' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

হো হো করে হেসে উঠল আর্দালিয়ন, 'ও কে, তোর মেয়েমানুষ? ওঃ নাতালিয়া, সর্বনাশ করেছিস তুই! সাধুবেচারীকে পর্যন্ত ফাঁদে ফেলেছিস!'

খোকাও হো হো করে হাসতে হাসতে উরু থাবড়াতে শুরু করল, তারপর

দুজনে মিলে আমাকে কুৎসিৎ ভাষায় পরিহাস করতে লাগল। কিন্তু এই হৈ-চৈয়ের মধ্যে নাতালিয়া পালিয়ে বাঁচার সুযোগ পেল। যখন মনে হল আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়, তখন খোকার বুকে একটা জোড় ঘুসি চালিয়ে ওকে চিত করে ফেলে দিয়ে ছুটে পালালাম।

তারপর অনেকদিন আর 'লক্ষপতি' পাড়ায় যাইনি, কিন্তু আর্দালিয়নের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আবার। এবার দেখা হল একটা খেয়া নৌকোয়।

'আরে,' খুশিভরা সুরে বলে উঠল আর্দালিয়ন, 'হয়েছে কি তোর?'

যখন বললাম যে নাতালিয়াকে ওরা যেভাবে মারছিল আর আমাকে হেয় করছিল তাতে আমি খুবই অপমানিত হয়েছিলাম, তখন ও ভরাট গলায় হেসে বলল, 'তুই কি মনে করিস আমরা সত্যি সত্যিই তাই ভেবেছি? তোকে একটু রাগাচ্ছিলাম মজা করার জন্য। আর ওর কথা বলছিস—ওকে পিটব না কেন? ও তো একটা পথের বেশ্যা। লোকে যদি নিজের বৌকে ধরে মারতে পারে তবে একটা মাগীকে ছেড়ে দেবে কেন? কিন্তু আমরা তো শুধু ঠাট্টা করছিলাম। ঠেঙ্গিয়ে কাউকে কখনো বোঝান যায় না, সেটা আমি ভাল করেই জানি।'

'কী মনে কর, ওকে বোঝাবার যোগ্যতা আছে নাকি তোমার? ওর চাইতে তুমি এমন কিছু উন্নত নও।'

ও আমার গলা ধরে একটা নাড়া দিল। হাসতে হাসতে বলল, 'মন্দটা তো সেখানেই। কেউ অন্য কারুর চাইতে ভাল নয়…সেটা আমি বুঝতে পারি—ওপর নীচ সবই দেখতে পাই। আমি তো আর তোমার পাড়াগেঁয়ে বলদ নই।'

ও তখন মাতাল, মনটাও ফুর্তিতে ভরা। যেমন করে স্নেহশীল শিক্ষক ক্ষমাসুন্দর চোখে অবুঝ ছাত্রের দিকে তাকায়, তেমনি এক দৃষ্টে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাঝে মধ্যে পাভেল ওদিনৎসভের সঙ্গে দেখা হত। আগের চাইতেও উজ্জ্বল; একটু সৌখিন গোছের পোশাক পরিচ্ছদ। আমাকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখত। একদিন তিরস্কারের সুরে বলল, 'ও ধরণের একটা কাজ নিলি কেন তুই? ঐ সব ছোটলোকদের সঙ্গে কাজ করে কোন দিনও কিছু হবে না।'

তারপর দুঃখের সঙ্গে জানাল কারখানার সংবাদ, 'ঝিখারেভ এখন সেই বুড়ীটার সঙ্গে বাস করছে। মনে হয় সিতানভ যেন কি এক মনোবেদনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, আর শরীরের পক্ষে যতটা সম্ভব তার থেকে ঢের বেশি মদ খাচ্ছে। গোগলেভকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। বড় দিনের ছুটিতে যখন বাড়ি যায় তখন এক দিন মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। তখন নেকড়েরা মিলে ওকে দাঁতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।'

কল্পনায় দৃশ্যটা ওর চোখে ভেসে উঠতেই পাভেল হো হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল, 'ওকে চিবিয়ে নেকড়েগুলোও বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। সার্কাসের কুকুরের মত পেছনের পায়ে ভর দিয়ে হেলে দুলে বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর চিৎকার করছিল ভীষণভাবে। পরদিন সবকটাই মারা গেল…'

ওর কথা শুনে আমিও হাসলাম, আর মনের একান্ত গভীরে অনুভব করছিলাম, যে কারখানা আর কারখানা-জীবনের কথা আমি চিন্তা করতাম তা কখন আমার কাছে এক অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি, ব্যাপারটা দুঃখের।

উনিশ

বলতে গেলে শীতকালে মেলার মাঠে প্রায় কোন কাজই ছিল না। বাড়িতে বসে সেই পুরনো কাজই করতে হচ্ছিল। সমস্ত দিনটা কেটে যেত ঘরের কাজকর্ম করতে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় অবকাশ পেতাম। আবার পারিবারিক সমাবেশে 'নিভা' আর 'মস্কো ইস্তাহার' থেকে উপন্যাস পড়ে শোনাতে লাগলাম, যেটা আমি মনে প্রাণে অপছন্দ করতাম। রাত্রে ভাল বই পড়তাম, আর কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম।

একদিন গিন্নীরা সান্ধ্য উপাসনায় গেছে। মনিবের শরীর খারাপ বলে আমার সঙ্গে বাড়িতেই ছিল। মনিব বলল, 'ভিক্তর তোমার কবিতা নিয়ে পরিহাস করে। সত্যি, লেখ নাকি পেশকভ? তোমার লেখা কয়েকটা শোনাও দেখি!'

প্রত্যাখ্যান করতে কেমন জানি খারাপ লাগল; তাই কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনালাম। বুঝতে পারলাম পছন্দ হয় নি। বলল, 'যাও, চলে যাও। হয়ত সময়ে আর একজন পুশকিন হয়ে উঠবে। পুশকিন পড়েছ কখনো?

'পেত্নীরা কখনো বিয়ে করে
ভূতরা যায় মরে?'

ও'র সময়ে লোকে ভূতে বিশ্বাস করত। কিন্তু উনি বিশ্বাস করতেন বলে আমার মনে হয় না; নিছক পরিহাস করেই লিখেছেন!'

'হাঁ ভাই, তোমাকে কিছু লেখাপড়া শেখান উচিত ছিল,' আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কি করে যে তুমি সংসার চালাবে তা একমাত্র শয়তানই বলতে পারে। তোমার ঐ নোটবইটা মেয়েদের থেকে গোপনে রেখো। নাহলে ওরা তোমায় পরখ করতে শুরু করবে। মেয়েমানুষ, বুঝলে ভাই, ওরা মানুষের ব্যথিত জায়গায়ই আঘাত করতে ভালবাসে।

কিছুদিন ধরে আমার মনিব খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, কি এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকত সব সময়। থেকে থেকে উন্নত দৃষ্টিতে নিজের চারপাশে তাকাত আর দোরের ঘণ্টা শুনলেই চমকে উঠত। কখনো কখনো সামান্য কারণেও ব্যধি-গ্রস্তের মত বকাবকি করে উঠত। সবাইকে গাল দিতে দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। ফিরে আসত অনেক রাতে, মাতাল হয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কোন একটা কিছুর চাপে ওর অন্তর পিষে যাচ্ছে, সেটা যে কি তা একমাত্র ওই জানে। তাতে ওর উদ্যম, উৎসাহ হারিয়ে গেছে। ফলে ও জীবনের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে। যেন শুধু অভ্যাসের বশেই জীবন যাপন করছে।

রবিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়তাম। সন্ধ্যা নটা অব্দি বেড়িয়ে চলে আসতাম ইয়াম্স্কায়া স্ট্রীটের সরাইখানায়। দোকানের মালিক ছিল মোটামত, ঘর্মাক্ত কলেবর একটি জীব—ওর ছিল প্রবল গানের নেশা। এটা জানতে পারায় চারপাশের সমস্ত গির্জের গায়কেরা এসে হাজির হত ভদ্কা, বিয়ার আর চায়ের লোভে। মালিক ওদের গানের পরিবর্তে এই পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করত। গির্জের গায়কেরা সকলেই নিস্তেজ মাতালের দল। শুধু ও ভদ্কা, বিয়ার-এর লোভে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান গাইত। আর গির্জের গান ছাড়া কদাচিৎ অন্য কিছু গাইত। ধার্মিক মাতালেরা যখন প্রতিবাদ করত যে মদের দোকান গির্জের গান গাওয়ার জায়গা নয়, তখন মালিক তার অতিথিদের নিয়ে চলে যেত নিজের

খাস কামরায়। তখন দরজায় কান লাগিয়ে না থাকলে গানের সুর আর শোনা যেত না। প্রায়ই গাঁয়ের মিস্ত্রি, কৃষকেরা এসে গাইত ওর দোকানে। গায়কের খোঁজে চতুর্দিক চষে ফেলত মালিক। হাটের দিনে যে সব চাষীরা শহরে আসত তাদের মধ্য থেকে খুঁজে গায়ক বের করে তাদের নিমন্ত্রণ করে আনত দোকানে।

গাইয়েকে সরাইখানার ভদ্‌কার পিপের সামনে একটা টুলে বসতে দেয়া হত। পিপের তলাটাকে তার মাথার পেছনে একটা গোল চক্রের মত দেখাত।

সবার চেয়ে ভাল গাইত ক্লেশ্চভ—ছোটখাটো শীর্ণ চেহারার জিন নির্মাতা। ওর গানের ঝুলিতে জমা ছিল সুন্দর সুন্দর গান। কুঞ্চিত এলোমেলো চেহারা, সমস্ত দেহ লাল চুলে ঢাকা। মৃতের মত ওর নাকটা ছিল চক্‌চকে। ওর ছোট ছোট স্বপ্নালু রেশমী চোখদুটো মনে হত যেন নিশ্চলভাবে কোটরের ভেতরে বসান।

কখনো কখনো চোখ বন্ধ করে পিপের তলার চাকার ওপরে ভর দিয়ে বুক চিতিয়ে নম্র কিন্তু অদম্য সপ্তম সুরে গেয়ে চলত ও।

ওর কণ্ঠস্বর তেমন উঁচুতে নয়, কিন্তু অশ্রান্ত। একটা রূপোর সুতোয় সে যেন সরাইখানার ঐ একঘেয়ে মৃত অন্ধকার গুঞ্জনকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করে চলত। এমন কেউ ছিল না যে সেই বিষাদের গানের করুণ ভাষা আর কান্নার ঢেউয়ের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেত। এমন কি সবচেয়ে বেশি মাতাল হয়ে পড়ত যারা তারাও আশ্চর্য রকমের যত্নশীল হয়ে উঠে পলকহীন দৃষ্টিতে সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। সুন্দর কোন সঙ্গীত যদি মর্মস্থল স্পর্শ করে তাহলে যে-রকম অদমনীয় ভাবাবেগে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই রকম আবেগে বুকখানা কানায় কানায় ভরে ফেটে পড়ার অবস্থা হত।

সরাইখানাটাকে ঘিরে নেমে আসত গির্জের নীরবতা। গায়ক যেন সেই নীরব নীস্তব্ধ গির্জের এক মঙ্গলকামী পুরোহিত। কোন ধর্ম-বাণী প্রচার করছে না সে, কিন্তু পরম ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছে। এই অভাগা মানব জীবনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ব্যথা বেদনার কথা নিবেদন করে দিচ্ছে! আর চারপাশ থেকে দাড়িওলা লোকগুলো তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ওদের জান্তব মুখের ওপর শিশুর মত চোখগুলো ভাবপ্রবণতায় মিটমিট করছে। মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে কারো বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে—সে দীর্ঘশ্বাস সঙ্গীতের প্রভাবের নিশ্চিত্ত প্রমাণ। এসব মুহূর্তে আমার মনে হত যেন সমস্ত মানুষ এক ভূয়ো কৃত্রিম জীবন যাপন করে চলেছে। কিন্তু সত্যিকারের জীবন—আঃ, সে জীবন এখানে!

দূরে এক কোণে বসে থাকত ফুলো মুখো লীসুখা। মেয়েটা ছিল ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল। নির্লজ্জ বেশ্যা। কাঁধের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করত। প্রগলভ চোখ দুটোর কোণ বেয়ে নীরবে নেমে আসত চোখের জল। কিছুটা ব্যবধানে একটা টেবিলের ওপরে নেতিয়ে পড়ে থাকত গির্জের গম্ভীর দর্শন গায়ক মিত্রোপোলস্কি। রোমশ দৈত্যের মত লোকটা, গভীর খাদে বাঁধা গলার স্বর। আধপোড়া বিহ্বল মুখের ওপরে ট্যাবট্যাবে দুটো চোখ। ওকে আলখাল্লাহীন পুরুতের মত দেখতে লাগত। সামনের টেবিলের ওপর রাখা মদের গেলাসটার দিকে তাকাল। গেলাসটা হাতে তুলে নিল। ঠোঁটের সামনে নিয়ে এল। তারপর একটুও

স্পর্শ না করে একান্ত সর্তকতার সঙ্গে নিঃশব্দে নামিয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিল। জানিনা, কেন মুখে দিতে পারল না।

সরাইখানার সমস্ত মানুষগুলোই নিথর নিশ্চল হয়ে বসে থাকত, যেন কান পেতে কোন এক দূর অতীতের বিস্মৃত, অন্তরের একান্ত প্রিয়, নিবিড় ঘনিষ্ঠ কিছু একটা কথা শুনছে।

গান শেষ হলে ক্লেশ্চভ বিনীতভাবে টুলের ওপরে বসে থাকত। সরাইখানার মালিক এক গ্লাস ভদ্‌কা ওর হাতে তুলে দিতে দিতে সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলত, 'সত্যি বলছি, চমৎকার হয়েছে! যদিও এটা গানের চাইতে অনেকটা কাহিনীর মত, তবু এতে দখল আছে তোমার! সত্যিই, কেউই এ কথা স্বীকার না করে পারবে না।'

তাড়াহুড়ো না করে ক্লেশ্চভ ভদ্‌কাটুকু খেয়ে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলত, 'যার গলা আছে সেই গাইতে পারে। কিন্তু একমাত্র আমিই পারি গানের মধ্যে প্রাণ জাগিয়ে তুলতে!'

'থাক, অত অহঙ্কারের প্রয়োজন নেই!'

'যার অহঙ্কার করার মত কিছুই নেই সে চুপ করে থাক।' শান্ত নম্র কণ্ঠেই উত্তর দিল ক্লেশ্চভ। কিন্তু ওর গলায় দৃঢ়তার সুর বেজে উঠল।

'নিজের সম্পর্কে তোমার ধারণাটা দেখছি একটু বেশি উন্নত, ক্লেশ্চভ!' কিছুটা রুষ্ট হয়েই বলে উঠল সরাইখানার মালিক।

'আমার আত্মার মতই উন্নত। এর চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারি না।'

কোণের আসন থেকে মিত্রোপোলস্কি গর্জে উঠল, 'ওরে কীট-পতঙ্গ সরীসৃপের দল! তোরা কতটুকু বুঝিস এই দেবদূতের গান। কি ক্ষমতা তোদের?'

প্রায় সময়েই অন্য সবার সঙ্গে ঝামেলা বাধাত। ঝগড়া-বিবাদ করত, আর লোকের দোষ ধরে বেড়াত। ফলে প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই গাইয়ে কিংবা অন্য লোকের হাতে মার খেয়ে ফিরত।

সরাইখানার মালিক ক্লেশ্চভের গান ভালবাসত, কিন্তু মানুষটাকে ঘৃণা করত। সবার কাছেই নালিশ করত ওর বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছুতো খুঁজে বেড়াত ওকে অপমান করার, কিংবা ওকে হাস্যকর করে তোলার। সরাইখানার সমস্ত লোকেরা, মায় ক্লেশ্চভ নিজেও একথা জানত।

'ও ভাল গাইয়ে, কিন্তু বড় বেশি অহঙ্কারী। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।' সরাইখানার মালিকের এই অভিমতের সঙ্গে ওর খদ্দেররাও অনেকে একমত ছিল, 'কথাটা বাস্তবিক সত্যি। লোকটা খুবই অহঙ্কারী।'

'কিন্তু অহঙ্কারের কী-ই বা আছে! ঈশ্বর গলাটা দিয়েছেন, ও তো আর নিজে তৈরি করেনি সেটা। তাছাড়া গলাও এমন একটা কিছু ভাল নয়।' বলত মালিক।

'সত্যি কথা। গলাটা তেমন কিছু নয়, তবে খেলাতে পারে, এই যা।' সবাই বলত।

একদিন গান শেষ হলে গাইয়ে সরাইখানা থেকে চলে যাওয়ার পর মালিক মীসুখাকে ধরে বসল, 'তুমি একবার ক্লেশ্চভকে একহাত দেখে নাও, মারিয়া ইয়েভদকিমভনা। ওকে একটু ভোঁতা করে দাও। তুমি অনায়াসেই তা পারবে।'

'আমার বয়স যদি আরো কম হত...' একটু হেসে মারিয়া বলল।

'আরে ছুকরিরা মোটেই কোন কাজের নয়।' লোকটা জেদ ধরল, 'তুমিই

একমাত্র পার। তোমার জন্যে ও ধুঁকে মরছে দেখলে আমার খুব আনন্দ হবে। ওর হৃদয়টা গুঁড়িয়ে দাও দেখি! দেখি কেমন গান গায় তখন? একটু লেগে পড় ইয়েদক্ত-কিমভনা। এরজন্য তুমি আমার ধন্যবাদ পাবে।'

কিন্তু সে প্রত্যাখান করল প্রস্তাবটা। মেদবহুল বিশাল দেহটা নিয়ে চোখের দৃষ্টি নামিয়ে বসে বসে শালের কোণে আঙুল জড়াতে জড়াতে নির্জীব একঘেয়ে সুরে বলে চলল, 'এসব কাজে দরকার ছুকরিদের। আমার বয়েসটা যদি আরো কম হত তাহলে অবশ্য আমি পরোয়া করতাম না....'

সরাইখানার মালিক ক্লেশ্চভকে মাতাল করে ফেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতি গান পিছু এক গ্লাস করে মদ খেয়েও দু'তিনটে গান গাইবার পরেই—প্রতি বারই হাতে বোনা মাফলারটা সযত্নে গলায় জড়িয়ে নিত। তারপর, উস্কোখুস্কো মাথার ওপরে টুপিটা পরে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত।

প্রায়ই মালিক ক্লেশ্চভের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে লোক খুঁজে আনত। এসব ক্ষেত্রে জিনওলা গান শেষ করার পরেই যখন প্রশংসার ঝড় থেমে যেত, তখন ভেতরের উত্তেজনা চেপে রেখে মালিক বলে উঠত, 'যাই হোক, আজ রাতে অন্য একজন গাইয়ে আছে। চলে এস বন্ধু, দয়া করে চলে এস!'

সময়ে সময়ে দেখা যেত নতুন গাইয়ের গলা খুবই সুন্দর। কিন্তু ক্লেশ্চভের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখেই অমন সহজ প্রাণময় সুরে গান শুনিনি।

'হুম্, বাস্তবিক খুবই ভাল গলা তোমার। কিন্তু গানের প্রাণ....' একটু অসন্তুষ্ট হয়ে স্বীকার করতেই হত মালিককে।

সবাই হেসে উঠত, 'জিনওলাকে হারাবার মত দেখছি কেউই নেই!'

লালচে রোমশ ভ্রূর তলা দিয়ে ক্লেশ্চভ সবাইকে দেখে নিয়ে সরাইখানার মালিককে লক্ষ্য করে বিনম্র ধৈর্যের সঙ্গে বলত, 'যতই খোঁজ না কেন, আমার মত গাইয়ে আর একটিও পাবে না। কারণ আমার ক্ষমতাটা হল ঈশ্বর প্রদত্ত....'

'ভগবানের কাছ থেকে তো এসেছি আমরা সকলেই।'

'কখনই পাবে না, এমন কি তোমার দোকানের সমস্ত মদের পরিবর্তেও না।'

মালিকের মুখের ওপর চকিতে একটা কালো ছায়া নেমে আসত। তারপর বিড়বিড়িয়ে বলত, 'আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে সেটা....'

ক্লেশ্চভ কিন্তু বলে চলল, 'গানটা তোমার ঐ মোরগের লড়াই নয়, বুঝলে?'

'তুমি কে, আমায় শেখাতে এসেছ?'

'শেখাচ্ছি না, শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি, গান অন্তরের বস্তু।'

'অনেক হয়েছে, থাম। তার চেয়ে বরং একটা গান চলুক।'

'গান গাইতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। এমন কি ঘুমের মধ্যেও।' রাজী হয়ে গেল ক্লেশ্চভ। তারপর একটু কেশে নিয়ে গান ধরল।

ক্ষণিকের মধ্যে যত ক্ষুদ্রতা, কথা আর ষড়যন্ত্রের আবর্জনা—সরাইখানার যা কিছু কদর্য নোংরা, সব আশ্চর্যভাবে ধোঁয়ার মত মিশে গেল। সবাই অনুভব করল যেন এক অন্য ধরণের জীবনের সতেজ নিঃশ্বাস এসে পড়ছে কোথা থেকে। সে জীবন বিশুদ্ধ, বিষাদময়; সে জীবন ভালবাসা আর ব্যথায় পরিপূর্ণ।

লোকটাকে ঈর্ষা হত আমার। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ওর প্রতিভাকে, মানুষের ওপরে ওর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে ঈর্ষা করতাম। কি আশ্চর্যভাবেই না

সে তার এই ক্ষমতাকে কাজে লাগাত। ঐ জিনওলার সঙ্গে পরিচিত হতে, ওর সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু দুটো অনুজ্জ্বল চোখের এমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে সে চারপাশে তাকাত যে মনে হত কাউকে দেখতেই পাচ্ছে না। তাই আর সাহস করে উঠতে পারলাম না। তাছাড়া ওর মধ্যে কী একটা অস্বস্তিকর বস্তু ছিল যাতে আমার হৃদয়াত্মা বিমুখ হয়ে উঠত ওর ওপরে, যদিও গানের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়েও আমি ওকে প্রশংসাই করতে চাইতাম। ওর টুপি পরার কায়দাটা ছিল কেমন যেন বিদঘুটে বুড়ো মানুষের মত। আর বেশ ঠাট করে গলায় একটা লাল স্কার্ফ জড়াতে জড়াতে বলত, 'আমার প্রেমিকা নিজের হাতে বুনে দিয়েছে আমাকে—একটি অল্প বয়স্ক তরুণী…।'

ও যখন গান গাইত না তখন বেশ ভারিক্কি চালে নিজেকে ফুলিয়ে রাখত। তুষারাহত নাকটা ঘসে নিয়ে যেন একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এক বা দুই অক্ষরে প্রশ্নের জবাব দিত। একদিন ওর পাশে বসেছিলাম। কি যেন একটা প্রশ্ন করেছিলাম ওকে। কিন্তু উত্তরে আমার দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করেই বলে উঠেছিল, 'দূর হ।'

ওর চাইতে অনেক বেশি ভাল লাগত আমার মিত্রোপোলস্কিকে। সরাইখানায় এসেই মাল বওয়া মানুষের মত ভারি পায়ে কোণের দিকে চলে যেত। পা দিয়ে ঠেলে একটা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ত তাতে। তারপর কনুইটা টেবিলের ওপরে ভর করে ভারী চুলে ভরা মাথাটা হাতের ওপরে রাখত। একটা কথাও না বলে নীরবে দু'তিন গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে ঠোঁট দিয়ে এমন জোরে আওয়াজ করত যে সবাই চমকে উঠে ফিরে তাকাত ওর দিকে। চিবুকটা হাতের ওপর রেখে হেলাভরা চোখে তাকিয়ে থাকত সে। উস্কোখুস্কো চুলগুলো বন্য লতার মত ফোলা ফোলা রক্তাভ মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

'তাকিয়ে আছিস কেন? কি দেখছিস?' হঠাৎ এক সময়ে চেঁচিয়ে উঠত সে।

'ভূত দেখছি!' কখনো কখনো লোকেরা ওর প্রশ্নের উত্তর দিত।

কোন কোন সন্ধ্যায় ও নীরবে বসে বসে মদ খেত। তারপর ভারি পা দুটো ঘষতে ঘষতে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখতাম ধর্মযাজকের মত সবাইকে ও গালমন্দ করছে, 'আমি প্রভুর নিষ্পাপ ভৃত্য। নিরপরাধী সেই অতীতের ইশাইয়ার মত তোদের আমি গালমন্দ করছি। ধিক্ এই আরিয়েল শহর, কামসিক্ত কদর্যতার মধ্যে এখানে যত চোর আর পাপীদের বাস। ধিক্ এই পাপ-ঠাসা পৃথিবীর জাহাজটাকে, যেটা ভেসে চলেছে বিশ্বের দরিয়ায়। সে অপরাধের অংশ হচ্ছিস তোরাও। ওরে মাতাল, পেটুক রাক্ষসের দল, পৃথিবীর জঞ্জাল! তোরা সংখ্যায় অগণিত, তবুও পৃথিবী ঘৃণায় তোদের ধ্বংসাবশেষ পায়ে ঠেলবে!'

ওর গম্ভীর গলার আওয়াজে জানলার কাঁচগুলো ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠত। এই জিনিষটা ওর শ্রোতাদের খুব পছন্দ হত। প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠত।

'ব্যাটা রোমশ বদমাশ কোথাকার! এটা বন্ধ করতে পারে না ও!'

ওর সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করা যেত। খাওয়াব জানালেই হল। অমনি ও এক বোতল ভদ্‌কা আর লাল মরিচ ছড়ান এক টুকরো গরুর মেটের জন্য হাঁক দিয়ে বসত। এগুলো ও পছন্দ করত, এতে উদর, কণ্ঠ দুটোই জ্বলে যেত বলে। কিন্তু কি বই আমার পড়া উচিত জিজ্ঞাসা করতেই ও ভীষণ রাগে ফেটে পড়ল আমার ওপর, 'পড়ে হবেটা কি?'

কিন্তু ওর প্রশ্ন আমাকে আঘাত দিয়েছে বুঝতে পেরে ও নম্র হয়ে এসেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আধ্যাত্মিক কিছু পড়েছিস ?'

'পড়েছি।'

'ধর্মগ্রন্থ পড়বি! ওতেই হবে। দুনিয়ার যা কিছু জানার সবই ওর মধ্যে আছে। শুধু তোদের ভোঁতা মাথায় সেগুলো ঢোকে না। কেউ-ই বোঝে না। কি করিস তুই, গান করিস ?'

'না।'

'না কেন ? তোর গান করা উচিত। নানারকম রোজগারের মধ্যে ওটাই হচ্ছে সবচাইতে আহাম্মকের পেশা।'

পাশের টেবিল থেকে কে বলে উঠল, 'তোমার বেলায় ? তুমি কি গাইয়ে নও ?'

'আমি ? আমি একটা ভবঘুরে। আর কিছু বলবে ?'

'কিছুই না।'

'স্বাভাবিক। সবাই জানে যে তোদের ঐ মাথাটার মধ্যে কিছুই নেই। কোন কালেও হবে না।'

ও সবার সঙ্গে এই সুরে কথা বলত। অবশ্যই আমার সঙ্গেও। কিন্তু দু'তিন বার আমি ওকে খাওয়াবার পরে ও একটু নরম হয়েছিল আমার ওপরে। এমন কি একদিন কিছুটা অবাক সুরে বলল, 'যখনই আমি তোর দিকে তাকাই, আমি বুঝতে চেষ্টা করি তুই কে, কি করিস, কেন করিস। কিন্তু তুই নরকে গেলেও কিছু যায় আসে না আমার!'

ক্লেশ্চভ সম্পর্কে ওর প্রকৃত মতামত যে কি তা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। খুব ফুর্তির সঙ্গেই ও গান শুনত। এমন কি মাঝে মাঝে পরিতোষের হাসিও হাসত; তবে কখনো ওর সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করত না। ওর সম্পর্কে কথা বলত অবজ্ঞার সুরে; কর্কশ অভদ্র ভাষায়, 'ও একটা ভাঁড়! কি করে শ্বাস নিতে হয় জানে, কী গায় সে সম্পর্কেও টনটনে জ্ঞান আছে। তবুও ও একটা গাধা!'

'কেন ?'

'কারণ ও গাধা হয়েই জন্মেছিল।'

সংযত অবস্থায় ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে হয়ত আনন্দ হত। কিন্তু সে সময় ও শুধু গাঁক্ গাঁক করে করুণ ফ্যাকাশে চোখে এদিক ওদিক তাকাত। একজনের কাছে শুনেছিলাম, এই যে লোকটা সারাদিন মদে ডুবে থাকে, এককালে ও ছিল কাজান একাদেমীর ছাত্র। হয়ত ধর্মযাজকও হয়ে যেতে পারত। প্রথম প্রথম গল্পটা আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু একদিন কথায় কথায় ওর সামনে বিশপ ক্রিসান্‌ফের নাম করেছিলাম।

'ক্রিসান্‌ফ ?' মিত্রোপোলস্কি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'তাকে আমি চিনতাম। আমার শিক্ষাগুরু, যথেষ্ট উপকারও করেছিলেন আমার। সেটা কাজান একাদেমীতে—মনে আছে এখনো। ক্রিসান্‌ফ অর্থ 'সোনার ফুল'; খাঁটি কথা বলেছিলেন পামভা বেরীন্দা। বাস্তবিকই উনি ছিলেন সোনার, ক্রিসান্‌ফ।'

'পামভা বেরীন্দা কে ?' প্রশ্ন করলাম। কিন্তু মিত্রোপোলস্কি কর্কশ গলায় জবাব দিল, 'কি দরকার তোর তা দিয়ে ?'

বাড়ি ফিরে আমার নোটবইয়ে টুকে রাখলাম: অবশ্যই পড়তে হবে 'পামভা

বেরীন্দা'। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল যে সব প্রশ্ন আমার অন্তর কুরে খাচ্ছে তার উত্তর পাব তা বেরীন্দার কাছে পাব।

গির্জের এই গায়ক যত সব বিকৃত নাম বলতে পছন্দ করত, আর অদ্ভুতভাবে কথা মিশিয়ে বলতে ভালবাসত। 'আনিসিয়া নয় জীবনটা।' ও বলল একদিন।

'আনিসিয়া কে?'

'আনিসিয়া হচ্ছে এনোডাইন।' আমার বিড়ম্বনা দেখে মজা পেয়ে বলল।

এই ধরণের ভাষা ব্যবহার, আর ও যে একাদেমীতে পড়েছিল, এটা জানা থাকায় মনে করেছিলাম অনেক জ্ঞান লোকটার। কিন্তু ও যে অনিচ্ছুক জটিলতার সঙ্গে কথা বলে বিরক্তি লাগাত, তাতে ভাবতাম আমি হয়ত জানি না কি ভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়। তথাপি আমার অন্তরেও ছাপ ফেলে গেছে। সাধু ঈশাইয়ার মত ওর সেই নেশাগ্রস্ত ধিক্কার বাণীর সাহস ভাল লাগত আমার।

'ওরে দুনিয়ার আবর্জনার দল!' ক্ষেপে উঠত সে, 'আজ অসৎরা পুজো পাচ্ছে আর সাধুরা হচ্ছে পদদলিত। কিন্তু বিচারের দিন দ্রুত ঘনায়মান, আর তখন— কিছুতেই কিছু হবে না, কিছুতেই না!'

এই হতাশাপূর্ণ চীৎকারে আমার মনে পড়ত 'বাঃ বেশ' আর নাতালিয়া ধোপানীর কথা। কী দারুণ দুঃখজনক অধঃপতন। আর রাণী মার্গো—তার গলায় কত বিশ্রী নিন্দার মালা! এরমধ্যে কত স্মৃতিই না আমার মনে জমে উঠেছে।

এই মানুষটার সঙ্গে আমার অল্প কালের পরিচয় অদ্ভুতভাবে সমাপ্ত হল একদিন। বসন্তকালে একদিন সৈনিকদের তাঁবুর কাছে মাঠের মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা। হাঁটছিল একা একা। দারুণ ফুলো ফুলো মুখ চোখ। উটের মত মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে চলছে। 'হাওয়া খাচ্ছিস?' কর্কশ গলায় বলল, 'আয়, এক সাথে হাওয়া খাই। আমিও বেড়াতে বেরিয়েছি। ব্যামো হয়েছে ভায়া, সত্যিব্যামো হয়েছে।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। আচমকা দেখি একটা লোক গর্তের মধ্যে পড়ে আছে। গর্তের দেয়ালে ভর রেখে লেপটে বসে। একটা কানের কাছে কোটটা উঠে আছে। সেটা খোলবার চেষ্টা করেছিল যেন।

'মাতাল!' মন্তব্য করে ও দেখবার জন্য দাঁড়াল। কিন্তু সামান্য তফাতেই কচি ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে বড় একটা রিভলবার, পুরুষের মাথার একটা টুপি আর আধখাওয়া একটা ভদ্কার বোতল গলা অব্দি ঘাসের মধ্যে ঢাকা।

মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর পা দুটো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিত্রোপোলাস্কি বলে উঠল, 'গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।'

ওকে দেখা মাত্র আমার মনে হচ্ছিল যে লোকটা মাতাল নয়, মরে গেছে। কিন্তু এটা এতই অপ্রত্যাশিত যে সে ভাবনাটা আমি জোর করেই সরিয়ে রাখছিলাম। মনে আছে যখন ঐ বড় চক্‌চকে খুলিটা আর কোটের কলারের ওপরে বেরিয়ে থাকা নীল কানটার দিকে তাকালাম, তখন ভয় কিংবা দুঃখ কিছুই অনুভব করলাম না। এমন সুন্দর বসন্তের দিনে কেউ যে আত্মহত্যা করতে পারে এটা বিশ্বাস করাই দুষ্কর।

মিত্রোপোলাস্কি তার হাত দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গালটা এমনিভাবে ঘষতে লাগল যেন সে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তারপর বলল, 'বুড়ো বুড়ো চেহারা। বৌ হয়তো পালিয়ে গেছে, কিংবা টাকাকড়ির কষ্টে পড়েছিল।'

পুলিশে খবর দেবার জন্য ও আমাকে শহরে পাঠাল। আর নিজে গর্তের

পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। সুতো বেরোন কোটটা দিয়ে আঁট করে কাঁধ দুটো জড়িয়ে নিল। ঐ আত্মহত্যার খবরটা পুলিশকে দিয়েই আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম। কিন্তু এর মধ্যেই গাইয়ে মৃত লোকটার ভদ্কার বোতলে যা বাকি ছিল নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমাকে দেখেই শূন্য বোতলটা নাড়তে শুরু করল, 'এই যে, এই হচ্ছে ওর কুকর্মের কারণ।' চেঁচিয়ে ও বোতলটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। সেটা ভেঙে খান্খান্ হল।

একটা পুলিশ আমার পেছনে পেছনে ছুটে এল। গর্তটার মধ্যে তাকিয়ে টুপি খুলল। তারপর ক্রুশ করে গাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?'

'তা জেনে, তোমার কি লাভ?'

একটু ভেবে পুলিশটা আরো ভদ্রভাবে বলল, 'এ কেমন ব্যাপার! একজন মরে পড়ে আছে এখানে আর আপনি মদ খাচ্ছেন!'

'গত বিশ বছর যাবৎ আমি মদ খাচ্ছি!' বুক চাপড়ে সগর্বে বলে উঠল গায়ক!

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ভদ্কাটা খেয়ে ফেলার জন্য পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করবে। শহর থেকে আরো অনেক লোক ছুটে এল। এরমধ্যে একজন কড়া পুলিশ অফিসার এল। সে গর্তের মধ্যে নেমে কোটটা তুলে ধরল ওর মুখটা দেখার জন্য।

'প্রথম একে কে দেখেছে?'

'আমি।' বলল মিত্রোপোলস্কি।

পুলিশ অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চকিতে একবার ওকে দেখে নিয়ে ভীতিপ্রদ কণ্ঠে টেনে টেনে বলল, 'আহ্, তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম!'

প্রায় দু'ডজন দর্শক এসে ভিড় করেছিল। উত্তেজনায় তারা হাঁপাচ্ছিল আর গর্তের চারপাশে জড়ো হয়ে তাকাচ্ছিল ভেতরের দিকে। কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ও একটা কেরাণী। আমাদের রাস্তায় থাকে, আমি ওকে চিনি!'

পুলিশ অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গাইয়ে দুলল, বোকার মত তর্ক করল, চেঁচাল হেঁড়ে গলায়। অফিসার ওর বুকে একটা ধাক্কা মারতেই ও কাত হয়ে টলে গিয়ে বসে পড়ল। আগের পুলিশটা ধীরে সুস্থে একগাছা দড়ি দিয়ে গায়কের হাতদুটো বেঁধে ফেলল। গায়ক একান্ত বাধ্যের মত পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর ভিড় লক্ষ্য করে অফিসার ধমকে উঠল, 'এখান থেকে ভাগ হতচ্ছাড়ারা!'

আরেকজন পুলিশ, ভিজে লাল চোখে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ছুটে এল। তারপর গায়কের হাতে বাঁধা দড়িটার শেষ প্রান্তটা ধরে নিয়ে চলল শহরের দিকে।

দারুণ দুঃখে আমিও মাঠ ছেড়ে চলে এলাম। আমার স্মৃতিতে, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই কথাটা 'আরিয়েল শহরের বুকে দুঃখের রাত নেমে আসুক!'

ধীরে সুস্থে পুলিশটা যেভাবে পকেট থেকে দড়িটা বের করল, আর সেই ভয়ঙ্কর চেহারার সাধু বাধ্যভাবে তার রোমশ লাল হাত দুটো যেভাবে পেছনে বাড়িয়ে দিল তাতে মনে হল যেন এইভাবে হাজার বছর ধরে সে এই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে এসেছে। আমার মন থেকে কিছুতেই এই ছবিটা সরছিল না।

পরে আমি শুনেছিলাম তাকে নির্বাসিত করা হয়েছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই ক্লেশ্চভও চলে গেল। খুব লাভজনক একটা বিয়ে করে সে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল।

কিন্তু ও চলে যাবার আগে আমার মনিব—যার কাছে আমি ওর গানের প্রশংসা করতাম—একদিন বলল, 'সরাইখানায় ওর গান শুনতে যাব।'

একদিন তাই করল মনিব। আমার মুখোমুখি একটা টেবিলে বসল। তার চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল। বিস্ময়ে ভ্রূদুটো উঠল কপালে।

সরাইখানার সমস্ত পথটা সে আমাকে খেপাতে খেপাতে এসেছে। এমন কি যখন আমরা এসে ঢুকলাম তখনও সে আমাকে নিয়ে, অন্যান্য খদ্দেরদের নিয়ে, উগ্র দম আটকান দুর্গন্ধের কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। জিনওলা যখন গাইতে শুরু করল তখন মুখে অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটিয়ে এক গ্লাস বিয়ার ঢালতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তারপর মাঝ পথেই থেমে বলে উঠেছিল, 'হুঁম্, করে কি শয়তানটা!'

কাঁপা কাঁপা শুরু করেছিল সে।

'ঠিকই বলছে ভায়া,' ক্লেশ্চভের গান শেষ হতেই সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'কেমন করে গাইতে হয় ও জানে, লোকটা আমার ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছে হে।'

জিনওলা আবার গান ধরল। পেছন দিকে হেলান তার মাথাটা, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সিলিংয়ের গায়ে।

'হাঁ লোকটা গাইতে পারে বটে,' একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল মনিব।

ক্লেশ্চভ গেয়ে চলেছে বাঁশীর মত কাঁপা কাঁপা সুরে।

অপূর্ব লাল চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করতে করতে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল মনিব, 'জাহান্নামে যাক সব। লোকটা অপূর্ব।'

তাকিয়ে তাকিয়ে মনিবকে দেখতে লাগলাম আমি। আনন্দে অন্তর ভরে উঠল আমার। গানের বেদনাবিধুর কথাগুলো সরাইখানার হট্টগোল ছাপিয়ে ক্রমেই আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল।

মনিব লজ্জা ভুলে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। মাথা নামিয়ে বসে রইল। জোরে জোরে ফোঁপাল আর হাঁটুর ওপরে চোখের জল ঝরে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা।

তৃতীয় গানের শেষে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠল, 'আমি এখানে আর বসে থাকতে পারছি না। হাওয়া নেই ; যা বিশ্রী গন্ধ, চল বাড়ি যাই!'

কিন্তু পথে নামতে ওর মত পাল্‌টে গেল, 'জাহান্নামে যাক সব, পেশকভ! চল, হোটেলটায় গিয়ে কিছু খাই! বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না আমার!'

দাম দর নিয়ে কোন কলহ না করেই একটা স্লেজে উঠে বসল ও। হোটেলে না পৌঁছনো পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। হোটেলে ঢুকেই কোণার দিকের একটা টেবিলে বসে ঘন ঘন চারপাশে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল, যেন কী এক গভীর আঘাতে চঞ্চল হয়ে পড়েছে সে। 'বুড়ো ছাগলটা একেবারে বসিয়ে দিয়েছে আমাকে, মনটা এত খারাপ করে দিল। শোন, তুমি অনেক পড়, অনেক কিছু নিয়ে ভাব এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করবে কেমন করে বল তো? ধর, আমি বছরের পর বছর জীবন কাটিয়ে চলেছি। চল্লিশটা বছর ফেলে এসেছি পেছনে। বৌ আর ছেলেপুলে আছে। কিন্তু এমন কেউই নেই পৃথিবীতে যার সঙ্গে দু'টো কথা বলতে পারি! এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন আমার ইচ্ছে হয় কারো কাছে অন্তর উজাড় করে দি, সব বলি, যা কিছু বলার আছে। কিন্তু বলার মত কেউ নেই। যদি বল, বৌয়ের কাছে বলতে, সেটা মাথায় ঢুকবে না তার। তার কি এতে? তার নিজের ছেলেপুলে ঘরদোর আর নিজের ভাবনা নিয়ে আছে সে! সে আমার আত্মার বাইরে। তোমার বৌ ততক্ষণই তোমার বন্ধু যতক্ষণ প্রথম সন্তান না এল—এইতো ব্যাপার। তাছাড়া, এক কথায় আমার স্ত্রী আছে, নিজের

চোখেই তা দেখেছ, এতটুকু আনন্দ নেই তার সঙ্গে···এক তাল মাংসপিণ্ড মাত্র। জাহান্নামে যাক। আঃ ভাই হৃদয়ের যে কী যন্ত্রণা।'

বারে বারে ঠাণ্ডা তেঁতো বিয়ার গিলে নিঃশব্দে চুপ হয়ে বসে থেকে মাথার বড় চুলগুলো আঙুলে টেনে টেনে এলোমেলো করতে লাগল। তারপর আবার বলতে শুরু করল,'বুঝলে ভাই, সোজা কথায় বলতে গেলে মানুষ হচ্ছে একটা নিকৃষ্ট জাত। আমি দেখেছি, তুমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঐ চাষীগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে ভালবাস। কিন্তু খুব ভাল করেই জানি আমি, অবস্থা, কী কদর্য, কত নীচ ওরা। সত্যি কথাটা হচ্ছে, ওরা সবাই চোর। ভাব ওরা তোমার কথা শোনে? এতটুকুও না। পিওতর, তাতার, অসিপের কথাই ভেবে দেখ না—ওরা হচ্ছে আরো নীচ। তুমি যা কিছু বলনা কেন, ও সব বলে দেয় আমার কাছে, কি বলবে ওদের ?'

উত্তর দেব কি, একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি।

'তা হলেই দেখ!' মৃদু হেসে মনিব বলল, 'তোমার পারস্যে যাওয়ার ইচ্ছেটা ছিল ভালই। অন্তত অন্যে কি বলে বুঝতে পারতে না, সেটা হত বিদেশী ভাষা!'

'আমি যেসব কথা বলি অসিপ তা বলে দেয় ?' প্রশ্ন করলাম।

'নিশ্চয়ই। আশ্চর্য হচ্ছ ?' সবার চাইতে ওই বেশি বলে, ওটা একটা আস্ত বাচাল। লোকটা দারুণ চালবাজ, বুঝলে ভাই। না, ভাই পেশকভ, কথা দিয়ে লোকের ভেতরটা ভেজান যায় না। সত্য ? কে সত্য শুনতে চায় ? ওটা শরতের বরফের মত—কাদায় পড়ে জল হয়ে যায়। ফলে আরো বেশি কাদা সৃষ্টিকরা ছাড়া আর তার কিছু থাকে না। তারচেয়ে মুখ বন্ধ করে পড়ে থাক, সেই ভাল।'

একের পর এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে চলল ও। কিন্তু বেঁহুশ না হয়ে গিয়ে ক্রমেই আরো কটু সুরে দ্রুত বলতে শুরু করল, 'কথাই আছে, গাম্ভীর্য হচ্ছে সোনা, আর কথা হল গিয়ে মরচে। কি বল ভাই, জীবনটা বড়ই একা। যে কথাটা ও গাইল সেটা সত্যি, 'এমন বধু নেইকো গাঁয়ে যে আমার পানে চায়'।

চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলতে লাগল, 'কয়েকদিন আগে একজনকে পেয়েছিলাম···যে আমার মরমী, স্থানীয় একজন মেয়েমানুষ, বিধবা,—অর্থাৎ কিনা টাকা জাল করার অভিযোগে তার স্বামীকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। এখনো সে সেখানকার জেলে। যাই হোক, সেই মেয়েমানুষটির সঙ্গে পরিচয় হল আমার। একটা কোপেকও তার হাতে ছিল না—সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নিল—মানে···এক ঘটক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল···চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকালাম—কী মিষ্টিই না ছিল মেয়েটি! বাস্তবিক সুন্দরী—ভারি অল্প বয়েস, এত সুন্দর! ওর কাছে আমি যাতায়াত করতে লাগলাম। একবার, দুবার—তারপর আমি তাকে বললাম, 'এটা কেমন ব্যাপার, আমি বলি, তোমার স্বামী জেলে,তুমি সহজ সোজা পথ ধরছ না কেন ? তুমি কেন তার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যাচ্ছ ?' কিন্তু সে আমাকে বলল, 'ও যা কিছুই হোক না কেন আমার কাছে ও চিরদিন ভালই থাকবে। কারণ আমি ওকে ভালবাসি। হয়ত আমার জন্যেই ও বাধ্য হয়েছে খারাপ কাজ করতে। আর ওরই জন্য আমি তোমার সঙ্গে এ সব করছি। ওর টাকার দরকার।' সে বলল, 'ও ভদ্রলোক, আর চিরকাল ভালভাবে বাস করে এসেছে। আমি যদি একা হতাম তবে আমিও সৎভাবেই বাস করতাম। তুমিও মানুষ ভাল। তোমাকে ভাল লাগে আমার।' 'কিন্তু এ সম্পর্কিত কেন

কথা আর কখনো মুখে এনো না আমার সামনে...' জাহান্নামে যাক সব! ...আমার সঙ্গে যা কিছু ছিল সব দিয়ে এলাম ওকে—প্রায় আশি রুবলের কিছু বেশি। তারপর আমি তাকে বললাম, 'আমাকে মাফ কর, তোমার কাছে আমি আর কখনো আসতে পারব না। কিছুতেই আসতে পারব না!' ঐ ভাবেই চলে এলাম...'

এর মধ্যেই ও মাতাল হয়ে পড়েছে, যেন ঢলে পড়বে এক্ষুনি। একটু থেমে বিড়বিড় করে বলল, 'ছ'বার আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। তুমি ধারণা করতে পারবে না সে কি জিনিস! পরেও আরো ছ'বার গিয়েছিলাম তার ঘরের দোরে কিন্তু ভেতরে যাবার সাহস হয়নি...এখন সে চলে গেছে...'

টেবিলে হাত রেখে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারতে আরম্ভ করল সে. 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আর কখনো যেন তার সঙ্গে দেখা না হয়।' ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভগবান না করুন! তবে সে দিনই সব শেষ হয়ে যাবে। চল বাড়ি যাই!'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। ও বিড়বিড় করে বলছে, 'বুঝলে তো ভাই এখন...'

ও যা বলল তাতে আমি অবাক হইনি। কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে ওর জীবনে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে থাকবে। কিন্তু জীবন সম্পর্কে ওর মতামত আর বিশেষ করে অসিপ সম্পর্কে যা বলল তাতে আমার মনটা ভীষণভাবে দমে গেল।

কুড়ি

তিনটে গ্রীষ্ম ঋতু ধরে এই মৃত নগরীর শূন্য বাড়িগুলোর ভেতরে 'ওভারসিয়ারের কাজ করে চললাম। দেখতে পেতাম শ্রমিকেরা পাথুরে দোকান ঘরগুলো ভাঙছে, আবার প্রত্যেক বসন্তে গড়ে তুলছে।'

মাইনে হিসেবে পাওয়া পাঁচটা রুবলের প্রতিটার মূল্য যাতে আমি কাজ করে পরিশোধ করি সেদিকে মনিবের লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ণ। যদি কোন দোকানঘরের মেঝে নতুন করে গড়তে হত তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ মেঝেটার প্রায় দু'ফিট মাটি খুঁড়ে তুলে দিতে হত। এ কাজে যে কোন সাধারণ শ্রমিকের মজুরী ছিল এক রুবল। কিন্তু আমাকে এর জন্য কিছুই দেয়া হত না। তবে এ কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ছুতোরদের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারতাম না। সে সুযোগে ওরা বল্টু খুলে তালা কিংবা দরজার হাতল সরিয়ে নিত। কি শ্রমিকেরা কি ঠিকাদারেরা সব রকমেই ওরা আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করত। চুরি করত প্রায় চোখের ওপরেই। যেন ভীষণ কোন প্রয়োজনের তাড়নাতেই চুরি করছে। যখন ধরে ফেলতাম, ওরা রাগত না। আশ্চর্য হয়ে বলত, 'পাঁচ রুবলের জন্য তুমি এমন খাটছ যেন ওটা বিশ রুবল! দেখলে হাসি পায়!'

মনিবকে জানালাম আমাকে দিয়ে একটা রুবল বাঁচাতে গিয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হচ্ছে তার। চোখ পাকিয়ে সে জবাব দিল, 'আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কোর না!'

বুঝতে পারলাম চোরেদের সঙ্গে আমার যোগ-সাজশ আছে বলে ও সন্দেহ করছে। কিন্তু আমি এতে বিচলিত হলাম না, বরং ঘৃণা বোধ করলাম ওর প্রতি। ব্যবস্থাটাই এইরকম! সকলেই চুরি করছে। এমন কি অপরের জিনিস আত্মসাৎ করতেও আমার মনিবের দ্বিধা ছিল না কোন।

মেলা ভাঙবার পর কোথায় কি সারাতে হবে না হবে তা দেখার জন্য ঘুরে

ঘুরে ও দোকান ঘরগুলো দেখত। মাঝে মধ্যেই ভুলে ফেলে যাওয়া সামোভার, থালা, কম্বল, কাঁচি, এমন কি মালপত্রে ভরা বাক্স-পেঁটরা পর্যন্ত পেত। হালকা হেসে বলত, 'একটা তালিকা করে এগুলো গুদাম ঘরে রেখে দাও।'

গুদামঘর থেকে কিছু কিছু মালপত্র নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে বলত ওইগুলোর নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকা করতে।

জিনিষপত্রের ওপরে লোভ ছিল না আমার! সে কারণে কোন জিনিস দখল করবার ইচ্ছে জাগত না। এমন কি বইও বোঝা মনে হত। আমার নিজস্ব সম্পত্তি বলতে ছিল বেরাঞ্জের একটা ছোট বই. আর হাইনের কবিতা। পুশকিনের বই কেনবার সাধ ছিল, কিন্তু শহরের মধ্যেকার একমাত্র পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক—খিট্‌খিটে বুড়ো আমার কাছে প্রচুর দাম হাঁকল।

আসবাবপত্র, কম্বল, আয়না, ইত্যাদি যে সব মালপত্র দিয়ে মনিবের ঘর ভরা সে সব আমার ভাল লাগত না। ওগুলোর কুৎসিত চেহারা, বার্নিশ ইত্যাদির গন্ধে বিরক্তি লাগত। দেখে মনে হত ওটা যেন, নানান রকমের আবর্জনায় ভরা একটা বাক্স। আরো খারাপ লাগত যখন দেখতাম অপরের মাল গাড়ি বোঝাই করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনে হত আমার জীবনটাই সংগতিহীন, সামঞ্জস্যহীন—ভারাক্রান্ত অর্থহীন বাহুল্যের বোঝায়। এই যে আমরা দোকানঘর সারাচ্ছি, এর সবই ডুবে যাবে বসন্তকালের প্লাবনে। মেঝেগুলো ফেঁপে উঠবে. বেঁকে যাবে দরজাগুলো। জল পড়বে। কড়ি বর্গাগুলো পচে যাবে। বহু বছর ধরে বছরের পর বছর মেলার মাঠ এমনি করে প্লাবনে ডুবে যাচ্ছে, বাড়ি, বাঁধান উঠোন, সমস্তই যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। বার্ষিক প্লাবনে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আর সবাই জানে যে এটা নিজের থেকে বন্ধ হবে না।

বসন্তকালে প্রতি বছর যখন বরফ ভাঙ্গত সে সময় কয়েক ডজন বজরা, ডিঙ্গি নৌকো বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে যেত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মানুষ আবার নতুন নৌকো বানাত, শুধু পরের বছরের বরফ ভাঙ্গার সময়ে সেগুলো আবার ভেসে যাবে বলে। এমন এক দুরন্ত চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া মানুষ সহ্য করে কি করে!

এ ব্যাপারে অসিপকে জিজ্ঞেস করলাম যখন, মনে হল ও যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে। তারপর ঠাট্টা করে বলল, 'ঐ কাকটাকে দেখ, কেমন করে ডাকছে। কি আসে যায় তাতে? তুই ওর কি ধার ধারিস। খুব ভেবে ভেবে এসব আবিষ্কার করিস তুই! হয়ত কিছুই আসবে যাবে না তোর এসবে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এগুলোই ভাল করে কাজে লাগবে তোর। বুঝতে চাসও—দ্যাখ না…'

ওর বলার মধ্যে অনুশোচনা, অভিযোগ নেই। যেন জীবনের বিরুদ্ধে তার যে অনেক অভিযোগ জানা আছে এতেই সে খুশি। যখন বুঝতে পারলাম আমার চিন্তার ধারা ওর কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তখন শুনতে বেশ কষ্ট লাগল আমার।

'আর একটা জিনিস—আগুন…'

জানি এমন কোন গ্রীষ্মকাল পার হয় না যেবার ভলগার ওপারের বনে আগুন না লাগে। জুলাই মাসে প্রতিবার জাফরানী রঙের মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। আর তার ফাঁক দিয়ে কিরণহীন সূর্য ঘেয়ো চোখের মত মাটির বুকে তাকিয়ে থাকে।

অসিপ বলল, 'বনের আগুনও কিছু নয়। বন হল জমিদার আর জারের সম্পত্তি। চাষীদের কোন মালিকানা নেই। এত বড় একটা শহর পুড়ে গেলেও

তেমন অনিষ্ট হয় না তাতে, বড় বড় ধনী লোকেরা বাস করে বড় বড় শহরে। তাই ওদের জন্য দুঃখ করার মানে হয় না। কিন্তু দেখ, ছোট শহর আর গ্রাম—এক একটা গ্রীষ্মে কতগুলো গ্রাম পুড়ে ছাই হয়? কমের পক্ষে শ' খানেক। আসল লোকসানতো এটাই।

অসিপ নিঃশব্দে হাসল একটু, 'আমাদের ব্যথা থাকলেও মাথা নেই। তুই আমি কি দেখছি? না মানুষের পরিশ্রমের ফল তার নিজের বা তার জমির উপকারে ব্যয় হচ্ছে না। ব্যয় হচ্ছে জলে আর আগুনে!'

'হাসছিস্ কেন?'

'হাসবই না বা কেন? চোখের জল দিয়ে তো আগুন নেভান যায় না, তাতে বরং বান বেড়েই যাবে।'

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে আমি যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে এই শান্ত বুড়ো মানুষটিই হচ্ছে সব থেকে বেশি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। কিন্তু ওর পছন্দ-অপছন্দের খেই আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এসব কথা মনে মনে ভাবছিলাম, আর ও একাধারে আমার চিন্তার আগুনে ভাবনার ইন্ধন দিচ্ছিল, 'দেখ, মানুষ কেমন করে তার শক্তি নষ্ট করে চলেছে; সাথে অন্যের শক্তিও! ধর, তোর মনিব তোকে কেমন করে নিংড়ে নিঃশেষ করে নিচ্ছে। ধর, কি ক্ষতিটাই না হচ্ছে ভদ্কায়। এর হিসেব নিকেশ নেই কোন। একটা কুঁড়েঘর পুড়ে গেলে আর একটা বানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু একটা ভাল মানুষ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আর শোধরাবার উপায় নেই। যেমন ধর, আর্দালিয়ন কি গ্রিগোরি। ভাব দেখি, ঐ চাষীটা কী ভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওই গ্রিগোরিটা খুব যে বুদ্ধিমান ছিল তা নয়, কিন্তু ওর প্রাণটা ছিল উদার। এমন ভাবে জ্বলে উঠল যেন খড়ের গাদা একটা। পচা দেহে যেমন পোকা ধরে তেমনি মেয়ে-মানুষগুলো ওকে ছেঁকে ধরেছে।'

'তোমাকে আমি যে সমস্ত কথা বলি তুমি সেগুলো আমার মনিবকে জানিয়ে দাও কেন?' কেবলমাত্র কৌতূহলের বশেই প্রশ্নটা করি ওকে।

সে তেমনি সাবলীল আর ভদ্রভাবেই জবাব দিল, 'তোর মতিগতি কী দারুণ ক্ষতিকর এটা জানাবার জন্য তাকে বলি। তার উচিত তোকে শিক্ষা দেয়া। মনিব ছাড়া তোকে আর কে শেখাবে বল? তোকে শত্রুতা করে যে বলি তা নয়। দুঃখ হয় বলেই বলি। তুই নির্বোধ নয়' কিন্তু তোর মাথার মধ্যে এক দৈত্য আছে। সে তোর সমস্ত কিছু গোলমাল করে দেয়। তুই কিছু যদি চুরি করিস তবে তাতে আমি মুখ বন্ধ করে থাকব; যদি ছুঁড়িদের পেছনে ঘুরিস তা হলেও কিছু বলব না' মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়, আমি একটা কথাও মুখে আনব না। কিন্তু তোর ঐ সব বিশ্রী চিন্তা—তার কথা আমি বলবই বলব, এটা তুই মনে রাখিস।'

'আমি আর তোমার কাছে কোন কথা বলব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অসিপ। জমাট একটুকরো আলকাতরা তুলে নিল হাতে। তারপর স্নেহ ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাজে কথা! নিশ্চয়ই বলবি। নইলে কার কাছে বলবি? বলবার মত একটা মানুষও এখানে নেই।'

পরিষ্কার ঝক্ঝকে পোশাক সত্ত্বেও এই মুহূর্তে অসিপ যেন আগওলা ইয়াকভ হয়ে উঠল—তেমনি সকলের সম্পর্কে, সমস্ত কিছু সম্পর্কে নিস্পৃহ, উদাসীন।

ওকে দেখে কোন কোন সময়ে মনে পড়ত সনাতন-পন্থী গোঁড়া পিণ্ডতর ভাসিলিয়েভের কথা ; কখনো বা গাড়োয়ান পিওতরের কথা। এক এক সময়ে মনে হত ওর অনেক কিছুই যেন দাদুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমার জানা চেনা সকল বুড়োদের সঙ্গেই একদিক থেকে না একদিক থেকে ওর মিল ছিল। এই সবকটা বুড়োই ছিল অদ্ভুত রকমের আকর্ষণীয়। কিন্তু উপলব্ধি করতাম ওদের সঙ্গে বাস করা কঠিন, বিরক্তিকর। মনে হত, ওরা যেন ওদের উপদেশে মানুষের অন্তর বিদীর্ণ করে খাবে। অসিপ কি ভাল লোক ? না। খারাপ লোক ? তাও না। স্পষ্টই বুঝতাম ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ওর মনের বিভিন্ন ধারায় যেমন একদিকে বিস্ময়ে মুগ্ধ হতাম অন্যদিকে তেমনি উপলব্ধি করতাম ওর চিন্তাধারায় ভয়ঙ্কর একটা প্রতিক্রিয়া আমার ওপরে এসে পড়ছে। সর্বদিক থেকে যা আমার নিজস্ব চিন্তাধারার অন্তরায়।

আমার মধ্যে গুমড়িয়ে উঠতে লাগল যত হিংস্র চিন্তা, 'যতই যে হাসুক আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলুক সকলেই সকলের—শত্রু ; সকলেই বিজাতীয়। ভালবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে তাদের কেউই জীবনের সঙ্গে বোধ হয় বাঁধা পড়েনি। একমাত্র দিদিমাই ভালবাসেন জীবনকে, মানুষকে। আর সেই অপূর্ব মহিলা রাণী মার্গো।

মাঝে মাঝে এই জাতীয় চিন্তা কালো মেঘের মত ভিড় করে জীবনের শ্বাস বন্ধ করে বিষাদময় করে তুলত। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কি ধরণের জীবন আছে ? কেমন করে মুক্তি পাব ! অসিপ বাদে আর কেউ নেই যার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি। তাই ওর কাছেই আরো ঘন ঘন আসতে আরম্ভ করলাম।

আমার আবেগপূর্ণ কথাগুলো ও শুনত পরম আগ্রহ নিয়ে। প্রশ্ন করত বোঝার চেষ্টা করত ব্যাপারটা, তারপর শান্ত ধীর কণ্ঠে বলত, 'কাঠ্‌ঠোকরা একটা জেদী পাখি, কিন্তু ভয়াবহ নয়। ওকে কেউ ভয় পায় না। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি তোকে, তুই একটা মঠে গিয়ে থাক—যতদিন পর্যন্ত না তোর উপযুক্ত বয়েস হয়। বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দিবি। ভাল ভাল কথা বলে তোর মনে শান্তি আসবে। আমি তোকে বলছি তুই তাই কর, তুই এ সংসারে খাপ খাইয়ে চলতে পারবি না।'

মঠে যাবার আমার আদৌ কোন সাধ ছিল না. কিন্তু মনে হত কি এক রহস্যময়তার গোলক ধাঁধাঁয় হারিয়ে গেছি আমি। সেখান থেকে নিষ্কৃতি চাইছিলাম। জীবনটা যেন শরতের বনভূমির মত হয়ে উঠেছে। কর্মহীন এক শূন্যতার মধ্যে পড়ে আছি। যার প্রতিটা কোনা-খামচি আমার কাছে একান্ত ভাবে চেনা।

আমি ভদ্‌কা খেতাম না, মেয়েদের সঙ্গে প্রেমও করতাম না। প্রাণ মাতাল করার এ দুটো জিনিষের স্থান অধিকার করেছিল আমার বই। কিন্তু যতই পড়তাম ততই অধিকাংশ লোক যে ভাবে জীবন কাটায় তেমনি শূন্য, ফাঁকা, অর্থহীনভাবে জীবন কাটান দুষ্কর হয়ে উঠল আমার কাছে।

সবেমাত্র পনেরো পেরিয়েছি। কিন্তু মাঝে মধ্যে এক সময়ে মনে হত যেন বুড়ো হয়ে গেছি। যে সমস্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমি এসেছি, যা কিছু পড়েছি আর এলোমেলোভাবে যা কিছু ভেবেছি, সমস্ত কিছু মিলে আমার অন্তর যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ফুলে উঠত। যেন একটা অন্ধকার গুদাম ঘরের মত আমার স্মৃতির ভাণ্ডার এত অসংখ্য জিনিসপত্রে ঠাসা যে আমার সামর্থ্য নেই সেগুলোকে বেছে সাজিয়ে তুলি।

বিপুল সংখ্যার. দিক থেকেই কেবলমাত্র নয়, এই সব স্মৃতির বোঝা এতই

ভারাক্রান্ত যে আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছিল না। হালকা একপাত্র জলের মতই আমাকে দোলাচ্ছিল এদিক ওদিক।

আমি অভিযোগ, দুঃখ, অমঙ্গলকে ঘৃণা করতাম। পাশবিক দৃশ্য, রক্ত, মারামারি,—এমন কি মৌখিক গালমন্দতেও আমার ভেতর একটা বিরূপতার ভাব জেগে উঠত। সে বিরূপতা এক অদম্যক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে উঠত। হিংস্র পশুর মত তখন ঝাঁপিয়ে পড়তাম, পরে আবার এক নিষ্ঠুর অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরতাম।

এমনি কোন এক অত্যাচারীর গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নেওয়ার উত্তেজিত উন্মাদনায় এক এক সময় অন্ধের মত মারাপিটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আজ অবধি যখনই সেই অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত তীব্র হতাশার অন্ধ আবেগের কথা মনে পড়ে তখন লজ্জায় ক্ষোভে অন্তর অভিভূত হয়ে পড়ে।

আমার মধ্যে দুটো মানুষ বাস করত। তার মধ্যে একজন অত্যধিক কুৎসিত ক্লেদাক্ততা দেখে দেখে পবিত্র হয়ে গেছে। জীবনের ভয়ঙ্কর তুচ্ছতা ওকে করে তুলেছে সংশয়বাদী, সন্দেহপরায়ণ। পরম অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখত সমস্ত মানুষকে। এমন কি নিজেকেও। নিঃসঙ্গ একক এই মানুষটি পছন্দ করত মানুষজন, শহরের কোলাহল পেরিয়ে দূরে কর্মহীন শান্ত জীবন যাপন করতে। সে স্বপ্ন দেখত, পারস্যে যাবার স্বপ্ন দেখত মঠে ঢোকার, বনবাসীর কুঁড়েঘরে কিংবা রেলের চৌকিদারদের ঘরে গিয়ে থাকার। শহরের বাইরে রাত-পাহারাদারের কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকবার ইচ্ছে হত তার। লোক যত কম, যতই দূরের জায়গা, ওর কাছে তা ততই পছন্দসই।

অপর মানুষটি, সত্য জ্ঞানগর্ভ বইয়ের বিশুদ্ধ প্রেরণায় দীক্ষা পেয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, জীবনের এই ভয়াবহ একঘেয়েমির ভেতর এমন এক নিষ্ঠুর অব্যর্থ শক্তি আছে যা খুব সহজেই নিজের মাথাটা ছিঁড়ে ফেলতে পারে; নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে পায়ের তলায়। ফলে সে আত্মরক্ষার জন্য দেহের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দাঁতে দাঁত চেপে মুঠি পাকায়, সর্বদা লড়াই কিংবা তর্কের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। অন্তরের অনুকম্পা, ভালবাসা প্রকাশের দাবি করত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ফরাসী উপাখ্যানের নির্ভীক বীরের মতই সামান্য উস্কানীতে রুখে দাঁড়াত মুক্ত তরবারি হাতে।

মালায়া পোকরোভ্স্কায়া স্ট্রীটের বেশ্যাপল্লীর দারোয়ান আমার ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল এই সময়। খেলার মাঠে যাবার পথে একদিন সকালে ওর সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়। দেখি, গাড়ি থেকে অচৈতন্য একটা মেয়েমানুষকে নামাচ্ছে। মেয়েটির পায়ের মোজা গুটিয়ে ছিল। সেই পা দুটো ধরে ও এমন বিশ্রীভাবে টানা-টানি করছিল যাতে পা থেকে কোমর অবধি নগ্ন হয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ করতে লাগল লোকটা, আর থুথু ছেটাতে আরম্ভ করল মেয়েমানুষটার নগ্ন দেহের ওপরে। আলুথালু অবস্থায় মেয়েমানুষটা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছিল। লোকটার ধাক্কায় হেঁচড়ে হেঁচড়ে নামছিল। ওর অবশ হাত দুটোর গ্রন্থি যেন আলগা হয়ে গেছে। মাথায় ওপরে লম্বালম্বি পড়ে রইল। প্রথমে গাড়ির গদিতে, পরে পা দানিতে—সবশেষে বাঁধান রাস্তায় ধাক্কা খেয়ে পড়ল।

ঘোড়ায় চাবুক মেরে কোচোয়ান গাড়ি ছোটাল। দারোয়ান তখন কাঠগাড়ির কাঠের মত মেয়েটির পা দুটো ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে আমি দারোয়ানের দিকে ছুটে গেলাম। কপাল ভাল, আমার সাত ফুট লম্বা মাপ-

কাঠিটা, এক নয় আমি ফেলে দিয়েছিলাম, কিংবা আমার হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছিল। ফলে দারোয়ান আর আমি দুজনেই ভয়ঙ্কর একটা পরিণতির থেকে রক্ষা পেলাম। একদমে ছুটে ওকে ধাক্কা মেরে চিত করে ফেলেই ফটকের চাতালে উঠে বেপরোয়াভাবে ঘন্টা বাজিয়ে দিলাম। এতে কতকগুলো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার লোক দৌড়ে এল ; কিন্তু ব্যাপারটার কিছুই তাদের বুঝিয়ে বলতে না পেরে আমি আমার মাপকাঠিটা তুলে দ্রুত চলে এলাম।

নদীর দিকের রাস্তায় কোচোয়ানকে পাকড়াও করলাম। কোচ-বাক্সের ওপর থেকে খুশি খুশি ভাবে সে আমাকে বলল, 'তুমি তাকে বেশ দিয়েছ।'

কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটার সঙ্গে অমন বিশ্রী নির্লজ্জ আচরণ দেখেও সে কেন কিছুই করল না ?

'চুলোয় যাক মাগী !' ঘৃণাপূর্ণ স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল কোচোয়ান, 'ভদ্রলোকেরা তাকে গাড়িতে তুলে পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে, ব্যস, আমার সম্পর্ক ঐটুকুই।'

'লোকটা যদি খুন করত তাকে, কি হত তাহলে ?'

'ঐ ধরণের মাগীকে খুন করা সহজ নয়।' এমন জোরের সঙ্গে মন্তব্যটা করল যেন মাতাল বেশ্যা খুন করে করে ও হাত পাকিয়েছে।

এরপর থেকে প্রায়-সকালেই দারোয়ানটার সঙ্গে আমার দেখা হত। যেতে যেতে দেখতাম উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে কিংবা বসে আছে সিঁড়িতে—যেন অপেক্ষা করছে আমারই জন্য। আমি এগিয়ে গেলে উঠে দাঁড়াত ; শাসাত আস্তিন গুটিয়ে।'

চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স। খাটো পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা। গর্ভবতী মেয়ের মত পেটটা। ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসত ; কিন্তু ওর দয়ালু উজ্জ্বল চোখ দুটো অবাক করে দিয়ে ওর প্রতি আমাকে নিরুৎসাহ করে তুলত কারণ ও মারপিটে আদৌ উপযুক্ত ছিল না। দু-তিনটে আক্রমণেই হার স্বীকার করত। হাঁপিয়ে ওঠে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বলত, 'এক মিনিট দাঁড়া।'

এরকম মারামারি করে বিরক্তি লেগে গিয়েছিল আমার। ওকে বললাম একদিন, 'শোন বুদ্ধু, আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না, বুঝলি ?'

'তুই কেন লাগতে শুরু করেছিলি আগে ?' অনুযোগসহকারে বলল সে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কেন ঐ ভাবে নির্যাতন করছিল মেয়েটাকে ;

'তোর কি তাতে ? ওর জন্য দয়া হয় নাকি তোর ?'

'অবশ্যই হয়।'

একটু চুপ করে থেকে ঠোঁট মুছে বলল, 'বেড়ালের জন্যও কি তোর দয়া হয় ?

'হ্যাঁ, হয়।'

এবার বলল, 'তুই একটা বেকুফ্ ! সবুর কর, আমি তোকে দেখাচ্ছি !'

আমাকে এ রাস্তা দিয়েই যেতে হত। কাজে যাবার সব চেয়ে সোজা পথ ছিল এটাই। তাই দারোয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানর জন্য আমি খুব সকাল সকাল উঠতে লাগলাম। এ সত্ত্বেও একদিন দেখি সিঁড়িতে ও একটা বেড়াল কোলে নিয়ে বসে আছে। আমি যখন মাত্র পা তিনেক দূরে সে তখন বেড়ালটার পেছনের পা ধরে পার্থরের থামে এমন আছাড় মারল যে আমার সর্বাঙ্গ উষ্ণ রক্তের ছিটের ভরে গেল। পরে বেড়ালটা আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেমন ?'

আমি কী আর করব? দুটো কুকুরের মত আমরা উঠোনে জড়াজড়ি করতে লাগলাম। পরে দুঃখে ক্লেদে বিহ্বল হয়ে পড়ে পথের ধারে ঝোপের মধ্যে শুয়ে দাঁত মুখ বন্ধ করে কান্না চাপতে চেষ্টা করলাম। সে কথা মনে পড়লে সাংঘাতিক বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবি কেন উন্মাদ হইনি সেদিন, অথবা হত্যা করিনি।

কেন আমি এই সব ক্লেদাক্ত স্মৃতি রোমন্থন করছি? কারণ, আপনারা যাতে জানতে পারেন, হে ভদ্র পাঠকেরা, এ কেবলমাত্র অতীতের ঘটনা নয়। কল্পিত কদর্যতার কাহিনী উপভোগ করে থাকেন আপনারা; আনন্দিত হন ভয়ঙ্কর কাহিনীমূলক বই পড়তে। নিজেদের অনুভূতিকে নির্মম বেদনাময় কল্পনার দ্বারা সুড়সুড়ি দিতে আপনাদের সামান্যতম আপত্তি নেই। কিন্তু আমার পরিচয় হয়েছে বাস্তব বীভৎসতার সঙ্গে, প্রাত্যহিক জীবনের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর সঙ্গে। তাই আমার অধিকার আছে আপনাদের অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে সে ভয়ঙ্করের কথা শোনাতে, যাতে অপনারা সঠিকভাবে জানতে পারেন কোথায় বাস করছেন, কেমন করে বাস করছেন।

হীন, এক ঘৃণ্য জীবনযাপন করছি আমরা। কেউ অস্বীকার করতে পারব না। মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে, ব্যথা দেবার হাত থেকে দূরে সরাতে গিয়ে আমি দেখেছি, আমাদের ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। আকর্ষণীয় কথার বাক্যজালে বা মনোরম মিথ্যা দিয়ে নির্মম সত্যকে আমরা যেন না ঢেকে রাখি। জীবনের কাছে দাঁড়াতে হবে আমাদের, খুব কাছে। আর তাতে প্রাণের যা কিছু ভাল, যা কিছু মানবিক সব ঢেলে দিতে হবে উজাড় করে।

মেয়েদের সম্পর্কিত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে সব চেয়ে বেশি অপমানিত করত। পড়ার মধ্য দিয়ে শিখেছিলাম, জীবনে নারীর চেয়ে সুন্দর ব্যঞ্জনাময় আর কিছুই নেই। আর এ কথা যে একান্ত সত্য তা দিদিমা, তার মেরী মাতা ও বিজ্ঞ ভাসিলিসার কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণ পেয়েছি হতভাগিনী ধোপানী নাতালিয়ার কাছে। শত সহস্র হাসি আর চাওনি দিয়ে মেয়েরা, জীবনের জননীরা, নিরানন্দ প্রেমহীন একটা অস্তিত্বকে সুন্দর করে তুলেছে, দেখেছি।

তুর্গেনেভের বই নারীর গৌরবের গান। আর আমার 'রাণী'—মেয়েদের সম্পর্কিত ভাল যা কিছু আমি জানতে পেরেছি তারই মূর্ত প্রতীক হয়ে আছেন। আমার সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে হাইনে আর তুর্গেনেভের অকৃপণ দান।

মেলার মাঠ থেকে ঘরে ফেরার পথে প্রায়ই আমি ক্রেমলিন প্রাচীরের পাশে একটা টিলার ওপর বসতাম ভলগার বুকে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য। জলন্ত এক স্রোত আকাশের বুকে ধেয়ে চলত, তখন আমার প্রিয় পার্থিব নদীর বুকে নেমে আসত ঘন নীল লোহিত ছায়া। এমনি সময়ে পৃথিবীটাকে বিরাট কয়েদী বজরার মত মনে হত কিংবা অতিকায় একটা শূয়োরকে যেন দড়ি বেঁধে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে।

অধিকাংশ সময়ই আমার চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর ব্যাপকতার মধ্যে ছুটে চলত অন্য সব নগরীর দিকে, যাদের কথা—আমি বই-এ পড়েছি, যাদের জীবনযাত্রা প্রবাহিত ভিন্ন খাদে, তাদের কাছে সেই সব দেশে। এক ঘেয়ে মন্থর গতিতে যে জীবন আমাকে ঘিরে আবর্তিত, তার তুলনায় বিদেশী লেখকদের লেখায় জীবনকে ঢের বেশি পরিচ্ছন্ন, ঢের বেশি আকর্ষণীয় আর অনেক কম দুর্বিষহ করে দেখান হয়েছে। এতে আমার ভয় কেটে ক্রমশই এই আশা জাগত যে, এর চেয়ে সুন্দর জীবনযাপন সম্ভব। আমি মনে মনে ভাবতাম যে, কোন একদিন আমি একজন

প্রজ্ঞাবান সরল মানুষের দেখা পাব যিনি আমাকে রৌদ্রোজ্জ্বল এক প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করাবেন।

একদিন ক্রেমলিন প্রাচীরের পাশে একটা বেঞ্চের ওপরে যখন বসেছিলাম। ইয়াকভ খুড়ো তখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি লক্ষ্য করিনি যে সে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারিনি। যদিও একই শহরে দীর্ঘকাল আমাদের বাস, তবু দেখা সাক্ষাৎ হত কদাচিৎ, দৈবাৎ ক্ষণিকের জন্য।

'ডানা গজিয়েছে দেখছি।' ছোট্ট করে গা ধাক্কা দিয়ে ঠাট্টার সুরে বলল সে। তারপর আমরা পরস্পর এমনভাবে কথাবার্তা শুরু করলাম যেন আমরা আত্মীয় নই, তবে পরস্পরের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের পরিচয় আছে।

দিদিমা আমাকে বলেছিল যে, ইয়াকভ খুড়ো তার বিষয় সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। এক সময়ে সে জেল-কলোনীর সেপাইয়ের সহকারী ছিল। কিন্তু এক দুঃখজনক পরিণতির মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সেপাই অসুস্থ থাকাকালীন ইয়াকভ খুড়ো তার নিজের ঘরে কয়েদীদের এনে আমোদ প্রামোদ করেছিল। এটা জানাজানি হতে তার চাকরী যায়, এবং রাতে কয়েদীদের ছেড়ে দেবার অভিযোগে সে অভিযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে কেউ না পালালেও একজন ধরা পড়েছিল এক পুরুতের সহকারীকে গলা টিপে মারতে গিয়ে। অনুসন্ধান পর্ব দীর্ঘদিন চললেও আদালত পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কয়েদীরা আর সেপাইরা মিলে আমার দয়ালু হৃদয়বান্ খুড়োকে সেই অপমান থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করেছিল। এখন সে আর কোন কাজ করে না, ছেলের ওপরে নির্ভরশীল; ছেলে সেই সময়কার প্রখ্যাত রুকাভিশনি-কভ গির্জের গায়ক সম্প্রদায়ের একজন। ছেলের সম্পর্কে খুড়ো আশ্চর্য কথা বলল, 'আজকাল খুবই গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠেছে ও, কেউকেটা গোছের! একজন 'একক গায়ক'। সামোভার গরম করতে বা ওর পোশাক-আশাক ব্রুশ করতে আমার সামান্য দেরি হলে তৎক্ষণাৎ রেগে ওঠে! খুব ধোপদুরস্ত-ছেলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটাই ওর স্বভাব কিনা।'

খুড়োকে বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছিল। পরনে খুব নোংরা, জীর্ণ জামা কাপড়। কাঠখোট্টার মত। তার আকর্ষণীয় কোঁকড়ানো চুলগুলো উঠে হালকা হয়ে গেছে; কানদুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোখের পাতায় আর দাড়িহীন চক্‌চকে রেশমী গালে ফুটে উঠেছে লাল-লাল সূক্ষ্ম শিরার জাল। পরিহাসের সুরে কথা বললেও মনে হচ্ছিল তার মুখের ভেতর এমন একটা কিছু আছে, কথা বলতে যা বাধার সৃষ্টি করছে, যদিও তার দাঁতগুলো বেশ শক্ত।

কেমন করে আনন্দে থাকতে হয় ও তা জানে। এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম। অনেক কিছুই দেখেছে ও, অনেক কিছুই জানে। ওর সেই দুঃসাহসী হাস্যকৌতুকের গান আর তার সম্পর্কে দাদুর মন্তব্য আমার স্পষ্ট মনে আছে, 'ও গানে দাভিদ কিন্তু কাজে আবসালোম।'

আমাদের পাশের বুলেভার দিয়ে দলে দলে বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছে শহরের সম্মানীয় মানুষজন: অফিসার, সরকারী কর্মচারী, কোমল পশমের পোষাক পরি-বৃতা তরুণী। আমার খুড়োর পরনে পুরনো কোট, মাথায় ছেঁড়াখোঁড়া টুপি আর পায়ে নোংরা রঙের বুট। আমরা পোচাইনস্কি গলির ওপরের একটা সরাইখানায় ঢুকে বাজারের দিকের জানলায় একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। বেশবাসের জন্য

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে জড়োসড়ো ভাবে সে বেঞ্চের ওপরে বসল।

'কেমন করে আপনি গাইতেন মনে আছে ?

চিন্তাক্লিষ্টভাবে সে তার নিজের জন্য এক গ্লাস ভদ্‌কা ঢালতে ঢালতে বলে উঠল, 'ও, হ্যাঁ আমি আমার জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। আমোদ প্রমোদও করেছি। কিন্তু খুব বেশি নয়। ও গানটা আমার নয়। লিখেছিল সেমিনারির এক মাষ্টার। কি যেন নামটা তার ? ভুলে গেছি। আমরা বড্ড বন্ধু ছিলাম—সে আর আমি। কিন্তু সে মদ খেয়ে খেয়ে মাতাল হয়ে গেল—ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল। কত লোককেই না আমি মদ খেয়ে খেয়ে মরে যেতে দেখেছি! হিসেবের বাইরে! তুই কি মদ খাস ? খাস না। সবুর কর দুদিন। মাঝে মাঝে দেখতে আস তোর দাদুকে ? দুঃখী বুড়ো মানুষ। মনে হয় সামান্য যেন দোষ হয়েছে মাথায়।'

কয়েদীদের ব্যাপারটা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তাও তুই শুনে ফেলেছিস ?' বলে চারপাশটা দেখল। তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে বলল, 'তারা কয়েদী তাতে কি ? আমি তাদের বিচারক নই। দেখলাম ওরাও অন্যান্য সকলের মতই মানুষ। তাই আমি তাদের বলি, 'এস ভাই, বন্ধুর মত এক সঙ্গে থাকি আমরা, একটু আমোদ-প্রমোদ করি। হেসে উঠে সে জানলার বাইরে সারি সারি দোকানে ভরা অন্ধকারময় পাহাড়ী নালাটার দিকে তাকাল, অবশ্যই ওরা খুশি হয়েছিল। জেলের ভেতরটা বিশ্রী এক ঘেয়ে।' গোঁফে তা দিতে দিতে সে বলে গেল, 'তাই নাম ডাকা হয়ে গেলে ওরা আমার কাছে আসত। খাবার আর ভদ্‌কা চলত। কখনো আমার, কখনো ওদের। আর ভরত পাখীর ডানায় উড়ে চলতেন রুশ জননী! নাচ গান আমি ভালবাসতাম। আর ওদের মধ্যেও কিছু ভাল গাইয়ে আর নাচিয়ে ছিল। সত্যি, খুব চমৎকার। তুই বিশ্বাস করতে পারবি না! ওদের মধ্যে অর্ধেকের শেকল পরান ছিল, আমি অনুমতি দিলাম শেকল খুলে ফেলতে। এটা সত্যি কথা, ওরা নিজেরাই খুলতে পারত, আমার ছাড়াই। চালাক লোক, সত্যি ভারি চালাক কিন্তু। ঐ যে সকলে আমার সম্পর্কে বলে, শহরে গিয়ে চুরি করবার জন্য ওদের আমি রাত্রে ছেড়ে দিতাম, বাজে কথা এটা। কেউই তা প্রমাণ করতে পারত না।'

বলতে বলতে চুপ করল সে, তারপর পাহাড়ী নালাটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। সেখানে পুরনো জিনিসের বিক্রেতারা তাদের দোকান বন্ধ করছিল। হুড়কোর খট্‌খট্, তালার ঝন্‌ঝনানি, আর পড়ে যাওয়া তক্তার শব্দ জেগে উঠছিল। তারপর সে চোখ মিট্‌মিট্ করে হেসে বলতে লাগল, 'তা যদি সত্যি করে বলি তো ওদের মধ্যে একজন রাত্রে বেরুত ঠিকই।' তবে তার শেকল বাঁধা ছিল না। একটা স্থানীয় চোর মাত্র—নিঝ্‌নি নভগোরদের ধারেকাছেই ওর মেয়েমানুষ ছিল একটা, পেচোরকা নদীর পাড়ে। আর পুরুতের ঐ সহকারীর ব্যাপারটা—ওটা নেহাৎ একটা দুর্ঘটনা। পুরুতটাকে ও ব্যবসায়ী ভেবেছিল। শীতের এক ঝড়বৃষ্টির রাতে এটা ঘটে। প্রত্যেকেরই পরনে ওভারকোট। কে বলবে কোনটা পুরুত, কোনটা ব্যবসায়ী।'

শুনে মজা লাগল। আর সেও হাসতে হাসতে বলল, 'অবশ্য এটা ঠিক, ও চিনতে পারে নি।'

আচমকা, রাগে জ্বলে উঠল আমার খুড়োই। প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে মুখখানা বেজার করে একটা সিগারেট ধরাল, বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ওরা একজন

আরেকজনেরটা চুরি করছে, একজন আরেকজনকে ধরছে—জেলে দিচ্ছে কিংবা সাইবেরিয়ার পাঠাচ্ছে কঠোর শ্রমের সাজা দিয়ে। কিন্তু এরমধ্যে আমাকে জড়ান কেন? থুঃ থুঃ এ সবে। আমি আমার আপন আত্মাকে বাঁচিয়ে চলেছি।'

সর্ব শরীরে বড বড় লোমে ভর্তি আগওলার মূর্তি আমার চোখে ভেসে উঠল। সেও এই রকম 'থুঃ থুঃ' করত। আর তারও নাম ছিল ইয়াকভ।

'কি ভাবছিস?' খুড়ো জিজ্ঞেস করল মৃদুভাবে।

'ঐ সব কয়েদীদের জন্য কি আপনার দুঃখ হত?'

'তাদের জন্য। দুঃখ হওয়াটাই সহজ, এমন চমৎকার লোক সব! সত্যি, খুব চমৎকার! মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, তোমাদের জুতো পালিশ করবার যোগ্য নই আমি, আর আমি কি না তোমাদের রক্ষক! শয়তানগুলো চালাক আর ধূর্ত শেয়ালের মত।'

মদ আর অতীত স্মৃতি ওকে ফের চাঙা করে তুলল। জানলার শিকে কনুয়ের ভর রেখে দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরা হলদে হাতটা নাড়তে নাড়তে প্রাণবন্ত স্বরে বলতে লাগল, 'যদি শুনতিস ওদের মধ্যে একজন কেমন করে কথা বলত। সে ছিল একচোখ কানা। খোদাইকার আর ঘড়ির মিস্ত্রি। ধরা পড়ে টাকা জাল করতে গিয়ে। পালিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিল। কথায় কথায় মশালের মত জ্বলে উঠত। গান গাইত সে পাখির মত! লোকটা বলত, 'এটা আমাকে বোঝাও দেখি, টাঁকশালে যদি টাকা তৈরি করতে পারে তাহলে আমি পারব না কেন? হুঁ! এস, বোঝাও!' কেউই বোঝাতে পারত না। কেউই না এমন কি আমিও না। অথচ আমি কি না রক্ষক ওদের! তারপর আরেকজন ছিল, মস্কোর এক নামজাদা চোর—শান্ত, পরিষ্কার চেহারা। বাবু বাবু গোছের খানিকটা। সর্বদাই কথা বলত ভদ্রভাবে। সে বলত, 'মানুষ খেটে খেটে শেষ হচ্ছে; কিন্তু আমার তা করার কোন ইচ্ছেই নেই। চেষ্টা করেছিলাম একবার,' সে বলল, 'খেটে খেটে আমার আঙুলের ডগা ক্ষয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিসের জন্য? এক দলা ভাতের জন্য। মদ খাও এক ঢোক, হারো এক আধ কোপেক তাসে, একটা মেয়েমানুষের সোহাগের বদলে দাও নাম মাত্র, আর তারপর আবার তোমার ভেঙে পড়া, পেটের জ্বালা। না,' সে বলত, 'আমি ঐ খেলা খেলতে রাজী নই'।'

ইয়াকভ খুড়ো বলতে বলতে টেবিলের উপর নুয়ে পড়ল। চোখ লাল হয়ে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে ছোট ছোট কান দুটো পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে, 'ওরা বোকা নয়, ভাই। ওরা আসল মূলটাই বুঝে নিয়েছে। জাহান্নামে যাক সব ভায়ারা! এই আমাকে ধরেই দেখ; কি হল আমার জীবনটা? মনে করতেও লজ্জা বোধ করি। ভাল যা কিছু তা লুকিয়ে নিতে হয়েছে। অর্জন করেছি দুঃখ আর চুরি করেছি আনন্দ। আমার বাবা ধমকাত এটা কোর না, আমার বৌ ধমকাত ওটা কোর না, আর আমি নিজের জন্য ভয় পেতাম একটা কোপেক খরচ করতেও। এভাবেই গড়িয়ে গেল জীবন। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আমি আমার নিজের ছেলের তোষামুদে চাকর। লুকোবার চেষ্টা করব কেন? আমি বাধ্যের মত তার সেবা করি, ভায়া, আর সে আমাকে ভর্ৎসনা করে খাঁটি ভদ্রলোকের মত। ও আমাকে ডাকে 'বাবা' কিন্তু আমার কানে বাজে 'তোষামুদে চাকর।' এর জন্যই আমি জন্মেছিলাম! সকল কিছু সহ্য করেছিলাম কি শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলের তোষামুদে

চাকর হয়ে মরতে ? কিন্তু যদি এরকম না'ও হত, তবু আমি কিসের জন্য বাঁচলাম ? কতটুকু আনন্দ পেয়েছি আজ পর্যন্ত জীবনের কাছ থেকে ?'

আমি তেমন মন দিয়ে তার কথা শুনছিলাম না। আমতা-আমতা করে কিছু না ভেবে চিন্তেই বললাম, 'কেমন করে বাঁচতে হয় আমিও জানি !'

গজগজ করে উঠল সে, 'হুঁ ! কে জানে ? এমন একজনও দেখি নি আমি যে জানে। মানুষ জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে—অভ্যাসের বশেই…'

তার গলায় আবার রাগ ও ক্ষোভের সুর বেজে উঠল, 'আর একজন ছিল ওরেলের—তার সাজা হয়েছিল নারী ধর্ষণের জন্য। ভদ্র বংশের ছেলে। সে ছিল একজন চমৎকার নাচিয়ে। গান গেয়ে ও লোকদের হাসাত। কিন্তু আমার মতে, গানটার ভেতরে হাসবার মত মজা ছিলনা। ওটা হচ্ছে আসল সত্য। যতই দাপাদাপি কর কিংবা চিৎকার করে যতই কাঁদো, কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই কবরের হাত থেকে। আর সেখানে গিয়ে পৌঁছব যখন তখন আমি কয়েদী ছিলাম কি সেপাই ছিলাম, তা ভাবতে বয়েই যাবে।

কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে ভদ্‌কাটুকু নিঃশেষ করে সে পাখির মত একচোখ বুজে শূন্য গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে রইল। ধূমপান করতে লাগল নীরবে। গোঁফের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

ইয়াকভ খুড়োর সঙ্গে পাথর-মিস্ত্রি পিওতরের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। প্রায়ই সেও বলত, 'যতই চেষ্টা করুক মানুষ, যত ইচ্ছে আশা করুক না কেন একদিন কফিনে করে কবরের তলায় তাকে আসতেই হবে।' তাছাড়া আরো কতই না লোককথা আছে এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে !

আমার খুড়োকে আর কোন কিছুই জিজ্ঞেস করবার স্পৃহা ছিল না। ওর জন্য দুঃখ হচ্ছিল ! আর ওর সঙ্গে বসে থেকে থেকে মন ভারি হয়ে এসেছিল আমার। তার বিষণ্ণতার মধ্যে, তার সেই আনন্দময় হাসির গান আর গিটারের ঝঙ্কারের কথা মনে না করে পারছিলাম না। আমি হাসিখুশি সেই ৎসিগাণকের কথাও ভুলে যাইনি। আজ ঐ দোমড়ানো দেহ ইয়াকভ খুড়োর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ওর এখনো মনে আছে কিনা, একদিন কেমন করে ৎসিগাণকে ক্রুশ দিয়ে পিটিয়েছিল। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করলাম না তাকে।

নিচের পাহাড়ী নালাটার দিকে তাকালাম, শরতের কুয়াশায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে সেটা। গভীর তলদেশ থেকে ভেসে আসছে আপেল আর তরমুজের গন্ধ। শহরের দিকে সরু পথে চমকে উঠছে লণ্ঠনের আলো। আমার চারপাশের সমস্ত কিছুই আমার একান্ত পরিবারের মত পরিচিত। ঐ যে জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল. ওটা রীবিনস্ক চলেছে, আর ঐ যে আরেকটা জাহাজের বাঁশী ওটা যাবে পেরম।

'এই, আচ্ছা—আমি এখন যাচ্ছি।' বলল আমার খুড়ো।

সরাইখানার দরজার সামনে সে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'এখনই অত মনমরা হোস না। মনে হয় ভারি অবসাদগ্রস্ত তুই। চাঙ্গা হয়ে ওঠ. তোর এখনো অল্প বয়েস। মনে রাখিস, 'ভাগ্যের মাথা খেয়ে ফুর্তি করি, পথ না ফুরোয় যতক্ষণ।' আচ্ছা, শুভ বিদায়। উস্‌পেনস্কি গির্জে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

প্রসন্ন মেজাজী আমার খুড়ো চলে গেল। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করার আগে সে যা বলে গেল তাতে আমার মাথাটা আগের চাইতেও বেশি করে ঘুলিয়ে এল।

পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম। শহরের দিকে, মাঠের পথ ধরে চলতে লাগলাম আকাশে পূর্ণচাঁদ। ছুটে চলেছে পরন্ত মেঘ, তাদের নিজের ছায়ায় মুছে দিয়ে যাচ্ছে আমার ছায়া। মাঠের পথে শহরটা ঘুরে ওৎকস এতে ভলগার পারে এসে পৌঁছলাম আমি। নদী, মাঠ, আর স্তব্ধ নিশ্চল মাটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম ধূলি ধূসর ঘাসের বুকে। ভলগার বুকের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে মেঘের ছায়া ভেসে যেতে যেতে ওপারে মাঠের কাছে পৌঁছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন যাবার পথে জলে নেমে পরিশুদ্ধ হয়ে নিয়েছে ওরা। আমাকে ঘিরে সব কিছুই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, নতজানু। আর সবকিছুই যেন একান্ত অনিচ্ছায়, প্রয়োজনের তাগিদে চলছে; জীবন আর তার গতিময়তার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওরা চলছে না।

এই মাটিকে আর নিজেকে এমন একখানা লাথি মারতে ইচ্ছা হল, যাতে সবকিছুই এক আনন্দের আবর্তে, আত্মহারা নৃত্যে পাক খেয়ে ওঠে,—যেখানে নৃত্য করছে সেই মানুষ—যারা পরস্পরকে ভালবাসছে জীবনের সঙ্গে, আর ভালবাসছে এই জীবনকেই,—আরো সৎ, সাহসী ও সুন্দর এক জীবনের আকাঙ্ক্ষায়।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কিছু একটা করতে না পারলে আমি হারিয়ে যাব

আনন্দহীন শহরের দিনে বনে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার সময় অনেকদিন আমি সূর্যের মুখ দেখা তো দূরে থাক অনুভব পর্যন্ত করতে পারতাম না। প্রায়ই ভুলে যেতাম তার অস্তিত্ব। যদি আমি আমার পথ হারিয়ে ফেলতাম তখন ফিরে আসবার জন্য উপপথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতাম; খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে এলে পর দাঁতে দাঁত চেপে বেপরোয়া ভাবে গভীর বনে ঢুকে পায়ের তলার ঝোপজঙ্গল ভেঙে বিপদসঙ্কুল জলাভূমি পার হতাম। আর সর্বদা অনিবার্যভাবেই আমি আমার ঠিক রাস্তায় এসে পড়তাম।

তারপর আমি আমার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই বছরের শরৎকালেই কাজানে পাড়ি দিলাম। সেখানে পড়াশুনো করবার কোন একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি, এই গোপন আশা রইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত